অর্ধেক
জীবন
সুনীল
গঙ্গোপাধ্যায়

সাময়িকপত্রে ধারাবাহিক প্রকাশের সময় 'অর্ধেক জীবন' নিয়ে বৃহত্তর বাঙালি পাঠকের ভিতর যে-কৌতূহল তৈরি হয়েছিল, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। তিনটি দশক জুড়ে লেখকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-ভালবাসা, স্মৃতি-বিস্মৃতি, অনতিঅতীতের ইতিহাস ও সমসাময়িক ঘটনার ইতিবৃত্ত এই রচনাকে অন্যমাত্রায় উত্তীর্ণ করেছে। সব মিলিয়ে 'অর্ধেক জীবন' একটি রোমাঞ্চকর, সংগ্রামবহুল, গৌরবময় ও আনন্দ-বেদনার আকীর্ণ সত্যিকারের জীবনকাহিনী।

অর্ধেক জীবন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

চান্দ্রেয়ী আর শৌভিককে

মুখবন্ধ

ধারাবাহিকভাবে এই রচনা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের সময় ও সমাপ্ত হলে অনেকে আমাকে প্রশ্ন ও অভিযোগ করেছেন, আমি 'অর্ধেক জীবন' নাম দিয়েছি কেন, আমি কি আমার আয়ুর সীমানা জানি? কিংবা অকস্মাৎ এ রচনা শেষ হয়ে গেল কেন, দ্বিতীয় খণ্ড কি আবার লেখা হবে? অতি সংক্ষেপে এর উত্তর এই যে, নামকরণের সঙ্গে আমার আয়ুর কোনও প্রশ্নই নেই, পুরো জীবনের কথা কেউ কখনও লিখতে পেরেছেন কি না আমি জানি না, তা ছাড়া, শেকসপিয়ারের হ্যামলেটের যে-উক্তিটি আমি উদ্ধৃত করেছি, তার মধ্যেই এই নামকরণের তাৎপর্য নিহিত আছে। এর পরের খণ্ড আর লেখার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এ রচনা আমি মধ্যপথে সমাপ্ত করিনি, এইটুকুই-এর পূর্বপরিকল্পিত নির্দিষ্ট পরিধি। পূর্ব বাংলার এক অখ্যাত গ্রামে জন্ম। বহু বছর পর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন, এর মধ্যে একটা বৃত্ত আছে। এবং চল্লিশ-পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বিপদসঙ্কুল, কঠিন, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের মধ্য দিয়ে জীবন টিকিয়ে রাখা, যাকে বলে জীবনসংগ্রাম, সব কিছুই অনিশ্চিত, তারই মধ্যে নানা রকম আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসা, অনেক স্বপ্ন, সেই বয়েসটার কথা লিখতে চেয়েছি। এটাকে ঠিক আত্মজীবনীও বলা যায় না। নিজের অন্তর্জীবনের কথা বলা যায় না কিছুতেই, অনেক সময় মনে হয় তা অকিঞ্চিৎকর, অন্যকে জানাবার মতন নয়, আমার পারিবারিক কাহিনীও যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত, বরং সমসাময়িক স্মৃতিকথাই প্রাধান্য পেয়েছে, কাছাকাছি ইতিহাসের পটভূমিকা এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী।

এর পরবর্তী অংশ না লেখার প্রধান কারণটিও এখানে ব্যক্ত করা যায়। এই অংশে আমি এমন অনেক মানুষের কথা লিখেছি, আমার সেইসব প্রিয় মানুষ আর ইহলোকে নেই, বন্ধুদের মধ্যেও কেউ কেউ চিরবিদায় নিয়েছে, তাঁদের মৃত্যুর কথা লিখতে আমার কলম অক্ষম। আমার এই স্মৃতিকাহিনীতে তাঁরা জীবন্ত হয়েই থাক। শুধুমাত্র আমার বাবার মৃত্যুর কথা লিখতেই হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে।

এই লেখা শুরু করার পর পদে পদে বাধার সম্মুখীন হয়েছি, আর সেই বাধা এসেছে আমার নিজেরই কলম থেকে। কোনও লেখকের পক্ষে এক বিষয় নিয়ে বারবার লেখা সম্ভব নয়, তা চর্বিত চর্বণের পর্যায়ে পড়ে। আমি আমার বিস্তর কবিতায় ও গল্প-উপন্যাসে নিজের জীবনকে ব্যবহার করেছি টুকরো টুকরোভাবে। সেইসব ঘটনারই পুনরাবৃত্তি করতে আমার কলম ইতস্তত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থমকে গেছে। অথচ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য সে সব একেবারে বাদ দেওয়াও যায় না। সেই জন্যই ওই সব অংশ (যেমন আমার প্রথমবারের প্রবাস জীবন ও মার্গারিটের সঙ্গে বন্ধুত্ব) আগেই অন্যত্র বিস্তৃতভাবে লেখা হয়েছে বলে এখানে শুধু একটু একটু ছুঁয়ে গেছি মাত্র। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার ইতিহাসও আমি নিজে ছাড়াও আরও অনেকে লিখেছেন, তাই এখানে শুধু কয়েকটি রেখার টানই মনে হয়েছে যথেষ্ট। তবু, আমি স্বীকার করতে বাধ্য, কোথাও কোথাও পুনরুক্তি এসেই গেছে।

আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ভি এস নইপাল, তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থটির নাম 'হাফ অফ লাইফ'। আমার 'অর্ধেক জীবন' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয় প্রায় তিন বছর আগে, তখন নইপালের উপন্যাসটির

নাম কিংবা প্রস্তুতিপর্বের কথা কিছুই জানা যায়নি। হাফ অফ লাইফ অবশ্য স্মৃতিকথা নয়, জীবন-ঘেঁষা উপন্যাস, তবু এই নামের মিলে আমি কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করেছি। আমি ওই বইয়ের কথা আগে শুনিনি, নইপালও যতদূর মনে হয় বাংলা জানেন না এবং 'দেশ' পত্রিকা পড়েন না। তিনিও কি হ্যামলেটের ওই লাইনটির কথা মনে রেখেছেন? তাঁর বইটিতে অবশ্য সে উল্লেখ নেই। যাই হোক, সে জন্য আমার এ রচনার নাম বদলের কোনও যৌক্তিকতা নেই।

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় প্রথমে যে-পরিচ্ছেদটি ছিল, সেটি এ গ্রন্থ থেকে বাদ দিয়েছি ইচ্ছে করে। সে পরিচ্ছেদে ছিল আমার জীবনের পরিণত বয়েসের কিছু কিছু ঘটনার সমন্বয়, তার পরের এই দীর্ঘ অংশ ফ্ল্যাশ ব্যাক, আঙ্গিক হিসেবে বেমানান। তা ছাড়া তাতে যে কৌতুকের প্রয়াস ছিল, তার রেশ এতদূর ধরে রাখা যায় না। সেই পরিচ্ছেদটি পরিশিষ্ট হিসেবে যুক্ত করার কথা একবার ভেবেও শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়েছে, পুরনো 'দেশ' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই সেটা নিবদ্ধ থাক।

ইতিহাসের উপাদান ও প্রেক্ষাপটের ঘটনাবলী কিছু কিছু বই ও সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলির নাম আর আলাদাভাবে উল্লেখিত হল না। আমার নিজের যে-সব বইতে আমার জীবন ছড়িয়ে আছে, সেগুলির তালিকা দিলেও নিশ্চিত বাহুল্য বোধ হবে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

Queen : O Hamlet, thou hast cleft my heart in twain,
Hamlet : O, throw away the worser part of it,
And live the purer with the other half.

Hamlet, Act III, Sc IV
William Shakespeare.

এক

অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার মহকুমা শহর মাদারিপুর, সেই শহর থেকেও বেশ দূরে ইজপাড়া একটি অতি সাধারণ গ্রাম। মাইয বা মাইজ মানে খুব সম্ভবত মধ্যম, বাঙাল ভাষায় মজো ভাইকে বলে মাইজাভাই। আঞ্চলিক অভিধানে মাইজ-এর একটা অন্য অর্থও আছে, াইজপাতা মানে গাছের কচি পাতা।

শুধু মাইজপাড়া নয়, পূর্ব মাইজপাড়া। তার মানে নিশ্চয়ই একটা পশ্চিম মাইজপাড়াও ছিল বা আছে। অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়। যেমন, এখন পশ্চিমবঙ্গ নামে একটি রাজ্য আছে, (আগে যাকে প্রদেশ বলা হত) কিন্তু পূর্ববঙ্গ বলে এখন আর পৃথিবীতে কিছু নেই। এই পশ্চিমবঙ্গের আবার উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ হিসেবেও ভাগ করা হয়, কিন্তু পূর্ববঙ্গ অদৃশ্য।

ওই পুব মাইজপাড়া গ্রামের এক প্রান্তে ছিল একটি ব্রাহ্মণ পল্লী। একটি বেশ বড় আকারের চৌকো উঠোনের চারদিকে চারটি বাড়ি। পঞ্চম একটি বাড়ি এক কোণের দিকে, বোঝা যায় পরের দিকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, তাই বর্গক্ষেত্রটির পাশে জায়গা পায়নি। সেই পঞ্চম বাড়িটি আকারেও ছোট, চেহারায় মলিন, তাতে অন্যদের তুলনায় এক দরিদ্র পরিবারের বাস। সেই পরিবারের কর্তার নাম অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, আমার পিতামহ। তিনি ছিলেন সামান্য এক টোলের পণ্ডিত।

সেই সময়ে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নামে একজন লেখকও ছিলেন। কলকাতায় ইস্কুলের নিচু ক্লাসে আমাদের 'চাণক্য শ্লোক' নামে একটি চটি বই পড়তে হত, সেই শ্লোকগুলির পদ্য-অনুবাদক অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, আমি সহপাঠীদের কাছে চাল মেরে বলতাম, ইনি আমার ঠাকুর্দা। একেবারে নির্জলা মিথ্যে কথা। আমাদের বংশে কেউ কখনও লেখালেখির ধার ধারেননি।

আমার জন্ম অবশ্য ওই গ্রামে হয়নি; এক সময় সন্তানসম্ভবা বধূকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার প্রথা ছিল। আমার মাকেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বাপের বাড়িতে নয়, কারণ মায়ের কোনও বাপের বাড়ি ছিল না। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করা দরকার, আমার মায়ের একজন জবরদস্ত বাবা তো ছিলেনই, বরিশাল জেলায় তাঁর বাড়িও ছিল। কিন্তু মা কখনও যেতেন না সেখানে। এর পেছনে আছে কৌলীন্যপ্রথার সুদীর্ঘ করুণ ও হাস্যকর ইতিহাস। চতুর ও লোভী ব্রাহ্মণেরা এই প্রথা চালিয়ে কত যে অসহায় কুমারীর সর্বনাশ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। বিদ্যাসাগর মশাই পূর্ববঙ্গের কুলীন ব্রাহ্মণদের এক একজনের দুশো-আড়াইশো পত্নীরও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছিলেন। এখন অনেকের ধারণা, কৌলীন্যপ্রথা বুঝি উনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপার, তা কিন্তু নয়, বিংশ শতাব্দীতেও অনেকদিন চালু ছিল, আমি নিজেও দেখেছি, আমার পিতৃ ও মাতৃকুল এই প্রথার ভুক্তভোগী।

আমার গরিব ঠাকুর্দা চারখানা বিয়ে করেছিলেন, এবং মাতামহ তিনটি। গল্প শুনেছি, আমার ঠাকুর্দার এক পত্নীর একবার খুব অসুখ হয়। চিকিৎসা করার সঙ্গতি ছিল না, দিশাহারা হয়ে তিনি বাড়ি থেকে চলে যান, কয়েকদিন পর বেশ কিছু টাকাপয়সা নিয়ে ফিরে এলেন। অর্থোপার্জনের একমাত্র উপায় আর একটি বিয়ে করা, তিনি তাই করেছেন, নবোঢ়াকে ফেলে পণের টাকা নিয়ে

ফিরে এসে অন্য পত্নীর জন্য ওষুধ-ডাক্তারের খরচ মিটিয়েছেন।

আমার মাতামহ অত গরিব ছিলেন না, অরক্ষণীয়া ব্রাহ্মণ কন্যাদের উদ্ধার করার জন্যই সম্ভবত তিনবার দার পরিগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু তিন পত্নীকে এক সংসারে রাখার মতন বোকামি করেননি। আমার মায়ের মা কখনও তাঁর স্বামী-গৃহে থাকেননি, প্রায় সারাটা জীবন তিনি তাঁর এক ভাইয়ের সংসারে আশ্রিতা হয়ে কাটিয়ে গেছেন। আমার মায়ের সেই মামার বাড়িই ছিল কার্যত তাঁর বাপের বাড়ি, আমিও সেই বাড়িকেই মামার বাড়ি বলতাম।

ফরিদপুর জেলাতেই সেই মামার বাড়ির গ্রামের নাম আমগ্রাম বা আমগাঁ, লোকে অবশ্য বলত আমগা; পূর্ববঙ্গের লোকদের কেন যেন চন্দ্রবিন্দুর প্রতি বড়ই অভক্তি। পশ্চিমবঙ্গে আবার বেশি বেশি চন্দ্রবিন্দু। ওরা চাঁদ ও ফাঁদকে বলে চাদ ও ফাদ, এদিকে এরা হাসি ও হাসপাতালের বদলে হাঁসি ও হাঁসপাতাল। আমাদের মাইজপাড়ার তুলনায় আমগাঁ বেশ বর্ধিষ্ণু, অনেক সচ্ছল লোকের বাস, বেশ কিছু পাকা বাড়ি, এমনকী দোতলা-তিনতলা, যা ওই ধরনের গ্রামে তখনকার দিনে খুবই দুর্লভ ছিল।

আমাদের বাবা-ঠাকুর্দার বাড়ির সঙ্গে মায়ের মামাবাড়ির কোনও তুলনাই চলে না। আমাদের বাড়িটি মাটির দেওয়াল, ওপরে টিনের চাল। ছোট্ট উঠোন, তার এক পাশে রান্নাঘর, অন্য পাশে আর একটি ছোট্ট ঘর, সেগুলির চাল খড়ের। সেই ব্রাহ্মণপল্লীতে তিনটি বেশ বড় বড় পুষ্করিণী ছিল, কোনওটাই নিজস্ব নয় আমাদের। যান-বাহনের জন্য আমাদের নিজস্ব নৌকো বা গরুর গাড়িও ছিল না। তবে কয়েক বিঘে জমি ছিল দূরে কোথাও, সেই জমির চাষিরা আমাদের তুলনায় অনেক সম্পন্ন, বছরে একবার সাজগোজ করে আমাদের ধান বিক্রির টাকা দিতে আসত। লুঙ্গির ওপরে ধপধপে সাদা কুর্তা পরা ও গলায় মাফলার জড়ানো একজন মুসলমান প্রজার কথা আমার মনে পড়ে। অত ভালো পোশাক আমার বাপ-ঠাকুর্দা কখনও পরেননি।

আমরা ছাড়াও জ্যাঠামশাইয়ের পরিবার ও দু'জন অবিবাহিত কাকা, সবাই মিলে সেই ছোট বাড়িতে কী করে এঁটে যেতাম জানি না। আমার তিন বছর বয়েসে ঠার্কুদা মারা যান, তাঁর সম্পর্কে আমার প্রায় কিছুই স্মৃতি নেই। একজন ঠাকুমা, বাবার নিজের মা নন, সৎমা, বেঁচে ছিলেন আরও কিছুদিন।

টিনের চাল দেওয়া মাটির বাড়িতে খুব যে কষ্টে ছিলাম, তা তো মনে হয় না। টিনের চালে কাক লাফালে ক্যাচোর-ম্যাচোর শব্দ হত, কিন্তু বৃষ্টির শব্দ ছিল আচ্ছন্ন করা মন্ত্রের মতন। একটাই অসুবিধে, মাটির ভিত কেটে চোর ঢোকা বেশ সহজ ব্যাপার, তাকে বলা হয় সিঁধ কাটা। কিছু কিছু ফলের গাছ সব বাড়িতেই থাকে, আমাদের উঠোনে ছিল একটা জামরুল গাছ, বাড়ির এক পাশে একটা বাতাবি লেবুর গাছ, ওখানকার ভাষায় বলে জম্বুরা। বাতাবি শব্দটি এসেছে ব্যাটাভিয়া থেকে, জাভার অন্তর্গত একটি স্থানের নাম ব্যাটাভিয়া, ফলটি সেখান থেকেই আনীত। জম্বুরা শব্দটি কোথা থেকে এসেছে জানি না; সেই গাছটিতে প্রচুর ফল হত, অত কে খাবে, সেই বাতাবি লেবু দিয়ে আমরা ফুটবল খেলতাম। একটা পুকুর ধারের এজমালি বাগানে একটা খুব বড় আমগাছ, সে গাছের আমের নাম টিয়াঠুঁটি, যে-ই নাম দিয়ে থাকুক, তার উপমাজ্ঞান দারুণ।

আমগ্রামে মায়ের মামার বাড়ি পাকা, ওখানকার ভাষায় দালান কোঠা। একতলা কিন্তু অনেকগুলি ঘর, সামনে ও পেছনে দীর্ঘ ও প্রশস্ত বারান্দা, এক একটা বারান্দায় পঁচিশ-তিরিশজন লোক পাত পেড়ে বসে খেতে পারে। পেছন দিকে বড় উঠোন, তার দু'পাশেও কয়েকটা ঘর, পাকা না হলেও বেশ মজবুত, দুটি রান্নাঘর। বাড়িটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর সামনের দিকের আটচালা। আটখানা কাঠের থামের ওপর একটি স্থায়ী ছাউনি, তার নীচে শ পাঁচেক লোক বসতে পারে অনায়াসে। ওঁরা ছিলেন ছোটখাটো জমিদার, ওই আটচালার নীচে প্রজারা

এসে জমায়েত হত মাঝে মাঝে। এক পাশে একটি পূজামণ্ডপ, সেখানে খুব ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হত, এবং লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, সেই উপলক্ষে যাত্রাপালা ও গানবাজনা। স্থায়ী আটচালার জন্য গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতে কোনও অসুবিধে হত না।

আমার মায়ের বড়মামাকে বৃদ্ধ অবস্থাতেই দেখেছি, বয়সের তুলনায় তাঁকে বেশি বৃদ্ধ দেখাত, পাতলা, ছোটখাটো চেহারা, তিনিই পরিবারের প্রধান, জমিদারোচিত ভঙ্গিতে রুপো বাঁধানো ছড়ি নিয়ে হাঁটতেন। প্রায় কোনও খাদ্যই হজম করতে পারতেন না, তবু দুপুরবেলা তাঁর ভাতের থালার পাশে দশ-বারোটি বাটিতে মাছ-মাংস ও বিভিন্ন ব্যঞ্জন সাজিয়ে দিতে হত, তিনি সেগুলির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেন, কোনওটা আঙুল দিয়ে শুধু ছুঁতেন। এটা তাঁর লোভের প্রকাশ নয়, তাঁর জন্য অত কিছু রান্না হত বলেই বাড়ির অন্যরা ভালোমন্দ খেতে পেত। খাদ্যের বদলে তিনি দু'বেলা খেতেন আফিমের গুলি। শুনেছি, একবার তাঁকে সাপে কামড়ায়, এবং সাপটিই মারা যায়, আফিমের এমনই গুণ।

মায়ের মেজোমামা কিন্তু ছিলেন খুবই সুপুরুষ। দীর্ঘকায়, সুগঠিত শরীর, অত্যন্ত ফর্সা, চোখের তারা কালো নয়, এক রকম মণির মতন, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যাট্স আই, বেড়াল-চোখো বললে খারাপ শোনায়। সুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন গাঙ্গুলি নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি, অত্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তি, তখনকার দিনের ডি এসসি, পি আর এস, অনেক বছর ধরে তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্ক বিভাগের প্রধান। তিনি গ্রন্থকারও ছিলেন। জ্যামিতি, অ্যালজ্যাবরা, ট্রিগনোমেট্রির টেক্সট বই রচনা করেছিলেন অনেকগুলি, স্কুল ও কলেজের। সেইসব বই এখন আর পাওয়া যায় না, তবে গাঙ্গুলি-মুখার্জি ট্রিগনোমেট্রির বই বিজ্ঞানের ছাত্ররা অনেকদিন পড়েছে। সে আমলে টেক্সট বই বেশি ছিল না, এইসব বইয়ের লেখকরা বেশ ধনী হতেন। আমার মনে হয়, পারিবারিক জমিদারির আয়ের চেয়েও এক সময় আমাদের এই মেজো দাদুর ব্যক্তিগত আয় অনেক বেশি ছিল। তিনি খরচও করতেন যথেষ্ট এবং বহু বছর পতিগৃহ বঞ্চিতা তাঁর বোনকে এবং আরও অনেককে আশ্রয় দিয়েছেন। সেই অবস্থায় প্রায় সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেও আমার দিদিমার আচার ব্যবহারে কখনও তিক্ততার চিহ্ন ছিল না। তিনি যেমন ছিলেন রন্ধনপটীয়সী, তেমনই বাড়ির সকলের অসুখে বিসুখে সেবা-শুশ্রূষায় দিন-রাত অক্লান্ত। কারও অসুখ হলেই দিদিমাকে তার শয্যার পাশে রাত জেগে বসে থাকতে দেখেছি।

দিদিমার নাম আমি জানতাম না, এই কয়েকদিন আগে মাকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি ছিলেন, কারও বোন, কারও পিসি, কারও মাসি, কারও মা। ভালো নাম মনোরমা, ডাকনাম মণি, তাঁর দাদারা ওই নামে ডাকতেন। তাঁর স্বামী বিরাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বছরে কয়েকবার আসতেন এই পত্নী সন্দর্শনে, বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, স্বল্পভাষী, মার্জিত ব্যবহার, তাঁর গায়ের রং লেডিকেনির মতন, কিন্তু তাঁর এই পক্ষের তিনটি ছেলেমেয়েই বেশ ফর্সা। বড় মেয়ের নাম মীরা, পরের মেয়ের নাম কুসুম, ছোট ছেলেটির নাম যতীন। কিশোরী মীরা শুধু সুন্দরীই নয়, লেখাপড়াও শিখেছিল কিছুটা, এবং নিছক গ্রাম্য মেয়েও বলা যাবে না, অল্প বয়েস থেকেই খানিকটা শহুরে আলো-বাতাসেরও স্বাদ পেয়েছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন বছরের বেশির ভাগ সময় কলকাতাতেই থাকতেন সপরিবারে, তাঁর বোন মণিকেও নিয়ে আসতেন, কারণ, তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না, মণিকেই প্রধানত সংসার সামলাতে হত। মণির ছেলেমেয়েরাও থাকত তাঁর সঙ্গে। সেই সুবাদে মীরা কলকাতার আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়। সুরেন্দ্রমোহনের স্ত্রীর নামটি বেশ গালভারী, ব্রজবাসিনী, ছোট্টখাট্টো চেহারার মহিলা, স্বভাবটি ভারী মধুর, তবে শেষ দিকে হাঁপানি রোগে খুব কাতর হয়ে পড়তেন, শয্যাশায়ী অবস্থাতেও তাঁর মুখের হাসি দেখলে মনে হত, সুহাসিনী নামটি তাঁকে বেশি মানাত।

সুরেন্দ্রমোহন প্রথম দিকে থাকতেন ভাড়াবাড়িতে, পরে দমদম মতিঝিলে বাগান সমেত বিশাল বাড়ি বানিয়েছিলেন। বিভিন্ন ভাড়াবাড়ি থাকার আমলে একবার উত্তর কলকাতার যে বাড়িটিতে থাকতেন, সেই বাড়িরই অপর অংশে বাস করতেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কিশোরী মীরা ওই কবিকে স্বচক্ষে দেখেছে। এই দেখার স্মৃতি বহু বছর পরেও মীরা অনেককে শুনিয়েছে, অর্থাৎ একজন কবির বিশেষ গুরুত্ব ছিল তার কাছে। যথাসময়ে, অর্থাৎ পনেরো বছর বয়েস হতে না হতেই মীরার বিয়ে হয় এক স্কুল শিক্ষকের সঙ্গে।

মাইজপাড়ার দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে অবিনাশচন্দ্রের সন্তানদের নামকরণের কোনও পদ্ধতি ছিল না। বড় ছেলের নাম বিনয়কৃষ্ণ, মধ্যমের নাম কালীপদ, ছোট ছেলে দেবপ্রিয়। বৈমাত্রিক আর দুটি ভাইয়ের নাম হরিপদ ও তারাপদ, এঁদের মধ্যে হরিপদ পুলিশে চাকরি নিয়ে আত্মহত্যা করেছিল, এ ঘটনা ক্ষীণভাবে শুনেছি। অপর ভাই তারাপদ সন্ন্যাসী হয়ে যায়। সেই অজ পাড়াগাঁ থেকে কালীপদ কলেজে পড়তে এসেছিল কলকাতায়। তৎকালীন গ্রামীণ সমাজে অনেক পরিবারেরই অন্তত একটি ছেলেকে, যদি লেখাপড়ায় একটু মাথা থাকত, কষ্টেসৃষ্টেও পাঠানো হত শহরে, যাতে সে দুটো-একটা পাস দিয়ে কোনওক্রমে একটা চাকরি জোগাড় করতে পারে। পথের পাঁচালীর অপুর মতন হাজার হাজার অপু ভরিয়ে রাখত শিয়ালদা অঞ্চলের মেসবাড়িগুলি। নিজস্ব ধানজমি থেকে সংবৎসরের খোরাকি জুটে যেতে পারে, কিন্তু অন্যান্য অভাব মেটাতে চাকরির নগদ টাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

গ্রাম্য টুলো পণ্ডিতের ছেলে শহরে এসে শিক্ষকতা শুরু করলে, তা যথেষ্ট পদোন্নতিই বলতে হবে। মেসবাড়িতে থাকা, দেশের বাড়ি থেকে টাকা আসার কোনও সম্ভাবনা নেই, কালীপদকে অর্থের জন্য অনেক উঞ্ছবৃত্তি করতে হত, তাই বি.এ পড়তে পড়তেই তিনি চাকরির সন্ধান করছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর চাকরি পাওয়া ও বিবাহের মধ্যে হয়তো একটি যোগসূত্র ছিল। অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন বেশ প্রতিপত্তিশালী, অনেক কলেজ ও স্কুল কমিটির সঙ্গে তিনি যুক্ত, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের টাউন স্কুলের তিনি সভাপতি, সেই স্কুলে তিনি কালীপদ নামে যুবকটিকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেন। তাঁর ভাগনিকে বিয়ে করা ওই চাকরির শর্ত ছিল কি না জানি না, তবে এ রকম প্রায়ই হয়তো হত। তখন বিবাহ ব্যাপারে প্রধান বিবেচ্য জাত-পাত, কুলিন ব্রাহ্মণরা বেশি বেশি স্পর্শকাতর। কৌলীন্যের মধ্যেও কত রকম ভাগাভাগি, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, শ্রোত্রীয় (বাঙাল ভাষায় ছুরিত্তির), বৈদিক, ভঙ্গকুলীন ইত্যাদি। বংশে একটি বিয়েও ঠিক-ঠিক স্ববর্ণে না হলে সবাই পতিত হয়ে যেত। উপাধ্যায় যুক্ত পদবীধারী রাঢ়ী ব্রাহ্মণরা নিজেদের মনে করতেন বর্ণশ্রেষ্ঠ। নিজেরাই নিজেদের শ্রেষ্ঠ বানিয়েছিলেন আর কী!

মামাবাড়ির আশ্রিতা না হলে মীরা তার রূপ ও গুণের জন্য যোগ্যতর পাত্র পেতে পারত। কৌলীন্য ছাড়া কালীপদর আর কোনও বংশগৌরব ছিল না, তিনি সুপুরুষও নন, বেঁটেখাটো চেহারা, ভালোমানুষের মতন গোল মুখ, গায়ের রং অবশ্য পরিষ্কার, অল্প বয়েস থেকেই টাক পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পারিবারিকভাবে খুবই গরিব, এবং চাকরি হিসেবে শিক্ষকতা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। অনেক ব্যাঙ্কের বেয়ারার চেয়ে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন কম ছিল, এবং অনেক স্কুলের শিক্ষকরা প্রতি মাসে প্রাপ্য মাইনের পুরোটাও হাতে পেতেন না।

প্রত্যেক মানুষেরই জন্মের পশ্চাতে আছে এক আকস্মিক ও বিচিত্র রসায়ন। মীরার সঙ্গে কালীপদর বদলে যদি ধরা যাক বিষ্ণুপদ নামে অন্য একজনের বিবাহ হত, কিংবা কালীপদর সঙ্গে মীরার বদলে যদি বিবাহ হত মালতি নামে কোনো কুমারীর, তা হলে তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা হত সম্পূর্ণ অন্যরকম। অনেক সময় দেখা যায়, একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর বিয়ের কথাবার্তা প্রায় ঠিকঠাক হয়েও ভেস্তে গেল শেষ মুহূর্তে, বদলে গেল পাত্র-পাত্রী, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ বংশধারাও পরিবর্তিত হয়ে গেল। আমরা সবাই এই আকস্মিকতার

সন্তান। পৃথিবীতে আসাটাই আকস্মিক, তবু সারাজীবন আমরা নানারকম যুক্তি দিয়ে এই জীবনটা সাজাবার চেষ্টা করি।

বিয়ের এক বছরের মধ্যেই গর্ভবতী হওয়ায় মীরাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আমগ্রামে, সেখানেই তাঁর মা ছিলেন তখন। আমগ্রামে শহরের মতন গাড়ি-ঘোড়ার ধুলো নেই, কল-কারখানার ধোঁয়া নেই। বাতাস অতি বিশুদ্ধ। চারদিকে সবুজের সমারোহ, বৃক্ষগুলি ফলবতী, পুকুরগুলি টলটলে জলে ভরা। মীরা ভালো সাঁতার জানে। মামাবাড়িতে প্রচুর শাকসব্জি, মাছ, ঢেঁকি-ছাঁটা চালের ফেনা ভাতে খাঁটি ঘি এবং অন্যান্য নানান সুখাদ্যের অভাব নেই। মাইজপাড়ায় তাঁর শ্বশুরবাড়িতে এসব পাওয়া সম্ভব ছিল না। মামাবাড়িতে বইও অনেক, দুপুরে সমবয়েসি মেয়েদের সঙ্গে অনেকক্ষণ সাঁতার কেটে ও অন্য সময় বই পড়ে তাঁর দিন কাটে, গর্ভের সন্তানটিও বাড়তে থাকে ক্রমশ।

সেই উনিশশো চৌত্রিশ সালে সারা পৃথিবীতে কিংবা সারা দেশে, কিংবা কলকাতা শহরে, এমনকী কাছাকাছি ঢাকাতেও কীসব ঘটনা ঘটছে, তার কোনও রেশই আমগ্রাম বা মাইজপাড়ার মতন গ্রামে পৌঁছয় না। ইংরিজিতে যাকে বলে ব্যাক অফ বিয়ন্ড, এইসব গ্রামগুলির সেই অবস্থা। বিদ্যুৎ কেউ চোখে দেখেনি, গ্রাম থেকে যারা শহরে আসে, তারা সুইচ টিপলে আলো জ্বলে আর কল খুললে জল বেরোয়, এই ব্যাপারগুলি ম্যাজিকের মতন মনে করে, তাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না। ট্রানজিস্টার রেডিয়ো তখনও আবিষ্কৃত হয়েছে কি না জানি না, অন্তত ভারতে পৌঁছয়নি, খবরের কাগজও আসে না। সুতরাং বিহারে যখন সাঙ্ঘাতিক ভূমিকম্প হয়ে গেল, তখনও পূর্ব বাংলার গ্রামগুলি নিস্তরঙ্গ।

স্মরণকালের মধ্যে এমন মারাত্মক ভূমিকম্প হয়নি। মুঙ্গের ও মজফ্‌ফরপুর একেবারে বিধ্বস্ত, আরও অনেক গ্রাম ও ছোট শহর ধ্বংসস্তূপ, সরকারি এবং বেসরকারি হিসেবে প্রাণহানির সংখ্যায় যথারীতি অনেক ফারাক, তবু বহু সহস্র। প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিল দার্জিলিঙ ও নেপালেও, নেপালের রাজ পরিবারের কয়েকজনও নিহত হয়।

গাঁধীজি সারা দেশে ঘুরে ঘুরে হরিজনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে একক, অহিংস যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন বলা যেতে পারে। কেউ তাঁকে মানপত্র দিলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা নিলাম করে দিচ্ছেন প্রকাশ্যে। মহিলাদের বলছেন, গা থেকে গয়না খুলে দাও, মা-বোনেরা। তিনি বরাবরই স্বল্পভোজী, কোথাও তাঁকে খাতির করে মূল্যবান সুখাদ্য পরিবেশন করা হলে তিনি ধমকাচ্ছেন উদ্যোক্তাদের। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন আহার প্রণালী, বাঙালি রান্নার সঙ্গে গুজরাতি রান্নার কোনও মিল নেই, যেমন মিল নেই দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে পঞ্জাবের, এ জাতি একতাবদ্ধ হবে কী করে? এ চিন্তাও পীড়িত করে, তিনি সমস্ত ভারতীয়দের একই রকম খাদ্য অভ্যাস করবার জন্য নিজেই এক প্রকার অন্ন ব্যঞ্জনের পরামর্শ দিলেন, সে রান্নায় কোনওরকম ভাজাভুজি বা তেল-ঘি-মশলার স্থান নেই।

বিহারের ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শনেও ছুটে এলেন গাঁধীজি, দুর্গতদের সাহায্য করার জন্য ডাক দিলেন দেশবাসীকে। কিন্তু তাঁর মাথায় সর্বক্ষণ ঘুরছে হরিজনদের কথা। তিনি মন্তব্য করে বসলেন, বিহারের এই দুর্বিপাক ও অস্পৃশ্যতার মধ্যে সম্পর্ক আছে, এটা ওই পাপের জন্য ভগবানের অভিশাপ! তাতে আবার অনেকের মনে হল, প্রকৃতির তাণ্ডবের সঙ্গে পাপ ও ভগবানকে জড়িয়ে গাঁধীজি প্রশ্রয় দিচ্ছেন কুসংস্কারের। অর্থদান করতে অবশ্য দেশবাসী সে সময় কার্পণ্য করেনি। এর মধ্যে একটি ঘটনা অতিশয় মর্মস্পর্শী। জিন্নাৎউন্নেসা নামে দক্ষিণ কলকাতার এক যুবতীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে মণীন্দ্রনাথ রায় নামে এক ব্যক্তি। তার নামে আদালতে নালিশ করে জিন্নাৎউন্নেসা। এইসব মামলায় উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে দুষ্কৃতকারীরা অনেক সময় ছাড়া পেয়ে যায়। তাই বিচারপতি যুবতীটিকে পরামর্শ দিলেন, আদালতের বাইরে কোনও শর্তে তোমরা মিটিয়ে ফেলতে পারো কি না, আগে চেষ্টা করে

দেখো না! অন্যদের মধ্যস্থতায় জিন্নাৎউন্নেসা লোকটিকে ক্ষমা করতে রাজি হল এক শর্তে, ওই মণীন্দ্রকে চারশো টাকা চাঁদা দিতে হবে ভূমিকম্প ফান্ডে।

চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্বে খানিকটা শূন্যতা এসে গেছে। প্রধান নেতা সুভাষচন্দ্র বসু বেশ অসুস্থ, তিনি চিকিৎসার জন্য রয়েছেন ভিয়েনায়। তিয়াত্তর বছর বয়সেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর জন্য টাকা তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অনলসভাবে। দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদে গিয়ে খানিকটা সফলও হলেন, নিজাম দিলেন এক লক্ষ টাকা, সেখানকার অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরাও বাংলার এই বিদ্যালয়টির জন্য অর্থ দিলেন মুক্তহস্তে।

দেশের পরাধীনতা মোচনের জন্য যারা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী, গাঁধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস যাদের সমর্থন করে না, ব্রিটিশ সরকার যাদের নাম দিয়েছে টেররিস্ট বা সন্ত্রাসবাদী, তাদের তেজ এই সময় একেবারেই হ্রাস পেতে বসেছে, প্রায় সকলেই ধরা পড়ে গেছে, পটাপট ফাঁসি হয়ে যাচ্ছে, কিংবা চালান হয়ে যাচ্ছে আন্দামানে। চট্টগ্রামে সূর্য সেনের ফাঁসি হয়ে গেল।

ভোর থেকেই কলকাতা শহরে লোক চলাচল শুরু হয়। দুধের বালতি হাতে গয়লা ও খবরের কাগজ হাতে হকারদের ছোটাছুটি থেকেই বাড়িগুলির দরজা-জানলা খোলে। পথচারীরা হকারদের থামিয়ে দু' পয়সা দিয়ে একটা কাগজ কেনে। আনন্দবাজার চোদ্দো পাতা, বিলিতি সংবাদপত্রের অনুকরণে প্রথম পৃষ্ঠায় কোনও খবর থাকে না, শুধু চৌকো চৌকো বিজ্ঞাপন। একজন কাগজ কিনলেই আর পাঁচজন পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মারে। সকলেরই আগ্রহ একই বিষয়ে, সবচেয়ে মুখরোচক অংশ এখন ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার সুদীর্ঘ বিবরণ। পূর্ব বাংলার ভাওয়াল জমিদারির মেজকুমার অসুস্থ অবস্থায় মারা যান দার্জিলিঙে, আত্মীয়-পরিজনরা সেখানেই তাঁকে দাহ করে। অনেক বছর পরে এক সন্ন্যাসীবেশী ব্যক্তি দাবি করে যে সে-ই পুনর্জীবিত মেজকুমার। দার্জিলিঙে সেই রাত্রে খুব বৃষ্টি হয়েছিল, শ্মশানযাত্রীরা নাকি তাঁকে দাহ না করেই ফেলে পালিয়েছিল, এক সন্ন্যাসীর কৃপায় অলৌকিকভাবে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। রানি বিভাবতী একেবারেই মানলেন না। তাঁর মতে লোকটি ফেরেববাজ ও জুয়াচোর। ওই লোকটিকে দেখলে বাঙালি বলে মনেও হয় না, বাংলায় সে সঠিকভাবে নাম সই করতে পারে না, তার বাংলা উচ্চারণও অবাঙালিদের মতন। আসলে যে এটা বিষয়-সম্পত্তি ঘটিত কুটিল ষড়যন্ত্র, তা সাধারণ মানুষ বুঝতে চায় না, তারা রোমাঞ্চকর, ধারাবাহিক গল্পটিতেই আগ্রহী, এর মধ্যে কিছুটা যৌনতার গন্ধও আছে।

লেবং খেলার মাঠে গভর্নর অ্যান্ডারসনকে হত্যা-প্রচেষ্টার অভিযোগেও ধরা পড়েছে অনেকগুলি যুবক, তাদের মধ্যে রয়েছে উজ্জ্বলা মজুমদার নামে একটি তরুণী, সেই মামলাও চলছে দীর্ঘকাল ধরে। সংবাদপত্রের অর্ধ পৃষ্ঠা, কখনও পূর্ণ পৃষ্ঠা জুড়ে থাকে সাক্ষীদের জেরার বিবরণ। এরই মধ্যে এসে গেল পাকুড় হত্যা মামলা, তা আরও অত্যাশ্চর্য, বিলিতি রহস্যকাহিনীর মতন রোমহর্ষক, হাওড়া স্টেশনের জনারণ্যে প্লেগের জীবাণু ইঞ্জেকশান দিয়ে একজনকে খুন!

ওদিকে হিটলার দখল করে বসেছে জার্মানি, বিরুদ্ধপক্ষকে একেবারে নির্মূল করে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। শুরু হয়ে গেছে ইহুদি-বিতাড়ন। নাতসিরা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে, তিনি স্বদেশ ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন আমেরিকায়। সেখানে শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘট হচ্ছে মাঝেমাঝেই, অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো নয়। এর মধ্যে এসে পড়ছে দলে দলে শরণার্থী, ইহুদি। তাদের পুনর্বাসনে অর্থ সংগ্রহের জন্য কনসার্টে বেহালা বাজাচ্ছেন আইনস্টাইন, টিকিটের দাম পঁচাত্তর টাকা। বিজ্ঞানী হিসেবে আইনস্টাইন এদেশে তেমন পরিচিত নন, কিন্তু তাঁর বেহালা-বাদন শোনার জন্য অনেকেই আগ্রহী। সব টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। এইসব সংবাদ ছাপা হয় খবরের কাগজের খুব ভেতরের পৃষ্ঠায়, স্বল্প পরিসরে।

সেপ্টেম্বর মাস, মাঝে মাঝেই বৃষ্টি আসে ঝেঁপে ঝেঁপে। আমগ্রামের মতন পল্লীগুলিতে

জীবন বয়ে চলে সাদামাঠাভাবে। সূর্যকেন্দ্রিক জীবন, ভোর হতে না-হতেই সকলের ঘুম ভেঙে যায়, সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর আর বিশেষ কিছু করার থাকে না। কুপি জ্বালালে আলোর চেয়ে ধোঁওয়া ছড়ায় বেশি, হারিকেনের শিখা একটু বাড়াতে গেলেই চিমনি ফেটে যায়। কাছাকাছি বাঁশঝাড়ে তুমুল শেয়ালের ডাক, অন্ধকারে বাড়ির বাইরেই কারও যেতে সাহস হয় না, সাপের উপদ্রব তো আছেই, সন্ধের পর সাপ কথাটা উচ্চারণ করতে নেই, শুনলেই তারা এসে পড়ে, তাই বলতে হয়, লতা, লতা, লতা।

ঋতু পরিবর্তন এখানে স্পষ্ট বোঝা যায়, মেঘের রং একটু একটু সাদা হতে শুরু করেছে, মাঝে মাঝে ঝিলিক দেয় নীলিমা। শিউলি গাছগুলিতে প্রচুর ফুল এসেছে, প্রত্যুষে গাছতলায় শিউলি ঝরে থাকে আলপনার মতন। জলা জায়গাগুলিতে হঠাৎ যেন জাদুবলে ফুটেছে অজস্র কাশফুল। মাঠগুলি আউস ধানে ভরা, কোথাও কোথাও বন্যা হয়েছে, তবে এবারে তেমন প্রবল নয়।

সম্পন্ন হিন্দু পরিবারগুলিতে শুরু হয়ে গেছে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি। নৌকোয় চেপে কুমোররা আসে, বাড়িতেই হয় প্রতিমা-নির্মাণ, প্রথমে কঞ্চির কাঠামোর ওপরে খড়ের খসড়া, তারপর এক মেটে, দো মেটে ইত্যাদি। গ্রামের অনেক বাড়িরই কিছু কিছু মানুষ থাকে কলকাতায়, পূজা-অবকাশে তারা ফিরে আসবে, সঙ্গে আনবে অনেক জিনিসপত্র, তাতে শহুরে গন্ধ। নতুন শাড়ি-ধুতি, নতুন ডিজাইনের জামা, বিধবাদের জন্যও নতুন থান। লজেন্স ও চকোলেটের সঙ্গে ছোট ও বড় এলাচ নামের অপূর্ব দুর্লভ বস্তু।

সাত তারিখ সকালে ষোড়শী মীরার প্রসববেদনা শুরু হল।

তখন ভারতের জনসংখ্যা ঠিক কত? বঙ্কিমচন্দ্র বন্দে মাতরম গানে বাংলায় সপ্ত কোটি কণ্ঠের কলকল নিনাদের কথা লিখেছেন। তখন জনসংখ্যা ও টাকা-পয়সার হিসেবে এক কোটি খুবই বেশি অঙ্ক, এক কোটি জনসংখ্যা বাড়তে বেশ কয়েক বছর সময় লাগত। পরবর্তীকালের একটি গান ছিল এই রকম : 'তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ, হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন, ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন, ঐ দেখ প্রভাত উদয়...'। সেই সাত তারিখ প্রভাতে আমগ্রামে ভারতের জনসংখ্যা আর একটি বৃদ্ধি পেল। মীরা ও কালীপদর প্রথম সন্তান।

জন্মালেই যে জীবিত থাকবে, তার কোনও স্থিরতা নেই। শিশুমৃত্যুর হার তখন খুবই বেশি। গণ্ডগ্রামে ডাক্তার-বদ্যি ডাকার তেমন সুবিধে নেই, পুরুষ ডাক্তার থাকলেও সন্তানসম্ভবা রমণীদের তাঁরা কোনও সাহায্যই করতে পারে না, সে দায়িত্ব নেয় ধাত্রী বা ধাই, তারা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শেখে না, বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতাই সম্বল। শিশুদের মধ্যে রোগ সংক্রমণ ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার।

উঠোনে তৈরি হত অস্থায়ী আঁতুরঘর। প্রসূতি ও দাই ছাড়া সেখানে আর কারও প্রবেশ নিষেধ, নবজাতককে স্পর্শ করার আর কারও অধিকারও নেই। নিতান্তই দিদিমা শ্রেণীর কেউ দাইয়ের অনুপস্থিতির সময়টুকু সেবার ভার নিলে তিনি আসতেন স্নান করে, ধৌত বস্ত্রে শুদ্ধ হয়ে। এ সবই ছিল অভিজ্ঞতালব্ধ, গ্রাম্য স্বাস্থ্যবিধি। আঁতুরঘরটির চ্যাঁচার বেড়া, বৃষ্টির সময় ছাঁট আসে, তলা দিয়ে পোকা-মাকড়, এমনকী সাপও ঢুকে পড়তে পারে। আঁতুরঘরের দিনগুলিতে একটি শিশুর বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য ঘটনা। মীরার সন্তানটি এমনই জেদী, ঠিক বেঁচে গেল।

আমার ধাইয়ের নাম ছিল বোঁচার মা। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা, পুরুষালি চেহারা। এ বাড়ির পাশের একটি মস্ত জলাশয়ের ওপারে থাকতেন, আসতেন একাই নৌকা চালিয়ে। ছেলের নাম বোঁচা, তাঁর নিজের নাকটিও খুব বোঁচা ছিল। চক্ষু উন্মীলনের পর সেই রমণীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার নাকটিও বোঁচা হয়ে যায়। আমার মায়ের অমন সুন্দর টিকোলো নাক, কে বলবে আমি তাঁর সন্তান।

দুই

আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে এগোতে থাকি, আবার ভুলতে ভুলতে যাই। যেন গাছের পাতা ঝরা ও নতুন পাতা। উপমাটা অবশ্য সঠিক নয়, কারণ আমরা সব পুরনো পাতা ঝরিয়ে দিই না। কোনওটা রাখি, কোনওটা ফেলি, তার কোনও রীতি-পদ্ধতি আছে কি? স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলি বড় রহস্যময়। শ্যামপুকুর স্ট্রিটের মোড়ে বসা একজন মুচির মুখ আমার স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু আমার এক পিসেমশাইয়ের মুখ আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারি না। 'রূপে তোমায় ভুলাবো না' গানটি জীবনে প্রথমবার শোনার ক্ষণটি স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হয়ে আছে, যদিও সে গানের মর্ম বোঝার বয়েস আমার হয়নি তখনও, তবু। অথচ কত প্রিয় গান হারিয়ে গেছে জীবন থেকে।

মানুষের মস্তিষ্কে দশ বিলিয়ান কোষ আছে, তার অর্ধেকও পূর্ণ হয় না এক জীবনে। এত ঘর খালি থাকতেও অন্যান্য ঘরের অনেক বাসিন্দাদের কেন আমরা বিদায় করে দিই? আসলে কিছুই নাকি হারায় না, স্মৃতিরও নানান স্তর আছে, সব কিছুই আমাদের মনে থাকে, কিন্তু মনে পড়ে না। বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর আড়াই বছর বয়সের স্মৃতির কথাও লিখেছেন। বিট জেনারেশানের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক জ্যাক কেরুয়াক আমাকে বলেছিলেন, এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থানের স্মৃতিও ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। সত্য-মিথ্যা জানি না।

আমার বাল্যস্মৃতি বড়ই এলোমেলো। সাল-তারিখের ঠিক-ঠিকানা নেই। কখনও দেখতে পাই একটি ইজের পরা বালক শহরের গলিতে ছুটছে কোনও ভোঁ-কাট্টা ঘুড়ি ধরার জন্য, কখনও দেখি, পুকুরের জলে দাপাদাপি করছে একটি ন্যাংটো শিশু। এখন গ্রামের ছেলেরাও হাফ প্যান্ট পরে, আমাদের ছেলেবেলায় গরিব বাড়ির ছেলেরা পরত ইজের, সেটা হাঁটু পর্যন্ত হাফ-পাজামার মতন, রঙিন। ইজের শব্দটি এসেছে আরবি ইজারা থেকে। আগরতলায় ইজেরের খুব সুনাম ছিল। ইজেরের মতন একটা সামান্য বস্তু কেন আগরতলাতেই সার্থকতা পাবে, তা কে জানে! যেমন শুনতাম, বাঁদিপোতার গামছা খুব টেঁকসই হয়। বাঁদিপোতা জায়গাটা কোথায়, আজও জানি না।

এক হিসেবে আমি সৌভাগ্যবান, আমার বাল্য-কৈশোরকাল শহর ও গ্রাম, দু' জায়গাতেই কেটেছে। একেবারে খাস বাঙাল বাড়ির ছেলে হয়েও আমি পাঠশালার বয়েস থেকেই কলকাতার ঘটি-ভাষা বলতে পারি, আবার গ্রামে গিয়েই সহ-খেলুড়েদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি চোস্ত্ বাঙাল ভাষায়। ট্রেন থেকে শিয়ালদা স্টেশনে নেমেই খেয়েচি-বলেচি, আর ওদিকে স্টিমার থেকে নেমে খাইসি-বলসি! কলকাতার শান বাঁধানো পথে আছাড় খেয়ে আমার মাথা ফেটেছে, আবার গ্রামের আদিগন্ত পাটখেতের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে আমি চলে গেছি সূর্যাস্তের দিকে।

উত্তর কলকাতায় টাউন স্কুলে বাবার চাকরি, সেই স্কুলের এক-দেড় মাইল পরিধির মধ্যে বিভিন্ন ভাড়াবাড়িতে আমরা থেকেছি। মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট, রামধন মিত্র লেন, তেলিপাড়া লেন, দুর্গাদাস মুখার্জি স্ট্রিট, বৃন্দাবন পাল লেন, এইসব রাস্তায় বারবার কেন বাড়ি বদল করতে হয়েছে, তা ঠিক জানি না। দেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত কলকাতায় ভাড়াটেদের বেশ খাতির ছিল, অনেক খালি বাড়িতে ঝুলত 'টু লেট' লেখা বোর্ড, খুব সম্ভবত আমাদের ভাই-বোনের সংখ্যা যত বেড়েছে, ততই বাবাকে আরও সস্তার ফ্ল্যাট খুঁজতে হয়েছে, সবই একতলায়। উত্তর কলকাতার পল্লীগুলি ঘিঞ্জি, অধিকাংশ বাড়িই গায়ে গায়ে লাগা, একতলার ঘরগুলিতে আলোবাতাস খেলে

না, কোনও বাড়িতেই নিজস্ব কোনও বারান্দা ছিল না আমাদের। অবশ্য ছাদ ব্যবহার করা যেত, সেই ছাদে উঠে দেখতে হত আকাশ। গরমকালে ছাদেই শুতাম মাদুর পেতে, চিত হয়ে ঘুম আসবার ঠিক আগের মুহূর্তে হারিয়ে যেতাম গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জে।

কলকাতায় জুতো পরা, গ্রামে খালি পা। বাটা কোম্পানির নটিবয় শু, সামনের দিকটা ভোঁতা মতন, দেয়ালে লাথি মারলেও ছেঁড়ে না। গ্রামে গিয়ে আমি জুতো লুকিয়ে রাখতাম। সেখানকার বয়স্করাও শুধু কোনও নেমন্তন্ন বাড়িতে যাবার সময় জুতো পরে। সবই তো কাঁচা রাস্তা, বছরের আট মাসই জলকাদা। সেই জন্যই ঢাকার কুট্টিদের চালু রসিকতা ছিল, জুতোর দোকানে খদ্দের গেলে তাকে জিজ্ঞেস করা হত, বাবুর বগলের মাপ কী! গ্রামে ছুটোছুটি করার সময় কখনও কাঁটা ফুটেছে বা শামুকের ভাঙা খোলে পা কেটেছে ঠিকই, তবু আমার ধারণা, খালি পায়ে হাঁটলে অনেক দিন চোখ ভাল থাকে। গ্রামে চশমা একটা বিলাসিতা। অথচ শহরে আমার সঙ্গী অনেক স্কুল-পড়ুয়ার চোখে চশমা দেখেছি। আমার চোখ বরাবরই ভালো, বেশি ভালো, অনেক দূর থেকে বাসের নম্বর বলে দিতে পারি, তাই বন্ধুরা বারবার বিস্ময় প্রকাশ করেছে। প্রায় সিকি মাইল দূরের কোনও সাইনবোর্ড পড়ে দেবার পরীক্ষাও নিয়েছে, আমি বলে দিয়েছি গড় গড় করে, তারা কাছে গিয়ে মিলিয়ে দেখেছে।

শহর ও গ্রামের তফাতের প্রসঙ্গে মনে পড়ে চিল ও শকুনের কথা। কলকাতা শহর চিল-প্রধান। এক সময় কলকাতা হাড়গিলে নামে শকুন জাতীয় বড় বড় পাখিতে ভর্তি ছিল। আমরা হাড়গিলে দেখিনি, তারা নিঃশেষ হয়ে গেছে। শকুন দেখা যায় মফস্বলে ও গ্রামে। শকুনের বিশ্রী ও ভয়াবহ চেহারা হলেও তারা নিরীহ ও অলস, শিকার করতে জানে না, মৃত প্রাণীই তাদের আহার্য, সুতরাং শকুনকে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু চিলের উপদ্রবে যে কতবার চোখের জল ফেলেছি, তার ঠিক নেই। আমাদের খুব প্রিয় খাদ্য ছিল রাধাবল্লভী। যেমন বাহারি নাম, তেমনই অপূর্ব স্বাদ, কচুরি বা লুচির দ্বিগুণ আকারের, বেশ দামি, চার পয়সায় দু'টো, অবশ্য সঙ্গে আলুর তরকারি কিংবা হালুয়া ফ্রি। দোকান থেকে শালপাতার ঠোঙায় দিত, কোথা থেকে যমদূতের মতন এসে ছোঁ মারত চিলে। অধিকাংশ সময়ই তারা নিতে পারত না, ঠোঙাটা হাত থেকে ছিটকে যেত, রাধাবল্লভীতে লাগত রাস্তার ধুলো। যেন ফেলে দেওয়াতেই চিলগুলোর আনন্দ। আমি রাগে-অভিমানে ফুঁসছি, রাধাবল্লভী কুড়িয়ে নিয়ে যেত ফুটপাথের কাঙালি ছেলেরা। ওরা ধুলো মাখা খাবার খেয়েও দিব্যি বেঁচে থাকে।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে, একবার কাশীতে গিয়ে টানা মাসকয়েক ছিলাম। একদিন ছাদে দাঁড়িয়ে একটা কলা খাচ্ছি, হঠাৎ যেন কিষ্কিন্ধা থেকে এক লাফে একটা গোদা বাঁদর এসে পড়ল আমার ঘাড়ে। কলাটা তো কেড়ে নিলই, সপাটে এক থাপ্পড় কষাল আমার গালে। থাপ্পড়টা কেন মেরেছিল, আজও বুঝি না। বাঁদড়ের থাপ্পড় কি কখনও ভোলা যায়?

'ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে!' মাইজপাড়া গ্রামে মাছ ধরা শিখেছিলাম, বেশ নেশাই ধরে গিয়েছিল। পুকুর-খাল-বিলের তো অভাব নেই, মাছও প্রচুর। প্রত্যেক পল্লীতেই একটি পুকুর বিশেষ যত্নে পরিচ্ছন্ন রাখা হত। সেটার নাম মিষ্টি পুকুর। তাতে গোরু-মোষ নামবে না, সেই পুকুরের জলই একমাত্র পানীয়। টিউবওয়েল কেউ দেখেনি, জল ফুটিয়ে খাবার কথাও কেউ জানে না। ওই মিষ্টি পুকুরটায় প্রচুর পুঁটি মাছ ও ছোট ছোট ট্যাংরা, ছিপ ফেললেই চটাস চটাস করে মাছ ওঠে, কারও কারও মাছ ধরার হাত বেশ ভালো হয়, কেউ শত চেষ্টাতেও ঠিক পারে না। পাশাপাশি দু'জন ছিপ ফেলেছে, একজন পটাপট মাছ তুলছে, আর একজন চেয়ে থাকছে হতাশভাবে। আমার হাত মন্দ ছিল না, অন্য একটা পুকুরে একবার একটা বেশ বড় কালবোস মাছ ধরে যেন লটারিতে প্রথম পুরস্কার জেতার আনন্দ পেয়েছিলাম। রুই ও কাতলার মাঝামাঝি এই প্রজাতির মাছ খুব সুলভ নয়, স্বাদ অপূর্ব। আমার ছিপ কোনও দিন কোলাব্যাঙে নেয়নি, মাছও নেয়নি চিলে। তবে, একবার খুব নাকানিচোবানি খেয়েছিলাম

বটে। বঁড়শিতে মাছ গেঁথেছে, ফাতনা ডুবে গেছে, মেরেছি জোরে টান, অথচ কিছুই ওঠে না। ছিপ বেঁকে গেছে, কিন্তু কুলোচ্ছে না আমার গায়ের জোরে। খুব বড় মাছ হতে পারে না, তা হলে তো সুতো ছিঁড়ে যেত। তবে, এটা কোন্ রহস্যময় প্রাণী? টানের চোটে আমি হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলাম জলে, তবু কিন্তু ছিপ ছাড়ছি না। আশপাশ থেকে দু'তিন জন ছুটে এসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সম্মিলিত শক্তিতে টেনে তোলার পর দেখা গেল, সেটা একটা বান মাছ। বান মাছ সরু আর অনেকটা লম্বা হয় বলে, জলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে স্ক্রু-র মতন হয়ে যায়, তাই টেনে তোলা অত শক্ত।

মাছ ধরে বাড়ি ফেরার পর খুব ভাল করে হাত-পা ধোওয়া নিয়ম। যে ছেলে ওই নিয়ম মানে না, সে নির্ঘাত সে-রাতে বিছানায় হিসি করবে। ঠিকই তাই, এই বালকটিও যে-কয়েকবার ওই নিয়মে ফাঁকি দিয়েছে, সেই সেই রাতে সে বিছানা ভিজিয়েছে।

মাছ ধরার পাট চুকিয়ে দিতে হয় বিকেল থাকতে থাকতে। সন্ধে হয়ে গেলেই বিপদ। সন্ধের পর পেত্নীতে মাছ কেড়ে নিতে পারে। অনেক লোক অন্ধকারে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে মাছের খালুই হাতে আসতে আসতে শুনতে পেয়েছে পেত্নীর গলা, মাঁছ দেঁ, মাঁছ দেঁ। তখন তারা খালুই ফেলে ছুটে পালায়। বাঁশঝাড় পেত্নীদের খুব প্রিয় জায়গা। দিনের বেলাতেও বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে যেতে হলে দৌড় লাগাতাম আমরা। আমাদের গ্রামে প্রচুর সাপ, শেয়াল, ভূত, পেত্নী, ব্রহ্মদৈত্য ছিল। আমাদের বাড়ির ঠিক পাশের দিকে আর একটা বাড়ি ছিল, বহুদিন পরিত্যক্ত, দরজা-জানলা ভাঙা, আমাদের দূর সম্পর্কের কোনও জ্যাঠামশাইয়ের। তার নাম জানি না। কেউ কেউ বলত, 'মরা গোরু কি ঘাস খায় জ্যাঠামশাই'! তিনি প্রবাসে চাকরি করতে গিয়েছিলেন, হিল্লি-দিল্লিতে কোথাও, সেখান থেকে প্রচুর আধুনিক ও উদ্ভট চিন্তা নিয়ে ফিরে আসেন। তিনি নিজের বাবার শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানে অস্বীকার করেছিলেন, যুক্তি হিসেবে বলেছিলেন, মৃত আত্মাকে খাবার-দাবার দেওয়া হবে কেন, মরা গোরু কি ঘাস খায়? সবাই তা নিয়ে খুব হাসাহাসি করত, নিজের বাবার সঙ্গে গোরুর তুলনা! যাই হোক, তিনিও অনেকদিন আগে দেহরক্ষা করেছেন, ও বংশে আর কেউ নেই। লোকে ধরে নিয়েছে, তিনি নাস্তিক ছিলেন, নাস্তিকের আত্মা পরলোকে ঠাঁই পায় না। সুতরাং তিনি অবশ্যই ব্রহ্মদৈত্য হয়েছেন। ওই ফাঁকা বাড়িটার একটা তালগাছের গোড়ায় এক এক দিন গভীর রাত্রে কীসের যেন একটা বিকট আওয়াজ উঠত। সেটা কি ব্রহ্মদৈত্যের হুংকার? তাতে আমাদের অবশ্য ভয়ের কোনও কারণ ছিল না, আমরা তো আত্মীয়, আমাদের কোনও ক্ষতি করবেন না তিনি। বরং এ কথাও বলা যায় যে, পাশেই ওই ব্রহ্মদৈত্যের পাহারা ছিল বলে আমাদের বাড়িতে কখনও অন্য কোনও ভূত-পেত্নীর উপদ্রব হয়নি।

আমাকে নিয়ে একবার বাড়ির লোকরা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। সন্ধেবেলা বাড়ির ঠিক সামনেই দেখি একটা বেশ লম্বা সাপ। তখন আমার ছ' সাত বছর বয়েস, অবোধের মতন ভয়-ডর ঠিক জন্মায়নি, কাছেই বেড়ার গায়ে গোঁজা ছিল একটা কাটারি (ওখানে বলে দা কিংবা দাও, হিন্দির মতন), সেটা নিয়েই দিলাম এক কোপ। তাতে সাপটার লেজের দিকে খানিকটা অংশ কেটে গেল, বাকি অংশটা পালাল কিলবিলিয়ে। ঘটনাটা শুনে বাড়ির সকলের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। সাপ অতিশয় প্রতিহিংসাপরায়ণ, ওই কাটা সাপটা কখনও না কখনও ফিরে এসে কামড়াবেই আমাকে। (এখন অবশ্য জানি, সাপ খুবই বোকা প্রাণী, তার স্মৃতিশক্তি বলে কিছু নেই।) কয়েকটা দিন আমাকে রাখা হল অতি সাবধানে, তারপর চালান করে দেওয়া হল কলকাতায়।

ভূতপেত্নী কিন্তু শুধু গ্রামেরই একচেটিয়া নয়। তখন কলকাতাতেও অনেক পরিত্যক্ত বাড়ি, হানাবাড়ি, ভূতের বাড়ি ছিল। প্রতি পল্লীতেই একটি, দুটি। কোনও কোনও দুঃসাহসিক ব্যক্তি সে রকম ভূতুড়ে বাড়িতে রাত কাটাতে গিয়ে ফিরে আসতেন নাকাল হয়ে। আমাদের এক

মাস্টারমশাই একবার সে-রকম অভিযানে গিয়েছিলেন, ভূতের দেখা তিনি পেয়েছিলেন, গলা মটকে দেয়নি বটে, কিন্তু সারা গায়ে আঁচড়ে দিয়েছিল। অনেকদিন স্নান না করলে সারা গায়ে খড়ি ওঠে, চুলকোলে সাদা দাগ হয়, সেই দাগ তিনি দেখিয়েছিলেন সবাইকে। ভূতে তাঁর গা চুলকোতে গেল কেন কে জানে!

এ রকম আরও অনেক গল্প শুনেছি, যা সত্য ঘটনা হিসেবেই চালু ছিল। অনেকদিন পর্যন্ত আমার খুব শখ ছিল অন্তত একটা ভূত দেখার, সে শখ মেটেনি। দেশ বিভাগের পর উদ্বাস্তুদের প্রবল জনস্রোত এসে কলকাতা শহরের সব ভূত তাড়িয়ে দেয়। কোনও বাড়িই আর ফাঁকা থাকেনি। পোড়োবাড়িগুলোর রাতারাতি রূপ বদলেছে।

গ্রামে যেমন সাঁতার ও মাছ ধরা, কলকাতায় তেমনই ঘুড়ি ওড়ানোর নেশা। রাস্তা দিয়ে চলার সময়ও চোখ আকাশের দিকে, ঘুড়ির প্যাঁচ খেলা চলছে, দেখতে তো হবেই, তা দেখতে গিয়ে কতবার গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যাওয়া। তারপর কাটা ঘুড়ি ধরার জন্য দৌড়োনো। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে আরও কিছু বালক, তাদের মধ্যে যে বেশি লম্বা সেই ঘুড়িটি পায়, কেউ কেউ আঁকশি নিয়েও আসে। আমি ঘুড়ির পেছনে বহুবার দৌড়েছি, কখনও পাইনি। ঘুড়ি ওড়াবার জন্যও কিছুদিন শিক্ষানবিশি করতে হয়, হতে হয় দাদাশ্রেণীর কারও খিদমদগার। ধরাই দেওয়া, লাটাই গোটানো, ছেঁড়া ঘুড়িতে তাপ্পি মারা। এ সব শিখলে নিজের হাতে উড়ান ঘুড়ির সুতো ধরবার অধিকার। ঘুড়ির বিভিন্ন সাইজ, আধ-তে, এক-তে, দেড়-তে, দো-তে। এই 'তে' কোন শব্দের ভগ্নাংশ তা কখনও খেয়াল করিনি। বাচ্চাদের পক্ষে আধ-তে ঘুড়িই উপযুক্ত, বড় ঘুড়ির টান বেশি। শুধু বর্ষার কয়েক মাস বাদ দিলে সারা বছরই বিকেলের আকাশ জুড়ে থাকত নানা বর্ণ ও আকারের ঘুড়ি, 'রঙের কোলাহল'ও বলা যেতে পারে। উত্তর কলকাতার আকাশ, দক্ষিণ কলকাতার কথা তখন কিছুই জানি না।

গ্রে স্ট্রিট-দুর্গাদাস মুখার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে যখন থাকতাম, কাছেই ছিল রায়বাড়ি। পুরনো বনেদি বাড়িগুলির অন্যতম, মস্ত বড় লোহার গেট, ভেতরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে কয়েকটি ওয়েলার ঘোড়া, সে বাড়ির কর্তা-গিন্নিরা জুড়ি গাড়িতে বেরোতেন। গত শতাব্দীর বাবু-কালচারের কিছু কিছু রেশ এই শতাব্দীতেও বেশ কয়েক দশক রয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন বাড়িতে পায়রা পোষা ও পায়রা ওড়ানো ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। মোটর গাড়ির চেয়ে জুড়ি গাড়িটির কদর ছিল বেশি, সাধারণ লোকেও ট্যাক্সির বদলে ভাড়া ঘোড়ার গাড়িই ব্যবহার করত সবসময়। পূর্ববঙ্গ থেকে ট্রেনে শিয়ালদা স্টেশনে গেলে আমরা ঘোড়াগাড়ি ভাড়া করেই বাড়ি পৌঁছোতাম। ট্যাক্সি চাপার অধিকার হয় অনেক পরে। রাস্তার ধারে ধারে ঘোড়াকে জল পান করাবার জন্য লম্বা লম্বা লোহার চৌবাচ্চা থাকত। প্রাসাদতুল্য বাড়িগুলির তখনও ঝুরঝুরে অবস্থা হয়নি, অনেক বাড়ির সঙ্গেই সুসজ্জিত বাগান, তাতে ফোয়ারা এবং নগ্ন পরির মর্মর মূর্তি। ঘুড়ি ওড়ানোটাও ছিল বিলাসিতার পর্যায়ে, তবে দরিদ্ররাও এতে অংশ নিতে পারত। বাগবাজারের বোসদের বাড়ির সামনের বিরাট মাঠে হত ঘুড়ি-উৎসব, ময়দানেও হত ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা। পাড়ায় পাড়ায় ঘুড়ির দোকান, ফড়েপুকুরের নাজির সাহেবের দোকান ছিল বিখ্যাত, সেখানে কত রকমের বাহারি ঘুড়ি, নাজির সাহেবের মাঞ্জাও ছিল অকাট্য। আমি সে দোকানের সামনে দিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে অনেকবার ঘোরাফেরা করেছি, কখনও কিছু কিনতে পারিনি।

প্রাগুক্ত রায়বাড়ির ঘুড়ি ওড়ানোর খুবই বিশেষত্ব ছিল। এ ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন সে পাড়ার দারুণ প্রতাপশালী রাজা। অন্যরা এক এক দিন এক এক রকম ঘুড়ি ওড়ায়, কিন্তু রায়বাড়ির সব ঘুড়িই সারা বছরই এক, বিশেষ অর্ডার দিয়ে তৈরি করানো বোঝাই যায়। দেড়-তে কালো চাঁদিয়াল। প্রথমে তাদের ঘুড়ি অনেক ওপরে উঠে যায়, তারপর বাজপাখির মতন শোঁ শোঁ করে নেমে আসে, এক একটা ঘুড়ির ওপর পড়ে আর কচাৎ কচাৎ করে কেটে দেয়। আকাশে কালো চাঁদিয়াল দেখলেই আমরা চুনো-পুঁটি ঘুড়ি ভয়ে ভয়ে নামিয়ে নিই। যারা স্পর্ধাভরে তখনও

ওড়ায় কালো চাঁদিয়াল তাদের নির্মূল করে দেয়। রায়বাড়ির ছেলেরা সব ফর্সা ফর্সা, সুগঠিত চেহারা, গলায় সোনার মবচেন পরে, এক একটা ঘুড়ি কেটে তারা বিজয়গর্বে সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, ভোম্মারা! অনেক পয়সাকড়ি আছে বলে তাদের হুংকারও বেশ জোরালো।

সন্ধের আগে রাজ্য জয় করার মতন কালো চাঁদিয়াল আকাশে একাধিপত্য করে। তারপর একটি বিচিত্র ব্যাপার হয়। অন্য কেউ কাটতে না পারলেও রায়বাড়ির ছেলেরা সেই বিজয়ী কালো চাঁদিয়ালকে আর ফেরত নেয় না। অনেক ওপরে তুলে সুতো ছিঁড়ে দেয়। সেটা ভাসতে ভাসতে চলে যায় নিরুদ্দেশে। ওই দৃশ্যটাই আমাকে উদ্দীপিত করত সবচেয়ে বেশি, শুরু হত কল্পনার খেলা। ওই ঘুড়ি কোথায় যায়? আমি কোনওদিন কালো চাঁদিয়াল ধরতে পারিনি, কিন্তু অনেক দূরে কোনও বাড়ির ছাদে আমারই মতন কেউ দাঁড়িয়ে আছে, সে ধরে ফেলবে ওই ঘুড়ির সুতো, কেমন হাস্যোজ্জ্বল হবে তার মুখ! কালো চাঁদিয়াল ছাড়াও কোনও কোনও প্রাক সন্ধ্যায় আবছা আকাশে প্রায় মেঘ ছুঁয়ে কোনও ঘুড়িকে দুলতে দুলতে উড়ে যেতে দেখেছি, সেদিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটা রহস্যের শিরশিরানি অনুভব করতাম শরীরে। ওরা আমায় অ-দেখা জগতের একটুখানি ইঙ্গিত দিয়ে যেত।

ঘুড়ি ওড়াবার অত শখ থাকলেও সামর্থ্য ছিল খুবই কম। একটা ঘুড়ি কেটে গেলে আর একটা কেনার পয়সা পাব কোথায়? অনেক বিকেলেই ঘুড়িবিহীন হয়ে শুধু ঘাড় ব্যথা করে দেখতাম অন্যদের প্যাঁচ খেলা। আমাদের ছাদটা নিচু, সেখান থেকে কাটা ঘুড়ি ধরার সম্ভাবনা খুবই কম। পয়সার বড় টানাটানি। আমার দরিদ্র স্কুল শিক্ষক বাবা প্রাণপণে, অতি পরিশ্রমে আমাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতেন ঠিকই, কিন্তু অতিরিক্ত কিছু ব্যয় করার প্রশ্নই ছিল না। মাঝে মাঝে মায়ের কাছে খুব কাকুতি-মিনতি করে দু'-চার পয়সা আদায় করতাম। তখন লোকে কথায় কথায় বলত, কলকাতা শহরের পথে পথে পয়সা ছড়ানো থাকে। এটা আংশিকভাবে আক্ষরিক সত্য ছিল। ধনী পরিবারের কেউ মারা গেলে তার শবযাত্রায় যেমন একদল লোক পিছনে পিছনে হরি বোল ধ্বনি দিত, তেমনই সেই দলের একজন ধামা থেকে মুঠো মুঠো খই ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেত, তার মধ্যে খুচরো পয়সা। যত বেশি বড়লোক, তত পয়সাও বেশি। সেই পয়সা কুড়োবার জন্য হন্যে হয়ে পড়ত একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে। ফুটপাথের যারা স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের বলে কাঙালি, বস্তির বাচ্চারা তাদের চেয়ে একটু উঁচুতে, এই দু'দলেরই অধিকার ছিল পয়সা কুড়োবার। আমরা তো ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে, আমাদের ওসব করতে নেই। লোভ যে হত না তা নয়, রাস্তা দিয়ে সে রকম কোনও শবযাত্রার মিছিল যাচ্ছে, গড়ানো পয়সাগুলোর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে থেকেছি, অন্য ছেলেরা এসে টপাটপ কুড়িয়ে নিয়েছে। কোনও কাঙালি ছেলের হাতে এক মুঠো পয়সা দেখে কী যে ঈর্ষা হত! কিন্তু জ্ঞান-উন্মেষের পর থেকেই জানতাম, কাঙালি বা বস্তির ছেলেদের চেয়ে আমরা আলাদা, আমাদের দু'বেলা খাওয়া জুটুক বা না-জুটুক, পরিষ্কার জামা পরে রাস্তায় বেরোতে হবে। কাঙালিদের মতন শবযাত্রায় পয়সা কুড়োলে, চেনাশুনো কেউ দেখলে বাড়িতে বলে দেবেই, তারপর গুরুজনদের কেউ মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেবে। বাঙাল পরিবারগুলিতে ছেলেমেয়েদের মারধর করার বেশ প্রচলন ছিল। পরিবারের যিনি অধিপতি, তিনি বাইরে যতই অসহায় বা ক্ষুদ্র জীবিকাশ্রয়ী হোন না কেন, বাড়ির মধ্যে খুদে হিটলার।

একদিন গ্রে স্ট্রিট ও হরি ঘোষ স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, খুব বড় একটা শব-মিছিল যাচ্ছে, মস্ত বড় পালঙ্কে শায়িত মৃতদেহটি ফুলে ফুলে ঢাকা, অনুগামী অনেকেই বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা, মৃত ব্যক্তিটি কেউকেটা ছিলেন বোঝা যায়, আতরের গন্ধ ভুর ভুর করছে, শুভ্র বসন পরা এক ব্রাহ্মণ ছড়াচ্ছেন খই ও পয়সা, যথারীতি কাঙালি ও বস্তির ছেলেরা হুড়োহুড়ি করে কুড়োচ্ছে পয়সা। শব-মিছিলটি চলে গেল রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে, হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, রাস্তার পাশের ময়লা জলে চকচক করছে সাদা মতন কী যেন... একটা সিকি? কাঙালিরা ওটা দেখতে পায়নি।

গা ঝিমঝিম করে উঠল। এ রকম একটা সিকি দেখে উপেক্ষা করে চলে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব? এক সিকিতে অন্তত আটখানা ঘুড়ি, ষোলো খানা বেগুনি, চার খানা আইসক্রিম, অন্তত পাঁচটা বুড়ির মাথার পাকা চুল, পাঁচটা খাতা, আরও কত কী। এদিক ওদিক তাকিয়ে টপ করে তুলে নিলাম সিকিটা।

যত দূর মনে পড়ে, আমার জীবনে সেটাই প্রথম স্বাধীন উপার্জন।

শবযাত্রায় খই ও পয়সা ছড়ানোর তাৎপর্য কী ছিল আমি ঠিক জানি না। এই প্রথাটি এখন প্রায় উঠেই গেছে, সেটা ঠিক হয়নি। এখনও তো কাঙালি ও বস্তির ছেলেরা একই রকম রয়েছে। ভদ্রলোক সাজা হতদরিদ্রদের সংখ্যাও কিছু কম পড়েনি।

বছরে দু'বার, প্রায় দেড় মাস-দু' মাসের জন্য যেতাম গ্রামে। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমাদের নিজেদের বাড়ি মাইজপাড়া, সেখানকার দিনগুলি প্রায় বৈচিত্র্যহীন, কোনও উৎসব ছিল না। পুজোর ছুটিতে যেতাম আমগ্রামে, মায়ের মামাবাড়িতে। মাইজপাড়ায় আমাদের পল্লীর ধারেকাছে পুজোর আয়োজন ছিল না, আর আমগ্রামে গাঙ্গুলিদের বাড়িতেই খুব ধুমধাম করে হত দুর্গাপুজো। সেখানে সবার জন্যই আগ্রহ ও ব্যকুলতা ছিল খুব বেশি। ভাদ্র মাস শেষ হতে না হতেই দিন গোনা শুরু হত।

শিয়ালদা থেকে ট্রেনে সারা রাত যাত্রার পর খুলনা। সেখান থেকে ভোর ভোর স্টিমারে চাপা, (আমরা বলতাম ইস্টিমার, সেটাই বেশি শ্রুতিমধুর) আমরা ডেকের যাত্রী, অন্যদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে বসতে হত পোঁটলা-পুটলি নিয়ে। অনেকের কাছেই গোলাপফুল আঁকা টিনের সুটকেস। রেলিং-এর পাশে জায়গা পেলে যে-কোনও বালকের জীবন ধন্য হয়ে যাবে। সারা দিন নদীর দিকে চোখ, ঘন ঘন নব নব আবিষ্কার। যখন-তখন জল থেকে মাথা তুলছে শুশুক, ঠিক যেন মনে হয় কোনও মানুষ, মাছ ধরা নৌকোর জালে ধরা পড়ছে ইলিশ মাছ, এখানে চিলগুলোর রঙ লালচে কেন, ওগুলো শঙ্খচিল, মাঝে মাঝে মধ্য নদীর চরায় পোড়া কাঠের মতন কী পড়ে আছে, হঠাৎ যেন নড়ে উঠল মনে হয়, স্টিমার কাছে যেতেই সেগুলো সরসরিয়ে নেমে গেল জলে, কুমির! কুমির!

চরমুগুরিয়া বা ফতেপুরে নামতে হয় স্টিমার থেকে। তারপর নৌকো। অর্থাৎ কলকাতা থেকে সেই গ্রামে পৌঁছতে যানবাহন লাগে তিন রকম। নৌকো এসে ভেড়ে একেবারে বাড়ির পাশের পুকুরঘাটে। পুকুরে যাত্রী নৌকো ঢোকে কী করে? পুকুরের একটা পাশ কাটা থাকে, তাকে বলে 'যান', সেটা বন্ধ রাখা হয়, আবার খোলাও যায়। সেখানে একটা সরু খালের সঙ্গে বড় খাল কিংবা নদীর যোগাযোগ।

পর পর নৌকোয় আসে প্রবাসীরা। আমার মায়ের অনেক মামা ও মাসি, তাঁদের ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী যে-যেখানেই থাকুক, দুর্গাপুজোর সময় এ বাড়িতে এসে মিলিত হবেই। বিশাল যৌথ পরিবার। পুজোর আয়োজনও খুব ব্যাপক। আটচালার পাশে স্থায়ী পূজামণ্ডপ, কুমোরের দল ঘুরে ঘুরে এসে সেখানেই প্রতিমা বানায়। প্রধান কুমোরের নাম জলধর, বেঁটেখাটো, শ্যামলা রঙের, স্বল্পবাক, তাকে দেখলেই মনে হয়, সে অন্যদের থেকে আলাদা। সে একজন শিল্পী। প্রতিমা নির্মাণের শেষপর্বে চক্ষুদানের সময় তার শিল্পীসত্তাটি বিশেষভাবে বোঝা যায়। এই পর্যায়ে মণ্ডপটি কাপড় দিয়ে ঘিরে রাখা হয়, অন্যদের প্রবেশ নিষেধ, কারণ এই সময় মূর্তিগুলি সম্পূর্ণাঙ্গ এবং উলঙ্গ। তা দেখতে নেই। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েরা উঁকিঝুঁকি মারবেই। তখনও নগ্নতা সম্পর্কে কৌতূহল বা লজ্জাবোধ জাগেনি। দুর্গা প্রতিমার চোখ দুটি আঁকার আগে জলধর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন ধ্যানমগ্ন, তারপর জাপানিরা যেমনভাবে হাইকু রচনা করে, সেইভাবেই সে হঠাৎ তুলির একটানে নিখুঁত দুটি চক্ষু সৃষ্টি করে। হয়তো একেই বলে প্রেরণা। যে-কোনও জায়গায় দাঁড়ালেই মনে হয় দুর্গাঠাকুর ঠিক আমারই দিকে তাকিয়ে আছেন।

চারদিন ধরে অবিরাম উৎসব, প্রচুর জনসমাগম, ঢাকের বাজনা, দুই ঢাকীর প্রতিযোগিতা, অত বড় ঢাক কাঁধে নিয়ে তাদের কী লাফালাফি! এবং গণভোজ। হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় রীতি-নীতির কী তফাত, সে বোধ তো তখন ছিল না। মুসলমানদের চেনা যেত তাঁদের পোশাকের কিছুটা তফাত কিংবা দাড়ি দেখে। অনেক মুসলমানও এই উৎসবে যোগ দিতে আসতেন এবং বসতেন পঙক্তি ভোজনে। শেষ পাতে কে কটা রসগোল্লা খেতে পারে, এক একজন দিব্যি পঁচিশ-তিরিশটা উড়িয়ে দিতেন।

সপ্তমী থেকে নবমী, এই তিন দিনে চারটি পাঁঠা বলি, দশমীর দিন লাউ-চালকুমড়ো, আখ ইত্যাদি নিরীহ বস্তুর ওপর কোপ। অনেক আগে থেকে কুচকুচে কালো রঙের পাঁঠা কিনে আনতে হয়, তাদের গায়ে একটু সাদা ছোপ থাকলেই অচল। স্নান করিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয় কোথাও সাদা ছোপের ওপর কালো রং করে দিয়েছে কি না বিক্রেতা। বাড়ির ছোটদের ওপর ভার পড়ত সেই পাঁঠাগুলোকে রোজ ভালো করে ঘাস খাইয়ে নধর করে তোলার। যত নধর হবে, ততই মাংস বাড়বে। পাঁঠাদের ঘাসভর্তি মাঠে নিয়ে চরানো খুব সোজা, ওরা পালাতে জানে না। হাঁড়িকাঠে মাথা দেওয়া কিংবা কসাইয়ের ছুরিই ওদের নিয়তি। গল্প আছে, এক সাহসী ও অভিমানী পাঁঠা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে অনুযোগ করেছিল, প্রভু, আর সব জীব-জন্তু, পশু-প্রাণীরই স্বাভাবিক মৃত্যু আছে, শুধু আমাদেরই কেন গলা কেটে মরার বিধান দিয়েছেন? ব্রহ্মা বলেছিলেন, তুমি সরে যাও, শিগগিরই সরে যাও, তোমাকে দেখে আমারই জিভে জল আসছে! অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন যে, পাখি হিসেবে মুরগি দেখতে খুব সুন্দর, লাল ঝুঁটি মাথায় একটা মোরগ কী দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়ায়, কিন্তু মানুষ অন্যান্য অনেক পাখির রূপের তারিফ করলেও মোরগ-মুরগি দেখলেই খাবার কথা ভাবে!

মানুষ আমিষাশী প্রাণী। কিছু মানুষ সাত্ত্বিক, নিরামিষাশী হলেও বিশ্বের জনসংখ্যার অধিকাংশই মাংসলোলুপ। পছন্দের মাংসের জন্য প্রাণীহত্যা চলবেই, কিন্তু তার সঙ্গে ধর্মের দোহাই জুড়তে হবে কেন? দুর্গাপুজো, কালীপুজোয় পাঁঠা বলি, মোষ বলি অতি বীভৎস প্রথা। মুসলমানরাও গোরু ও উট কোরবানি দেয়। এসব যে ধর্মেরই অপমান, তা কি এত যুগ ধরেও মানুষ বোঝে না?

পাঁঠা-চরানোর কাজটা আমার বেশ পছন্দ ছিল। বেশ রাখাল রাখাল ভাব, শুধু হাতে বাঁশিটাই নেই, এই যা। পুকুর ধারে, জঙ্গলে, মাঠে ওদের নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম, একটা করে নামও দিতাম। পাঁঠারা ঘাসের চেয়েও ধান গাছ খাওয়া বেশি পছন্দ করে। ধান গাছের পাতা যে প্রায় ব্লেডের মতন ধারালো হয়, তা শহরের ছেলেরা কি জানে? এক গোছা ধানপাতা টেনে ছিঁড়তে গিয়ে আমার হাতের তালু চিরে রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল। মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াবার একটা প্রধান স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, পয়সার কোনও চিন্তা থাকত না, শহরে যেমন সব সময় এটা কেনা, সেটা কেনা কিংবা কিনতে না পারার দুঃখ, গ্রামে কেনার কিছুই নেই। নানান রকম ফলের গাছ, গাব কিংবা ডউয়ার মতন ফল শহরে দেখাই যায় না। প্রত্যেক গাব গাছে লাল ওল্লা থাকবেই। হঠাৎ জঙ্গলে কুড়িয়ে পাওয়া যায় হরীতকী, আমলকী গাছ ধরে ঝাঁকালে টুপটাপ খসে পড়ে পাকা আমলকী, সেগুলি মুখে দেবার পর জল খেলে কী মিষ্টি লাগে!

পাঁঠা বলি দিতেন মায়ের ছোটমামা, তাঁর নাম অমূল্যরতন, বিশাল দেহী, কলকাতায় তিনি রেল কোম্পানির অফিসার, গ্রামে তিনি শক্তিশালী পুরুষ হিসেবেই প্রসিদ্ধ। অন্য সময় তিনি স্নেহপ্রবণ ও নরম স্বভাবের, কিন্তু মস্ত বড় একটা খাঁড়া হাতে নিয়ে দাঁড়ালে তাকে বেশ ভয়ঙ্করই দেখাত। সপ্তমীর দিন প্রথম পাঁঠাটিকে পুকুরে চুবিয়ে আনা হত, গলায় পরানো হত গাঁদা ফুলের মালা। তারপর তাকে হাঁড়িকাঠে ফেলে, কয়েকজন মিলে এক দিকে তার মাথা, আর এক দিকে তার শরীরটা জোরে টেনে রাখা হত, তাতে তার গলাটা এমন সরু হয়ে যেত যে তা দু'ভাগ করার জন্য বেশি গায়ের জোর লাগার কথা নয়। পাঁঠাটার মৃত্যু-আর্তনাদ ঢেকে দেওয়া হত

প্রবল শব্দে ঢাক-ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে, কোপ পড়ার পর ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটকে এসে লাগত অনেকের গায়ে। এক কোপে কাটতে না পারলে নাকি অকল্যাণ হয়। মায়ের ছোটমামা কোনওবারই তাতে বিফল হননি, আমরা ছোটরা দিব্যি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম ও হাততালি দিতাম।

কয়েক বছর পর আমি বদলে গেলাম। একটা পাঁঠাকে স্নান করিয়ে টেনে আনা হচ্ছে, তারপর হাঁড়িকাঠে মাথা দিয়ে সেটা ব্যাঁ ব্যাঁ করে করুণ চিৎকার করছে, হঠাৎ আমার গলার কাছে বাষ্প আটকে গেল, জ্বালা করতে লাগল চোখ। এ তো নিছক একটা পাঁঠা নয়, প্রায় পনেরো-কুড়ি দিন ধরে আমি ওকে ঘাস-পাতা খাইয়েছি, আমার পোষা হয়ে গেছে, আমি ওর নাম দিয়েছি ছোট্টু, সেই নাম ধরে ডাকলে আমার মুখের দিকে তাকায়, সেই ছোট্টুকে এখন কেটে ফেলবে? তখনই দলের মধ্যে থেকে একটি বালক, নতুন জামা-পরা, এক পা দু'পা করে পিছিয়ে লাগাল দৌড়। পুকুরধার দিয়ে দৌড়ে, ধোপাপাড়ার কাছে এসে একটা গাছতলায় বসে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে। অন্যরা তো কেউ সরে গেল না, সে কাঁদছে বলে তার লজ্জাও হচ্ছে, না কেঁদেও পারছে না। সম্ভবত সেইদিন থেকেই তার পিউবার্টির শুরু। যৌনচেতনা না জাগলে মানুষ যেমন অন্য কারও জন্য চুম্বকটান অনুভব করে না, তেমনই অন্য কারও জন্য চোখের জলও আসে না।

তিন

দূর থেকেই দেখা গেল, স্কুলের সামনের রাস্তায় জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেরা। আজ আর ক্লাস হবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা গেছেন, সবাই দেখতে যাবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে? তিনি বিশ্বকবি। বিশ্বকবি মানে কী? জানি না। সাত বছর বয়েস, ক্লাস টু-এর ছাত্র। 'আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে/বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে,' পাঠ্য বইতে পড়েছি, পাঠ্য বইতে আরও অনেক কবিতা থাকে, সেগুলি যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা বেঁচে আছেন না মরে গেছেন, তাও তো জানি না, তবে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিন অনেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে, সকলেই আগে বলে নেয়, বিশ্বকবি। এ বছরেই একটি উঁচু ক্লাসের ছেলে ওই দিনে 'পঞ্চ নদীর তীরে, বেণী পাকাইয়া শিরে, দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ' আবৃত্তি করার সময় মাথার ওপর আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেণী পাকানো দেখিয়ে দিচ্ছিল, আমরা বাচ্চাদের দল তা দেখে খিল খিল করে হেসে উঠেছিলাম, হেডমাস্টারমশাই চোখ পাকিয়ে তর্জনি তুলে ধমক দিয়েছিলেন, সাইলেন্স, সাইলেন্স!

আমাদের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ে কারুকে আলোচনা করতে শুনিনি। বরং, কয়েক মাস আগেই সুভাষচন্দ্র বসু নামে একজন সাহেব-পুলিশদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছেন, তিনি সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করবেন, সেইসব কথা শুনতাম, পাড়ার লোকরা ওই নামটি উচ্চারণ করত ফিসফিসিয়ে, সভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে, সেই জন্য ওঁর সম্পর্কে খুব কৌতূহল ছিল।

ছুটি পেয়ে অনেক ছাত্র বাড়ি চলে গেল, কিছু ছাত্র সারিবদ্ধ হয়ে চলল বিবেকানন্দ রোডের দিকে, আমিও কী করে যেন জুড়ে গেলাম সেই মিছিলে। পথে গাড়িঘোড়া নেই। শুধুই মানুষ। বিবেকানন্দ রোড এমনই জম-জমাট যে তার পেছনে দাঁড়িয়ে আমাদের মতন ক্ষুদ্রাকৃতি

মানবকদের কিছুই দেখা সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ রোডে কোনও একটি ছাত্রের আত্মীয়ের বাড়ি, সবাই হুড়মুড় করে উঠে গেলাম সেই বাড়ির ছাদে। সে রাস্তার সব বাড়িরই ছাদ ও বারান্দা মানুষে মানুষে ছয়লাপ।

বেশ কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পর দেখা গেল, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন এগিয়ে আসছে মানুষ, একটা খাট শুধু ফুলে ভরা, সেটা যেন জনতার মাথার ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে, সব বাড়ি থেকে আরও ফুল ছোঁড়া হচ্ছে সেই খাট লক্ষ্য করে।

রবীন্দ্রনাথের মরদেহের শেষ যাত্রার বিস্তৃত বর্ণনা আমার লেখা উচিত নয়। সত্যিই কি সেই দিনটির কথা আমার মনে আছে? পরে ওই দিনের বর্ণনা কতবার পড়েছি, ছবি দেখেছি অবনীন্দ্রনাথের আঁকা, অরোরা ফিল্ম কোম্পানি মিছিলের একটি তথ্যচিত্র তুলেছিল, সেটাও দেখার সুযোগ ঘটেছে, সেইসব মিলিয়ে মিশিয়ে আমার লুপ্ত স্মৃতির মধ্যে আমি কি ঢুকিয়ে দিয়েছি একটি চিত্র? অনেক সময় চার-পাঁচ বছর বয়েসের কোনও দৃশ্য যেন হুবহু দেখতে পাই। আসলে তা মা-মাসিদের কাছে গল্প শুনে শুনে পরবর্তী নির্মাণ। এই স্মৃতি সিনথেটিক। সেই বাইশে শ্রাবণে একটি সাত বছরের বালকের পক্ষে একজন অচেনা মানুষের মৃতদেহ দেখার জন্য ব্যাকুল হওয়া মোটেই স্বাভাবিক নয়। অন্যদের সঙ্গে বিবেকানন্দ রোডের এক বাড়ির ছাদ থেকে উঁকি মেরেছিলাম ঠিকই, কিন্তু এমনও হতে পারে, এত দেরি হচ্ছে কেন ভেবে অস্থির হয়েছি, কখন শেষ হবে, কখন পাড়ায় ফিরে গিয়ে খেলাধুলো করব, এই চিন্তাই প্রধান ছিল।

রবীন্দ্রনাথকে চিনতে এবং তাঁর রচনায় মগ্ন হতে আমার আরও পাঁচ-ছ' বছর সময় লেগেছে। তারও অনেক পরে ভেবেছি, রবীন্দ্রনাথ সঠিক সময়েই এই মর্ত্যধাম থেকে প্রস্থান করেছেন। আরও বেঁচে থাকলে তাঁকে বড় বেশি মর্মযাতনা ভোগ করতে হত। আজীবন যিনি সুন্দরের পূজারী, তিনি কি সহ্য করতে পারতেন, তাঁর প্রিয় এই শহর, তাঁর ভালোবাসার এই সোনার বাংলা, এমনকী গোটা দুনিয়াটারই নরকে পরিণত হওয়ার বাস্তবতা? 'সভ্যতার সংকট' তিনি আঁচ পেয়েছিলেন, টের পেয়েছিলেন, 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,' কিন্তু তারও পরবর্তী মানবতার বিপর্যয় সম্ভবত তাঁরও কল্পনার অতীত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুটা দেখে গেছেন, তখনও তা ইউরোপে সীমাবদ্ধ। অচিরকালের মধ্যেই তা দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয়দের কাছে এ এক কিম্ভূত যুদ্ধ। পরাধীন দেশ, সে আবার কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তার কোনও পক্ষ বা বিপক্ষও থাকার কথা নয়। কিন্তু শাসকশ্রেণী ভারতকেও যুদ্ধে জড়িয়ে নিল, কারণ এত বড় উপনিবেশটির সম্পদ যুদ্ধের কাজে লাগাতে হবে। ভারতীয় সৈনিকদের রণক্ষেত্রে পাঠাতে হবে কামানের খাদ্য হিসেবে।

আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান ও জাপান সিঙ্গাপুর দখল করার পর কলকাতাতেও সাজ সাজ রব পড়ে যায়। পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানিদের হাতে খুব মার খাচ্ছে ইংরেজরা, হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে কলোনিগুলো। রেঙ্গুন পতনের পর মনে হল জাপানিরা এসে গেছে একেবারে ভারতের দোরগোড়ায়, এরপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কলকাতা দখলের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইংরেজদের সাহায্য করবার জন্য এসে গেছে আমেরিকান বাহিনী, শহরের পথে পথে অনবরত সামরিক গাড়ি ছুটছে। রেড রোডকে রানওয়ে বানিয়ে সেখান থেকে উড়ছে বিমান। সন্ধের পর সারা শহর প্রায় নিষ্প্রদীপ, রাস্তার গ্যাসের আলোয় পরানো হয়েছে ঠুলি, সাধারণ নাগরিকরা বাড়ির মধ্যে বাতি জ্বাললেও জানলা খুলতে পারবে না, যখন তখন বিকট শব্দে বেজে উঠছে বিপদসঙ্কেত জানাবার জন্য সাইরেনের মহড়া। ফাঁকা মাঠ আর পার্কগুলিতে কাটা হয়েছে ট্রেঞ্চ, রাস্তার যেখানে সেখানে গাঁথা হয়েছে নতুন পাঁচিল। গোলাগুলি থেকে বাঁচবার জন্য যেগুলিকে বলে ব্যাফল ওয়াল, বাঙালিরা ঠাট্টা করে বলত,

বিফল প্রাচীর।

যুদ্ধে অনেক কিছুই বদলায়। সব চেয়ে বেশি বদলায় মূল্যবোধ। প্রশাসনের দৃষ্টি অন্য দিকে থাকে বলে সেই সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু মানুষের অবদমিত লোভ, হিংসা, কাম প্রবৃত্তি প্যান্ডোরার বাক্সের ভয়ঙ্কর পতঙ্গগুলির মতন বেরিয়ে আসে। খাদ্য, বস্ত্রের মজুতে যখন টান পড়ে, তখন শুরু হয় কালোবাজার। নারীদেহেরও বাজার তৈরি হয়। সৈনিকদের মনোরঞ্জনের জন্য রমণী সরবরাহ সব যুদ্ধেরই অঙ্গ। তাদের প্রকাশ্য বেলেল্লাপনা দেখলেও সরকার মুখ ফিরিয়ে থাকে। কলকাতা শহরে বারাঙ্গনার সংখ্যা কম নয়, তাতেও প্রয়োজন মেটেনি। অর্থের লোভে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের সুন্দরী কন্যারা প্রকাশ্যে টমিদের কণ্ঠলগ্না হয়েছে। সমাজ তখন অদৃশ্য। তবে সব সৈনিকই যে শুধু নারী-সম্ভোগের জন্য উন্মত্ত, তা বলা যায় না। বহু দূরে ফেলে আসা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের জন্যও অনেকের মন কেমন করত, প্রকাশ পেত বাৎসল্যের। ট্রেনের জানলায় বসা কোনও সৈনিকের ব্যথাময় মুখও দেখা যেত, অনুগ্রহ ভিখারি বাচ্চা ছেলেমেয়েদের প্রতি এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। খুলনা স্টেশনে একজন সৈন্য ট্রেন থেকে আমার দিকে একটা চকোলেটবার ছুঁড়ে দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরের বছর শীতকালে একদিন জাপানিরা কলকাতায় হঠাৎ বোমা ফেলে গেল। ঠিক আক্রমণ বলা যায় না। কেমন যেন অন্যমনস্কভাব। যেন বিমানে চেপে আকাশে বেড়াতে বেড়াতে কলকাতা পর্যন্ত চলে এসে জাপানিরা ভাবল, দু' একটা বোমা ফেলে একটু ভয় দেখানো যাক না! তাতেই শুধু ভয় নয়, দারুণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল শহরে। এতদিন যুদ্ধ চলছিল দূরে দূরে, এবার বুঝি কলকাতা শহর ধ্বংস হয়ে গেল। প্রায় দুশো বছর আগে সেই যে সিরাজউদ্দৌল্লা কলকাতার দিকে কামান দেগেছিল, তারপর থেকে তো আর কলকাতার ওপর কোনও আক্রমণ হয়নি! দিশেহারার মতন নাগরিকরা পালাতে লাগল শহর ছেড়ে, যে সব পরিবারের সঙ্গতি আছে, তারা আশ্রয় নিল মধুপুর, দেওঘর, ঘাটশিলার মতন স্বাস্থ্যকর জায়গায়, অন্যরা পালাল গ্রামে-গঞ্জে। শহর প্রায় ফাঁকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম শিকার আমার বাবা। স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেল অনির্দিষ্টকালের জন্য, বে-সরকারি স্কুলে ছাত্রদের মাইনে থেকেই শিক্ষকদের বেতন হয়। স্কুল বন্ধ, বাবা বেকার হয়ে গেলেন, তখন আর সংসার চালাবেন কী করে, আমাদের পাঠিয়ে দিলেন গ্রামের বাড়িতে।

সেবারে আমি মাইজপাড়া গ্রামের বীরমোহন বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। টিনের চালের ঘর, বেশ পরিচ্ছন্ন, পেছন দিকে টলটলে জলের সুন্দর একটা বড় দিঘি। স্কুলটি আমাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে, হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। হাঁটতে ভালোই লাগে, শুধু একটা বিশাল অশ্বত্থ গাছতলায় শ্মশান, সেখান দিয়ে চোখ বুজে যাই, হঠাৎ হঠাৎ সে গাছের কোটর থেকে ডেকে ওঠে তক্ষক সাপ। সে সাপকে কখনও চোখে দেখা যায় না। তবু ডাক শুনলেই ছমছম করে বুক। আর একটি বাড়ি, সেটিও গাঙ্গুলিবাড়ি। কিন্তু তাঁরা খুব ধনী, অনেকখানি জায়গা নিয়ে তাঁদের প্রাসাদোপম হর্ম্য, শুনেছি তাঁদের বন্দুক আছে, এবং আছে একটি বিলিতি কুকুর, আমরা বলতাম ডালকুত্তা, তার গম্ভীর ঘেউ ঘেউ শুনলে রক্ত হিম হয়ে যায়। সে বাড়ির গেটের সামনেটা পার হতাম দৌড়ে।

টাউন স্কুলে আমাদের কোনও মুসলমান সাহপাঠী ছিল না। গ্রামের স্কুলে হিন্দু-মুসলমান মিশ্র ছাত্র। হেডমাস্টার লস্কর সাহেবকে মনে হত চলন্ত পর্বত, কিন্তু তাঁর ব্যবহার ছিল নরম, তাঁর এক ছেলে হেডমাস্টার-পুত্র হওয়ার যোগ্যতায় বেশ অহংকারী ধরনের। প্রথম প্রথম আমি ছিলাম অন্যদের কাছে কৌতূহলের সামগ্রী। আমার গায়ে শহুরে গন্ধ, আমার মতন চেন লাগানো গেঞ্জি অন্যরা আগে দেখেনি। আমার একটি মাউথ অর্গান ছিল। সেটাও অনেকের কাছে অভিনব। ওই মাউথ অর্গানটি কিছুদিন পরে একটা উঁচু ক্লাসের ছেলে কেড়ে নেয়।

উঁচু ক্লাসের ছেলেদের জন্মগত অধিকার আছে মাঝে মাঝে ছোটদের চড়-চাপড় মারার। এ

নিয়ে নালিশ জানানো আরও বিপজ্জনক। অর্থাৎ র‍্যাগিং সব জায়গাতেই চলে। উঁচু ক্লাসের একটি ষণ্ডামার্কা ছেলে নাদুস-নুদুস চেহারার ছোট ছেলেদের গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করত, এই তুই আমার রানি হবি? রানি হওয়া কাকে বলে তখন বুঝতাম না। আমাকে অবশ্য কারুর রানি হতে হয়নি কখনও।

স্কুলে যেতাম গরম গরম ফেনাভাত খেয়ে। ঢেঁকি ছাঁটা লাল চালের ফেনাভাত, অপূর্ব তার স্বাদ, ঘি জোটার প্রশ্ন নেই। ঘি খায় আমগ্রামের মামাবাড়ির ছেলেমেয়েরা, তাতে কী। আলুসেদ্ধ আর পুঁটি মাছ ভাজা, চমৎকার! তবে, যতই সুখাদ্য হোক, দিনের পর দিন তা কি মুখরোচক হতে পারে? কয়েক মাস পরে, শুধু সকালে নয়, প্রতিদিন অন্য বেলাতেও ফেনাভাত।

গ্রামে যুদ্ধের কোনও রেশ নেই, কামান-বন্দুকের শব্দ দূরে থাক, এখানকার আকাশ দিয়ে কোনও বিমানও উড়ে যায় না। তবু যুদ্ধের ধাক্কা লাগে এই নিস্তরঙ্গ গ্রামগুলিতে। প্রথম আঘাত হানে রান্নাঘরে।

আমরা আর যুদ্ধের খবর কী জানি! শহরের তুলনায় গ্রাম্য জীবন অনেক স্বাধীন। কলকাতায় বাড়ি থেকে একা একা বেশি দূরে যাওয়া নিষেধ ছিল। পথ হারাবার ভয়, গাড়ি চাপা পড়ার ভয়। গাড়ি মানে, ট্রাম-বাস-মোটর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, গোরুর গাড়ি। প্রথম তিন প্রকার গাড়ি চাপা পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু, ঘোড়ার গাড়ি চাপা পড়লে প্রাণটা না গেলেও দারুণ জখম হবার সম্ভাবনা, আর গোরুর গাড়িতে কেউ চাপা পড়লে তাকে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, সে শহরে বাস করার যোগ্য নয়। গ্রামে কোনও বাধাবন্ধন নেই, যেখানে খুশি টো টো করে ঘুরে বেড়ানো যায়। বর্ষা এসে গেছে, এখন চতুর্দিকে জল, ধানের খেতগুলিও বিল হয়ে গেছে, রাস্তা এখন নদী। আমি কবে যে সাঁতার শিখেছি, তাই-ই মনে নেই। মানুষ ছাড়া আর কোনও প্রাণীই জলে ডোবে না, গোরু-মোষ, এমনকী হাতিও জন্ম থেকে সাঁতরাতে পারে, মানুষের মাথা তার শরীরের অনুপাতে বেশি ভারী, সহজে ডুবে যেতে চায়, তাই মাথাটাকে জলের ওপর তুলে রাখার জন্য সাঁতার শিখতে হয়। গ্রামে সাঁতার শেখার পদ্ধতিটি অতি সরল। মাসি, পিসি কিংবা দিদি স্থানীয়রা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের হাসতে হাসতে পুকুরের জলে ছুঁড়ে দেয়। শিশুটি ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে হাত-পা দাপায়, তারপর একটু একটু করে ডুবতে থাকে, একেবারে ডুবলে ওই নারীগণের কেউ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কোলে তুলে আনে। শিশুটির কান্না থামতে না-থামতেই আবার জলের মধ্যে ঝপাস। এই রকম প্রতিদিন চার-পাঁচবার, এবং চার-পাঁচদিন পরেই বাচ্চাটা কান্নার বদলে খলখল করে হাসে, হাঁসের মতন ভাসতে শিখে যায়। তারপর যার যার নিজের কৃতিত্ব।

আমি ডুবসাঁতারে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিলাম। এক ডুবে যেতে পারতাম অনেক দূর। ডুব দিয়েছি, আর উঠছি না, উঠছিই না, অন্য সবাই উদ্বিগ্ন, সেটাই একটা মজা। ডুব দিয়ে আবার উল্টো দিকে ফিরে এসে ঘাটের কাছে অর্ধনিমগ্ন কারুর উরুতে চিমটি কেটে দেওয়া ছিল একটা প্রিয় খেলা। আর একটা প্রতিযোগিতা ছিল, মাঝপুকুরে গিয়ে এক ডুবে তলার মাটি তুলে আনা। অচেনা পুষ্করিণীতে এটা খুব বিপজ্জনকও হতে পারে। এক একবার ডুব দিয়ে তলিয়ে যাবার পর মনে হত, বুক ফেটে যাবে, আর দমে কুলোবে না, ওপরে ফেরা হবে না, কোনও রকমে আকুপাকু করে ভুস করে জলের ওপর মাথা তোলার পর মনে হত, পুনর্জীবন হল।

সাঁতার শেখার পরেই নৌকো চালানোর যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। যে সাঁতার জানে না, তার বৈঠা কিংবা লগি হাতে নেওয়ার অনুমতি মেলে না। নৌকো বলতে যা বোঝায় তা আমাদের নিজস্ব ছিল না, কিন্তু কয়েকটা কলাগাছ একসঙ্গে বেঁধে নিলে হয় ভেলা, তা নিয়ে দিব্যি চলাচল করা যায়। জলপথে, এমনকী শুধুমাত্র একটা তালগাছের খোল দিয়েও বানানো হয় ডোঙা। ওই ভেলা বা ডোঙা উল্টে যেতে পারে যখন তখন, ওই দুটিতেই আমার প্রথম বৈঠা চালানোর শিক্ষা।

কখনও সখনও অন্যের নৌকোয় জায়গা পেয়ে মাদারিপুর পর্যন্ত ঘুরে আসা ছিল দারুণ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এ যেন গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়া. বৃত্তটা আরও বিস্তারিত হওয়া। যাওয়ার পথে একটি গ্রামের নাম ধুয়াসার। সে গ্রামটির কথা একটি বিশেষ কারণে মনে আছে। যে নৌকো চালাচ্ছিল, সে ওই গ্রামের একটি বাড়ির সামনে একজন মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অকারণে সেখানে নৌকো ভিড়িয়ে বলল, মাসিমা, আমাগো খুব তেষ্টা পাইছে, এট্টু জল খাওয়াবেন?

মহিলাটি আমাদের অপেক্ষা করতে বলে বাড়ির ভেতর থেকে নিয়ে এলেন সোনার মতন উজ্জ্বল একটি কাঁসার ঘটি, (একটু বড় ধরনের ঘটিকে বলা হত 'আকফোরা') একটি কাঁসার গেলাস এবং একটি রেকাবিতে কিছু মিষ্টি। আমাদের কারুরই জলতেষ্টা পায়নি, তবু খেলাম ওই মিষ্টিগুলোর লোভে, ওগুলোর নাম তক্তি, খাঁটি ক্ষীর ও নারকোল দিয়ে তৈরি, কলকাতায় যাকে বলে বরফি। কী অপূর্ব তার স্বাদ! আবার নৌকো ছাড়ার পর সবাই হাসতে লাগল। জল খেতে চাইলে কোনও বাড়িতেই আপত্তি করে না, অতিথিকে জল না-দেওয়াটা পাপ, অনেক বাড়িতে শুধু জল দেয় না, সঙ্গে কিছু না-কিছু মিষ্টি দিতে হয়, আর কিছু না থাকলে অন্তত কয়েকটা বাতাসা। নৌকোর ছেলেরা ধুয়াসার গ্রামের সেই বাড়িটার নাম দিয়েছিল 'তক্তি বাড়ি', যাওয়া-আসার পথে যে-কোনও সময় ওখানে থামলেই বিনা পয়সায় মিষ্টি খাওয়া যায়।

মাদারিপুর একটি গঞ্জ, অনেক দোকানপাট, অনেক খদ্দের ও ব্যাপারি। পাশের নদীটার নাম আড়িয়াল খাঁ। কলকাতায় পাশে গঙ্গা কতবার দেখেছি, আরও কত নদী পার হয়ে আসতে হয় এখানে, তবু আড়িয়াল খাঁ-ই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। নামটার মধ্যেই বিশেষ দার্ঢ্য রয়েছে। আগে মনে করতাম, এ নদী বুঝি কোনও ডাকাতের নামে, পরে শুনেছি কোনও ফকিরের। বর্ষার সময় আড়িয়াল খাঁ-র রূপ কোনও লুঠেরার মতনই দুর্দান্ত, ঢেউ যেন ফুঁসছে, অনবরত পাড় ভাঙছে। নদী যেন কামড়ে কামড়ে খেয়ে নিচ্ছে তটরেখা। এক একটা গাছ উল্টে যাচ্ছে শিকড় সমেত। সে দৃশ্য অন্যদের কাছে ভয়ঙ্কর, কিন্তু একটি বালকের চোখে মোহময়।

নদীতে জাল ফেলে ধরা হচ্ছে ইলিশ মাছ। যেসব মাছের গায়ের রং একেবারে সাদা, তারা সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না। জল থেকে তোলার পরই মারা যায়, তাই জ্যান্ত ইলিশ সচরাচর কেউ দেখতে পায় না। আমরা জালে-ওঠা ইলিশ দু'একবার মাত্র লাফাতে দেখেছি।

এক একটা নৌকো ঘাটে এসে ভিড়লেই ক্রেতারা এসে ভিড় জমায়। ওজন-টোজনের কোনও বালাই নেই, মাছের আকার অনুযায়ী দাম। ক্রেতার তুলনায় মাছ অনেক বেশি, তাই বেশ দরাদরি চলে। একবার আমার কাকা দু'আনা (বারো পয়সা) দিয়ে একটা প্রায় দু' কিলো সাইজের ইলিশ কিনলেন। দলটির মধ্যে আমিই সর্বকনিষ্ঠ, একজন জেলের হঠাৎ কী খেয়াল হল, একটা ছোট ইলিশ (ছ'-সাতশো গ্রাম) আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এটা দা ঠাউরের জইন্যি মাগনা দিলাম। দা ঠাউর অর্থাৎ দাদাঠাকুর, আমাদের মতন উচ্চবর্ণের বালকদের নিম্নবর্ণের লোকেরা এই নামে সম্বোধন করত। কেন ওই জেলেটি আমাকে দাম না নিয়ে একটি মাছ দিল? অত ছোট মাছ বিক্রি হবার সম্ভাবনা নেই বলে? কিংবা, আমার বয়েসি তার কোনও ছেলে আছে, যার মুখখানি আমারই মতন, হয়তো সে ছেলেটি বেঁচে নেই, কিংবা সে ভেবেছে যে তার মৃত সন্তানটিই আবার বামুনের ঘরে জন্মেছে...। তখন অবশ্য এসব কথা ভাবিনি, পরবর্তীকালের চিন্তা। রোদে পোড়া তামাটে মুখ, রুখু দাড়ি, জ্বলজ্বলে চোখ, সেই খর্বকায় জেলেটির কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে।

বর্ষাকালে এমনি এমনি মাছ পাওয়া অভাবনীয় কিছু ছিল না। কোনও এক রহস্যময় কারণে আকাশে মেঘ ডাকলে কই মাছ জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসে। অন্য কোনও মাছের এই স্বভাব নেই, শুধু কই মাছেরই কেন মেঘ গর্জনের সঙ্গে সম্পর্ক, তা কে জানে! পুকুর থেকে অনেক দূরে, পায়ে চলা পথে কিংবা মাঠের মধ্যেও মেঘলা বিকেলে কানকোয় ভর দিয়ে কই মাছদের

চলতে দেখেছি। খপ খপ করে ধরে ফেলা যায়। এইসব বিবাগী কই মাছ নাকি গাছেও চড়তে চায়। গল্পের গাঁজখুরিত্ব বোঝাবার জন্য 'গল্পের গোরু গাছেও চড়ে' বলে একটা কথা আছে। কিন্তু কইমাছের গাছে চড়া বোধহয় গাঁজাখুরি নয়, আমি স্বচক্ষে তা কখনও দেখিনি বটে, তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে শুনেছি।। প্রসঙ্গত বলা যায়, গল্পের গোরু গাছে চড়ার বক্রোক্তি থেকেই সম্ভবত গল্পগাছা কথাটা তৈরি হয়েছে।

মাছের অভাব নেই, কিন্তু টান পড়ল অন্য দিকে। অনবরত ফেনাভাত রান্নার কারণ, চাল বাড়ন্ত। বাঙালিরা সাধারণত শখ করে দু'একদিন ফেনাভাত খায়, অন্য সময় ভাতের ফেন গেলে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু চাল কম পড়লে ফেন দিয়েই পেট ভরাতে হবে। ক্রমে চাল একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

জাপানিরা আসছে, জাপানিরা আসছে! জাপানের অগ্রগতি ইংরেজরা রুখতে পারেনি। রেঙ্গুন দখল করার পর জাপানি সৈন্যবাহিনী অসম পেরিয়ে নামবে পূর্ববঙ্গে, তাই সরকার থেকে সেখানকার চারটি জেলার সমস্ত ধান-চাল সরিয়ে নেওয়া হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার জন্য বাজেয়াপ্ত করা হল বহু নৌকো, কয়েক হাজার নৌকো একেবারে ধ্বংস করেই দেওয়া হল, সেখানকার মানুষগুলি কার্যত গৃহবন্দি, তারা খাবে কী? সে চিন্তা সরকারের নয়। এরকম কৃত্রিম অভাবের সময়ই শুরু হয় কালোবাজারের রমরমা। মজুতদারদের কল্যাণে চালের দর বাড়তে থাকে লাফিয়ে লাফিয়ে। যুদ্ধ পূর্বকালে চালের মন (৪০ সেরে এক মন, এখনকার ৩২-৩৩ কেজি) ছিল ছয় থেকে সাত টাকা। কোনও বছর আট টাকায় উঠলে লোকে বলত, দেশটার হল কী? তখন সোনার ভরি পঁয়তিরিশ টাকা চার আনা। বেয়াল্লিশ সালের ডিসেম্বরে চালের মন তেরো থেকে চোদ্দো টাকা, পরবর্তী এক বছরের মধ্যে তা পঞ্চাশ-ষাট, চট্টগ্রামে আশি টাকা, ঢাকায় একশো পাঁচ টাকা।

খাদ্যশস্যের প্রকৃত অভাবকে বলে দুর্ভিক্ষ। পরবর্তীকালে গবেষক অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন যে সেই তেতাল্লিশ সালে খাদ্যশস্য ছিল প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু সরকার ও কালোবাজারিরা তার অনেকখানিই সরিয়ে রেখেছিল, সেই জন্যই খোলা বাজারের চালের এমন আকাশছোঁওয়া মূল্যবৃদ্ধি, তা চলে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। দেশে চাল আছে, তবু দেশের এক অংশের মানুষ অনাহারে ধুঁকছে।

আমার বাবা সেকালে মাইনে পেতেন পঁয়তাল্লিশ টাকা। স্কুল বন্ধ, তখন তাঁর সে উপার্জনও নেই। কলকাতায় তিনি অন্য চাকরি খুঁজছেন, কী করে টিঁকে আছেন, আমাদের জন্যই বা কী উপায়ে মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠাচ্ছেন, সে জ্ঞান আমার ছিল না। এক দু' মাস কোনওই চিঠি আসত না তাঁর, কোথায় আছেন জানি না, হঠাৎ হঠাৎ দেখে ফেলতাম, ঘরের এক কোণে, দেয়ালের দিকে ফিরে, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছেন মা। শুধু মেয়েরাই বুঝি পারে এভাবে কাঁদতে, শরীরটা কাঁপে, কোনও শব্দ হয় না।

মাদারিপুরে চালের দোকানের সামনে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ম্লান মুখে। দোকানের মালিক হাত নেড়ে জানাচ্ছেন, চাল নেই, চাল নেই! সন্ধেয় অন্ধকারে সে দোকানেরই পেছনের দরজা দিয়ে সম্পন্ন গৃহস্থেরা থলে ভরা চাল নিয়ে সরে পড়ছে চুপি চুপি। এ দেশের মানুষ কেড়ে খেতে জানে না, নিজের কপালে হাত চাপড়ায়। সৈন্যদের জন্য প্রচুর খাদ্য গুদামবন্দি রয়েছে, সিংহলে রপ্তানি যাচ্ছে চাল, তবু এখানকার অভুক্ত মানুষরা লুঠতরাজ শুরু করেনি। 'এই সব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে দিতে হবে ভাষা', কে দেবে সেই ভাষা, সে নেতৃত্ব কোথায়?

আমাদের সম্পূর্ণ অনাহারে পড়তে হয়নি, কোনও এক বিস্ময়কর কারণে সে বছর আলু সস্তা ছিল। আলু খেয়েও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। জাপানিরা কি আলু খায় না? সরকার আলুও সরিয়ে দিল না কেন? আমাদের চাল কেনার ক্ষমতা নেই, বস্তায় ভরে আলু আনা হত। ভাতের হাঁড়িতে সেদ্ধ করা হয় সেই আলু। সকালে আলু, দুপুরে আলু, বিকেলে আলু, রাত্তিরে আলু।

একসঙ্গে বেশি আলু খাওয়া যায় না, মুখে রোচে না। তাই একসঙ্গে অনেক আলু সেদ্ধ করা থাকে, আমরা ঘুরে ফিরে একটা-দুটো খাই। ইস্কুলেও আলু নিয়ে যাই পুঁটলি বেঁধে, আমার মতন আরও অনেকে, ইস্কুল থেকে নুন আর মরিচ দেবার ব্যবস্থা করা হয়, প্রত্যেক পিরিয়াডের পর দপ্তরি এসে হাইবেঞ্চে একটু একটু নুন আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে যায়, মাস্টারমশাইরাও পাঞ্জাবির পকেট থেকে আলু বের করেন। মাস্টারমশাইদের অনুপস্থিতিতে খুদে ছাত্রদের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ শুরু হয়ে যায় আলু-যুদ্ধ, কামানের গোলার মতন আলু ছোঁড়াছুঁড়ি চলে, এক পক্ষ ইংরেজ, এক পক্ষ জাপানি।

দিনের পর দিন এই রকম, এক এক রাতে আমরা ধোঁওয়া ওঠা গরম ভাতের স্বপ্ন দেখি। মনে হয় যেন এ-জীবনে আর ভাত খাওয়া হবে না। সহপাঠীদের মধ্যে যে দু'চারজনের বাড়িতে ভাত রান্না হয়, তাদের মুখে আমরা ভাতের গল্প শুনি। হেডমাস্টারের ছেলেটি সেইরকম একজন সৌভাগ্যবান, সে অবজ্ঞার সঙ্গে একদিন বলল, তার একথালা ভাতের ওপর একটা আরশোলা (ওখানকার ভাষায় তেলাচোরা) এসে পড়েছিল বলে সে পুরো ভাতটা বাড়ির কুকুরকে খাইয়ে দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ সেই কুকুরটির প্রতি আমাদের ঈর্ষা হয়। এ কাহিনী শোনাবার সময় সেই লস্কর-নন্দন জামার পকেট থেকে একটি মূল্যবান লাঠি লজেন্স বার করে দেখিয়ে দেখিয়ে চোষে।

বাজারে আলুও তো অফুরন্ত নয়, একদিন টান পড়বেই, তারপর? এরকম দুঃসময়ে চুরি-ডাকাতি ও অরাজকতাও বাড়ে। আমাদের বাড়িতেও চোর এল এক রাতে। আগেই বলেছি, আমাদের বাড়িটি ব্রাহ্মণপল্লীর অন্য বাড়িগুলির পেছন দিকে, তেমন মজবুতও নয়। মাটির ভিত, ইট-সিমেন্টের কোনও বালাই নেই, সেই মাটির ভিত শাবল দিয়ে খুঁড়ে সিঁধ কেটে ভেতরে তো ঢোকাই যায়। হায়রে চোরের পোড়া কপাল, আমাদের মতন বাড়িতে এসে সে কী পাবে? চোরেরা সাধারণত আগে থেকে খোঁজ খবর নিয়ে আসে, এ নিশ্চিত পেশাদার চোর নয়, পেটের জ্বালায় মরিয়া হয়ে ঢুকে পড়েছে।

শীতের রাত, মেঝেতে লম্বা বিছানা পাতা, কম্বল চাপা দিয়ে মায়ের দু'পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছি আমরা চার ভাইবোন। দিদিমা আমার একটা অন্য নাম দিয়েছিলেন, সনাতন, সেই থেকে ডাক নাম সুনু, পরের ভাই মনু (অনিল), তারপর বাচ্চু (অশোক), ছোট বোনটি কণা (কণিকা)। সে একেবারেই দুগ্ধ পোষ্যা।

চোরটি ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে হাতড়ে হাতড়ে কিছুই পায় না। আলনা থেকে পুরনো জামা-কাপড়গুলি নিয়ে পুঁটুলি বাঁধল, কিন্তু শুধু তাতে তার পোষাবে কেন? শেষপর্যন্ত সে আমাদের গা থেকে কম্বল টেনে নিতে লাগল। শীত লাগতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়, চেয়ে দেখি আবছা আলোয় প্রেতের মতন এক ছায়ামূর্তি। পরনে শুধু লেংটি, প্রায় উলঙ্গই মনে হয়, ওরা নাকি সারা গায়ে তেল মেখে আসে। কিছু না ভেবেই আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, মা! মা সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে আমার মুখ চাপা দিলেন, অর্থাৎ মাও আগে জেগেছেন, কিন্তু সাড়াশব্দ করতে গেলেই যদি চোরটি শাবল দিয়ে মাথায় মারে, কিংবা পেটে ছুরি বসিয়ে দেয়। সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছেলেটির বয়েস ন বছর, মীরা পঁচিশ বছরের তরুণী, তাঁর স্বামী থাকেন অনেক দূরে, রাত্তিরে ঘরের মধ্যে একজন জলজ্যান্ত পুরুষ, তার কাছে কী অস্ত্র আছে জানা নেই, এর চেয়ে অসহায় অবস্থা আর কী হতে পারে?

সেই চোর কম্বল টেনে নিয়ে ধীরে সুস্থে গর্ত দিয়ে নেমে গেল। কাকে ডাকব, কে সাহায্য করবে, এত রাতে চোরের পিছু পিছু ধাওয়া করারও কোনও প্রশ্ন ওঠে না। এবারে মীরার কান্না থামাল তার কোলের মেয়েটি, সে কিছু না বুঝে ভ্যাঁ করে উঠতেই মীরা চোখ মুছে তাকে কোলে তুলে নিলেন।

আমার একটি ছোট টিনের বাক্স ছিল, তাতে ছিল পাঠ্য বইয়ের বাইরের দু'একখানা বই,

একটা দু'মুখো লাল-নীল পেন্সিল, কয়েকটা কাচের গুলি, কিছু সোডার বোতলের ছিপি, কয়েক পাতা জলছবি, সবই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান। পরদিন পাছ-পুকুরের ওধারের জঙ্গলে সুটকেসটি একেবারে তোবড়ানো ও খালি অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়। কয়েকদিন পর বাজারের কাছে একটি ছেলেকে আমার চেন বসানো গেঞ্জিটি পরে ঘুরে বেড়াতে দেখি, ওরকম গেঞ্জি আর দ্বিতীয়টি থাকার কোনওই সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু ছেলেটিকে নাকি কিছু বলা যাবে না, প্রতিকারের কোনও উপায় নেই। পল্লীর বয়স্কদের কাছে নালিশ জানাতে তাঁরা চাপা বিষাদের সঙ্গে বলেছিলেন, চুপ করে থাক, ও নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিস না।

তখন বাংলায় মুসলিম লিগ মিনিস্ট্রি, কিছুদিন আগে ফজলুল হককে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী (হ্যাঁ, মুখ্যমন্ত্রী নয়, তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রীই বলা হত) এখন খাজা নাজিমুদ্দিন, তিনি দুর্ভিক্ষ সামলাবার কোনও ব্যবস্থাই নিতে পারছেন না, এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানের ফাটল ক্রমশ বাড়ছে।

চার

উনিশ শো তেতাল্লিশ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে তেহরানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক স্তালিন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের এক বৈঠক হল। এমনই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ যে মনে হয়, এই তিনজন অনেকদিনের বন্ধু।

রাজনীতিতে শয্যাসঙ্গী পরিবর্তন যখন-তখন ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার আগে স্তালিন ছিলেন অপর দুই ব্যক্তির চক্ষুশূল। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে চাপা আশঙ্কার স্রোত বইতে শুরু করেছিল, এই বুঝি দিকে দিকে কমিউনিজ্‌ম ছড়িয়ে পড়বে। যদিও সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজ্‌ম এক নয়, তবু চলতি কথায় কমিউনিজ্‌মই বলে, কারণ সোভিয়েত রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টিই ক্ষমতাসীন, অন্য অনেক দেশেও কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এমনকী জার্মানিতেও, হিটলারের অভ্যুত্থানের আগের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল বেশ শক্তিশালী।

লেনিনের তুলনায় স্ট্যালিন অনেক কঠিন ধরনের মানুষ। চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত সোভিয়েত রাশিয়াকে রক্ষা করার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রয়োজনে তিনি চরম নির্মমও হতে পারেন। ট্রটস্কির পলায়নের পর তিনি নিজের আশেপাশে অনেককেই ঘরশত্রু বিভীষণ বলে সন্দেহ করেন, ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তিনি নিজের দেশের বহু মানুষকে হত্যা করিয়েছেন। বাইরের দেশগুলি অনেক খবরই ঠিকমতো জানতে পারে না, তাই সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে তাদের চোখে স্তালিন চরিত্রটি রীতিমতো ভয়াবহ।

ধনতন্ত্র ও কমিউনিজ্‌ম, এই দুইয়ের মাঝখানে হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ফ্যাসিবাদ, ইতালি ও জার্মানিতে। মুসোলিনি আর হিটলার দু'জনেই ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাধারণ করপোরাল, দু'জনেই আহত হয়েছিল। পরে মুসোলিনি হয় একটি বামপন্থী পত্রিকার সম্পাদক, হিটলার যোগ দিয়েছিল ওয়ার্কার্স পার্টিতে। কিন্তু দু'জনেই মনেপ্রাণে স্বৈরাচারী, রক্তলোলুপ ও যুদ্ধবাজ। প্রথম যুদ্ধে পরাজিত জার্মানি অত্যন্ত অপমানজনক শর্তাবলীতে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিল। তারপরেও বিজয়ী দেশগুলির শোষণে জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে বিপর্যস্ত, রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছে বটে, সম্রাট কাইজার পলাতক, তাতেও অবস্থার কিছুই উন্নতি হয়নি। এরই মধ্যে হিটলারের চমকপ্রদ অভ্যুদয়। প্রথম যৌবনে এই লোকটি ছবি

আঁকিয়ে হতে চেয়েছিল, দু'দু'বার চেষ্টা করেছিল ভিয়েনার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে ভর্তি হতে, কিন্তু অযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। একজন ব্যর্থ শিল্পী কী করে একজন সাঙ্ঘাতিক হিংস্র রণোন্মাদে পরিণত হয়, তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও অতি দুরূহ।

হিটলার এক অদ্ভুত ধরনের বাগ্মী, কথা বলে ঝড়ের বেগে, তাতে যুক্তির চেয়েও তেজ থাকে প্রচণ্ড, জনসভায় শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতন হয়ে যায়। হিটলার প্রচার করতে লাগল, জার্মানির এই অধঃপতনের জন্য দায়ী ইহুদিরা। ইহুদি ও বলশেভিকদের ষড়যন্ত্রে দেশটার সর্বনাশ হতে বসেছে। এবং আর্যদের মধ্যে নর্ডিক জার্মানরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তারা সারা পৃথিবী শাসন করার যোগ্য। জার্মানদের জন্য আরও ভূমির প্রয়োজন, তাই অন্য দেশ দখল করা দোষের কিছু নয়। এবার যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে, তার আয়ু হবে অন্তত হাজার বছর। হিটলারের এইসব প্রলাপবাক্যে জার্মানির অধিকাংশ মানুষ মোহগ্রস্ত হল। তাদের পরাজয়ের অপমানের ক্ষতে এইসব প্রলাপই হল প্রলেপ। নাতসি বাহিনী গঠন করে বিস্ময়কর দ্রুততায় হিটলার হয়ে উঠল জার্মানির সর্বেসর্বা আর মুসোলিনি ইতালিয়ানদের স্বপ্ন দেখাল যে, আবার রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলির চোখে কমিউনিজ্‌ম ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে কে বড় শত্রু? ফ্যাসিবাদ পুরোপুরি স্বৈরাচারী, বিরুদ্ধবাদীদের নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হলেও ধনতন্ত্রের সমর্থক। শ্রমিক শ্রেণীর সমস্ত আন্দোলন দমন করে তারা বড় বড় কলকারখানার মালিক ও পুঁজিপতিদের নিজেদের পক্ষে রাখে। হিটলার যদি এতটা অস্থির না হত, সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে একটার পর একটা দেশ দখল করে না নিত, তা হলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি তার সঙ্গে এক ধরনের বোঝাপড়ায় আসতে বোধহয় অনিচ্ছুক ছিল না। হিটলার-মুসোলিনীকে দিয়ে কমিউনিজ্‌মকে ধ্বংস করার প্রচ্ছন্ন মদত দিত। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন সেই চেষ্টাই করেছিলেন।

কমিউনিস্টদের চোখেও ধনতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে কোনটি বেশি বিপজ্জনক? ধনতন্ত্রে তবু খানিকটা উদারতা আছে, বিরুদ্ধ মত কিছুটা প্রকাশ করা যায়, অন্য পার্টি গঠন করে আন্দোলনও চালানো যায়। কিন্তু ফ্যাসিবাদ তো সব বিরুদ্ধবাদীদেরই গলা টিপে মারছে। শ্রমিক-কৃষকদের পদানত রাখাই তাদের নীতি এবং কিছুতেই কমিউনিজ্‌মের বিস্তার হতে দেবে না। সুতরাং ফ্যাসিবাদ রোখার জন্য আপাতত ধনতন্ত্রের সঙ্গে হাত মেলানোই তাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

যুদ্ধের প্রথম থেকেই হিটলারের চমকপ্রদ সাফল্যে সারা ইউরোপ শঙ্কিত। জার্মান বাহিনী যেন অপ্রতিরোধ্য। এখন নিজেদের স্বার্থেই ফ্রান্স-ব্রিটেনের সঙ্গে রাশিয়ার সামরিক চুক্তি করা অতি আবশ্যক। সম্মিলিতভাবেই জার্মানিকে প্রতিহত করা যেতে পারে। স্তালিন এরকম একটা চুক্তির ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, ফ্রান্স-ইংল্যান্ডের সঙ্গে চিঠি চালাচালিও শুরু হয়েছিল, কিন্তু শর্তের খুঁটিনাটি নিয়ে মতভেদে দেরি হচ্ছিল। এই জন্য ত্রিপাক্ষিক করমর্দনের দিন নির্ধারিত হতে পারছিল না।

আচম্বিতে একদিন বজ্রপাতের মতন শোনা গেল, হিটলারের সঙ্গে স্তালিন হাত মিলিয়ে ফেলেছেন, জার্মানির সঙ্গে রাশিয়ার অনাক্রমণ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে দশ বছরের জন্য! কমিউনিস্টরা ফ্যাসিস্তদের সঙ্গে হাত মেলাবে, এও কি সম্ভব? পশ্চিমি শক্তির সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রী আলোচনা তো পরিত্যক্ত হয়নি, মধ্যপথে অসমাপ্ত অবস্থায় ছিল, তারই মধ্যে গোপনে গোপনে জার্মানির সঙ্গে আলোচনা তো বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর! অবশ্য স্তালিনের পক্ষ থেকেও যুক্তি দেখানো যায় যে, ফরাসি-ইংরেজরা অনাবশ্যক বিলম্ব করে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছিলেন। এই বিলম্বের কারণ কি শর্তাবলি নিয়ে দ্বিধা, নাকি জার্মানি যদি এর মধ্যে রাশিয়া আক্রমণ করে বসে, তার জন্য অপেক্ষা? যাক শত্রু পরে পরে!

শুধু অনাক্রমণ চুক্তি নয়, রুশ-জার্মান বাণিজ্য চুক্তিও হয়ে গেল, জার্মানিকে তোয়াজে রাখার জন্য রাশিয়া থেকে পাঠানো হতে লাগল তুলনায় বেশি বেশি মালপত্র। চুক্তি স্বাক্ষরের দিনে বিশাল পানভোজনের আয়োজন হয়েছিল ক্রেমলিনে, জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যুৎসাহী স্তালিন সুরার পাত্র তুলে হিটলারের সঙ্গে স্বাস্থ্যপান করলেন।

স্তালিনের ষাটতম জন্মদিনে বন্ধুভাবাপন্ন সোভিয়েত রাশিয়া ও তার জনগণের উদ্দেশে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠাল হিটলার। উত্তরে স্তালিন জানালেন, রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মান জনগণের বন্ধুত্ব হবে সুদূরপ্রসারী ও দৃঢ়।

এই চুক্তি সারা বিশ্বের কমিউনিস্টদের খুব ফাঁপরে ফেলে দিয়েছিল। মানব সভ্যতার শত্রু ফ্যাসিস্তদের সঙ্গে মিতালি? বছরের পর বছর তাঁরা ফ্যাসিবাদের মুণ্ডপাত করে এসেছেন, এখন সেসব গিলে ফেলতে হল, জার্মানির বিরুদ্ধে আর কেউ একটি কথাও বলেন না। বরং বলা হতে লাগল, এই অনাক্রমণ চুক্তির ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়ে শান্তির আবহাওয়া ফিরে এসেছে। পশ্চিমি দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী, ওরাই যুদ্ধ চায়।

হিটলার যেমন চতুর, তেমনই তার মিথ্যে কথা বলার অসাধারণ ক্ষমতা। শুধু কমিউনিস্ট নয়, সমগ্র রুশ জাতির প্রতিই তার মনে চরম ঘৃণা জমে আছে, অথচ স্তালিনের সঙ্গে প্রাণের সখা ভাব করে বার্তাবিনিময় চলতে লাগল, ধুরন্ধর স্তালিনও এই ধাপ্পা ধরতে পারেননি। স্তালিনের চেয়েও বেশি দায়ী তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ, যাঁর সম্পর্কে চার্চিল লিখেছেন, 'আধুনিক কালের নিখুঁত রোবটের মতন এমন মানুষ আমি আর একটিও দেখিনি, যার হাসি সাইবেরিয়ার শীতের মতন, যাঁর প্রতিটি কথা মেপে মেপে বলা, অবশ্য জ্ঞানীর মতোই, এই ভয়ংকর পৃথিবীতে তিনি সোভিয়েত নীতির সুযোগ্য মুখপাত্র', সেই মলোটভই হিটলারকে বিশ্বাস করে এই মৈত্রীচুক্তির প্রধান উদ্যোক্তা। শুধু তাই নয়, হিটলারের কার্যকলাপের সমর্থনে তিনি এমন কয়েকটি বিবৃতি দিয়েছেন, তা যেন স্রেফ নাতসি তোষামোদ। কমিউনিজমের ঘোষিত আদর্শ এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিরোধী এইসব কথাবার্তা পরবর্তীকালের সাম্যবাদী ঐতিহাসিকদেরও অস্বস্তিতে ফেলেছে। রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরের খবর পেয়েই হিটলার আনন্দে লাফাতে লাফাতে দেওয়ালে দু' হাতে কিল মেরে বলেছিল, এবার পৃথিবীটাকে আমি পকেটে ভরে ফেলেছি!

তার প্রথম পদক্ষেপ পোল্যান্ড আক্রমণ। এর আগে চেকোশ্লোভাকিয়া একেবারে উপঢৌকনের মতন হিটলারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, পোল্যান্ড আক্রমণে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণায় বাধ্য হল। শুধু যেন ঘোষণাই সার, তেমনভাবে বাধা দেওয়া গেল না, নাতসিবাহিনী বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে দখল করে নিল পোল্যান্ড। এই সুযোগে সোভিয়েত রাশিয়ার লাল ফৌজও ঢুকে পড়ল পোল্যান্ডের অন্য দিক দিয়ে, জার্মানদের কাছ থেকে বাধা পাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। পোল্যান্ডের পঁচাত্তর হাজার বর্গমাইল রাশিয়ার অধিকারে চলে গেল, হিটলার যেন সেদিকে তাকিয়ে রইল প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে। বন্ধুকে কেকের একটুখানি ভাগ তো দিতেই হয়। জার্মানির সঙ্গে পা মিলিয়ে পোল্যান্ডের মতন একটি স্বাধীন ও সর্বভৌম রাষ্ট্রকে গ্রাস করার মতন একটি অনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করতেও সোভিয়েত রাশিয়া দ্বিধা করেনি।

পোল্যান্ডের পর নরওয়ে এবং ডেনমার্ক গেল নাতসিদের কবলে। তারপর তারা মুখ ফেরাল পশ্চিম রণাঙ্গনে। প্রথমে হল্যান্ড, তারপর বেলজিয়াম, এবং দুর্ধর্ষ ফরাসি সৈন্যবাহিনীও রুখতে পারল না জার্মানদের, প্যারিসের পতন হল, ডানকার্ক থেকে পালাতে হল ইংরেজদের। এতদিনে প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়ের সত্যি সত্যি প্রতিশোধ নিল জার্মানি, আত্মসমর্পণে বাধ্য হল ফ্রান্স। ১৯১৮ সালে কম্পিয়েন ফরেস্টে একটি রেলের কামরায় বসে পরাজিত জার্মানি মাথা নিচু করে আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, বাইশ বছর পরে, সেই সংরক্ষিত রেলের

কামরাটিতেই সেই চেয়ারে এসে বসল হিটলার। এবারে বিজয়ী জার্মানি এখানেই ফ্রান্সকে মাথা নিচু করাতে চায়।

এর পর ইংল্যান্ডের পালা। ইংল্যান্ড এখন নিঃসঙ্গ, তাকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারলে জার্মানি হবে ইউরোপের একচ্ছত্র অধিপতি। ইংল্যান্ড দখল নয়, বশ্যতা স্বীকার করানোই হিটলারের উদ্দেশ্য। স্থলপথে হিটলার অসাধারণ রণনৈপুণ্য দেখিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু জলপথের যুদ্ধে তার আত্মবিশ্বাস কিছুটা কম। ইংলিশ চ্যানেল পেরুতে হলে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সম্মুখীন হতে হবে। বিখ্যাত স্প্যানিশ আর্মাডাও ইংল্যান্ডের কূলে ভিড়তে পারেনি, নেপোলিয়নও পার হতে পারেনি ইংলিশ চ্যানেল। হিটলার তাই ঠিক করল, আকাশপথে প্রচণ্ড আক্রমণ চালালে, বিশেষত লন্ডন শহরটাকে ভেঙে-চুরে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিতে পারলে ইংরেজরা ভয় পেয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য হবে।

শুরু হল বোমাবর্ষণ।

এর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যান্ড কুক্ষিগত করে নিয়েছে। যদিও এই ক্ষুদ্র দেশটি জয় করতে অপ্রত্যাশিত প্রত্যাঘাত ও রক্তক্ষয় করতে হয়েছে প্রচুর।

ইংল্যান্ডে এর মধ্যে পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক। প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের একচক্ষু হরিণের মতন স্বভাবে, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতায় পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে বসেছেন উইনস্টন চার্চিল। সুরা ও চুরুটে আসক্ত এই স্থূলকায় ব্যক্তিটির বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম এবং অসাধারণ তাঁর মনোবল। সেই মনোবল তিনি চারিয়ে দিলেন দেশবাসীর মধ্যে। ব্রিটেনকে সাহায্য করার আর কেউ নেই, তবু চার্চিল অনমনীয় দৃঢ়তায় ঘোষণা করলেন, কোনওক্রমেই আত্মসমর্পণ করা হবে না। দেশের মানুষের কাছে তিনি আহ্বান জানালেন, 'আমরা লড়ব, বেলাভূমিতে, আমরা লড়ব অবতরণ ক্ষেত্রগুলিতে, আমরা লড়ব মাঠে মাঠে, রাস্তায় রাস্তায়, আমরা লড়ব পাহাড় চূড়ায়, তবু আমরা কিছুতেই আত্মসমর্পণ করব না।'

বোমারুবিমান পাঠাবার আগে হিটলার হঠাৎ শান্তিবাদী হয়ে উঠল। যুদ্ধ তো প্রায় শেষই হয়ে গেছে, এখন বিজয়ী জার্মানির সঙ্গে ব্রিটেন সন্ধি করলেই সব ঝামেলা চুকে যায়। এই কপট শান্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন চার্চিল।

প্রথম দফায় উড়ে এল চারশো বিমান, জার্মানরা ভেবেছিল প্রথমেই ব্রিটেনের রয়াল এয়ারফোর্স ও বিমানঘাঁটিগুলো ধ্বংস করে দিতে পারবে। কিন্তু ব্রিটিশরাও তৈরি ছিল, জার্মান মেসারস্মিট্‌স, হেঙ্কেইল ও জুঙ্কার জঙ্গি বিমানগুলির মুখোমুখি হল ব্রিটিশ বাহিনীর হারিকেন ও স্পিটফায়ার জঙ্গি বিমান, যুদ্ধ চলল আকাশে আকাশে। আকাশচারী বিহঙ্গরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে না, কাজেই সেই তুলনা দেওয়া চলে না, কিন্তু কুকুররা কামড়াকামড়ি করে, তাই এই যুদ্ধের নাম ডগ ফাইট। হিংস্র কুকুররা এখন আকাশে। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ পাইলটরা জার্মানদের তুলনায় অনেক বেশি সাহস ও কৃতিত্ব দেখাল, তাদের ক্ষয়ক্ষতিও কম।

ব্রিটেনে দশ লক্ষেরও বেশি গৃহ ধ্বংস বা আংশিক চূর্ণ হল, হতাহত হল প্রায় পঁচানব্বই হাজার মানুষ, লন্ডন শহর অর্ধেক বিধস্ত, তবু ব্রিটিশরা মনোবল হারাল না। লন্ডনের হাউজ অফ কমন্স বিধ্বস্ত হল, বোমাবর্ষিত হল বাকিংহাম প্যালেসে, তবুও রাজা ষষ্ঠ জর্জ তাঁর রানি ও সন্তানদের নিয়ে লন্ডন ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না। বোমাবর্ষণ একটু থামলেই কতটা কী ক্ষয়ক্ষতি হল তা নিজের চোখে দেখবার জন্য চার্চিল বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়।

প্রথম দফা বোমাবর্ষণে ব্রিটেনকে পর্যুদস্ত করতে না পেরে পরবর্তী প্রস্তুতির জন্য হিটলার থামল কিছুদিনের জন্য। এর পরেই শুরু হল অন্য নাটক।

পশ্চিম রণাঙ্গনে ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধরত জার্মানি যে পূর্বেও একটি রণাঙ্গন প্রস্তুত করবে, তা

যুদ্ধনীতির সহজ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না। কিন্তু হিটলার ব্রিটিশদের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধে আগ্রহী ছিল না, ব্রিটিশদের প্রতি তার জাতিগত বিদ্বেষও ছিল না। তখনও তার ধারণা, ব্রিটিশরা হার স্বীকার করতে বাধ্য হবে এবং সেটাই যথেষ্ট। প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলি দখল করে নেবার জন্য জার্মান সেনাপতিরা যে পরামর্শ দিয়েছিল, তাতেও কর্ণপাত করেনি হিটলার। তার মতে, ইহুদিরা মনুষ্য পদবাচ্যই নয় এবং রাশিয়ানরা অতি নিকৃষ্ট জাতি, এদের ধ্বংস করাই জার্মানদের কর্তব্য। রুশরা পোকামাকড়ের মতন বংশবৃদ্ধি করে, সুতরাং তাদের নির্বংশ করাই উচিত কাজ। সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে দেশটাকেই পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দিতে চায় হিটলার।

মনের মধ্যে এরকম তীব্র ঘৃণা পুষে রেখেও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ ও বাণিজ্য চুক্তির দৌলতে স্তালিনের সঙ্গে কত শুভেচ্ছা বিনিময় ও মলোটভের সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠক। এর মধ্যেই পূর্ব সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ও যুদ্ধ প্রস্তুতি চলছে গোপনে। কিন্তু যুদ্ধের সময় অনেক কিছুই গোপন রাখা যায় না, চতুর্দিকে গুপ্তচর ও প্রতি-গুপ্তচর গিসগিস করছে, অসম সাহসী সাংবাদিকরাও অনেক খবর ফাঁস করে দেয়, হিটলার অনাক্রমণ চুক্তি ছিঁড়ে ফেলে রাশিয়া আক্রমণে উদ্যত, এসব সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, তখনও স্তালিন তা বিশ্বাস করেনি, এমনকী যুদ্ধ ঘোষণার সাতদিন আগেও স্তালিনের নির্দেশে তাস নিউজ এজেন্সি থেকে প্রবলভাবে রুশ-জার্মান যুদ্ধ সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হল। স্তালিনের এই বিভ্রান্তির ব্যাখ্যা নেই। মলোটভ যখন ভোরবেলা ক্রেমলিনে জার্মান রাষ্ট্রদূতের মুখে হিটলারের অগুন্তি মিথ্যে অভিযোগ ও আক্রমণের কথা শুনলেন, তখনও যেন বুঝতে পারেননি, কেন এই যুদ্ধ! এই যুদ্ধ কি তাঁদের প্রাপ্য!

রাত তিনটে পনেরো মিনিটে রুশ সীমান্তে একসঙ্গে গর্জে উঠল ছ' হাজার কামান। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে বৃহত্তম ও নৃশংসতম যুদ্ধ। ন'শো তিরিশ মাইলব্যাপী সীমান্ত এই রণাঙ্গন। পরে তা আরও ছড়িয়ে হয়েছিল দু' হাজার মাইল। জার্মান পক্ষে ৫৫ লক্ষ সৈন্য, ৪৯৫০টি বিমান, ২৮০০ ট্যাঙ্ক, ৪৮ হাজার কামান, ১৯৩টি রণতরী। আক্রমণের আকস্মিকতায় রুশ বাহিনী দারুণভাবে পর্যুদস্ত হতে লাগল। যদিও তাদের সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্রসম্ভার খুব একটা কম ছিল না, কিন্তু জার্মানরা অনেকগুলি যুদ্ধে জয়ী হয়ে দক্ষতায় অনেক ঊর্ধ্বে, রুশ অস্ত্রগুলিও আধুনিক নয়। প্রথম চোদ্দো দিনেই দশ লক্ষ রুশ সৈন্য বন্দি হল জার্মানদের হাতে, ১২০০ বিমান ধ্বংস হয়ে গেল প্রায় মাটিতেই, কত নিহত হল তার ইয়ত্তা নেই, কারণ হিটলার ধরা-পড়া সৈন্য ও সাধারণ রুশ নাগরিকদেরও নির্মমভাবে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল।

লাল ফৌজের অদম্য বলে যে খ্যাতি ছিল, তা আর বিশ্বাসযোগ্য রইল না, সারা বিশ্বের চোখে স্তালিনও হেয় হয়ে গেলেন। লাল ফৌজের এই ব্যর্থতার জন্যও পরবর্তীকালে স্তালিনকেই দায়ী করা হয়েছিল, কারণ, যুদ্ধ শুরুর দু'বছর আগে পার্জিং বা বিশুদ্ধিকরণের নামে, নিছক সন্দেহের বশে তিনি সেনাবাহিনীর ওপর মহলের বহু অফিসারকে অপসারণ ও মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। সুসংগঠিত ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী হিসেবে লাল ফৌজ গড়ে তুলেছিলেন ট্রটস্কি এবং তুখাচেভ্স্কি, এঁদের মধ্যে ট্রটস্কি নির্বাসিত এবং তুখাচেভ্স্কিকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গুলি করে মারা হয়। স্তালিন ব্যক্তিপূজার অবাধ প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে সামান্য মতভেদকেই ষড়যন্ত্র বলে গণ্য করা হত, সেনাবাহিনীর প্রায় কুড়ি হাজার অফিসারকে বিচারের প্রহসনে বা বিনা বিচারেও প্রাণ দিতে হয়েছে। এর ফলে, সেনাবাহিনীর মধ্যে নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়েছিল। শূন্য স্থানগুলিতে যেসব নতুনদের নিয়োগ করা হয়, তাদের কোনও যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই, ট্যাঙ্ক ও বিমান চালনার ঠিকমতন ট্রেনিংও পায়নি। সেই জন্য জার্মান আক্রমণের শুরুতেই লাল ফৌজকে যেমন পিছু হঠতে হল, তেমনই অস্ত্র-সরঞ্জামের

ক্ষয়-ক্ষতিও হতে লাগল প্রচণ্ড।

আর একটি ব্যাপারেও ব্যাখ্যা মেলে না, এ রকম ভয়ংকর, বিধ্বংসী যুদ্ধ শুরু হবার পর, বারো দিনের মধ্যেও স্তালিন সম্পূর্ণ নীরব। এ রকম একটা সংকটে, জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণ দিয়ে তাদের নৈতিক বল বজায় রাখা, শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইতে তাদের উদ্বুদ্ধ করা এবং যুদ্ধের সময় কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে সজাগ থাকার কথা জানানোই কোনও রাষ্ট্রনেতার প্রধান কর্তব্য। স্তালিন সেসব কিছুই করলেন না। তিনি কি প্রাথমিক আঘাতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন?

বরং, এই যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বি বি সি-তে এক ভাষণ দিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন চার্চিল। সুদক্ষ ব্রিটিশ গোয়েন্দাবাহিনী মারফত তিনি আগেই এই যুদ্ধের নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা জানতে পেরেছিলেন, স্তালিনকে সাবধান করে দেবার জন্য বার্তাও পাঠিয়েছিলেন, স্তালিন তা গ্রাহ্য করেননি। চার্চিলের বক্তব্যকে মূল্যই বা দেওয়া হবে কেন, মনে করা হয়েছিল, নিজেরা নাতসিদের সঙ্গে যুদ্ধে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে, এখন ছলছুতো করে রাশিয়াকেও যুদ্ধে জড়াতে চায়। নইলে সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল ও কমিউনিজমের শত্রু চার্চিলের মাথাব্যথা হবে কেন রাশিয়ার এই বিপদে? এ রকম গুজব ছড়াবার জন্য ভর্ৎসনা করা হয়েছিল মস্কোর ব্রিটিশ রাজদূতকে।

দেড় বছর আগে রাশিয়া-জার্মানির অনাক্রমণ চুক্তিতে সারা বিশ্বে যেমন বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছিল, তেমনই বিস্ময়ের ব্যাপার হল চার্চিলের এই বেতার ভাষণ। আবেগমথিত ভাষায় তিনি বিপন্ন রাশিয়াকে সাহায্যের প্রস্তাব দিলেন। শুধু ব্রিটেনের পক্ষ থেকেই নয়, আগেই তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে এ ব্যাপার জানিয়েছিলেন, রুজভেল্টও সবরকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বক্তৃতার মধ্যেই চার্চিল স্বীকার করলেন, গত পঁচিশ বছর ধরে আমার চেয়ে আর কেউ এমন ক্রমান্বয়ে কমিউনিজ্‌মের বিরোধিতা করেনি, কিন্তু এখন সে সব প্রশ্ন অবান্তর। আমি দেখতে পাচ্ছি রাশিয়ান সৈন্যরা দাঁড়িয়ে আছে তাদের জন্মস্থানে, তাদের পিতৃপিতামহরা যে জমি চাষ করে গেছে, পাহারা দিচ্ছে সেই ফসল...দেখতে পাচ্ছি সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে তাদের বাসগৃহ, যেখানে তাদের মায়েরা ও বধূরা প্রার্থনা করছে নিরাপত্তার, আমি দেখতে পাচ্ছি হাজার হাজার রাশিয়ান গ্রাম, যেখানে ভূমি থেকে উৎপাদনই বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়, তবুও যেখানে প্রবাহিত হচ্ছে জীবনের প্রাথমিক আনন্দ, যেখানে শিশুরা খেলার মধ্যে হাসে...আমি সেখানে দেখতে পাচ্ছি জার্মান বোমারু বিমান, নির্বিচারে হত্যা ও ধ্বংস করে চলেছে...আমি দেখতে পাচ্ছি একটি ছোট শয়তান গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে সুসংহত হয়ে এই বীভৎস ধ্বংসলীলা চাপিয়ে দিচ্ছে মানবজাতির ওপর...।

চার্চিলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার মতন একজন ঘোরতর কমিউনিস্ট বিরোধী ভোল পাল্টালেন কেন? এটা কি আপনার মাথা নিচু করার মতন একটা ব্যাপার হচ্ছে না? চার্চিল জবাব দিয়েছিলেন, মোটেই না। আমার একটিই মাত্র উদ্দেশ্য, তা হচ্ছে হিটলারকে ধ্বংস করা! যদি হিটলার নরকে গিয়েও আক্রমণ চালাত, তা হলেও আমি হাউজ অফ কমন্‌সে শয়তানের সপক্ষে ভালো কিছু বলতাম!

বারো দিন পর স্তালিন তার নীরবতা ভঙ্গ করে ভাষণ দিলেন মস্কো বেতারে। তাতে আবেগ নেই, উদ্দীপনা নেই। শান্ত কঠিন গলায় তিনি দেশবাসীকে জানালেন যে দেশ আজ কত গুরুতর বিপদের সম্মুখীন। লাল ফৌজের সাময়িক পরাজয় ও কিছু কিছু গ্রাম-নগর যে নাতসিবাহিনীর দখলে চলে গেছে, তা স্বীকার করলেন এবং বিস্তারিত প্রতিরোধ-প্রস্তুতির কথাও শোনালেন। ঘোষিত হল পোড়া মাটি নীতি।

এই ভাষণেই স্তালিন চার্চিলের ঐতিহাসিক ঘোষণা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যদানের

প্রস্তাবের উল্লেখ করে ওই দুই দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন। নাতসি বাহিনীর বর্বরতার বিরুদ্ধে তিন দেশের সংগ্রাম পরিচালিত হবে এক সঙ্গে।

রাজনীতির পাশাখেলা কী বিচিত্র! কয়েক মাস আগেও জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে সুসম্পর্ক রাখার কত প্রতিশ্রুতি, কত গলা জড়াজড়ি ও খানাপিনা, এখন তারা মারাত্মক শত্রু। কিছুদিন আগেও মলোটভ বলেছিলেন, জার্মানি নয়, ফ্রান্স ও ব্রিটেনই আক্রমণকারী, তারাই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে, এখন সেই ব্রিটেন ও তার সূত্রে আমেরিকাকে সহযাত্রী হিসেবে না পেলে চলবেই না।

হিটলার ভেবেছিল, মাত্র আট সপ্তাহের মধ্যেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করা যাবে। এত বড় দেশটা অধিকারে রাখা বাস্তবসম্মত নয়, রাশিয়ার মেরুদণ্ডটা ভেঙে দেওয়াই দরকার। লেনিনগ্রাড শহরটাকে ভেঙে, গুঁড়িয়ে মিলিয়ে দিতে হবে ধুলোয়, যাতে সে শহর একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, মস্কো রাখতে হবে নিজেদের দখলে, বড় বড় কল-কারখানা, শস্যভাণ্ডার, তেল ও কয়লাখনি অধিকার করে রেখে এ দেশের মানুষদের মারতে হবে না খাইয়ে রেখে।

প্রথম দিকে পর পর অতি দ্রুত সাফল্যে হিটলারের অহমিকা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেল। নেপোলিয়ান যা পারেনি, সে তা অনায়াসে পারবে ধরে নিয়ে, সেনাপতিদের মতামত উপেক্ষা করে নিজেই নির্ধারণ করতে লাগল রণনীতি। আত্মম্ভরিতার সঙ্গে যুক্ত হল পাগলামি। মস্কো শহরের উপান্তে পৌঁছেও, চরম আঘাত হানার সুযোগ ছেড়ে যুদ্ধের গতি ঘুরিয়ে দিল ইউক্রাইনের দিকে। তাতে ইউক্রাইন দখল হল বটে, ফাঁদে পড়ে রুশ সৈন্যবাহিনীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শেষও হয়ে গেল, কিন্তু এর মধ্যে এসে গেল শীত। রাশিয়ার প্রধান সেনাপতি এই শীতের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে নেপোলিয়ানও ব্যর্থ হয়েছিলেন, নাতসি বাহিনীও মস্কোর অন্দরে প্রবেশ করতে পারল না। অবশ্য প্রথম দিকের বিহ্বলতা কাটিয়ে রুশ সৈন্যবাহিনী এর মধ্যে মরিয়া সংগ্রামেও প্রস্তুত হয়ে পড়েছে, দুর্জয় জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের প্রাণপণ লড়াইও অভূতপূর্ব। যে-কোনও দিন মস্কোর পতন আসন্ন, এই আশঙ্কা সারা মুক্ত দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তবু মস্কো টিকে গেল।

মস্কো রক্ষায় বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে লাল ফৌজের সুনামের কিছুটা পুনরুদ্ধার হয়। স্তালিনের সম্মানও বাড়ে। বেতার ভাষণে স্তালিন ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তির কৈফিয়ত হিসেবে বলেছিলেন, এর ফলে তিনি রাশিয়ার সমর প্রস্তুতির সময় পেয়েছিলেন। এই কৈফিয়ত যুক্তিগ্রাহ্য হয়নি, এই কি সমর প্রস্তুতির নমুনা? তা হলে জার্মানদের হাতে এমন প্রচণ্ড মার খেতে হল কেন? এখন সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, জাতীয়তাবাদ প্রচার করে দেশবাসীর মনোবলও দৃঢ় করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু শুধু সৈন্য সংখ্যা ও জাতীয়তাবাদ দিয়ে তো দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীর সর্বত্র গতিরোধ করা যাবে না। রসদ চাই। রাশিয়ার গাড়ির উৎপাদন খুবই কম, প্লেন বানাবার জন্য যথেষ্ট অ্যালুমিনিয়াম নেই, আরও গোলাগুলি ট্যাঙ্ক ও কাঁচামাল চাই। শীতের পর বসন্ত আসবে, বরফ ও কাদা শুকিয়ে গেলেই জার্মান আক্রমণ আবার তীব্র হবে, তখন যুদ্ধ চালাবার জন্য ওইসব প্রয়োজনীয় রসদ না পেলে রাশিয়ার ভরাডুবির সম্ভাবনা। ওইসব রসদ সরবরাহ করতে পারে একমাত্র আমেরিকা। কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এক ভাষণে বলেছিলেন, আমেরিকা হচ্ছে 'গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার'। তিরিশের দশকে মন্দার অবস্থা কাটিয়ে উঠে আমেরিকা এখন ধনসম্পদে অতুলনীয়, এত গাড়ি, এত তেল, এত অর্থ নিয়ে কী করবে, নিজেরাই যেন ভেবে পাচ্ছে না।

রুজভেল্ট রাশিয়াকে সাহায্য করতে আগ্রহী। তিনিই প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়ে সোভিয়েত রাশিয়াকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কর্জ ও ইজারা হিসেবে মিত্রপক্ষকে যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্র ও কাঁচামাল পাঠাবার জন্য আইন পাস করিয়েছেন, বছরে পঞ্চাশ হাজার বিমান বানাবার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু স্তালিন যদি শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে না পারেন, রাশিয়া

যদি পরাজয় স্বীকার করে, তা হলে ভস্মে ঘি ঢেলে লাভ কী? সরেজমিনে অবস্থাটা বোঝার জন্য রুজভেল্টের দূত হপকিন্স দুবার এলেন স্তালিনের সঙ্গে দেখা করতে। স্তালিনের ব্যক্তিত্ব ও রাশিয়ার মানুষদের সম্পর্কে আমেরিকানদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। তারা কমিউনিস্ট জুজু সম্পর্কেই চিন্তা করেছে, কমিউনিস্টরাও যে মানুষ, তা ভেবে দেখেনি।

স্তালিনের সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হলেন হপকিন্স, বুঝলেন, এ মানুষ এমনই এক ধাতুতে গড়া, পরাজয় স্বীকার করা যে ধাতুতে নেই। সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো হল জ্যাকসনকে, অত্যুৎসাহে স্তালিন এমনও বলে ফেললেন, আমেরিকা যদি সৈন্যবাহিনী পাঠাতে চায়, তা হলে তিনি রাশিয়ার ভূমিতে তাদের স্বাগত জানাবেন!

কিন্তু আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করেনি, তার সঙ্গে কোনও সমর চুক্তি সম্ভব নয়। আমেরিকার কিছু মানুষ ইউরোপের নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় আমেরিকার নাক গলানোর বিরোধী, আবার প্রগতিশীল কিছু মানুষ, যাঁদের মধ্যে হেমিংওয়ে, ড্রেইজার, সিনক্লেয়ার, পল রোবসন-এর মতন লেখক বুদ্ধিজীবীরা রয়েছেন, তাঁরা এবং আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টি এই সংকটে সোভিয়েত জনগণকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন।

তারপর এক ডিসেম্বরের সকালে আচম্বিতে ১৮৯টি জাপানি বিমান পার্ল হারবারে এসে বোমাবর্ষণ করে গেল। সেই খবর শোনার পর চার্চিল বলেছিলেন, সেটাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় দিন। দেড় বছর ধরে তাঁকে একা যুদ্ধ করতে হয়েছে, এবার আমেরিকাকে দলে পাবেন। এবার ব্রিটেন বাঁচবে, ব্রিটেনের সাম্রাজ্য বাঁচবে।

রেডিয়োতে খবরটি শোনার পরেও চার্চিল তা যাচাই করার জন্য টেলিফোন করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে। রুজভেল্ট বললেন, হ্যাঁ, যা শুনেছেন তা সত্যি। আমেরিকা এবার যুদ্ধে যোগদান করছে। উই আর অল ইন দা সেম বোট নাউ!

জীবিত অবস্থাতেই স্তালিন একটি শহরের নাম রেখেছিলেন নিজের নামে। সেই স্তালিনগ্রাডের লড়াই যুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এই যুদ্ধের নৃশংসতা, ও ধ্বংসলীলাও অতুলনীয়। আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ চলে মাসের পর মাস, জার্মানরা শহরটি দখল করে চূর্ণবিচূর্ণ করতে থাকে, যাকে সামনে পায় তাকেই হত্যা করে, রুশ বাহিনীর পাল্টা আক্রমণও একই রকম নির্মম, লড়াই হয় শহরের পথে পথে, শেষ পর্যন্ত নাতসিরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। এই প্রথম জার্মানদের দারুণ অপমানজনক পরাজয়। এর পরই সোভিয়েত রাশিয়া অন্যতম প্রধান বিশ্বশক্তি হিসেবে গণ্য হয়।

মিত্রশক্তি হিসেবে জোট বাঁধে রাশিয়া, ব্রিটেন ও আমেরিকা, তার বিরুদ্ধে জার্মানি, ইতালি ও জাপানের অক্ষশক্তি। তেতাল্লিশ সালের শুরুতেই মোটামুটি বোঝা যায়, অক্ষশক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তার পরেও বিরাট প্রশ্ন থেকে যায়, এ যুদ্ধ কতদিন চলবে, আরও কত ক্ষয়ক্ষতি ও মনুষ্যজীবন বিনষ্ট হবে। মিত্রশক্তির মধ্যে তা নিয়ে শলাপরামর্শ চলে অবিরাম, কিন্তু তিন প্রধানের একবারও বৈঠক হয়নি। সেই কারণেই তেহরানের শীর্ষ সম্মেলন এত গুরুত্বপূর্ণ।

তেহরানে যাবার আগে রুজভেল্ট সদলবলে পৌঁছলেন কায়রোতে। চার্চিল আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত। সেখানে চিনের চিয়াং কাইসেককেও ডেকে আনা হয়েছে। রুজভেল্ট চিয়াং-এর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা সেরে নিতে চান। জাপানকে ঠাণ্ডা করতে হলে তাঁর চিনের ভূমি ব্যবহার করা প্রয়োজন। চিনের অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব খারাপ, ভয় পেয়ে যদি রণে ভঙ্গ দেয়, তাতেও অনেক মুশকিল। বহু বছর ধরে জাপান জ্বালিয়ে মারছে চিনকে, তাই চিয়াং কাইসেক চান আমেরিকার সহায়তায় জাপানের বিজয় অভিযান রুখে দিতে। বার্মা অভিযানের একটি পরিকল্পনাও তিনি করে এনেছিলেন, কিন্তু তাতে চার্চিলের প্রবল আপত্তি। ব্রহ্মদেশ অভিযানে জল-জঙ্গল-পাহাড়ের অনেক অসুবিধের অজুহাত দেখিয়ে চার্চিল বললেন, সেখানে যথেষ্ট নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীও নিয়োগ করা যাবে না। কারণ, পশ্চিম রণাঙ্গনে দ্বিতীয় ফ্রন্ট

খোলাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

চার্চিলের আপত্তির আসল কারণ অন্য। এই ব্যক্তিটি অতিশয় গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক তিলও তিনি হারাতে রাজি নন। যুদ্ধের সময় এশিয়ার কলোনিগুলোতে স্বাধীনতার দাবি প্রবল হয়ে উঠেছে, তার তিনি তোয়াক্কা করেন না। বিশেষত ভারতের ব্যাপারে তিনি অতিশয় স্পর্শকাতর। রুজভেল্ট ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে। কারণ আমেরিকাই তো ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হয়েছে। তিনি সাম্রাজ্যবাদেরও সমর্থক নন, (যদিও পরবর্তীকালে আমেরিকা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের অধীশ্বর হয়, কিন্তু তখন সে প্রশ্ন ওঠেনি।) এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল। চার্চিল সে প্রসঙ্গ উত্থাপনই করতে দিতে চান না। বর্মা যুদ্ধও নিজেরাই লড়ে সেখানে ইংরেজ রাজশক্তির সম্মান রক্ষা করতে বদ্ধ পরিকর।

এরপর চিয়াং কাইসেককে বাদ দিয়ে চার্চিল ও রুজভেল্ট পৌঁছলেন তেহরানে। তেহরান নোংরা ঘিঞ্জি শহর। রাস্তাগুলো সরু সরু, বহু রকম গুপ্তচররা সেখানে গিজগিজ করছে। তিন প্রধানকে হত্যা করারও চেষ্টা হতে পারে। তাই রাশিয়ার পক্ষ থেকে রুজভেল্টকে অনুরোধ জানানো হল রুশ দূতাবাসে আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য। রুশ দূতাবাস অনেক বড়, অতিশয় সুরক্ষিত, দাঁত খোঁচাবার খড়কে যে এনে দেয় সেও আসলে পিস্তলধারী গোয়েন্দা।

রুজভেল্ট রাজি হলেন। রাশিয়ার দূতাবাসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট! এই মহামান্য অতিথির কী খাতির! চার্চিল আসবার আগেই স্তালিনের সঙ্গে দেখা হল রুজভেল্টের। ধনতন্ত্র ও সাম্যবাদের দুই প্রতিভূর এই প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎকার। পটভূমিকায় হিটলার, তাই দু'জনে এত কাছাকাছি এসেছেন, দু'জনেই সৌজন্য ও আন্তরিকতার প্রতিমূর্তি।

সারা বিশ্বের যুদ্ধ পরিস্থিতি আলোচনা করতে করতে এশিয়ার উপনিবেশগুলির প্রসঙ্গ আসতেই রুজভেল্ট বললেন, খবরদার, ভারতের সমস্যা নিয়ে যেন চার্চিলের কাছে কথা তুলবেন না। স্তালিন মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, এই বিষয়টা অবশ্যই অস্বস্তিকর। রুজভেল্ট বললেন, একেবারে তলা থেকে ভারতের সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত, স্তালিন বললেন, তলা থেকে সংস্কার মানে বিপ্লব!

এর পর ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ভারতের প্রসঙ্গ উঠল না, ইউরোপীয় যুদ্ধ পন্থাই গুরুত্ব পেল। ভারতে যে কী অবস্থা চলছে, তা কিছুই জানতে পারলেন না দুই শীর্ষ নেতা। সেখানকার গণ-আন্দোলন, সেখানকার দুর্ভিক্ষের কথা চাপা পড়ে রইল।

যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে। কেউ সৈনিক হিসেবে প্রাণ দেয়, কেউ দেশ রক্ষার জন্য আত্মদান করে। আর লক্ষ লক্ষ ভারতীয়, যাদের সঙ্গে যুদ্ধের কোনও সংস্রব নেই, যারা কখনও অস্ত্র ধরেনি কিংবা ধরতে জানে না, তারা প্রাণ দিতে লাগল শুধুমাত্র খাদ্যের অভাবে। রাস্তায় রাস্তায় কঙ্কালসার মৃতদেহ। খিদের জ্বালায় মা বিক্রি করে দিচ্ছে ছেলেমেয়ে, স্বামী বিক্রি করে দিচ্ছে স্ত্রীকে। তবু তারা বাঁচবে না। উপবাস ডেকে আনে নানারকম ব্যাধি, তার কোনও চিকিৎসা নেই। অন্তত সাতাশ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু প্রাণ হারাল তেতাল্লিশ সালের এই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে। অকারণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কোনও ইতিহাসে এদের কথা লেখা থাকবে না।

পাঁচ

টাউন স্কুলের শিক্ষক কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় মাইজপাড়া গ্রাম থেকে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের আনিয়ে নিলেন কলকাতায়। সেখানে তারা অনাহারের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। অনাচারের বিপদের সম্ভাবনাও কম ছিল না।

জাপানি আক্রমণের ভয়ে যেমন বহু মানুষ শহর ছেড়ে পালিয়েছে দূরে, তেমনই হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসছে কলকাতার দিকে। এরা সব ক্ষুধার্ত, নিরন্ন নারী-পুরুষ-শিশু। গ্রামে খাদ্য নেই, শহরে কিছু না-কিছু পাওয়া যাবেই, এই আশায়। কলকাতার মতন পরিচ্ছন্ন, শোভন-সুন্দর শহরে এই প্রথম দেখা গেল পথে শুয়ে থাকা এত মানুষ। তাদের সমস্ত রকম জৈবিক প্রক্রিয়া সারা হয় এই পথের সংসারে।

ব্রহ্মদেশ বা বার্মা অধিকার করে বসে আছে জাপানিরা। বাঙালিরা বার্মাকে বলে বর্মা। ভীষ্মলোচন শর্মা যখন গান ধরেন, তখন সেই আওয়াজ শোনা যায় দিল্লি থেকে বর্মা। এই বর্মা মুলুক বাঙালিদের কাছে বেশ পরিচিত, সেখানে প্রচুর বাঙালির বসতি, অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে গুছিয়ে বসেছিল, জীবিকা বা ভাগ্যসন্ধানী যুবকেরা বর্মায় পাড়ি দিত, যেমন গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। জাপানি হানার পর ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালাতে শুরু করল বাঙালি তথা ভারতীয়রা। শুধু ভয় নয়, ভারতীয়-বিতাড়নও শুরু হয়েছিল। পলাতকদের অনেককেই আসতে হয়েছে পায়ে হেঁটে, বর্মা ও অসমের দুর্গম, বিপদসঙ্কুল পাহাড় ও জঙ্গল পেরিয়ে, বেশ কিছু মানুষ শেষ পর্যন্ত পৌঁছতেও পারেনি। সেই উদ্বাস্তু ও শরণার্থীরাও আশ্রয় নিতে লাগল কলকাতায়।

জাপানিরা সেই যে খেলাচ্ছলে একবার বোমা ফেলে দিয়েছিল, আর তাদের পাত্তা নেই। কলকাতা দখল করতে চায় কি না, সে ব্যাপারে যেন মনস্থির করতে পারেনি। শহরের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, কিছু কিছু স্কুল কলেজ খুলেছে, আমার বাবা এর মধ্যে এখানে-সেখানে টুকিটাকি পার্ট টাইম কাজ করে কোনওক্রমে চালাচ্ছিলেন, স্কুলের চাকরিটা আবার ফিরে পেলেন। এবারেই এসে আমরা উঠলাম গ্রে স্ট্রিটের (এখন শ্রীঅরবিন্দ সরণি। অরবিন্দ ঘোষ ওই রাস্তারই একটি বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন) একটা উপ-পথ, দুর্গাদাস মুখার্জি স্ট্রিটের একটি বাড়িতে। একতলায় দু'খানা ঘর, আলো-বাতাস প্রায় বর্জিত। পূর্ববঙ্গের লোকেরা দেশের বাড়িটাকে মনে করত আসল বাড়ি, শহরের ভাড়াবাড়িকে বলে বাসা। আমার স্কুলের বন্ধুরা ঠাট্টা করে, তোরা কি পাখি যে বাসায় থাকিস? বাঙাল-ঘটির ঝগড়া নিত্য তিরিশ দিনের, তবে তা সীমাবদ্ধ থাকত রঙ্গ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, কখনও কখনও হাতাহাতিতেও পর্যবসিত হত মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার মাঠে।

খাঁটি কলকাতার লোকরা বাঙালদের খানিকটা নিচু চোখে দেখত, মনে করত তারা অমার্জিত, যদিও বাঙালদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা এদিককার চেয়ে বেশি। তবু এরকম একটা ধারণা গড়ে ওঠার কারণ, খোলামেলা জায়গায় মানুষ বলে বাঙালরা সাধারণত চেঁচিয়ে কথা বলে, কারুর কারুর অতি তুচ্ছ কথাও ধমকের মতন শোনায়। কলকাতা তথা নদীয়া-কৃষ্ণনগরের ভাষা বাংলা সাহিত্যের স্ট্যান্ডার্ড ভাষা বলে গৃহীত হয়েছে। সেই তুলনায় পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির ভাষাকে গ্রাম্য ও অপরিশীলিত মনে হয়। বঙ্কিমবাবু থেকে অনেক লেখকই বোকা বা ভাঁড় ধরনের চরিত্রের মুখে বাঙাল ভাষা বসিয়েছেন। দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে

বিভিন্ন জেলার ভাষা নিয়ে যাতে কোন্দল শুরু না হয় সেজন্য বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর শহীদুল্লা সাহিত্যে প্রচলিত কৃষ্ণনগরের ভাষাকেই সেখানকার স্ট্যান্ডার্ড ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তাঁর সেই দূরদর্শিতার জন্য খণ্ডিত বাংলার দুই দিকেই সাহিত্যের ভাষা একই বাংলা, বাড়ির বাইরের ব্যবহারিক ভাষাও প্রায় এক।

আমাদের পাশের ঘরে থাকতেন দুই যুবক, অশোকরতন ও প্রফুল্লরতন নামে দুটি কলেজের ছাত্র। এদের পদবি গঙ্গোপাধ্যায় হলেও আমাদের সঙ্গে কোনও পারিবারিক সম্বন্ধ ছিল না, গ্রাম সম্পর্কে আত্মীয়। পূর্ববঙ্গের অজ পাড়াগাঁ'র ছেলেরা কলেজে পড়ার জন্য চলে আসত কলকাতায়, চেনাশুনো কারুর বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকাই তার বেশি পছন্দ হত, না পেলে অগত্যা মেসে বা হস্টেলে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবেই, এই দৃঢ় জেদে পড়াশুনোয় খুব মনোযোগী হত। দু'জনকে দিনরাত পড়তে দেখতাম। অশোকরতন কৃতবিদ্য হয়েছিলেন, প্রফুল্লরতন হয়েছিলেন 'যুগান্তর' পত্রিকার সাংবাদিক এবং ইউনিয়নের কেউকেটা। তখন অবশ্য তাঁর সাংবাদিকতার দক্ষতা কিংবা রাজনীতিপ্রবণতার কোনও প্রমাণ পাইনি, তবে হঠাৎ এক এক দিন তিনি ঘরের আলো নিবিয়ে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে উচ্চৈস্বরে গান গাইতেন। বড় করুণ সেই গানের সুর, তাতে ফুটে উঠত গ্রামজীবনে ফিরে যাবার ব্যাকুলতা।

সেবারে কলকাতায় এসে আমারও খুব মন কেমন করত গ্রামের জন্য। খাওয়াদাওয়ার কষ্ট ছিল, চোর-ডাকাতের উপদ্রবে হয়তো আর বেশি দিন টেঁকা সম্ভব হত না, তবু সেই জলাভূমি, পাটখেতে লুকোচুরি, নৌকো ভ্রমণ ও অনেকখানি যখন-তখন রং-বদলানো আকাশ মন জুড়ে বসেছিল, ইস্কুলটাও পছন্দ হয়েছিল খুব। একজন সহপাঠীর কথা কোনও দিনই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। আমারই পাশে বসত সে, তার নাম ইয়াকুব, সাদামাটা চেহারা, চোখ দুটি জুলজুলে ধরনের, তার মতন মিথ্যেবাদী কেউ কখনও দেখেনি। আমার চেয়ে দু'এক বছরের বড়, অর্থাৎ দশ কি এগারো, ওই বয়েসেই এমন দুর্ধর্ষ মিথ্যেবাদী সারা পৃথিবীতেই দুর্লভ। সে সত্যি কথা বলবেই না যেন প্রতিজ্ঞা করেছে। সে পুঁটি মাছের ঝাল খেয়ে এসে বোয়াল মাছের ঢেঁকুর তোলে। তার স্কুলে আসতে দেরি হয়, কারণ রাস্তায় একটা বুনো ভাল্লুক তাকে তাড়া করে। হাসিমারা নামের কোনও এক সুদুর স্থান থেকে তার চাচা একটা হরিণ এনে বাড়িতে রেখেছে, আমরা সদলবলে দেখতে গিয়ে জানতে পারি, তার এক কাকা হাট থেকে একটি ছাগল কিনে এনেছেন। তাদের পুকুরে কুমিরের উপদ্রব হয়েছে, এ গল্পটাও সে প্রায় বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিল। মিথ্যে কথা বলার জন্য সে মারও কম খায়নি, শিক্ষকদের হাতে, সহপাঠীদেরও, তবু সে মিথ্যে ছাড়বে না। আমি কিন্তু ইয়াকুবের প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। কোনও এক রহস্যময় কারণে ওই এগারো বছরের ছেলেটি বাস্তবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সর্বক্ষণ কল্পনার জগতে থাকতে চায়। আমরা যে-সব স্বপ্ন দেখি, সে তো আমাদের নিজেদেরই রচনা, ইয়াকুব জাগ্রত অবস্থাতেও নতুন নতুন দৃশ্য তৈরি করে। আমরা বর্ষার আকাশে শুধু বৃষ্টিই দেখি, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক, ইয়াকুব দাবি করে যে একটা বিদ্যুৎ মাটিতে এসে সাদা রঙের একটা আলোর রেখা হয়ে যায়, উনুনের ধোঁওয়ার মতন সেই আলোটা তাদের বাড়ির পেছনের ছাইগাদায় ঢুকে যায়, তারপরই সেখানে স্পষ্ট শোনা যায় একটা বাচ্চা মেয়ের খিলখিল হাসির শব্দ। ইয়াকুব নিজের কানে অন্তত তিনবার শুনেছে। আমার পাশে বসে সে ফিসফিস করে বলে যায় এইসব কাহিনী। নির্মাণে তার কোনও ক্লান্তি নেই। ইয়াকুবের বাবাকে দেখেছি, পোস্ট অফিসের পিওন, তার মা সাতটি সন্তানকে সামলাতে সারা দিন ব্যতিব্যস্ত। ইয়াকুব একদিন আমাকে বলল, ওঁরা দু'জন ওর আসল বাবা-মা নন। সে সিলেটের এক নবাববাড়ির সন্তান, ডাকাতরা সে বাড়ি আক্রমণ করে অনেক ধনরত্ন সমেত তাকেও সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। কিছুদিন তাকে রাখা হয় এক পাহাড়ের গুহায়, সেখানে তাকে পাহারা দিত একটা চিতাবাঘ, তারপর একদিন সাহেব পুলিশরা হানা দেয় সেই ডাকাতদের ডেরায়, চিতাবাঘটা গুলি খেয়ে মরে,

ডাকাতরা পালায়, পুলিশরা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। তারপর কোনও পরিবারে তাকে রাখা হলে হাজার টাকা ইনাম দেওয়া হবে শুনে বদরু মিঞা তাকে নিয়ে আসে বাড়িতে। এটা গল্পের বইয়ের মতন মনে হওয়ায় আমি সন্দেহ প্রকাশ করতেই সে আমাকে ধমকে দিয়ে বলে, তুই যাদের বাবা-মা বলে ডাকিস, তারা যে তোর সত্যি বাবা-মা, তা কি তুই হল্‌ফ করে বলতে পারবি? ইয়াকুবের কাছে একটা লকেট আছে, সেটাই প্রমাণ যে সে নবাব বংশের ছেলে, একদিন না একদিন সে ঠিক নিজের অধিকার আদায় করে নেবে। সত্যি হোক বা না হোক, কাহিনীটা আমার মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হতে থাকে, স্পষ্ট যেন দেখতে পাই, মশাল নিয়ে হইহই করে ছুটে আসছে দস্যুদল, একটা শিশুকে কোলে নিয়ে ছুটছে, একটা গুহার সামনে গরগর করতে করতে ঘুরছে একটা চিতাবাঘ....। শুধু তাই নয়, ইয়াকুবের মিথ্যে শুনতে শুনতে আমার কাছেও অনেক মিথ্যে সত্য হয়ে ওঠে, একটা ছাগলছানাকে দেখে হঠাৎ মনে হয় হরিণশিশু, একটা নিস্তরঙ্গ বিরাট দিঘির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, এই বুঝি এক্ষুনি একটা কুমির ভেসে উঠবে, বিদ্যুৎ চমকের পর মেঘগর্জন হয়, কখনও কানে তালা লাগে, তার মধ্যেই যেন শুনতে পাই কারা যেন খলখলিয়ে হাসছে।

মানুষ বয়েসের সঙ্গে পা ফেলতে ফেলতে অনেক কিছু শেখে। সব মানুষের জীবনেই বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ব্যাপারে এক একজন দীক্ষাগুরু থাকে। আমার কল্পনা উস্‌কে দেওয়ার প্রথম দীক্ষাগুরু ওই ইয়াকুব। সারাজীবনে তাকে আর কখনও দেখিনি।

কলকাতায় এসে আমাদের আর আহারের চিন্তা রইল না। শিক্ষকরা হতদরিদ্র শ্রেণীর হলেও তাঁদের একটা সামাজিক সম্মান ছিল। মূল্যবান বেশ-ভূষা সজ্জিত জবরদস্ত ধরনের ব্যক্তিও রাস্তায় মলিন চেহারার প্রাক্তন শিক্ষককে দেখলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। ছাত্রদের অভিভাবকরা শিক্ষকদের কোনও প্রয়োজনে সাহায্য করে স্বেচ্ছায়। মুদির দোকান ধার দেয় শিক্ষকদের। শিক্ষকের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়ার মাইনে লাগে না। বাজারদরের চেয়ে কমে বাবা চাল জোগাড় করে আনতেন, প্রায়ই রাত্রিবেলা টিউশানি সেরে তিনি বাড়ি ফিরতেন চালের থলি হাতে নিয়ে। একটা মস্ত বড় মাটির জালা কেনা হল, তাতে জমা হতে লাগল চাল, ভবিষ্যতে আরও কত দুর্দিন আসবে তা কে জানে! তবু গম নামে বস্তুটি এই প্রথম বাঙালির হেঁশেলে প্রবেশ করল। আটা নয়, ময়দা নয়, আস্ত গম, তা নিজেদেরই ভাঙাবার ব্যবস্থা করতে হয়। বিশেষত পূর্ববঙ্গের লোকেরা ভাত ছাড়া অন্য কিছুকে প্রধান খাদ্য মনে করে না। পাঁচখানা রুটি কিংবা দশখানা লুচি বা পুরি খেলেও মনে করে, এ তো জলখাবার, এরপর ভাত খেতেই হবে। কিন্তু অবস্থার বিপাকে এখন একবেলা ভাত, একবেলা রুটি চালু হয়ে গেল। চালের বদলে আস্ত গমের সঙ্গে ডাল মিশিয়ে একরকম খিচুড়িও তৈরি হয়, তার নাম ডালিয়া, তা নাকি খুবই পুষ্টিকর, কিন্তু স্বাদে কী আর আসল খিচুড়ির সঙ্গে তুলনা চলতে পারে!

দুপুরবেলা পিঁড়ি পেতে খেতে বসলেই বাইরে রব শুনতে পাই, মা, দুটি ভাত দাও! মা, একটু ফেন দাও! অন্য সময়েও পথে পথে এই একই রব, সারাক্ষণই, এমনকী গভীর রাত্তিরেও, কিন্তু নিজেরা ভাতের থালার সামনে বসলে এই আর্তচিৎকার বেশি বেশি কানে লাগে, খাদ্য বিস্বাদ হয়ে যায়। ভিখারিরা এখন আর পয়সা চায় না, শুধু ভাত কিংবা ফেন চায়। আমাদের খেতে দেবার আগে মা এক থালা ভাত কোনও একটি ভিখারি পরিবারকে দিয়ে আসেন, অনেক গৃহস্থই এরকম দিয়ে কিছুটা বিবেকের দায় মুক্ত হয়, তারপর বন্ধ রাখতে হয় সব দরজা জানালা, যাতে ওই কাতর স্বর আর কানে না আসে।

রাস্তায় যদি একজন মানুষকে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তবে তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ কেউ এগিয়ে আসে। কিন্তু শত শত ক্ষুধার্ত, বিপন্ন মানুষকে পড়ে থাকতে দেখলে লোকে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যায়, না দেখার ভান করে। দয়া, মায়া, মমতা এইভাবে শুকিয়ে যেতে থাকে। আমরা স্কুলে যাবার সময় দেখতে পাই, ফুটপাথে শুয়ে কাতরাচ্ছে কত শত

কঙ্কালসার নারী ও পুরুষ, প্রথম প্রথম বুকের মধ্যে কী রকম যেন করত, তা কি ভয় না অনুকম্পা, না অপরাধবোধ কে জানে, কিংবা সব মিলিয়ে একটা অনুভূতি। কিছুদিন পর গা-সহা হয়ে যায়। অনেক সময় ওদের ডিঙিয়ে রাস্তা পার হতে হয়। কোনও কোনও গৃহস্থ ঝাঁটা হাতে নিয়ে নিজেদের বাড়ির সদর দরজার সামনে থেকে ভিখিরি পরিবারদের বকে বকে সরিয়ে দেয়।

না খেতে পেয়ে মানুষ জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু দেখেছি, শিশুরা মোটা হয়, তাদের হাত-পা ফুলে যায়, পেটটা বেলুনের মতন, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, শিশুত্ব বলে কিছু থাকে না, অস্বাভাবিক চেহারা। মা কখন মরে গেছে, তার শিশু সন্তানটি তখনও মা মা বলে ডেকে তাকে ঠেলছে, এই দৃশ্যটিকে মনে হতে পারে স্টিরিওটাইপ কিংবা কষ্টকল্পিত, কিন্তু এ দৃশ্য অহরহ দেখা গেছে। চতুর্দিকে মানুষ কাঁদছে, মানুষ মরছে, আর যুদ্ধ চলছে অনেক অনেক দূরে।

চল্লিশের দশক বাংলায় মৃত্যুর দশক। কত মৃত্যু, কত হানাহানি পার হয়ে আসতে হয়েছে। যারা সেই মৃত্যুর দশক পার হয়ে আসতে পেরেছে, সেই আমরা যে কতখানি সৌভাগ্যবান, আমরা যে বেঁচে গেছি কত হত্যার পটভূমিকায়, তা আমরা অনেক সময়ই মনে রাখি না।

স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে আশু অর্থাৎ আশুতোষ ঘোষ আমাদের বাড়ির সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী। এ-ছাদ থেকে ও-ছাদ দেখা যায়, আমাদের গলি থেকে বেরিয়ে দু'পা গেলেই ওদের সদর। বড় রাস্তার ওপর বাড়ি, বনেদি দু' মহলা, দোতলায় দুটি ঝুল বারান্দা। একতলায় অনেক খালি ঘর পড়ে থাকে, দোতলায় ওঠার চওড়া কাঠের সিঁড়ি, কার্পেট পাতা, ইদানীং তা ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে অবশ্য, দোতলার দীর্ঘ দালানটি সাদা-কালো মার্বেলে চকমেলানো, একটি হলঘরে পুরনো আমলের সোফা সেটি, ঝাড়লণ্ঠন, দেওয়ালে বড় আকারের কয়েকটি ছবি, ইউরোপীয় চিত্রকরদের, আসল নয়, কপি। খাঁটি কলকাতার কায়েত যাকে বলে, ঘোষ-বোস-মিত্তির-দত্ত ইত্যাদি, ইংরেজ আগমনের পর এঁরাই এখানকার অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন, দূরদর্শিতার অভাবে সেসব ধরে রাখতে পারেননি, অবাঙালি ব্যবসায়ীরা এসে আস্তে আস্তে সব কুক্ষিগত করে নেবার পর এই কায়স্থ কুলতিলকদের সকলেরই অবস্থা তখন পড়ন্ত, এই ঘোষবাড়িটি সেই বিগত-মহিমা সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত।

এই বাড়িতে গিয়েই আমি কলকাতা কালচারের প্রথম স্বাদ পাই। আশুরা অনেক ভাই-বোন। একজন স্থায়ী শিক্ষক নিযুক্ত আছেন, তিনি থাকেন ও বাড়িতেই, সব ছেলেমেয়েদের পালা করে পড়ান। ওদের নিজেদেরই জন্য একটি লাইব্রেরি, পাড়ার ছেলেমেয়েরাও বই নিতে পারে সেখান থেকে। আশু ক্লাসের ভালো ছেলে, অনেক গল্পের বইও পড়ে, গান-বাজনার দিকে ঝোঁক আছে, খেলাধুলোও ভালোবাসে। আমাদের মতন গরিব বাড়িতে খাওয়া-পরার চিন্তাই প্রধান, ভবিষ্যতে চাকরি জোটানোর জন্য মন দিয়ে পড়াশুনো করতে হবে, এটাই ছিল পারিবারিক নির্দেশ, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, খেলা এগুলিও যে জীবনযাপনের অঙ্গ, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবার সময় পায়নি। এর আগে আমার খেলাধুলো বলতে ছিল ঘুড়ি ওড়ানো, গলির ছেলেদের সঙ্গে ড্যাংগুলি খেলা, (গাংগুলির সঙ্গে ড্যাংগুলির বেশ মিল দেওয়া যায় বলেই বোধহয় ওই খেলাটা আমি ভালোই পারতাম, আর চু-কিত কিত। পেছন দিকের বস্তির ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল, তারা সোডার বোতলের ছিপি ও বাটখারা দিয়ে একটা খেলা খেলত, সেটা দেখে প্রলুব্ধ হয়ে আমি গোপনে কয়েকবার তাদের সঙ্গে ওই খেলাতে যোগ দিয়েছি। আশুদের বাড়িতে প্রশস্ত উঠোনে ব্যাডমিন্টন খেলা হয়। কিছুদিন পর ঠাকুরদালানে টেবিল টেনিসের বোর্ড বসেছিল। আশু ভালো সাইকেল চালায় বলে আমিও সাইকেল শিখতে উদ্বুদ্ধ হলাম। আমাদের বাড়িতে গল্পের বই প্রায় ছিলই না, বাবার এদিকে ঝোঁক নেই, সময়ও পেতেন না। আমার মায়ের ছিল বই পড়ার নেশা, এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে বই

পড়তেন, আরও দু'-এক বছর পর মায়ের নামে বয়েজ ওন লাইব্রেরিতে মেম্বারাশপ নেওয়া হয়, প্রায় প্রতিদিন মায়ের জন্য দু'খানা করে বই আনতাম আমি। এবং মায়ের নেশার উত্তরাধিকার সূত্রে আমিও সে বই শেষ করি, তথাকথিত বড়দের বই হলেও কিছু যায় আসে না।

তার আগে, আশুদের বাড়ির লাইব্রেরিতে অনেক ছোটদের বই পেয়ে আমি দারুণ ক্ষুধার্তের মতন সেসব বই কামড়ে কামড়ে খেতে শুরু করেছি। আবিষ্কার করি হেমেন্দ্রকুমার রায়কে, শিবরাম চক্রবর্তীকে। দমদম মতিঝিলে আমার মায়ের মামার বাড়িতেও কিছু বই ছিল। সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা কি আমি চুরি করে এনেছিলাম? নইলে বইটি আমার সম্পত্তির অন্তর্গত হল কী করে, কেনার তো পয়সা ছিল না! যাই হোক, এতদিন পরে সেই চুরির স্বীকারোক্তি দিয়েই বা লাভ কী!

রবীন্দ্রনাথেরও আগে নজরুল ইসলামের কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। একজন মাস্টারমশাই কেন যেন ধরে নিয়েছিলেন যে আমার মধ্যে একজন সফল আবৃত্তিকার হবার বিরাট সম্ভাবনা আছে। তিনি নজরুলের ভক্ত, আমাকে নজরুলের কবিতা মুখস্থ করাতেন এবং বিভিন্ন পাড়ার জলসায় আমাকে উপস্থিত করাতেন শিশুশিল্পী হিসেবে। অল্পকালের মধ্যেই আবৃত্তিকার হিসেবে আমার বেশ নাম হয়েছিল। একটা গুট্‌লে মতন ছেলে মাথা নেড়ে নেড়ে নজরুলের লম্বা লম্বা কবিতা মুখস্থ বলছে দেখেই সবাই হাততালি দিত। মনে আছে, একবার ছায়া সিনেমার মঞ্চে একটা বড় ধরনের জলসায় আমার আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়ে সামনের সারির একজন দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে একটা মেডেল দেবেন বলে ঘোষণা করলেন। (ওই ঘোষণাই সার, সে মেডেল কখনও হাতে পাইনি। সেই সময় অনেক থিয়েটারে, গানের আসরে দর্শকদের মধ্য থেকে হোমরা-চোমরা কেউ এক এক জনের নামে মেডেল ঘোষণা করতেন। সে মেডেল ক'জন সত্যি সত্যি পেতেন, তাতে সন্দেহ আছে।)

কয়েক বছর পর ওই মাস্টারমশাই আমাকে নজরুলের কাছেও নিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন কবির জন্মদিন। নজরুল ইসলাম কী অবস্থায় আছেন, কথা বলতে পারেন কি না তা আমি তো কিছুই জানি না। জন্মদিনে অনেক লোক, প্রচুর ফুল, কেউ কেউ কবিকে নানা কথা জিজ্ঞেস করছে, তিনি কোনও উত্তর দিচ্ছেন না। কবির চোখের দৃষ্টি যে অস্বাভাবিক, তা একটি বালকও বোঝে। মাস্টারমশাইটি আমার পিঠে খোঁচা মেরে বলছিলেন, শোনা, শোনা, কবিকে তোর আবৃত্তি শোনা! আমার ভয় ভয় করছিল, মাস্টারমশাইয়ের তাড়নায় মুখ খুলবার আগেই কবি গলা থেকে ফুলের মালা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়াতে লাগলেন রাগত ভঙ্গিতে। ঘরের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেল।

নজরুল ইসলামকে সেই একবারই আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমার আবৃত্তিকার হয়ে ওঠার সম্ভাবনারও সেদিনই সমাপ্তি। সেই মাস্টারমশাইয়ের শত অনুরোধেও আমি জেদ ধরে থেকে আর কোনও জলসায় যাইনি।

আশুর বাবা অমিয়নাথ ঘোষ খুব সুপুরুষ ছিলেন। স্বল্পভাষী, দীর্ঘকায়, সঙ্গীতপ্রিয়। প্রতিদিনই বাড়ি ফেরার পথে তিনি কিছু না-কিছু বই কিনে আনতেন। এবং তাঁর মতন মধ্যবয়েসি লোকের পক্ষে যেটা স্বাভাবিক নয়। তিনি স্টল থেকে কিনে আনতেন নতুন নতুন পত্রিকা। এখন যাকে বলে লিট্‌ল ম্যাগাজিন। ছেলেমেয়েদের জন্য নয়, ওগুলি তিনি নিজেও পড়তেন। ও বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু করে অনেক পত্র-পত্রিকার নাম আমি জানতে পারি। 'দেশ' পত্রিকা সেখানেই প্রথম দেখি।

আশুর ঠাকুমা তখনও জীবিত। তাঁকে দেখা ও তাঁর কথা শোনা এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ঠিক যেন মহারানি ভিক্টোরিয়ার এদেশি সংস্করণ। যেমন ফর্সা রং, তেমনই বড়সড় চেহারা। ভিক্টোরিয়ার কণ্ঠস্বর কেমন ছিল আমি জানি না, এঁর গলার আওয়াজ বাজখাঁই। একটা ধমক শুনলে বুক কেঁপে উঠত। এঁর কথা বলার ভঙ্গি আমার মনে গেঁথে আছে, পরবর্তীকালে 'সেই

সময়' রচনার সময় কাজে লেগেছিল। এখন অত্যধিক বাঙালদের সংস্পর্শে খাঁটি কলকাতার ভাষা অনেকটা বদলে গেছে। নুচি, নেবু, নঙ্কা এখন আর শোনাই যায় না। বাঙাল ও ঘটিদের মধ্যে চন্দ্রবিন্দুগত পার্থক্য তো ছিলই, তা ছাড়াও ল ও ন এবং চ ও ছ-এর ব্যবহারবিধি বেশ কৌতূহলজনক। এদিকে ল সম্পর্কে দারুণ অনীহা। শুধু নুচি নেবু নঙ্কা নয়, লুকিয়ে হয়ে যেত নুকিয়ে, লাফানোর বদলে নাপানো, লেপ-এর বদলে নেপ। স্নানকে বাঙালরা বলে সান, কলকাতায় বলে চান। ছাপার অক্ষরে লেখা থাকে বিছানা, বাঙালরা বলে বিসানা, ঘটিরা বলে বিচ্‌না। করিচি, খেয়িচি, বলিচি তো আছেই, পালিয়িচি, ফুঁড়েচি, সব ছ-বর্জন। শুধু ছি-ছি করার সময় কেউই চি-চি বলে না।

ছাপার অক্ষর ও মৌখিক উচ্চারণ সম্পর্কে একটি ক্ল্যাসিক গল্প আছে বরিশাল জেলা সম্পর্কে। বরিশালে বেড়ালকে বলে মেকুর। স্কুলের ছাত্রপাঠ্য বই দেখে জোরে জোরে উচ্চারণ করে, ব-এ রস্বই, ড-এ শূন্য রয়ে আকার, আর ল=মেকুর!

মাইজপাড়া থেকে ফেরার পর কয়েক মাস বাদে জাপানিদের আবার কী খেয়াল হল, কলকাতায় কয়েকটা বোমা ফেলে গেল। আমাদের বাড়ির কাছেই হাতিবাগান বাজার, তার পেছনে খাটাল, শোনা গেল, সেই খাটালে একটা বোমা পড়ে পঞ্চাশটা মোষ মারা পড়েছে। এরকম বোমা তো কৌতুকের বিষয় হতেই পারে। বোমা নিয়ে অনেক ছড়া প্রচলিত হয়েছিল, তার মধ্যে একটি হল 'সা-রে-গা মা-পা-ধা-নি, বোম ফেলেছে জাপানি/ বোমের মধ্যে কেউটে সাপ/ ব্রিটিশ বলে বাপরে বাপ!' এই ছড়ার ভাবার্থেই প্রকাশ, সাধারণ মানুষ মনে করে জাপানিরা ভারতীয়দের মারতে চায় না, বোমা ফেলে ব্রিটিশদেরই ভয় দেখাতে চায়।

জাপান সারা এশিয়ার গর্ব। জাপান কখনও পরাধীন হয়নি, বরং এই শতাব্দীর শুরুতেই জাপান রাশিয়াকে যুদ্ধে হারিয়ে প্রমাণ করেছে যে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যরা অপরাজেয় নয়। বৌদ্ধধর্মের সূত্রে ভারতের সঙ্গে জাপানের একটা আত্মিক সম্পর্কও আছে। বাণিজ্য বিস্তারে জাপান টেক্কা দিয়েছে আমেরিকাকে, ইংরেজদের ঘাঁটি কেড়ে নিয়েছে একটার পর একটা, এতে পরাধীন ভারতীয়দের সুখানুভূতি হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে জাপান নাৎসি জার্মানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে যেভাবে হিংস্র আগ্রাসী ভূমিকা নিয়েছে, তাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাকে মানব সভ্যতার শত্রু হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু ভারত সমেত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি, যেখানে ইংরেজ-ফরাসিরা উপনিবেশ গেড়ে বসে আছে, সেই দেশগুলির অধিকাংশ মানুষের মনোভাব সে রকম নয়। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই তাদের কাছে প্রধান। শত্রুর যে শত্রু, সে আমার বন্ধু হতে পারে, এই নীতিই অনেকের মনে অনুরণিত হয়। এমনকী রক্তলোলুপ হিটলারকেও ভারতের বহু মানুষ নরদানব মনে করে না, জার্মানরা বোমা মেরে লন্ডন শহর গুঁড়িয়ে দিচ্ছে জেনে তারা খুশি, বেশ কিছু পুরুষ হিটলারি গোঁফ রাখতেও শুরু করেছে।

ভারতের রাজনৈতির অবস্থাও বিভ্রান্তিকর। চার্চিল-সরকার যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতীয় রসদ ব্যবহার করলেও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিতে কিছুতেই রাজি নয়। অনেক আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হবার পর গাঁধীজি অসহযোগ আন্দোলনে ভারত ছাড়ার ডাক দিয়েছেন। সে-আন্দোলন অহিংস থাকেনি, বহু জায়গায় রেল স্টেশন, ডাকঘর, থানা আক্রান্ত হয়েছে, ইংরেজ রাজশক্তির সরাসরি মুখোমুখি হয়েছে ভারতীয় জনতা। গাঁধীজি সমেত কংগ্রেসের প্রধান নেতারা সবাই নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল, তাদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল, কারণ তাঁরা অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী, স্তালিন-রুজভেল্ট-চার্চিল হাত মিলিয়েছেন বলে এই যুদ্ধ তাঁদের কাছে ফ্যাসিবিরোধী জনযুদ্ধ এবং ভারতে ইংরেজদের যুদ্ধব্যবস্থার সমর্থক। কমিন্টার্নের প্রভাবে কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত রাশিয়ার সব ব্যাপারে সমর্থক, দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কথা তাঁরা বিবেচনার মধ্যেই আনেননি। কংগ্রেস নেতারা জেলে বন্দি আর কমিউনিস্ট পার্টি মুক্ত, এ যেন ইংরেজদের পরিহাস। অনেক

পরে এজন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে আত্মসমালোচনা ও ত্রুটি স্বীকার করতে হয়েছিল।

অল্প সংখ্যক হলেও দ্বিতীয়বার জাপানি বোমাবর্ষণে আবার ডামাডোল শুরু হয়ে গেল। আবার স্কুল বন্ধ অনির্দিষ্টকালের জন্য। গ্রামে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এবার বাবা আমাদের পাঠিয়ে দিলেন কাশীতে। সেখানে আমাদের এক পিসিমা-পিসেমশাই ছিলেন, তাঁদের অবস্থা এমন নয় যে তাদের কাছে আশ্রয় নেওয়া যায়, কাছাকাছি একটি বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। কাশীতে জিনিসপত্রের দাম সস্তা, বাড়ি ভাড়াও সহজলভ্য।

দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই একটি পুরনো পাথরের বাড়িতে তিনতলায় দেড়খানা ঘর। এসব বাড়ির একতলা এমনই অন্ধকার যে মনুষ্য বাসের অযোগ্য। সরু সিঁড়ি। চৌকো উঠোনের ওপর প্রত্যেক তলায় লোহার শিক দিয়ে ঢাকা। বাড়ির সামনের গলিগুলো গোলকধাঁধার মতন। গলির গলি তস্য গলি। এক একটা গলি সম্পূর্ণ জুড়ে ষাঁড় শুয়ে থাকে, তাদের মেরেধরে সরাবার প্রশ্নই নেই, বিশ্বনাথের এই শহরে ষাঁড়েরা প্রণম্য, লোকেরা হাত জোড় করে অনুরোধ জানায়, বলিবর্দ প্রভুটি মর্জিমতন উঠে গেলে পথ মুক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে একটা রসিকতাও চালু ছিল। এক গলিতে শুয়ে ছিল এক গাধা। গাধাও কৃষ্ণের জীব, তাকে মারা যাবে না। এক ভক্তিমান মাড়োয়ারি ভদ্রলোক গাধাটির সামনে হাত জোড় করে বসেছিলেন, আপ তো আপই হায়, হঠ যাইয়ে! অর্থাৎ অন্য কেউ শুয়ে থাকলে গালাগালি দিয়ে বলতাম, এই গাধা, সরে যা। কিন্তু আপনি তো আপনিই!

সেই আমার প্রথম প্রবাসের অভিজ্ঞতা। অনেক দূরের ট্রেন যাত্রা, প্রকৃতির পরিবর্তন, নরম মাটির বদলে পাথরের দেশ, দিগন্তের পটভূমিকায় প্রথম পাহাড়। ইস্কুল নেই, পড়াশুনোর ধার ধারি না, কাশীর গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াই, বিকেল হলেই গঙ্গার ধারে গিয়ে কথকদের মুখে রামায়ণ পাঠ শুনি।

এই অংশটা লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে, পথের পাঁচালীর অপুর সঙ্গে খুব মিলে যাচ্ছে না? সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মের দৃশ্য আমি অনুকরণ করছি? তা তো নয়, সত্যিই তো যুদ্ধের সময় কয়েক মাস আমরা কাশীতে ছিলাম। কাশীর পটভূমিকা থাক বা না থাক, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা অপু আছে। আসল অপুর সঙ্গে তফাত এই, দুর্গার মৃত্যুর পর অপুর আর কোনও ভাই-বোন ছিল না। আমরা চার ভাই-বোন। বাবা কলকাতায়, আমিই পরিবারের প্রধান। সকালবেলা বাজার করে আনি। বাজারের খরচ বাঁচিয়ে কিনে আনি দু'পয়সায় এক খুরি রাবড়ি। একই খুরি থেকে চার ভাই-বোন চুমুক দিয়ে খেতে পারে।

মীরার দ্বিতীয় ছেলে অনিল বরাবরই শান্ত প্রকৃতির। তৃতীয় ছেলে অশোক ছটফটে, দুরন্ত। সবাই বিকেলবেলা দশাশ্বমেধ ঘাটে যায়, সন্ধে পার করে ফেরে। দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রত্যেক বিকেলেই যেন মেলা বসে যায়, কত রকম মানুষ, কত রকম পসরা, গঙ্গার বুকে ভেসে যাওয়া বজরায় শোনা যায় নৃত্যগীত। বাঙালি কথকরা নাটকীয়ভাবে রামায়ণ পাঠ করেন, হঠাৎ এমন এক জায়গায় থামেন যে দারুণ কৌতূহল নিয়ে পরের দিন আসতেই হবে। মীরা এক কথক ঠাকুরের সামনে আগেভাগে এসে রোজ বসেন, মেয়েটি থাকে তাঁর কোলে। ছেলেরা কেউ কথকতা শোনে, কেউ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। একদিন হঠাৎ দেখা গেল, অশোক ধারেকাছে নেই, খোঁজ খোঁজ খোঁজ, ঘাটের কাছে শোনা যাচ্ছে কীসের যেন গোলমাল। দুরন্ত অশোক লাফালাফি করতে গিয়ে জলে পড়ে গেছে।

শীতকাল, কাশীর শীত দারুণ শীত, এ সময় কেউ জলে নামতে চায় না। মীরার বড় ছেলেটি ভাল সাঁতার জানে, ছোট ভাইয়ের প্রায় ডুবন্ত হাত দেখেই সে চিনতে পেরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গঙ্গায়। তখন আরও কয়েকজন ধরাধরি করে তুলে আনে অশোককে।

মীরা তখনও তন্ময় হয়ে কথকতা শুনছেন।

ছয়

আমি বারাণসীতে গেছি অনেকবার। অবশ্য জীবনের প্রথম ও দ্বিতীয়বারের মধ্যে তফাত ছিল বেশ কিছু বছরের। পরে যতবারই দেখেছি, প্রথমবারের তুলনায় মনে হয়েছে অন্য রকম, পরিবর্তন অনেকখানি। এমন ঘিঞ্জি, এমন আবর্জনাপূর্ণ, এমন কোলাহলময় তো আগে ছিল না। কিংবা সত্যিই কি বারাণসী শহর অত বদলেছে, না বদলেছে আমার চোখ? প্রথম দেখার স্মৃতিতে বারাণসী কেমন যেন হালকা হালকা, কোনও কিছুতেই বাড়াবাড়ি নেই, সময়ের গতি খানিকটা মৃদু, বাতাস অতি পরিচ্ছন্ন, পথ ও প্রাসাদগুলির কোথাও মালিন্যের চিহ্নমাত্র নেই। এ ছবিটিও কি সত্য, না বালকের টলটলে, অপাপবিদ্ধ চোখে সব কিছুই সুন্দর দেখায়?

বাল্যচক্ষুতে অনেক ক্ষুদ্র জিনিসকেও যে বৃহৎ মনে হয়, সে প্রমাণ পরে অনেকবার পেয়েছি। স্কুলের খেলার মাঠটিকে মনে হত কত বিরাট, আসলে প্রয়োজনের পক্ষে অপ্রতুল। মামাবাড়ির বড় দিঘিটার ওপাশে যেন ছিল নিবিড় অরণ্য, গা ছমছমে অন্ধকার, পরে দেখেছি সেটা কয়েক বিঘের আমজামের বাগান। শৈশবের বড় বড় নদী গুলি সব মাঝারি হয়ে গেছে। যা ছিল দিগন্তবিস্তৃত, এখন তার কাছাকাছি সীমানা স্পষ্ট দেখা যায়। শুধু অল্প বয়েসের দেখা আকাশ এখনও বদলায়নি, বরং অনেক বেশি রহস্যময় মনে হয়।

গ্রামে আমি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, কাশীতেও পড়াশুনোর বালাই নেই। নষ্ট হয়ে যাবার অবাধ স্বাধীনতা! ওখানেও ঘুড়ি ওড়ানোর খুব চল, কাছাকাছি ছাদগুলিতে স্থানীয় ছেলেরা দাপটের সঙ্গে চিৎকার করে, তাদের সঙ্গে প্যাঁচ লড়ার শক্তি আমার নেই। উল্লাসের প্রকাশ হিসেবে তারা নানারকম গালাগালি উচ্চারণ করে, অর্থ না জেনে কয়েকটি গালাগাল আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে সেগুলির অর্থ বুঝে শিউরে উঠেছি। কাশীর কিশোররা নানাবিধ গোপন শারীরিক ক্রিয়াকর্ম বিষয়ে হিন্দি গালাগাল নিঃসঙ্কোচে সাবলীলভাবে ব্যবহার করে যায়। আর বেশিদিন থাকলে আমিও ওদের অন্তর্গত হয়ে যেতাম বোধহয়।

কাশীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কোনও আঁচ নেই, দুর্ভিক্ষের চিহ্ন নেই, গাঁধীজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনেরও কোনও প্রভাব চোখে পড়ে না। মোটামুটি নিস্তরঙ্গ জীবন। মাঝে মাঝে বড়দের মুখে শুনতে পাই এখানকার গুণ্ডাদের এক একটি রোমহর্ষক কাহিনী, সেসবও গল্পের মতন শুধুই শোনা, কখনও চাক্ষুষ নয়। শুধু চোখে পড়ে বাঙালি বিধবাদের করুণ দৃশ্য, যা কোনও বালকের মনেও দাগ কাটে। বাংলা থেকে হাজার হাজার বালবিধবাদের তখন কাশীতে পাঠিয়ে দেওয়া হত, অত দূরে ঠেলে দিয়ে সেইসব বিধবাদের বাবা-কাকা-দাদারা দায়মুক্ত হতেন। মাসোহারা হিসেবে পাঠানো হতে পাঁচ টাকা বা দশ টাকা, ভদ্রলোকের এক কথার মতন বছরের পর বছর সেই টাকার অঙ্ক একই থাকত। যুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য অনেকগুণ বৃদ্ধি হওয়ায় সেই সামান্য টাকায় তাঁরা কীভাবে গ্রাসাচ্ছাদন চালাবেন, তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না বাংলার অভিভাবকরা। অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের বিধবাদেরও দেখা যেত গলির মোড়ে, দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে অসহায়, লজ্জিত মুখে ভিক্ষে করতে। কেউ কেউ অন্য কোনও অনৈতিক কর্মও গ্রহণ করতেন বাধ্য হয়ে।

ঘুড়ি ওড়ানোর চেয়েও গঙ্গার ধারে কথকতা শোনার টান ছিল বেশি। দুপুরে ঘুড়ি উড়িয়ে

বিকেল হলেই ছুটে যেতাম ঘাটের দিকে। কথকদের মুখে সুরেলা ও নাটকীয় উচ্চারণে শুনে শুনে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী আমার জানা হয়ে যায়। কাশীতে সেটাই আমার একমাত্র শিক্ষা।

পরবর্তীকালে কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে বাঙালি কথকদের আর দেখতে পাইনি। ওই প্রজাতিটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রথমবার কাশীতে আরও একটি জিনিস দেখেছিলাম, যা এখন নেই। মণিকর্ণিকা ঘাটের ওপাশে বেণীমাধবের ধ্বজা নামে দুটি সুউচ্চ গম্বুজ, কুতুবমিনার কিংবা কলকাতার মনুমেন্টের মতন ওপরে ওঠা যেত। সে দুটি অনেককাল আগেই ভেঙে পড়ে গেছে।

কলকাতা ও কাশীতে দুটি সংসার চালানো অসুবিধাজনক হচ্ছিল বলে বাবা আমাদের কলকাতায় ফিরিয়ে আনলেন। তখনও কলকাতার অবস্থা স্বাভাবিক নয়। রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহ, অনেকদিন ধরে যারা অল্পভুক্ত ও অপুষ্টিতে আক্রান্ত তারাই এই সময় মরছে বেশি। কিছু কিছু লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে বটে, কিন্তু অভাবের সমুদ্রে তা গণ্ডূষ মাত্র।

বাবা ঠিক চাল জোগাড় করে আনতেন, আমরা একদিনও না খেয়ে থাকিনি। খেতে বসে শেষপাতে কিংবা থালার বাইরে একটি-দুটি ভাত ফেললেই বাবা ধমক দিয়ে বলতেন, ভাত ফেলছিস? জানিস না, কত লোক না খেয়ে থাকে? এখনও আমি ডাল-ভাত এমন চেটেপুটে খাই যে খাওয়ার শেষে থালাটা ঝকঝক করে, অনেকে ঠাট্টা করে বলে, তোমার এঁটো থালা তো না ধুলেও চলে! নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে আমি যতটুকু নিই, তার এক বিন্দু খাবারও নষ্ট করি না। সেই দুর্ভিক্ষের আমলের স্মৃতি! সেই জন্যই আমি এটা খাব না, ওটা খাব না, বলতেও শিখিনি। আমার ছোট ভাইবোনদের অতটা স্মৃতি নেই, তাদের ফেলে-ছড়িয়ে, বাছবিচার করে খাওয়ার স্বাধীনতা আছে।

কী কারণে যেন কলকাতাতেও বিশেষ সুবিধে হল না, এবারে বাবা আমাদের পাঠিয়ে দিলেন মায়ের মামাবাড়ি আমগ্রামে। দুর্গাপূজা আসন্ন, সে সময়ে ওখানে কিছুদিন থেকে যাওয়ার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই।

সেবারেই প্রথম আমার মামাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের খানিকটা পরিচয় পাই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিমণ্ডলে ভারতের স্বাধীনতার দাবি প্রবল হয়ে উঠেছিল। জাতীয়তাবাদী নেতারা মনে করেছিলেন, যুদ্ধে জিতুক বা হারুক ইংরেজরা অনেকখানি হীনবল তো হয়ে যাবেই, সেই সুযোগে স্বাধীনতা আদায় করে নিতে হবে। তখন একটা কথা বেশ চালু হয়েছিল, ইংরেজদের যতই কামান-বন্দুক থাক, তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী যদি সবাই মিলে একটা ধাক্কা দেয়, তা হলেই ইংরেজরা হুড়মুড় করে সাগরে হাবুডুবু খাবে।

কিন্তু সবাই তো একসঙ্গে মিলিত হয়নি। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগে প্রবল রেষারেষি চলছে। তা ছাড়াও অধিকাংশ মানুষই নিজের পরিবার-পরিজন, খাওয়া-পরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তাতেই মগ্ন। পরাধীনতার জ্বালাই বা ক'জন বোধ করে? যা চলছে তেমন চলুক, এটাই অনেকে মেনে নেয়। তার ওপরে আছে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বনাশা নিয়তিবাদ।

সুভাষ বসু সম্পর্কে অনেক রকম খবর আসছে। অনেক মিথ্যে, গুজব ও অপপ্রচারের কুয়াশার মধ্যেও ফুটে উঠছে কিছু কিছু সত্য। রেডিয়োতে শোনা যাচ্ছে তাঁর কণ্ঠস্বর, বহু লোক দরজা-জানলা বন্ধ করে সেই বেতার-তরঙ্গে কান পাতে। জার্মানি ছেড়ে তিনি দুঃসাহসী অভিযানে সমুদ্রের তলা দিয়ে পৌঁছে গেছেন জাপানে। তারপর সিঙ্গাপুরে ভারতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হয়েছেন, জাপানি সৈন্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে আসছে তাঁর বাহিনী, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে উড়েছে তাঁর বিজয় পতাকা, এদিকেও বর্মা সীমান্তে তিনি আক্রমণে উদ্যত।

দেশত্যাগের আগেই সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তাঁর জার্মানি যাওয়া এবং জাপানের সাহায্য নিয়ে সমরে অবতীর্ণ হওয়া তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত। কংগ্রেসের নেতারা সুভাষচন্দ্রের এই ভূমিকা তো সমর্থন করেনইনি, প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কমিউনিস্টদের কাছেও এটা জনযুদ্ধ, জার্মানি-জাপানের সঙ্গে সহযোগিতার অর্থই বিশ্বাসঘাতকতা।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন না পেলেও ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের হৃদয়ে বীরের আসন পেয়ে গেছেন। তিনিই যেন একমাত্র সাহস ও শৌর্যের প্রতীক। কল্পনায় এমনও দৃশ্য ভেসে ওঠে, অশ্বারোহণে তরবারি উঁচিয়ে সুভাষচন্দ্র বন্দিনী দেশজননীকে উদ্ধার করতে ছুটে আসছেন ঝড়ের বেগে।

আমার মায়ের মামাতো ভাইরা কেউ কখনও কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেননি, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের মতন তাঁরা ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি বা অর্থনীতি পাঠে মনোনিবেশ করেছিলেন। মায়ের একমাত্র সহোদর ভাইটি তখনও সাবালক হয়নি, তার লেখাপড়ার মাথা ছিল না। তাঁর এক মাসতুতো দাদা, যাকে আমরা টুকটুকি মামা বলতাম, একমাত্র তিনি ছিলেন কিছুটা বাউণ্ডুলে স্বভাবের, কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন, কিছুদিন পার্টির হয়ে কাজও করেছিলেন সম্ভবত। যাই হোক, উচ্চশিক্ষার্থী প্রধান মামাগণও সে সময় সুভাষচন্দ্র বসুর রোমান্টিক মহিমায় আকৃষ্ট না হয়ে পারেননি। সেবারে তাঁরা সপরিবার দুর্গাপ্রতিমা গড়ার এক অভিনব পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

যথাসময়ে সদলবলে জলধর কুমোর উপস্থিত। মূর্তি নির্মাণের ব্যাপারে এমনই গোপনীয়তা অবলম্বন করা হল যে আমাদের মতন বাচ্চাদেরও কাছ ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি একটিবারও।

এ বছরই প্রথম দেখি গ্রামোফোন যন্ত্রটি, বাংলায় যার নাম 'কলের গান'। অমন গ্রামদেশে ওই বস্তুটি খুবই অভিনব। আমাদের মতন বাচ্চাদের অবস্থা হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এর কুকুরটিরই মতন, আমরা হাঁটু গেড়ে অবাক বিস্ময়ে শুনতে শুনতে ভাবতাম, ওই বাক্সটির মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে একজন লোক গানগুলি গাইছে। এটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নয়, এর মধ্যে যথেষ্ট সংশয়ও ছিল, একই লোক বিভিন্ন গান, বিভিন্ন রকম গলায়, এমনকী মেয়েদের মতন গলাতেও গায় কী করে? কমিকগুলিতে চার-পাঁচজন লোকের গলা এক সঙ্গে শোনা যায়, ওই বাক্সের মধ্যে একজনের বেশি মানুষ থাকা তো কোনওক্রমেই সম্ভব নয়!

আমেরিকার কোনও রেড ইন্ডিয়ানের প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড শোনার পর যে বিস্ময়-অনুভূতি, তার সঙ্গে আমাদের অনুভূতির কোনও তফাত ছিল না।

সমসাময়িক বিষয় নিয়ে অনেক গান রেকর্ড করা হত তখন, একটি গানের কয়েকটি লাইন মনে আছে:

ক্যালকাটা নাইনটিন ফরটি থ্রি অকটোবর
এ আর পি, মিলিটারি
পথে পথে ভিখিরি
সব জিনিসের বাড়ল দর
ক্যালকাটা নাইটিন ফরটি থ্রি অকটোবর!...

এ আর পি এখন অপরিচিত, যুদ্ধের সময় এয়ার রেইড পুলিশ নামে আলাদা একটি বাহিনী তৈরি হয়েছিল, বিমান হানা ও সাইরেন বাজার সময় নাগরিকদের সতর্ক করে দেওয়াই ছিল এদের কাজ। স্কুল বন্ধ হবার ফলে বেকার অবস্থায় আমার বাবাও কিছুদিন এই কাজ করেছিলেন। এই গানটির আর একটি লাইনও লক্ষণীয়, ১৯৪৩ সালের আগে কলকাতা শহরে এত ভিখিরির উপদ্রব ছিল না। সেই থেকে শুরু।

আর একটি গান ছিল বেশ মজার। 'বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের'। এই বিখ্যাত পদাবলী গানটির প্যারোডি। মূল গানটিতে শুক ও সারি নামে দুই পক্ষী যথাক্রমে কৃষ্ণ ও রাধার পক্ষ নিয়ে সওয়াল করে। যেমন:

শুক বলে: আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা
সারি বলে: আমার রাধার নামটি তাহে লেখা
ওই যে যায় দেখা!
শুক বলে: আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল
সারি বলে: আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল
নইলে পারবে কেন!...ইত্যাদি।

এর অনুকরণে যদু ও মধু নামে দুই ব্যক্তি নিজেদের বউয়ের গুণপনার প্রতিতুলনায় মত্ত! যেমন:

যদু বলে: (আমার বউ) টকি দেখতে বড্ড ভালবাসে
মধু বলে: (আমার বউ) সেই টকিতে পেলে
করে আসে
এবার ফিরল বোধহয়!

দুঃখের বিষয় গানটির বাকি পঙ্ক্তিগুলি আমার স্মরণে নেই।

সিনেমাকে তখন অনেকেই বলত টকি। মুম্বইয়ের একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'বম্বে টকিজ'। মঞ্চ অভিনেতা শিশির ভাদুড়ি একটি ফিল্মে অভিনয় করেছিলেন। তার নাম 'টকি অব টকিজ'। আর কিছু লোক বলত বাইস্কোপ। সিনেমা, মুভি, ফিল্ম এই শব্দগুলির বিশেষ প্রচলন ছিল না। সেই দশ বছর বয়সেও আমি একটাও বাইস্কোপ দেখিনি। থিয়েটার-বাইস্কোপ ছিল তখন ছোটদের পক্ষে নিষিদ্ধ জগৎ। আরও কয়েক বছর পর প্রথম আমাকে টারজন-এর সিনেমা দেখার অনুমতি দেওয়া হয়।

ছোট ছোট বাচ্চারা মা-বাবাকে অনেক রকম প্রশ্ন করে। পাখি কেন ওড়ে, গাছে কেন ফুল ফোটে, আগুন কেন গরম আর বরফ কেন ঠাণ্ডা। রাত্তিরে সূর্য ঘুমোয় কিন্তু চাঁদ কেন ঘুমোয় না। এই ধরনের হাজার প্রশ্নে বিরক্ত করে মা-বাবাকে। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন কিংবা অন্য কাজে ব্যস্ত, তবু বাচ্চারা জ্বালাতন করবেই, বই পড়ার চেয়েও এই সব কৌতূহলের মধ্য দিয়েই তাদের আসল শিক্ষা হয়। দশ-এগারো বছর বয়েস হয়ে গেলে তারা আর মা-বাবার কাছে যায় না। তখন আরও অনেক বেশি প্রশ্ন থাকে, কিন্তু নিজেরাই উত্তর খোঁজে। অনেক প্রশ্নই প্রহেলিকার মতন থেকে যায় বেশ কিছু দিন। সেই সব প্রহেলিকা বা সংশয় নিয়েই গড়ে ওঠে তার নিজস্ব জগৎ।

সেই বয়সে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে একটা নিদারুণ সংকটে ভুগেছিলাম বেশ কিছুদিন। ছেলে মেয়েরা জন্মায় মায়ের পেটে, বাবাদের সে ক্ষমতা নেই, এটা জানা হয়ে গেছে। কিন্তু বিয়ে হবার পরেই মেয়েরা মা হয়, বিয়ের আগে কেন হয় না? এর মধ্যে কী যেন একটা রহস্য আছে। কিছুতেই ধরতে পারছি না। তরুণী মেয়েরা যুবা পুরুষদের দিকে যেভাবে তাকায়, ছোটদের দিকে তো তাকায় না সেভাবে? তিনটি তরুণী নিজেদের মধ্যে যেভাবে হাসাহাসি করে, অন্য একজন পুরুষ উপস্থিত হলেই কেন বদলে যায় সেই হাসির ধরন?

ফ্রয়েড সাহেব কীসব লিখে গেছেন তা তো তখন পড়িনি, যৌনচেতনা কাকে বলে তা-ও জানি না। কিন্তু এই বয়েস থেকেই মেয়েদের সম্পর্কে কৌতূহল বা আগ্রহ হঠাৎ বেড়ে গেল। তাদের কথা বলা, হাসি, চলার ছন্দ, বসার ভঙ্গি যেমনভাবে লক্ষ করি, তেমনভাবে তো পুরুষদের দিকে তাকাই না। সামানাসামনির বদলে আড়াল থেকে মেয়েদের দেখতে বেশি ইচ্ছে

হয়।

নয়-দশ বছর থেকে তেরো-চোদ্দো বছর পর্যন্ত বালকেরা সমবয়েসি মেয়েদের একেবারে পাত্তা দেয় না। কারণ তখনও পর্যন্ত ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক গড়নের তফাত থাকে না বিশেষ। অন্তত বছর দশেকের বড় রমণীরা তাদের চোখে পরিপূর্ণ নারী। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, পঞ্চদশীরা পূর্ণিমায় পৌঁছোয়। আমার মনে হয় আরও কয়েক বছর বেশি সময় লাগে। বিংশতি বর্ষ পার হবার পরই সাধারণত মেয়েদের স্তনোদগম সম্পূর্ণ হয়, চওড়া হয় উরুদ্বয়, গমন ভঙ্গি বদলায়। দশ-এগারো বছরের ছেলেদের চোখে সেটাই নারীত্ব, তাদের প্রতি মুগ্ধতার দৃষ্টি থেকেই বালকেরা এক সময় কৈশোরের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসে। বাইশ-তেইশ বছরের কিংবা তারও বেশি বয়সের রমণীরা দশ-বারো বছরের ছেলেদের মানুষ বলেই গণ্য করে না। কিন্তু সেই সব ছেলেরা যে তাদের কী চোখে দেখে তা তারা কোনওদিনই জানতে পারে না।

দুর্গাপুজো উপলক্ষে আমগ্রামের সেই মামাবাড়িতে প্রচুর আত্মীয়স্বজনের সমাবেশ হত। তাদের মধ্যে আমার কয়েকজন অপ্সরীতুল্যা মাসি ছিলেন, আমি তাঁদের প্রত্যেকের প্রেমে পড়েছিলাম। সেই প্রেম অনেকটা দেবী-আরাধনার মতন। এক একজনের ফর্সা, নরম পা দেখে মনে হত, আমি মাটিতে শুয়ে থাকব, তিনি যদি অন্যমনস্কভাবে আমার বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যান, তাতেও আমার জীবন ধন্য হবে!

সেবারেই প্রথম আমার অভিনয়েরও অভিজ্ঞতা হল। পূজার কয়েকটি দিনে মণ্ডপের সামনে আট চালায় যাত্রা, থিয়েটার ও গানবাজনার আসর বসে। এই উৎসবের জন্য কলকাতা থেকে কয়েকজন ঠাকুর-চাকর নিয়ে আসা হত, তারা এবং স্থানীয় কর্মচারীরা মিলে আলাদা একটি যাত্রাপালা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছিল, এদের মধ্যে কয়েকজন ওড়িশাবাসী, একজনের গানের গলা চমৎকার। পালাটির নাম মনে নেই, তাতে বাচ্চা শ্রীকৃষ্ণের একটা ভূমিকা ছিল, আমার বয়েসি আর কোনও ছেলে নেই, সুতরাং মা-বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমাকেই সাজানো হল রাখাল-রাজা কৃষ্ণ। খুব ঝলমলে সাজপোশাক পরানো হয়েছিল, আমি বায়না ধরেছিলাম, আমাকে একটা তরোয়াল দিতেই হবে। শ্রীকৃষ্ণ কখনও তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন কি না, সে রকম কোনও বর্ণনা পাওয়া যায় না, কিন্তু আমার তলোয়ারের প্রতি খুব লোভ ছিল। বাঁখারির ওপর রাংতা জড়িয়ে বানানো হয়েছিল একটি তলোয়ার, সেই তলোয়ার সমেত বীর শ্রীকৃষ্ণ একটি আছাড় খেয়েছিল এবং দর্শকদের হাসিয়েছিল। দর্শকদের হাসি মানেই তো সার্থকতা!

পালার শেষে এক মাসি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন আনন্দে। ছ-সাত বছর বয়েস থেকেই ছেলেরা মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শোবার অধিকার হারায়, দশ-এগারো বছরের ধেড়ে ছেলেকে মাসি-পিসিরাই বা জড়িয়ে ধরতে যাবে কেন? সেই আলিঙ্গনে আমার মাসি যে আমাকে কী দিয়েছিলেন, তা তিনি নিজেই জানে না। নারীরা না জেনে অনেক কিছু দেয়।

পরের কথা আগে এসে যাচ্ছে। জলধর যথাসময়ের কিছু আগেই কাজ শেষ করলেন, পঞ্চমীর দিন প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করা হল। সকলেই হতবাক। অন্যান্য বছর ছিন্নমুণ্ড মহিষের দেহ ভেদ করে উত্থিত অর্ধেকটা দেখা যায় অসুরকে। এবারে মহিষাসুর সম্পূর্ণ দণ্ডায়মান, পুরোপুরি মিলিটারির পোশাক, বুট জুতো সমেত, এবং তার মুখ অবিকল সাহেবদের মতন। অর্থাৎ ইংরেজ অসুর। আর দুর্গার ছোট ছেলে কার্তিক হচ্ছেন সুভাষ বসু, তিনিও সামরিক বেশে সজ্জিত, তীর-ধনুকের বদলে হাতে রাইফেল, সেটা অসুরের বুকে তাক করা।

প্রাথমিক বিস্ময়ের পর সবাই হাততালি দিয়ে উঠলেন। বাতাসের চেয়েও দ্রুতবেগে রটে গেল এই সংবাদ, হাজার হাজার মানুষ ছুটে এল সেই অভিনব প্রতিমা দর্শনের জন্য। একটা

দারুণ হুড়োহুড়ির পরিবেশ। অনেকে সুভাষ বসুর নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

থানাতেও পৌঁছে গেল জনরব। বিকেলবেলা দারোগাবাবু কয়েকজন সেপাইকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। মামারা বেশি দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে ফেলেছিলেন, ইংরেজ সৈন্যকে হত্যা করার দৃশ্য স্পষ্টতই রাজদ্রোহমূলক, সুভাষ বসু পলাতক আসামি, তাঁকে দেবত্বে উন্নীত করাও শাস্তিযোগ্য, সুতরাং বাড়ির কর্তারা সকলেই গ্রেফতার হতে পারতেন। তখন প্রতি জেলার এস পি-রা হত ইংরেজ, থানা পর্যায়ে বাঙালি বা অন্য ভারতীয়রাই নিযুক্ত হত। এই দারোগাবাবু বাঙালি, ইনি ইংরেজের চাকর হলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি একেবারে সহানুভূতিশূন্য ছিলেন না বোধহয়। তিনি পরামর্শ দিলেন এস পি সাহেব জানবার আগেই প্রতিমা একেবারে ঢেকে, লুকিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু পূজা তো বন্ধ করা যায় না, শুধু ঘট পূজা হবে। প্রতিমা তো থাকে প্রেক্ষাপটে, সামনে ঘট রেখে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাই তো আসল পূজা।

সেই রকমই হল। আমরা সবাই জানি, প্রতিমা আছে অন্তরালে, বাইরের লোক এসে শুধু ঘট দেখতে পায়। কিন্তু তাতে কী মন ভরে? যতই প্রতীকের কথা বলা হোক, অনেক শতাব্দী ধরে হিন্দুদের মনে সাকার-সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে আছে। খানিকটা নিরানন্দ হতে লাগল সব কিছু, যদিও পঙ্‌ক্তি ভোজ বাদ যায়নি। অষ্টমীর রাতে আরতির উদ্দামতা শিহরন জাগায়, দু' হাতে দুটি জ্বলন্ত ধুনুচি নিয়ে কয়েকজন প্রায় প্রলয়নৃত্য শুরু করে, ছিটকে ছিটকে পড়ে আগুন, হঠাৎ কারওর শরীর ঝলসে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। পুরুষের ওই ধরনের নৃত্য আমার কোনওদিনই ভালো লাগেনি। নবমীর দিনে হয় ঢাকের বাজনার প্রতিযোগিতা। এ বাড়িতে জনাচারেক ঢাকি-ঢুলি তো থাকেই, অন্য পূজামণ্ডপ থেকেও অন্য ঢাকিরা এসে প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়, বড় বড় জয়ঢাকের রীতিমতো পোশাক আছে এবং ওপরে পালকের সাজ, সেগুলি বাজাতে বাজাতে ঢাকিদের সে কী উল্লম্ফন! আর কী কানের তালা ফাটানো আওয়াজ! দৃশ্যটির মধ্যে উত্তেজনা আছে বটে, কিন্তু কে যেন বলেছিলেন, ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি লাগে, কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য।

দশমীর সকাল থেকেই ঢাকের আওয়াজ নরম হয়ে যায়, তার মধ্যে স্পষ্ট শোনা যায়, ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন। বিসর্জনের প্রস্তুতিও দারুণ, বিশাল বিশাল নৌকো আসে, পেট মোটা লম্বা ধরনের নৌকো, এক একটিতে পঞ্চাশ-ষাট জন মানুষ এঁটে যায়। অন্য সময় এই নৌকোগুলি কোথায় থাকে কে জানে! ইংরেজ-অসুর ও সুভাষচন্দ্ররূপী কার্তিকের মূর্তি দুটি বাদ দিয়ে বাকি প্রতিমা সাড়ম্বরেই বিসর্জনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এইদিন পরিবারের পুরুষরা ধুতি ও সাদা পাঞ্জাবির সঙ্গে গলায় সরু সোনার হার পরেন, যাকে বলে মফচেন। আমি তখন প্রাপ্তবয়স্ক নই বলে সে রকম হার পরার প্রশ্ন ওঠেনি, পরবর্তীকালেও কোনওদিনই আমার কণ্ঠে হার ধারণ করতে হয়নি। তাগা-তাবিজ-মাদুলির সঙ্গেও আমার সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি কখনও।

দুর্গাপূজা শেষ হতে না-হতেই লক্ষ্মী ঠাকরুনের আলাদাভাবে আগমন, তারপর কার্তিক, অল্প দূরত্বেই কালী ও সরস্বতী, পর পর পূজা লেগেই আছে। দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় বাঙালিদের কাছে বিশেষ সম্মান পান না। তাঁর পূজা হয় বটে, আবার অনেকে ছড়া বানায়, 'কার্তিক ঠাকুর হ্যাংলা/একবার আসে মায়ের সঙ্গে, একবার আসে একলা!' ছড়াটি যুক্তিহীন, কারণ লক্ষ্মী ও সরস্বতীও তো আলাদা পূজা নিতে আসেন, শুধু কার্তিককেই হ্যাংলা দোষারোপ কেন? মেয়েদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব!

শরৎকালের পর হেমন্ত ঋতু গ্রামদেশেই বোঝা যায় স্পষ্ট। বর্ষার উন্মাদনা, শরতের মন ভোলানো রূপের পর হঠাৎ যেন সব কিছু মন্থর হয়ে আসে, জল কমতে থাকে নদীতে, শূন্য পড়ে থাকে ফসলের ক্ষেত, বাতাস আর গাছগুলিকে দোলায় না, সন্ধের পর খোলা জায়গায় বসে থাকলে মাথায় হিম পড়ে। অবশ্য একটার পর একটা পূজা-উৎসব চলতে থাকে বলে আমরা ঋতু পরিবর্তন তেমন খেয়াল করি না। বহু আত্মীয় সমাবেশে সব সময়ই যেন ধারাবাহিক

হুল্লোড় চলে, তারপর বিদায় নিতে শুরু করে এক একটি দল। আমাদেরও আর বেশি দিন থাকা মানায় না, এখান থেকে চলে যেত হবে মাইজপাড়ায় নিজেদের বাড়িতে। লক্ষ করেছি, মা তাঁর শ্বশুরবাড়ির চেয়ে এখানেই থাকেন বেশি ফূর্তিতে, মামাতো-মাসতুতো অনেকগুলি ভাই বোনদের মধ্যে তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এখানে মেয়েদের সহজভাবে ঘোরাফেরার সীমানাটা অনেক বড়, সেই তুলনায় মাইজপাড়ার পরিবেশ বেশ নিরানন্দ, গণ্ডিটাও ছোট। তবু যেতে তো হবেই।

আমগ্রামে আমি স্কুলে ভর্তি হইনি বটে, কিন্তু কাশীর মতন লাগামছাড়া জীবন ছিল না, প্রতিদিন বই খুলে বসতে হয়। এ বাড়িতে পড়াশুনোর পরিবেশ আছে। ছোটদের তদারকি করে মেজো বয়েসিরা, মেজোদের ওপর নজর রাখেন তাদের যাঁরা গুরুজন। বড়দের আড্ডার সময় সেখানে ছোটদের থাকা নিষেধ, কিন্তু পড়া জিজ্ঞেস করার ছুতো করে সেখানে অনায়াসে যাওয়া যায়। এ রকম বৃহৎ যৌথ পরিবারে বয়ঃসন্ধির পর প্রাথমিক প্রেম প্রেম খেলা হয় মামাতো-মাসতুতো-খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো-পিসতুতো ভাইবোনদের মধ্যে। সে রকম কোনও গোপন-নিবিড় পরিবেশে আচমকা ঢুকে পড়ে হকচকিয়ে গেছি।

যেহেতু আমি ঠাকুর-চাকর-কর্মচারীদের প্রযোজনায় যাত্রাপালায় অংশ নিয়েছিলাম, তাই ওদের সঙ্গে আমার বেশ ভাব ছিল। রান্নার ঠাকুর লুকিয়ে মাছ ভাজা খেতে দিত। বাড়ির বাঁধা মাঝি ও জেলেদের কাছে গিয়েও গল্প শুনতাম নানারকম, চলে যেতাম ধোপাপাড়ায়। বড় দিঘিটার এক ধারে নমঃশূদ্ররা থাকে, (সিডিউল্‌ড কাস্ট, চলতি কথায় সবাই বলত শুধু নমো) সেখানে না যাওয়ার একটা অলিখিত নির্দেশ ছিল, কারণ তারা অচ্ছুত, যদিও তাদের পরিষেবা ও শ্রম নিতে কোনও আপত্তি নেই। নিম্ন বর্ণের অনেকে খ্রিস্টান হয়েছিল, তাদেরও অচ্ছুত মনে করা হত। নিষেধ ছিল বলেই কৌতূহলে আমি তাদের পল্লীতে চলে যেতাম সুযোগ পেলেই। তাদের কারওর বাড়িতে জল চাইলে তারা নিজেরাই দিত না, তাদের ধারণা, আমি ছেলেমানুষ বলে না জেনে পাপ করতে যাচ্ছি, ব্রাহ্মণ সন্তানকে জল দিলে তারাও পাপের ভাগী হবে।

মাঝিদের কাছে একদিন শুনলাম, তারা কয়েকজন দল বেঁধে একটা বিলে যাবে কয়েকদিনের জন্য। এই বিল-অভিযানের গল্প আগেও শুনেছি, দারুণ রোমাঞ্চকর মনে হত। বিল মানে অপরিকল্পিত এক বিস্তীর্ণ জলাশয়, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বেশ কয়েক মাইল হবে, কিন্তু তাকালে মনে হয় অকূল ধু ধু। অথচ সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা চলে না, ঢেউ নেই, তেমন গভীরও নয়, অনেক জায়গায় তলার মাটি দেখা যায়, মাঝে মাঝে গাছপালাও আছে, এবং বিন্দু বিন্দু দ্বীপ। বিলে অফুরন্ত মাছ এবং ধরাও সহজ। যারা দল বেঁধে বিলে যায়, তারা নৌকোতেই থাকে তিন-চার দিন, সেখানেই রান্নাবান্না, খাওয়া ও ঘুম, যাযাবরের জীবন।

আমি ওই দলটির সঙ্গে বিলে যাবার আবদার করতেই বাড়ির সকলে প্রবল আপত্তি জানালেন। প্রথম কারণ, ভদ্রসন্তানেরা ওই ভাবে যায় না। দ্বিতীয় কারণটি আরও মারাত্মক, বিলে যেমন লোকে মাছ ধরতে যায়, তেমনই যায় ডাকাতের দল। যখন তখন ডাকাতেরা এসে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে যায়, খুন-জখমও বাদ যায় না। আমার দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে কান্নাকাটি, খাওয়া বন্ধ ও কেউ হাত ধরে টানলে খিমচে দেওয়া ইত্যাদির পর এবং কুটিশ্বর নামে এক মাঝি নিজ দায়িত্বে আমার নিরাপত্তার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত অনুমতি পাওয়া গেল।

সেই তিন-চারদিনের যাযাবরত্ব যে খুব বেশি উপভোগ্য হয়েছিল, তা বলা যায় না। অন্যরা সব সময় মাছ ধরায় ব্যস্ত। বরফের ব্যবস্থা নেই, তিন-চারদিন মাছ ধরলে পচে যাবার কথা। তাই নৌকোর খোল অর্ধেকটা জলে ভরা, ধরা-পড়া মাছগুলো সেই জলে ছেড়ে দেওয়া হয়, যাতে সেগুলি জ্যান্ত থাকে। যে কটা মরে যায়, সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে কেটেকুটে রান্না করে খেয়ে ফেলা

হয়। তার মধ্যে ফলি মাছই মরে বেশি, ফলি মাছের বড্ড ছোচ ছোট কাঁটা, আমার সুবিধে লাগে না। সন্ধে হতে না হতেই খাওয়াদাওয়া শেষ এবং শুয়ে পড়া। কারণ জাগতে হয় অতি ভোরে এবং চিলের ডাকে। চিল এসে ঘোরে মাথার ওপর । সন্ধে রাতেই ঘুম না এলে চিত হয়ে শুয়ে আকাশ দেখা, নৌকোটা একটু একটু দোলে, খোলের মধ্যে খলবল করে মাছগুলো, অনেক দূরের কোনও নৌকো থেকে ভেসে আসে বেসুরো গান।

একদিনই শুধু একটা দারুণ উত্তেজনার ব্যাপার হল। তখন সবারই ঘুমিয়ে পড়ার কথা, একজন হঠাৎ উঠে বসে ভূত ভূত বলে চেঁচিয়ে উঠল, অন্যরাও জেগে উঠে বলল, আলেয়া। প্রথমে আমি দেখতেই পেলাম না, সবাই আঙুল দেখাচ্ছে, তবু দেখতে পাচ্ছি না। তারপর অনেক দূরে দেখলাম অস্পষ্ট আলো, মনে হয় কেউ পাটকাঠি জ্বেলেছে। ক্রমে আর একটু স্পষ্ট হল, সেই আলোটা স্থির নয়, যেন জলের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরছে। ইচ্ছে করলে সেটাকে একটা নারীমূর্তি হিসেবে কল্পনা করা যায়। সেদিকে চেয়ে থেকে রোমাঞ্চ বোধে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। সত্যিই একটা আলোর মূর্তি লাফাচ্ছে জলের ওপর? অনেকেই ভয় পেয়ে চোখ ঢাকছে, তারা আলেয়াকে প্রেতিনী মনে করে। কুটিশ্বর তার অভিজ্ঞ কণ্ঠে জানাল, তার দীর্ঘ জীবনে সে অনেকবার আলেয়া দেখেছে, কিন্তু সে জানে, আলেয়া কখনও কাছে আসে না।

আলেয়া ব্যাপারটা কী, তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা এখন সবাই জানে। যেমন আকাশে কেন রামধনু ফোটে, তার কারণ স্কুলের ছাত্ররাও জেনে গেছে। তবু রামধনুর সৌন্দর্য ও তার প্রতি মানুষের মুগ্ধতাবোধ যেমন একই রকম রয়ে গেছে, তেমনই নির্জন নিশীথে, দিগন্তবিস্তৃত জলাভূমির ওপর নৌকোয় বসে আলেয়া দেখার রোমাঞ্চ একটুও কমে না।

সাত

স্টিমারে কলকাতায় ফেরার সময় খবর পাওয়া গেল, যুদ্ধ থেমে গেছে। হয়তো মাঝপথে কোনও যাত্রী উঠে ছড়িয়েছে এই খবর। কিছু লোক তা নিয়ে বলাবলি করতে লাগল, অনেক লোক এত বড় একটা ঘটনায় ভ্রূক্ষেপও করল না। কেউ কেউ ডেকের রেলিং-এর ধারে বসবার জায়গা দখলের জন্য ঠেলাঠেলির তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিল না বিশ্বযুদ্ধকে।

খুলনা শহরেও মানুষের সে রকম কোনও ভাবান্তরের চিহ্ন নেই। স্টিমারঘাটায় যথারীতি বিশৃঙ্খলা ও চেঁচামেচি, মাথার ওপরে ঘুরছে এক-ঝাঁক চিল। পরে শুনেছি, এই উপলক্ষে অনেক স্কুলে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছিল, কিছু কিছু অফিস ও ব্যবসা কেন্দ্রে হয়েছে উৎসব, কিন্তু তা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। ততদিনে যুদ্ধের রোমাঞ্চকর গল্প শোনার কৌতূহলের বয়েস হয়ে গেছে আমার, কিন্তু তা শোনাবার মতন কেউ ছিল না ধারেকাছে। স্টিমারের ডেকে দাঁড়িয়ে আমি কল্পনা করেছিলাম, কোথাও, বহু দূরে, হাজার হাজার বন্দি সৈনিক মাথা নিচু করে শ্লথ পায়ে হাঁটছে।

যুদ্ধ শেষ হলে জয়ী দেশগুলিতে বয়ে যাবে আনন্দের স্রোত, পরাজিত দেশগুলি মুহ্যমান হয়ে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। ভারত জয়ীও নয়, পরাজিতও নয়, আবার সুইডেন কিংবা সুইটজারল্যান্ডের মতন নিরপেক্ষও বলা যাবে না, কারণ ভারতীয় সৈনিকেরা রণাঙ্গনে প্রাণ দিয়েছে। জাপানের আত্মসমর্পণের আগেই আজাদ হিন্দ ফৌজে ঘটে গেছে শোচনীয় বিপর্যয়। বহু ভারতবাসীর মনে একটাই প্রশ্ন, সুভাষবাবু কোথায়?

২৮ এপ্রিল রাত একটার পর বার্লিনের মাটির নীচের প্রকোষ্ঠে খ্রিস্টীও আচার-অনুষ্ঠান মেনে হিটলার বিয়ে করল ইভা ব্রাউনকে, যে রমণীটি গত বারো বছর ধরে ছিল হিটলারের প্রণয়িনী ও রক্ষিতা। তারপর এই দম্পতি যোগ দিল ছোটখাটো একটি ভোজ উৎসবে। তখন ওপরে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ চলছে, মার্শাল জুকোভ-এর নেতৃত্বে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে এগিয়ে আসছে লাল ফৌজ। আমেরিকান ও ইংরেজদের চেয়েও আগে ধেয়ে এসে রাশিয়ানরা বার্লিন দখলে উদ্যত, শেষ মরিয়া যুদ্ধেও জার্মানরা তাদের প্রতিহত করতে পারছে না।

বিবাহের প্রহসনের পর হিটলার একজন সচিবকে ডেকে রচনা করল তার ইচ্ছাপত্র ও রাজনৈতিক ভাষ্য, যা ঝুরি ঝুরি মিথ্যেয় ভরা। এতকালের দুই প্রধান সহচর গোয়েরিং ও হিমলারকে বরখাস্ত করা হল বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে। নিশ্চিত পরাজয় আসন্ন, তবু শেষ সংবাদটি স্বকর্ণে শুনতে চায়নি হিটলার, ৩০ এপ্রিল দুপুর সাড়ে তিনটের সময় এই নবদম্পতি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঢুকল একটি ঘরে, বাইরে পাহারায় রইল গোয়েবল্‌স ও বোরমান। শোনা গেল শুধু একটি রিভলবারের গুলির শব্দ, একটু অপেক্ষা করে সবাই দৌড়ে সে ঘরে ঢুকে দেখল, সোফার ওপর দুটি মৃতদেহ পড়ে আছে, হিটলার গুলি করেছে নিজের মুখের মধ্যে, ইভা বিষ পান করেছে। হিটলারের পূর্ব নির্দেশ মতনই প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের এক ফাঁকে সকলে মিলে মৃতদেহ দুটি ওপরে চ্যান্সেলারির বাগানে নিয়ে গিয়ে, পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল। বার্লিনের নিয়মমাফিক পতনের আগেই চিরবিদায় নিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্যতম যুদ্ধাপরাধী অ্যাডল্‌ফ হিটলার।

হিটলার তবু আত্মহত্যা করেছিল এবং তার মৃতদেহও যাতে শত্রুপক্ষের পদদলিত না হয়, সে ব্যবস্থা করে গিয়েছিল। সেই তুলনায় ফ্যাসিস্ত মুসোলিনির শেষ মুহূর্ত ও পরবর্তী ঘটনাবলী চরম অপমানজনক এবং তার উপযুক্তও বটে। ইতালির শেষ দশায় এক জার্মান বাহিনী পশ্চাৎ অপসরণ করছিল উত্তর সীমান্তের দিকে, তার মধ্যে আত্মগোপন করেছিল মুসোলিনি ও তার উপপত্নী ক্লারা পেতাচ্চি। এক সময় তাদের ঘিরে ধরে মুক্তিবাহিনীর একটি দল, তাদের নেতা বেলিনি নামে একটি বাইশ বছরের সম্ভ্রান্ত যুবক। তারা সন্দেহ করেছিল, ওই দলটির মধ্যে কিছু ইতালিয়ান হোমরা-চোমরা রয়েছে, মুসোলিনির কথা তারা কল্পনাও করেনি। জার্মান সৈন্যদলটির সঙ্গে মুক্তিবাহিনী সংঘর্ষেও লিপ্ত হতে চায়নি, জার্মানরা ফিরেই যখন যাচ্ছে, তখন আর অনর্থক রক্তক্ষরণে প্রয়োজন কী? শুধু তারা পলাতক ইতালিয়ানদের ফেরত চায়। এদের মধ্যে লুক্কায়িত মুসোলিনিকে হঠাৎ চিনতে পেরে তারা আনন্দে আত্মহারা। জার্মানদের কাছে তখন মুসোলিনির কানাকড়িও মুল্য নেই, বরং একটি বোঝা, তারা স্বেচ্ছায় মুসোলিনিকে পরিত্যাগ করে চলে গেল।

প্রথমে মুসোলিনি ও ক্লারাকে বন্দি করে রাখা হল সীমান্তের একটি গ্রামে। মুসোলিনির নিজের স্ত্রী ও অনেকগুলি রক্ষিতা ছিল। তাদের মধ্যে ক্লারার বয়েস অনেক কম ও অতিশয় রূপসী এবং মুসোলিনির অন্ধ ভক্ত। সে মুক্তিবাহিনীর নেতা বেলিনির কাছে ইনিয়েবিনিয়ে শোনাতে লাগল তাদের প্রেমের কাহিনী এবং এক সময় কাঁদতে কাঁদতে বলল, আপনারা বুঝি ওকে গুলি করে মারবেন? তা হলে ওর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে ওর পাশে থাকতে দেবেন তো? আমাকেও সেইসঙ্গে গুলি করবেন, কথা দিন! অল্পবয়েসি যুবক বেলিনি এই প্রেমকাহিনীতে বিচলিত হয়ে গিয়ে শপথ করে ফেলল, না, আমি ওকে গুলি করে মারব না, ওর বিচার হবে।

কিন্তু মুসোলিনিকে বাঁচিয়ে রাখা মোটেই নিরাপদ ছিল না। এর আগেও মুসোলিনিকে একবার বন্দি করা হয়েছিল, কিন্তু হিটলার কমান্ডো বাহিনী পাঠিয়ে চমকপ্রদভাবে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। সেই জন্যই মুক্তিবাহিনীর সদর দফতর মিলানে এই অসাধারণ সংবাদটি পৌঁছতেই কমিউনিস্ট নেতা তোগলিয়াত্তি অবিলম্বে দলবলসমেত মুসোলিনিকে শেষ করে

দেওয়ার নির্দেশ জারি করলেন। সেই জন্য পনেরো জনের একটি দল দ্রুত চলে এল সীমান্তের গ্রামে। এক চাষির বাড়ি থেকে মুসোলিনি ও ক্লারাকে টেনে বার করা হল, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে উদ্যত অস্ত্র দেখে ক্লারা জড়িয়ে ধরে রইল মুসোলিনিকে, সরে যাবার নির্দেশ সে কিছুতেই মানল না, তখন গুলি চালিয়ে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হল দু'জনেরই শরীর।

যে মিলান শহরে মুসোলিনি শেষবার ফিরে আসতে চেয়েছিল, সেখানে আনা হল তার মৃতদেহ। তারপর এক প্রকাশ্য স্থানে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হল মুসোলিনি ও ক্লারার শব, ক্ষিপ্ত সাধারণ নারী-পুরুষ তখন সেই ঝুলন্ত শবের ওপরেই থুতু, লাথি ও অন্যান্য এমন সব প্রক্রিয়া শুরু করল, তার বর্ণনা অত্যন্ত বীভৎস ও অশ্লীল বলে পরিগণিত হতে পারে, তা থেকে বিরত হওয়াই ভাল!

মৃত্যুর সময় হিটলারের বয়েস বাহান্ন বছর দশ দিন, মুসোলিনির বাষট্টি বছর।

এত বড় একটা মহাযুদ্ধে বিজয়ী তিন প্রধান রাষ্ট্রনায়কও জয়ের উল্লাস পুরোপুরি ভোগ করতে পারলেন না।

আমেরিকার সংবিধানে কোনও ব্যক্তিকেই দু'বারের বেশি প্রেসিডেন্ট হবার অধিকার দেওয়া হয়নি। কিন্তু আপৎকালে, সারা দেশের মানুষের এমনই আস্থা অর্জন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যে তিনি সমস্ত প্রথা ভেঙে পর পর চারবার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রচণ্ড মানসিক চাপে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছিল আস্তে আস্তে, চতুর্থবার প্রেসিডেন্ট হবার তিন মাস পর, এক মধ্যাহ্নে, রুজভেল্ট তাঁর জর্জিয়ার পার্বত্য নিবাসে আরামকেদারায় বসলেন বিশ্রাম নেবার জন্য। একজন মহিলা শিল্পী এই সময় তাঁর প্রতিকৃতি আঁকেন, রুজভেল্ট একটা সিগারেট ধরিয়ে তাঁকে বললেন, আমার কিন্তু ঠিক আর পনেরো মিনিট সময় আছে। ঠিক পনেরো মিনিট বাদেই তিনি জ্ঞান হারান এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর শেষনিশ্বাস পড়ে। আর মাত্র তিন সপ্তাহ পরে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে, হিটলারের চরম দুর্গতির কথাও জেনে যেতে পারলেন না রুজভেল্ট।

চার্চিল বেঁচে রইলেন বটে, কিন্তু ইংরেজ জাতির বিচিত্র স্বভাবের জন্য তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেন আকস্মিকভাবে। যুদ্ধ শেষ হতে না-হতেই ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে হেরে গেল রক্ষণশীল দল, প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হলেন চার্চিল।

জার্মানির আত্মসমর্পণের পর পটসডামে একদা কাইজারের পল্লীপ্রাসাদে শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক সম্মেলন। জার্মানি ও তার অঙ্গ রাজ্যগুলি কীভাবে ভাগাভাগি হবে, তাই নিয়ে আলোচনা চলছে মিত্র শক্তির প্রধানদের মধ্যেই। সম্মেলনের মধ্যপথেই চার্চিল তাঁর চেয়ার ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন ব্রিটেনের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী এট্‌লিকে। চার্চিল এই মহাসময়ের অন্যতম প্রধান নায়ক, কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে কথা বলার তাঁর আর কোনও সরকারি অধিকার রইল না। অবশ্য রয়ে গেলেন উপদেষ্টা হিসেবে।

একমাত্র স্টালিন তাঁর সাহসে, দৃঢ়তায় এবং সোভিয়েত জনগণের প্রচণ্ড আত্মত্যাগের মধ্যেও মনোবল জাগিয়ে রাখার কৃতিত্বে ক্ষমতায় অবিচল। কিন্তু তিনিও তখন হৃদরোগে আক্রান্ত এবং ফুসফুস দুর্বল, তাঁরও সিগারেট টানার দারুণ নেশা। অবশ্য এর পরেও তিনি আরও কয়েক বছর জীবিত থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সুসংহত করে গেছেন।

রুজভেল্ট ছিলেন অনেকটা উদারমনস্ক এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারে অমায়িক। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনিই প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেন, এবং তিনি মনে করতেন, অনবরত সংঘর্ষে না গিয়ে ওই দেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মানবতাবাদী, সে জন্য তাঁর দেশের কট্টর ক্যাপিটালিস্টরা তাঁকে কমিউনিস্টদের পক্ষপাতী বলতেও ছাড়েনি। চার্চিল ও স্ট্যালিনের চাপা শত্রুতা প্রশমনে তিনি বরাবর মধ্যস্থতা করে এসেছেন। তাঁর মৃত্যুতে স্ট্যালিন আন্তরিক শোকবার্তা পাঠালেন এবং সুপ্রিম সোভিয়েতের

অধিবেশনে সমস্ত সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানালেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রুমান হলেন নব্য প্রেসিডেন্ট। ইনি আবার রক্ষণশীল এবং সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। প্রথম থেকেই তাঁকে উস্কানি দিতে লাগলেন চার্চিল।

ইউরোপীয় যুদ্ধের পরিণতি দেখে চার্চিল খুশি হতে পারেননি। হিটলারের বর্বরতার অবসান হল বটে, কিন্তু চার্চিল আশা করেছিলেন, এই যুদ্ধের ধাক্কায় সোভিয়েত রাশিয়াও হীনবল হয়ে যাবে, আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু সে রকম তো হল না! বেশ কয়েকটি সম্মেলনে স্ট্যালিনের সঙ্গে চার্চিলকে করমর্দন করতে হয়েছে বটে, কিন্তু তার অন্তরটি যে কমিউনিজম বিদ্বেষে ভরা। সোভিয়েত সৈন্যরা আগেভাগেই এসে বার্লিন দখল করে নিয়েছে, এটা যেন তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয়। আমেরিকান সৈন্যরাই যাতে আগে বার্লিনে পৌঁছয় এ জন্য তিনি বহু রকম চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জেনারেল আইসেন হাওয়ার তখন রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তিনি প্রকৃত সেনাপতির মতন যুদ্ধনীতি মেনে সহযোগী রুশ বাহিনীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে চাননি।

এর পরেও যে সোভিয়েত রাশিয়াকে প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, এই মর্মে চার্চিল আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রুমানকে প্ররোচিত করে যাচ্ছিলেন। ট্রুমানের তাতে আদর্শগত আপত্তি না থাকলেও তখনই তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বিষিয়ে তুলতে রাজি হলেন না। তখনও জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হয়নি, এশীয় রণাঙ্গনে স্ট্যালিনের সহায়তার প্রয়োজন আছে। ট্রুমান সেই জন্যই রুজভেল্ট-নীতি বিশেষ বদলালেন না।

জাপানের পরাজয়ও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রশ্ন হল, কতদিন পর? উভয় পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতি প্রচণ্ড। এক একটা ছোট ছোট দ্বীপ দখল করতে গিয়ে আমেরিকান বাহিনীকে যত সৈন্যের প্রাণ ও অস্ত্রসম্ভার দণ্ড দিতে হয়, তা কোনও যুদ্ধেরই হিসেবের সঙ্গে মেলে না। জাপানি সৈনিকেরা লড়াই করে উন্মত্তের মতন, তারা প্রাণ দেয়, ধরা দেয় না। মাত্র আট বর্গমাইল আয়তনের একটি দ্বীপ আইও জিমা, সেখানে অবতরণ করে মার্কিন পক্ষে হতাহত হয় কুড়ি হাজারেরও বেশি। জাপানিরা নিহতই হয় একুশ হাজার, আহত অনেক বেশি, বন্দি করা যায় মাত্র দু'শো জনকে।

আমেরিকানদের ঐতিহ্য বলে কিছু নেই, তাদের জোর আত্মনির্ভরতা। জাপানিরা ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধভাবে অনুগত, এবং দেশের সম্মান রক্ষায় ব্যক্তি-প্রাণ তুচ্ছ। সংস্কার যখন কুসংস্কারে পরিণত হয়, তখন তার তীব্রতা আরও বাড়ে। মূল জাপান ভূখণ্ড থেকে মাত্র তিনশো বাষট্টি মাইল দূরের ওকিনাওয়া দ্বীপটিও যখন হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন জাপানের জঙ্গিগোষ্ঠী মধ্যযুগীয় এক কাহিনী প্রচার করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খান এক বিশাল নৌবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছিল জাপান দখল করতে। জাপান কখনও বিদেশি শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করেনি, তাই সে দেশকে রক্ষা করার জন্য সে সময় জাপানিদের আরাধ্য সূর্যদেবতা এক দৈব ঝড় সৃষ্টি করলেন, তাতেই কুবলাই খানের রণতরীগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সেই দৈব ঝড়, জাপানি ভাষায় কামিকাঝি (Kamikaze), একালে সৃষ্টি করবে জীবন্ত মানুষ। এক ঝাঁক ছোট ছোট বিমান নিয়ে পাইলটরা সোজা উড়ে গিয়ে ঝাঁপ দেবে বিপক্ষ সৈন্যদের মধ্যে, নিজেরা ধ্বংস হবে, বিপক্ষেও ধ্বংসের আগুন জ্বালাবে। যে শত্রু নিজের প্রাণ বাঁচাবার চিন্তা করে না কিংবা পশ্চাৎ অপসরণের পথ খোলাই রাখে না, তার সঙ্গে যুদ্ধ করা অতি কঠিন। এই কামিকাঝি পাইলটদের জ্বালায় আমেরিকানরা বিপর্যস্ত।

এদিকে চিনের কুওমিনটাং সরকারের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির একটা সাময়িক সমঝোতা হয়েছে, গৃহযুদ্ধ তখনকার মতন এড়ানো গেছে। চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে আলোচনা ও কিছুটা দরাদরির পর স্ট্যালিন সন্তুষ্ট হলেন এবং জাপানের সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুক্তি বাতিল করে দিলেন। চিনে তখনও কুড়ি লক্ষ জাপানি সৈন্য রয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে নামা

আমেরিকানদের পক্ষে অসুবিধেজনক, বরং মাঞ্চুরিয়ার দিক থেকে রুশ সৈন্যবাহিনীর চাপ সৃষ্টি করা অনেক বাস্তব সম্মত। সেই সুযোগে মূল জাপান ভূখণ্ডে অগ্নিবৃষ্টি চালিয়ে যাবে মার্কিনরা।

জাপান এখন এই সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে, আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য পথ নেই। জাপানের সম্রাট আত্মসমর্পণের জন্য রাজিও হয়ে আছেন বাধ্য হয়ে। কিন্তু এর মধ্যে, মার্কিন, ব্রিটেন ও চিনের রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষে জাপানকে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের জন্য একটি চরমপত্র দেওয়া হয়েছে। আত্মসমর্পণ ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্যে তফাত আছে, জার্মানি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছে, তারা করতে পারে, কারণ জার্মানি আগেও যুদ্ধে হেরেছে অপমানজনকভাবে, কিন্তু জাপান তো কারুর কাছে কখনও পরাজিত হয়নি, সুতরাং যুদ্ধ থামাতে গেলে তার সম্মানজনক শর্ত চাই। এই সম্মানের প্রশ্ন নিয়ে টানাটানিতে প্রাণ দিতে লাগল লক্ষ লক্ষ মানুষ। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য জাপানিরা যখন-তখন হারাকিরি বা আত্মনিধনে প্রস্তুত, সেই একই কারণে তারা পুরো দেশটাকেই ধ্বংস করে দিতে রাজি।

এর মধ্যেই নির্মিত হয়ে গেল সেই অস্ত্র, মহাভারতের ভাষায় যাকে ব্রহ্মাস্ত্র বলা যেতে পারে।

পদার্থের ক্ষুদ্রতম রূপটির নাম পরমাণু। এর গ্রিক নাম অ্যাটম, যার অর্থই হল, যে জিনিস আর ভাঙা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কৌতূহল অদম্য, তাঁরা কোনও কিছুই চূড়ান্ত শেষ বলে মেনে নিতে চান না। গত শতাব্দী থেকেই কিছু কিছু বৈজ্ঞানিকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, সত্যিই কি পরমাণু আর ভাঙা যায় না? ভাঙলে কী হয়?

বিজ্ঞানীরা যে কোনও আবিষ্কারেরই পরবর্তী ধাপের দিকে এগিয়ে যেতে চান গবেষণার আকর্ষণে। একজন একটা নতুন পথ দেখালে অন্য বিজ্ঞানীরা সন্ধান দেন অজ্ঞাতপূর্ব নানান সম্ভাবনার। যেমন কোপারনিকাস-জিয়োদার্নো ব্রুনো-গ্যালিলিও জীবনের ঝুঁকি নিয়েও প্রচার করলেন, পৃথিবী নিশ্চল নয়, সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ভ্রমণ করে না প্রতিদিন। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব নিছক রূপকথা, বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত অ্যারিস্টটলের তত্ত্বও ভুল, সূর্যের আবর্তে পৃথিবীই ঘূর্ণ্যমান। নিউটনের যুগান্তকারী আবিষ্কার মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব তারই পরবর্তী পদক্ষেপ। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি ও সভ্যতার অগ্রগতি সমান্তরাল। বিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রার অনেক উপকরণ জুগিয়ে দিয়েছে, চিকিৎসা, কৃষি, বাস্তুশাস্ত্র ইত্যাদিতে ঘটিয়ে দিয়েছে অভাবিত পরিবর্তন। আবার বিজ্ঞানীদের গবেষণায় রাষ্ট্রনায়করা অনেক মারাত্মক অস্ত্র নির্মাণেও সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞানীরা সত্যের সাধক, কিন্তু কখনও কখনও তাঁদের কেউ কেউ প্রলোভনের বশে কিংবা শাসকশ্রেণীর হুমকিতে, সৃষ্টির বদলে নিযুক্ত হয়েছেন ধ্বংসের কাজে।

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-প্রতিভা অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তিনি মানবতাবাদী ও শান্তির সপক্ষে। মহাত্মা গাঁধীর সঙ্গে শান্তির আন্দোলনেও তিনি সহমর্মিতা জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরমাণু বোমার মতন একটি বিরাট বিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণের ব্যাপারে তিনি অনেকটাই দায়ী। পরবর্তীকালে তিনি এ জন্য খুবই অনুতাপ বোধ করেছিলেন, কিন্তু ততদিনে যা হবার তা হয়ে গেছে। সম্ভবত হিটলারের অগ্রগতি রোধ করার একমাত্র চিন্তাই তাঁকে পেয়ে বসেছিল, অন্যভাবে মানব সভ্যতার সর্বনাশের কথা তাঁর মনে আসেনি।

জার্মানরা পরমাণু বিভাজন ঘটিয়ে ফেলেছে এবং তা দিয়ে বোমা বানাচ্ছে, এরকম একটা ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছিল যুদ্ধ শুরু হবার আগেই। জার্মান বিজ্ঞানীরা আটত্রিশ সালেই বার্লিনে পরীক্ষামূলকভাবে পরমাণু বিভাজন সত্যিই ঘটিয়েছে কিন্তু বোমা তৈরির ব্যাপারে বিশেষ এগোতে পারেনি, এবং আমেরিকানরাও এ ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। উনিশ শো উনচল্লিশের ২ অগাস্ট রুজভেল্টকে একটি চিঠি লিখলেন আইনস্টাইন, তাতে তিনি জানালেন যে গত চার মাসে কয়েকজন বিজ্ঞানীর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে অনেকখানি ইউরেনিয়াম বিভাজনে যে ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া, তাতে যে প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি হয়, তা দিয়ে অত্যন্ত বিধবংসী

বোমা বানানো সম্ভব। এই যে নতুন ধরনের অসম্ভব শক্তিশালী বোমা, তার একটি মাত্র কোনও বন্দরে নিক্ষিপ্ত হলে সেই বন্দরটি তো পুরোপুরি ধ্বংস হবেই, তার আশেপাশের এলাকাতেও আগুন জ্বলবে।

এত বড় একজন বিজ্ঞানীর সুপারিশ অবহেলা করবেন কী করে রুজভেল্ট। তাঁর নির্দেশেই অতি গোপন ও অতি ব্যয়বহুলভাবে শুরু হল সেই বোমা বানাবার প্রক্রিয়া। তিনি অবশ্য শেষ পর্যন্ত সেই বোমা দেখে যেতে পারেননি, তার ধ্বংসক্ষমতাও জেনে গেলেন না।

ইংরেজরাও পরমাণু-অস্ত্র নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছিল, কিন্তু ইংল্যান্ডে যখন-তখন জার্মান বিমান এসে বোমাবর্ষণ করে, তাদের গবেষণাকেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, তাই সেই উদ্যোগ বন্ধ করে দিয়ে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরাও আমেরিকানদের সঙ্গে হাত মেলালেন। আইনস্টাইন ছাড়াও ফ্যাসিস্ট ও নাৎসিদের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য বহু বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী এসে আশ্রয় নিয়েছেন আমেরিকায়, তাঁদের মধ্যে আছেন ইতালির এনরিকো ফেরমি, ডেনমার্ক থেকে নীল্‌স বোর, এঁদের পরামর্শও ছিল অতি মূল্যবান। তবে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব নিয়ে যুক্ত হয়েছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ওপেনহাইমার। শেষ পর্যন্ত তিনিই পরিচিত হয়ে উঠলেন অ্যাটম বোমার জনক হিসেবে।

আশ্চর্য মানুষ এই ওপেনহাইমার। বিজ্ঞানী বলতেই যেমন মনে হয়, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, দাড়ি কামালে সময় নষ্ট হয় বলে মুখ ভর্তি দাড়ি, কোলকুঁজো, সর্বক্ষণ হয় মাইক্রোস্কোপে চোখ অথবা অঙ্ক কষছেন, এর সঙ্গে ওপেনহাইমারের কোনও মিলই নেই। তিনি সুপুরুষ ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, অধ্যাপক হিসেবে বিখ্যাত তো বটেই, তা ছাড়াও নানা দিকে তাঁর উৎসাহ। সাহিত্য ভালবাসেন, জানেন অনেকগুলি ভাষা, তার মধ্যে সংস্কৃত অন্যতম, গীতার বেশ কিছু অংশ তাঁর কণ্ঠস্থ, দর্শনচর্চা করেন, আবার প্রেম-চর্চাতেও সময়ের অভাব হয় না। পদার্থের পরমাণু বিভাজনে যে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয়, তা একটি তত্ত্ব, তা সত্যি সত্যি উৎপন্ন করা সম্ভব কি না, এটা জানাই যেন বৈজ্ঞানিকের একমাত্র উদ্দেশ্য। পাঁচ বছর ধরে ওপেনহাইমার তিন-চারটি গোপন কেন্দ্রে এই অস্ত্রের প্রস্তুতিপর্ব পরিদর্শন করেছেন অক্লান্তভাবে।

অবশেষে পরীক্ষার দিনটি নির্দিষ্ট হল পঁয়তাল্লিশ সালের ষোলোই জুলাই। নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে সফলভাবে বিস্ফোরিত হল পৃথিবীর প্রথম অ্যাটম বোমা। মানুষ কল্পনা করতে পারে না এমন প্রচণ্ড শব্দ, মানুষ কল্পনা করতে পারে না এমন আলোর বিচ্ছুরণ, পাথর পর্যন্ত গলে গিয়ে আগ্নেয়গিরির লাভার মতন শূন্যে উত্থিত হল, তাতে নানা রকম রং, বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণে তৈরি হল এক ভয়ংকর মেঘ, তা ব্যাঙের ছাতার আকারে ক্রমাগত উঠতে লাগল ওপরে ...।

দশ মাইল দূরে, পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ওপেনহাইমার, প্রথম সেই প্রলয়ংকর আলোর ঝলকানি দেখে তিনি অস্ফুট স্বরে আবৃত্তি করলেন গীতার শ্লোক :

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্‌ যুগপদুত্থিতা
যদি ভাঃ সাদৃশী সা স্যাদ ভাসস্তস্য মহাত্মন্‌

(যদি কখনও আকাশে একই সঙ্গে সহস্র সূর্যের উদয় হয়, তা হলে সেই দীপ্তি পরমাত্মার জ্যোতির সঙ্গে কিছুটা তুলনা করা যেতেও পারে।)

খানিক বাদে ওপেনহাইমারের মনে অন্য একটি বোধ এল। এ তো শুধু বিজ্ঞানের জয়যাত্রা নয়, মেধার সাফল্য নয়, এ যে অস্ত্র, মানুষের ইতিহাসের ভয়ালতম অস্ত্র, এই একটি মাত্র বোমায় কত মানুষের প্রাণ যাবে? যা ছিল তত্ত্ব, তার যে এমন ভয়ংকরতম রূপ হবে, তা কেন আগে খেয়াল করা হয়নি? বিভ্রান্ত ওপেনহাইমার আবার সান্ত্বনা খুঁজলেন গীতার শ্লোকে :

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধ
লোকান্‌ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

ঋতেঽপি ত্বা ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥

(মহাভারতের যুদ্ধের প্রারম্ভে হঠাৎ অর্জুন বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। এই যুদ্ধে কত মানুষের প্রাণ যাবে, তাদের মধ্যে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনও রয়েছেন, তবে কেন এই যুদ্ধ? অর্জুন হাত থেকে ধনুক ও শর নামিয়ে রাখলেন। তখন তাঁর সারথি কৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করে বললেন,

আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল
এখন লোকসংহারে প্রবৃত্ত হয়েছি
তুমি যুদ্ধ না করলেও এখানে যে সব
বীরগণ রয়েছেন
তাঁরা কেউই আর বেঁচে থাকবেন না)

এরকম একটা পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ সত্যিই ঘটানো যাবে কি না, তা শেষ দিন পর্যন্ত অনিশ্চিত ছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রুমান যখন জার্মানির পটসডামে মিত্র শক্তির সম্মেলনে যোগ দিতে গেলেন, তখনও তিনি এর সাফল্যের কথা জেনে যাননি। সেখানে তাঁর কাছে সাঙ্কেতিক বার্তা পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানালেন চার্চিলকে। দু'জনেই আনন্দে আত্মহারা। এবার জয় তাঁদের হাতের মুঠোয়।

স্ট্যালিন সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবও বদলে গেল, কিংবা বলা যায়, আসল মনোভাব প্রকটিত হয়ে পড়ল। স্ট্যালিনকে আর তোয়াজ করার দরকার নেই, কারণ জাপানকে ঠাণ্ডা করতে আর রাশিয়ার সাহায্যের দরকার হবে না। যুদ্ধে অংশ নেবার বদলে জাপানের কিছু অংশ দাবি করেছেন, তা তাঁকে দেওয়া হবে কেন? ইউরোপ ভাগাভাগির প্রশ্নেও আরও কঠোর হওয়া যেতে পারে। রাশিয়া সম্পর্কে রুজভেল্ট-নীতি বজায় রাখার আর কোনও প্রয়োজন নেই।

জাপানে এই পারমাণবিক বোমাবর্ষণের সিদ্ধান্ত নেন ট্রুমান, নিজ দায়িত্বে। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এর বিরুদ্ধে ছিলেন। আমেরিকা এরকম একটি বোমা তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। এটা জানিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট, বোমা ফেলে জাপানের অজস্র সাধারণ মানুষের জীবননাশ করতে হবে কেন? একদল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক ভাবে বোমাটির বিধ্বংসী ক্ষমতা দেখে আতঙ্কিত হয়ে আইনস্টাইনের কাছে এসে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন, এই বোমা যুদ্ধের কাজে ব্যবহার না করার জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে আবেদন করেন। আইনস্টাইন রাজি হয়ে চিঠি লিখেওছিলেন। কিন্তু রুজভেল্ট সে চিঠি পড়ার সময় পাননি, হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। রুজভেল্টের টেবিলে অনেক কাগজ পত্রের মধ্যে সে চিঠি না-খোলা অবস্থায় পড়েছিলেন! স্বয়ং জেনারেল আইসেনহাওয়ারও পটসডামের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও জানালেন যে জাপান হারতে বসেছে, এই অবস্থায় এরকম একটি অস্ত্রাঘাত মানবতাবিরোধী।

কিন্তু ট্রুমান এসব সদুপদেশে কর্ণপাত করলেন না। চার্চিলের সমর্থন অবশ্যই ছিল। তাঁদের যুক্তি এই, জাপানি সেনারা যে-ভাবে মরিয়া হয়ে লড়ছে, তাতে যুদ্ধ শেষ করতে গেলে আরও অন্তত দশ লক্ষ আমেরিকান সৈন্য ও পাঁচ লক্ষ ব্রিটিশ সৈন্যের প্রাণ যাবে। জাপানেও কত মানুষের প্রাণ যাবে তার ঠিক নেই। সে কারণেই দ্রুত যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য জাপানকে একবার অন্তত এরকম দৃষ্টান্তমূলক আঘাত করা দরকার।

স্ট্যালিনকে এই ব্রহ্মাস্ত্রের কথা জানানো হবে কি, হবে না? না জানালেই ভাল হয়। অনেকক্ষণ নিভৃতে আলাপ-আলোচনার পর ট্রুমান ও চার্চিল ঠিক করলেন, মিত্রশক্তি এখনও ভেঙে যায়নি, প্রধান ত্রয়ীর অন্যতম স্ট্যালিন, তাঁকে এই ব্যাপারে অন্ধকারে রাখা একেবারেই নীতিবিরুদ্ধ হয়ে যাবে এবং এ জন্য স্বদেশেই তাঁদের সমালোচনা শুনতে হবে। তবে লিখিতভাবে জানাবার বদলে মুখে জানানো যায়, লিখিতভাবে জানাতে গেলে সবিস্তারে জানাতে হয়, মুখে অসমাপ্ত বাক্য দিয়েও কাজ চলে। একদিন সম্মেলনের অধিবেশন শেষে

সবাই হোটেলে ফিরছেন, ট্রুমান আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন স্ট্যালিনকে। অদূরে দাঁড়িয়ে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে কৌতুকহাস্যময় মুখে অপেক্ষা করতে লাগলেন চার্চিল। এখানে একটি ক্ষুদ্র নাটক অনুষ্ঠিত হল। ট্রুমান জানালেন, তাঁরা একটা অসাধারণ বিধ্বংসী নতুন অস্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু ট্রুমান নিউক্লিয়ার বা অ্যাটমিক শব্দ দুটি উল্লেখও করলেন না। কোনও মন্তব্যই করলেন না স্ট্যালিন। তিনি আগে থেকেই জানতেন? তা সম্ভব নয়। কিংবা ক্লান্ত ছিলেন, নিজের কক্ষে ফিরে বিশ্রাম নেবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন? ফিরে এসে ট্রুমান চার্চিলকে বললেন, উনি তো কোনও প্রশ্ন করলেন না! চার্চিল এমন একখানি হাসি দিলেন যাতে বোঝা গেল, তিনি সেটাই ধরে নিয়েছিলেন। চার্চিল এরকমই লিখে গেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে।

এই ঘটনার ঠিক তেরোদিন পর ৬ অগাস্ট সকাল ৮টা ১১ মিনিটে মার্কিন বিমান থেকে জাপানের হিরোসিমা শহরে প্রথম অ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ধ্বংস হল শহরের ষাট ভাগ অংশ, ৭৮ হাজার জীবন্ত মানুষ শব হয়ে গেল যেন চোখের নিমেষে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে ছটফট করতে লাগল আরও হাজার হাজার মানুষ, বহু গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়ে গেল, পুরুষত্ব হারাল বহু পুরুষ, বিকলাঙ্গ হয়ে গেল কত সহস্র, এই ধ্বংসের প্রক্রিয়া চলতেই লাগল। নরকের কল্পনাও এত বীভৎস নয়।

ট্রুমান হয়তো আশা করেছিলেন, এই এক আঘাতেই জাপানে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠবে। আত্মসমর্পণের আর একদিনও দেরি হবে না। কিন্তু জাপানের দিক থেকে কোনও সাড়াশব্দই নেই। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ? যাঁরা জীবন রক্ষার চেয়েও আত্মসম্মান রক্ষাকে বেশি মূল্য দেয়, তাঁরা করবে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ? সম্রাটের মর্যাদা রক্ষার কোনও শর্ত থাকবে না? জাপানি যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচার হবে জাপানের বাইরে? জাপানি সৈন্যদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেবে আমেরিকানরা, সৈন্যরা তা মেনে নেবে?

তা ছাড়া আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেবে কে? প্রধানমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, উপদেষ্টা পরিষদের কেউই সে দায়িত্ব নিতে রাজি নন। যিনি নেবেন, তিনিই দেশবাসীর চোখে ঘৃণ্য হবেন। একদল উগ্রবাদী যুবক পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাঁরা ঘোষণা করেছে, যে আত্মসমর্পণের কথা উচ্চারণ করবে, তাকেই হত্যা করা হবে। সেনাধ্যক্ষদের মধ্যেও অনেকেরই এরকম মনোভাব। একমাত্র এ দায়িত্ব নিতে পারেন সম্রাট, তাঁর কথার প্রতিবাদ করার সাধ্য কারুর নেই। জাপানিদের কাছে তাঁদের সম্রাট স্বয়ং দেবতা, জাপানে যাঁরা আত্মহত্যা করে তারা সম্রাটের প্রাসাদের দিকে মুখ করে বসে পেটে ছুরি চালায়।

তিনদিন অপেক্ষা করার পর ট্রুমান দ্বিতীয় বোমাটি ফেলার আদেশ দিলেন। কোকুরা এবং নাগাসাকি, এই দুটি শহরের মধ্যে বেছে নেওয়া হবে যে-কোনও একটিকে। বিমানটি প্রথমে উড়ে এলো কোকুরাতে, সেখানকার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ওপর থেকে শহরটি দেখাই যায় না। বিমানটি চক্রাকারে ঘুরতে লাগল, কিন্তু বিশাল ওজনের বোমাটি নিয়ে বেশিক্ষণ ঘোরা যাবে না, জ্বালানি ফুরিয়ে আসছে, তাই বিমানের মুখ ঘুরে গেল নাগাসাকির দিকে। সেখানকার আকাশেও ঘন মেঘের আবরণ। কিছুই দেখা যায় না। তবে কি ফিরে যেতে হবে? হঠাৎ মেঘ একটু ফাঁক হল, নীচে দেখা গেল পাহাড় প্রান্তের শহরটিকে একঝলক। বৈমানিক আর মুহূর্তও দেরি না করে বোমাটি সেখানে নিক্ষেপ করে চম্পট দিল। আকাশের মেঘ বাঁচিয়ে দিল কোকুরা শহরের মানুষদের, আবার সেই আকাশের মেঘ আচম্বিতে নাগাসাকির লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপর নেমে এলো মৃত্যুঝড় হয়ে। এবারের বোমাটি আরও শক্তিশালী, ধ্বংসলীলা আরও প্রচণ্ড।

এর মধ্যে স্ট্যালিন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। হিরোসিমায় পতিত অ্যাটম বোমাটির ধ্বংস করার ক্ষমতা দেখেই বোঝা গিয়েছিল, জাপানের শেষ দশা ঘনিয়ে এসেছে। জাপানের রণতরীবাহিনী আগেই শেষ হয়ে গেছে, আর সে দেশের পক্ষে স্থলযুদ্ধ চালানোও সম্ভব নয়। স্ট্যালিন সোভিয়েত জনগণকে পরমাণু অস্ত্রটির কথা সঠিক জানতেই দিলেন না,

সংবাদপত্রগুলিতেও এমন অকিঞ্চিৎকরভাবে ছাপা হল, যাতে কেউ গুরুত্ব না দেয়। এবং হিরোসিমার দু'দিন পর রাশিয়ার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হল। সঙ্গে সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ায় ঢুকে পড়ল রাশি রাশি রুশ সৈন্য। এ কি মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা? নাকি লুঠের মালের বখরা নেবার জন্য হুড়োহুড়ি? কিংবা জাপান জয়ের কৃতিত্ব স্ট্যালিন শুধু আমেরিকাকে দিতে চাননি? দ্বিতীয় বোমায় নাগাসাকি বিধ্বস্ত হবার পরেও যেন তা উপেক্ষা করে মাঞ্চুরিয়ায় রুশ সাফল্যের কথাই বিস্তারিতভাবে জানানো হল তাঁর দেশবাসীকে। এসব তবু বোঝা যায়। প্রত্যেক দেশই নিজের স্বার্থ দেখবে, এতে আর আশ্চর্যের কী আছে! কিন্তু যুদ্ধ শেষে স্ট্যালিনের বিবৃতি বেশ বিভ্রান্তিকর। ১৯০৪-৫ সালে জারের আমলের রাশিয়া জাপানের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পোর্ট আর্থার ও অন্য কিছু অঞ্চল হারিয়েছিল। এবারে জাপান পরাজিত হল রাশিয়ার কাছে। এতদিন পরে প্রতিশোধ নেওয়া হল সেই পূর্ব-পরাজয়ের। স্ট্যালিন বললেন, 'আমার মতন বয়স্ক ব্যক্তিরা গত চল্লিশ বছর ধরে এই দিনটিরই অপেক্ষা করছিলাম। আজ সেই দিন এসেছে!' একজন মার্ক্সবাদীর মুখে সাম্রাজ্যবাদী জারের আমল ও সেই ঐতিহ্যের সমর্থন!

পরপর দুটি অ্যাটম বোমার ধ্বংস ক্ষমতা দেখে জাপানের সমরনায়কদের বোধোদয় হল যে এর পরেও যুদ্ধ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে জাপান নামের দেশটাই পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। এরই মধ্যে গুজব ছড়াল যে নাগাসাকির তিনদিন পর খোদ টোকিও'র ওপরেই তৃতীয় অ্যাটম বোমাটি নিক্ষিপ্ত হবে। মাঞ্চুরিয়াতে রুশ আক্রমণের সংবাদেও তাঁদের হতবুদ্ধি করে দিয়েছে। নিরুপায় হয়ে তাঁরা সম্রাটের দ্বারস্থ হল। জাপানের সম্রাট সর্বক্ষণ নিজেকে আড়াল করে রাখেন, দেশের মানুষের সঙ্গে কখনও সরাসরি কথা বলেন না। তবু চরম সর্বনাশ রোধ করার জন্য তরুণ সম্রাট হিরোহিতো দেশবাসীকে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে ভাষণ দিতে রাজি হলেন। জাপান সরকারের পক্ষ থেকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ মেনে নিয়ে শুধু একটি আবেদন যুক্ত করা হল, যেন সম্রাটের মর্যাদা অন্তত রক্ষিত হয়।

১৫ আগস্ট বিকেল ৪টে বেজে পাঁচ মিনিটে সেই সংবাদ ঘোষিত হওয়ার পর বিশ্বযুদ্ধের অবসান হল। জাপানে পড়ে গেল আত্মহত্যার হিড়িক।

জাপানে অ্যাটম বোমার আক্রমণের সত্যিই কি কোনও প্রয়োজন ছিল? এমন কথিত আছে যে প্রথম পারমাণবিক অস্ত্রটির বিস্ফোরণের সময় প্রিন্সটনের সেন্টার অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এর গবেষণা কক্ষে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন মাথায় হাত দিয়ে মুখ কালো করে বসেছিলেন। হাহাকার করেছেন অন্য অনেক বৈজ্ঞানিক। কিন্তু তাঁরাই এই অস্ত্র তুলে দিয়েছেন এক রাষ্ট্রনায়কের হাতে। এই অস্ত্র যে মানব সভ্যতার ওপরেই চরম আঘাত করতে পারে, সেটুকু বোঝার মতন দূরদর্শিতা ওপেনহাইমারের মতন বৈজ্ঞানিকদের ছিল না? গীতার শ্লোকের আশ্রয় নেওয়া ছলনা মাত্র। তিন-চার হাজার বছর আগেকার দর্শন দিয়ে বর্তমানকালের বিচার চলে না।

পীত রঙের জাপানিদের হত্যা করার বদলে শ্বেতাঙ্গ জার্মানদের ধ্বংস করার জন্য জার্মানিতে কি অ্যাটম বোমা ফেলা হত? এ প্রশ্ন কিছুটা অবান্তর মনে হতে পারে, কেন না অ্যাটম বোমা নির্মাণ-প্রক্রিয়া শুরুই হয়েছিল হিটলারের রণ-উন্মাদনা থামাবার জন্য। কিন্তু অস্ত্রটির সফল পরীক্ষার আগেই হিটলার ধরাধাম পরিত্যাগ করেছে এবং ইউরোপে যুদ্ধ থেমে গেছে। যদি ইউরোপের যুদ্ধ আরও প্রলম্বিত হত, হিটলার আত্মহত্যা না করত, তা হলেও কি জার্মানিতে নিক্ষিপ্ত হত এই মারণাস্ত্র, যাতে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের মৃত্যু অনিবার্য? আমেরিকার বহু নাগরিক প্রাক্তন জার্মান, তাঁরা নিশ্চয়ই প্রতিবাদে সরব হত। আড়াইশো কোটি ডলার খরচ করে যে বস্তুটি নির্মিত হল, তার ধ্বংসক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখার জন্যই সেটি ফেলা হয় জাপানে। ট্রুমানের আর একটি উদ্দেশ্য, স্ট্যালিনকে তাঁর এই অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করা। অর্থাৎ এক যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ঠাণ্ডা যুদ্ধ। বিশ্বশান্তি স্থাপনের আশা

মিলিয়ে গেল শূন্যে।

শুধু মানবিক কারণে নয়, সামরিক কারণেও জাপানে এই পরমাণু বোমাবর্ষণ অপ্রয়োজনীয় ছিল। এই বোমার প্রবল সমর্থক চার্চিল পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, ব্রিটেনের মতনই জাপান একটি দ্বীপরাজ্য, নৌবাহিনী না থাকলে এরকম দেশ অচল হয়ে পড়ে। অ্যাটম বোমা ফেলার আগেই জাপানের নৌশক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং জাপানের পতন কিছুদিনের অপেক্ষা মাত্র। পৃথিবীর বহু দেশের সমর-বিশেষজ্ঞগণ, তাঁদের মধ্যে কিছু আমেরিকানও আছেন, জাপানের প্রতি এই অস্ত্রাঘাতের জন্য আমেরিকাকে ভর্ৎসনা করেছেন। যুদ্ধ প্রলম্বিত হবার হিসেব এবং তিরিশ-চল্লিশ লক্ষ সৈন্যের সম্ভাব্য মৃত্যুর পরিসংখ্যান অতিরঞ্জিত। খাদ্য-অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে জাপান যুদ্ধ চালাত কী করে?

অস্ত্রটি আদৌ নির্মাণ করারই কি কোনও প্রয়োজন ছিল? শুধু বিজ্ঞানের একটি নতুন তত্ত্বের সাফল্যের জন্যই এতখানি ঝুঁকি? যখন তত্ত্বটি পরীক্ষিত সত্য হিসেবে জানা হয়ে গেল, তখন মধ্যপথে সেই শক্তি ধ্বংসের কাজে না লাগিয়ে জীবনযাত্রার উন্নতির বহু কাজে লাগানো যেত না? কিংবা যুদ্ধের অবসানে ট্রুমান কি ঘোষণা করতে পারতেন না যে আর একটিও অ্যাটম বোমা উৎপন্ন হবে না? কলসি থেকে যে দৈত্যকে বার করা হয়েছে, তাকে আবার কলসিতে ভরে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হোক, আর যেন কেউ তার সন্ধান না করে! ট্রুমান সে প্রতিশ্রুতি দেননি। একালে বিজ্ঞানের কোনও আবিষ্কারের সংবাদই কোনও একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। অন্য দেশের বৈজ্ঞানিকদের এই পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের পদ্ধতি জানতে আর কতক্ষণ লাগে। আমেরিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, এদিকের পাল্লা ভারী রাখতে যোগ দিয়েছে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স, ওদিকে চিন, তারপর এখন যে-কোনও হেঁজি-পেঁজি গরিব দেশও প্রচুর অর্থসম্পদ জলাঞ্জলি দিয়ে একখানা-দু'খানা বোমা বানিয়ে ফেলতে পারে। নাগাসাকির পর এতগুলি বছরে আর কোথাও একটিও অ্যাটম বোমা ব্যবহৃত হয়নি, অথচ কী বিপুল অর্থের অপচয় হয়েছে অনেকগুলি দেশে এই অস্ত্রের নির্মাণে। মানুষের কি নিদারুণ মূর্খতা! এই বিপুল সম্পদে পৃথিবীর সব দেশের দারিদ্র্য নির্মূল করা যেত, কত মূক-মুখে দেওয়া যেত ভাষা। যে-সম্পদে গোটা মনুষ্যজাতিকে দেওয়া যেত মাথার ওপরে একটি আচ্ছাদন, সেই সম্পদ অস্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে এই পৃথিবীকেই যে-কোনও সময় ধ্বংস করার আশঙ্কা নিয়ে মাথার ওপর ঝুলছে।

এই প্রক্রিয়া শুরু করেছে আমেরিকা। সে জন্য ইতিহাস কোনওদিন সে দেশকে ক্ষমা করবে না। সমকালীন অনেক বিজ্ঞানীও ধিকৃত হবেন।

আট

দেশপ্রেম নামে ব্যাপারটা আমি প্রথম অনুভব করি আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের সময়। সেই বয়সেই খবরের কাগজের পৃষ্ঠা প্রথম চক্ষু টানে। গল্পের বই পড়ার নেশা এমন জমে উঠেছে যে কোথাও বাংলা অক্ষর দেখলে তা পড়তে হবেই, এমনকী মুড়ির ঠোঙা পর্যন্ত।

ইংরেজরা রেঙ্গুন পুনর্দখল করার পর আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। জাপানের নিজেরই তখন অন্তিম দশা, সে আর সাহায্য করবে কী করে? ইংরেজরা সুভাষচন্দ্রকে ধরতে পারল না, তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের অস্ত্র কেড়ে তাদের ভারতে নিয়ে এসে বন্দি করে রাখা হল দিল্লির লালকেল্লায়। তারপরই সরকারি ঘোষণা হল যে তাদের

কোর্ট মার্শাল হবে।

এতদিন আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতাম না। যুদ্ধের সময় নানারকম বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চলতে থাকে, খবরের কাগজে থাকে সেনসরশিপ। এখন যেন অনেক বন্ধ কক্ষ অর্গল মুক্ত হয়ে গেল। হাওয়া বদলও টের পাওয়া যায়। এতদিন বাতাস যেন ছিল বেশ ভারী, এখন অনেকটা ফুরফুরে। দুর্ভিক্ষের দশাও কমে এসেছে, অন্তত শহরে। আজাদ হিন্দ ফৌজের নানারকম বীরত্ব কাহিনী লোকের মুখে মুখে ঘুরছে। সুভাষচন্দ্র ক্রমশ হয়ে উঠছেন এক রোমাঞ্চকর নায়ক। এতদিন তিনি ছিলেন সুভাষ বোস, এখন থেকে হলেন নেতাজি। তাঁর যোদ্ধৃবেশের ছবিও বিক্রি হতে লাগল সর্বত্র।

হাওয়া বদলের আর একটা লক্ষণ, এতবড় একটা যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেও ইংরেজরা তেমন কোনও সম্ভ্রম আদায় করতে পারেনি ভারতবাসীর কাছ থেকে, বরং তাদের সম্পর্কে ভয় অনেকটা ভেঙে গেছে। চার্চিলের অপসারণ এবং শ্রমিক দলের এটলি প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় অনেকেরই ধারণা হয়ে গেছে যে এবারে আর ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ পরাধীন রাখা যাবে না। স্বায়ত্তশাসন কিংবা কোনও না কোনও ধরনের স্বাধীনতা দিতেই হবে। পত্র-পত্রিকায় সে সব কথাই খোলাখুলি লেখা হতে লাগল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক বিচারের ঘোষণা যেন ইংরেজ সরকারের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার শেষ মরিয়া প্রচেষ্টা। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল সারা ভারত জুড়ে। এবং সেই প্রতিবাদে মিশেছিল হিন্দু-মুসলমান-শিখের মিলিত কণ্ঠস্বর।

আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিটি খুব ছোট, সেখানে শুধু সপ্তাহে একখানা বই পাওয়া যেতে পারে। প্রতি শনিবার। তাও আলাদা কোনও লাইব্রেরিয়ান নেই, যে-শিক্ষক মহাশয় ভারপ্রাপ্ত, তিনি কোনও কারণে এক শনিবার অনুপস্থিত থাকলে সিঁড়ির পাশের গ্রন্থাগারটির আর তালা খোলা হত না সেদিন। সপ্তাহে একখানি বই যেন দাবানলে একটি শুকনো পাতা। ক্লাসের সহপাঠীদের মধ্যেও তখন গল্পের বই বদলা-বদলি হয়। আমি সবচেয়ে বেশি বই পেতাম একটি মাড়োয়ারি ছেলের কাছ থেকে, তার নাম কমল ভাণ্ডারি। কমলের বাংলা কথায় অবাঙালি সুলভ টান ছিল, 'কিন্তু'র বদলে বলত 'লেকিন', অথচ বাংলা পড়তে পারত খুব তাড়াতাড়ি। অনেক সময়, ক্লাসের মাস্টারমশাইয়ের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে হাই বেঞ্চের আড়ালে একই গল্পের বই পড়তাম দু'জনে, আমার শেষ হবার আগেই কমল পাতা উল্টে দিত। বলাই বাহুল্য, আমাদের তুলনায় কমলের বই কেনার ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি, নতুন নতুন বই কিনে সে নিজে শেষ করার পরেই বিলিয়ে দিত বন্ধুদের মধ্যে।

আমার সহপাঠী ও প্রতিবেশী আশুদের বাড়ির লাইব্রেরিরও আমি ছিলাম অন্যতম রক্ষক ও ভক্ষক। ঠিক কোথা থেকে মনে নেই, এই সময় আমার হাতে আসে একটি বই, সেটির নাম 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান', কিংবা এই ধরনের কিছু। তাতে ছিল ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, ভগৎ সিং, সূর্য সেন প্রমুখদের সংক্ষিপ্ত জীবনী। খুব আবেগময় ভাষা, পড়তে গেলে চোখে জল আসবেই। সে বই পড়ে যে কত কেঁদেছি তার ঠিক নেই। শুধু তাই নয়, ভগবানের ওপর খুব রাগ হয়েছিল, কেন তিনি আমাকে আরও অন্তত আট-দশ বছর আগে জন্মাতে দেননি? (আমার জন্মের জন্য মা-বাবা কিংবা ভগবান দায়ী, সে সম্পর্কে সংশয় তখন যায়নি। সে যাই হোক, ভগবানের ওপর দোষারোপ করাই সুবিধেজনক।) আর মাত্র ছ' সাত বছর আগে জন্মালেও আমি দেশের জন্য ক্ষুদিরামের মতন প্রাণ দিতে পারতাম! আজাদ হিন্দ ফৌজের কত সৈন্য দেশের মুক্তির জন্যই তো লড়াই করতে করতে মরেছে। এখন যারা রয়েছে বিচারের অপেক্ষায়, তারাও হয়তো ঝুলবে ফাঁসির দড়িতে। আর আমি দেশের জন্য কিছুই করতে পারব না?

পরাধীন ভারতে আমার মতন দশ-বারো বছরের ছেলে-মেয়েরা স্বাধীনতা আন্দোলনে

কোনও ভূমিকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তখন আমরা বালক না কিশোর? গলা ভাঙেনি, নাকের নীচটা পরিষ্কার, হাফ প্যান্ট পরি। কিশোরদের তবু খানিকটা কদর থাকে বিপ্লবীদের কাছে, কিন্তু বালকরা পাত্তা পায় না। ক্ষুদিরাম তো পনেরো-ষোলো বছর বয়েস থেকেই যোগ দিয়েছিল বিপ্লবীদের সঙ্গে। ইস, ক্ষুদিরামের বয়েস আমার থেকে মাত্র চার-পাঁচ বছর বেশি।

আমার বয়েসি বালকদের একমাত্র রাজদ্রোহমূলক আচরণ ছিল, পুলিশ দেখলে আওয়াজ দেওয়া, তাও নিরাপদ দূরত্ব থেকে। আমরা বলতাম, বন্দে মাতরম্, পুলিশের মাথা গরম! কিংবা বন্দে মাতরম্ লাল পাগড়ির মাথা গরম! সেপাই বা কনস্টেবল জাতীয় সব পুলিশের মাথায় থাকত লাল পাগড়ি। অফিসারদের মাথায় শোলার হ্যাট। এই গরমের দেশে গরম কালেও সর্বক্ষণ ওরকম পাগড়ি বা টুপি পরে থাকলে এমনিতেই তো মাথা গরম হবার কথা!

পরাধীন আমলে জন্মে আমি সেই বালক বয়েসেও একেবারে ইংরেজ-সংস্পর্শ বর্জিত থাকতে পারিনি। শ্বেতাঙ্গ শাসক শ্রেণীর অত্যাচারের অতি সামান্য একটি নমুনা অঙ্গে ধারণ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। সামান্য হলেও খুব জ্বলজ্বলে ভাবে মনে আছে। আমি দাঁড়িয়েছিলাম হাতিবাগান বাজারের সামনে সকালবেলা, হাতে একটা থলি নিয়ে। বাবা এক জায়গা থেকে টিউশানি সেরে আসবেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাজার করবেন পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে, তারপর আমার হাতে থলি দিয়ে তিনি দ্রুত চলে যাবেন অন্য টিউশানিতে। সেদিন বাবা তখনও পৌঁছননি, একটা মিছিল আসছে শ্যামবাজারের দিক থেকে। তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার বন্ধ করার দাবিতে শহর উত্তাল। কয়েকদিন আগে পুলিশের গুলিতে মরেছে কয়েকজন, প্রতিদিন প্রতিবাদ মিছিল। আমি মিছিলটা দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে রাস্তার একেবারে ধারে এসে দাঁড়িয়ে উঁকি মারছি আরও অনেকের সঙ্গে। বিপরীত দিক থেকে ঝড়ের বেগে এসে হঠাৎ থামল একটা জিপ গাড়ি, তার থেকে টপাটপ করে লাফিয়ে নামল কয়েকজন পুলিশ, তারা রাস্তার দু'পাশের ভিড় সরাতে লাগল লাঠি উঁচিয়ে। আমি পিছিয়ে আসার আগেই একজন লালমুখো সাহেব পুলিশ তার এক হাতের থাবা আমার মুখে চেপে ঠেলে দিল খুব জোরে। আমি ছিটকে গিয়ে পড়লাম ফুটপাথে, মাথাটা জোরে ঠুকে গেল।

এইটুকুই মাত্র। অন্য ভয়ার্ত লোকজন আমার ওপর দিয়েই ছুটে গিয়ে আমায় পিষে দিতে পারত, সেরকম কিছু হয়নি। আমার মাথা ফাটেনি, রক্তও বেরোয়নি, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে চম্পট। পুলিশটি খাঁটি ইংরেজ না অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। পুলিশসুলভ লম্বা-চওড়া চেহারা, শ্বেতাঙ্গ, নির্মম মুখখানি দৈত্যের মতন, তার হাতের পাঞ্জাটা এতই বড় যে আমার মুখখানা প্রায় ঢেকে গিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কী, সেই ঘটনা স্মরণ করলে আজও আমার কিছুটা গর্বমিশ্রিত সুখানুভূতি হয়। ভাগ্যিস পুলিশটা আমাকে ওই ভাবে ধাক্কা দিয়েছিল, তাই এইটুকু অন্তত তো বলতে পারব যে পরাধীন আমলে একেবারে গা বাঁচিয়ে থাকিনি, রাস্তায় মাথা ঠুকে গিয়েছিল। অনেকে প্রাণ দিয়েছে, জেল খেটেছে, নির্বাসনে গেছে, আমি আমার বয়েসের অনুপাতে সহ্য করেছি যৎসামান্য।

যতদূর জানি, আমাদের বংশে, আত্মীয়-কুটুম্বদের মধ্যে কেউ জেল খাটেনি, কেউ স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়নি, রাজনীতিতে যোগ দেয়নি। শুনেছি, ছাত্রাবস্থায় আমার বাবাকে একবার সন্দেহের বশে পুলিশ থানায় নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। বাবা তখন একটা মেসে থাকতেন। কোনও পলাতক বিপ্লবীর খোঁজে পুলিশ হঠাৎ এসে সার্চ করে সেই মেস বাড়ি। বাবা সব সময় একটা ছোট নোট বই রাখতেন পকেটে, তাতে রাজ্যের লোকের নাম ও ঠিকানা। যার সঙ্গেই পথে-ঘাটে, বাসে-ট্রামে সামান্য আলাপ হত, ওই নোট বুকে তাদের নাম-ঠিকানা লিখে রাখতেন, বলা তো যায় না কখন কী কাজে লাগে। পুলিশ সেই নোট বইতে কয়েকজন সন্দেহজনক ব্যক্তির নাম দেখতে পায় এবং গোঁফ খাড়া করে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারা বাবাকে চুনোপুটি জ্ঞানে পরিত্যাগ করে ছুটেছিল রাঘব বোয়ালদের সন্ধানে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের মার্চিং সং 'কদম কদম বঢ়ায়ে যা, খুসিসে গীত গাহে যা—', কী করে যেন আমরা শিখে গেলাম সবাই। প্রত্যেক পাড়ার ক্লাবে ওই গানটি জনপ্রিয়তায় বন্দে মাতরম্ কিংবা জন-গণ-মন-কে হটিয়ে দিল। পাড়ায় পাড়ায় নতুন ধরনের ক্লাবও গজিয়ে উঠল হঠাৎ। এই সব ক্লাবে কেট্‌ল ড্রাম, বিউগ্‌ল, ব্যাগ পাইপ এই সব বাজাতে শেখানো হয়। পয়লা বৈশাখের প্রভাত ফেরি কিংবা দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন-শোভাযাত্রা যাই হোক না কেন, আগে আগে যাবে সাদা প্যান্ট, সাদা শার্ট ও সাদা কেড্‌স জুতো পরা এরকম কোনও ক্লাবের ছেলেরা, ওই সব বিলিতি বাজনা বাজাতে বাজাতে। এসব সরঞ্জাম কিনতে অনেক টাকা লাগে, সে জন্য প্রত্যেক ক্লাবেরই একজন ধনী পৃষ্ঠপোষক দরকার। আমাদের গ্রে স্ট্রিট পাড়ায় অনেক সচ্ছল কবিরাজ ও জ্যোতিষীর বাস। পাশাপাশি দু'জন জ্যোতিষীর সাইনবোর্ডেই লেখা ছিল 'বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ'। একজন ধনী কবিরাজ মশাই নিজেই একটি ব্যান্ড পার্টির ক্লাব খুললেন, তাঁর বাড়ির পেছনে অনেকটা জমি খালি পড়েছিল, সেখানেই হত বাজনার মহড়া। পি রানা কোম্পানি থেকে তিনি ঝকঝকে সব কেট্‌ল ড্রাম, বিউগল, বিগড্রাম ইত্যাদি কিনে আনলেন তো বটেই, দর্জি ডাকিয়ে প্রত্যেক ক্লাব সদস্যের সাদা জামা, সাদা প্যান্ট তৈরি করিয়ে দিলেন। এবং গলায় নীল রঙের স্কার্ফ। সম্ভবত ওই জামা-প্যান্টের লোভেই আমি ভর্তি হয়েছিলাম সেই ক্লাবে। কেট্‌ল ড্রাম বাজাতে শিখে গেলাম অবিলম্বে। কেন যেন আমাদের ধারণা হয়েছিল, এই সব বাজনার সঙ্গে যুদ্ধের কোনও সম্পর্ক আছে। প্রত্যেকদিন একবার সেই কবিরাজ মশাই ধুতির ওপর কালো কোট পরে একটা টুলের ওপর দাঁড়াতেন, হাসি হাসি মুখে কপালে দু আঙুল ঠেকিয়ে, আমরা বাজাতে বাজাতে তাঁকে মার্চ পাস্ট করে যেতাম, প্রথমে অল্প বয়েসীরা কেট্‌ল ড্রাম, তারপর একটু বড়দের ঠোঁটে বিউগ্‌ল, তারপর সবচেয়ে শক্তিশালী যুবকটির বুকে বিগ ড্রাম বা জয় ঢাক। আমাদের ধ্বনি দিতে হত, জয়হিন্দ! জয়হিন্দ! জয় নেতাজি, জয় কবিরাজ মশাই! (নাম মনে আছে। লিখছি না।)

মাস ছয়েক কেট্‌ল ড্রাম শিল্পী থাকার পর আমার বিউগ্‌ল-বাজনদার পদে উত্তীর্ণ হওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। বিউগ্‌ল জিনিসটা দেখতে কী সুন্দর, যেন সোনার তৈরি। ক্লাব থেকে একটা বিউগ্‌ল আমাকে দিয়ে দেওয়া হল প্র্যাকটিস করার জন্য। কিন্তু বিউগ্‌ল প্র্যাকটিস করা নিয়েই যত ঝামেলা। বিউগ্‌ল থেকে শব্দ বের করা মোটেই সহজ নয়। দু'গাল ফুলিয়ে বাতাস ভরে যতই জোরে চাপ দেওয়া যাক, তবু শব্দ বেরোয় না। তারপর একদিন হঠাৎ প্যাঁ করে ওঠে, সেটা একেবারে বেসুরো। সেই বেসুরো আওয়াজকে সুরে আনতে সময় লাগে বেশ কিছুদিন। আমার ওই বেসুরো পর্যায়ে বাড়ির লোক, পাড়ার লোকদের কাছ থেকে প্রবল আপত্তি আসতে লাগল। ভোরবেলা ছাদে গিয়ে প্র্যাকটিস করি, তাতেও অনেকে রেগে যায়, বিকট আওয়াজে ঘুম ভাঙা তাদের পছন্দ হবে কেন? তা হলে লোকে বিউগ্‌ল বাজানো শেখে কী করে? দু' একজন বলল, গঙ্গার ধারে যা, হাওড়ার দিকে মুখ করে বাজাবি! শেষ পর্যন্ত আমার বিউগল-শিল্পী হওয়া হল না অন্য কারণে, একদিন একজন আত্মীয় আমার হাতে ওই যন্ত্রটি দেখে আঁতকে উঠলেন। তাঁর ধারণা, বিউগ্‌ল বাজাতে খুব বেশি দম লাগে এবং সে জন্য যক্ষ্মা হয়। তাঁর সেই ধারণাটি আমার জনক-জননীর কাছে অঙ্গভঙ্গি সহকারে ব্যক্ত করায় তাঁরাও খুব ভয় পেয়ে গেলেন। চল্লিশের দশক পর্যন্ত বাঙালির কাছে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ ছিল যক্ষ্মা। ক্যানসার বা হৃদরোগের তেমন রমরমা তখনও হয়নি। অধিকাংশ বাংলা ট্র্যাজিক গল্প-উপন্যাসের নায়ক যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হবেই, নায়িকার কোলে মাথা দিয়ে কাশতে কাশতে তার ঠোঁটের কোণে রক্ত গড়িয়ে আসবে। যক্ষ্মার এখনকার নাম টি বি, তখন বলা হত থাইসিস, বাংলা নাম সচরাচর কেউ উচ্চারণ করে না।

ঘরে ঘরে নেতাজির ছবি তো স্থান পেয়ে গেছেই, আরও তিনটি ছবি বিক্রি হতে লাগল খুব। আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনাপতি শাহ্‌নওয়াজ, সাইগল এবং ধীলন। এঁদের বিরুদ্ধেই বিচার

শুরু হয় প্রথমে। মুসলমান, হিন্দু ও শিখ, ফলে এই তিন সম্প্রদায়ই প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র শুধু বাঙালির নেতা নন, সারা ভারতে তাঁর জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। তিনি অনুপস্থিত, বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর একটা খবর ছড়ালেও কেউ তা বিশ্বাস করেনি, তিনি ধরা পড়েননি মানেই কোথাও আত্মগোপন করে আছেন, যথা সময়ে আবার প্রকাশিত হবেন। সেই সময় যদি কোনও রকম জনপ্রিয়তার বিচার হতো, তা হলে গাঁধী, নেহরু ও জিন্নার চেয়েও যে সুভাষচন্দ্র ওপরে স্থান পেতেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আজাদ হিন্দ ফৌজে তিনি এমন চমৎকারভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োগ করেছিলেন, যে-রকম আগে দেখা যায়নি। কোনও রকম সাম্প্রদায়িক গণ্ডি টানা ছিল না। হিন্দু-মুসলমান সৈন্যরা আহার করত পাশাপাশি বসে। যদি বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুসংবাদ মিথ্যে হত, যদি সত্যিই তিনি কোথাও লুকিয়ে থাকতেন এবং পরের বছরে অকস্মাৎ আবির্ভূত হতেন, তা হলে নিশ্চিত অন্যরকম অবস্থার সৃষ্টি হত। ভারতের পরবর্তী ইতিহাসই বদলে যেতে পারত, দেশ ভাগ কিংবা পাকিস্তানের প্রশ্নটিই হয়তো হয়ে যেত অবান্তর।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের আগে পর্যন্ত কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, কমিউনিস্ট পার্টি সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন তো করেইনি, বরং ধিক্কার জানিয়েছে। জওহরলাল নেহরু এমন কথাও বলেছিলেন যে, যদি সুভাষচন্দ্র সসৈন্যে ভারতে ঢুকতে চান, তা হলে তিনি নিজে তাদের বাধা দেবেন। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা অসহ্য কষ্ট সহ্য করে, দুর্দশার মধ্যে, আহার্য ও ওষুধের অভাব নিয়েও দেশের জন্য প্রাণপণে লড়াই করেছে, এখন তাদের বিচার ও শাস্তির বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। সব শ্রেণীর জনসাধারণের এ রকম প্রতিক্রিয়া দেখে কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষেই আর বিমুখ হয়ে থাকা সম্ভব নয়। প্রতিবাদ মিছিলে একে একে যোগ দিল সবাই। কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, তাদের প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা হিন্দু মহাসভা, পঞ্জাবের দল এবং কিছুটা দ্বিধার পরে কমিউনিস্ট পার্টিও। সামরিক আদালতে সরকার পক্ষে বাঘা বাঘা উকিল ব্যারিস্টার দাঁড় করানো হয়েছিল, জনসাধারণের পক্ষ থেকেও আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থনে সমবেত হলেন দেশের প্রখ্যাত আইনজীবীরা। ব্যারিস্টারি পাশ করেও জওহরলাল নেহরু কখনও মামলা-মোকদ্দমা করেননি, তিনিও সামলা এঁটে যোগ দিলেন এই দলে।

আদালতে শাহ্‌নওয়াজ যে ভাষণ দেন, তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। তিনি এক বিশাল পরিবারের সন্তান, যে-পরিবারের প্রতিটি সমর্থ পুরুষই ইংরেজদের অধীনে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বরাবর যোগ দিয়েছেন। তাঁর বাবা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষ নিয়েই লড়েছেন। এবং এখনও সে পরিবারের অন্তত আশিজন ব্যক্তি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন অফিসার পদে যুক্ত রয়েছেন। পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী তিনিও ওই সেনাবাহিনীতেই যোগ দিয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজে চলে আসেন বিবেকের তাড়নায়। তাঁদের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের প্রধান অভিযোগ বিশ্বাসঘাতকতার। অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে আছে, এই সব সেনাপতিরা অনেক অনিচ্ছুক ভারতীয় সৈন্যদের জোর করে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে বাধ্য করেছেন। এ রকম কিছু কিছু অনিচ্ছুক সৈন্যদের ওপর চরম অত্যাচার, এমনকী হত্যারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর উত্তরে শাহ্‌নওয়াজ বলেন :

আই এন এ-তে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই আমি স্থির করেছিলাম যে আমি আমার সর্বস্ব—আমার জীবন, আমার ঘর সংসার এবং সম্রাটের প্রতি আমার পারিবারিক আনুগত্যের ঐতিহ্য, সব কিছুই উৎসর্গ করব। আমি মনে মনে এমনকী এও ঠিক করে নিয়েছিলাম যে আমার ভাইও যদি আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা হলে তার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করব এবং ১৯৪৪ সালের পরবর্তী সময়ের যুদ্ধে আমরা যথার্থই পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করি। আমি এবং আমার খুড়তুতো ভাই চিন পাহাড় এলাকায় প্রায় দু' মাস ধরে প্রতিদিনই পরস্পরের বিরোধিতা

করেছি। সে আহত হয়েছিল। সম্রাট না স্বদেশ, কার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা হবে, সেটাই ছিল আমাদের প্রধান প্রশ্ন। আমি দেশের প্রতি অনুগত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করব বলে আমি নেতাজির কাছে পবিত্র অঙ্গীকার করেছিলাম ... এটা বলা বোধহয় ভুল হবে না যে তাঁর ব্যক্তিত্বে এবং তাঁর বক্তৃতা শুনে আমি সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি ভারতবর্ষের প্রকৃত চিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, এবং আমার জীবনে সেই প্রথম আমি একজন ভারতীয়ের চোখ দিয়ে ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করলাম। দেশের প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ এবং ঐকান্তিক মমত্ববোধ, তাঁর অকপট আচরণ এবং জাপানি অভিসন্ধির কাছে মাথা নোয়াতে তাঁর প্রবল আপত্তি লক্ষ করে আমি রীতিমতো পুলকিত বোধ করেছিলাম।... সেই সব লক্ষ লক্ষ উপবাসী মানুষ, যাদের নির্দয়ভাবে শোষণ করে এবং যাদের ইচ্ছাকৃতভাবে নিরক্ষর ও অজ্ঞ রেখে ব্রিটিশরা নিজেদের শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখেছিল, তাদের কথা চিন্তা করে আমার মনে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে একটা তীব্র ঘৃণার বোধ সৃষ্টি হয়েছিল।... আমি আপনাদের এবং আমার দেশবাসীর অবগতির জন্য জানাতে চাই যে আই এন এ যে-দুর্ভোগ সহ্য করেছে, তা কোনও ভাড়াটে কিংবা ক্রীড়নক সৈন্যবাহিনীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। বস্তুত আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করার জন্যই লড়াই করেছিলাম।

অন্য দুই সেনাধ্যক্ষের বিবৃতিও প্রায় একইরকম। তাঁদের বক্তব্যে আরও একটি বিষয় ফুটে উঠেছিল। জাপানকে তাঁরা কেউ প্রকৃত বিশ্বাস করেননি, জাপানের কাছ থেকে বিশেষ কিছু প্রত্যাশাও করেননি। বরং, জাপান যদি কোনওক্রমে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে, তা হলে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করারও মানসিক প্রস্তুতি ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের।

ইংরেজ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখানো। আজাদ হিন্দ ফৌজের কিছু সৈন্যকে শাস্তি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যও এটা প্রয়োজনীয়। কিন্তু ফল হল সম্পূর্ণ বিপরীত। হঠাৎ যেন ভয় ভেঙে গেল। এই বিচারের অধিকারেরই বিরুদ্ধতা করে বসল ভারতীয় প্রজারা। এমনকী ইন্ডিয়ান আর্মির অনুগত সৈন্যরাও এই সরকারি সিদ্ধান্ত সমর্থন করেনি, তাদের সহানুভূতি প্রকাশ পেল আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি।

কলকাতায় প্রথম আন্দোলন শুরু করে ছাত্ররা। দুপুরবেলা একটা মিছিল যাচ্ছে ধর্মতলা স্ট্রিট দিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে, মাঝপথে আটকাল পুলিশ। লাঠি-সোঁটা, বন্দুকধারী পুলিশ দেখেও কিন্তু ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হল না, সবাই বসে পড়ল রাস্তায়। পুলিশ তাদের এগোতে দেবে না, ছাত্ররাও পিছু হটবে না। দু' পাশের পাড়া থেকে ছুটে এল লোকজন, তারা এবং পথচারীরাও বসে পড়ল ছাত্রদের পাশে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসছে আরও বহু মানুষ, কেউ তাদের ডাকেনি। এর মধ্যে একবার লাঠি চার্জ হয়ে গেছে, তবু বেড়েই চলছে মানুষ, মুহুর্মুহু স্লোগান উঠছে, জয় হিন্দ! কুইট ইন্ডিয়া! ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিপাত যাক! সন্ধের পর ফলপট্টির মুসলমান ছেলেরা ইট মেরে মেরে সব বাল্‌ব ভেঙে দিল। অন্ধকারে এগিয়ে চলল শীতের রাত। কেউ জায়গা ছেড়ে নড়বে না! কলকাতা শহরে এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য!

লাঠি ও গুলি চালাবার আগে পুলিশ থেকে অভিযোগ করা হয় যে জনতা ইট ছুঁড়েছে তাদের দিকে। ইটের বিরুদ্ধে বন্দুকের গুলি! সেদিন লড়াইটা অসম হলেও পরদিন তা হয়নি। ভোরের সংবাদপত্র এই পুলিশি অত্যাচারের খবর পৌঁছে দিল সারা শহরে। কেউ কিছু নির্দেশ দিল না, সব অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ এমনিই বন্ধ হয়ে গেল। দোকান বন্ধ। হাজার হাজার মানুষ জমা হতে লাগল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। বিভিন্ন দিক থেকে মিছিল আসছে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আর তিল ধারণের জায়গা নেই, পঞ্চাশ-ষাট হাজারের চেয়েও বেশি মানুষ ছড়িয়ে আছে চারদিকের রাস্তায়। তাদের মধ্যে কংগ্রেসের তে-রঙা পতাকা, মুসলিম লিগের সবুজ

পতাকা, কমিউনিস্টদের লাল ঝাণ্ডা, হিন্দু মহাসভার গৈরিক পতাকা। এক একটা গোষ্ঠী আওয়াজ তুলছে, বন্দে মাতরম্, আল্লা হো আকবর, ইনকিলাব জিন্দাবাদ; আবার সমবেতভাবে গর্জন করছে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! পুলিশি জুলুম চলবে না, চলবে না। তারপর এক সময় ক্রোধের বিস্ফোরণ হল, শুরু হল পুলিশকে মারা, গাড়ি পোড়ানো। অনেক জায়গায় পুলিশ ভয়ে পালিয়েছে, অনেক জায়গায় গুলি করে মানুষ মেরেছে। ফরাসি বিপ্লব এইভাবেই শুরু হয়েছিল, কলকাতায় হলেও হতে পারত।

ভারতের বড় লাট ওয়াভেল, প্রধান সেনাপতি অকিনলেক। জনসাধারণের এমন উগ্র প্রতিক্রিয়া সরকারকে চিন্তায় ফেলে দিল। এর পরেও কি বিচার চালিয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত? ওপরের মহল থেকে ঠিক করা হল, কোর্ট মার্শালে শাস্তি হলেও প্রধান সেনাপতি নিজ অধিকার বলে সে শাস্তি তো মকুব করে দিতেই পারেন। সেই সূত্র অনুসারে শাহ্‌নওয়াজ, সেগল আর ধীলনকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হল। তাতে যেন আরও বেড়ে গেল এঁদের গৌরব, বিভিন্ন শহরে শহরে এঁই তিনজনকে দেওয়া হল বীরের সংবর্ধনা। সে রকম অনেক সংবর্ধনা সভায় সরকারি ফৌজের ভারতীয় সেনারা উর্দি পরেই হাজির! বছর গড়াতে না গড়াতেই এসে গেল নেতাজির পঞ্চাশতম জন্মদিন। বিপুলভাবে সারা দেশে পালিত হল সেই দিনটি।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কোর্ট মার্শাল ঘোষণা এবং তা শুরু করে দেবার পরেও জনগণের চাপে তা কি একেবারে বন্ধ করে দিতে পারে? তাতে রাজশক্তির সম্মান থাকে কোথায়! একটা মুখ রক্ষার উপায় বার করা হল। আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিকাংশ বন্দিকে মার্জনা করা হবে বটে, তবে যে ক'জনের বিরুদ্ধে সহযুদ্ধবন্দিদের ওপর নির্মম অত্যাচার এবং সভ্যতার পরিপন্থী ব্যবহারের অভিযোগ আছে, তাদের বিচার চলবে। ফেব্রুয়ারি মাসে শোনা গেল, সামরিক আদালতের বিচারে ক্যাপ্টেন রশিদ আলি নামে এক বন্দির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেও সরকার দয়া পরবশ হয়ে তা কমিয়ে সাত বছরের সশ্রম দণ্ড দিয়েছেন। আবার ফেটে পড়ল মানুষের ক্ষোভ। মাঝখানের এই কয়েক মাসে নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আবেগ অনেক বেড়ে গেছে। টানা ছ'দিন ধরে কলকাতায়, শুধু কলকাতায় নয়, আরও অনেক অঞ্চলে চলল সরকার পক্ষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের খণ্ডযুদ্ধ। শুধু পুলিশ নয়, মিলিটারি নামিয়ে দেওয়া হল আন্দোলন রুখতে, তাতেও ভয় না পেয়ে আন্দোলনকারীরা পুড়িয়ে দিল অনেক মিলেটারি ট্রাক। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে আটকে দেওয়া হতে লাগল পুলিশ-মিলিটারির গতিবিধি। বাংলায় তখন বেশ কিছু আমেরিকান সৈন্য রয়ে গিয়েছিল, তারা তখন দেশে ফেরার মুখে, জনতার রোষে তাদেরও অনেক গাড়ি পুড়ল, আহত হল কিছু আমেরিকান সৈন্য। সে জন্য এখানকার আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর কমান্ডার ঘোষণা করে দিলেন, ভারতের অভ্যন্তরে গণ-আন্দোলন দমন করার জন্য আমেরিকান সৈন্যবাহিনীকে ব্যবহার করা চলবে না।

কয়েকদিন আগেও সাধারণ মানুষ রশিদ আলি নামে কারও নামও শোনেনি, তবু তারই মুক্তির দাবিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিতে লাগল হিন্দু ও মুসলমান। সংবাদপত্রে আহত-নিহতদের তালিকাটা এই রকম : আলি হোসেন, বঙ্কিম দত্ত, মহঃ ইসমাইল, জানকী সাহা, চন্দর সিং, মেহের খান, রামচন্দ্র, মহঃ শরীফ প্রমুখ। এবারে জয় হিন্দ, জয় নেতাজি, রশিদ আলির মুক্তি চাই ইত্যাদি স্লোগানের সঙ্গে যুক্ত হল, কংগ্রেস-লিগ এক হো! হিন্দু-মুসলিম এক হও! লীগ নেতা সুরাবর্দি ছাত্রদের সামনে এসে বললেন, 'আমার জীবনের একটা বড় আশা আজ পূর্ণ হয়েছে—কংগ্রেস, লিগ পতাকার নীচে হিন্দু-মুসলমান ছাত্ররা এক হয়ে দাঁড়িয়েছে!' নাজিমুদ্দিন নামে এক শহীদের মৃতদেহ নাখোদা মসজিদ থেকে মানিকতলায় নিয়ে যাবার পথে প্রায় পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-মুসলমান অনুগমন করে, কবর দেবার পর সেই মাটি ছুঁয়ে লিগের এক নেতা বলে ওঠেন, "এই মাটি যেন লিগ ও কংগ্রেসের পতাকাকে শক্ত করে

বেঁধে দেয়, শহীদের রক্তে এই বন্ধন চিরদিনের জন্য এক হয়ে যাক!"

কলকাতার ঘটনার দু'দিন পরেই মুম্বইয়ের তলোয়ার জাহাজের নাবিকরা শুরু করে নৌ বিদ্রোহ।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার কাহিনী ও তার প্রতিক্রিয়ার বিবরণ বিশদভাবে লিখলাম বিশেষ কারণে। এসব ঘটনা আমার স্মৃতিতে বিশেষ নেই। রশিদ আলি দিবসের একটি মিছিলে স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েছিলাম অস্পষ্ট মনে পড়ে, নিছক দৌড়াদৌড়ি ছাড়া আর কিছু করিনি বোধহয়। বইপত্র দেখে সেই সময়কার তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এই পর্বটি বিস্তৃতভাবে লিখলাম শুধু এটাই বোঝাবার জন্য যে মানুষ কী বিচিত্র প্রাণী আর ধর্ম কী বিষম বস্তু! তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে দারুণ মন কষাকষি ও দর কষাকষি চলছে। তিক্ততা ও বিদ্বেষ চলে গেছে চূড়ান্ত পর্যায়ে। এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করা হচ্ছে যে হিন্দু আর মুসলমান কিছুতেই আর মিলেমিশে থাকতে পারবে না। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার উপলক্ষে কী করে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে সাম্প্রদায়িকতা ঘুচে গেল? কোনও রাজনৈতিক নির্দেশ ছিল না, সাধারণ মানুষের আবেগ সব দলের ব্যবধানও মুছে দিয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সরকারের বিরুদ্ধে লড়েছে, গুলি খেয়ে পাশাপাশি ঢলে পড়েছে। তা হলে, জীবনে ও মরণেও তারা একসঙ্গে থাকতে পারে?

আবার এইসব মানুষই কত তাড়াতাড়ি বদলে যেতে পারে নেতাদের নির্দেশে! আজ যাকে ভাই বলে সম্বোধন করছে, কাল তার বুকে ছুরি বসাতে যাচ্ছে। ব্যবধান কীসের? শুধু ধর্মের। ধর্মের ডাকে মানুষ ভেড়ার পাল হয়ে যায়! ধর্ম যেন মানবিকতা বর্জিত। দয়া, মায়া, স্নেহ, করুণা বর্জিত। মানুষের জন্য ধর্ম, না ধর্মের জন্য মানুষ? ধর্মীয় উন্মাদনায় মানুষ অন্য ধর্মের একটি শিশুকেও ছুরি দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে, কিন্তু রাস্তা থেকে কুকুরছানা বুকে তুলে নিয়ে যায়।

১৯৪৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় হিন্দু ও মুসলমানের একসঙ্গে পা মেলানো, হাত মেলানোর মধুর দৃশ্যটি দেখা গিয়েছিল, তার ঠিক আট মাস পাঁচ দিন পর এই কলকাতাতেই আবার যে তাণ্ডব শুরু হল, তা কি আমরা কোনওদিন ভুলতে পারব?

নয়

পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে আগে জাগে কে? খুব সম্ভবত মোরগ। শুধু সে নিজে জাগে না, প্রকৃতি যেন তাকে দায়িত্ব দিয়েছে অন্যদেরও জাগাবার। একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সে ভালো করে আলো ফোটবার আগেই গলা ফুলিয়ে তারস্বরে কোঁকর কোঁ শুরু করে। কতবার কত ডাকবাংলোতে ভোরবেলায় আরাম-ঘুম ভেঙেছে মোরগের চেল্লামেল্লিতে। বিরক্ত হয়ে বাইরে এসেছি। কিন্তু লাল-ঝুঁটি মোরগের দৃপ্ত ভঙ্গিটি দৃশ্যত ভারী সুন্দর।

আমাদের ছেলেবেলায় অবশ্য মোরগ-মুরগি ধারে কাছে ছিল না, গ্রামেও না, শহরেও না। মুরগি তো যবন পক্ষী, হিন্দু পল্লীতে তাদের স্থান নেই। আমিষাশী হিন্দুদের গো-মাংস ভক্ষণ সম্পর্কে আপত্তির তবু কারণ বোঝা যায়, (যদিও প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিরা যজ্ঞের আগুনে পুড়িয়ে দিব্যি বিফ কাবাব বানিয়ে খেতেন বোধহয়, অন্তত অতিথি এলে যে তাকে গো-মাংস পরিবেশন করা হত, 'গোঘ্ন' শব্দটিতে তার প্রমাণ ও ইতিহাস রয়ে গেছে। মুনি-ঋষিদের অবশ্য চাষ-বাসের দায়-দায়িত্ব ছিল না, পরবর্তী কৃষিজীবী সমাজে গোরু গৃহপালিত প্রাণী, দুগ্ধদাত্রী, ভূমি কর্ষণে অতি প্রয়োজনীয়, সে কারণে গোরুর প্রতি স্নেহ, মমতা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা থাকা

স্বাভাবিক।) কিন্তু হাঁসের মাংস ও ডিম খাওয়া যাবে, অথচ মুরগির মাংস-ডিম কেন নিষিদ্ধ, তার কোনও যুক্তি খুঁজে পাই না। নেপালের হিন্দুরা গো-মাংস চক্ষেই দেখতে চায় না, কিন্তু সে দেশে মোষের মাংস বেশ চলে। কৃষিজীবী সমাজে গোরু ও মোষের ভূমিকা একই, গৃহ পালিত মোষের সঙ্গেও স্নেহ মমতার সম্পর্ক হতে পারে। বলিবর্দের সঙ্গে মোষের প্রায় কিছুই তফাত নেই, তবু বেচারা মোষ কেন হিন্দুদের কাছে বধযোগ্য, তা বুদ্ধির অগম্য।

হিন্দুদের মতন মুসলমানদেরও খাদ্যাখাদ্যে অনেক বিধি-নিষেধ আছে। শূকর মাংস তাদের কাছে অতি ঘৃণ্য, তা ছাড়াও অন্যান্য প্রাণী ও পাখি হালাল ও হারাম হিসেবে ভাগ করা। যতদূর জানি, কচ্ছপ তাদের কাছে অস্পৃশ্য। একবার কয়েকটি বাংলাদেশি মুসলমান যুবকের সঙ্গে আমি টোকিও শহরের এক বিশাল উদ্যানে বেড়াচ্ছিলাম, সেখানে একটি বিস্তীর্ণ কৃত্রিম সরোবরে কিছু সামুদ্রিক প্রাণী খেলা করছিল, কিছু সিল ও ডলফিন ছিল, একটি চকচকে প্রাণী দেখে একজন যুবক জিজ্ঞেস করল, এটা খাওয়া যায় না? তার সঙ্গী একজন বলল, হালাল কি না দেখতে হবে। তাতেই আমার মনে হয়েছিল, ভক্ষ্যণীয় এবং বর্জনীয় এরকম দুটি তালিকা আছে তাদের ধর্মে। অবশ্য, আরব দেশীয় শাস্ত্রে সব রকম সামুদ্রিক প্রাণীর উল্লেখ থাকা সম্ভব কি না, তা আমি জানি না।

'আপ রুচি খানা', এই কথাটাই স্বাভাবিক সত্য। যার যেমন অভিরুচি, স্বাদে সহ্য হয়। কিন্তু রান্নাঘরেও ধর্ম এসে নিষেধের তর্জনি তুলে দাঁড়ায়। একই অঞ্চলের মানুষের যদি খাদ্যরুচি এক রকম না হয়, যদি দুই সম্প্রদায় পরস্পরের খাদ্যবিশেষকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, তা হলে তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিলন প্রকৃতপক্ষে কতখানি সম্ভব? খাদ্য বাদ দিয়ে সংস্কৃতি হয়? চিন, জাপানের এই সমস্যা নেই। আমরা ভারতীয়রা অনেক শতাব্দী ধরে এই ব্যাপারে চরম মূর্খতার পরিচয় দিয়ে কতবার যে দাঙ্গায় প্রমত্ত হয়েছি, তার হিসেব রাখাও সম্ভব নয়। হিন্দুদের অন্ধত্ব আরও বেশি। শুধু অপর ধর্ম নয়, নিজেদের ধর্মের মধ্যেও খাদ্যের ব্যাপারে ছোঁয়াছুঁয়ির বিভেদ বজায় রেখেছে, তাই যুগ যুগ ধরে বহু মানুষ অভিমান ভরে বাপ-পিতামহের ধর্ম ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছে নতুন ধর্মে।

আমি মুরগির মাংসের স্বাদ প্রথম গ্রহণ করি প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর। তাও বাড়ির বাইরে, গোপনে। আবার বাবা একবার গ্রাম থেকে ফেরবার পথে গোয়ালন্দ স্টিমার ঘাটায় আমাকে নিয়ে একটা ভাতের হোটেলে ঢুকেছিলেন। সে হোটেলের রান্নার ঠাকুর ব্রাহ্মণ নয়, কায়স্থ। অব্রাহ্মণের হাতের রান্না আমরা বামুন হয়ে খাব কি করে? কিন্তু পাশের বামুনের হোটেলে যে সবেমাত্র উনুন ধরানো হয়েছে, আমাদের স্টিমার একটু বাদেই ছেড়ে যাবে, তাই বাবা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই হোটেলেই খেতে বসে গেলেন এবং আমার দিকে এমন একটা ইঙ্গিত করলেন, যাতে এই ঘটনা আমি বাড়িতে গিয়ে বলাবলি না করি। বাবা মুরগির মাংস সম্ভবত কখনও খাননি, অন্তত তাঁর জীবিতকালে ওই পক্ষী আমাদের বাড়িতে ঢোকেনি। আমি স্কুল বয়স ডিঙোবার পর প্রথম আমিনিয়া হোটেলে বিরিয়ানি ও চিকেন চাঁপ খেয়ে পরমার্থ লাভ করেছিলাম।

মাত্র কয়েক দশকেই কী বিপুল সামাজিক পরিবর্তন ঘটে গেছে! এখন মুরগি হিন্দুর ঘরে ঘরে সমাদৃত। অন্নপ্রাশন থেকে বিয়ের নেমন্তন্নেও মুরগি। তবে, যখন নিষিদ্ধ ছিল, তখন এর স্বাদ ছিল অপূর্ব, এখন বিস্বাদ লাগে। এখন ডাক্তাররাও পাঁঠার মাংসের বদলে মুরগি সুপারিশ করেন বলে পাঁঠার মাংসের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে। গোরু-শুয়োরের দ্বন্দ্ব অবশ্য আজও মেটেনি।

প্রসঙ্গ শুরু হয়েছিল ঘুম ভাঙা নিয়ে। ছেলেবেলায় মোরগের ডাক শুনিনি, গ্রামে শুনতাম ভোর থেকেই বিভিন্ন পাখির কলকাকলি। ইষ্টকুটুম, বউ কথা কও, গৃহস্থের খোকা হোক, এরকম কত বিচিত্র পাখির নাম। ঘুঘু পাখিটির ডাক নানা রকম, কখনও ওড়ার সময় সে শুধু প্যাঁ-অ্যা-অ্যা শব্দ করে, কখনও এক মনে ডাকে ঘু-ঘু-ঘু-ঘু, কখনও বলতে থাকে, ঠাকুর

গোপাল, ওঠো, ওঠো, ওঠো! তারস্বরে রাত্তিরবেলাতেও চিৎকার করে চোখ গেল পাখি। ওই পাখিরই হিন্দি নাম পিউ কাঁহা। 'চোখ গেল' কিংবা 'পিউ কাঁহা', দুটোই সুন্দর নাম, কিন্তু ইংরিজি নামটি বিকট। 'ব্রেইন ফিভার'! সাহেবরা মনে করে, মাথায় রোগ আছে বলেই ওই পাখি একটানা অনেকক্ষণ ডেকে চলে।

শহরে এত রকম পাখির বৈচিত্র্য নেই। কাক, চড়াই আর শালিক। এই তিন জাতের পাখি মানুষের কাছাকাছি থাকে, পৃথিবীর সর্বত্র। আমরা ঘরের আনাচে কানাচে এদেরই দেখেছি। আর আততায়ীর মতন চিল তো আছেই। ডালহাউসির কাছে হঠাৎ হঠাৎ দেখা যেত কয়েক ঝাঁক টিয়া। উত্তর কলকাতায় অনেকের পাখি পোষায় শখ ছিল, প্রধানত কোকিল, ময়না ও চন্দনা। খাঁচার কোকিলও ডেকে উঠত বসন্তকালে। ময়না ও চন্দনাকে খুব করে শেখালে বলতে পারত মানুষের মতন দু'-একটি কথা। সেন্ট্রাল এভিনিউতে এক বাড়িতে ছিল বহু রকমের কাকাতুয়া, তাদের বিভিন্ন আকার ও অপূর্ব বর্ণবাহার। মাঝে মাঝে রোদ পোহাবার জন্য তাদের রাখা হত বাড়ির সামনের চাতালে, সে সব কাকাতুয়া দেখার জন্য ভিড় জমে যেত গেটের বাইরে। সেখান থেকে অদূরে ডাক্তার কে কে হাজারির বাড়িতে ছিল পোষা বাঘ।

কাক, চড়াই আর শালিকের মধ্যে কে আগে জাগে, তা জানি না। তবে, সব পাখির আগে জেগে উঠতেন আমার বাবা। ব্রাহ্মণদের নাকি ব্রাহ্ম মুহূর্তেই শয্যা ত্যাগ করা উচিত। বাবাকে কোনও দিনই বেশি বেলা করে ঘুমোতে দেখিনি। ছুটির দিনে একটু দিবানিদ্রা দিতেন বটে, কিন্তু দিন শুরু করতেন সূর্যোদয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। তাঁর অত ভোরে ওঠার আর একটি কারণ ছিল, তিনি সকালের ইস্কুলেও পড়াতেন, তাই তৈরি হয়ে নিতেন তাড়াতাড়ি। পরিবারের যিনি প্রধান, তিনি জেগে উঠবার পর অন্যদের তখনও বিছানায় আরাম করার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমি আর আমাদের এক কাকা, বয়সে আমার চেয়ে সামান্যই বড়, ডাক নাম খোকা, ঘুমোতাম এক ঘরে। বাবা সেই ঘরের দরজার কাছে এসে হাঁক ডাক করে আমাদের দু'জনকে জাগাতেন। সময়ের ব্যাপারে অতিশয়োক্তি করা ছিল তাঁর স্বভাব। অর্থাৎ তিনি যখন বলতেন, এই ওঠ, ওঠ, আটটা বেজে গেল, এখনও ঘুমোচ্ছিস, তখন প্রকৃত পক্ষে ঘড়িতে পাঁচটা কুড়ি! এক একদিন সন্ধের সময় খেলাধুলো সেরে সামান্য দেরি করে বাড়িতে ফিরলে তিনি চোখ রাঙিয়ে বলতেন, রাত দশটায় বাড়ি ফেরা হচ্ছে? তখন ঘড়ির কাঁটা সাতটাও পেরোয়নি।

শীতকালের ভোরবেলা সাড়ে পাঁচটার সময় কম্বলের উষ্ণতা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে কী কষ্টটাই না হত! অন্তত আর একটা ঘণ্টার জন্য কত অনুক্ত, কাতর আবেদনই না ছিল! 'ওঠো শিশু মুখ ধোও, পর নিজ বেশ/ আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ'। আমি আর কাকা বই সামনে নিয়ে বসেছি, এই দৃশ্যটি দেখার পর বাড়ি থেকে বেরোতেন বাবা। প্রায়ই পড়তে পড়তে ঘুমে ঢুলতাম। কোনও কোনওদিন বাবা গলির বাঁকে মিলিয়ে যেতেই আবার সুরুৎ করে ঢুকে যেতাম কম্বলের নীচে। সেই রকম কোনও একটি দিনে নস্যির কৌটো নিতে ভুলে যাওয়ায় বাবা দৈবাৎ আবার ফিরে এলে কী অবস্থা হত? না, বাবা মারধোর করতেন না। বাবার হাতে মার খেয়েছি তো বটেই, আমার চেয়েও কাকা অনেক বেশি, তবে তা দুপুরে বা সন্ধের সময়, সকালে কখনও নয়, সম্ভবত এ বিষয়ে তাঁর কোনও নীতি ছিল।

ছুটির দিনগুলির সকালে বাবা বাড়িতে থাকতেন। তিনি সকালে ও দুপুরে স্কুলে পড়ান, তারপর বিকেলে কোচিং ক্লাস, আবার সন্ধের পর টিউশানি, সংসার চালাবার জন্য, আমাদের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় তিনি দিনে প্রায় ষোলো-সতেরো ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। এত সব ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন, কিন্তু নিজের ছেলে-মেয়ে ও ছোট ভাইয়ের লেখা পড়ার দিকে নজর রাখতে পারছেন না, এ জন্য তাঁর মনে বোধহয় মাঝে মাঝে অপরাধ বোধ জাগত, তাই ছুটির দিনেও তাঁর কাছে অনেক লোকজন দেখা করতে এলেও তিনি আমাদের নিয়ে মাঝে মাঝে পড়াতে বসতেন। যেহেতু ধারাবাহিকতা ছিল না, তাই হঠাৎ হঠাৎ পড়াতে গিয়ে তিনি

আমাদের বিদ্যার দৌড়, ফাঁকিবাজি ও মনঃসংযোগের অভাব দেখে মর্মাহত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন, আমাকে ভর্ৎসনা করে বলতেন, লেখাপড়া করবি না, বড় হয়ে চায়ের দোকানে বয় হবি! এই কথাটা আমি অনেকবার শুনেছি, এবং সত্যি কথা বলতে কী, চায়ের দোকানে বয় হবার সম্ভাবনাটা আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয়ই মনে হত। চায়ের দোকানে কত রকম মানুষ আসে, পাড়ার দোকানে দেখেছি যুবকেরা সেখানে টেবিল চাপড়ে তর্ক করে, বৃদ্ধেরা চোখ উল্টে হাসে, সারাদিন চপ-কাটলেটের গন্ধ, আহ চমৎকার!

বাবা মূলত অঙ্ক ও ভূগোলের শিক্ষক হলেও সংস্কৃত এবং ইংরিজিও ভালো জানতেন। ওঁদের আমলে শিক্ষাই ছিল এরকম। শাস্তি হিসেবে সংস্কৃত শব্দরূপ ও ধাতুরূপ মুখস্থ করতে দিতেন আমায়, ওঃ কী যে কঠিন শাস্তি তা কহতব্য নয়। আশ্চর্য ব্যাপার, এতগুলি বছর বাদেও সেগুলি ভুলিনি। এক একদিন বাথরুমে হঠাৎ আপন মনে বলে উঠি, নদী, নদ্যৌ, নদ্যাঃ! এবং সকাল সকাল জেগে ওঠার অভ্যেসটাও রয়ে গেছে। সকাল ছ'টায় ঘুম ভেঙে যায়। এখন তো স্বাধীন। তবু রাত দেড়টা-দুটোয় শুতে গেলেও বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে পারি না।

এক সকালে বাবার সামনে পড়তে শুরু করেছি, হঠাৎ গলি দিয়ে অনেক লোক ছোটাছুটি করতে লাগল। শোনা গেল সোরগোল। কিছুক্ষণ পরেই তা পরিণত হল প্রবল হই-হল্লায়, তাতে মিশে আছে আতঙ্ক ও উল্লাস। অচিরেই জানা গেল, শুরু হয়ে গেছে দাঙ্গা, লুঠ হচ্ছে দোকানপাট। জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম, বহু ছুটন্ত মানুষের হাতেই লুঠের মাল, কেউ কেউ পেয়েছে অনেক কিছু, কেউ পেয়েছে জুতোর দোকানের এক পাটি মাত্র জুতো!

বাবার কঠোর নির্দেশে আমরা বাড়ি থেকে বেরোতে পারলাম না। পাড়ার সমস্ত বয়স্ক ব্যক্তিরা গলিতে সমবেত হয়ে কী সব আলোচনা করতে লাগলেন, তাদের উদ্বিগ্ন মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম, সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটছে। তারিখ, ১৬ই অগাস্ট, '৪৬, ভারতের ইতিহাসে অতি কলঙ্কময় দিন। আমার বয়স তখন বারো বছর, সেই দিনটার স্মৃতি আমার বুকে আজও একটা দগদগে ক্ষত হয়ে আছে। তখন যাদের বয়েস পাঁচ-ছ বছর, তারাও বোধ হয় সেই দিনটির কথা ভুলতে পারবে না।

দাঙ্গায় আমরা আক্রান্ত হইনি শেষ পর্যন্ত, ব্যক্তিগত ক্ষতি কিছু হয়নি, কিন্তু সেই কৈশোর বয়সের মনোজগতে দারুণ একটা ধাক্কা লেগেছিল। কেন এই দাঙ্গা? মাত্র কয়েক মাস আগে রশিদ আলির মুক্তির দাবিতে হিন্দু-মুসলমান পাশপাশি হাতে হাত ধরাধরি করে আন্দোলনে নেমেছিল, আজ তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ছুরি তুলবে কেন? এর মধ্যে বিভেদের কী এমন কারণ ঘটল? মুসলিম লিগ থেকে সেই দিনটিতে ডাইরেক্ট অ্যাকশান বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাকের মর্ম আমি আজও বুঝি না।

বাংলায় তখন মুসলিম লিগের শাসন, প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রী বলা হত না) হুসেন শহিদ সুরাবর্দি। (তাঁর নামের বানান অন্যরকমও লেখা হয়, তখন পত্র-পত্রিকায় সুরাবর্দিই প্রচলিত ছিল।) তিনি বিখ্যাত খানদানি বংশের সন্তান, তাঁর এক বড় ভাই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয়ের আড্ডার বিশিষ্ট সদস্য, এই সুরাবর্দিও কৃতিবিদ্য ও বিশিষ্ট নেতা, পরবর্তীকালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, কিন্তু সেই সময় তাঁর ভূমিকা নিয়ে অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। বিলেত থেকে যে ক্যাবিনেট মিশন এসেছিল, তাদের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে, পাকিস্তানের দাবি শূন্যে ঝুলে আছে, মরিয়া হয়ে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের জন্য মুসলিম লিগের এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঘোষণা। কিন্তু এই সংগ্রাম কার বিরুদ্ধে, সংগ্রামের রূপরেখা কী, তা কিছুই বলা হল না। জিন্না অবশ্য ঘোষণা করেছিলেন, লিগ রক্তপাতের পথে যাবে না। দেশে গৃহযুদ্ধের সূচনা করবে না। রক্তপাতহীন 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' মানে কী?

ওই দিন বিকেলবেলা ময়দানে লিগ এক জনসভার আয়োজন করে। আবুল হাসিমের মতন

বিশিষ্ট তাত্ত্বিক নেতাও সেখানে উপস্থিত। প্রচুর গরম গরম বক্তৃতা হয়। আবুল হাসিম হিন্দুদের নাম উচ্চারণ করেননি, দূরের ফোর্ট উইলিয়ামের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন, লড়াই ইংরেজদের বিরুদ্ধে। এই বক্তব্য কি দূরদর্শিতার চরম অভাবের পরিচয় নয়? লাঠি-সোঁটা কিংবা ছোরা-ছুরি নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'? তার চেয়ে অনেক সহজ, হিন্দুরাই পাকিস্তান দাবির প্রতিবন্ধক ভেবে তাদের পেটে ছুরি মারা, তাদের দোকান লুঠ করা। গুণ্ডা-বদমাসরা অতিদ্রুত এই সব সুযোগ গ্রহণ করে, অনেক সাধারণ মানুষও এই রকম সময় লোভী ও রক্তলোলুপ হয়ে ওঠে। ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট, বিকেলের ওই মিটিং-এর আগে সকাল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল খুনোখুনি। সুরাবর্দি আগে থেকেই ওই দিনটিকে কেন ছুটির দিন ঘোষণা করেছিলেন, তার ব্যাখ্যা আজও মেলে না। মারামারি করার জন্য সরকারি ছুটি? পুলিশের প্রতি আগে থেকেই নির্দেশ ছিল, তাদের ভূমিকা হবে নীরব দর্শকের। দাঙ্গা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় সুরাবর্দি ঘাঁটি গেড়েছিলেন লালবাজারের কন্ট্রোল রুমে। ফজলুল হক পর্যন্ত বলেছিলেন, কন্ট্রোল রুম কিছুই কন্ট্রোল করছে না। বাংলা পত্র-পত্রিকার বিবরণ বাদ দিলেও ইংরেজদের স্টেটসম্যান পত্রিকা মুসলমানদের পক্ষপাতী, তার সম্পাদক পাকিস্তান দাবির সমর্থক, সেই পত্রিকাতেও এই আদিম হিংস্রতার জন্য দায়ী করা হল লিগ মিনিস্ট্রিকে। এ ব্যাপার পূর্ব পরিকল্পিত, পুলিশ নিষ্ক্রিয়, দাঙ্গাকারীরা কোথা থেকে পেল গাড়ি, ঘোড়া, পেট্রল? ভারতের ছোটলাট দিল্লির বড়লাটকে রিপোর্ট পাঠালেন, 'এ পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে, তা স্পষ্টত সাম্প্রদায়িক। কোনওক্রমে ব্রিটিশ বিরোধী নয়, আবার বলছি, ব্রিটিশ বিরোধী নয়।'

প্রথম দু'-একদিন হিন্দুরা প্রস্তুত ছিল না, তারা মার খেয়েছে বেশি। তারপর সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তারাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। হিংস্রতায় কেউ কারওর চেয়ে কম যায় না। এই সব সময়ে প্রকটিত হয়ে পড়ে, মানুষই এই পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী। বিবেক, মনুষ্যত্ব, এসবই যেন অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রথম শুরু হয় কলকাতায়, তার প্রতিক্রিয়া খুনোখুনি ছড়িয়ে পড়ে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশাল, পাবনা। তার থেকেও ভয়াবহ আকার নেয় নোয়াখালি, কুমিল্লায়, সন্দীপে। আরও প্রবল আগুন জ্বলে বিহারে। আরও ভয়াবহ পঞ্জাবে। শুধু পঞ্জাবেই নিহতের সংখ্যা অন্তত ছ লাখ, অন্তত এক লাখ তরুণীকে পুরুষ পশুরা ছিন্নভিন্ন করেছিল।

এক বছর পরে দেশ স্বাধীন হয়েছিল দু'-টুকরো হয়ে। তবে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার ইতিহাসে যে গভীর কলঙ্করেখা আছে, তা স্বীকার করা উচিত। আবেগময় ভাষায় যতই বলা হোক, এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, আসলে তা সত্যি নয়। এই স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ ভ্রাতৃহত্যায়, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, শিশুহত্যায়। অসংখ্য নিরীহ, নির্দোষ, সাধারণ মানুষের রক্তের ওপর উত্তোলিত হয়েছে ওই দুই দেশের স্বাধীনতার পতাকা। সেই পাপের দগদগে ঘা এখনও ফুটে ওঠে এই উপমহাদেশের যেখানে সেখানে। যেসব কাপুরুষ নেতারা নিজেদের গা বাঁচিয়ে, ব্যক্তি স্বার্থের তাড়নায় তাড়াহুড়ো করে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্ধ হয়ে ভারত বিভাগে সম্মত হয়েছিলেন, যাঁদের ছবিতে আজও মালা দেওয়া হয়, ক্রমওয়েলের মতন কবর থেকে তুলে এনে তাদের প্রত্যেককে এখন ফাঁসি দিলে হয়তো সেই পাপের স্খালন হতে পারে।

দাঙ্গার বিবরণ আমি দিতে চাই না। এমনিতেই তখনকার বাস্তব অতি নৃশংস, তার ওপরেও গুজবে গুজবে এমন আতঙ্ক ছড়িয়েছিল যে আমরা বাড়ি থেকে এক পা বেরোতে সাহস করতাম না। রাজাবাজার থেকে মুসলমানরা যখন তখন দল বেঁধে এসে আক্রমণ করবে, এই ভয়ে পালা করে রাত জেগেও পাহারা দেয় সবাই। এক এক রাতে দূর থেকে আল্লা হো আকবর ধ্বনি শোনাও যায়, তাতে হিম হয়ে আসে বুকের রক্ত। ছাদে অনেক আধলা ইট জড়ো করে রাখা আছে, আর দরজার খিলগুলো খুলে নেওয়া হয়েছে লাঠি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য, মধ্যবিত্ত

বাঙালির বাড়িতে আর কোনও অস্ত্র থাকে না। কোনও কোনও বাড়িতে নাকি কড়া ভর্তি গরম তেল রাখা থাকে, আক্রমণকারীদের মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে। আত্মরক্ষার হাস্যকর অক্ষম প্রয়াস! কিছু হিন্দু গুণ্ডা মদ খেয়ে, খোলা তলোয়ার হাতে মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে বেড়ায়, তাদের গৃহস্থরা কী খাতিরই না করে!

বড় রাস্তায় প্রথমদিন থেকেই পড়ে আছে সাত আটটি মৃতদেহ। সরাবার কেউ নেই। ক্রমে সেগুলো পচতে শুরু করে। বিকট গন্ধ ছড়ায় চতুর্দিকে। তা সেই গন্ধ চাপা দেবার জন্য ধূপ জ্বালিয়ে রাখা হয় ঘরে। দোকানপাটে যাবার উপায় নেই, খাদ্য শুধু সেদ্ধ ভাত, এরই মধ্যে কারা যেন বাড়ি বাড়ি এসে ধূপ সরবরাহ করে গেল। কয়েকদিন পর ছাদ থেকে উঁকি মেরে দেখি, সেই মৃতদেহগুলি আস্তে আস্তে উঠে বসছে। হ্যাঁ, সত্যি দেখেছি। রাইগার মর্টিশ হয়ে একসময় মৃত শরীর বেঁকতে শুরু করে। সে দৃশ্য দেখার পর বেশ কয়েক রাত ঘুমোতে পারিনি।

শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা আমাদের গ্রে স্ট্রিট পাড়ায় আক্রমণ করতে আসেনি। মুসলমান কর্তৃক হিন্দু নিধনের কোনও দৃশ্য দেখিনি আমি। তা অন্যত্র ঘটেছে, বরং উল্টোটাই দেখেছি। আমাদের পাড়ায় কিছু কিছু দোকান ছিল মুসলমানদের, যেমন শালকর, শাল ধোলাই ও সেলাইয়ের কারবার তাদের একচেটিয়া। সেসব দোকান ও তাদের মালিকরা শেষ। ফড়িয়াপুকুরে নাজির সাহেবের ঘুঁড়ির দোকান ছিল বিখ্যাত, আমাদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়, সে দোকান লুঠেরারা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, অতি সুপুরুষ ও মিষ্টভাষী নাজির সাহেব পালাতে পেরেছেন কি না জানি না। রাজমিস্তিরিরা নব্বই ভাগ মুসলমান, যে জন্য বলা হয় কলকাতার প্রায় সমস্ত দালান কোঠায় মুসলমানের হাতের ছোঁয়া আছে, তারাও অনেকে নিজের হাতে তৈরি করা বাড়ির সামনে প্রাণ দিয়েছে। আরও কত ফেরিওয়ালা ছিল।

আমি স্বচক্ষে শুধু একটিই হত্যাকাণ্ড আংশিক দেখেছি। প্রথমবারের দাঙ্গা কয়েকদিন পর প্রশমিত হলে, মাঝে মাঝেই হঠাৎ আবার শুরু হয়ে যেত। এরই মধ্যে সবাই অফিস কাছারি যেতে শুরু করে, বাজার-হাট খোলে। একদিন সকালে হাতিবাগানে গেছি, কারা যেন বলাবলি শুরু করল, মানিকতলা বাজারে হিন্দুদের খুব মারছে। সত্যি বা মিথ্যে যাই-ই হোক, কেউ যাচাই করে দেখল না, এ বাজারেও শুরু হয়ে গেল হুড়োহুড়ি। আমি কিছু বুঝবার আগেই দেখি যে এক প্রৌঢ় ডিমওয়ালা ডিমের ঝুড়ি হাতে নিয়ে ছুটছে, তাকে তাড়া করে আসছে একদল ক্লীব। ধপা-ধপ করে বাঁশ দিয়ে পেটানো হতে লাগল তাকে, ডিমগুলো ছিটকে পড়ে গেল। সে দু' হাত দিয়ে মাথা ঢেকে কী যেন বলতে চাইছে কাতরভাবে। একটি লোকও তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেল না, আমিও যাইনি, লোকের ঠেলাঠেলিতে ছিটকে পড়েছি, তারপর পালিয়েছি নিজের প্রাণভয়ে।

সেই মানুষটির অসম্ভব ভয়ার্ত দুটি চোখ আর রুগ্ন দাড়িওয়ালা শুকনো মুখখানা কি কোনওদিন ভুলতে পারব? আজও স্পষ্ট দেখতে পাই।

এই সব দাঙ্গায় যারা মরে, তাদের নিরানব্বই ভাগ মানুষই গরিব, অসহায়, দুর্বল মানুষ। তাঁদের জীবনে ধর্মের তেমন কোনও ভূমিকাই নেই, জীবিকার তাড়নাতেই তারা অস্থির। একজন মুসলমান ডিমওয়ালা হিন্দুপ্রধান বাজারে এসেছিল নিতান্তই পেটের দায়ে, যারা তার কাছ থেকে ডিম কেনে তারাই তাকে হত্যা করল অকারণে। তাতে কোন ধর্মের কী সুরাহা হল? ওই বয়সে, ওরকম একটি দৃশ্য দেখে, ধর্মের প্রতি আমার দারুণ অভক্তি জন্মে যায়। যারা ওই ডিমওয়ালাকে অকারণে মারল, যারা দূরে দাঁড়িয়ে সেই হত্যা দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল অথবা বাধা দিল না, তারা যদি হিন্দু হয়, আমি তা হলে সেই হিন্দু হতে চাই না। চুলোয় যাক ধর্ম!

দশ

আমি গাঁধীজিকে স্বচক্ষে দেখেছি মাত্র দু'বার।

প্রথমবারের দেখাটি নামমাত্র। দেশবন্ধু পার্কের একটি জনসভায় তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, খুব উঁচু মঞ্চ, প্রচুর ভিড়, তার শেষে দাঁড়িয়ে এই বালকটি পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ডিঙি মেরে দেখার চেষ্টা করছিল সেই নগ্নগাত্র, শীর্ণকায় মানুষটিকে। হিসেব অনুযায়ী তখন আমার বয়েস বারো বছর মাত্র, কেন গিয়েছিলাম সেখানে? বারো বছরের বালকরা কি রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে যায়? হয়তো তখন আবহাওয়াই এমন উত্তপ্ত ছিল। কিংবা বহুশ্রুত গাঁধী নামের মানুষটিকে একবার সশরীরে দেখার কৌতূহল। কিংবা, দেশবন্ধু পার্কে সেই সময় খেলতে গিয়েছিলাম, এমনিই একবার উঁকি মারা। ভাষণ দিয়েছিলেন হিন্দিতে, তার একটি বর্ণও স্মরণে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে, তাঁর কণ্ঠস্বর ধীর এবং ভাঙা ভাঙা, মেঠো বক্তৃতার মতন গলা চড়াতেন না।

আমি যে পরিমণ্ডলে বর্ধিত হয়েছি, সেখানে গাঁধীজি একেবারেই জনপ্রিয় ছিলেন না। অনেকেই সুভাষচন্দ্র বসুর ভক্ত, বামপন্থার দিকে ঝোঁকও ক্রমশ বাড়ছে। গাঁধীজিকে নানান অভক্তিসূচক নামে ডাকা হত। এক ধরনের পোকা আছে, সেগুলো হাত দিয়ে ধরলেই আঙুলে বিচ্ছিরি গন্ধ হয়, হিন্দিতে তার নাম বোধহয় গন্ধা পোকা, বাংলায় তার নাম দেওয়া হয়েছে গাঁধী পোকা। নামটি এখনও চলছে, অবিলম্বে বদলানো উচিত, অথবা সেই পোকার প্রজাতিটিকে নির্বংশ করে দিলে হয়।

গরিষ্ঠ সংখ্যক বাঙালিই গাঁধীজির সমর্থক ছিল না। সাধারণভাবে বলা যায়, সারা ভারতেই গাঁধীজির গুরুত্ব তখন ক্ষীয়মান, কিন্তু তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি বৃদ্ধি পেয়েছিল খুবই। অহিংস গাঁধীবাদ নামক রাজনৈতিক দর্শনটিই পশ্চিমি মানুষদের কাছে অভিনব।

এখানে অনেকেরই ধারণা ছিল, গাঁধীজি বাঙালি-বিদ্বেষী। বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি সমর্থন দূরে থাক, তিনি কখনও সহানুভূতিও জানাননি। এবং কংগ্রেস দলের সভাপতি নির্বাচনে পট্টভি সিতারামিয়ার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গাঁধীজি প্রকাশ্যে বলেছিলেন, 'সিতারামিয়াস ডিফিট ইজ মাই ডিফিট,' তাতে বাঙালিদের ওই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছিল। গাঁধীজি সত্যিই বাঙালি বিদ্বেষী ছিলেন কি না, কিংবা, তাঁর মতন মানুষের পক্ষে কোনও জাতিগত বিদ্বেষ পোষণ করা সম্ভব কি না, তা আমি জানি না। তবে, গাঁধীজি তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয়বার কলকাতা আগমনের বর্ণনা দিয়েছেন, দুটি অভিজ্ঞতাই তাঁর পক্ষে সুখকর হয়নি।

প্রথমবার এসেছিলেন দক্ষিণ অফ্রিকার ব্যারিস্টার মিস্টার এম কে গাঁধী, পাক্কা সাহেবী পোশাক, উঠেছিলেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। কলকাতা শহরে কারুক্কে চেনেন না। এর আগে একবার দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার জাহাজ থেমেছিল কলকাতা বন্দরে, জাহাজ থেকে নেমেই সোজা হাওড়া গিয়ে ট্রেনে চেপেছিলেন, শহর দেখা হয়নি মোটেই। তবে এই শহর সম্পর্কে জানেন অনেক কিছু। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, শিল্প বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র, বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাও শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রণী, সম্প্রতি তারা রাজনীতিতেও মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। ইয়ং বেঙ্গলের দলের নানা রকম প্রথা ভাঙার কথাও তিনি শুনেছেন, স্কুলে পড়ার সময় এক সহপাঠীর পাল্লায় পড়ে, ইয়ং বেঙ্গলের দৃষ্টান্তে, কট্টর

নিরামিষাশী পরিবারের সন্তান হয়েও নিষিদ্ধ ও মাংস ভক্ষণেও দীক্ষা নিয়েছিলেন। আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বেশ্যালয়ে গমন করতেও দ্বিধা হয়নি, মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সে সবই অবশ্য পরিত্যাগ করেছেন এখন।

তরুণ গাঁধীর সেই প্রথমবার আগমনের কারণটি বিচিত্র। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থার কথা এখানকার মানুষদের জানাতে চান। সকলেই মনে করে যে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে প্রচুর মানুষকে ইংরেজরা কুলি কামিন হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় চালান করেছে। কিন্তু তারা সবাই এখন আর নিছক শ্রমদাস নয়, বুদ্ধি ও অধ্যাবসায় বলে তারা অনেকে সে দেশে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেছে, বিস্তর সম্পত্তির মালিক হয়েছে, ইংরেজ প্রভুরা কুলিদের এই রূপান্তর সহ্য করতে পারছে না, অত্যাচার চালাচ্ছে নানাপ্রকার, এসব কথা মূল ভূখণ্ডের মানুষ জানে না।

গাঁধী প্রথম দেখা করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁকে অনুরোধ জানান, একটি জনসভার ব্যবস্থা করার জন্য, যেখানে গাঁধী ওই বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রখ্যাত ব্যক্তি ও অতিশয় ব্যস্ত, অন্যরা সভা সংগঠন করে তাকে সভাপতি ও বক্তা হিসেবে চায়, তিনি একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির জন্য সভা ডাকতে যাবেন কেন? এ রকম অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে তিনি যদি অপ্রসন্ন হন, তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি দু'কথায় গাঁধীকে বিদায় করে দিয়েছিলেন। এর পরেও গাঁধী উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একই অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কেউই পাত্তা দেননি তাঁকে। এমনকী তৎকালীন জনপ্রিয়তম বাংলা সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীর সম্পাদক যোগেশচন্দ্র বসুর সঙ্গেও দেখা করেছিলেন, যোগেশচন্দ্র তাঁর কোনও কথাই শুনতে চাননি। বাঙালিদের কাছ থেকে কোনও রকম সহযোগিতা না পেয়ে সেবারে গাঁধীকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

গাঁধীজি দ্বিতীয়বার কলকাতায় এসেছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে একজন সাধারণ প্রতিনিধি হিসেবে। সুরেন্দ্রনাথেরই রিপন কলেজ ছুটি দিয়ে সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল, ঘরগুলি মানুষে ঠাসাঠাসি, বারান্দাতেও বিছানা পাতা। কিন্তু এত মানুষের প্রাতঃকৃত্যের জন্য প্রায় কোনও বন্দোবস্তই ছিল না, অল্প কয়েকটি শৌচালয় পুরীষে পরিপূর্ণ, মেথর-মুদ্দোফরাসরা ধারে কাছে নেই। তরুণ গাঁধীজি নিজেই ঝাঁটা-বালতি নিয়ে শৌচালয় পরিষ্কার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

কংগ্রেসের বহিরাগত প্রতিনিধিরা মূল অধিবেশনের আগে খাওয়া-দাওয়া ও গুলতানি করেই সময় কাটায়। গাঁধীজি আলস্য কাকে বলে জানেন না, তিনি স্বেচ্ছায় কিছু কাজ করার জন্য কংগ্রেস নেতাদের কাছে আবেদন জানান, তাঁকে পাঠানো হয় জানকীনাথ ঘোষালের কাছে। জানকীনাথের নাম একালে অনেকটাই বিস্মৃত, সে সময় তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, ঠাকুরবাড়ির এই তেজস্বী জামাতা কংগ্রেস পার্টি সংগঠনের অন্যতম স্থপতি, সেবারের কংগ্রেস অধিবেশনের সম্পাদক। একালে তিনি স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী এবং সরলা দেবী চৌধুরানীর পিতৃপরিচয়ে স্মরণীয় হতে পারেন।

জানকীনাথ গাঁধীজির চেহারা ও পোশাক দেখে অতি সাধারণ ধরনের মানুষ বলে ধরে নিয়েছিলেন, একে তিনি কী কাজ দেবেন? টেবিলের ওপর জমে থাকা একটি চিঠির স্তূপ দেখিয়ে বলেছিলেন, আমার কাছে অসংখ্য চিঠি আসে, সব পড়ে দেখার সময় হয় না, পড়ার যোগ্যও না। তুমি এই চিঠিগুলো পড়ে প্রয়োজনীয়গুলো আমার জন্য বেছে রাখো। গাঁধীজি বিনা আপত্তিতে একজন কনিষ্ঠ কেরানির মতন বসে গেলেন চিঠি পড়তে। সেদিনই তাঁর একটা কৌতুককর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। জমিদার নন্দন জানকীনাথ নিজে জুতোর ফিতে বাঁধতে পারতেন না, কোটের বোতামও লাগাতে পারতেন না, সে সব কাজের জন্য সব সময় একজন

ভৃত্য প্রস্তুত থাকত। বিকেলবেলা কাজ শেষ করে জানকীনাথ উঠে দাঁড়িয়ে ভৃত্যকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন, সে লোকটি তখন ধারে কাছে ছিল না, জানকীনাথ অসহায় ভাবে জুতোয় পা গলিয়ে, কোট হাতে নিয়ে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে, তখন গাঁধীজিই এগিয়ে এসে তাঁর জামা ও কোটের বোতাম লাগিয়ে দেন। পরে অবশ্য জানকীনাথ গোখলের কাছে জেনেছিলেন যে ওই মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী নামে তরুণটি বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার, যাকে দিয়ে তিনি কেরানি ও আর্দালির কাজ করিয়েছেন।

সে বারে গাঁধীজি সারা কলকাতা শহর একা-একা ঘুরে দেখেন, বিখ্যাত বাঙালিদের সাক্ষাৎপ্রার্থী হন কোনও দাবি না নিয়েই। স্বামী বিবেকানন্দকে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল তাঁর, পায়ে হেঁটে হাওড়া থেকে বেলুড় মঠেও গিয়েছিলেন, কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিট আগে বিবেকানন্দ অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন।

কলকাতায় তাঁর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয় কালীঘাটের মন্দিরে। রাশি রাশি পাঠা-ছাগল বলি, মন্দির প্রাঙ্গণে থকথকে রক্ত, কাঠগড়ায় গলা দেওয়া অজ-বৎসের ব্যাকুল ডাক ঢাকা দেওয়ার জন্য উদ্দাম ঢোল বাদ্য, আশেপাশে অজস্র নির্বিকার মানুষজন, এসব দেখে তাঁর গা গুলিয়ে উঠেছিল। এ রকম পৈশাচিক কাণ্ড তাঁর অভিজ্ঞতায় প্রথম। দেবতার নামে কেন এই অসহায় পশুবলি? অনেক বুদ্ধিজীবী বাঙালি ভদ্রলোকদের তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ধর্মের নামে এই বীভৎস প্রথার যৌক্তিকতা কী? কারুর কাছ থেকেই সন্তোষজনক উত্তর পাননি।

বহু বছর পরে, ছেচল্লিশের দাঙ্গায় গাঁধীজি দেখলেন কলকাতার পথে পথে রক্তস্রোত, পশুর নয়, মানুষের, ধর্মের নামে মানুষ মানুষকে নির্বিবেক হত্যা করে। পশুর মাংস তবু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সে জন্য কিছু উপযোগিতা থাকতে পারে, তাই ধর্মের নামে সেই মাংস কিছুটা শুদ্ধ করে নেওয়া হয়। কিন্তু মানুষ তো মানুষের মাংস খায় না! পৃথিবীতে কিছু কিছু নরখাদক উপজাতি ছিল, যাদের আমরা অসভ্য, বর্বর আখ্যা দিয়েছি, তারা নিশ্চয়ই সবিস্ময়ে ভেবেছে, কেন শিক্ষিত ও সভ্যতাগর্বী মানুষরা নরহত্যার মতন অপচয় করে?

দাঙ্গার সময় গাঁধীজি ভেঙে পড়েছিলেন। কলকাতার পরে আরও ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয় নোয়াখালি এবং কুমিল্লার টিপকরা ও সন্দীপে। তিনি একা একা সেখানে ঘুরেছেন মানুষের মনে শুভবুদ্ধি ফিরিয়ে আনার জন্য। অর্ধনগ্ন শীর্ণকায় মানুষটি হাতে একটা লাঠি নিয়ে হেঁটেছেন গ্রামের মাঠে, আলপথে, দাঙ্গাকারীদের দিকে হাত তুলেছেন, ব্যাকুল আবেদন জানিয়েছেন, কিন্তু গাঁধীজির ব্যক্তিত্বের জাদু তখন ক্ষীয়মান, সেই সব উন্মত্ত মানুষেরা তাঁকে গ্রাহ্য করেনি, বরং বিদ্রূপে প্রত্যুত্তর দিয়েছে। নোয়াখালির আগুন জ্বলতে লাগল, অন্যদিকে আগুন লাগল বিহারে, গাঁধীজি ছুটলেন সেখানে। ইংরেজ লেখক পেন্ডেরাল মুনের মতে সারা ভারতে দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা দুই থেকে দশ লক্ষের মধ্যে, অর্থাৎ প্রকৃত সংখ্যাটা কোনওদিনই জানা যাবে না, নিরুদ্দিষ্টদের সংখ্যাও এর মধ্যে নেই।

কলকাতায় দাঙ্গা মাঝে মাঝে থেমেছে, বেরিয়েছে শান্তি মিছিল, আবার হঠাৎ হঠাৎ ভূমি ভেদ করা অগ্ন্যুৎপাতের মতন শুরু হয়েছে খুনোখুনি। এরকম মধ্যবর্তী কোনও সময়ে বহু স্কুল কলেজের ছেলে গিয়েছিল গাঁধীজির সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তখন বেলেঘাটার মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে একটি বাড়িতে তাঁবু গেড়েছিলেন। সেবারেই জাতির পিতা নামে মিথ্যাভাবে খ্যাত সেই মানুষটিকে সামনা সামনি দেখার সুযোগ ঘটে। অমন মহান একটি মানুষ যদি কোনও জাতির পিতা হন, তা হলে সেই জাতি এত অপরিণামদর্শী, এত হিংসাপরায়ণ হয় কী করে?

উঠোনের মধ্যে একটি খাটিয়ায় তিনি শুয়েছিলেন, কী করুণ, কী জীর্ণ শরীর! মুখখানি বিষাদে মাখা। যেন সারা জীবন লড়াই করে এসে, জীবন উপান্তে তিনি পড়ে আছেন এক ধ্বংসস্তূপে, মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন চরম পরাজয়। ছেলেরা সারবদ্ধ হয়ে তাঁকে প্রণাম করে যাচ্ছে, তার দেহে যেন কোনও স্পন্দনই নেই। অদূরে দাঁড়িয়ে আছে একদল মুসলমান ছেলে,

তাদের মাথায় ফেজ টুপি, একসময় গাঁধীজি তাদের দিকে আঙুল তুলে ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, ইন লোগোঁকো পানি পিলা দেও।

অমনি শুরু হয়ে গেল একটা হুড়োহুড়ি। মুসলমান ছেলেরা জগে করে জল আর কাঁসার গেলাস নিয়ে এল, আমরা হুড়োহুড়ি করে তা পান করতে লাগলাম। এতখানি বয়েস পর্যন্ত আমরা জল খেয়ে এসেছি, এবারে মুসলমানদের হাত থেকে পানি খেলাম। মনে হল যেন অমৃত। যেন সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়ে গেল, এরপর থেমে যাবে সব দাঙ্গাহাঙ্গামা। দুই সম্প্রদায়ের বালকদের সেই আগ্রহ দেখে গাঁধীজির শীর্ণ ওষ্ঠে ফুটে উঠেছিল কি কৌতুকের হাসি?

এরপর সারাজীবন জল আর পানি শব্দটি নিয়ে অনেক মজা পেয়েছি। শুধুমাত্র বাঙালিদের মধ্যেই জল আর পানি, এই দুটি শব্দের ব্যবহারেই হিন্দু-মুসলমান জানা যায় কেন? অভিধানে দুটি শব্দেরই ব্যুৎপত্তি একই। জল তো বটেই, পানি বা পানীও এসেছে সংস্কৃত— প্রাকৃতের পথ বেয়ে। বঙ্গীয় শব্দকোষে আছে : সং পানীয়স্তু লি পানী, প্রা পাণি অস্তু বা পাণি, পাণী। কোনও এক রহস্যময় কারণে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অধিকাংশ ভারতীয়ই পাণি ব্যবহার করে, বাঙালি হিন্দুরা জল। মুঘল আমলে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন জাত ও বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে একটি সাধারণ ভাষা গড়ে ওঠে, যার নাম উর্দু, এর মধ্যে সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, হিন্দি নানা রকম শব্দ মিশে আছে, সেখানেও জলের বদলে পানি। যে সব বাঙালি হিন্দু মনে করে পানি একটা মুসলমানী শব্দ, তাদের মতন মূর্খ আর হয় না। আর যেসব বাঙালি মুসলমান মনে করে জল হিন্দু শব্দ, কিন্তু পানি তাদের ধর্মীয় ভাষার, তারাও একই রকম নির্বোধ। জওহরলাল নেহরু ও জিন্না সাহেব দু'জনেই পানি বলতেন, যেমন গাঁধীজি, যেমন ফজলুল হক ও সুরাবর্দি, বল্লভভাই প্যাটেল ও লিয়াকৎ আলি। কট্টর হিন্দু সাভারকর আর মৌলানা আক্রম খাঁ পানির বন্ধনে বাঁধা।

বাঙালি হিন্দুরাও বাংলার সীমান্ত পেরিয়ে বিহারে পৌঁছেই পানি বলতে শুরু করে। ট্রেনের জানলা দিয়ে ডাকে, পানি পাঁড়ে। পানিফল খায়। এমনকী কলকাতাতেও রয়াল বা নিজাম হোটেলে গিয়ে পানি চায়। সেই বাঙালি হিন্দুই কোনও মুসলমান বন্ধুর মুখে পানি শুনলে চমকে ওঠে। বাংলাদেশে হিন্দুরা এখন আর প্রকাশ্যে জল বলে না, পশ্চিমবাংলার মুসলমানরাও অনেকে জল বলা অভ্যেস করছে। যারা হিন্দু-মুসলমান এই সাম্প্রদায়িক বিচারের উর্ধ্বে, তারাও মনে করে, জল বাংলা শব্দ, পানি অবাঙালিদের। যদিও সংখ্যার হিসেবে বাংলাভাষীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে জল শব্দটিকে বেশি শ্রুতিমধুর মনে করি। জলপ্রপাত, ধারাজল, সজল চোখ, জলজ প্রাণী, অতল জল ইত্যাদি বাক্যবন্ধে পানি বিকল্প হতে পারে না। আবার গেলাসে একটু পানি ঢালো, অকূল দরিয়ার পানি, জিরা পানি ইত্যাদিতে পানির ব্যবহার সাবলীল। যিনি স্টাইপেন্ড বা স্কলারশিপ বা হাত খরচ হিসেবে জলপানি শব্দটি তৈরি করেছিলেন, তিনি অতি বুদ্ধিমান, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করে। সেই রকম জল ও পানি এই দুটি শব্দই ইচ্ছে মতন যে কোনও জায়গায় প্রয়োগ করলেই সম্প্রদায়গত ব্যবধান কিছুটা ঘুচে যায়। কিন্তু মূর্খ ও নির্বোধদেরই শক্তি বাড়ছে দিন দিন। ব্যবধান যত বাড়ে, ততই তাদের উল্লাস।

দিল্লিতে তখন যে ধরনের সাম্প্রদায়িক পাশাখেলা চলছে, সে সম্পর্কে আমি অবহিত ছিলাম না। খবরের কাগজ-পড়া অভ্যেস হয়নি তখনও। ভোরবেলা সদর দরজার কাছে পড়ে থাকা খবরের কাগজ কুড়িয়ে এনে বাবাকে দিতে হত, তখন প্রথম পৃষ্ঠায় একবার চোখ বুলিয়ে নিতাম। খুব বড় খবর কাঠের ব্লকে ধ্যাবড়া হরফে ছাপা হত। 'প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ডেড', এই আট কলম হেডিং মনে আছে। অন্যান্য দিন কী সব ক্যাবিনেট মিশনের কথা থাকে, তা জানার আগ্রহ ছিল না। ভারত সম্রাটের নাম ষষ্ঠ জর্জ, তা জানি, তিনি অবশ্য এ দেশে আসেন না,

রুপোর টাকায় তাঁর কাটা মুণ্ডের ছবি থাকে। দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বড়লাট, এই সেদিনও তাঁর নাম ছিল লর্ড ওয়াভেল, এখন তাঁর জায়গায় বদলি হয়ে এসেছেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। বড় লাটরা সবাই লর্ড, আমাদের ইতিহাসে পড়তে হয়েছে লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড ডালহৌসি, লর্ড কার্জনদের কথা। লর্ড থেকেই লাট এসেছে, কিন্তু বাংলার গভর্নরদের বলা হয় ছোট লাট, তারা কিন্তু সবাই লর্ড নয়। আমরা উত্তর কলকাতার ছেলেরা তখনও ময়দানের মনুমেন্ট পর্যন্ত চিনি, তার ওপারে সাহেবপাড়া, অনেক টম টম আর ফিটন গাড়ি চলে, পার্ক স্ট্রিট নামে একটি রাস্তা নাকি অমরাবতী তুল্য, তা স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

উত্তর কলকাতাতেও কিছু কিছু সাহেব আসে। ফেরিওয়ালাদের মধ্যে চিনেম্যান প্রচুর। আর দেখা যায় কাবুলিওয়ালাদের পাহাড়ের মতন চেহারা, গায়ে পরতের পর পরত জামা, মাথায় পাগড়ি, তখনও রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্পটি পড়িনি, তাই তাদের দেখতাম দূর থেকে শঙ্কামিশ্রিত চোখে। তারা হিং, আখরোট, কিসমিস বিক্রি করে, কিন্তু তাদের প্রধান পেশা গরিবদের টাকা ধার দিয়ে চড়া হারে সুদ নেওয়া। কাবুলিওয়ালাদের টাকা ফাঁকি দেবার কোনও উপায় ছিল না, অধমর্ণরা কে কোথায় কাজ করে তা তারা জানত, মাস পয়লায় দাঁড়িয়ে থাকত, কেউ পালাবার চেষ্টা করলে চওড়া থাবায় টুঁটি চেপে ধরত তার। যেন শালিক পাখিকে ধরেছে এক বাজপাখি। কেরানি-কাবুলিওয়ালা সম্পর্ক নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত ছিল ঘরে ঘরে। আমার মামার এক বন্ধু নাকি কোনও এক কাবুলিওয়ালার মুখ থেকে অপমানজনক কথা শুনে তার দাড়ি টেনে ছিঁড়ে দিয়েছিলেন, তাকে শুইয়ে দিয়েছিল মাটিতে। বাঙালিদের মধ্যে এ রকম বীরপুরুষ অতি দুর্লভ, সেই ব্যক্তির বীরত্ব কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল মতিঝিল অঞ্চলে। পরে রবীন্দ্রনাথের গল্প পাঠ করেই শুধু নয়, সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনা পড়ে মনে হয়েছে, অধিকাংশ কাবুলিওয়ালাই বড় সড় চেহারার অতি সরল শিশুর মতন।

গ্রামের মতন, শহরের স্কুলেও আমি হেঁটে যাই। একেবারে বাড়ির সামনে থেকে ট্রামে চড়েও যাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিদিন পয়সা খরচ করবে কে?

গ্রে স্ট্রিট পেরিয়ে একটা গলি দিয়ে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট, তারপর একটু গেলেই লাহা কলোনির বিস্তীর্ণ প্রান্তর। যুদ্ধের সময় সেখানে ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছিল, তখনও বোজানো হয়নি। সেখানে লুকোচুরি খেলা হয়। লাফিয়ে লাফিয়ে ট্রেঞ্চগুলি পার হওয়া ছিল আমারও প্রতিদিনের খেলা। পরবর্তীকালে যুদ্ধ কাহিনীতে যেখানেই ট্রেঞ্চের বর্ণনা পড়েছি, আমার ওই লাহা কলোনির কথা মনে পড়েছে।

তারপর আর একটি রাস্তা ধরে শ্যামপুকুর স্ট্রিটে, ডানদিকে। এই রাস্তায় তখনও অনেক ধনীদের প্রাসাদ অটুট ছিল। বড় গেটের ফাঁক দিয়ে দেখা যেত প্রাঙ্গণে শ্বেত পাথরের নগ্ন নারী মূর্তি। যাবার সময় সতৃষ্ণ নয়নে একবার সেই মর্মর রমণীকে দেখে নিতাম এক ঝলক, পরক্ষণেই লজ্জায় মুখ নিচু হয়ে যেত। প্রত্যেক দিন সেই বাড়ির কাছাকাছি এসে মনে হত, আজ কি গেট খোলা থাকবে, না বন্ধ? দেখা হবে, কি হবে না? ওই রাস্তার সবচেয়ে সুদৃশ্য, উদ্যানশোভিত প্রাসাদটি মিত্রদের, কয়েক বছর পরেই আমি সে বাড়িতে অবাধ প্রবেশ অধিকার পেয়ে গিয়েছিলাম।

ওই সব ধনীদের অনেকের বাড়িতেই তখনও ছিল জুড়ি গাড়ি। মোটর গাড়ির যুগ এসে গেছে বটে, তবুও বনেদিয়ানা ধরে রাখার শেষ চেষ্টায় কেউ কেউ জুড়ি গাড়ি বজায় রেখেছেন। ঘোড়াগুলি খুবই দর্শনীয়। জনসাধারণের জন্য ট্রাম-বাসের পাশাপাশি ছ্যাকড়া গাড়ির সংখ্যাও প্রচুর। এই সব গাড়ির চেহারাও যেমন মলিন, ঘোড়াগুলিও হাড় জিরজিরে। শিয়ালদা থেকে আসা কিংবা হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার জন্য এই ছ্যাকড়া গাড়িগুলিই প্রশস্ত, কারণ এর ছাদে যত ইচ্ছে মালপত্র, পোঁটলা-পুঁটলি রাখা যায়, ভেতরেও গাদাগাদি করে বসতে পারে পুরো পরিবার। আমার কলকাতা দর্শনের প্রথম বাল্যস্মৃতি ঘোড়ার গাড়ির জানলা দিয়ে মুহুর্মুহু ব্যাকুল

উন্মোচন।

এই সব ঘোড়াগাড়ির পেছনে সহিসের সহকারির দাঁড়াবার একটা জায়গা থাকে, সেই সহকারি অনুপস্থিত থাকলে রাস্তার ছেলেরা দৌড়ে গিয়ে সেখানে বসে পড়ে কিছুটা যায়। সহিস টের পেয়ে গেলে উল্টোদিকে ছপটি মারে, উটকো যাত্রীটি গুটিশুটি মেরে বসলে সেই ছপটি গায়ে লাগানো শক্ত। এটাও একটা খেলা। অনেক সময় আমারও এই খেলাটি খেলতে ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু আমি যে ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে, আমাদের ওসব করতে নেই।

আমার স্কুল-জীবন সুখের ছিল না। স্কুলমাস্টারের ছেলের অনেক জ্বালা। কখনও প্রাণ খুলে দুষ্টুমি করতে পারিনি। কোনও কোনও সহপাঠীর সঙ্গে ঝগড়া করার অদম্য ইচ্ছে দমন করতে হয়েছে। ক্লাসে গল্প করা কিংবা লুকিয়ে গল্পের বই পড়ার উপায় ছিল না। প্রত্যেকটি মাস্টারমশাই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন, ক্লাসে ঢুকে প্রথমেই নজর দেন আমার দিকে। হোমটাস্ক পুরো না করলে কিংবা আমার ব্যবহারে সামান্য পান থেকে চুন খসলে মাস্টারমশাইরা হুংকার দিতেন, তোর বাবাকে বলে দেব! তাঁরা কেউ সত্যি সত্যি বাবাকে নালিশ জানালে আমাকে বাড়িতে শাস্তি পেতে হত অপরাধের তুলনায় অনেক বেশি। পিতৃ-সম্মান রক্ষা করাই আমার প্রধান কর্তব্য! ইস্কুলমাস্টারের ছেলের বখাটে হবার কোনও উপায় নেই? ইস্কুল ছাড়ার পরেই আমার সে সাধ আমি পুরোপুরি মিটিয়ে নিয়েছি। আমার সহপাঠী সত্যময় মুখোপাধ্যায়ের বাবাও একই স্কুলের শিক্ষক, সে শান্ত প্রকৃতির ভালো ছাত্র, পরবর্তী জীবনে সে বিশিষ্ট বিদ্বান ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব শাখার প্রধান হয়েছিল।

আমি ভালো ছাত্র ছিলাম না। গল্প-কবিতা পড়ার নেশা তখনই এমন ধরে গেছে, যে নিরস পাঠ্য পুস্তকে মন বসে না। ক্লাসে ফার্স্ট সেকেন্ড হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনও পোষণ করিনি, শুধু জানতাম, পাশ করতে হবে। পরীক্ষার আগের কয়েকটা দিন তেড়েফুঁড়ে পড়াশুনো করে পাশ করে যেতাম মাঝারি ধরনে।

সেই সময় স্কুলের ছেলেদের ব্রতচারী, বয়েস স্কাউট কিংবা মণিমালা কিংবা ছোটদের পাততাড়ি নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ ছিল। আমি প্রথম তিনটির সঙ্গেই যুক্ত হয়েছিলাম বিভিন্ন সময়ে, এর মধ্যে ব্রতচারীতেই আদি দীক্ষা। প্রখ্যাত আই সি এস গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক। পরবর্তীকালে কারুকে কারুকে বলতে শুনেছি নিছক দেশাত্মবোধ বা যুব সমাজের উপকারের আদর্শে নয়। ইংরেজ সরকারই উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করেছিল, যাতে অল্প বয়েসি ছেলেরা বিপ্লবী না হয়, ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে না গিয়ে নাচে গানে মেতে থাকে। এটা নিছক রটনা বা চরিত্র হননের চেষ্টাও হতে পারে, অনেকে যে কোনও ভালো কাজের পেছনেই কিছু না কিছু অভিসন্ধি খোঁজে। গুরুসদয় দত্ত এমন কতকগুলি গান রচনা করেছিলেন যেগুলির আবেদন কিশোর মনে খুবই দাগ কাটে। দশ-বারো বছরে শেখা সেইসব গান আমি আজও ভুলিনি। এখনকার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও সেই সব গান শিখলে উপকার ছাড়া ক্ষতির কোনও প্রশ্ন নেই।

কয়েকটা গান এই রকম :

বাংলার মানুষ আমরা, বাংলার সন্তান দল
কর্মে খুঁজি মুক্তি, ঐক্যে গড়ি বল
.............পাল রাজার বীর্য গরিমা
চণ্ডীদাস জয়দেবের ছন্দ মহিমা.....

বাংলার পুকুর-খাল-বিল সব কচুরিপানায় ভরা। ম্যালেরিয়া কলেরা উদরাময় প্রভৃতি রোগ এই কচুরিপানার দূষিত জল থেকেই বেশি ছড়ায়। সারা দেশকে এই কচুরিপানা থেকে মুক্ত করা এমন কিছু শক্ত নয়, কিন্তু সে ব্যবস্থা কখনও গ্রহণ করা হয়নি। গুরুসদয় যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গান বেঁধেছিলেন :

চল আয় কচুরি নাশি
এই রাক্ষুসী যে বাংলাদেশের দিচ্ছে গলায় ফাঁসি
চল, আয় কচুরি নাশি....

গুরুসদয় দত্তর ব্রতচারীতে আর একটি গান এখনও সুর সমেত আমার মনে আছে, কোনও বাচ্চাদের সমাবেশে গেলে গেয়ে শোনাতে ইচ্ছে করে। অনেক বক্তৃতার চেয়ে এরকম একটি গান বেশি কার্যকর।

আমার ঠাকুরের নাই কোনো আচার
ওগো নাই কোনো নাম, নাই কোনো ধাম
নাই কো জাত বিচার
কেউ বলে আল্লা হো আকবর
কেউ বলে বনমালী, শ্যাম নটবর
আবার যীশু নামে বেথলেমেতে
হলো গো প্রচার
আমার ঠাকুরের নাই কোনো আচার।

ছেচল্লিশের ১৬ অগাস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক ও বীভৎস দাঙ্গার পর এক বছর পূর্ণ না হতেই শোনা গেল, স্বাধীনতা এসে যাচ্ছে। একটা পরাধীন দেশের পক্ষে স্বাধীনতার স্বপ্নই সবচেয়ে মধুর, সেই স্বপ্ন কখনও সত্য হবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই আনন্দের অবধি থাকার কথা নয়। কিন্তু আমাদের কাছে এই বার্তা এল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন!

এগারো

দেশ স্বাধীন হল, আমরা দেশ হারালাম। এই বাক্যটি শুনতে অদ্ভুত না? এই অদ্ভুত ব্যাপারটিই নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল আমাদের ঘটমান বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

দেশবিভাগ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে, আমি আর সে জঞ্জাল বাড়াতে চাই না। তবে সেই প্রসঙ্গ উঠলে এখনও ক্রোধবহ্নি জ্বলে ওঠে, সেই দুষ্কর্মের হোতাদের ক্ষমা করতে পারি না। সেই সময় যে-সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস ও অসূয়া তৈরি হয়েছিল, তাতে ভারত বিভাগ হয়তো অবধারিত ছিল। কিন্তু যাতে কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের দিশা বদলে যাবে, সেই কাজ কি অত দ্রুততার সঙ্গে করা যায়? হিন্দু ও মুসলমান নেতারা কেন বুঝতে পারেননি যে তাঁরা তখনও আসলে ইংরেজ শাসকদের ক্রীড়নক। যে স্বাধীনতার জন্য এত সংগ্রাম, এত আত্মত্যাগ, সেই স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত অর্জন করা গেল না। শেষ হাসি হেসে গেল ইংরেজরা। ত্যাগ করে যাবার আগে এ দেশকে চিরতরে দুর্বল করে যাওয়াতেই ছিল তাদের প্রকৃত স্বার্থ। শাসন করেছে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'—এই নীতিতে, তাদের শেষতম নীতি 'ডিভাইড অ্যান্ড কুইট'। হিন্দুদের প্রতি অবিশ্বাসে মুসলমান নেতারা পাকিস্তানের দাবি চূড়ান্ত করে তুলেছিলেন, কিন্তু তাঁদের উস্কানিদাতা ছিল ইংরেজরা। নেহরু অনেক সময় তিতিবিরক্ত হয়ে বলেছেন, বোঝাপড়ার আলোচনা এগোতে পারে না, 'সাদা মোল্লা'-দের জন্য। সাদা মোল্লাদের এই কূট কৌশল মুসলমান নেতৃবৃন্দ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, প্রতিরোধ করতে পারেননি কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ।

পাকিস্তানের দাবিদার বাঙালি মুসলমান নেতারাও তখনও পর্যন্ত অনুমান করতে পারেননি

যে, তাঁরা স্বাধীন হচ্ছেন না, তাঁরা একটি নতুন দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হতে চলেছেন। প্রায় শেষ মুহূর্তে আবুল হাসেমের মতন নেতার চৈতন্য হল, তিনি বললেন, হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, শেষ পর্যন্ত সবাই বাঙালি। সকলের ভাষা এক, সংস্কৃতি এক। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা কেন হাজার মাইল দূরের পাকিস্তানি শাসন মেনে নেবে? কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওদিকে সুরাবর্দি, এদিকে শরৎ বসুর মতন নেতারা অখণ্ড বাংলা রক্ষার জন্য দৌড়দৌড়ি করেছিলেন, সে দাবি নস্যাৎ হয়ে যায়। র‍্যাডক্লিফ সাহেব ততদিনে ছুরি দিয়ে বাংলাকে কেটে ফেলেছেন।

পাকিস্তানের ধ্বংসের বীজ তার সৃষ্টির মধ্যেই উপ্ত ছিল। জিন্না সাহেবও কায়েদ-ই-আজম হবার পরেই বললেন, এ পোকায় কাটা পাকিস্তান নিয়ে আমি কী করব? আর ভারতের ললাটে রয়ে গেল কাশ্মীররূপী চির অশান্তি।

স্বাধীনতার দিনটিতে আমরা কলকাতাতেই ছিলাম। সকাল থেকেই প্রভাতফেরী ও নানা রকম মিছিল যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। কিন্তু আমাদের বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি। দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি যে একটি বিশাল ঘটনা, তা উপলব্ধি করার মতন বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু বাড়ির লোকদের ম্রিয়মাণ মুখগুলি দেখে মনে হয়েছিল, এর মধ্যে গভীর শোকের ব্যাপারও রয়েছে। কিছু কিছু পূর্ববঙ্গজ আত্মীয়স্বজন এসেছেন বাড়িতে, তাঁরা কথা বলছেন নিচু স্বরে। দেশভাগের পুরোপুরি তাৎপর্য তখনই বোঝা সম্ভব ছিল না। এঁরা সবাই পড়াশুনো বা চাকরিসূত্রে কলকাতায় অস্থায়ী বাড়িতে থাকেন, গ্রামের বাড়িই আসল বাড়ি। সেখানে কি আর ফেরা যাবে? কিংবা সেখানে যে কাকা-জ্যাঠা, মাসি-পিসিরা রয়েছেন, তাঁরাই বা টিঁকতে পারবেন কতদিন? ব্যক্তিগতভাবে এঁদের সকলেরই মুসলমান বন্ধু আছে, মুসলিম লিগ এঁদের বুকে বজ্র হানলেও মুসলমানদের প্রতি জাতিগত বিদ্বেষ তৈরি হয়নি, কিন্তু প্রায় এক বছর ধরে বীভৎস, হিংস্র দাঙ্গা চলছে বলে অবিশ্বাস ও আশঙ্কা জমেছে মনে মনে।

আমার বাবা দেশভাগ কিছুতেই মানতে পারেননি। তাঁর মতে, এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব, ইংরেজরা তাড়াহুড়ো করে কাটা ছেঁড়া করে দিয়ে গেছে, দেশের মানুষ আবার মিলেমিশে যাবে, মুছে ফেলবে এই কৃত্রিম সীমারেখা, বারবার জোর দিয়ে তিনি বলেছিলেন এই কথা, এবং আমৃত্যু তাঁর এই বিশ্বাস ছিল।

শোনা যায়, গাঁধীজি সেদিন কেঁদেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমার কাছে আজ উৎসবের দিন নয়, কান্নার দিন। তবু, অধিকাংশ বাঙালিই দেশভাগের জন্য অনেকটাই দায়ী করেছে সেই মানুষটিকে। সকলেরই ধারণা, গাঁধীজি জোর দিয়ে বললে, ভারত বিভাগের বিরোধিতা করলে, তা অমান্য করার সাধ্য নেহরু-পটেল প্রমুখের ছিল না। না হয় জিন্নাকেই করা হত অখণ্ড স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী! অনেক ব্যাপারেই গাঁধীজি আমরণ অনশনের সঙ্কল্প নিয়ে অনেক সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছেন, এমন একটি গুরুতর ব্যাপারে তিনি কেন অনশনে বসলেন না? গাঁধীজির প্রায়োপবেশনকে আগে অনেকবার ইংরেজরাও অগ্রাহ্য করতে পারেনি, সেক্ষেত্রে তাদের বিশ্ব জনমতের কথা চিন্তা করতে হয়েছে। নাথুরামের গুলিতে প্রাণ দেবার বদলে ভারত বিভাগের বিরোধিতা করে গাঁধীজি যদি অনশনে প্রাণ দিতেন, তা হলে তাঁর মর্যাদা বেড়ে যেত শতগুণ। নিহত হবার আগেই যেন তিনি বিগত মহিমা, প্রাণশক্তিও প্রায় নিঃশেষিত, তাঁর নামের ম্যাজিকও আর কাজ করে না। তিনি বললেন, স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস পার্টি ভেঙে দিতে, কর্ণপাত করলেন না কেউ। ওদিকে জিন্নাও ক্ষমতার সিংহাসনে বসার জন্য অধীর হয়ে দেশটা দু' ভাগ করলেন, সে সিংহাসন তিনি পুরো একটি বছরও ভোগ করতে পারলেন না। গাঁধীজির আট মাস পর পৃথিবী থেকেই প্রস্থান করতে হল জিন্নাকে। জাতির পিতা নামে অভিহিত এই দু'জনই দুটি দেশকে মহা অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়ে সরে পড়লেন।

দেশভাগের সময় সরকারি চাকুরেদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যার যে-দেশ পছন্দ সেখানে

চলে যাবার। বে-সরকারি চাকুরিজীবীদের সে সুযোগ নেই, তারা বাঁচুক বা মরুক, তাতে কার কী আসে যায়। পাকিস্তানের উদ্গাতারা ধর্মের প্রশ্নে দেশ ভাগ করলেন, কিন্তু ভারতে পড়ে থাকা কোটি কোটি মুসলমানের ভাগ্য নিয়ে চিন্তা করলেন না, তেমনই ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী ভারতীয় নেতারা চিন্তা করলেন না পাকিস্তানের হিন্দুদের নিরাপত্তার কথা। ফলে, দু' দিকেই শুরু হল শরণার্থীদের প্রবল স্রোত। পরিসংখ্যান অনুযায়ী হিন্দু উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বহুগুণ বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানে তো হিন্দুরা নিশ্চিহ্নই হয়ে গেল প্রায়।

আমাদের ফরিদপুর অঞ্চলে ঠিক কী ধরনের দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছিল, তা আমার স্মরণে নেই, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিল না। তবে আমাদের আত্মীয়স্বজনরা সকলেই চলে এসেছিলেন। নিতান্ত বাধ্য না হলে কি কেউ পিতৃ-পিতামহের ভিটে-মাটি ছেড়ে অনিশ্চিতের উদ্দেশে পাড়ি দেয়? মাটির টান অতি সাংঘাতিক। বিশেষত রমণীরা সাজানো সংসার ছেড়ে যেতে চায় না কিছুতেই। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা যে ভারতের দিক থেকে কোনও সোনালি হাতছানি দেখতে পেয়েছিলেন, তা নয়। ছিল না সাদর অভ্যর্থনার সামান্যতম ইঙ্গিত। বরং শরণার্থী হয়ে এসে তারা পেয়েছে উপেক্ষা, অবহেলা, বিদ্রূপ, অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ। তবু তারা এসেছে, বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে, পায়ে হেঁটে কিংবা নৌকোয়। নেহাত আমার বাবা দেশ ভাগের আগে থেকেই কলকাতার স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, আমরা থাকতাম এখানেই, সেই জন্য আমাদের ওরকম তাড়া-খাওয়া উদ্বাস্তু হতে হয়নি, তবু ওই দিন থেকে আমরা হয়ে গেলাম শিকড়হীন। আমাদের প্রতিবেশীরা আগে আমাদের বলত বাঙাল কিংবা বাঙাল দেশের লোক, এখন থেকে বলতে লাগল রিফিউজি।

এক কাকা আমাদের সঙ্গেই থাকতেন, আর এক কাকা কিছুদিন স্রোতের শ্যাওলার মতন এদিক ওদিক ভাসবার পর হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখেছি, তাঁর যে তেমন আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা ছিল তা নয়, মানব সেবার মহান আদর্শও তাঁকে টানেনি, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিলেন স্রেফ খাওয়া-থাকার চিন্তা ঘুচে যাবে বলে। গ্রামীণ পরিবেশে মানুষ, তেমন কিছু লেখাপড়া শেখেননি, কখনও শহর-বাসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, গ্রাম্য, ভূমি-নির্ভর জীবনে এই সব মানুষকে মানিয়ে যায়, কিন্তু অন্য পরিবেশে এলে এদের দিশেহারা অবস্থা হয়। তিনি তখনও বিবাহ করেননি, আর সে প্রশ্নও ছিল না, কোনওক্রমে মিশনে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়ে তিনি বেঁচে যান। গেরুয়াধারী হলেও উচ্চতর মহারাজদের ফাই-ফরমাস খাটা ছাড়া আর বিশেষ কিছু যোগ্যতা ছিল না তাঁর।

আমার এক জ্যাঠামশাই সপরিবারে দেশত্যাগ করে খুবই বিপদে পড়ে যান এখানে এসে। পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের কিছু কিছু সৌভাগ্যবান হিন্দু পশ্চিমবাংলার কিছু কিছু মুসলমানের সঙ্গে বাড়িঘর-সম্পত্তি বদলাবদলি করার সুযোগ পেয়েছিল, প্রধানত ঢাকা-চট্টগ্রাম-যশোর ইত্যাদি শহরের মানুষদেরই সেই সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বাড়ি ছিল প্রত্যন্ত গ্রামে, বিষয়-সম্পত্তিও বলতে গেলে যৎসামান্য, সুতরাং বদলাবদলির কোনও সুযোগই ঘটেনি। তা ছাড়া পরিবেশ নিশ্চিত হঠাৎ খুব বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল, তাই তড়িঘড়ি অস্থাবর জিনিসপত্রও না নিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কলত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য চলে আসেন কলকাতায়। পরিবারে আমার বাবাই একমাত্র চাকুরিজীবী, সুতরাং তাঁকেই দায়িত্ব নিতে হয়েছিল সকলের। জ্যাঠামশাইয়ের বিশেষ ডিগ্রি ছিল না, কিন্তু সংস্কৃত জানা বিদ্বান ব্রাহ্মণ, তখন সেই বিদ্যার কোনও মূল্যই নেই। যুদ্ধ শেষ হবার পর চতুর্দিকে ছাঁটাই ছাঁটাই রব, ঘরে ঘরে বেকার, এর মধ্যে আমার জ্যাঠামশাইয়ের মতন মানুষের কোনও চাকরি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, তবু আমার বাবা সম্ভবত মরিয়া হয়েই সেই অসম্ভবকেও সম্ভব করেছিলেন। যেহেতু অনেক ছাত্রের অভিভাবকদেরই তিনি চেনেন, এবং তাঁদের অনেকেই চাকরিতে উচ্চপদস্থ কিংবা সফল ব্যবসায়ী, তাই তাঁদের ধরাধরি করে কোনওক্রমে মার্টিন অ্যান্ড বার্ন কোম্পানিতে একটি নিচু কেরানির চাকরি সংগ্রহ করে দেন

জ্যাঠামশাইয়ের জন্য। তিনি আলাদা বাসা ভাড়া করলেন। খুব বাল্যকালে দেখেছি, আমার জ্যাঠামশাই দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, গ্রাম্য জল-মাটি ছেড়ে কলকাতায় আসার পর তিনি রোগা হতে শুরু করেন, কয়েক বছরের মধ্যেই একেবারে কঙ্কালসার চেহারা, গলার আওয়াজও খোনা খোনা হয়ে যায়। এমন সর্বাংশে ভেঙে পড়া মানুষ আমি আর দেখিনি।

আমার এক পিসিমাও তাঁর সন্তানদের নিয়ে কিছুদিন আমাদের কাছে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতার সামান্য উপার্জনে বাবা নিজের সংসার চালাতেই হিমসিম খেয়ে যেতেন, তার ওপর এত সব দায়িত্বের বোঝা এসে পড়ায় তিনি কী করে সামলাতেন, তখন বুঝিনি। কথায় বলে, উদয়াস্ত পরিশ্রম, আমার বাবার ক্ষেত্রে সেটা ছিল দীর্ঘতর, ভোর থেকে প্রায় মধ্যরাত্রি, প্রায় দিনই বাবাকে আমরা প্রায় চক্ষেই দেখতাম না। উপার্জন বাড়াবার জন্য তিনি পাগলের মতন টিউশানি করতেন।

সেই সময়কার দারিদ্র্যের কোনও তিক্ততার স্মৃতি আমার নেই। পরবর্তীকালে ভাবতে বেশ মজাই লেগেছে। মরে তো যাইনি, বেঁচে আছি, তাই-ই যথেষ্ট। দুটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য।

আমাদের প্রধান বিলাসিতা ছিল মাছ নিয়ে। ডাল-তরকারি যাই-ই থাকুক, অন্তত এক টুকরো মাছের ঝোল না থাকলে ভাত খাওয়া যেন সম্পূর্ণই হয় না। মা মাছ ছাড়া খেতেই পারেন না। প্রতিদিন বাজার এলেই প্রথমে বলেন, কী মাছ দেখি! স্বাধীনতা প্রথম ধাক্কায় আমাদের মাছ কেড়ে নেয়। পরিজনের সংখ্যা বেড়ে গেলে সকলের জন্য মাছ কেনার প্রশ্নই ওঠে না। নিরামিষ আহারে সকলের মুখেই অতৃপ্তির ছাপ। ধোঁকার ডালনা কি মাছের বিকল্প হতে পারে? গরমমশলা দিয়ে রান্না এঁচোড়ের তরকারি খেয়ে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করে বলতাম, ঠিক মাংসের মতন। এঁচোড়ের নামই হয়ে গিয়েছিল গাছ-পাঁঠা! মাঝে মাঝে হাঁসের ডিমের ঝোল হত। তাও প্রত্যেকের জন্য একটা আস্ত ডিম না, আধখানা। প্রথমে কয়েকটি ডিম সেদ্ধ করে তারপর সুতো দিয়ে খুব সাবধানে দ্বিখণ্ড করা। এ অতি সূক্ষ্ম কারুকাজ, আমার মা এতই ভালো পারতেন যে সেই আধখানা সেদ্ধ ডিম ভেঙে ঝোল করার পরেও একটুও ভাঙত না, সামান্য কুসুমকণাও বিচ্যুত হত না। শ্রীমতী মীরা দেবী ধনী পরিবারে পালিতা হয়েছিলেন, তবু অবস্থার চাপে পড়ে এমন সূক্ষ্ম রন্ধনকলা শিখে নিয়েছিলেন। মেয়েরা সব পারে। সে রকম আধখানা ডিমের ঝোল আমি আর পরে কোথাও দেখিনি।

সেবারে দোলের সময় আবিষ্কার করলাম, আমার জামার সংখ্যা মাত্র একটি। জ্যাঠতুতো-পিসতুতো ভাইদের অন্য জামা দিয়ে দিতে হয়েছে। উত্তর কলকাতার দোল মানে রং মেখে একেবারে ভূত হতে হয়। রুপোলি, সোনালি রং, আলকাতরা, রাস্তার কাদা কিছুই বাদ যায় না। সেদিনের জামাটি পুরোপুরি বিসর্জন দিতে হয়। আমার একটি মাত্র জামা, পরের দিন ইস্কুলে যাব কী করে? আমি তো আর বস্তির ছেলেদের মতন খালি গায়ে বাড়ি থেকে বেরোতে পারি না! সুতরাং দোল খেলা বন্ধ। কিন্তু স্কুলের সহপাঠী, পাড়ার ছেলেরা অনবরত ডাকছে, আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে কাঁপার ভান করে নাকি নাকি গলায় বলছি, জ্বর, খুব জ্বর। প্রয়োজনে মানুষ অভিনয় ভালো শেখে, ভিখিরির বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও কত উত্তম অভিনেতা। গ্লিসারিন লাগে না, যখন তখন চোখে জল আনতে পারে। আমিও জ্বরো-রুগীর ভূমিকায় ভালোই অভিনয় করেছিলাম। রাস্তায় রাস্তায় প্রবল হই হল্লা, বাড়ির মধ্যেও অন্যান্য ভাড়াটেদের ছেলেমেয়েরাও রং মেখে হুড়োহুড়ি করছে, আমি ছটফট করছি মনে মনে।

দুপুর দুটো-তিনটে পর্যন্ত চলে এই রকম দোল খেলার দাপট। তারপর কিছুক্ষণ সব শান্ত। বিকেলের দিকেও অনেকে বাড়ি বাড়ি যায়, তখন শুধু আবীর বা ফাগ মাখানো হয়, সেটা বেশ ভদ্র ব্যাপার, ওতে জামা-কাপড়ের কলঙ্ক হয় না। বিকেলবেলা বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়, আশুদের বাড়ি থেকে গল্পের বই নিতে হবে, ওদের বাড়িতে যদি আবীর খেলা হয়, তাতেও ঘোলে মিটবে দুধের স্বাদ। খানিকটা যেতেই একটা গলির মুখে, আমার চেয়েও বাচ্চা একটি

ছেলে ফস করে ছোট একটা পিচকিরি থেকে রং দিয়ে দিল আমার জামায়। সারা বুক ভিজে গেল ক্যাটকেটে লাল রঙে। শুধু রাগ নয়, অভিমানে আমার চেখে জল এসে গেল। জামাটা যদি নষ্টই হবে, তা হলে আমি সকালে দোল-উৎসবের মাতামাতি থেকে বঞ্চিত হলাম কেন? ছেলেটার ঝুঁটি ধরে সপাটে লাগালাম তার গালে একখানা চড়। ছেলেটি কান্না-ভরা অভিযোগে চেঁচিয়ে উঠল, ম্যাজিক কালার! ম্যাজিক কালার! অর্থাৎ বিকেলবেলা জল রং দিয়েও সে কোনও বেআইনি কাজ করেনি, এটা একধরনের প্র্যাক্টিক্যাল জোক। সত্যিই সেই রং মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে। ছেলেটিকে চড় মারার জন্য বহুকাল অনুতাপ বোধ করেছি।

দেশের স্বাধীনতা আমাকেও একধরনের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল, একা একা বাড়ির বাইরে ঘুরে বেড়াবার অনুমতি। ঠিক অনুমতি নয়, কৌশলে আদায় করে নেওয়া। বাবা রাত সাড়ে দশটার আগে বাড়ি ফেরেন না। মা ছোট ভাই-বোন ও অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, আমাকে শাসন করবে কে? এত ব্যস্ততার মধ্যেও মা বই পড়ার নেশা ছাড়তে পারেননি। রান্না করতে করতেও বই খুলে রাখতেন, লাইব্রেরি থেকে আমাকেই বই এনে দিতে হয়। মা বয়েজ ওন লাইব্রেরির সদস্যা হয়েছিলেন, নামটা তখন ঠিক বুঝতাম না, বলতাম ধয়েজোন। সেখানে ছোট ছেলেদের বদলে বয়স্কদেরই ভিড় দেখছি বেশি। সেখানে গ্রন্থের সংখ্যা প্রচুর, প্রতি সন্ধেবেলা বই আনতে যেতাম, কতক্ষণ লাগবে, তা তো বলা যায় না, এক একদিন ভিড় থাকলে সত্যিই অনেক সময় লাগত, কোনওদিন তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে আমি ঘুরে বেড়াতাম এদিক-ওদিক। অর্থাৎ সন্ধেবেলা নিজের পড়া ফাঁকি দিয়ে আমি এই শহরের অলি গলি ঘুরে ঘুরে বাড়িয়ে ফেলতাম আমার চেনা জগতের পরিধি। সেটা সিনেমা থিয়েটারের পাড়া। প্রথমে স্টার থিয়েটার, তারপর রূপবাণী সিনেমা, তার পাশে একটা বিশাল পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ি, অত উঁচু বাড়ি উত্তর কলকাতাতে তো বটেই তখন সারা কলকাতাতেই অঙ্গুলিমেয়, সেই বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা, সেইখানে লাইব্রেরি, তার একটু পরেই শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চ। প্রবাদপ্রতীম নট শিশিরকুমার ভাদুড়ী সেখানে তাঁর জীবনের শেষ কিছু অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছি কয়েকবার, মঞ্চের বাইরে। তখনকার দিনের বিখ্যাত গায়ক ও অভিনেতা ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, তিনি অন্ধ, তাই লোকের মুখে তাঁর ডাকনাম ছিল কানাকেষ্ট, এই নামটি লেখা হয়তো উচিত হল না, কিন্তু অনেক পোস্টারেও এই নাম ছাপা দেখেছি। এঁরই ভাইপো এখনকার প্রখ্যাত গায়ক মান্না দে। শিশিরকুমার ও কৃষ্ণচন্দ্র খুব বন্ধু ছিলেন, মাঝে মাঝে দেখতাম, ওরা দু'জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাটির ভাঁড়ে চা খেতে খেতে মগ্নভাবে কথা বলছেন। একটি কিশোর একটু দূরে থমকে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকত ওঁদের দিকে। কিশোরটির তখন হাফপ্যান্টের নীচে ঠ্যাংদুটো বিসদৃশ রকমের লম্বা দেখায়, নাকের নীচে সূক্ষ্ম রোমের রেখা, গলার আওয়াজ ভাঙতে শুরু করেছে। কিশোরটি অবাক হয়ে ভাবত, শিশিরকুমার ও কৃষ্ণচন্দ্র, ওঁরা নক্ষত্রলোকের মানুষ। ওঁরাও সাধারণ মানুষের মতন রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা খান মাটির খুরিতে? কিশোরটি একদিন গুটি গুটি পায়ে ওঁদের খুব কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ওঁদের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য। হায়, ওঁরা নাট্য বা সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করছিলেন না, খুবই দুশ্চিন্তিত ছিলেন টাকা-পয়সার অভাব বিষয়ে।

সে সময়ে কিশোর সাহিত্যের সংখ্যা এতই কম ছিল যে আমার উপযোগী পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা অচিরে ফুরিয়ে যায়। এদিকে ক্ষুধা সাঙ্ঘাতিক, বাধ্য হয়েই আমাকে ঢুকে পড়তে হয় বড়দের বইয়ের জগতে। মায়ের জন্য দু'খানা করে বই আনি, সেগুলি আমিই আগে শেষ করি। বুঝি না বুঝি, তাতে কিছু আসে যায় না। উই পোকা কি বইয়ের অর্থ বুঝে খায়? মনে আছে, ক্লাস সিক্সে পড়ার সময়ই কী করে যেন হাতে আসে রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা। সেটা পড়ছি, এক মামা আমার কান ধরে বলেছিলেন, অ্যাঁ, খুব এঁচোড়ে পাকা হয়েছিস? তবু বইখানা শেষ করেছিলাম, এবং বুঝিনি, কতটা এঁচোড়ে পাকা হলাম। মা শরৎচন্দ্র, নরেশ সেনগুপ্ত, উপেন

গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখের রচনা বেশি পছন্দ করতেন, আমি সে সবই পড়তাম, ক্রমশ আমার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ গড়ে ওঠে। কল্লোল যুগের লেখকরা আমাকে বেশি টানে। ক্যাটালগে এক একজন লেখকের নাম ধরে ধরে তাঁদের সব বই পড়ে ফেলতাম। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ......। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর আমি তাঁর বহুকাল ছাপা না থাকা কোনও কোনও বইয়ের উল্লেখ করায় তিনি হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, যখন তিনি ও তাঁর বন্ধুরা অর্থসঙ্কটে ছিলেন তখন দেবসাহিত্য কুটির বা অন্য দু'একটি প্রকাশকের জন্য অনেক ছোট ছোট উপন্যাস লিখেছিলেন, সেগুলি হারিয়েই গেছে বলে ধরে নেওয়া হত, শুধু কয়েকটি লাইব্রেরিতে সেসব বইয়ের অস্তিত্ব টিঁকে ছিল। আমি বুদ্ধদেব বসুকে সবিনয়ে বলেছিলাম, ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত আপনার এমন কোনও লেখা নেই, যা আমি পড়িনি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কবি ও অনুবাদক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক সময় আমার বাংলা বই পড়া নিয়ে প্রতিযোগিতা হত। মানবেন্দ্র ছাড়া, অন্য কোনও লেখক বা চেনাশুনো কেউ আমার চেয়ে বেশি বাংলা বই পড়েনি। পাঁচকড়ি দে থেকে শশধর দত্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় থেকে প্রবোধকুমার সান্যাল, এমনকী নীহাররঞ্জন গুপ্ত কিংবা রোমাঞ্চ সিরিজে প্রতুল লাহিড়ীর গোয়েন্দা কাহিনী কিছুই বাদ দিইনি। মানবেন্দ্রর সঙ্গে আমার তফাত এই, এত বেশি বাইরের বই পড়েও সে অ্যাকাডেমিক পড়াশোনাতেও কৃতবিদ্য, সেদিকে আমার কিছুই হয়নি!

তৎকালীন লেখকদের সম্পর্কে কিছু কিছু কৌতুক কাহিনী প্রচলিত ছিল। অধুনা বিস্মৃত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় একসময় বেশ জনপ্রিয় এবং বহু গ্রন্থের লেখক ছিলেন। তাঁর ভাষার বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি অনেক বাক্যই ডট ডট দিয়ে শেষ করতেন, যেমন, সে জানালার দিকে চাহিয়া রহিল......, কিংবা সে এখন কী করিবে......। এই লেখকের কন্যা সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়ই এখনকার স্বনামধন্যা গায়িকা সুচিত্রা মিত্র। তখন অনেকে বলত, এই সুচিত্রা হচ্ছে সৌরীন্দ্রমোহনের ডটার! রবীন্দ্রনাথ ছবিও আঁকতেন বলে তখন অনেক লেখকও ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন। যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল। তারাশঙ্কর নাকি ছবি আঁকতে আঁকতে তাঁর ছেলে সনৎকে ভুল করে রথী বলে ডেকে উঠতেন। মোহন সিরিজের লেখক শশধর দত্ত সম্পর্কে ধারণা ছিল, তিনি বহু দেশ ঘোরা, সাহসী, বলশালী পুরুষ। একসময় জানা গেল, তিনি উত্তর কলকাতারই একটি মেস বাড়িতে থাকেন। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তাঁর সঙ্গে। নিতান্তই এক রোগা সোজা নিরীহ বাঙালি, কথা বলতে বলতে থুতু ফেলেন মেঝেতে, খুব আফসোসের সঙ্গে জানালেন, ওই রকম এক-একটা রোমহর্ষক বইয়ের জন্য তিনি মাত্র পঞ্চাশ টাকা করে পান। এঁর ডাকনাম ছিল, কী হইতে কী হইয়া গেল বাবু। কারণ, এঁর বইতে, দুর্ধর্ষ নায়ক মোহনকে কোনও দুর্বৃত্ত একেবারে' কোণঠাসা করে ফেলেছে, তার রিভলভার মোহনের গলায় ঠেকানো, মোহনের বাঁচার কোনও উপায়ই নেই, তবু নায়ককে উদ্ধার করার জন্য তিনি এরকম অবস্থায় প্রায়ই লিখতেন, তাহার পর কী হইতে কী হইয়া গেল, দুর্বৃত্তের রিভলভার মোহনের হাতে!

আমার প্রধান দোষ আমি বই পড়তে পড়তে বড় কাঁদি। মৃত্যু দৃশ্য বা করুণ দৃশ্যে নয়, ভুল বোঝাবুঝির দৃশ্যে আমার চোখে বেশি জল আসে। একজন আর একজনকে ভুল বুঝছে, অথচ ভালোবাসার অভাব নেই, এরকম আমি সহ্য করতে পারি না। মনে আছে, সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' প্রথমবার পড়ার সময় মা, বাবা ও দুই ভাইয়ের ভুল বোঝাবুঝির কাহিনীতে আমি এত জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম যে মা ভয় পেয়ে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে ব্যাকুলভাবে জানতে চেয়েছিলেন, কী হয়েছে? তখন শুধু লজ্জা পেয়ে চোখের জল মুছতে হয়। এ জীবনে আমি বই পড়ে যতবার কান্নাকাটি করেছি. প্রিয়জন বিচ্ছেদের কান্না সে তলনায় অনেক কম।

ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগে বড়দের বই পড়লে চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। কতবার বকুনি খেয়েছি এজন্য। স্কুলের বই ছাড়া অন্য কোনও বই হাতে দেখলেই বাবা চোখ রাঙিয়ে বলতেন, নভেল-নাটক পড়া হচ্ছে? আবার যদি ফের দেখি—। নভেল একনম্বর ভিলেইন, নাটক তো পাঠযোগ্যই নয়। মহাপুরুষদের জীবনী তবু চলতে পারে। আমি কোনও নিষেধাজ্ঞা মানিনি, যা পেয়েছি, সব পড়েছি, পরীক্ষার আগের দিনও ইংরিজি টেক্সট বুকের তলায় লুকিয়ে পড়েছি গোয়েন্দা গল্প। অন্যরা বলাবলি করত, প্রবোধকুমার সান্যালের 'আঁকাবাঁকা', নাকি অশ্লীল বই, যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ'। ওসব বই পড়ে শেষ করে ফেলেছি গোঁফ গজাবার আগে। কই, তাতে তো বখেও যাইনি, চরিত্রও নষ্ট হয়নি।

কিংবা হয়েছে হয়তো। বোধহয় আমার চরিত্র বলে কিছুই নেই।

বারো

দেশ বিভাগের ফলে ফরিদপুরের আমগ্রামে আমার মায়ের মামাবাড়ির দুর্গাপুজো স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তখনও সকলের দৃঢ় বিশ্বাস বা সংস্কার ছিল যে পুজো-টুজো হঠাৎ বন্ধ করলে দারুণ পাপ হয় এবং নির্বংশ হবার সম্ভাবনা থাকে। বলাইবাহুল্য, এসব পরান্নজীবী ব্রাহ্মণদেরই রটনা। সুতরাং সুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবার গ্রামের সেই পুজো চালিয়ে যেতে থাকেন তাঁদের মতিঝিল কলোনির বাড়িতে। কিছুদিন পরে যখন কলকাতার আশেপাশে শত শত রিফিউজি কলোনি গজিয়ে ওঠে, তখন 'কলোনি' শব্দটিতে মতিঝিলবাসীদের আপত্তি হতেই পারে। নাগেরবাজারের কাছে এই সুদৃশ্য ও সুপরিকল্পিত পল্লীটি তৈরি হয় স্বাধীনতার অনেক আগেই, বিশিষ্ট এবং ধনবান ব্যক্তিরাই এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং মতিঝিল নামে একটি ঝিল সেখানে সত্যিই ছিল, এখন মরে হেজে গেছে। যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এই কলোনির অনেক বাড়িই অধিগ্রহণ করে, সুরেন্দ্রমোহনের উদ্যান সমন্বিত ভবনটিও বাদ যায়নি। গোলাপ বাগানে বসানো হয়েছিল কামান। ঝিলের জলে দাপাদাপি করত প্রায়-উলঙ্গ মার্কিন সৈন্য, যাদের ডাক,নাম টমি। যুদ্ধ শেষে বিপর্যস্ত অবস্থায় বাড়িটি ফেরত পাওয়া যায়, সরকার থেকে ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বাড়িটির শোভা আর পুনরুদ্ধার হয়নি। পরিবারের জনসংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় অপরিকল্পিতভাবে আরও ঘর বাড়ানো শুরু হয় এবং আয় বৃদ্ধির জন্য বাগান গ্রাস করে তৈরি হয় ভাড়াবাড়ি।

মতিঝিলের বাড়ির পুজোর সঙ্গে গ্রামের পুজোর কোনও তুলনাই চলে না। গ্রামে চলত প্রায় এক মাসব্যাপী উৎসব, স্থায়ী পূজামণ্ডপ, বিশাল প্রতিমা, নানারকম গান-বাজনা, যাত্রা-থিয়েটার, পুজোর তিনদিন গ্রামশুদ্ধু সকলের পাত পেড়ে খাওয়ার আমন্ত্রণ। আর এখানে প্রায় নমো নমো করে পুজো সারা যাকে বলে। প্রতিবছরই প্রতিমার আকার ছোট হতে থাকে, এবং টিম টিম করতে করতে সুরেন্দ্রমোহনের মৃত্যুর দু'এক বছর আগে পরে পুজো একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। ততদিনে বাস্তব অবস্থার চাপে পড়ে পাপ-ভীতি বা সংস্কার লোপ পেয়ে গেছে। বহু হিন্দু পরিবারেই আর দুর্গাপুজো চালিয়ে যাবার সামর্থ্য থাকে না। দেশ বিভাগের পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে মা দুর্গা বারোয়ারি হয়ে যান।

সেই থেকে দুর্গাপুজোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘুচে গেলেও আর কয়েকটি বছর আমি জড়িত ছিলাম সরস্বতী পুজোর সঙ্গে। স্কুলে তো পুজো হবেই, আর ক্লাস নাইন-টেনের ছেলেদের ওপরই থাকে চাঁদা তোলা এবং সবকিছু ব্যবস্থাপনার ভার। টাউন-স্কুলের সমস্ত ছাত্রকে

খাওয়ানো হত লুচি, ছোলার ডাল আর বেগুন ভাজা, আঃ, কী অপূর্ব সেই ছোলার ডালের স্বাদ, এখনও যেন জিভে লেগে আছে!

সব পাড়ায় পাড়ায় একটি করে ক্লাব, আমাদের পাড়ার ক্লাবটির নাম 'সবুজ সঙ্ঘ', তার সরস্বতীপুজো হয় একেবারে আমাদের বাড়ির সামনের গলিতে। পাড়ার ছেলে হিসেবে আমাকে সেখানে হাজিরা দিতে হয়ই, কিন্তু অন্যান্য গাঁট্টাগোঁট্টা ছেলেদের তুলনায় সেখানে আমার ভূমিকা নগণ্য। আর একটি পুজো একেবারেই আমাদের নিজস্ব।

তখন আনন্দবাজার পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠা পুরোটা জুড়ে প্রকাশিত হত আনন্দমেলা, তার সম্পাদক বিমলচন্দ্র ঘোষ ওরফে মৌমাছি। সেই মৌমাছির নেতৃত্বে মণিমেলা নামে একটি সংস্থা গড়ে উঠেছিল, ছোটখাটো নয়, সুবিশাল, রাজনৈতিক দলের মতনই তার অজস্র শাখা, শুধু কলকাতাতে নয়, সুদূর মফঃস্বলেও, কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সেই সব শাখায় পাঠানো হত নানারকম নির্দেশ। বার্ষিক সম্মেলনে প্রত্যেকটি শাখা থেকে দু'তিনজন প্রতিনিধি আহ্বান করা হত, তাতেই জড়ো হত কয়েক হাজার কিশোর-কিশোরী। সে রকম একটি বার্ষিক সমাবেশে আমি শুনেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের বক্তৃতা। কী খারাপ বাংলা বলতেন তিনি!

আনন্দবাজারের প্রধান প্রতিযোগী দৈনিক যুগান্তর, তারও একদিনের শেষ পৃষ্ঠা ছোটদের জন্য বরাদ্দ ছিল, তার সম্পাদক অখিল নিয়োগী ওরফে স্বপনবুড়ো, তাঁর নেতৃত্বেও 'সব পেয়েছির আসর' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, তারও অনেক শাখা ছিল। আমরা 'মণিমেলা'র একটা শাখা গড়েছিলাম। প্রত্যেক শাখারই আলাদা নাম থাকে, আমাদেরটি 'শুভকামী মণিমেলা', নামটি বোধহয় আমারই দেওয়া, আমি তার সম্পাদক কিংবা সহ-সম্পাদক কিছু একটা হয়েছিলাম। আশুদের বাড়ির ঠাকুরদালানে বসত তার আসর, আনন্দমেলায় প্রকাশিত মৌমাছির সুদীর্ঘ উপদেশপূর্ণ চিঠিটি প্রথমে পাঠ করা হত ভক্তিভরে, তারপর কিছু কিছু ব্যায়াম, গান-বাজনা, কবিতা পাঠ, মুখে মুখে গল্প রচনা ইত্যাদি। নিছক স্কুল ও পারিবারিক গণ্ডিবাঁধা জীবনের বাইরে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ অল্প বয়েসিদের পক্ষে বিশেষ উপকারীই ছিল। খেলাধুলো, গান-বাজনা, শিল্পরুচি বিকাশের সুযোগ ছিল তো বটেই, ছেলেমেয়েরা সমানভাবে মিশত বলে কৈশোরিক প্রেমের উদ্গমও হত এখানেই। সেটাও আমার মতে স্বাস্থ্যকর। পাড়ার রকে-বসা, শিস-দেওয়া, মেয়েদের দিকে কদর্য ইঙ্গিত করা বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মণিমেলা বা এই ধরনের সংস্থার ছেলেদের ছিল স্পষ্ট তফাত। প্রেমে পড়লেই ছেলেরা সব মেয়েদের প্রতিই সৌজন্য দেখাতে শেখে। অপ্রেমই তো যত সমস্যার মূল।

সেই মণিমেলা থেকে আমরা একবার সরস্বতী পুজো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সরস্বতী বাক্‌দেবী, সাধারণ মানুষ তাকে বিদ্যার দেবী মনে করে। বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে অন্য সব ঠাকুর-দেবতার তুলনায় সরস্বতীর জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। ঘরে ঘরে তার পুজো। এবং এই পুজোয় ধর্মীয় রীতিনীতি কঠোরভাবে না মানলেও চলে। কিছু প্রসাদ, ফুল আর সামনে কতগুলো বই রেখে অঞ্জলি দেওয়াই আসল ব্যাপার। ওই দিনটিতে পুরুত জোগাড় করাও খুব কঠিন। পেশাদার পুরোহিতরা ওই দিনে অনেক বিখ্যাত ডাক্তারদের চেয়েও বেশি ব্যস্ত। অনেকে পাড়ার যে-কোনও ব্রাহ্মণকে ধরে আনত। আমার জন্ম যদিও ব্রাহ্মণ পরিবারে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত আমার পৈতে হয়নি বলে পুজোর মন্ত্র পাঠের যোগ্যতা অর্জন করিনি, উপনয়ন না হলে ব্রাহ্মণ-সন্তানও দ্বিজ হয় না। ক্রমশ পুরোহিত কিংবা ব্রাহ্মণ জোগাড় করতে করতে হয়রান হয়ে গিয়ে এখন অনেক জায়গায় যে-কোনও একজন পুজো সেরে দেয়, মেয়েরাও পুজোর অধিকারিণী হয়েছে, এই সামাজিক পরিবর্তনটি শুভই বলতে হবে। হিন্দুধর্মের এই একটা সুবিধে আছে, অনেকে যেমন কট্টর মৌলবাদী হয়, আবার অনেকে ধর্ম নিয়ে ছেলেখেলাও করতে পারে, সেখানে মৌলবাদীরা চোখ রাঙাবার সাহস পায় না। অলঙ্ঘনীয় তেমন কোনও

শাস্ত্রও নেই।

মণিমেলায় প্রথমবারের সরস্বতীপুজোর আগের রাত্রিটি আমার কাছে চিরস্মরণীয়। একটু বিস্তৃতভাবেই বলতে হবে। সেই প্রথম আমি বাড়ির বাইরে রাত কাটাবার অনুমতি পাই। তার উপযুক্ত কারণও ছিল। কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা কিনে আনতে হবে, সেখানে অসম্ভব ভিড় ও ঠেলাঠেলি, আমাদের মতন অল্পবয়েসিরা ভেতরে ঢোকার সুযোগই পাই না। শেষ পর্যন্ত পছন্দমতন প্রতিমা ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে আসতে আসতে বেজে গেল রাত নটা। এরপর প্রতিমাকে বেদীতে বসাতে হবে, ডাকের সাজ পরাতে হবে, মণ্ডপ সাজাতে হবে, অনেক কাজ, সবই সেরে ফেলতে হবে রাত্তিরের মধ্যে, কারণ সকাল থেকেই তো পুজো। বাড়িতে গিয়ে তাড়াতাড়ি নাকে মুখে কিছু খাবার গুঁজে, অনুমতি আদায় করে ছুটে এসেছি পূজামণ্ডপে। তারপর তিন-চারজন বন্ধু মিলে শুরু হল কাগজের শিকলি বানানো এবং অন্যান্য অনেক কাজ। প্রায় মাঝরাত্তিরে অন্য বন্ধুদের খেয়াল হল, স্বার্থপরের মতন আমি আগেই খেয়ে এসেছি, তারা কিছুই খায়নি। খিদে পেয়েছে তো বটেই, তা ছাড়া বাড়ির লোক রাগ করবে, তারা খেতে চলে গেল আমাকে প্রহরায় বসিয়ে।

নিঃশব্দ, নিবিড় রাত্রি, আমি বসে আছি, আমার সামনে একটি মাটির মূর্তি ছাড়া আর কিছু নেই। বসে আছি, তো বসেই আছি, হঠাৎ সময় প্রসারিত হয়ে গেল। মনে হল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, ওরা কেউ আসছে না ফিরে। ওরা কি আর আসবেই না, আমাকে একলা বসে থাকতে হবে? এ রাত্রিও যেন শেষ হবে না। প্রতিমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় সর্বাঙ্গে শিহরন হল। কী অপূর্ব সুন্দর মুখ এই শ্বেতবসনা রমণীর! আয়ত চক্ষু, স্ফুরিত ওষ্ঠ, ভরাট, বর্তুল দুটি স্তন। সরু কোমর, প্রশস্ত উরুদ্বয়। হয়তো এ ভাবে আলাদা করেও দেখিনি, সব মিলিয়ে এক শিল্প সৃষ্টি, তার অভিঘাতে তছনছ হয়ে যেতে লাগল আমার কৈশোর, জেগে উঠল পুরুষার্থ, অল্প অল্প শীতেও উষ্ণ হয়ে উঠল শরীর। না, আমার কোনও অলৌকিক অনুভূতি হয়নি, পিগম্যালিয়ানের মতন সেই মাটির মূর্তিকে জীবন্তও মনে হয়নি, মাটিরই প্রতিমা, একটি নারী, পরিপূর্ণ নারী। চোরের মতন সতর্কভাবে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে আমি হাত রাখলাম দেবী মূর্তির বুকে। 'জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচ যুগ শোভিত মুক্তহারে....', সেই কুচযুগে আমার আঙুল, আমার শরীর আরও রোমাঞ্চিত হল, কানদুটিতে আগুনের আঁচ। আমি প্রতিমার ওষ্ঠ চুম্বন করলাম, আমার জীবনের প্রথম চুম্বন।

সিঁড়িতে কারুর পায়ের শব্দ শুনে চট করে সরে গেলাম সেখান থেকে। বন্ধুরা ফিরে এল। কারুকে কিছু বলার প্রশ্নই ওঠে না, আমার শরীর তখনও কাঁপছিল, অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম, কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করেনি। পরদিন, সেই উচ্ছিষ্ট মূর্তিরই পুজো হল, কেউ কিছু জানতে পারেনি, কোনও অঘটনও ঘটেনি।

এর দু'এক বছর পর ঠিক ওই একই রকম পরিবেশে, ঠাকুরদালানে, গভীর রাত্তিরে আমি একটি রক্তমাংসের কিশোরীকে চুমু খেয়েছিলাম, চকিত সুযোগ পেয়ে এবং তার আগ্রহ মেশানো সম্মতিতে। তারপরই যে কথাটা তাকে বলেছিলাম, সে কথাটাও মনে আছে স্পষ্ট। বলেছিলাম, কই, শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলিয়া গেল না তো? গল্প-উপন্যাসে চুম্বনের দৃশ্যে এরকমই কিছু বর্ণনা থাকত, আমার ধারণা ছিল, ওই কর্মটি করলে সত্যিই বুঝি ইলেকট্রিক শক খাবার মতন কিছু হয়! তেমন কিছুই হল না, বরং আগেরবার উত্তেজনা যেন বেশি ছিল! এবং আগেরবার কোনও বিঘ্ন না ঘটলেও এবারে মাটির প্রতিমা বোধহয় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন, সে বছরে পরীক্ষায় রেজাল্ট কিছুটা খারাপ হল, বিশেষত বাংলায় নম্বর পেলাম বেশ কম।

এখানে আর একটি স্বীকারোক্তিও করা যেতে পারে। সব আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথাই তো স্বীকারোক্তি, যে জন্য রুশো তাঁর আত্মজীবনীর নামই দিয়েছেন, কনফেশান। যে-কোনও

কারণেই হোক, ধর্মীয় ব্যাপারে পাপ-পুণ্যের কোনও বোধই আমার জন্মায়নি। গুরুজনদের নির্দেশে ঠাকুর-দেবতাদের সামনে প্রণাম করেছি ঠিকই, কিন্তু অনেকে সেই সময় অনেক কিছু প্রার্থনা করে, আমি কখনও কিছু চাইনি, এই চাওয়া ব্যাপারটাই অবান্তর মনে হয়েছে, খড়-মাটি কিংবা পাথরের মূর্তি আমায় কী দেবে? উপোস করে অঞ্জলি দিতে হয়, লুকিয়ে খেয়ে নিয়েছি বিস্কুট, পুজো শেষ হবার আগেই প্রসাদের থালা থেকে গোপনে তুলে নিয়েছি সন্দেশ। একবার স্কুলের পুজোয় আমাদের ওপর ভার ছিল চাঁদা তোলার। কাজটি বেশ আনন্দের। আমাদের ক্লাস করতে হয় না, আমরা অন্য ক্লাসগুলিতে ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুলি। রশিদ দেবার কোনও ব্যাপার নেই, সঙ্গে থাকে একটি কাপড়ের ঝুলি, ছেলেরা তার মধ্যে সিকি, আধুলি, টাকা যা খুশি দেয়, কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, প্রত্যেককেই আগের দিনে বাড়ি থেকে কিছু আনতে বলে দেওয়া থাকে, কম-বেশির কোনও তারতম্য করা হয় না। তারপর আমরা সেই চাঁদার টাকা-পয়সা গুণে গেঁথে তুলে দিই কোনও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের হাতে। শুধু ওই চাঁদার টাকাতেই পুজোর সব সরঞ্জাম ও লুচি-ছোলার ডালের ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়, বাকি টাকাটা ভর্তুকি দেওয়া হয় স্কুল-ফান্ড থেকে। বিকেলে মাঠের এক কোণে বসে টাকা-পয়সা গণনা চলছে, মাঝে মাঝে আসছে দমকা হাওয়া, কিছু নোট উড়তে শুরু করলে আমরা ধাওয়া করে ফিরিয়ে আনি। কাজটি সম্পন্ন হলে, কাগজে লিখে সবশুদ্ধ দিয়ে আসা হল শিক্ষক মহাশয়ের হাতে। তার কিছু পরে, জল খাবার জায়গার পাশের নালায় আমি দেখতে পেলাম তিন খানা নোট পড়ে আছে, কিছুটা ভেজা। নিশ্চিত চাঁদারই টাকা, উড়ে এসেছে অনেকটা দূরে, ভেজা নোট নষ্ট হয় না, শুকিয়ে ব্যবহার করা যায়। পুজোর চাঁদার টাকা, সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের কাছে দিয়ে আসা উচিত। শুরু হয়ে গেল আমার মধ্যে সৎ অসতের দ্বন্দ্ব। ভালো ছেলেরা এই টাকা ফেরত দেয়। যাদের পাপের ভয় আছে, তারা কোনও রকম চিন্তা না করে টাকা ফেরত দিয়ে পুণ্য অর্জন করবে। আমি ভালো ছেলে নই, পাপেরও ভয় নেই। বাড়িতে সবসময় অভাব আর অভাবের কথা, মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই বাজার কমতে থাকে, মায়ের সঙ্গে বাবার মন কষাকষি, আমি কিছুই হাত খরচ পাই না। সচ্ছল পরিবারের সন্তানদের পক্ষে ভালো ছেলে ও পুণ্যলোভী হওয়া সহজ। মোট সাত টাকা, ওই টাকা ফেরত দেওয়া না দেওয়ায় পুজো কিংবা লুচি-ছোলার ডালের কিছু হেরফের হবে না, কিন্তু আমি ইচ্ছে করলে দু'একটা বইখাতা কিনতে পারি, একদিন অন্তত লালসা মিটিয়ে জিলিপিও খেতে পারি। এটা পাপ, না পুণ্য? দ্বিধা করিনি। টপ টপ করে নোটগুলো তুলে পকেটে ভরে নিয়েছি। হয়তো আমার এই কীর্তিটিকে টেকনিক্যালি চাঁদার টাকা তছরুপ বলা যায় না, তবু এক ধরনের চুরি তো বটেই!

আমাদের বাড়ির মধ্যে তেমন কোনও ধর্মীয় আবহাওয়া ছিল না। বাবা নাস্তিক ছিলেন না মোটেই, তবে নিয়ম করে কিংবা ভক্তিভরে কোনও ধর্মীয় আচরণ করার ঝোঁকও ছিল না। তিনি পৈতেধারী, সেই সব দিনে ব্রাহ্মণরা দুবেলা আহ্নিক করতেন, বাবা তার সময় পেতেন না। শুধু একটাই ব্যাপার দেখেছি, দুপুরে খাওয়ার আগে, থালার বাইরে পাঁচটি ভাত ফেলে, জল ছিটিয়ে দেবতাকে উৎসর্গ করতেন, আর খাওয়া শেষ হলে তালুতে একটু জল নিয়ে ঠোঁটে ছুঁইয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তেন কিছু একটা। তাও খুব হুড়োহুড়ি করে, যাতে আধমিনিটও সময় নষ্ট না হয়। আমাকে ইংরিজি ও অঙ্ক শেখাবার ব্যাপারে তাঁর যত ঝোঁক ছিল, তেমন কোনও আগ্রহই ছিল না ধর্মশিক্ষা দেবার।

আমার মা প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুজো করতেন। তাও অতি যৎসামান্য উদ্যোগ যাকে বলে। দুটি মাত্র ঘর, তার একটিতে শুই আমি আর কাকা। অন্য ঘরটিতে আর তিন ভাই-বোনকে নিয়ে মা আর বাবা। দিনের বেলা আমাদের ছোট ঘরটিই সব ভাই বোনদের পড়ার ঘর, আবার দৈবাৎ কোনও বাইরের লোক এসে গেলে, সেটাই তাঁদের বসবার ঘর, তখন আমাদের বাইরে চলে যেতে হত। মায়েদের ঘরখানি জিনিসপত্রে ঠাসা, তারই এক দেয়ালের তাকে একটি

লক্ষ্মী ঠাকরুনের ছোট মূর্তি, আর কয়েকটা ছবি, সামান্য কিছু ফুল, কোষাকুষি। আর পেতলের রেকাবিতে প্রসাদের জন্য বরাদ্দ চার পয়সার বাতাসা বা গুজিয়া। বেস্পতিবার সন্ধেবেলা মা স্নান করে এসে নিজেই পুজো করতেন, পুজো মানে 'লক্ষ্মীর পাঁচালি ও ব্রতকথা' নামে একটি পুস্তিকা পাঠ। কোনও কোনও বেস্পতিবারে সেই পুজোর ভার নিতে হত আমাকে, কারণ নারীরা রজঃস্বলা হলে কোনও পূজায় অংশগ্রহণ করতে নেই। আমি মাতৃভক্ত ছেলে, কারণ মায়ের কাছে কাকুতি-মিনতি করলে তবু দু'-চার পয়সা পাওয়া যায়, বাবার কাছে সে রকম কোনও দাবি উত্থাপনের সাহসই ছিল না। বাবাকে 'আপনি' সম্বোধন করতাম। সেইসময় গ্রাম দেশে বাবাকে আপনি ও মাকে তুই বলার রেওয়াজ ছিল, বিদ্যাসাগর মশাই পর্যন্ত মাকে তুই বলতেন, আমরা অবশ্য মাকে তুমি বলতেই শিখেছি।

মায়ের দায়িত্বটি পালন করতে রাজি হলেও সন্ধেবেলা স্নান করা আমার ধাতে সয় না। বাইরের জামা প্যান্ট বদলে, মাথায় একটু গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে শুদ্ধ হয়ে বসে যেতাম তুলোর আসনে। দুলে দুলে পড়তাম লক্ষ্মীর পাঁচালি, এখনও তার অনেক পঙ্‌ক্তি মনে আছে :

দোল পূর্ণিমার নিশি নির্মল আকাশ
মৃদু মন্দ বহিতেছে মলয় বাতাস
মলয় পর্বতে বসি লক্ষ্মী নারায়ণ
মনোসুখে দুইজনে করে আলাপন...
এরপর ঋষি নারদ এসে লক্ষ্মীকে বললেন :
নরলোক পানে মাগো চাহ একবার
মর্ত্যবাসী অন্নাভাবে করে হাহাকার
বল মাগো কৃপা করি কী পাপের ফলে
মর্ত্যবাসী নর-নারী সদা দুঃখে জ্বলে...
তা শুনে লক্ষ্মী দেবীর উত্তর :
লজ্জা আদি গুণ যত রমণীর আছে
ক্ষণিক সুখের লাগি বর্জন করেছে
স্বামীরে না মানে তারা না শুনে বচন
ইচ্ছা মত হেথা সেথা করিছে ভ্রমণ...

কয়েক বার পাঠ করলেই পুরো চটি বইটি মুখস্থ হয়ে যায়। এর একটা বিশেষ উপকারিতা পেয়েছি পরবর্তী জীবনে। পুরো বর্ণনাই পয়ার ছন্দে, চোদ্দ মাত্রা। আমায় কেউ শিখিয়ে দেয়নি, অবচেতনেই ছন্দের কান তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। কাকে পর্ব বলে, কার নাম মাত্রা, কিছুই জানি না, তবু, 'কপালে না থাকে যদি লক্ষ্মী দিবে ধন', এটা পড়তে গিয়ে 'কপালে না থাকে যদি', এখানে একটু থামি, তারপর 'লক্ষ্মী দিবে ধন।' অর্থাৎ আট ছয়, আট ছয়, পয়ারে যাহারে কয়। যেমন, 'মহাভারতের কথা/ অমৃত সমান।,' কাশীরাম দাস ভণে/ শুনে পুণ্যবান,'! ওই লক্ষ্মীর পাঁচালির পদ্যকার ছন্দে খুব একটা দক্ষ নন, কেন না, তাতে এরকমও পংক্তি আছে, 'সাত ভাই দৈবকে বলে করিয়া বিনয়,' এটা আমি বারবার উচ্চারণ করি আর আমার কানে খটকা লাগে। সাত ভাই দৈবকে বলে/করিয়া বিনয়, এর মধ্যে কিছু একটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। অস্বস্তি বোধ হয়, মাথা নাড়ি। রবীন্দ্রনাথ শিশু বয়সে প্রথম পাঠে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' থেকেই ছন্দ-মিল চিনতে শিখেছিলেন, আর আমার ফাইভ-সিক্স স্কুল বয়েস থেকে লক্ষ্মীর পাঁচালি মুখস্থ করে ছন্দ শিক্ষা শুরু হয়।

স্কুলের শেষ দিকে আমি মণিমেলা ছাড়া 'বয়েজ স্কাউট'-এও যোগ দিয়েছিলাম, সেখানে খাঁকি হাফপ্যান্ট ও সাদা শার্ট পরে, গলায় নীল স্কার্ফ বেঁধে ড্রিল করতে হত, শিখেছিলাম অনেক ইংরিজি গান। যেমন 'জন ব্রাউনস বডি,' 'হি ইজ আ জলি গুড ফেলো' ইত্যাদি। কোনও কোনও

বৃহস্পতিবার বয়েজ স্কাউটে ইংরিজি গান গেয়ে মার্চ শেষ করেই বাড়ি ফিরে বসতে হত লক্ষ্মীপুজোয়। বাইরের পোশাক ছাড়তেই হবে। কিন্তু অন্য কোনও কাচা প্যান্ট যদি না থাকে (রোজ কাচা হয় না), তা হলে অগত্যা বসে পড়তে হবে কোমরে গামছা জড়িয়ে। অর্থাৎ, যে ছেলেটি একটু আগে গলায় স্কার্ফ বেঁধে ইংরিজি গান গাইছিল, সে-ই এখন গামছা পরে লক্ষ্মীর পাঁচালি পাঠ করছে। পুজো শেষ করে কয়েকবার শাঁখ বাজাতে হয়। শুধু সে-ই ব্যাপারটি ওই ছেলেটি রপ্ত করতে পারেনি।

কোন কারণে বাড়ির সেই লক্ষ্মীপুজো বন্ধ হয়ে গেল জানি না, আমার ভাই-বোনদের বোধহয় সে পুজোয় কখনো বসতে হয়নি, মাকেও কখনও আফসোস করতে শুনিনি। এরপর থেকে আমাদের বাড়িতে আর কখনও কোনও পুজো-পাট হয়নি।

মণিমেলা, বয়েজ স্কাউট ছাড়াও আমি অল্প দিন যুক্ত হয়েছিলাম 'কিশোর বাহিনী'তে, এটি কমিউনিস্ট পার্টির ছোটদের শাখা। সেখানকার পরিবেশ খুবই ভালো লাগত, কিন্তু কিশোর বাহিনীর অনুষ্ঠান হত বলরাম বোস স্ট্রিটে কাটু বোসের বাড়িতে, সেটা আমাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূর। তাই নিয়মিত যাওয়া সম্ভব হত না। সেখানেই দু'-একবার দেখেছি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে। তখনই শুনেছিলাম, এই কৃশকায়, ধুতি-শার্ট পরা দাদাটি একজন কবি।

আমাদের গ্রে স্ট্রিট পাড়াতেও একজন কবি ছিল, তার নাম মনে নেই। তার একেবারে খাঁটি কবি-কবি চেহারা। বেশ সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত। ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে কাঁধে একটি চাদর, পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে সে, কেউ অনুরোধ করলেই দু'চার লাইন কবিতা শুনিয়ে দিত। সুকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে তার কোনও মিলই নেই, তবু, সেই ব্যক্তিটির ডাক নামই হয়ে গিয়েছিল কবি, সবাই বলত, ওই যে কবি যাচ্ছে। অনেক বাড়িতেই তার সহজ যাতায়াত ছিল, কিছুদিন পর এক ডাক্তারের নাবালিকা কন্যাকে নিয়ে সে উধাও হয়ে যায়। তারপর থেকে এ পল্লীতে কবি শব্দটি একটি গালাগালি হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল।

আমি আর কাকা যে-ঘরটিতে থাকি, তার শুধু একদিকের দেওয়ালে দুটি জানলা, তাই দিনের বেলাতেও পুরোপুরি অন্ধকার ঘোচে না। পাশেই গলি, চোরের উপদ্রব আটকাবার জন্য জানলায় শক্ত মোটা জাল দেওয়া। গলি দিয়ে কত রকম মানুষ যায়, হরেক রকম ফেরিওয়ালা, তাদের কত বিচিত্র সুর। হরিদাস নামে একজন ফেরিওয়ালা চানাচুর বিক্রি করত, তার চানাচুরের নাম ছিল কুড়মুড় ভাজা। এই সুস্বাদু চানাচুর বিক্রেতার দুটি গুণ ছিল, তার গানের গলা চমৎকার, এবং আমাদের কাছে পয়সা না থাকলেও পুরনো দু'-একখানা খাতা দিলে তার কাছ থেকে চানাচুর পাওয়া যেত। খাতার পাতা ছিঁড়ে ঠোঙা বানাত সে। তার গান ছিল, 'আমাদের এই হরিদাসের কুড়মুড় কুড়মুড় ভাজা, খাস্তা ভাজা, খেতে মজা, লাগে যেন জিভে গজা'। এই গান এমনই বিখ্যাত হয়েছিল যে পরবর্তীকালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এই গানটি গেয়ে রেকর্ড বার করেছিলেন।

সন্ধের পর প্রায়ই শোনা যেত মাতালদের হৈ হল্লা। আমরা পড়াশুনো করছি, পাশের গলি দিয়ে ছুটছে মাতালেরা। মদ সম্পর্কে তখন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের লোকদের প্রবল শুচিবাই ছিল, আমার বাবা-কাকা, মামা-মেসো-পিসেদের মধ্যে কেউ কখনো মদ্য স্পর্শ করেছেন বলে শুনিনি। কিন্তু উত্তর কলকাতার খাঁটি সন্তানরা একটু লায়েক হলেই মদ ধরবে, এটা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। রাস্তাঘাটে দেখা যেত, কোনও মাতাল অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, রিকশার ওপর এলিয়ে আছে মাতাল, কোনও বাড়িতে দুই ভাই ঝগড়া করছে, দু'জনেই পরস্পরকে দূর শালা মাতাল বলে অভিহিত করছে। অনেক বাড়ির ছেলেই স্কুলের পড়া শেষ করে না, কিংবা স্কুলের গণ্ডি পার হলে আর কলেজে যাবার প্রয়োজনবোধ করে না। লেখাপড়ায় জেদ বাঙালদের বেশি, বিশেষত উদ্বাস্তু হবার পর তারা বুঝে গিয়েছিল, পশ্চিমবাংলায় তাদের ভিটেমাটি নেই, লড়াই করে দাঁড়াবার জায়গা আদায় করে নিতে হবে, এবং শিক্ষা কিংবা কয়েকখানা ডিগ্রি ছাড়া

লড়াইয়ের আর কোনও অস্ত্রও তো নেই! স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বাড়িতেও পড়াশুনোর চাপ ছিল খুব বেশি, রাস্তায় গণ্ডগোল হলেও উঁকি মেরে দেখার উপায় নেই। জানলা বন্ধ করে পড়তে হবে। তখন পাখা ছিল না, গরমকালে জানলা বন্ধ করলে অসহ্য অবস্থা, দরদরিয়ে ঘাম ঝরছে, তবু বই ছেড়ে বাইরে যাবার অনুমতি নেই।

একটা জানলায় তারের জাল কোনও কারণে ফুটো হয়ে গিয়েছিল, আমরা টেনে টেনে ফুটোটা বড় করে ফেলেছিলাম, যাতে হাত গলে যায়। গলি দিয়ে চানাচুর, পকৌরি, আলু কাবলি, বুড়ির মাথার পাকা চুল বা শোন পাপড়ির ফেরিওয়ালা গেলে ওই ফুটো দিয়ে কেনা হত। ফেরিওয়ালারাও চিনে গিয়েছিল ফুটোটা, তারা ওইখানে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রলোভন দেখাত আমাদের। কিন্তু সবদিন তো পয়সা থাকে না, দু'পয়সা চার পয়সা জোগাড় করাও শক্ত, মায়ের কাছেও পরপর দু'দিন চাওয়া যায় না, সুতরাং প্রায়ই পাঁঠার ঘুগনি কিংবা তিলকুটো চন্দ্রপুলির আহ্বান শুনেও শুকিয়ে ফেলতে হত জিভের জল।

হঠাৎ কোনও সকালে সেই জানলার সামনে এসে দাঁড়াতেন এক আশ্চর্য আগন্তুক. খুবই ছোটখাটো চেহারা, মাথার চুল কদমছাঁট, অত্যন্ত বিনীত মুখের ভাব, তিনি নিয়ে আসতেন অভাবনীয় সব উপহার। এক ছড়া মর্তমান কলা, গলদা চিংড়ি, ভীম নাগের সন্দেশ ইত্যাদি, খুব কাচুমাচু গলায় বলতেন, এইগুলি রাখো তো ভাইটি। মাকে আমার প্রণাম জানিয়ো! এঁর নাম হরিনারায়ণবাবু, আমার বাবা কাউকে ধরে করে এঁকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন, সেই কৃতজ্ঞতায় তিনি এসব দিতে আসেন। ইনি আসতেন বাবা বেরিয়ে যাবার একটু পরেই, বাবা নিতে তো চাইবেনই না, বরং বকাবকি করবেন, সেইজন্যই গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে দেখে নিতেন আগে। মা-ও আপত্তি জানাতেন খুবই, এমনকী তাঁকে বলা হত, সব ফিরিয়ে নিয়ে যান, আপনার বাড়ির জন্য নিয়ে যান, কিন্তু হরিনারায়ণবাবু নাছোড়বান্দা, ঠায় ওই জানলায় দাঁড়িয়ে কাকুতি মিনতি করতেন, একটা একটা করে জিনিসগুলো গলিয়ে দিতেন। এবং কিছুতেই বাড়ির মধ্যে আসতে চাইতেন না। তাঁর জিনিসগুলির নির্বাচন দেখেও তাক লেগে যেত। অত ভালো মর্তমান কলা খুবই দুর্লভ, অত বড় আকারের গলদা চিংড়ি কেনার সাধ্য আমাদের কোনওদিনই ছিল না, সন্দেশগুলিও সবচেয়ে দামি। বাবা তাঁকে কী আর এমন চাকরি জোগাড় করে দেবেন, সাধারণ কিছুই হবে, তাঁর পোশাকও মলিন, অথচ তাঁর নজর কী করে অত উঁচু হল সেটাই বিস্ময়কর। অনেক টাকা থাকলেও বহু লোক এমন শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি কিনতে পারে না।

একবার দু'বার নয়, বছরের পর বছর মাঝে মাঝেই হরিনারায়ণবাবু ওই রকম সব উপহার নিয়ে হাজির হতেন। প্রত্যেকবারই সর্বোৎকৃষ্ট। বাবা সাধ্যমতন অনেক লোককেই চাকরি বা টিউশানি জোগাড় করতে সাহায্য করতেন, তাদের অনেকের কথা পরে তাঁর মনেও থাকত না, তারাও মনে রাখত না। হরিনারায়ণবাবুর কৃতজ্ঞতাবোধ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। একদিন বাবা তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেললেন, তাঁর ঘাড় ধরে গলি থেকে হিড় হিড় করে টেনে আনলেন বাড়ির মধ্যে। দারুণ একজন অপরাধীর মতন মাথা নিচু করে রইলেন তিনি। বাবা তাঁকে প্রতিজ্ঞা করালেন যে, যদি কিছু দিতে ইচ্ছে হয়, তা হলে তিনি রেডক্রস ফাণ্ডে পয়সা দিতে পারেন, আমাদের বাড়িতে কোনও উপহার দ্রব্য আনা চলবে না।

মানুষের স্মৃতির মধ্যে যদি কোনও প্রতিকৃতির গ্যালারি থাকে, তা হলে আমার সেই গ্যালারিতে হরিনারায়ণবাবুর স্থান প্রথম সারিতে।

তেরো

আমার মায়ের সেজোমামা কলকাতা শহরে অনেক আগে থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর চার ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া শিখেছে কলকাতায়। কিন্তু বড়মামার ছেলেরা থেকেছে গ্রামেই, জমি-বাগান-পুকুরের আয় থেকেই তাঁদের সচ্ছল সংসার, সে কারণে বেশি লেখাপড়া শেখা কিংবা চাকরি-জীবিকার দিকে মন দেননি। দেশ বিভাগে সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তছনছ হয়ে গেল, তবু সেই বড়মামার বড় ছেলে শরণার্থী হয়ে কলকাতায় আসতে অস্বীকার করলেন। গ্রামে তিনি বর্ধিত হয়েছেন সম্মানে, চলাফেরা করেছেন মাথা উঁচিয়ে, সেই মানুষ কলকাতায় এসে অতি সাধারণের মতন চাকুরিপ্রার্থী হবেন, এটা তাঁকে মানায় না। তাঁর নাম গোবিন্দ, তেজী ও বলশালী পুরুষ, কালো রঙের শরীরটি যেন লোহায় গড়া, দৃষ্টিতে চাপা অহংকার। একবার তিনি বল্লম দিয়ে একটি পাগলা কুকুর মেরেছিলেন, কখনও-সখনও ওদিকে দু'-একটা বাঘ ছিটকে যেত, বাঘডাসা নামে আর একটি হিংস্র প্রাণীরও উপদ্রব হত মাঝে মাঝে, গোবিন্দ গাঙ্গুলি বর্শা হাতে নিয়ে অকুতোভয়ে সেসব তাড়া করে যেতেন। আশেপাশের বহু হিন্দু-মুসলমান তাঁকে মান্য করে, সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টি তাঁকে তেমন স্পর্শ করল না। বরং যেসব হিন্দু পরিবার জমিবাড়ি পরিত্যাগ করে চলে আসছিল, তাদের কাছ থেকে তিনি সম্পত্তিগুলি কিনে নিতে লাগলেন নামমাত্র মূল্যে, সেই সঙ্গে প্রত্যেককে এই আশ্বাসও দিলেন যে, তারা ফিরে এলে সব সম্পত্তি ফেরত পাবে। অর্থাৎ সেগুলি তাঁর কাছে গচ্ছিত থাকছে, যাতে অন্য কেউ বেদখল করে নিতে না পারে।

গোবিন্দ তখনও অবিবাহিত। গ্রামের কুমার-কুমারীরা, এমনকী শহরেরও অনেকেই তো বিয়ে করে না, তাদের বিয়ে হয়। নিজের বিয়ের কথা কেউ মুখ ফুটে বলবেই না, সেটা অশোভন ব্যাপার। অন্য কেউ, বা অভিভাবকরা উদ্যোগ না নিলে অনেকে সারা জীবন অবিবাহিতই থেকে যায়। আমার বাবা, অত ব্যস্ততার মধ্যেও যেমন চাকরির ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতেন, সেই রকমই উপযুক্ত পাত্র ও অনূঢ়া কন্যাদের মধ্যে বিবাহরূপ সেতুবন্ধনের কাজেরও শখ ছিল তাঁর। অনেকগুলি বিবাহের কার্যকারণের হোতা তিনি। আমার মায়েরও এই শখ আছে। বর্তমানে তাঁর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূরও এই ব্যাপারে খুবই উৎসাহ।

বাবা তাঁর নিজের গ্রামের চ্যাটার্জি বাড়ির প্রভা নাম্নী এক কুমারীর সঙ্গে গোবিন্দর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করে ফেললেন। দুই পরিবারের আর্থিক অবস্থার বেশ তারতম্য আছে বটে, কিন্তু পাল্‌টি ঘর যাকে বলে, জাত-ধর্ম-শ্রেণী সব ঠিকঠাক। সেই বিয়ের বরযাত্রী হয়ে যাওয়াটাই আমার পাকিস্তানি পূর্ববঙ্গে প্রথম ও শেষবার গমন। তখনও ভিসা-পাসপোর্ট প্রবর্তিত হয়নি। ফজলুল হকের বিশ্বাস ছিল, ওসবের কোনও প্রয়োজনও নেই, পরে সেই বিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে বলায় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে ধমক খেয়েছিলেন।

আমগ্রামের মামারবাড়ির অবস্থা দেখে বুকে একটা ধাক্কা লেগেছিল। কত উৎসব, কত জাঁকজমক দেখেছি সেখানে, এখন নিরানন্দ, নিঝুম পরিবেশ। অতগুলি ঘর, প্রায় সবই খালি পড়ে আছে, শূন্য আটচালা, শূন্য পূজামণ্ডপ। গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটলেও একটা থমথমে ভাব টের পাওয়া যায়। কেউ জোরে হাসে না, কেউ জোরে কথা বলে না। (যদিও বাঙালদের চেঁচিয়ে কথা বলাই স্বভাব!) একের পর এক বাড়ি জনশূন্য। দরজা, জানলা বন্ধ। যেসব বাড়ি দু'বছর আগেও কলরবমুখর দেখে গেছি, সেগুলিকে এমন নিঃশব্দ অবস্থায় দেখলে দিনের বেলাতেও

কেমন যেন অশুভ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমার খেলার সঙ্গীরাও কেউ নেই। যে কয়েকটি পরিবার তখনও রয়ে গেছে, তাদের মুখগুলি বিহ্বলতা মাখা। ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা জানে না, কোনও সিদ্ধান্তও নিতে পারছে না। কিছু কিছু মুসলমান ভদ্রলোকেরও প্রায় একই রকম অবস্থা। তাঁরাও বুঝতে পারছেন না, দলে দলে হিন্দুরা কেন ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। গ্রাম-প্রতিবেশী হিসেবে অনেকের সঙ্গেই সদ্ভাব ছিল। বিপদে-আপদে পরস্পরের কাছে এসেছে। অনেক মুসলমান নিজেদেরই অপরাধী মনে করছেন, অনেকে হিন্দুদের বলছেন, আপনারা যাবেন কেন, আমরা জান দিয়েও আপনাদের রক্ষা করব। এসব যেমন সত্যি, তেমনই আড়ালে নানা রকম উস্কানিমূলক প্রচার এবং যখন-তখন দাঙ্গার আগে অগ্ন্যুৎপাতও ছিল অবশ্যই।

আমার দিদিমা তখনও আমগ্রামে রয়েছেন, কিংবা বিবাহ উপলক্ষে তাঁকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। রাত্তিরে তাঁর পাশে শোওয়া, তাঁর মুখের গল্প শোনা আমার কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। কিন্তু তাঁর সব গল্প যেন ফুরিয়ে গেছে, বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কী যে হয়ে গেল! কী যে হয়ে গেল! খাবার-দাবারের অভাব নেই, যত্নের কোনও ত্রুটি থাকার কথাও নয়। তবু, সব কিছুই কেমন নিষ্প্রাণ!

দিদিমার যিনি সবচেয়ে বড় ভাই, গোবিন্দর বাবা, যিনি ছিলেন এই পরিবারের অধিপতি, তাঁকে দেশবিভাগের গ্লানি দেখে যেতে হয়নি, তিনি কয়েক বছর আগেই প্রস্থান করেছেন। তাঁর মৃত্যু-রাতটি আমার মনে আছে। তখন আমি নিতান্তই বালক, ঘুমিয়েছিলাম, রাত্রির তৃতীয় প্রহরে দিদিমা আমাকে জাগিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোর কাছে কড়ি আছে? চোখ কচলাতে কচলাতে বাইরে এসে দেখি, উঠোনের মাঝখানে শোওয়ানো হয়েছে বড়দাদুকে, তাঁকে ঘিরে গুঞ্জন করছে অনেক মানুষ। মৃতের শেষকৃত্যে কড়ি কোন কাজে লাগে জানি না ; কলকাতায় তো কখনও দেখিনি। হয়তো এটা গ্রাম্য লোকাচার। অনেক বাড়িতেই তখন কড়ি থাকত। অনেক বছর আগে কড়ি ছিল বিনিময় মুদ্রা, 'টাকাকড়ি' শব্দটিতে তার ইতিহাস রয়ে গেছে, 'কানাকড়ি' শব্দটিও ভাষা থেকে বাদ পড়েনি। মুদ্রা হিসেবে কড়ির প্রচলন আমরা দেখিনি, কড়ি নিয়ে খেলতাম, বাসরঘরেও বর-বধূ কড়ি খেলত।

আমগ্রামের মামাবাড়ি থেকে বরযাত্রী হয়ে আমি গিয়েছিলাম মাইজপাড়ায় নিজেদের গ্রামে। গিয়েছিলাম নৌকোয়। দু'-একটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা অনেক প্রধান ঘটনাকেও বিস্মৃতিতে ঠেলে দিয়ে স্মরণে উজ্জ্বল হয়ে থেকে যায়। সেই রকমই একটা ঘটনা, আমার জুতো হারানো। শুধু বরযাত্রী নয়, সম্ভবত নিতবর ছিলাম বলেই আমাকে একটি নতুন জামা ও একজোড়া পাম্পশু কিনে দেওয়া হয়েছিল। বর্ষাকাল, নৌকোয় উঠতে গিয়ে জুতো দুটো কাদায় মাখামাখি হয়ে যায়! নৌকোযাত্রায় আমার অভ্যেস ছিল গলুইয়ের কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে একটা হাত জলে ডুবিয়ে রাখা, তাতে বড় আরাম, মনে হয় যেন হাতটা জল কেটে কেটে যাচ্ছে। এজন্য বকুনিও খেতে হয়েছে অনেক, কারণ, তখন পদ্মানদীতে অনেক কুমির তো ছিলই, আমি নিজের চোখেই দেখেছি, অনেক নদী-খালেও কুমির দুর্লভ ছিল না। সেবারেও আমি চলন্ত নৌকোয় উপুড় হয়ে শুয়ে জলে হাত ডুবিয়ে রয়েছি, এক সময় মনে হল, জুতোর কাদা তো এইভাবে ধুয়ে ফেলাও যায়। এক পাটি বেশ ভালোই ধোওয়া হল, দ্বিতীয় পাটিটি জলে ডোবানো মাত্র পিছলে গেল হাত থেকে। চিৎকার করেও লাভ নেই, ভরা বর্ষার নদী, মুহূর্তের মধ্যে সেটা তলিয়ে গেছে। ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ অসাড়। এমনিতেই জুতো জোটে না, তার ওপর নতুন জুতো খোওয়ানো, এ জন্য কী শাস্তি যে পেতে হবে...। একটু পরেই বাবা ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলেন, তিনি শুধু বললেন, বোকার মতন এক পাটি জুতো হাতে ধরে রেখেছিস কেন? পৃথিবীতে কোনও দোকানে শুধু একপাটি জুতো কিনতে পাওয়া যায়? ওটাও ফেলে দে!

সত্যিই, কোনও দোকানে শুধু এক পাটি জুতো কিনতে পাওয়া যায় না কেন? এটা অন্যায়।

কত কারণে এক পাটি জুতো নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কুকুরে নিয়ে যেতে পারে, হঠাৎ ছিঁড়ে যেতে পারে। সব দোকানেই ডান ও বাঁ পায়ের এক পাটি করে জুতোও বিক্রির জন্য রাখা উচিত। সে রকম ব্যবস্থা থাকলে শরৎচন্দ্রকেও অমন বিব্রত হতে হত না। শরৎচন্দ্র একবার শ্রীরঙ্গম বা নাট্যভারতীতে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন, নিজেরই উপন্যাসের নাট্যরূপ। শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁকে খাতির করে বসিয়েছিলেন দোতলার বক্সে। শরৎচন্দ্র চটি খুলে সোফায় পা তুলে বসেছিলেন, অনুষ্ঠান শেষে দেখা গেল তাঁর মূল্যবান চটিজুতোর এক পাটি নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না। শরৎচন্দ্র ভাবলেন, কোনও চোর তাঁর এক পাটি সরিয়েছে, দ্বিতীয়টা নেওয়ার সময় পায়নি, নিশ্চিত আশে পাশে তক্কে তক্কে আছে। চোরকে জব্দ করার জন্য তিনি অন্য পাটিটি রেখে না গিয়ে কাগজে জড়িয়ে নিলেন সঙ্গে। তিনি তখন হাওড়ার কাছে শিবপুরে থাকেন, ঘোড়ার গাড়িতে হাওড়া ব্রিজ পার হবার সময় তিনি সেই দ্বিতীয় পাটিটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন গঙ্গায়। পরদিন সকালে শিশির ভাদুড়ী এসে ওই জুতোর ব্যাপারে দুঃখপ্রকাশ করে বললেন, একটা পাটি সোফার পেছন দিকে নিচু জায়গায় পড়ে গিয়েছিল, এই নিন, সেই পাটি! জুতোর ব্যাপারে শরৎচন্দ্র বরাবরই স্পর্শকাতর। একবার রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অনেক লেখককে আহ্বান জানিয়েছিলেন ঘরোয়া আলোচনার জন্য। শরৎচন্দ্র তাতে যোগ দিতে এসে ঘরের বাইরে অনেক জুতো দেখে তার মধ্যে নিজের জুতো মেশাতে চাইলেন না। নিজের জুতো জোড়া কাগজে এমনভাবে মুড়ে নিলেন যে মনে হবে কোনও বই। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝতে পেরে সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন, কী হে শরৎ, তোমার বগলে ওটা কী, পাদুকাপুরাণ নাকি? আমার জীবনে আরও কয়েকবার এক পাটি জুতো নষ্ট বা নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। তারাপদ রায়ের হাবড়া কিংবা পণ্ডিতিয়ার বাড়িতে যারাই গেছে তাদের কেউ না কেউ খালি পায়ে ফিরতে বাধ্য হয়েছে। তারাপদর পোষা কুকুর গণেশ যেসব অতিথিদের পছন্দ করত না, তাদের এক পাটি জুতো খেয়ে নিত। কুকুররা কোনওদিনই আমাকে পছন্দ করে না।

সে যাই হোক, বিয়েবাড়িতে আমাকে যেতে হয়েছিল খালি পায়ে। সেটা এমন কিছু দ্রষ্টব্যের ব্যাপার হয়নি, গোটা উৎসবটাই ছিল ম্রিয়মাণ। ছেচল্লিশের দাঙ্গার পর আর আমি দেশের বাড়িতে আসিনি, সেবারে নিজেদের বাড়িটাকে দেখাই যে শেষ দেখা, সে উপলব্ধিও হয়নি। বাড়ির ডান পাশে বড় বাতাবিলেবুর গাছ, পেছনের উঠোনে জামরুল গাছ, রান্নাঘরের পাশ দিয়ে পুকুরে যাবার সরু পথ, পুকুরঘাটের পাশে বাঁকা খেজুর গাছ, এই চিত্রটি স্মৃতিতে স্থির আলেখ্য হয়ে আছে। সে বাড়ি নিশ্চিত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, গাছগুলিও আর নেই, সেখানে অন্য কেউ বাড়ি তুলেছে না জংলা হয়ে পড়ে আছে জানি না। কিন্তু সেই ছবিটি কিছুতেই মুছে যাবার নয়।

আমাদের পরিবারে আর্থিক অনটন থাকলেও এক হিসেবে আমি ভাগ্যবান, আমার সমবয়সি বালক ও কিশোরদের তুলনায় আমি ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছি অনেক বেশি। স্বাধীনতার আগে প্রতি বছরই একাধিকবার ট্রেনে-স্টিমারে-নৌকোয় পূর্ববঙ্গে যাওয়া-আসা তো ছিলই, যুদ্ধের সময় ছিলাম কাশীতে, এ ছাড়াও বিহার-ওড়িশায় বেড়াতে গেছি বাচ্চা বয়েসে। সেই সময় 'চিলড্রেন্‌স ফ্রেস এয়ার অ্যান্ড এক্সকারশান সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। শুনেছি, কোনও এক সহৃদয়া ধনবতী বাঙালি রমণী গরিবদের ছেলেমেয়েদের জন্য গড়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠান। (হায়, সে রকম সহৃদয় ধনবতী বাঙালি রমণীরা একালে কোথায় চলে গেলেন!) যে-সব বাবা-মা তাঁদের ছেলেমেয়েদের কখনও বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন না, শুধু তাদেরই এখানে আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হত, সমিতির একটা বাংলা নামও ছিল, 'মুক্তবায়ু সেবন সমিতি', মাত্র পাঁচ টাকায় এক একটি ছেলে বা মেয়েকে পনেরো দিনের জন্য নিয়ে যাওয়া হত বিহার-ওড়িশার কোনও স্বাস্থ্যকর, দর্শনীয় স্থানে। ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ার সময়ই আমি এই সমিতির সঙ্গে গেছি দেওঘর, মধুপুর, ভুবনেশ্বরে। আমাদের বাড়িতে শাসনের কড়াকড়ি ছিল, কিন্তু বাবা এই ধরনের ভ্রমণে উৎসাহ দিতেন, সেই থেকেই সারা জীবন আমার ভ্রমণের নেশা

ধরে যায়।

মুক্তবায়ু সেবন সমিতির সঙ্গে বাইরে যাওয়ার উপকারিতা ছিল অনেক। অসীম দত্ত নামক একজন জাঁদরেল স্কাউট মাস্টার হতেন সর্বাধিনায়ক, তিনি কঠোর শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দিতেন সকলকে। ঠিক ভোর সাড়ে পাঁচটায় শয্যাত্যাগ, তারপর ছ'টার সময় ড্রিল, এক ঘণ্টা পরে জলখাবার, তারপর দু' ঘণ্টা পড়াশুনো, তারপর মার্চ করে কোনও দ্রষ্টব্য স্থানে যাওয়া, সাড়ে বারোটায় স্নান, দেড়টার মধ্যে মধ্যাহ্নভোজন শেষ, এক ঘণ্টা বিশ্রাম, এরপর খেলাধুলো, আবার জলখাবারের বিরতি, সন্ধের পর গোল হয়ে বসে ক্যাম্পফায়ার। এই রুটিনের এক চুলও এদিক ওদিক করা যাবে না। কেউ এই নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গ করলেই অসীম দত্ত কড়া ধমক দিতেন। তাঁকে আমরা সবাই ভয় পেতাম, আবার কখনও যদি তিনি অকস্মাৎ মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে কথা বলতেন, তা হলেই যেন জীবনটা ধন্য মনে হত। এ রকম সংগঠকই আদর্শ, তিনি সবাইকে তটস্থ রেখে শৃঙ্খলারক্ষায় বাধ্য করতেন আবার সদয় ব্যবহার ও স্নেহ দেখাতেও কার্পণ্য করতেন না। এক এক দিন তিনি নিজেই নিয়ম ভঙ্গ করে এক ঝুড়ি জিলিপি এনে সকলকে খাওয়াতেন অসময়ে।

সবচেয়ে উপভোগ্য ক্যাম্পফায়ারের সময়, মাঝখানে কাঠের আগুন জ্বেলে সবাই মিলে গোল হয়ে বসা, তারপর এক এক করে প্রত্যেককেই কিছু না-কিছু শোনাতে হবে, গান বা কবিতা গল্প, নাটকের অংশ, চুটকি রসিকতা, কারও বাদ যাওয়ার উপায় নেই। যে যত ভুল করে, তারটা তত উপভোগ্য। আমার তখন নজরুলের কবিতার আবৃত্তি শিল্পী হওয়ার পর্ব চলছে, আমার কোনও অসুবিধেই নেই। গড়গড় করে লম্বা কবিতা বলে যাই, কিন্তু শ্রোতাদের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যায় না, এখানে তো শিশুশিল্পী হিসেবে আলাদা খাতির পাবার কোনও প্রশ্ন নেই! কয়েকদিন পর আমি ইচ্ছে করে ভুলে যাবার ভান করতেই প্রচুর হাস্যরোল উপহার পেয়েছিলাম। আরও কিছু কিছু উপহারও পাওয়া যেত, রেড ক্রশ এবং অন্যান্য দু'-একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান এই সমিতিকে কিছু কিছু সাহায্য করতেন, তাই আমাদের দেওয়া হত বিনামূল্যে টুথ-পেস্ট, টুথ ব্রাশ, বিলিতি লজেন্স-বিস্কুট ইত্যাদি।

সপ্তাহে দু'দিন বাড়িতে চিঠি লেখাও ছিল বাধ্যতামূলক। দুপুরবেলা সার বেঁধে সবাই বসে যেত পত্র রচনায়, অসীমদা পরিদর্শন করতেন, পরীক্ষার হলের মতন ঘুরতে ঘুরতে হাঁক দিতেন, কী, শেষ হল? প্রত্যেককেই লিখতে হবে, অসীমদা নিজে সেগুলি সংগ্রহ করে পাঠাতেন ডাকঘরে। চিঠি অবশ্য তিনি পড়বেন না, বা সেন্‌সর করবেন না, শুধু একবারই আমাকে চিঠি লিখতে নিষেধ করেছিলেন।

সেবারে দেওঘরে। নন্দন পাহাড়, ত্রিকূট পাহাড়, আরও সব চমৎকার চমৎকার জায়গায় ঘোরাঘুরি করে অপূর্ব দিন কাটছিল, হঠাৎ একদিন আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলে ব্যথা শুরু হল। ব্যথা মানে অসহ্য ব্যথা, আঙুল ফুলে কলাগাছ যাকে বলে, এবং সেই আঙুলটার রং হয়ে গেল হলুদ। প্রথম দু'-একদিন কারুকে বলিনি, তারপর ব্যথার চোটে এসে গেল জ্বর। ক্যাম্পের পরিচালকদের নজরে পড়ায় তাঁরা ডাক্তার দেখালেন। সে অসুখটার নাম আঙুলহারা, এখনও মনে আছে, ডাক্তারটি প্রেসক্রিপশনে ইংরেজিতে লিখেছিলেন whitlow. আঙুলহারা মানে আঙুলটাই হারাতে হবে? ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ব্যবহার থেকেই পশুজগৎ থেকে মানুষ আলাদা হয়ে যায়, বুড়ো আঙুল ব্যবহার করতে জানে বলেই মানুষ অস্ত্র ধরতে শেখে, কলম চালাতে পারে। আমার সেই আঙুলটিই চলে যাবে? তা হলে আমি বিবর্তনের কয়েক ধাপ পিছিয়ে বাঁদর হয়ে যাব? ডাক্তারটি বললেন, অপারেশন করা ছাড়া গতি নেই। তিনি নিশ্চিত একজন হাতুড়ে ডাক্তার ছিলেন, হাসপাতালে বা অপারেশন টেবিলে নেবার প্রশ্ন নেই, লোকাল অ্যানেসথেসিয়ার ব্যবহারও বোধহয় জানতেন না, তাঁর চেম্বারের টেবিলে শুইয়ে দিয়ে তিনি আমার আঙুলে ছুরি চালালেন। দু'জন সহকারী আমাকে চেপে ধরেছিল, তিনি আমার আঙুল

কাটতে লাগলেন, আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে জ্ঞান হারালাম। প্রাণে বেঁচে গেলাম বটে, এবং আঙুলও রক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু অপারেশনটি এতই খারাপ হয়েছিল যে সারাজীবনের মতন আমার সেই আঙুলটির আকার বিকৃত হয়ে যায়। পরে, কলেজজীবনে, অনেক সখের জ্যোতিষী আমার হাত জোর করে দেখতে গিয়ে ওই আঙুলটি নিয়ে ধাঁধায় পড়েছে। কেউ কেউ বিজ্ঞভাবে মন্তব্য করেছে যে চিরো (নাকি, কিরো?) নামে এক হস্তরেখা বিশেষজ্ঞের বইতে ছবি আছে, যাদের বুড়ো আঙুল ওই প্রকার, তারা মানুষ-খুনি হয়। এ মন্তব্য শুনে আমি আশ্বস্ত বোধ করেছি। খুন করার অধিকার যখন আমার আছে, তখন একটা খুন করলেই তো হয়। এতগুলি বছর কেটে গেল, কিন্তু ঠিক কাকে যে খুন করব, সে ব্যাপারে মন স্থির করতেই পারিনি। ক্যান্ডিডেট যে অনেক! ওই সব শখের জ্যোতিষীরা কেউ বুঝতেই পারেনি যে আমার ওই আঙুলটির আকার জন্মগত নয়। এক হাতুড়ে ডাক্তারের কীর্তি! সেই আঙুল নিয়ে লেখালেখি দিব্যি চালিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

অপারেশনের পর আমার আঙুলে একটা মস্ত ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সে রকম অবস্থাতেই আমি নির্দিষ্ট দিনে অন্যদের সঙ্গে চিঠি লিখতে বসেছিলাম, একসময় অসীমদা আমার পাশে এসে কোমল কণ্ঠে বললেন, এবারে তোমাকে চিঠি লিখতে হবে না, উঠে এসো, আমরা অন্য জায়গায় বসে গল্প করব!

পরে বুঝতে পেরেছি, বাড়িতে আমার ওই রোগ ও অপারেশনের কথা চিঠি লিখে জানালে মা-বাবা খুব উদ্বিগ্ন হবেন, অসীমদা এটা চাননি। এতদিকে ছিল তাঁর নজর। তিনি নমস্য।

আঙুলহারা রোগটি কি বিলুপ্ত হয়ে গেছে? কারও হয়েছে বলে তো শুনি না। স্মল পক্স বা পান বসন্তের মতন মারাত্মক রোগটি পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে গেছে জানি, আমাদের ছেলেবেলায় ওই রোগে অনেকে প্রাণ হারাত। ওই রোগের এক দেবীও ছিল, তার নাম শীতলা, খুব হাঁকডাক করে তাঁর পুজোও হত। বেচারি দেবীটির ইদানীং নামও শোনা যায় না। আমাদের ছেলেবেলায় আরও কতকগুলো বিচ্ছিরি রোগ ছিল, যেমন খোস, পাঁচড়া ও দাদ। খোস-পাঁচড়ায় ভোগেনি এমন কে আছে? উরু থেকে পা পর্যন্ত গ্রীষ্মকালে ভরে যেত বিচ্ছিরি খোস-পাঁচড়ায়, বড় বড়, চাকা চাকা, তার পুঁজ লেগে যেত জামা-প্যান্টে। দাদের ছিল প্রবল প্রতাপ, কোমরের কাছে কোনও না কোনও সময়ে দাদ হবেই। সেই জন্য দাদের মলমের বিজ্ঞাপন চতুর্দিকে। ঢোল কোম্পানির দাদের মলম এমনই বিখ্যাত এবং এত বেশি বিক্রি যে তার বিজ্ঞাপন থাকত বাংলা সংবাদপত্রগুলির শিরোনামের পাশে। সেসব অসুখ অন্তর্হিত হয়ে গেছে। এমনকী ঘামাচি, যার জন্য গরম কালে সাহেবরা ত্রাহি ত্রাহি রব তুলত, সেই ঘামাচিও এখন আর হয় না। শুধু ম্যালেরিয়া, যার কবল থেকে নিস্তার পাবার কোনও উপায় ছিল না, আমিও ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি বাংলায় এর নাম ছিল পালা জ্বর, অর্থাৎ মাঝে মাঝে ঝেঁকে ঝেঁকে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, সেই ম্যালেরিয়াকে উৎখাত করল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকানরা প্যালুড্রিন নামে এক ওষুধ দিয়ে, সেই ম্যালেরিয়া গত এক দশক ধরে আবার ফিরে এসেছে প্রবলভাবে।

একবার ডায়মন্ডহারবারে বয়েজ স্কাউটদের সঙ্গে ক্যাম্প করতে গিয়ে আমাকে ম্যালেরিয়ায় ধরে। ম্যালেরিয়া ছিল গ্রামবাংলারই অসুখ, কলকাতা শহরে বিশেষ হত না। এখন ব্যাপারটি উল্টে গেছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কলকাতার মতন শহরেই বেশি, এবং ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় টপাটপ মানুষ মরে। তখনকার ম্যালেরিয়া ঠিক মৃত্যুরোগ ছিল না। মাঝে মাঝেই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসত, এ রকম চলত মাসের পর মাস। মৃত্যু বরং ভালো, তার বদলে এই রোগটি পুরো বাঙালি জাতটাকেই দুর্বল এবং নিরুদ্যম করে দিয়েছিল।

আমি ম্যালেরিয়ার জ্বর বেশ উপভোগই করতাম। কয়েকদিন বেশ ভালো আছি, ভালো আছি, হঠাৎ একদিন বিকেলে খেলাধুলো সেরে ফেরার পর অনুভব করতাম, চোখের পাতা

ভারী হয়ে আসছে, অবসন্ন হচ্ছে শরীর, অর্থাৎ এবার জ্বর আসছে, জ্বর আসছে, প্রথম দিকটা বেশ নেশার মতন, তারপরই এমন শীত যে তিন-চারটে লেপ-কম্বল চাপা দিলেও কাঁপুনি কমে না। খুব জ্বরের মধ্যে আচ্ছন্ন অবস্থায় কত কী দেখা যায় মানসপটে, কত দৃশ্য, কত রং, (খুব গাঁজা টানলেও এ রকম হয়) কোনও বেদনার অনুভূতি নেই, যেন স্বপ্নের প্রশান্ত মহাসাগরে ভাসমান অবস্থা। জ্বর কমলেই সমস্যার শুরু। তখন শরীর খুব দুর্বল, জিভে তিক্ত স্বাদ, অথচ খুব খাই-খাই মনোভাব। জ্বরের মধ্যে পথ্য শুধু বার্লি অথবা সাবু। এর মতন বিস্বাদ, কুৎসিত আর কিছু হয় না। কোন মহা নির্বোধরা এই পথ্যের সুপারিশ করেছিল কে জানে! তখন জ্বর হলে স্নানও বন্ধ থাকত। এখন বলা হয়, জ্বরের সঙ্গে স্নান বন্ধের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং বেশি জ্বর হলে ভালোভাবে স্নান করানো উচিত, এবং পথ্য হিসেবে দেওয়া উচিত পুষ্টিকর, পছন্দসই খাবার। আমরা নাক টিপে, কোনও রকমে, দারুণ বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেতাম লেবুর রস দেওয়া বার্লি, এখন অনেকে জ্বরের সময়ও মাংস-রুটি খায়। কিংবা ভাত-মাছের ঝোল। তখন জ্বরের সঙ্গে ভাতের ছিল ভাসুর-ভাদ্দর বউ সম্পর্ক, জ্বর হলেই ভাতের মুখ দেখা নিষিদ্ধ। মনটা সব সময় ভাত-ভাত করত, জ্বরের উপশমের পরের দিনও নয়, তার পরের দিনে দেওয়া হত ভাত, তার সঙ্গে কাঁচকলা দিয়ে সিঙ্গিমাছের ঝোল। সে রকম বিস্বাদ ঝোল আর পৃথিবীতে হয় না। কে বলেছে, সিঙ্গিমাছ আর কাঁচকলা সবচেয়ে সহজপাচ্য? সম্ভবত এটা কবিরাজি ধারণা, অ্যালোপাথরাও পরিবর্তনের ঝুঁকি না নিয়ে সে রকম নির্দেশই দিতেন! কোথায় গেল সেই সব বার্লির কৌটো? কট্টর বিধবারাও বোধহয় এখন আর সাবু খান না।

আমি ম্যালেরিয়ার জ্বর উপভোগ করতাম এই কারণে যে, সে সময় বাড়িতে বেশ খাতির পাওয়া যেত। মা প্রায়ই এসে বসতেন শিয়রের পাশে। খুব বেশি জ্বর বাড়লে হাতপাখার বাতাস করতেন, কপালে লাগাতেন জলপট্টি। একটা বেশ মা-মা গন্ধ পাওয়া যেত। আমিই হতাম সকলের মনোযোগের কেন্দ্র। অর্থাৎ বাচ্চাদের মতন আবদার আর কী! সে সময় প্রকাশ্যে স্কুলের বইয়ের বদলে গল্পের বই পড়ার অগাধ স্বাধীনতা। একবার জ্বর থেকে সেরে ওঠার পরই মনে মনে প্রার্থনা করতাম, আবার কবে জ্বর আসবে! বাল্যকাল থেকেই আমার আভ্যন্তরিক স্বাস্থ্য ভালো থাকার জন্য কখনও জ্বর-টরে আমি বিশেষ কাবু হয়ে পড়তাম না।

মুক্তবায়ু সেবন সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য বয়েসের একটা সীমারেখা ছিল। সেটা পার হবার পর, আমি বয়েজ স্কাউট হয়েও অনেক আউটিং, ক্যাম্প ও এক্সকারশানে গেছি। আমার বাবা ছিলেন টাউন স্কুলের স্কাউট মাস্টার। আর একজন স্কাউট মাস্টার কমল দাস পিতৃবন্ধু এবং তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। সেই সুবাদে, স্কাউটদের যে-কোনও আউটিংয়ে আমার স্থান পাওয়া ছিল অবধারিত। কাছেই গঙ্গানগর, কিংবা বেশ দূরে রাঁচি, ডাক পাওয়া মাত্রই আমি প্রস্তুত। আরও কিছুটা বেশি বয়সে, কাশ্মীরের ক্যাম্পে আমি আমার বন্ধু শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়কেও নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম, যদিও শরৎকুমারের সঙ্গে স্কাউটিং-এর কোনও সম্পর্কই ছিল না। অবশ্য শরৎ তাঁর নিজস্ব প্রফুল্ল স্বভাবগুণে স্কাউট সদস্যদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

বয়েজ স্কাউট বা অন্য কোনও সমিতি কিংবা গুরুজনদের সঙ্গ ছাড়াও ভ্রমণে বেরোতে শুরু করি স্কুল বয়েসেই। সম্ভবত তখন ক্লাস টেন, আমার বন্ধু আশুকে প্ররোচিত করেছিলাম। চলো, মুর্শিদাবাদ ঘুরে আসি। নির্মলেন্দু লাহিড়ী-অভিনীত সিরাজউদ্দৌল্লা নাটকটি সেসময় যখন-তখন রেডিয়ো এবং যত্রতত্র রেকর্ডে বাজে। যতবার শুনি, মন উদ্বেল হয়ে ওঠে। তখন ইতিহাসজ্ঞান খুবই ভাসা ভাসা, তাই সিরাজের নামেই আপ্লুত হয়ে উঠি, নাটকের সংলাপগুলিকেই মনে হয় সত্যিকারের এক ট্র্যাজিক নায়কের কণ্ঠস্বর। স্বদেশি আন্দোলনের সময় হিন্দু নেতারা মুসলমানদের মধ্য থেকে নায়ক খোঁজার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন, তাড়াহুড়ো করে তাঁরা তরুণ সিরাজের মতন এক দুর্বল, অপরিণামদর্শী, দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠুর যুবককে

প্রতীক-নায়ক হিসেবে বেছে নেন, তাঁদের ইচ্ছে অনুসারেই নাট্যকাররা সিরাজকে গড়ে তোলেন এক রোমান্টিক, আদর্শবাদী, হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়সাধক হিসেবে, আমরাও সেই বয়েসে তাই-ই গিলে নিয়েছিলাম। আশু আর আমি টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে উপস্থিত হলাম বহরমপুরে। এক হোটেলে চার টাকা দিয়ে ভাড়া করলাম একটি ঘর। হোটেলের মালিক আমাদের মতন গোঁফ না-গজানো দুটি ছেলেকে দেখে কৌতূহলের চোখে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু আপত্তি করেননি ঘর দিতে। সেখান থেকে মুর্শিদাবাদে গিয়ে হাজার দুয়ারি কিংবা জগৎশেঠের গোলাপ বাগান দেখেও তেমন কিছু মনে হয়নি। কিন্তু গঙ্গার অপর পারে, খোসবাগে, নবাব পরিবারের সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, সেখানকার রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং উদাসীন মনোভাব দেখে হঠাৎ এমনই আঘাত পেয়েছিলাম যে জল এসে গিয়েছিল চোখে।

সেই অশ্রু কি সিরাজের জন্য, না বর্তমান দেশের অবস্থার জন্য? তখনই তো আমরা বামপন্থীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে, ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, ভুলো মাৎ, ভুলো মাৎ, বলতে শুরু করেছি।

চোদ্দো

অতিরিক্ত পরিশ্রমে বাবার শরীর ভাঙতে শুরু করে। তাঁর ধারণা তিনি দৈত্যের মতন পরিশ্রম করতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতি তা মানবে কেন? তাঁর রক্তে উচ্চ চাপ এবং শর্করার আধিক্য শুরু হয়। বিশেষত দ্বিতীয় রোগটি খুবই ভীতিজনক, তখনকার দিনে নিদান ছিল ভাত একেবারে বাদ। আলু অস্পৃশ্য, আহার্য শুধু দু'তিনখানা হাতে গড়া রুটি। (এখন অবশ্য এসব তত্ত্ব অনেক বদলে গেছে, আলু বেচারি জাতে উঠে ভাত-রুটির সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছে।) বাঙালদের ভাত বন্ধ করা কঠিন শাস্তিস্বরূপ, দু'তিন দিন ভাত না খেলে তাদের মনে হয় জীবনটাই বৃথা, সুতরাং শুধু রুটি বরাদ্দ হলে আহারের রুচিই নষ্ট হয়ে যায়, সে জন্য শরীর আরও দুর্বল হতে থাকে। ইস্কুলের চাকরি টিঁকে থাকলেও বাবা টিউশনির সংখ্যা কমাতে বাধ্য হন। ফলে, আগে থেকেই টানাটানির সংসারে টানাটানি করার মতন ব্যাপারগুলিও ফুরোতে থাকে। যুদ্ধ বা মন্বন্তরের সময় এরকম সংকটে আমরা কিছুদিনের জন্য দেশের বাড়িতে গিয়ে থেকেছি। সেখানে অন্তত মাথা গোঁজার ঠাঁই এবং কিছু না কিছু খাদ্য জুটে যেত, কিন্তু এখন আর আমাদের দেশ বলে কিছু নেই। রিফিউজি মানেই তো জীবন্ত নিরালম্ব।

স্বাধীনতার পরেও অনেকগুলি বছর, এই সেদিন পর্যন্ত, স্কুল শিক্ষকরা ছিলেন সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত শ্রেণী। সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর একটি অবিস্মরণীয় গল্পে এক স্কুলের পণ্ডিতের মর্মন্তুদ অনুভূতির কথা লিখে গেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পোষা কুকুরের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ শুনে সেই পণ্ডিতমশাই হিসেব করেছিলেন, তাঁর উপার্জন কুকুরটার এক ঠ্যাঙেরও পরিচর্যার সমান নয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক রচনায় এবং মনোজ বসুর 'মানুষ গড়ার কারিগর' উপন্যাসে এরকম আরও অনেক চিত্র বিধৃত আছে। তখন এরকম একটা ধারণারই সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল যে শিক্ষকদের টাকা পয়সার প্রয়োজন নেই, তাঁরা তো আদর্শবাদী, ছাত্রসমাজকে গড়ে তোলার ব্রত নিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী বিনা চিকিৎসায় মরুক, তাঁর ছেলেমেয়েরা উচ্ছন্নে যাক, তবু তাঁকে মহান দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। পরাধীন আমলে সত্যিই কিছু কিছু আদর্শবাদী ব্যক্তি শিক্ষকতা গ্রহণ করে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করে নিতেন। স্বাধীনতার পর স্কুল-শিক্ষকতা সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীবিকা হিসেবে গণ্য হতে থাকে, যারা অন্য

কোনও চাকরি পায় না, তারাই শুধু বাধ্য হয়ে শেষ আশ্রয় হিসেবে শিক্ষকতা গ্রহণ করে এবং সেই জন্য শিক্ষার মানও নামতে থাকে হু হু করে। মিশনারি স্কুলগুলি সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য নয়, সেখানে মাইনে বেশি, ছুটি কম, নিয়ম শৃঙ্খলাও কঠোর। সত্তরের দশক থেকে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকরা খেয়ে না খেয়ে ছেলে-মেয়েদের ওই সব স্কুলে পাঠাতে শুরু করে, তার কারণ, ততদিনে বাংলা স্কুলগুলি সম্পর্কে অভক্তি জন্মে গেছে। সেই সময় আমাদের নকশালপন্থী তরুণ বিপ্লবী বন্ধুরা এক অদ্ভুত ভ্রান্ত নীতিতে বাংলা স্কুলগুলি বন্ধ করে দেওয়া, আগুন লাগানো ও শিক্ষক হত্যা শুরু করায় শিক্ষা ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হয়ে যায়, কিন্তু সেই বিপ্লবীরা মিশনারি স্কুলগুলি স্পর্শও করেননি, সে জন্য ওই সব স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির লাইন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে।

এখন অবশ্য সে অবস্থা বদলেছে। সরকারি-বেসরকারি স্কুলগুলির শিক্ষকদের সেরকম দুরাবস্থা কিংবা দুরবস্থা নেই, বেতনহার অনেক ভদ্রস্থ হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার মান উন্নত করার তেমন কোনও চেষ্টা হয়নি। তা ছাড়া, শোনা যায়, বেতনহার উচ্চ হবার ফলে এ চাকরিও আকর্ষণীয় হয়েছে, এখন এমনকী গ্রামের স্কুলেও চাকরি পেতে গেলে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হয়। যারা ঘুষ দিয়ে চাকরি কেনে, তারা কখনও সে কাজের প্রতি মনোযোগী হতে পারে? তাঁদের পাকা চাকরি, কিছু না পড়ালেও বরখাস্ত করা যাবে না। সুতরাং বাংলা স্কুলগুলির অবস্থা যে তিমিরে ছিল, এখনও সে তিমিরেই।

তখনকার বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকদের বেতন তো অতি কম ছিলই, হঠাৎ কোনও শিক্ষক অসুস্থ হয়ে এক-দেড় মাস শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে সেই ছুটির বেতনও পেতেন না। এরকম অবস্থায় সংসার খরচ চালাবার জন্য আমাদেরও সাধ্যমতন অংশগ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমার ছোটকাকা যে-কোনও পরিস্থিতি সামলাবার জন্য উপস্থিত বুদ্ধিতে দড় ছিলেন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কথাটা তাঁর সম্পর্কে খাটে, তিনি মাঝে মাঝে বিচিত্র উপায়ে কিছু কিছু উপার্জন করতেন। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় থেকে আমি শুরু করি টিউশনি।

আমার প্রথম ছাত্র একটি বস্তির ক্লাস সিক্সের বালক। শ্রী-উত্তরা সিনেমা হলের পেছন দিকে ছিল সেই বস্তি, প্রতিদিন দু'ঘণ্টা পড়াতে হবে, মাইনে দশ টাকা। ছাত্রের বাবা খুব ছোট একটি মুদিখানার কর্মচারী, আমাকে প্রায়ই বলতেন, মাস্টারবাবু, ছেলেটাকে পাশ করাতে হবে কিন্তু, আমি লেখাপড়া শিখিনি, ছেলে যেন শেখে, রক্ত জল করা টাকায় মাস্টার রেখেছি কী সাধে! ছেলেটির ঘাড়ের ওপর একটা মাথা ছিল বটে, কিন্তু যাকে বলে পড়াশুনোর মাথা, তা একেবারেই ছিল না। সে অঙ্ক কিছুতেই বুঝবে না বলে যেন প্রতিজ্ঞা করেই জন্মেছে। পড়ানো ছাড়াও আমার একটি অতিরিক্ত কাজ ছিল, ছেলেটির বাবা শেষ দিকে বাড়ি ফিরে এসে দোকানের হিসেব লেখাতেন আমাকে দিয়ে। বস্তিতে বিদ্যুৎ-সংযোগ ছিল না, হারিকেনের আলোয় মেঝেতে বসে পড়ানো, কাছাকাছি অন্যান্য ঘরে নানারকম গোলমাল ও ঝগড়াঝাঁটি এবং আমার পক্ষে অশ্রুতপূর্ব আদিরসাত্মক খিস্তি। ছাত্রের বাবা ঘর্মাক্ত শরীরে ফিরে, একখানা বিড়ি ধরিয়ে হিসেব লেখাতে লেখাতে আচমকা জিজ্ঞেস করতেন, পৌঁয়োরো ট্যাকা আট আনা মন দরে আড়াই সেরের দাম কত হল গে? কিংবা, দু'টাকা ছ'আনা হিসেবে আট সের? অর্থাৎ, এ সবই সুকৌশলে আমার অঙ্ক জ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়া। দোকানের কর্মচারীরা লেখাপড়া না শিখলেও এই সব হিসেবের ব্যাপারে খুব ধুরন্ধর হয়, চোখের পলক ফেলার আগে সঠিক বলে দেয়।

উনি অবশ্য আমাকে জব্দ করতে পারেননি, স্কুলে পড়ার সময় আমি অঙ্কে খারাপ ছিলাম না, পরীক্ষায় আশি-নব্বই পেতাম, কোনও একবার পুরো একশো পেয়ে বাবাকে পর্যন্ত অবাক করে দিয়েছিলাম। কলেজ জীবনে কবিতা এসে আমার মাথা থেকে তাড়িয়ে দেয় অঙ্ককে। তার ফলে আমাকে অনেক ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে। কবিতার সঙ্গে অঙ্কের সম্পর্ক যেন সপত্নীবৎ।

অঙ্কের অপর নাম যুক্তি, সব সময় যুক্তিসিদ্ধ হলে কবিতা বোধহয় ধারে কাছে আসতে পারে না, কারণ কবিতা অনেকটা স্বপ্নের মতন, জাগ্রত কল্পনার চেয়েও যা অনেক বেশি বিমূর্ত।

আমার সেই ছাত্রের পিতাটি একটি অন্যায় করতেন। অমনোযোগী ছাত্রটি ছিল নিদ্রাপ্রবণ। যখন তখন সে ঘুমে ঢুলে পড়ত। তা দেখলেই তার বাবা ধাঁই ধাঁই করে কিল মারতেন তার পিঠে। আমার সামনে আমার ছাত্রকে শাস্তি দেওয়া মানে শিক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা নয়? সেই সময় আমি বসে থাকতাম আড়ষ্ট হয়ে।

রাত সাড়ে আটটা-ন'টায় বস্তির অন্ধকার গলি দিয়ে বাড়ি ফিরত চোদ্দো বছরের খুদে মাস্টারবাবুটি, পায়ে টায়ারের চটি, (যুদ্ধের পর এটা চালু হয়েছিল, চামড়া ও রবার দুর্লভ হওয়ায় গাড়ির পুরনো টায়ার কেটে বানানো অতি শস্তার চটি, যার আকার ডিঙি নৌকোর মতন) ধুতির ওপর হাফ শার্ট, (হাফ প্যান্ট পরলে আরও ছোট দেখায়, ধুতি ছাড়া মাস্টারকে মানায় না) কুকুর ঘেউ ঘেউ করে বলে ভয়ে বুকটা কাঁপে বটে, তবু সে বেশ আত্মপ্রসাদও অনুভব করে। সময় ও শ্রমের বিনিময়ে সে কিছু উপার্জন শুরু করেছে।

সেই প্রথম-টিউশনিতে আমি একটি অনৈতিক কাজ করেছিলাম। অভিভাবকটি আমাকে বারবার মনে করিয়ে দিতেন যে তাঁর ছেলেকে পাশ করাতেই হবে। অনেক চেষ্টা করেও আমার ধারণা হয়েছিল, ছেলেটি অঙ্কে পাঁচ-দশ পাবে কি না তাতেও সন্দেহ আছে। সে কোনওক্রমে যোগ, বিয়োগ আর ভাগ কিছু কিছু পারে, কিন্তু গুণ একেবারেই তার মাথায় ঢোকে না। সাত দু'গুণে চোদ্দোর চার, হাতে রইল এক, এই হাতে রাখার ব্যাপারটা সে কিছুতেই বুঝবে না। সব সময় তার হাত খালি। গুণ ছাড়া অঙ্ক হয়? নভেম্বর মাসে, পরীক্ষার ঠিক আগে আমি সেই বস্তিতে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম বিনা নোটিসে। পরীক্ষার আগে গৃহ শিক্ষকের পলায়ন বলতে গেলে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর, কিন্তু আমি কী করব, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে মুদিখানার কর্মচারীটি নির্ঘাত আমাকেই মেরে বসবেন! দশ টাকার বিনিময়েও আমি মার খেতে রাজি নই। অবশ্য পরের মাসেই আমাকে আর একটি টিউশনি জোগাড় করতে হয়েছিল।

আমার স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে আর কেউ বোধহয় টিউশনি করেনি। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা প্রায় সবাই সচ্ছল পরিবারের সন্তান। কিন্তু টিউশনির সূত্রে আমি তাদের সকলের চেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান, আমি যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তারা সে সুযোগ পাবে কী করে? গৃহশিক্ষক হিসেবে আমি বস্তির ঘুপচিঘর থেকে রাজপ্রাসাদে পর্যন্ত প্রবেশ অধিকার পেয়েছি। সত্যিই আমি কিছুদিন পড়িয়েছি শোভাবাজার রাজবাড়িতে, এবং লর্ড সিন্হার এক নাতনিকে, তবে রাজবাড়ির চেয়েও বস্তির মধ্যে নিয়মিত যাতায়াতের সুযোগ পাওয়া আরও শক্ত নয় কি?

আমার টিউশনি-অভিজ্ঞতা নিয়ে পুরো একটি মহাভারত লেখা যায়। উনিশশো উনপঞ্চাশ সাল থেকে তেষট্টি সাল পর্যন্ত এক টানা চলেছিল এই পর্ব, তারপর আমার জীবনে একটা আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। যারা কখনও গৃহ শিক্ষকতা করেনি তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যারা করেছে, তাদের কাছে আমি ঈর্ষার পাত্র হতে পারি। বাবা স্কুল শিক্ষক বলে আমার পক্ষে টিউশনি জোগাড় করা খুব সহজ ছিল, ইচ্ছে মতন বদলাতেও পারতাম, মাঝখানে কয়েকটি বছর দিনে তিন জায়গাতেও পড়িয়েছি। বেকার অবস্থায় যখন শুধু টিউশনিই আমার জীবিকা, তখন কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুরা বলেছিল, তুমি পয়সা নিয়ে এত ছেলেমেয়েদের পড়াও, বিনা পয়সায় কয়েকজনকে পড়াতে পারো না? তাদের অনুরোধে তাদের স্টাডি সার্কেলে কিছুদিন বাগবাজারে বস্তির ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে শ্লাঘা বোধ করেছি। জানি না, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এখনও স্টাডি সার্কেল জাতীয় কিছু চালু আছে কি না।

টিউশনিতে আমার পদোন্নতি হয় ধাপে ধাপে। বস্তি থেকে শুরু, তারপর বিভিন্ন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে, রেট-ও বেড়েছে, দশ থেকে পনেরো, তারপর কুড়ি, সর্বোচ্চ পেয়েছি

পঁচাত্তর টাকা, কোনও কোনও বাড়িতে বেতনের অতিরিক্ত কিছু কিছু খাবারও পেতাম, আহিরিটোলার একটি বাড়িতে চায়ের সঙ্গে দেওয়া হত দু'খানা থিন অ্যারারুট বিস্কুট, অত বিস্বাদ চা আমি আর জীবনে খাইনি, চায়ের বদলে তাতে সাবানের গন্ধ, বিনা প্রতিবাদে তা-ই গলধঃকরণ করতাম নিয়মিত। একটি পরিবারে ঠাকুর-চাকর-দারোয়ানদের সঙ্গে মাস্টারকেও পুজোর সময় একটি ধুতি দেওয়া হত।

দুটি অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতন। শ্যামপুকুর স্ট্রিটে, টাউন স্কুলের প্রায় উল্টো দিকে বিখ্যাত মিত্তির বাড়ি। এ রকম কিছু কিছু বাড়ির জন্যই কলকাতা এক সময় সুন্দর শহর হিসেবে গণ্য হত। সে বাড়ির বর্ণনা এখন প্রায় রূপকথার মতন শোনাবে। প্রকাণ্ড লোহার গেটের পাশে ঘণ্টাঘর, একজন দ্বারবান সাতটার সময় সাতবার, এগারোটার সময় এগারোবার, অর্থাৎ প্রত্যেক ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘণ্টা বাজিয়ে সময় জানিয়ে দিত পথচারীদের। ভেতরে দুটি প্রাসাদ ও উদ্যান, যার এক প্রান্ত থেকে শেষ দেখা যায় না। মধ্যে ফোয়ারা ও শ্বেত পাথরের নারীমূর্তি। একপাশ দিয়ে সুরকি বিছানো পথ। বাড়িটির সেই রূপ আর এখন নেই। বর্তমানে কলকাতার কিছু কিছু বাড়িকে হেরিটেজ বিল্ডিং হিসেবে চিহ্নিত করে রক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে, কিন্তু মাঝখানের বছরগুলিতে আমাদের ঔদাসীন্যে কত সুদৃশ্য হর্ম্য হারিয়ে গেছে। এখন কি কেউ বিশ্বাস করবে যে ঝামাপুকুরে একটি বাড়িতে সদর থেকে অন্দরমহলে যাতায়াতের জন্য ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা ছিল?

আমি ওই মিত্রবাড়ির বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে গিয়ে দ্বিতীয় প্রাসাদটিতে দুটি ফুটফুটে ছেলেমেয়েকে পড়িয়েছি বেশ কয়েক বছর। ছেলেটির নাম বাবলু, মেয়েটির নাম সীতা। বাইরের দিকের একটি ঘরে বসে থাকতেন এক বৃদ্ধ, সম্ভবত তিনিই গোষ্ঠীপতি, অধিকাংশ দিনই দেখতাম তিনি চোখ বুজে রয়েছেন, একজন মাইনে-করা লোক গীতা কিংবা উপনিষদ পাঠ করে তাঁকে শোনাচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ তিনি চোখ খুলে হুঙ্কার দিয়ে বকতেন কোনও দাস কিংবা দাসীকে। পাশের বৃহৎ হল ঘরটিতে সোফা সেট ও প্রচুর দামি আসবাব, দেয়ালে নানা আকারের ও নানা ধরনের অনেকগুলি ঘড়ি। কাজের লোক ধুলো ঝাড়তে গিয়ে কোনও ঘড়ি বা ছবি বেঁকিয়ে ফেললে তাঁর নজর এড়াত না।

প্রথম দিকে আমি পড়াতাম হলঘরটির অন্য পাশের একটি ঘরে। একটি শ্বেতপাথরের টেবিল ঘিরে কয়েকটি চেয়ার, সে রকম চেয়ারে আমি আগে কখনও বসিনি। পাশে একটা শ্বেতপাথরের ভাস্কর্য ছিল, সেটার দিকে বারবার চোখ চলে যেত আমার, এক রমণীর পায়ের কাছে বসে আছে পাদ্রীর মতন পোশাক-পরা একজন পুরুষ। একজন পাদ্রী কেন একটি নারীর পদতলে বসে থাকবে? নিশ্চিত কোনও পশ্চিমি কাহিনী, কিন্তু সেটা জানি না বলে দারুণ কৌতূহল অবরুদ্ধ বাতাসের মতন ঘুরত আমার মাথার মধ্যে। অনেকদিন পরে এক ফরাসি কাহিনী পড়লাম, আবেলার নামে এক পাদ্রী এলোইস নামে এক তরুণীর প্রেমে পাগল হয়েছিলেন, সম্ভবত সেই কাহিনীই মূর্ত হয়েছিল ওই ভাস্কর্যে। সেটার দাম কত হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। ভাস্কর্যটির প্রতি আমি এমনই আকৃষ্ট হয়েছিলাম, যে প্রায়ই মনে মনে ভাবতাম, সেটা তো অবহেলাতেই পড়ে আছে এক ধারে, ওরকম শিল্প সৃষ্টি আরও অনেক আছে এ-বাড়িতে, আমার এক বছরের মাইনের বদলে যদি ওটা আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে আমি ধন্য হব। তবে ওরকম একটি শিল্পকে সাজিয়ে রাখার মতন জায়গা যে আমাদের ভাড়া বাড়িতে নেই, সে খেয়াল ছিল না।

বনেদি বাড়ির রীতি অনুযায়ী সীতার মা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথা বলতেন আড়াল থেকে, তাঁকে দেখা যেত না। তার বাবা ডাক্তার, পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছি, কখনও কথা হয়নি। তিনি একসময় উচ্চশিক্ষার্থে সপরিবারে বিলেত চলে গেলেন, তখন আমি শুধু বাবলুকে পড়াই। বছরখানেক বাদে সীতা ফিরে এসে আবার আমার ছাত্রী হল, আমি সবিস্ময়ে

লক্ষ করলাম, তার আচরণের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। সেই সময় বিলেত-যাওয়া চাট্টিখানি কথা ছিল না, বিলেত-ফেরতদের চালিয়াতি নিয়ে নানা গল্প প্রচলিত ছিল, তারা অকারণে ইংরিজি বলে, যখন তখন 'আমি যখন ইংল্যান্ডে ছিলাম' শুরু করে। সীতা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া মেয়ে, তবু সে নির্ভুল বাংলা বলে, বাংলা গল্পের বই দারুণ ভালোবাসে, প্রসঙ্গ এসে গেলেও সে বিলেত বলে না, বলে ওদেশে। তার মা-ও আবার পর্দানসীনা।

সেই বনেদি বাড়ির ভিতরের চিত্রটি আমার মনে এমন গেঁথে যায় যে পরবর্তীকালে 'সেই সময়' নামে উপন্যাসটি রচনার সময় তা খুব কাজে লেগেছে। ওঁদের কথাবার্তা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে আমি খাস কলকাতার ভাষাও রপ্ত করেছিলাম। বাবলুর বাবা মাঝে মাঝেই আমাকে বলতেন, আপনার কথা শুনে তো বোঝা যায় না যে আপনি বাঙাল! আমার মামা বাড়ি ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে তখনও বাঙাল ভাষা প্রবলভাবে প্রচলিত। পূর্ববঙ্গের লোকেরা নিজেদের ভাষা নিয়ে গর্ব বোধ করে, কলকাতায় এসে তারা স্থানীয় ভাষা বললেও বাড়ির মধ্যে ছ্যামরা-ছেমরি, পোলাপান, জম্বুরা, গোইয়া, বোরোই, ইত্যাদি এবং ছ-কে স-এর মতন উচ্চারণ অবাধে চালিয়ে যায়।

সীতার বাবা মিহিরকুমার মিত্র প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং একসময় ক্যালকাটা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বহুবছর বাদে, কোনও এক পুরস্কার বিতরণী সভায় তিনি সভাপতি, প্রধান অতিথি হিসেবে তাঁর পাশে আমার স্থান। আমি তাঁর দিকে ফিরে মৃদু স্বরে বললাম, আমাকে চিনতে পারছেন না, আমি একসময় আপনাদের বাড়ির মাস্টার ছিলাম, সীতাকে পড়িয়েছি। তিনি দারুণ অবাক হয়ে বললেন, আপনার নাম জানি, বইও পড়েছি, কিন্তু আপনিই যে সেই, তা তো জানতাম না! সভাপতির অন্য পাশে-বসা সীতার মাকে স্বচক্ষে দেখলাম সেই প্রথম! সীতা এবং তার স্বামীর সঙ্গে মাঝে মাঝেই দেখা হয়, পুরনো অভ্যেসবশত সর্বসমক্ষে সে আমাকে মাস্টারমশাই বলে ডেকে ফেলত, কিন্তু আমার মধ্যে মাস্টারত্ব আর কিছুই অবশিষ্ট নেই বলে এখন সে সুনীলদা বলে।

অন্যরা কেন আমাকে ঈর্ষা করবে, তার দ্বিতীয় কারণটা এবার বলি। থার্ডইয়ারে পড়ার সময় আমার বন্ধু সুনন্দ ওরফে বুঢ়ঢা একদিন আমায় বলল, তুই আমার কাকার ছেলে আর মেয়েকে পড়াবি? ওরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে, বাংলায় কাঁচা। আমি রাজি হয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। তখন ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীদের বাংলায় পাশ-করা বাধ্যতামূলক ছিল, তাদের ডিগ্রির নাম ছিল সিনিয়ার কেমব্রিজ, এখন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেকেই মাতৃভাষা এড়িয়ে যায়।

সেই প্রথম উত্তর কলকাতা থেকে আমার সুদূর দক্ষিণ কলকাতায় পাড়ি দেওয়া। হ্যাঁ, সত্যিই সুদূর। দক্ষিণ কলকাতার বেশির ভাগ মানুষই উত্তর কলকাতা চেনে না, অনেকে সারা জীবনে কখনও বোধহয় কলেজ স্ট্রিটের ওপাশে পা দেয়নি। আর উত্তর কলকাতার ছেলেরা মাঝে মাঝে দক্ষিণ কলকাতায় বেড়াতে আসে বাসে চেপে। উত্তরের তুলনায় দক্ষিণ কলকাতার রাস্তাঘাট অনেক সুন্দর। মানুষ কম, ফাঁকা ফাঁকা, প্রচুর গাছপালা, এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় এখানকার সুবেশা তরুণীরা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। হিমানীশ গোস্বামী লিখেছিলেন, দক্ষিণ কলকাতার মেয়েরা খুব খোলামেলা হয়, সাউথ ফেসিং কিনা?

ছাত্র-ছাত্রীর নাম ভাইয়া ও মুনা, তখনও ঠিক কৈশোরে পৌঁছোয়নি, বাড়ি সাদার্ন এভিনিউতে। এসব দিক আমার একেবারেই অচেনা। গুহঠাকুরতারা পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত পরিবার, এঁদের অনেক কৃতী সন্তান ছড়িয়ে আছে সারা ভারতে ও বিদেশেও। আমার বন্ধু বুঢ়ঢার বাবা প্রভু গুহঠাকুরতা সম্পর্কে শুনেছি, তিনি ভারতে সবচেয়ে কম বয়সে পি এইচ-ডি করেছিলেন, খুবই রূপবান ও গুণী পুরুষ ছিলেন তিনি, বুদ্ধদেব বসু তাঁর স্মৃতি কথায় এঁর বিষয়ে লিখেছেন। আমার ছাত্র-ছাত্রীর বাবা প্রভু গুহঠাকুরতার ছোট ভাই, তিনি বুদ্ধদেব বসুকে 'বুদ্ধদা' বলে ডাকতেন। সে সময়ের প্রখ্যাত অভিনেত্রী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, কারুর কারুর মতে তিনি

ছিলেন সুচিত্রা সেনের চেয়েও বেশি রূপসী এবং উচ্চাঙ্গের শিল্পী, ছিলেন এই পরিবারেরই মেয়ে। আমার ছাত্র-ছাত্রীর মায়ের নাম কৃষ্ণা, তাঁর মতন সুন্দরী ও কমনীয়া নারী আমি সে পর্যন্ত দেখিনি। আমি শুধু গৃহশিক্ষক নই, তাঁর দেওরপোর বন্ধু। সেই সুবাদে তিনি আমার সঙ্গে অতিরিক্ত সুব্যবহার করতেন, কতরকম সরবত ও অনাস্বাদিতপূর্ব মিষ্ট দ্রব্য যে সে বাড়িতে খেয়েছি তার ঠিক নেই। অল্প বয়েস থেকে সেই ছেলেমেয়েদুটিকে বেশ বড় বয়েস পর্যন্ত পড়িয়েছি, একজন সেন্ট জেভিয়ার্স, অন্যজন লোরেটো, সপ্তাহে দু'দিন শুধু বাংলা পড়ানো আমার কাজ। ছেলেটি খুব মেধাবী কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল, খেলাধুলোর দিকেই বেশি ঝোঁক, মেয়েটি নম্র, শান্ত, সেও ভালো সাঁতারু, তার পোশাকি নাম অনুরাধা। একদিন সে বলেছিল, মাস্টারমশাই, আপনার কি কখনও স্টেটসম্যানে ছবি বেরিয়েছে? আমি তখন কিছু লেখালেখি করি। দু'একটা বাংলা কাগজে কখনও সখনও নাম ছাপা হয়। কিন্তু স্টেটসম্যানের মতন উচ্চ ভুরু কাগজ আমার মতন অকিঞ্চিৎকর লেখককে পাত্তা দেবে কেন? অনুরাধা গুহঠাকুরতা সর্বভারতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় একটি বিষয়ে প্রথম হওয়ায় তার ছবি ছাপা হয়েছিল স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায়! মাস্টারের চেয়ে ছাত্রীর খ্যাতি অনেক বেশি।

এই বাড়িতে টিউশানি নেওয়ার পরই আমার ভাগ্য খুলে যায় যাকে বলে। অনুরাধা বাংলায় ভালো রেজাল্ট করতেই তার বান্ধবীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, তাদেরও একজন বাংলার টিচার চাই, এবং আমাকেই চাই! কারণ, আমার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। সবই ধনী পরিবারের ফুটফুটে চেহারার বুদ্ধিমতী মেয়ে, ইংরিজিতে তুখোড়, বাংলায় খুব কাঁচা। আমার এক মামিমার ছোট বোনকেও পড়াতে যেতে হত বরানগরে, মেয়েটির নাম নূপুর, সে তার নামের বানানও ভুল করে, কোন্‌টা হ্রস্ব-ই, কোন্‌টা দীর্ঘ-ঈ মনে রাখতে পারে না। আমি তাকে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের দু'লাইন গাইতে শিখিয়ে দিই : 'রাজার পুরে তমাল গাছে/নূপুর শুনে ময়ূর নাচে', এতে রবীন্দ্রনাথ এমন সুর দিয়েছেন যে নূপুর বানান সবাইকে শিখিয়ে ছাড়বেনই, নূ-উ-উ-উ পুর! আর একটি মেয়েকে সবাই আপ্‌লা বলে ডাকে, অনেকদিন পর আমি তার ভালো নাম জেনে স্তম্ভিত! জাতবেদাঃ! অর্থাৎ তার বাবা-ঠাকুর্দাদের কেউ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন নিশ্চিত, সেই মেয়ে নিজের নামের মানে তো জানেই না, ঝঞ্ঝা, বাতায়ন এইসব শব্দও তার কাছে দুর্বোধ্য। আপ্‌লা অবশ্য পরে ভালো বাংলা শিখেছিল নিজেরই উৎসাহে এবং নামকরা ইংরিজির অধ্যাপিকা হয়েছিল।

এই সময় কয়েক বছর আমি শুধু সুন্দরী ধনীকন্যাদের পড়াই, তাও শুধু বাংলা, এবং মাইনেও ভালো। বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই যে আমাকে এজন্য হিংসে করবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! কিন্তু আমি যে বস্তির ছেলেকে দশ টাকা মাইনে থেকে শুরু করেছি, তা কেউ মনে রাখতে চায় না। মাস্টার হিসেবে আমি ভালো এবং খারাপ দুই-ই! অর্থাৎ পড়ানোতে ফাঁকি দিই না, হাজিরায় ফাঁকিবাজ! সুন্দরী মেয়েদের চেয়েও বন্ধুদের প্রতি টান তখন বেশি। ততদিনে কৃত্তিবাস পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কফি হাউসে প্রতি বিকেলেই তুমুল আড্ডা জমে, তার মাঝখান থেকে টুক করে উঠে আমাকে টিউশানিতে যেতে হয়, এক একদিন কিছুতেই যেতে মন চায় না, সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়েও কেউ যেন ঘাড় ধরে টেনে আনে। কখনও কখনও পুরো সপ্তাহই অনুপস্থিত, এবং তার কারণ হিসেবে কত যে মিথ্যে গল্প বানিয়েছি। যে-ঠাকুমাকে চোখেই দেখিনি, তাঁর মৃত্যু বর্ণনা, এক মামাকে কামড়েছে পাগলা কুকুর, আমার পায়ে বইয়ের র‍্যাক ভেঙে পড়েছে বলে সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটার অভিনয়... কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা এইসব কাঁচা মিথ্যে অম্লান বদনে বিশ্বাস করতেন। কিংবা তিনি এতই সহৃদয় ছিলেন যে ওই সব গল্প যে মিথ্যে তা বুঝে ফেলেও আমার নকল বিপদগুলির জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতেন, ঘুণাক্ষরেও কখনও আমার প্রতি বিরাগের ভাব দেখাননি।

অনুরাধা একদিন আমাকে দারুণ উৎকণ্ঠায় ফেলে দিয়েছিল। ওরা সবাই মিলে মাঝে মাঝেই

বুদ্ধদেব বসুর বাড়িতে বেড়াতে যায়, 'কবিতা ভবন', ২০২ রাসবিহারী অ্যাভেনিউ কাছেই। একবার অনুরাধা আমাকে বলল যে, কাল এ বাড়িতে গিয়ে সে বুদ্ধকাকাকে আমার কথা বলেছিল। তারপর চুপ। বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার নাম বলেছিল, কী কী উত্তর দিলেন তিনি? চিনতে পেরেছেন? এর মধ্যে 'কবিতা' পত্রিকায় ডাকে পাঠানো আমার দু'তিনটি কবিতা ছাপা হয়েছে, সম্পাদককে চাক্ষুষ দেখিনি। কত তরুণ কবিরই তো রচনা ছাপা হয়, সবার নাম কি সম্পাদকের খেয়াল থাকে? বুদ্ধদেব বসু যদি আমায় চিনতে না পারেন, তা হলে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আমার সম্মান কমে যাবে না? কৌতূহল দমন না করতে পেরে ছাত্রীটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কী বললেন? কী বললেন? ছাত্রীটি জানাল যে সে বুদ্ধদেব বসুকে বলেছিল, আমার মাস্টারমশাই একজন কবি। নাম শুনে বুদ্ধদেব বসু খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমার কাগজে লিখেছে, অনেকদিন লেখা পাঠায়নি তো, পাঠাতে বলো।

বুদ্ধদেব বসু আমার নাম শুনে চিনতে পেরেছেন, এর চেয়ে বড় আনন্দ যেন আর হয় না! সারা শরীরময় উত্তেজনা। বাড়ি ফেরার পথে অনবরত জপ করেছি, উনি আমাকে চেনেন, আমাকে চেনেন, তা হলে আমি একেবারে এলেবেলে নই!

কলেজে ওঠার পর অনুরাধা আমাকে প্রায়ই চুপি চুপি অনুরোধ করত, আপনি তো কত গল্প লেখেন, একটা লেখার নায়কের নাম রাখবেন সিদ্ধার্থ! কেন ওই নাম রাখতে হবে, কাহিনীটা কী, তা সে কিছুতেই বলবে না। বোঝাই যায়, ওই নামের এক যুবকের সঙ্গে তার বেশ প্রণয় হয়েছে, কিন্তু বাড়িতে সে কথা প্রকাশ করা যাবে না। তার অনুরোধে আমি সত্যিই 'প্রতিদ্বন্দ্বী' উপন্যাসের নায়কের নাম সিদ্ধার্থ রেখেছিলাম, শুধু নামটাই, কাহিনীর কোনও মিলই নেই। আসল সিদ্ধার্থের সঙ্গে, দুই পরিবারের কিঞ্চিৎ আপত্তি প্রশমিত হলে, যথাসময়ে অনুরাধার শুভ পরিণয় হয়, তারা দু'জনেই এখন আমাদের পারিবারিক বন্ধু।

পনেরো

দশম শ্রেণীতে অভীক্ষার পর বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘুচে যায়। 'অভীক্ষা' শব্দটির কি মানে বোঝা গেল? যাকে বলে টেস্ট পরীক্ষা। অভীক্ষা শব্দটি খটোমটো মনে হলে টেস্ট-এর বদলে 'যাচাই পরীক্ষা' বলা যেতে পারে। কিন্তু তা কি কেউ বলবে? ক্লাস টেনের বদলে দশম শ্রেণীও প্রায় কেউ মুখে বলে না। কেন আমরা এত ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করি? সারা ভারত ঘুরে দেখেছি, অন্য আর কোনও রাজ্যের মানুষ তাদের নিজস্ব ভাষায় এমন বেশি ইংরিজি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটায়নি। অন্য ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করলে ভাষা প্রগতিশীল হয়, তা অবশ্যই মান্য, ইংরিজি ছাড়াও আরবি-ফার্সি, পোর্তুগিজ-ফরাসি এমনকী গ্রীক শব্দও আমরা প্রচুর গ্রহণ করেছি, কিন্তু নিজের ভাষার প্রচলিত শব্দগুলিকে হটিয়ে দিলে তো শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবার বদলে সঙ্কুচিত হতেই থাকে ক্রমশ। কৃত্রিম বা কষ্টকল্পিত বা উচ্চারণে অসুবিধাজনক পরিভাষা ব্যবহার করার বদলে অন্য ভাষার পরিচিত শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন আমি হাইড্রোজেন, অক্সিজেন রেখে দেওয়ার পক্ষপাতী, কিন্তু রেজাল্টের বদলে ফলাফল, পাস-এর বদলে উত্তীর্ণ, ইত্যাদি চালু না রাখলে যে এসব শব্দ হারিয়ে যাবে এক সময়। অনেক প্যান্ট-পরা বাঙালি লোকসমক্ষে নিজের অর্ধাঙ্গিনীকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পায়, বলে আমার ওয়াইফ কিংবা আমার মিসেস।

ইস্কুল শব্দটি দিব্যি বাংলা হয়ে গেছে, বিদ্যালয়ের পাশাপাশি চলতে পারে, বাংলা কথার

মধ্যে স্কুল-এর বদলে ইস্কুল শুনতে বেশি মিষ্টি লাগে। আমার ইস্কুল-জীবন শেষ হয়ে এল। ইস্কুল থেকে কয়েকজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে সঞ্চয় করেছি, যাদের সঙ্গে সম্পর্ক থেকেছে আজীবন, তা ছাড়া স্কুল জীবনে আমার তেমন কোনও সুখ-স্মৃতি নেই। কয়েকজন শিক্ষকের কথা মনে দাগ কেটে আছে, তাঁদের মধ্যে একজনের নাম কালীকান্ত গৌতম, ইনি আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন। ধুতি-ফতুয়া ও বিদ্যাসাগরী চটি পরা দীর্ঘকায় পুরুষ, মাথায় মোটা টিকি, কথা বলতেন কৌতুকের সুরে। অসাধারণ এঁর স্মৃতিশক্তি, কোনও নতুন ছাত্রের নাম ও বাবার নাম শুনেই ইনি জাদুকরের মতন গড়গড় করে বলে দিতেন তার বংশপরিচয়। বাংলার ইস্কুল থেকে সংস্কৃত-পণ্ডিতদের এই প্রজাতিটি এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। তার ফল কি ভালো হয়েছে? দেবনাগরী লিপি রপ্ত করায় আমি হিন্দি পড়তে পারি অনায়াসে, গৌতমবাবু যেটুকু সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন, তার সুফল এখনও অনুভব করি।

একটি মজার অভিজ্ঞতার কথা বলে ইস্কুল-পর্ব শেষ করা যেতে পারে। উঁচু শ্রেণীর ছাত্রদের ওপর সরস্বতী পুজোর ভার, সেবারে শুক্রবার পুজো বলে টানা তিনদিন ছুটি, আমরা ঠিক করলাম, শেষ দিকে একটি নাটকের অভিনয় করা হবে। পূর্ণাঙ্গ নাটক, শচীন সেনগুপ্ত-র 'সিরাজদৌল্লা', তখন খুবই জনপ্রিয়। রেকর্ডে নির্মলেন্দু লাহিড়ির কাঁপা কাঁপা গলায় ঘাতকের সামনে সিরাজের শেষ আবেদন শুনে চোখে জল আসে না, এমন পাষণ্ড কে আছে? নামভূমিকাটি আমাকে কেন দেওয়া হয়েছিল, তা ঠিক মনে নেই। অন্য বন্ধুদের তুলনায় কবিতা আবৃত্তি করায় কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা ছিল আমার। লুৎফুন্নেসা সাজতে কি কেউ রাজি হয়েছিল? সম্ভবত, স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত কিশোরদের উপযোগী কোনও সংস্করণ পাওয়া যেত ওই নাটকটির। সবচেয়ে ভালো মানিয়েছিল আমার বন্ধু ভাস্কর দত্তকে, লর্ড ক্লাইভের ভূমিকায়। বনেদি বাড়ির ছেলে ভাস্করের গায়ের রং একেবারে সাহেবদের মতন। সিরাজদৌল্লা'রও গায়ের রং ফর্সা হবার কথা, আমার কুচকুচে কালো মুখখানায় জিংক অক্সাইড মাখিয়ে সাদা করার চেষ্টা হয়েছিল।

আমার অভিনয় জীবন কণ্টকাকীর্ণ ও বিঘ্নবহুল। শিশু বয়েসে আমগ্রামে মামার বাড়িতে রান্নার ঠাকুরদের যাত্রা পালায় কৃষ্ণ সেজে আছাড় খাওয়ার কথা আগেই লিখেছি, এবারের ব্যর্থতা আরও বিরাট, এত মুখস্থ করা, এত মহড়া সবই গেল বিফলে। অনেক স্কুলের মতন টাউন স্কুলেরও কোনও হল নেই, একতলায় নিচু শ্রেণীগুলি কাঠের অস্থায়ী দেওয়াল দিয়ে ভাগ করা, সরস্বতী পুজো কিংবা পুরস্কার বিতরণীর মতন উৎসবে সেই কাঠের দেওয়ালগুলি সরিয়ে দেওয়া হয় এক পাশে। নাটক অভিনয়ের জন্যও সেইভাবে হল তৈরি করা হয়েছে, দর্শকদের জন্য বেঞ্চি পাতা, এক পাশে তৈরি হয়েছে মঞ্চ, সবই নিজেদের উদ্যোগে, মাস্টারমশাইদের কোনও সাহায্য বা পরামর্শও নেওয়া হয়নি। টিকিটের কোনও ব্যাপার নেই, ছাত্ররাই দেখবে। সেখানেই হয়েছিল আসল ভুল।

ঐতিহাসিক নাটকের পোশাক ভাড়া পাওয়া যায়, সেগুলি অবশ্য বয়স্ক অভিনেতাদের জন্য, আমাদের গায়ে ঢল ঢল করে, নানা জায়গায় সেফটি পিন দিয়ে আঁট করা হল, মুখে রং মেখে, সেজেগুজে শুরু হল নাটক। অভিভাবকদের আমন্ত্রণ করা হয়নি, দর্শকদের বয়েসের গড় এগারো। বেঞ্চের জায়গা দখল নিয়ে তারা ঠেল্লামেল্লি করছে, একজন মাস্টারমশাই মাঝে মাঝেই সাইলেন্স, সাইলেন্স বলে ধমক দিয়ে তাদের থামাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছেন, কেউ কেউ পরামর্শ দিল, নাটক শুরু হলেই গোলমাল থামবে। কিন্তু থামল না, বাইরে থেকে আরও কিছু ছেলে ঢুকে পড়ল, তাদের বসবার জায়গা নেই। আরও অনেক ছাত্র ঠেলাঠেলি করছে ঢোকার জন্য! বেঞ্চগুলিতে বসবার জায়গা বড়জোর আড়াইশো-তিনশো জনের, স্কুলের ছাত্রসংখ্যা এক হাজারের বেশি, আমাদের নাটক দেখার জন্য তারা সবাই এসে পড়েছে? আমরা সংলাপ বলছি, কিন্তু বাচ্চাদের চ্যাঁচামেচি, হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলিতে কিছুই শোনা যাচ্ছে না! কয়েক মিনিট পর সিরাজদৌল্লা স্বয়ং নাটকের সংলাপের বদলে চোখ পাকিয়ে বলল, অ্যাই, সব

চুপ! লর্ড ক্লাইভ তলোয়ার তুলে খাঁটি উত্তর কলকাতার উচ্চারণে বাংলায় বলল, বাচ্চারা চুপ করে বোস্, নইলে প্যাঁদানি খাবি! তাতেও কোনও ফল হয় না, বাইরে থেকে আর একটি ঢেউ পেছন্ দিকে এমন প্রবল ধাক্কা মারল যে সামনের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু ছেলে আছড়ে পড়ল মঞ্চের গায়ে, পরবর্তী লণ্ডভণ্ড কাণ্ডে এক পাশে হেলে পড়ল নড়বড়ে মঞ্চটি। এরপর উপায়ান্তর না দেখে সিরাজদৌল্লা, মিরজাফর, লর্ড ক্লাইভ প্রমুখের একসঙ্গে পলায়ন! আসল ইতিহাসে, ১৭৫৭ সালে গণ-অভ্যুত্থানে যদি এমন ব্যাপার ঘটত, তা হলে কী ভালোই না হত! বলাই বাহুল্য, আমাদের নাট্যপ্রয়াসের সেখানেই করুণ যবনিকা।

আমাদের সময় বিদ্যালয় ত্যাগের পরীক্ষাটির নাম ছিল ম্যাট্রিকুলেশান, সংক্ষেপে ম্যাট্রিক। বহু বছর ধরে যত ছাত্র ম্যাট্রিক পাশ করেছে, তাদের অধিকাংশই এই শব্দটির মানে জানে না। এর মানে, প্রবেশিকা, অর্থাৎ যে-পরীক্ষা পাশ করলে বিদ্যালয় ছেড়ে মহাবিদ্যালয়ে (স্কুল ছেড়ে কলেজে) প্রবেশের অধিকার পাওয়া যায়। সবাই বলত, এই পরীক্ষাটাই সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা, সুকুমার রায়ের কবিতার সৎপাত্রটি 'উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামলো শেষে'! আমরা পঞ্চাশের ব্যাচ, তার দু বছর বাদেই ম্যাট্রিক উঠে যায়, তারপর স্কুল ফাইনাল, সেকেন্ডারি, হায়ার সেকেন্ডারি নামে নানারকম পরীক্ষা চলেছে।

যাচাই পরীক্ষা ও চূড়ান্ত পরীক্ষার মাঝখানে আড়াই মাসের মতন সময় পাওয়া যায়। প্রথা হচ্ছে, এই আড়াই মাস অধ্যয়নকেই তপস্যা করতে হবে ছাত্রদের, অধ্যয়ন শুধু পাঠ্যপুস্তকের, অ-পাঠ্য অর্থাৎ গল্পের বই ছোঁওয়া পাপ, বাড়ি থেকে বেরোনো চলবে না, বন্ধুরা বাড়িতে আসবে না, সিনেমা-থিয়েটার দেখার চিন্তাও নিষিদ্ধ। আমাকে অবশ্য টিউশানির জন্য বাড়ির বাইরে বেরোতেই হত, আর জল বিনা মীনের মতন গল্পের বই ছাড়া আমার পক্ষেও বেঁচে থাকা দুষ্কর। বাবার ভয়ে পড়ার বইয়ের তলায় গল্পের বই রেখে পড়েছি কতদিন। ইংরেজি পরীক্ষার আগের রাতে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসটি শেষ করেছিলাম, স্পষ্ট মনে আছে। তখন একটি কিশোরীর সঙ্গে আমার ভাব-ভালোবাসা হয়ে গেছে, দু'এক দিন অন্তর তাকে অন্তত এক পলক না দেখলে যে জীবন উষর হয়ে যায়। মেয়েটির একটি নাম থাকা দরকার। তার নাম অপর্ণা। ভাব-ভালোবাসা মানে কী, কোনও প্রেমের কথা হয়নি। তখনও শরীর ছোঁয়া-ছুঁয়ির কথা মনে আসেনি। বিরলে মুখোমুখি বসারও সুযোগ নেই, শুধু অনেক লোকের মাঝখানেও হঠাৎ চোখাচোখি, সে রকম দৃষ্টি মাত্র একজনের জন্যই সংরক্ষিত, যেন মুহূর্তে দু'জনের চোখের মাঝখানে তৈরি হয়ে যায় এক অদৃশ্য সেতু, তা দিয়ে যাতায়াত করে অব্যক্ত ব্যাকুলতা।

বয়েসে আমার থেকে মাত্র এক বছরের ছোট, অপর্ণা সেই বয়েসেই পাগলের মতন কবিতা পড়ে। মাঝে মাঝেই সে এমন কবিতার লাইন বলত, যা আমার অজানা। কখনও রবীন্দ্রনাথ থেকে দু' পঙক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে জিজ্ঞেস করত, এর পরে কী বলো তো? আমি হেরে যেতাম প্রায়ই। অপর্ণা যদি খেলোয়াড়দের ভক্ত হত, আমি নিশ্চিত খেলায় মন দিতাম, যদি গায়কদের পছন্দ করত, আমি গলা সাধতাম, তাকে খুশি করার একমাত্র উপায় নতুন কোনও কবিতা মুখস্থ বলা, তাই আমার কবিতা পাঠ শুরু হল নতুন উদ্যমে।

ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতার কারণে অনেক দিন স্কুল বন্ধ ছিল বলে দু'-এক বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উদারভাবে নম্বর দিয়ে পাশ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রায় সকলকে। তখন সবাই বলত, সাতচল্লিশের ম্যাট্রিকে গোরু-ঘোড়া, চেয়ার-টেবিলও পাশ করে গেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তী বছরগুলিতে পরীক্ষা বেশি কঠোর হয়। আমাদের বারে অঙ্ক প্রশ্নপত্রের চেহারাটাই ছিল ভয়াবহ। যাই হোক, পরীক্ষা তো শেষ হল। এবার?

আগের আড়াই মাস যেমন বাড়িতে থাকার কড়াকড়ি, পরীক্ষা ও ফল প্রকাশের মাঝখানের তিন মাস তেমনই যথেচ্ছ স্বাধীনতা। এখন যেমন জয়েন্ট এন্ট্রান্স কিংবা বিভিন্ন কলেজে ভর্তির জন্যও পরীক্ষা দিতে হয়, তাই এই ছুটিতেও ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়,

তখন সে সব বালাই ছিল না, কলেজগুলোই ছাত্র-ছাত্রীদের নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে ডাকাডাকি করত। এই ছুটিতেই ছেলে-মেয়েরা কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়, দুটি করে ডানা গজায়, মুখের ভাষারও বদল হয় খানিকটা। আমার বেলায় হল তার বিপরীত, বাবার কড়া নির্দেশ, দুপুরবেলা কিছুতেই বাড়ি থেকে বেরোনো চলবে না, এবং বিকেলে খেলাধুলো করতে গেলেও বাড়ি ফিরতে হবে শেষ সূর্যের আলো গায়ে মেখে, বাইরে রাত্রি ছোঁয়া নিষেধ। বাবার ধারণা, পড়াশুনোহীন এই সময়টাতেই ছেলেদের মাথায় শয়তানের কারখানা চালু হয়। বাবার নির্দেশ অমান্য করার সাহস আমার ছিল না, বাঙাল পরিবারের অধিপতিদের অনায়াসে হিটলারের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেত। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবা দুপুরবেলা বাড়িতে থাকেন, পালাবই বা কী করে।

শুধু বাড়িতে আবদ্ধ থাকাই যথেষ্ট নয়। কী করে যেন একখানা টেনিসনের কাব্যসমগ্র বাড়িতে ছিল। বাবা আদেশ দিলেন, প্রতিদিন তার থেকে দুটি কবিতা আমায় অনুবাদ করতে হবে। এটা কাব্য চর্চার জন্য নয়, আমাকে ইংরিজি শেখাবার প্রয়াস। কী কষ্টই যে হত তখন, সেই সব দুপুরে বন্ধুরা সিনেমা দেখার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছে, কিংবা তাস খেলছে, কিংবা অন্য কোনও বন্ধুর বোনের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করছে, আর আমি এক হতভাগ্য বন্দি, নির্জন দুপুরে এক প্রায়ান্ধকার কারাকক্ষে বসে ইংরিজি শব্দের মানে খুঁজছি। বাবাকে তো কিছু বলতে পারি না, মনে মনে টেনিসনকেই অভিশাপ দিতাম। এই কবিটা জন্মেছিল কেন, কে ওকে এইসব খটোমটো কবিতা লেখার মাথার দিব্যি দিয়েছিল? এই বইখানাই বা আমাদের বাড়িতে এতদিন টিঁকে রইল কী করে?

কিছুদিন পর খানিকটা নিষ্কৃতির উপায় খুঁজে পেলাম। একমাত্র গ্রীষ্মের ছুটিতেই বাবা বিশ্রাম পেতেন, দিবানিদ্রা দিতেন। তিনি ঘুম থেকে ওঠামাত্র খাতাটা বাড়িয়ে দিতাম, আমার অনুবাদের অপপ্রয়াস দুটি দেখে ছাড়পত্র দিলেই আমি ছুট লাগাতাম রাস্তার দিকে। দিন দশেক পরে লক্ষ করলাম, সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে বাবা আর অনুবাদের প্রতিটি শব্দ মিলিয়ে দেখেন না, এক পাশে টেনিসনের বইয়ের পৃষ্ঠা খোলা, অন্য পাশে আমার খাতা, দু' দিকে চোখ বুলিয়ে মূল কবিতা ও অনুবাদের আকার সমান হলেই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে টিক মেরে দেন। তা হলে আর আমার কষ্ট করে ইংরিজি বাক্যের অর্থ বোঝার পরিশ্রম করার দরকার কী? ওপরে টেনিসনের একটি আঠেরো লাইনের কবিতার শিরোনাম লিখে তলার আঠেরো লাইন নিজে বানালেই তো হয়! সেইভাবেই দিব্যি পাশ করে যেতে লাগলাম। নিজে যেগুলো বানাই, তা অনেকটা কবিতা-কবিতাই শোনায়, ছন্দ মিল দিতে অসুবিধে হয় না। এরকম হাত পাকাতে পাকাতে একদিন লিখে ফেললাম একখানা প্রেমের কবিতার মতন কিছু একটা, কোনও নারীর প্রতি স্বগতোক্তি বা চিঠি। অবশ্যই অপর্ণা নাম্নী সেই কিশোরীর উদ্দেশে। দুঃখ থেকেই তো কবিতার জন্ম, আমারও সেই বন্দিদশা থেকেই কবিতা উৎসারিত হয়েছিল।

কিন্তু সেটা সত্যিই কবিতা পদবাচ্য হয়েছে কি না বুঝব কী করে? কোনও বন্ধুকে পড়ে শোনাবার প্রশ্নই ওঠে না, তারা হাসি মস্করা করবে। অপর্ণাকে পড়াবার প্রবল ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ নেই, প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে গোপনে চিঠি চালাচালির নানা রকম কায়দা আছে তা পরে জেনেছি, সে সময় আমার মাথায় ওসব আসেনি, অপর্ণার সঙ্গে নিভৃতে দেখা হয় না, তা ছাড়া পদে পদে ভয়, সবচেয়ে বেশি ভয় সেই মেয়েটিকেই, তার প্রতি হৃদয়-দুর্বলতার কথা তো কখনও প্রকাশ করিনি, সে-ও করেনি, শুধু আলাদা চোখে তাকায় মাত্র, যদি আমার এরকম প্রগলভতা দেখে সে রাগ করে? কয়েক মাস পরে একটি উপায় মাথায় এল। আমাদের বাড়িতে একটি খবরের কাগজ ছাড়া অন্য পত্র-পত্রিকা রাখা হয় না, ওদের বাড়িতে 'দেশ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা দেখেছি। সেই পত্রিকায় গদ্য রচনাগুলির তলায় মাপ মতন পদ্য ছাপা হয়, অপর্ণা সেগুলিও পড়ে। কারা লেখে ওই সব পদ্য? পত্রিকাটির ঠিকানা দেখে একদিন খামে

ভরে পাঠিয়ে দিলাম আমার সেই কবিতাটি, নাম দিলাম 'একটি চিঠি'। কবিতা রচনা করে কোনও রকম যশোকাঙ্ক্ষা তখনও আমার মস্তিষ্কে স্থান পায়নি, ওরকমভাবে ডাকে পাঠালে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতনামা কারও রচনা ছাপা হয় কি না, সে সম্পর্কেও আমার কোনও ধারণা ছিল না। সাময়িক উত্তেজনা প্রশমিত হলে সেটার কথা ভুলেই গেলাম। বেশ কয়েক মাস পরে আমার নামে একটি বড় খাম দিয়ে গেল পোস্টম্যান; তার মধ্যে একটি 'দেশ' পত্রিকা, এবং কিমাশ্চর্যম অতঃপরম, সূচিপত্রে জ্বলজ্বল করছে আমার নাম, কোনও একটি পৃষ্ঠার পাদদেশে অবিকৃতভাবে মুদ্রিত হয়েছে আমার সেই প্রেম-উচ্ছ্বাস! ছাপার অক্ষরে সেই প্রথম আমার নাম ও রচনার প্রকাশ।

যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা, সে কবিতাটি পড়লও বটে, যেহেতু আমি তাকে কিছুই বলিনি, তাই সে ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি যে সেটি আমার রচনা, আমাকে বলেছিল, দ্যাখো দ্যাখো, তোমার সঙ্গে নাম মিলে গেছে একজন নতুন কবির! শুধু ওইটুকুই, কবিতাটি ভালো না মন্দ, সে সম্পর্কে কোনও মন্তব্য নেই।

ছাপার অক্ষরে সেই স্বীকৃতি দেখে আমার বুক ধকধক করেনি, প্রবল উল্লাসে ফেটে পড়তে বা পাগলের মতন নাচতে ইচ্ছে করেনি। তবে, পত্রিকাটি হাতে পেয়ে আমার আবার কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয়েছিল। তত দিনে বন্দিদশা ঘুচে গেছে, টেনিসন পর্ব চুকে গেছে, অনুবাদের নামে ছলনা করার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, তবু যে লিখতে ইচ্ছে হল, তার কারণটি অতি সরল, একটি কবিতা ছাপা হলে একটি পত্রিকা বিনামূল্যে পাওয়া যায়। 'দেশ' পত্রিকায় সে সময় নবীন কবিদের জন্য সম্মান-দক্ষিণা চালু হয়নি, সে সব জানতামও না। একটি পত্রিকা পাওয়াই তো যথেষ্ট। আবার একটি পাঠালাম 'দেশ' পত্রিকায়, তখন 'অগ্রণী' নামে একটি মাসিক প্রকাশিত হত নিয়মিত, তাতে একটি কবিতা পাঠিয়ে পেয়ে গেলাম পত্রিকা। এমনকী আমার জীবনের চতুর্থ কবিতাটি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় পাঠাবার তিনদিনের মধ্যে মনোনয়ন পত্র পেয়ে হতবাক! তারপর থেকে যাকে বলে, এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় আমার বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র দীপক মজুমদার ছাড়া আর কেউই অকৃতকার্য হয়নি। অথচ দীপকই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। সে অনেক আগে থেকেই কবিতা লেখে ও ছাপা হয়, প্রবন্ধও লিখে ফেলেছে, সব সময় তার হাতে থাকে মোটা মোটা বই, বহু নাম-ডাকওয়ালা লেখকদের সঙ্গে তার ঘোরাফেরা, গোপাল হালদার বা বিনয় ঘোষের মতন যে সব সুদূরের মানুষদের আমি চোখেও দেখিনি, তাঁদের দীপক যথাক্রমে সম্বোধন করে গোপালদা ও বিনয়দা, শান্তিদেব ঘোষ নামক রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারক তার শান্তিমামা। দীপক ম্যাট্রিকে ফেল করেছিল বলে কেউ তার প্রতি সামান্য অবজ্ঞা বা করুণা দেখায়নি, বরং তা সত্ত্বেও সে সকলের চোখে হীরো। কারণ, দীপক-এর মধ্যে একবার জেল খেটেছে! সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি থেকে নানা রকম প্রতিরোধ আন্দোলন চলছে, স্কুলের ছাত্র হয়েও দীপক তারই কোনও একটিতে সামিল হয়ে জেলে চলে যায়। সেটা আমাদের কাছে রীতিমতো ঈর্ষণীয় ব্যাপার! কত বড় বড় নেতার সঙ্গে জেলের মধ্যে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে তার। এ রকম একটা বিরাট কাজ যে করেছে তার পক্ষে ম্যাট্রিক পরীক্ষা নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার! প্রায় কিছু না পড়েই সে পরীক্ষায় বসেছিল, যেন খেলাচ্ছলে, পাশ না করলেও কিছু আসে যায় না। রাজনৈতিক বন্দিদের বিশেষ মর্যাদা। জেল থেকে বেরোবার সময় তার হাতে নতুন সুটকেস ও চমৎকার একটি কম্বল, আমরা তার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিলাম। দীপক মেধাবী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও বাকপটু। কিন্তু স্কুলের পড়ায় তার একেবারেই মন ছিল না, প্রথমবার ম্যাট্রিক পাশ না করেও সে দমেনি, পরের বছরও ফেল করেছিল। দীপক স্কুলে আমার সহপাঠী হলেও পরে দু' বছর পিছিয়ে যায়। আসলে স্কুলপাঠ্য বিষয় থেকে দীপক অনেকখানি এগিয়ে ছিল, অঙ্কটঙ্ক নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাতে চায়নি, পরবর্তীকালে কলেজে এসে কলা বিভাগে সে

সাবলীল হয়ে যায়।

অন্য বন্ধুরা যখন বিভিন্ন কলেজের ফর্ম আনার জন্য ব্যস্ত, তখন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল। বাবা বললেন যে আমার আর কলেজে পড়ার দরকার নেই, এখন চাকরির চেষ্টা করা দরকার, শর্টহ্যান্ড ও টাইপ রাইটিং শিখলে বরং কাজে দেবে। বাবা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন; ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন ভেতরে ভেতরে, সংসারের রাশ আর টানতে পারছিলেন না এবং অনেক দুঃখ থেকেই যে এই কথা বলেছিলেন, তা বোঝার মতন মানসিকতা তখন আমার ছিল না। সেই বয়েসের ছেলেরা নিজের কথাই বেশি ভাবে, পরিবারের লোকজনের চেয়ে বন্ধু-বান্ধবরা বেশি আপন হয়, বহির্বিশ্ব চুম্বকের মতন টানে। বন্ধুরা কলেজে পড়তে যাবে, আর আমি যাব চাকরি করতে? কলেজ মানেই তো স্বাধীনতা, তা থেকে আমি বঞ্চিত হব? স্কুলের শেষ দিক থেকেই আমি স্বপ্ন দেখতাম কলেজের। নিশ্চয়ই খুব কান্নাকাটি করেছিলাম এবং কাকুতিমিনতি করেছিলাম মায়ের কাছে। মা'র প্রশ্রয়ে বাবা শেষ পর্যন্ত কলেজে ভর্তি করাতে রাজি হলেন কিন্তু এক শর্তে, বিকেলবেলা শর্টহ্যান্ড ও টাইপ রাইটিংও শিখতে হবে, এবং যদি কোনও চাকরি জুটে যায়, তা হলে আর কলেজীয় পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়া হবে না, কারণ পড়াশুনো তো চাকরির জন্য। আমার ক্ষেত্রে যে কোনও চাকরি।

এর পর কলেজ নির্বাচনের প্রশ্ন। স্বাভাবিকভাবেই আমার প্রথম পছন্দ প্রেসিডেন্সি কলেজ। সে আবেদন এক বাক্যে নাকচ করে দেওয়া হল, কারণ সেখানে ছেলেরা মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে! প্রেসিডেন্সি কলেজের এই অযোগ্যতার কথা শুনে এখনকার ছেলেমেয়েরা হাসবে। আমি সে কলেজের ফর্মও এনে রেখেছিলাম, ভর্তির অন্য কোনও অসুবিধেই ছিল না। তখনকার দিনে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত কম ছিল, তা বোঝাবার জন্য একটি তথ্যই যথেষ্ট, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল ছাপা হত খবরের কাগজে! প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া অনেক বন্ধু ও পরিচিতজন এখনও খানিকটা গর্বের সুরে কথা বলে, আমি যে কেন সে কলেজে পড়তে পারিনি, সে কারণটা জানাতে পারি না। বাড়ির খুব কাছে স্কটিশচার্চ কলেজ, সে কলেজেরও ওই একই দোষ। শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ব্যবস্থা হল, যার ধার কাছ দিয়েও মেয়েরা হাঁটে না।

এখনকার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে অভিভাবকরা আগে থেকেই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে রাখেন, ছেলে-মেয়েদেরও নিজস্ব মতামত গড়ে ওঠে। আমার শিক্ষার ব্যাপারে বাবা কোনও পরিকল্পনা করেননি, আমার মতামতেরও মূল্য দেননি। সেজন্য তিনি আমার ছাত্রজীবন নষ্ট করে দিয়েছেন। আমার কলেজ জীবন পুরোপুরি ব্যর্থ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় আমার ইংরেজি ও বাংলায় বেশ ভালো নম্বর ছিল, অঙ্কে বেশ কম, অর্থাৎ কলা বিভাগই আমার পক্ষে স্বাভাবিক পছন্দ হওয়া উচিত, কিন্তু বাবা আমাকে ভর্তি করে দিলেন বিজ্ঞানে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও অঙ্ক, চতুর্থ বিষয় জীব-উদ্ভিদ বিদ্যা। প্রথম তিনটিতে প্রচুর অঙ্ক লাগে। সিটি, বিদ্যাসাগর কলেজের তুলনায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে নাকি বিজ্ঞান শাখাটি ভালো পড়ানো হয়। একেই পয়সার টানাটানি, গ্রে স্ট্রিট থেকে শিয়ালদার কাছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে যেতে গেলে যে দু'বার বাস-ট্রাম বদল করতে হয়, তা বাবা খেয়ালই করেননি আগে।

বন্ধুরা নানা কলেজে ছড়িয়ে পড়ল, শুধু আশু, সম্পন্ন পরিবারের ছেলে, বাড়ির দিক থেকে কোনও আপত্তি নেই, সে প্রেসিডেন্সি-স্কটিশে পড়তে পারত অনায়াসে, তবু সেও সুরেন্দ্রনাথে ভর্তি হল শুধু আমার সঙ্গ ছাড়বে না বলে। আমার জন্য আশু'রও পড়াশুনোর ক্ষতি হয়েছে। আমার সঙ্গে রোজ কলেজে যাবে, এক সঙ্গে ফিরবে, এই ছিল তার ইচ্ছে. সে ব্যাপারেও আমি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আমাকে সুরেন্দ্রনাথ পরিত্যাগ করতে হয় এক বিচিত্র কারণে।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের এক বছরে আমার দুটি সুখকর অভিজ্ঞতা আছে। সেখানকার

পড়াশুনোর পরিবেশ মোটেই সুবিধের মনে হয়নি, একগাদা ছাত্র, কে কতটা ফাঁকি দিচ্ছে তা নিয়ে কর্তৃপক্ষের কোনও মাথাব্যথা ছিল না, যেমন চলছে চলুক ধরনের মনোভাব প্রকট। সব সময় হই হই রই রই। এরই মধ্যে একদিন এলেন সত্যেন বসু, সমস্ত বিজ্ঞানের ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দিলেন। সুদর্শন পুরুষ, মাথার চুল ধপধপে সাদা, সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষায় 'প্রসন্নতা ব্যাঞ্জক ওষ্ঠ', বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন পুরোপুরি বাংলায়, একটি ইংরিজি শব্দও ব্যবহার করেননি। এখন অনেকে সত্যেন বসুকে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি বিজ্ঞানী বলছেন, কিন্তু তাঁরা এবং এখনকার বিজ্ঞানীরাও সত্যেন্দ্রনাথের বাংলা ভাষাপ্রীতির কথা উল্লেখ করেন না। আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে যুক্ত হবার মতন তত্ত্ব যিনি অবিষ্কার করেছেন, তিনি বাংলা ভাষা নিয়ে গর্ব বোধ করতেন কত!

আমাদের সময় কলেজের প্রথম দু' বছর বিজ্ঞানে আই এস সি, পরের দু' বছর বি এসসি, কলা বিভাগে যেমন আই এ এবং বি এ। বিজ্ঞান নিলেও অবশ্য ইংরিজি ও বাংলা পড়তে ও পাশ করতে হত। ওই দুই ক্লাসেই ছিল আমার বেশি আকর্ষণ, বাংলা ক্লাসে আমি গোপনে একটি মজা করতাম। অধ্যাপকরা তখন প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে রচনা লিখতে দিতেন, আমাদের লিখতে হত সাধু বাংলায়; তখনও স্কুল-কলেজে চলতি বাংলা গ্রাহ্য হয়নি। সেই সব রচনার ফাঁকে ফাঁকে যে যত বড় বড় লেখকদের উদ্ধৃতি দিতে পারে, তার তত কৃতিত্ব। আট-দশ ছত্র পর পরই, 'তাই তো কবি বলিয়াছেন' লিখে কোনও কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ছিটিয়ে দিতে হয়। আমি এই সব রচনায় 'তাই তো কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন'-এর পর যে পঙ্‌ক্তিগুলি দিতাম, সে সব কবিতা রবীন্দ্রনাথ কস্মিনকালেও লেখেননি। অবিকল রাবীন্দ্রিক ভাষায় ছন্দ-মিল দিয়ে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি বানানো আমার পক্ষে নস্যি, অনর্গল মুখে মুখে বানাতে পারি। আমি দেখতে চাইতাম, কোনও অধ্যাপক আমার এই জালিয়াতি ধরতে পারেন কি না। একজনও ধরতে পারেননি। অগাধ সমুদ্রের মতন রবীন্দ্রসাহিত্যে কোথাও যে এ রকম পঙ্‌ক্তি নেই, তা ক'জন জোর দিয়ে বলতে পারে?

অঙ্কের তাড়নায় আমি ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি সম্পর্কে ক্রমশ আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলাম, কিন্তু বায়োলজি-বোটানির ক্লাস ভালো লাগত, বিশেষত প্র্যাকটিকাল। গাছের পাতা মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে দেখার একটা রোমাঞ্চ আছে। কিছু পোকা ও প্রাণী ব্যবচ্ছেদও করতে হত। সেজন্য বায়োলজিক্যাল বক্স কিনতে হয়েছিল, তা নিয়ে যেতাম কলেজে। জ্যান্ত আরশোলা ও ব্যাঙ কেটেছি অনেক। বড় বড় কোলা ব্যাঙ, ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে তারপর পেট চিরে দেখা। সবচেয়ে আনন্দ হত গলদা চিংড়ি ব্যবচ্ছেদের দিনে। চিংড়ি মাছের দেহতত্ত্ব খুব বিশেষ না জানলেও চলে, এক বন্ধু ফিসফিস করে কানে কানে বলেছিল, কোনও রকম রি-এজেন্ট লাগাস না, মাছটা ফেলিস না। তখন বড় বড় চিংড়ি মাছও নিশ্চিত এত দামি ছিল না, তাই দেওয়া হত প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে, এখনকার ছেলে-মেয়েরা বোধহয় পায় না। আমরা যে যার মাছ কাগজে মুড়ে নিয়ে আসতাম কাছাকাছি এক রেস্তোরাঁয়, সেখানকার মালিককে বলতাম, ভাজা করে দিন তো রতনদা? আমরা মহানন্দে সেই চিংড়ি মাছ ভাজা খেতাম, আর কলা বিভাগের ছেলেরা তাকিয়ে থাকত হ্যাংলার মতন। তখন অবশ্য বুঝিনি যে ওরকম বড় সাইজের কোলা ব্যাঙগুলোও ফেলে দেওয়া উচিত হয়নি। ব্যাঙের ঠ্যাংও দিব্যি ভাজা খাওয়া যায় এবং অতি সুখাদ্য। ব্যাঙের ঠ্যাং ভাজা খেয়েছি অনেক পরে।

ষোলো

উনিশ শো পঞ্চাশ সালে পুনরপি দাঙ্গা শুরু হয় পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানে। এবারে উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের সংখ্যা অনেক বেশি। এক সঙ্গে এত মানুষের ঢল নেমে আসে যে তা সামলানো সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ত্রাণ শিবিরের সংখ্যা যৎসামান্য, লক্ষ লক্ষ পরিবার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় উন্মুক্ত আকাশের নীচে, গাছতলায়, রেল স্টেশনে। দেশ ভাগের প্রথম তিন বছরের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় বাষট্টি লক্ষ। এই বাংলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে অনেক জায়গায় দাঙ্গা হয়েছে, অনেক মুসলমান এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে, তবে তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম।'

শিয়ালদা স্টেশন তখন উদ্বাস্তুদের অধিকারে চলে গেছে, কোনও প্ল্যাটফর্মে একটুও পা ফেলার জায়গা নেই, চতুর্দিক থিক থিক করছে নারী-পুরুষ, বুড়ো-বুড়ি। শিশুরা প্রাকৃতিক ক্রিয়া-কর্ম সারতে বাধ্য হয় প্রকাশ্যেই, তাদের আহার-নিদ্রা ও অন্যান্য কাজ রেলের নিত্যযাত্রীদের চোখের সামনেই চলে। তাদের প্রায় গায়ের ওপর পা ফেলে নিত্যযাত্রীরা দৌড়য়, আবর্জনা ও দুর্গন্ধে সুস্থ মানুষেরও অসুস্থ হয়ে পড়ার মতো অবস্থা।

সেই সময় অনেক স্কুল-কলেজের ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক হয়ে উদ্বাস্তুদের কিছু সাহায্য করার কাজে যোগ দিয়েছিল, আমিও ছিলাম সেই দলে। রেড ক্রশ থেকে গুঁড়ো দুধ আর রুটি বিলি করার ব্যবস্থা হয়েছিল, সে-দায়িত্ব স্বেচ্ছাসেবকদের। কাজটি কিছুটা বিপজ্জনকও বটে। উদ্বাস্তুদের সংখ্যার তুলনায় সাহায্যের পরিমাণ কখনও যথেষ্ট নয়। আমরা দুধের বালতি কিংবা রুটি ভর্তি ঝুড়ি নিয়ে এগোলেই ক্ষুধার্ত ও মরিয়া উদ্বাস্তুরা ঝাঁপিয়ে পড়ে কাড়াকাড়ি করে, তাতে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক আহতও হয়েছে।

আমি গিয়েছিলাম বয়েস স্কাউটদের সদস্য হিসেবে, খাঁকি হাফ প্যান্ট ও সাদা হাফ শার্ট পরা। ওই অসহায় মানুষগুলির মধ্যে রুটি বিলি করতে করতে আমার এক বিচিত্র অনুভূতি হত। আমি স্বেচ্ছাসেবক হয়েছি পশ্চিমবাংলার নাগরিকদের পক্ষ থেকে, কিন্তু আমি নিজেই তো উদ্বাস্তু। একটু এদিক ওদিকে হলে আমার স্থানও ওদের মধ্যেই হতে পারত। ভাগ্যিস আমার বাবা স্বাধীনতার আগে থেকেই কলকাতায় চাকরি করতেন, এখানে আমাদের মাথা গোঁজার মতন একটা আস্তানা আছে, নইলে আমাদেরও হয়তো শুতে হত এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। মনে প্রশ্ন জাগত, এই অসহায় মানুষগুলির মধ্যে আমাদের কোনও আত্মীয়-স্বজন কিংবা গ্রামের মানুষ কি থাকতে পারে? সকলকে তো চিনি না। যারা আমাকে খুব ছোট দেখেছে, তারাও আমার সদ্য গোঁফ গজানো মুখ ও লম্বা ঠ্যাং দেখে চিনতে পারবে না। একটি বুড়ি একেবারে হাত জড়িয়ে ধরে ভিক্ষে চাইত, মনে হয় সে চোখে ভালো দেখে না, হঠাৎ আমার মনে হতো, এই কি আমার সেই ধাই-মা, যার নাম ছিল বোঁচার মা? স্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে সেই মুখটি জ্বলজ্বল করে ওঠে। সেই মুখের সঙ্গে যেন এই মুখের খুব মিল। তোমার নাম কী, তোমার নাম কী— বারবার জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাই না, সে একেবারেই বধির হয়ে গেছে। আমার জন্মের পর গোলাপ জল দিয়ে যে-ধাইমা আমার চোখ ফুটিয়েছিল, তাকে আমি চিনতে পারছি না? সত্যিই সে আমার ধাই মা হলেও তাকে আমি আর কী সাহায্য করতে পারতাম!

শরণার্থীদের সংখ্যা আরও বাড়তেই থাকে। উনিশ শো পঞ্চাশ সালের এপ্রিল মাসে

জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের বৈঠকের পর দু'দেশের সংখ্যালঘুদের বিষয়ে একটি চুক্তি হয়। চুক্তির বয়ান শুরুতে বেশ ভালো, দুই নেতা ঘোষণা করলেন যে, দুটি রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা ধর্মনির্বিশেষে নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার পাবে, তাদের জীবন, সম্পত্তি ও সংস্কৃতি রক্ষার আশ্বাস দেওয়া হয়, মত প্রকাশের ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হল। শুধু তাই নয়, দেশত্যাগী উদ্বাস্তুরা ইচ্ছে করলে আবার ফিরে গিয়ে পৈতৃক ভিটে বাড়ি ও সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে, এমন ব্যবস্থাও করা হবে।

কিন্তু চুক্তি হলেই যে তা কার্যকর হবে, তার কি কোনও মানে আছে? পাকিস্তান এই চুক্তির তোয়াক্কা করেনি, বরং সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক কিছু কিছু আইন প্রণয়ন করে ইস্লামিক রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগোচ্ছে। প্রশাসনও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা রক্ষার দিকে উদাসীন। কোনও হিন্দু উদ্বাস্তুই পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে ফেলে যাওয়া সম্পত্তির অধিকার চাইতে সাহস পায়নি। পাকিস্তানের কট্টর সমর্থকরা সাধারণ মানুষের মধ্যে এরকম একটা ধারণার সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে, হিন্দুদের কিছুটা ভয় দেখালেই তারা বাড়ি-জমি ফেলে পালাবে আর সেগুলো দখল করে নেওয়া যাবে। ভারত থেকে মুসলমানদের দেশত্যাগের স্রোত এই চুক্তির ফলে অনেক কমে যায়, কিছু কিছু মুসলমান উদ্বাস্তু অসম ও পশ্চিমবাংলায় ফিরেও আসে। ভারত যে এই চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে তা নয়, কোথাও কোথাও মুসলমানদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু ভারতে প্রথম থেকেই একটা গণতান্ত্রিক বাতাবরণ ছিল এবং বিভিন্ন নাগরিক কমিটি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অংশ নিয়েছে। একান্ন সালের জনগণনায় দেখা যায়, পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার প্রায় কুড়ি শতাংশ মুসলমান, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের সংখ্যা কমে গেছে অনেক।

নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের ঢল অব্যাহত থাকায় দিল্লির লোকসভায় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবাংলার মধ্যে হিন্দু-মুসলিম লোক বিনিময়ের প্রস্তাব ওঠে। নেহরু সে প্রস্তাব উড়িয়ে দেন, এটা তাঁর মহৎ আদর্শের বিরোধী, তিনি টু নেশান থিয়োরিতে বিশ্বাস করেন না। যদিও দুই পঞ্জাবের লোক বিনিময়ের সময় নেহরু তাঁর এই মহৎ আদর্শ কাবার্ডে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

বহু বছর পর, দুর থেকে এই সব ঘটনা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, কীভাবে একটু একটু করে ইতিহাসের বদল ঘটছে। এক কালের সমৃদ্ধ পশ্চিমবাংলা এই উদ্বাস্তু সমস্যার জন্যই যে ধ্বংসের পথে যাচ্ছে, সে-সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নন, গত পঞ্চাশ বছর ধরে এই উদ্বাস্তু সমস্যাই পশ্চিমবাংলাকে খাঁক করেছে।

রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, আধপেটা খেয়ে, পুষ্টির অভাবে, চিকিৎসায় বঞ্চিত হয়ে হাজার হাজার উদ্বাস্তু প্রাণ দিচ্ছে প্রতিদিন। যুদ্ধ কিংবা রাষ্ট্র বিপ্লব নয়, দুর্ভিক্ষ নয়, এমনিই মরছে মানুষ। এরই মধ্যে আড়কাঠিরা একটু স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে পতিতালয়ে, শিশু কেনা-বেচাও চলছে। সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে উদ্বাস্তুরা ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তারা শুরু করল জবর দখল। কলকাতায় আশেপাশে সরকারি জমি, যে-কোন খালি জমি ও ধনীদের বাগান বাড়িগুলিতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তে লাগল এবং মাটি কামড়ে পড়ে রইল। হাত ছাড়া হয়ে গেল এদিককার অনেক মানুষের সম্পত্তি, তছনছ হয়ে গেল বহু প্রমোদ ভবন। এই জবর দখল কাজটি অবৈধ হলেও তখন উদ্বাস্তুদের বাধা দেবার শক্তি সরকারেরও নেই।

এই সময় থেকে পশ্চিমবাংলার অনেকের মনে শরণার্থীদের সম্পর্কে অবজ্ঞা ও ঘৃণা বাড়তে থাকে। এরা কেন আসতে বাধ্য হচ্ছে কিংবা কত অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছে, সেগুলো তলিয়ে না-বুঝে এরা কত সমস্যার সৃষ্টি করছে, সেদিকেই লোকে বেশি জোর দেয়। রেফিউজি শব্দটাই তখন গালাগালি হয়ে যায়, তার সঙ্গে যোগ হয় হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা ইত্যাদি।

আমার সামনেই যখন পরিচিত কেউ বলত, 'হারামজাদা রিফিউজিরা', আমার গায়ে তা ঠিক চাবুকের মতন লাগত। রিফিউজিদের প্রতি একাত্মতা বোধ আমার মন থেকে কখনও মুছে যায়নি।

আমার বন্ধু আশুদের একটি বিশাল ও অতি সুদৃশ্য বাগানবাড়ি ছিল নাগেরবাজার-ষাটগাছি অঞ্চলে। তার মধ্যে কত রকম গাছপালা। দুটি পুকুর, একটি জালঘেরা অর্কিড হাউস, মূল বাড়িটিতে ঝাড়লণ্ঠন শোভিত নাচঘর। বাচ্চা বয়েসে আমরা বেশ কয়েকবার সেখানে পিকনিক করতে গেছি, কত ডাব, কত রকম ফল খেয়েছি। তখন অবশ্য বাবু কালচারের দিন শেষ হয়ে এসেছে, বাগান বাড়িতে মোচ্ছব করার সামর্থ্য ও সময় আর অনেকেরই নেই, একটি মাত্র দারোয়ান সে বাড়ি পাহারা দেয়। ওই অঞ্চলের অন্যান্য বাগান বাড়িগুলির মতন আশুদের বাড়িটিতেও জোর করে ঢুকে পড়ে শরণার্থীরা। কোণঠাসা বেড়ালের মতন তারা এমনই হিংস্র হয়ে উঠেছে, যে বাড়ির মালিকরা আর সে সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সাহস পায়নি। জবর দখলকারীরা বাগানটা তছনছ করে দেয়, বহু গাছ কেটে কুঁড়ে ঘর বানায়, অর্কিড হাউসের দুর্লভ নমুনাগুলি নির্মূল হয়ে যায়, নাচঘর ভেঙে চুরে হয় রান্নাঘর। এই নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনে আশুদের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল।

এই ঘটনায় আমারও মন দ্বিধান্বিত হয়ে যায়। অমন চমৎকার একটি বাড়ি, সবুজ ছায়া-ঘেরা বাগান ধ্বংস হয়ে গেল, এ জন্য কষ্ট হয়। আমার বন্ধুদের অমন একটা মূল্যবান জমি-বাড়ি বেহাত হয়ে গেল, তাতে সমবেদনা আসাও স্বাভাবিক। অপর পক্ষে, ওইসব বাড়ি ও জমি, প্রায় সারা বছর খালি পড়ে থাকে, বড়জোর দু'একদিন পিকনিক হয়। অত বড় বড় সব জায়গা খালি পড়ে থাকবে, আর রিফিউজিরা উন্মুক্ত আকাশের তলায় থেকে পোকা-মাকড়ের মতন মরবে? তারা তো স্বেচ্ছায় নিজেদের ভিটে-মাটি ছেড়ে আসেনি। দেশ বিভাগের শর্ত মেনে নিয়ে যারা স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছে, সেই সব আহাম্মক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি এদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিতে না পারে, তবে তারা তো নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নিতে বাধ্য হবেই। এখানে বাঁচা-মরার প্রশ্ন, এখানে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অন্য রকম। বাড়িগুলো জবরদখল করছে, বেশ করছে!

এক কালের প্রমোদ উদ্যানভবনগুলির নাম হয়ে গেল রিফিউজি কলোনি। কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণে, এই রকম কলোনি অজস্র। অনেক বছর পর ওই নাগেরবাজার-ষাটগাছি অঞ্চলে আমরা একটা ভাড়াবাড়িতে থেকেছি। সেই বাড়ি থেকে যাওয়া-আসার পথে আশুদের বাগানবাড়িটির রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছি, চেনা ছবিটি মুছে গেছে, ভেতরে শুধু ছোট ছোট ঘর। সেই কলোনি এবং সেখানকার মানুষজনদের মধ্যেই 'অর্জুন' উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের খুঁজে পেয়েছিলাম।

পশ্চিমবাংলায় আমরা ভূমিহীন; তখনকার জমি দখলের হিড়িকে আমাদেরও কিছুটা ভূমি পাওয়ার সুযোগ এসেছিল। যাদবপুরের দিকে অনেকখানি জমি দখল করে যে-কলোনিটি গড়ে উঠেছিল, সেখানে ছিল আমাদের মামাবাড়ির গ্রামের কিছু মানুষ। তাদের সঙ্গে আমার বাবার যোগাযোগ হয়। তারা সহৃদয়ভাবে আমাদের জন্য কিছুটা জমি বরাদ্দ করার প্রস্তাব দেয়, একজন লেখাপড়া জানা, কলকাতা শহর ও সরকারের লোকজনদের চেনে এমন কারওকে প্রতিবেশী পেলে তাদেরও সুবিধে। তিন কাঠার মতন জমি, বাবা দু'-একবার গিয়ে দেখেও এলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই জমি নেওয়া হয়নি নৈতিক কারণে। প্রকৃত অর্থে আমরা খাঁটি রিফিউজি নই, আমরা পায়ে হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে শরণার্থী হইনি। আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে, আরও অসংখ্য উদ্বাস্তু এখনও কোথাও আশ্রয় পায়নি, সুতরাং আমাদের জমি পাওয়া শুধু প্রকট স্বার্থপরতা নয়, তঞ্চকতা বলা যেতে পারে। বাবা অসম্মত হয়ে আত্মসম্মান বজায় রেখেছিলেন। আমরা ভাড়াটে হয়েই রইলাম, যদিও এই সময় থেকেই বাড়ি ভাড়া হু হু করে

বাড়তে থাকে, বাড়ির মালিকরা পুরনো, অল্প টাকার ভাড়াটেদের উৎখাত করার জন্য তৎপর হয়। গ্রে স্ট্রিটের যে-বাড়িতে আমরা ভাড়াটে ছিলাম, তার মালিক পরিবার থাকতেন দোতলায়, তাঁদের সঙ্গে বেশ ভাব ছিল, পান্নালাল নামে সমবয়েসি একটি ছেলে ছিল আমার বন্ধু, কিন্তু এখান থেকে আমাদের বিদায় করে দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি হয়, সম্পর্কে চিড় ধরে। যুদ্ধের আগে বাড়িওয়ালারা ভাড়াটেদের ডেকে ডেকে আনতেন, স্বাধীনতার পর ভাড়ার অতিরিক্ত সেলামি নামে একটা থোক টাকা দেওয়ার রীতি চালু হয়, শুরু হয় কালো টাকার খেলা।

পশ্চিমবাংলায় আকস্মিক এত জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে বিপর্যস্ত হয়ে যায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা। সেই বিপর্যয় আজও অব্যাহত। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় কিছু কিছু স্কুল ও কলেজ খোলা হয়, প্রয়োজনের তুলনায় তা অবশ্য অপ্রতুল। সেরকমই একটা কলেজ খোলা হল দমদম-মতিঝিলে। এই কলেজটি আমার জীবনের একটি বাঁক ঘুরিয়ে দিল বলা যেতে পারে।

আমার দাদু সুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মতিঝিলের একজন বিশিষ্ট নাগরিক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক, কয়েকটি অঙ্ক পাঠ্য পুস্তকের রচয়িতা, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তিনি ওই কলেজের পরিচালনা সমিতির সভাপতি কিংবা হোমড়া-চোমড়া কিছু হয়েছিলেন। নতুন কলেজে প্রথম প্রথম ছাত্র ভর্তি হতে চায় না, বিশেষত বিজ্ঞান বিভাগে। ছাত্র ধরে ধরে আনতে হয়। আমার দাদু আমার বাবাকে প্রস্তাব দিলেন যে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ছেড়ে আমি যদি দমদম-মতিঝিল কলেজে এসে ভর্তি হই, তা হলে আমার অর্ধ বেতনের ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে। বাবা সেই প্রলোভনে রাজি হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় বর্ষে উঠতে-না-উঠতেই আমার কলেজ পরিবর্তন হল। আমার অভিভাবকরা এ কাজটা ভালো করেননি, একটি ছেলের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আমার বন্ধু আশু তো সহপাঠী ছিলই, অন্যান্য কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গেও বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। সেখান থেকে আমাকে উৎপাটিত করে নিয়ে আসা হল এক সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশে। মফঃস্বলের ছেলেরা কলকাতার কলেজে পড়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে, আমাকে কলকাতার কলেজ ছেড়ে প্রতিদিন যেতে হবে মফঃস্বলে, এ রকম অদ্ভুত কাণ্ডের জন্য অনেকেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করত আমাকে। হাফ-ফ্রি'র প্রস্তাবটাও হাস্যকর, পেনি ওয়াইজ পাউন্ড ফুলিশ যাকে বলে, সারা মাসের বাস ভাড়া কলেজের অর্ধ বেতনের চেয়ে বেশি! দুপুরে আমাকে যেতে হবে সুদূর উত্তরে, সন্ধেবেলা টিউশনি করতে যাই সুদূর দক্ষিণ কলকাতায়, বাসে-ট্রামেই যদি এত সময় কাটাতে হয় তা হলে পড়াশুনো করব কখন? এর ওপর আবার চাকরি-যোগ্যতা অর্জন করার জন্য আমাকে বিকেলবেলা একটা শর্টহ্যান্ড-টাইপ রাইটিং স্কুলে যেতে হত। হাতিবাগান বাজারের ওপরে সেই স্কুলে কয়েকদিন গিয়েই আমার আক্কেল গুড়ুম হওয়ার মতন অবস্থা। যাঁরা শর্টহ্যান্ড জানেন, তাঁরা আমার নমস্য। কয়েকটা আঁকা বাঁকা দাগ থেকে কোনও ভাষা উদ্ধার করার জন্য যে প্রতিভা লাগে, তা আমার একেবারেই নেই, শর্টহ্যান্ডে আমি মন বসাতে পারিনি। টাইপিং কিছুটা শিখেছিলাম, তাও দশ আঙুলে নয়, দু'তিনটে আঙুলে, অর্থাৎ শ্লথ গতি। সেই কারণেই কোনও সওদাগরি অফিসে স্টেনো-টাইপিস্টের চাকরি পাবার সুযোগ থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি। (এখন যেগুলিকে প্রাইভেট ফার্ম বলে, তখন সেগুলিকে মার্চেন্ট অফিস বা সওদাগরি অফিস নামে চিহ্নিত করা হত।)

এ রকম অবাস্তব ও অন্যায়ভাবে কলেজ বদল কী এখনকার ছেলেমেয়েরা নিশ্চই মেনে নেবে না, বিদ্রোহ করবে। আমি মেনে নিয়েছিলাম কেন? আমি কি শান্তশিষ্ট, অতি সুবোধ বালক ছিলাম? কলেজে এসেই অনেক ছেলে বিড়ি-সিগারেট টানতে শুরু করে। আমি গরিবের ছেলে এবং কিছুটা আদর্শবাদী, তাই ওসব কখনও ছুঁইনি। যে কোনও নেশার দ্রব্যকে ঘৃণা করতাম, পরিবারের কারওর নির্দেশের বিরুদ্ধতা তো দূরের কথা, উঁচু গলায় কথাও বলিনি, কিন্তু ভেতরে

ভেতরে ফুঁসতাম নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, তখন তথাকথিত ভালো ছেলেই ছিলাম বলা যেতে পারে, দু'এক বছরের মধ্যেই সেই ভালোত্ব খসে গিয়ে আমার আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়ার সময় একদিনও কলেজ কামাই করিনি, শিয়ালদা থেকে ফেরার পথে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে বসতাম কিছুক্ষণ। আমার তুলনায় আশু হাতখরচ অনেক বেশি পায়, সে খাওয়াত কফি, আর কোনওদিন একটা মাটন ওমলেট খেলে মনে হত জীবনটা ধন্য হয়ে গেছে। কফি হাউসের পরিবেশ দিন দিন ভালো লাগতে শুরু করে, কিছু কিছু বিখ্যাত লোকের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি। আমার দু'চারটে কবিতা ততদিনে ছাপা হয়েছে বটে, কিন্তু কোনও পত্রিকাগোষ্ঠী বা লেখকদলের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, আমাকে কেউ চেনে না, আমিও কারওকে চিনি না। একদিন কেউ আঙুল তুলে এক দীর্ঘকায়, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল ও প্রসন্ন হাস্যময় যুবা পুরুষকে দেখিয়ে বলল, উনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শুনেই তো আমার দম বন্ধ হবার মতন অবস্থা! আর একদিন কফি হাউসের নীচের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে নিয়ে একজন গাঁট্টাগোট্টা ব্যক্তি হেঁটে যাচ্ছেন, কেউ বলল, এই তো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ তো আমার স্বপ্নের মানুষ। ইচ্ছে হয়েছিল, ছুটে গিয়ে প্রণাম করি, চক্ষুলজ্জায় যেতে পারিনি, তাঁকে আর কোনওদিনই প্রণাম করা হয়নি।

তখন বাংলার ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়েরই প্রাধান্য। তাঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ ও মানিক দীর্ঘজীবী হননি। যতদূর মনে পড়ে, নাট্যকার জর্জ বার্ণাড শ এবং বিভূতিভূষণ একই দিনে বা দু'-একদিন আগে পরে মারা যান। জর্জ বার্ণাড শ-এর তখন এমনই জনপ্রিয়তা, এমনকী বাংলাতেও, যে তাঁর শোক সংবাদ ও জীবনীই খবরের কাগজে প্রাধান্য পেয়েছিল, বিভূতিভূষণের প্রস্থান তেমন মনোযোগই পায়নি। তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলারও সুযোগ হয়নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দু'-তিনবার মাত্র দেখেছি 'পরিচয়' পত্রিকার দপ্তরে। আমি তাঁর খুবই ভক্ত ছিলাম, তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্বের (অর্থাৎ যখন থেকে তিনি ঘোষিত সাম্যবাদী) রচনাগুলি নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক ছিল, কফি হাউসের তরুণ লেখকদের মধ্যে প্রবল বাদানুবাদের মধ্যে অনেকেরই মত ছিল, দ্বিতীয় পর্বে তার শিল্পী-সত্তা চাপা পড়ে যাচ্ছে, আমি ছিলাম এর বিরোধী, আমি তাঁর প্রতিটি রচনারই মুগ্ধ পাঠক। আমার বন্ধু দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পরে যে 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিল) সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে মতভেদ হত, কিন্তু এই বিষয়ে ছিলাম দু'জনেই সমমত।

'পরিচয়' দফতরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বচক্ষে দেখেছি বটে, কিন্তু বসে থাকতাম পেছনের সারিতে, কথা বলা হয়নি। এই তেজস্বী ও অহংকারী মানুষটি তখন প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। মনে আছে, কেউ একবার কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছিল, মানিকবাবু, চা খাবেন? তিনি বেশ রাগের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, না! তারপর সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে বলেছিলেন, তোমরাও আর চা খেয়ো না! সন্ধের পর চা খেলে লিভার খারাপ হয়!

তারাশঙ্করের সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে। সে প্রসঙ্গ অন্যত্র লিখেছি। এঁদের ঠিক পরবর্তী লেখক যাঁরা, যেমন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, ননী ভৌমিক, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ, তাঁরা ছিলেন অনেকটাই আমাদের কাছের মানুষ।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ প্রসঙ্গে একদিনের কথা বিশেষ স্মরণীয়। বিজ্ঞানের সমস্ত ছাত্রদের একটি সমবেত ক্লাসে একদিন হঠাৎ বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি যে কত বড় বিজ্ঞানী, সে সম্পর্কে তখন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। পরে শুনেছি, আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর থিয়োরি যুক্ত হওয়ার কৃতিত্বই শুধু নয়, তাঁর তত্ত্ব নিয়ে এখনও পৃথিবীতে গবেষণা চলেছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনি যে নোবেল পুরস্কার পাননি, সেটা নোবেল কমিটিরই ব্যর্থতা ও লজ্জার কথা।

মাথা ভর্তি ধপধপে সাধা চুল, সৌম্য, সহাস্য মুখ, তিনি একঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন পদার্থ বিজ্ঞানের

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ে, এবং কী আশ্চর্য, সে বক্তৃতায় একবারও একটিও ইংরিজি শব্দ উচ্চারণ করলেন না!

যখনই কেউ বলে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা কিংবা উচ্চশিক্ষা সম্ভব নয়, তখনই আমার সত্যেন বসুর সেই বক্তৃতার কথা মনে পড়ে।

কলেজ বদলের ব্যাপারে বাবা কিংবা দাদু আমার মতামত জানতে চাননি, নতুন জায়গায় আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারিনি। ছাত্রদের মধ্যে যারা প্রথম বর্ষ থেকে দ্বিতীয় বর্ষে উঠেছে, তারা সবাই পরস্পরকে চেনে, একমাত্র আমিই বহিরাগত। বহিরাগতকে কেউ সহজে ঘনিষ্ঠ মহলে নিতে চায় না, ক্লাসের বাইরে ছেলেরা এক এক জায়গায় জটলা করে গল্পে মেতে থাকে, আমি একা একা শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াই। নিজে থেকে যেচে গিয়ে আলাপ পরিচয় করার মতন স্বভাবও যে আমার নয়! বন্ধুদের মধ্যে আমি বাক্যবাগীশ, অচেনা জায়গায় মুখচোরা।

এর ফলে যা হবার তাই হল, আমি কলেজ ফাঁকি দিতে শুরু করলাম। কলেজে না গেলে বাসভাড়া বেঁচে যায়, সেই পয়সায় বসা যায় কফি হাউসে। দীপক মজুমদার যদিও তখনও স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি, কিন্তু বইপাড়া ও কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে সে নিয়মিত ঘোরাফেরা করে। বিকেলের দিকে কফি হাউসে গেলে অন্য চেনা কেউ না থাকুক, দীপক থাকবেই। কবিতা রচনার সূত্রে দীপকের সঙ্গেই তখন আমার হৃদ্যতা সবচেয়ে বেশি। কত মানুষকে সে চেনে! আমাদের বন্ধুদের বৃত্তে দীপকের কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে জোরালো, এবং সে তখনই পাকাপাকি কবি, আমি শিক্ষানবীশ মাত্র। একবার দীপক আমাকে নিয়ে গিয়েছিল পূর্ণেন্দু পত্রীর কাছে। পূর্ণেন্দু একই সঙ্গে নামকরা কবি এবং শিল্পী, থাকে শোভাবাজারের কাছে কোথাও, তার কাকা নিকুঞ্জ পত্রীর সঙ্গে। ঘরের মধ্যে রং-তুলি ছড়ানো, ক্যানভাস ফ্রেমে আঁটা, আর একটি সরস্বতী মূর্তি। দীপকই কথাবার্তা বলল, আমি তার পেছনে ছায়ার মতন, একটি শব্দও উচ্চারণ করিনি, পূর্ণেন্দু আমার নামও জানতে চায়নি। পূর্ণেন্দুও গ্রাম থেকে এসেছে কলকাতায়, কিন্তু তারই মধ্যে তার কণ্ঠস্বরে অহংকারের ছাপ ফুটে ওঠে, যেন দুটো এলেবেলে বাচ্চা কবি এসে তার সময় নষ্ট করছে!

কলেজে না-গিয়ে ঘোর দুপুরবেলা কোথায় যাওয়া যায়? কফি হাউসে তিনটে-চারটের আগে কেউ যায় না। তখন যেতাম সেই মেয়েটির কাছে, সে তখন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাড়ির মধ্যে ঢুকতে সঙ্কোচ হত, কদাচিৎ তার ঘরে গেছি, সে যে-ঘরে পড়ে, পাশের গলিতে সেই ঘরের জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। তার পড়াশুনোয় বিঘ্ন হচ্ছে বলে সে আমায় বকুনি দিত। আবার দু'দিন না গেলেই অনুযোগ করত, কেন আসনি? শরীরের ছোঁয়াছুঁয়ি একেবারেই হত না, কথাও বিশেষ নেই, শুধু চেয়ে থাকা, আর চিঠি লেখা। প্রতিদিন দেখা হলেও চিঠি ডাকে নয়, হাতে হাতে, আমার চিঠিটি নিয়ে কয়েক ভাঁজ করে সে রেখে দিত তার ব্লাউজের মধ্যে। আমার হাতের লেখা তার স্তনের স্পর্শ পাচ্ছে, এতেই আমার স্বর্গ সুখ। তার নিজের চিঠিও সে ব্লাউজের ভেতর থেকে বার করে দিত আমার হাতে, সঙ্গে সঙ্গে পড়ার প্রশ্ন নেই, নিয়েই চলে যেতাম, তারপর অনেকক্ষণ ধরে গন্ধ শুঁকতাম সেই চিঠির। সেই গন্ধেই যেন উপভোগ করতাম আমার মানসীর শরীর। তিন-চার বছরে তাকে আমি অন্তত পাঁচ-সাত শো চিঠি লিখেছি, সেই চিঠিগুলিতেই আমার গদ্য লেখা মক্‌শো হয়।

সেই চিঠিগুলির মধ্যে কতখানি ছিল সেই কিশোরীটির প্রতি প্রেম, আর কতখানি ভাষার প্রতি ভালোবাসা? সচেতন ভাবে এরকম কোনও তফাত ছিল না নিশ্চিত, আবেগের বশেই তো লেখা, কিন্তু পরবর্তীকালে মনে হয়েছে, তার মধ্যে গদ্য নিয়ে পরীক্ষা করার একটা ঝোঁকও ছিল খুব। মেয়েটির রূপ বা গুণের বর্ণনা তো পাঁচশো বার লেখা যায় না। তা একমাত্র অতি মূর্খরাই সে রকম এক ঘেয়েমির দিকে ঝোঁকে। নিজের সম্পর্কেও সাত কাহন করে বলাটা রুচিহীনতার লক্ষণ, তা হলে অতগুলি চিঠি লেখা হচ্ছে কোন বিষয় নিয়ে? কোনও বিষয়ই নেই, প্রতিদিনের ছোট ছোট ঘটনা, কিছু অনভূতি, কিছু স্বপ্ন, তা লেখার জন্য এমন একটা গদ্য ভাষা চাই, যা আকর্ষণীয় হবে।

সেই জন্যই বারবার কাটাকুটি করে লেখা সেই সব চিঠি। যার বিষয়বস্তুর চেয়েও ভাষার নতুনত্বই প্রধান। সুতরাং, প্রেমিক পত্রলেখক যখন মনে করে, তার হৃদয়েশ্বরীর চেয়ে পৃথিবীর আর কোনও কিছুকেই সে বেশি ভালোবাসে না, তখনও আসলে হয়তো সে ভাষাকেই বেশি ভালোবাসে।

আমার এই দুপুরের অভিসারের কথা সযত্নে গোপন রাখতাম বন্ধুদের কাছ থেকে। সেখান থেকে চলে যেতাম কফি হাউসে, মেতে উঠতাম অন্য রকম আলোচনায়। তখন ছাত্রদের মধ্যে বামপন্থী হাওয়া প্রবল, কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র শাখার নাম স্টুডেন্ট ফেডারেশন, ফরোয়ার্ড ব্লকের ছাত্র শাখা স্টুডেন্ট ব্লকও বেশ জনপ্রিয়, আমি যোগ দিয়েছিলাম স্টুডেন্ট ফেডারেশনে। অনেক মিছিলে অংশ নিয়েছি। এমনও হয়েছে, আমার পকেটে প্রেমিকার চিঠি, সদ্য এসেছি তার সন্নিধান ছেড়ে, তারপর কলেজ স্ট্রিটে মিছিলে যোগ দিয়ে হাত ছুড়ে ছুড়ে স্লোগান দিয়েছি কম্বুকণ্ঠে।

পূর্ববঙ্গ বা পর্বপাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ ক্রমেই কমে আসছে। চিঠিপত্রও সহজে আসে না। এদিককার কাগজে ওদিককার খবর সংক্ষিপ্ত। এরই মধ্যে একদিন দীর্ঘ শিরোনামে সংবাদপত্রে ছাপা হল ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি চালানোর বার্তা। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সেখানে প্রাণ দিচ্ছে ছাত্ররা। সালাম, বরকত এইসব নিহতদের নাম পড়ে বুক কেঁপে ওঠে। এই নামে আমার সহপাঠী ছিল ওখানকার ইস্কুলে, তাদেরই কেউ? সেই মুখগুলি যেন দেখতে পাই। আমার সহপাঠী হোক বা না হোক, নিবিড় একাত্মতা বোধ করি ওই সব নামের সঙ্গে। ততদিনে বাংলা শব্দ ও অক্ষরের মাদকতা ছড়িয়ে গেছে রক্তে, বাংলা ভাষার অপমানের কথা শুনলেই গা জ্বলে ওঠে। ইচ্ছে করে তখনই ঢাকায় ছুটে যেতে, সেখানে যারা মিছিলে মিছিলে শহরময় তুলকালাম করছে, তাদের সঙ্গে মিশে যেতে।

কিন্তু তা সম্ভব নয়। সে তো অন্য দেশ। মানুষের জন্মভূমি আর স্বদেশ সব সময় এক থাকে না। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার জন্মভূমি বিদেশ হয়ে গেছে।

সতেরো

হায়দরাবাদ রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে আছে দুটি কিশোর, মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ঝমঝমিয়ে আসছে ট্রেন। তখন কিছুক্ষণের জন্য সরগরম হয়ে উঠে স্টেশন, কুলি ও হকারদের চেঁচামেচি, নামন্ত ও উঠন্ত যাত্রীদের ঠেলাঠেলি, টিউবওয়েলের ক্যাঁচক্যাঁচ। একটু পরেই আবার সব নিঝুম। বেঞ্চে বসে থাকা কিশোর দুটির চোখে ঘুম নেই, শীতে কাঁপছে ঠক ঠক করে। এতদিন পরেও ছবিটি স্পষ্ট।

স্কুলের গণ্ডি পেরোবার আগেই ভ্রমণের দারুণ নেশা পেয়ে বসেছিল, কলেজের দু'-এক বছরের মধ্যে আমি ভারত দর্শন অনেকটা সেরে ফেলেছি। অভিভাবকদের সঙ্গে মোটেই না। এবং অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকাপয়সা না নিয়েও অত কম বয়সে হিল্লি-দিল্লি, উত্তর ও দক্ষিণ ভারত ঘোরাঘুরি কী করে সম্ভব? কাছাকাছি, ছোটখাটো জায়গাগুলির বিবরণ আপাতত বাদ দিচ্ছি, দূরপাল্লার ভ্রমণ অভিযানের রহস্য এখন ব্যক্ত করা যায়।

স্কুলে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একজনের নাম প্রশান্ত দাশগুপ্ত, তার বাবা ছিলেন রেলের উচ্চ কর্মচারী। রেলের এইসব অফিসাররা তাঁদের পরিবারের সকলের জন্য দেশের যে-কোনও প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণের পাস পেতেন। প্রশান্ত প্রায়ই আমাদের বলত, ইচ্ছে করলেই সে যে-কোনওদিন জম্মু কিংবা কন্যাকুমারী চলে যেতে পারে বিনা পয়সায়। কিন্তু প্রশান্ত শান্ত, ভদ্র ও পড়ুয়া ধরনের ছেলে, তার ওরকম ইচ্ছে হতে দেখিনি কখনও। প্রশান্তর কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করে তার এবং তার

ছোট ভাইয়ের নামে দু'খানা পাস বার করে তা ব্যবহার করতাম আমি আর কোনও বন্ধু। বেশ কয়েকবারই আমার এই অনির্দিষ্ট যাত্রার সঙ্গী হয়েছে দীপক মজুমদার।

আমার বাবা খুব কড়া শাসক হলেও আমার ভ্রমণ আকাঙ্ক্ষায় কখনও বাধা দেননি। দীপকের বাধা দেবার কেউ ছিলই না, অতি শৈশবেই সে পিতৃহীন, সংসারের একমাত্র অবলম্বন তার মা, আর কোনও ভাইবোন নেই। দীপকের মা একটি প্রাথমিক ইস্কুলের শিক্ষিকা, খুবই শীর্ণকায়, পুরনো ঘিয়ের মতন গায়ের রং, খুব নরম ও নিচু গলায় কথা বলেন। ক্ষীণ দীপশিখার সঙ্গে খুব মিল।

আমার তবু টিউশনির উপার্জন ছিল, দীপকের কিছুই না। তবে অন্য বন্ধু-বান্ধবরা তাকে ধার দিত। ধার শব্দটি অবশ্য দীপক ব্যবহার করত নিজস্ব অর্থে। যেমন, কোনও বন্ধুর কাছে টাকা ধার চেয়ে দীপক বলত, সামনের মাসেই শোধ দিয়ে দেব। তার সঙ্গে সে জুড়ে দিত আশ্বাসবাক্য, দিই বা না দিই, কথার ঠিক রাখব!

দু'জনে মিলে তিরিশ-চল্লিশ টাকা জোগাড় করতে পারলেই বেরিয়ে পড়তাম। তখনকার রেলের পাসে সুযোগসুবিধে ছিল সীমাহীন, এখনও সে রকম আছে কি না জানি না। যেমন, ধরা যাক আমাদের গন্তব্য লিখিয়ে নেওয়া হল সিমলা। তারপর হাওড়া থেকে আমরা চেপে পড়তে পারি যে-কোনও ট্রেনে, নেমে পড়তে পারি যে-কোনও স্টেশনে। সিমলার দিকে যাচ্ছি, আর তিন মাসের মধ্যে ভ্রমণ সমাপ্ত করতে হবে, এই শুধু শর্ত। অত কম টাকায় কোথাও কোনও হোটেলে থাকার প্রশ্নই ওঠে না, কোনও শ্লথগতির ট্রেনে চেপে রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিংবা কোনও বড় স্টেশনে নেমে, যেমন আগ্রায়, লেফ্‌ট লাগেজে জমা দিলাম আমাদের ব্যাগ, তারপর সারাদিন টো টো করে ঘোরাঘুরি, চাঁদের আলোয় তাজমহল দেখা, রাতটা কাটানো স্টেশনের ওয়েটিং রুমে, পরের দিন আবার আগ্রা দুর্গে এক বেলা, এবং দিনের বেলাই বা তাজমহল দেখব না কেন? প্রথম তাজমহল দর্শনের সঙ্গে ভালোলাগা, মন্দলাগা দুটোই মিশে আছে। যার খ্যাতি যত বেশি, তার সম্পর্কে প্রত্যাশাও তত বেশি হয়, এবং কল্পনায় আমরা যে তাজমহল নির্মাণ করি, তার সঙ্গে বাস্তব কিছুতেই মিলতে পারে না। দিনের বেলা তাজমহল ছোট হয়ে যায়, শ্বেতমর্মরকে মনে হয় সাদা চুনকাম, তাজমহল দেখতে হয় ঠিক সূর্যাস্তের সময়, তখন যেন তার আকার হঠাৎ অনেক বৃদ্ধি পায়, জুড়ে থাকে চোখের সামনের দিগন্ত।

অন্যান্য বন্ধুরা যখন কলকাতায় মন দিয়ে পড়াশুনো করছে, কিংবা পারিবারিক নিরাপত্তায় বেড়াতে যাচ্ছে দেওঘর কিংবা ঘাটশিলায়, আমি আর দীপক তখন রাত কাটাচ্ছি সুদূর উত্তরে ভারতের কোনও রেল স্টেশনে। দিনের পর দিন এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের গায়ে খড়ি উঠে যায়, একটু মাছের ঝোল ভাত খাওয়ার জন্য মন আনচান করে। দিল্লির মতন শহর দু'-একদিনে দেখা যায় না। যুগের পর যুগের ইতিহাস-চিহ্ন সেখানে ছড়ানো, পরবর্তীকালে রোম ও ইস্তানবুলের সঙ্গে দিল্লির মিল খুঁজে পেয়েছি, সেখানে আতিথ্য নিয়েছি এক বাড়িতে। আমার বা দীপকের কোনও আত্মীয় নেই দিল্লিতে, এক বন্ধুর মামার ঠিকানা নিয়ে এসেছিলাম। আগে থেকে চিঠিপত্রে কিছু জানানো হয়নি, হঠাৎ বিনা নোটিসে আমাদের আবির্ভাব, তাঁরা অবাক হয়ে থাকতে দিয়েছিলেন, যদিও বিনয়নগরে তাঁদের অপরিসর ফ্ল্যাটে অতিরিক্ত ঘর ছিল না। সম্পূর্ণ অচেনা ও অনাত্মীয় দুটি ছেলেকে তবু যে তাঁরা আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেটা তাঁদের মহানুভবতা। ইংরিজিতে একটা কথা আছে, মাছ এবং অতিথি দু'দিনের বেশি থাকলে পচা গন্ধ বেরোয়। আমরা তো তখন সে প্রবাদ জানি না, দিনের পর দিন মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছি, দুপুর রোদে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ছি হুমায়ুনের সমাধিতে কিংবা লোদি বংশের বাগানে, ক্রমশ আমাদের আশ্রয়দাতারা সকালবেলা আমাদের জলখাবার দিতে ভুলে যাচ্ছেন, একটু রাত করে ফিরলে দেখছি, সবাই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছেন, টেবিলে কিছু ঢাকা দেওয়া নেই, গৃহকর্তা দরজা খোলার পরই বলছেন, তোমরা খেয়ে এসেছ নিশ্চয়ই!

দীপক আর আমার যুগ্ম তহবিল কার কাছে থাকবে, তা নিয়ে মতান্তর ও মনান্তর হয় প্রায়ই।

দীপকের খরচের হাত খুব বেশি, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনার ব্যাপারটা তার চরিত্রে একেবারেই নেই। একদিন সামান্য এক গেলাস জল উপলক্ষ করে আমাদের দারুণ ঝগড়া হয়ে গেল। দিল্লিতে প্রবল গ্রীষ্মকালে লালকেল্লার সামনের ময়দানে গেলাসে করে ঠাণ্ডা জল বিক্রি হত। দীপক হঠাৎ চার পয়সা দিয়ে এক গেলাস জল কিনে চুমুক দিতে লাগল। আমি হতবাক। আমাদের প্রতিটি পয়সা টিপে টিপে হিসেব করে খরচ করতে হয়। আমাদের জন্য সরকার বাহাদুর রাস্তায় কল বানিয়ে রেখেছেন, সেখান থেকে বিনা পয়সায় জল পান করা যায়, হোক না তা গরম! চার পয়সায় পাওয়া যায় দুটো পরোটা, তার বদলে এক গেলাস জল? দীপক যদিও চুমুক দিতে দিতে হাত তুলে ইঙ্গিতে জানাল যে সে অর্ধেকটা আমাকে দেবে, কিন্তু এরকম বিলাসিতা আমার সহ্য হল না, এখনও অনেক পথ বাকি, দিল্লি থেকে যেতে হবে সিমলা পর্যন্ত, তারপর ফেরা, এর মধ্যেই অর্ধেকের বেশি খরচ হয়ে গেছে। তর্কের সময় দীপকের গলার জোরই বেশি, আমরা তাকে বলতাম কম্বুকণ্ঠ, যদিও তা বেশ সুরেলাও ছিল। ঝগড়া এমনই তুঙ্গে উঠল যে দীপক ঘোষণা করল যে আমরা আর একসঙ্গে থাকব না, সে যেদিকে ইচ্ছে যাবে, আমাকেও নিজের পথ দেখে নিতে হবে। হন হন করে সে হাঁটা দিল উল্টো দিকে। কিন্তু কত দূরে যাবে? আমরা যে শ্যামদেশীয় যমজের মতন, বিচ্ছিন্ন হবার কোনও উপায় নেই। দু'জনের টিকিট তো আলাদা নয়, একখানা কাগজে দু'জনের নাম লেখা, এবং সেই কাগজটি আমার কাছে!

তারপর ঠিক হল, দু'জনের টাকা আলাদাভাবে দু'জনের পকেটে থাকবে, একজন এক বেলা সব খরচ করবে, আর একজন অন্য বেলা।

ছোট ট্রেনে সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ পার হয়ে সিমলা পৌঁছনোর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা কোনওদিন ভুলবার নয়। জীবনে এরকম অনেক কিছুই প্রথমবার দেখার ছাপ গাঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে থাকে। এক একটা নতুন জায়গায় পা দিয়েই মনে হত, আমরা সে স্থানটি যেন জয় করতে এসেছি। অভিভাবকদের শাসন নেই, আমরা যা খুশি তাই-ই করতে পারি। যেন দু'জনের হাতে রয়েছে দুটি অদৃশ্য তলোয়ার, শুধু পকেট দুটিই বড় হালকা, এই যা অসুবিধে। সিমলা রেল স্টেশনটি খুবই অকিঞ্চিৎকর। সেখানে রাত্রে থাকা যায় না, তা ছাড়া শীত। ওখানে বাঙালিদের কালীবাড়ি নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে, খুবই সস্তায় থাকাখাওয়া যায়, মাত্র দৈনিক দু'টাকায় বিছানা সমেত খাট পাওয়া যায়। সিমলা শহরে আপার বাজার ও লোয়ার বাজারের চরিত্র একেবারে আলাদা। লোয়ার বাজারে স্থানীয় মানুষদের ছোট ছোট দোকানপাট, আর আপার বাজারে সাহেবি আমলের কেতাদুরস্ত রেস্তোরাঁ ও বাড়িঘর। আমরা লোয়ার বাজারে গিয়ে রুটি মাংস খেতাম, দোকানগুলো নোংরা নোংরা হলেও খাবারের স্বাদ বেশ ভালো এবং অবিশ্বাস্য রকমের কম দাম, আর বেড়াতাম ওপরের দিকে। চলে যেতাম পাহাড়ে। তখনও আমি দার্জিলিং যাইনি, সিমলা গিয়েই প্রথম হিমালয় দর্শন হল।

সিমলায় একদিনের বৃষ্টি স্মৃতিতে বিধৃত হয়ে আছে, ওরকম বৃষ্টি আর কখনও দেখিনি। বৃষ্টি তো নয়, যেন বর্গির আক্রমণ, লোকজন ভয়ার্তভাবে ছোটাছুটি শুরু করল, আকাশ থেকে বড় বড় পাথরের টুকরো নেমে আসছে। শিলাবৃষ্টি আমরা অনেক দেখেছি, বাংলায় বরফের টুকরোগুলো ছোট ছোট, টিনের চালে খটাখট শব্দ হয় বটে, কিন্তু মাটিতে পড়তে না পড়তে গলে যায়। সিমলায় শিলাবৃষ্টি যেন সত্যিই কঠিন পাথরের টুকরোর মতন, লোকে মাথা বাঁচাবার জন্য দৌড়োয়।

এক দুপুরে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে নামতে নামতে দীপক হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভূত দেখার মতন মুখ করে জানাল যে তার মানিব্যাগটি পকেটে নেই। কোথাও পড়ে গেছে কিংবা কেউ তুলে নিয়েছে। দীপক পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, আমি ধুতির ওপর ফুল শার্ট, ম্যাট্রিক পাস করার পর একটি লম্বা প্যান্টও পেয়েছিলাম। সব পকেট উল্টেপাল্টে দেখা হল, নেই তো নেই। দীপক অনেক ব্যাপারে সৌখিন, সম্বল তো বড়জোর কুড়ি-পঁচিশ টাকা, তবু তার মানিব্যাগটি দেখবার মতন, তার এক খোপে খুচরো, এক খোপে এক টাকার নোট, এক খোপে পাঁচ টাকা ইত্যাদি ও অন্য একটি

খোপে নিজের ছবি। আমি সারা জীবনেই বলতে গেলে তিনটি জিনিস ব্যবহার করিনি। মানিব্যাগ, হাতঘড়ি ও রোদ-চশমা। এগুলো বাদ দিয়েও দিব্যি জীবন কেটে যায়। টাকাপয়সা রাখি জামার বুকপকেটে, ঘড়ি না থাকলেও আকাশ দেখে সময় বোঝা যায় এবং কালো কাচের চশমা পরে পৃথিবীর স্বাভাবিক রং দেখা থেকে নিজেকে কখনও বঞ্চিত করিনি। মানিব্যাগটি হারানো নিয়ে দীপক যখন খুবই শোকগ্রস্ত, তখন আমার আরও বেশি দুশ্চিন্তা, এরপর আমাদের চলবে কী করে? কালীবাড়িতে আমাদের তিনদিনের বিছানা ভাড়া দিতে হবে বারো টাকা, আমার কাছে রয়েছে মাত্র এগারো টাকা আট আনা। সেই টাকাটা জমা দিয়ে, আজই যদি ফেরার জন্য রওনা দিই, দিল্লিতে ট্রেন বদল করে কলকাতায় পৌঁছতে তিন-সাড়ে তিনদিন লেগে যাবে। এই ক'দিন আমরা খাব কী? সেই বয়সে সর্বক্ষণ খিদে পায়, পেট ভরলেও মন ভরে না, আইসক্রিম-কেক-পেসট্রির দোকানগুলোর পাশ দিয়ে হ্যাংলার মতন তাকাতে তাকাতে যাই, সবচেয়ে কম খরচের রুটি-তরকা খেতে হয়। অনাহারের সম্ভাবনাতেই বুক কেঁপে ওঠে, হাতে একটাও পয়সা থাকবে না, দীর্ঘ তিনদিনের ট্রেন যাত্রা।...কালীবাড়িতে ফিরে গালে হাত দিয়ে ভাবতে ভাবতেও কূলকিনারা পাই না। শেষ পর্যন্ত একটাই উপায় মনে আসে, দুপুরের দিকে বিশেষ কেউ থাকে না এখানে, ম্যানেজার-কর্মচারীরা বিশ্রাম নেয়, ব্যাগ দুটি হাতে নিয়ে আমাদের নিঃশব্দ পলায়ন, দৌড়ে গিয়ে রেল স্টেশনে একগাদা বস্তার আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকি চোরের মতন, ট্রেন আসতে এখনও দেড় ঘণ্টা দেরি, প্রতি মুহূর্তে মনে হয়, এই বুঝি কালীবাড়ির লোকেরা পুলিশ নিয়ে আমাদের ধরতে আসবে, ধরার পর জেলে দেবার আগে খুব মারবে! অল্প বয়স থেকেই দীপকের চোখে চশমা, মার খাওয়ার সময় চশমা ভেঙে গেলে কী হবে, সেই চিন্তায় দীপক বেশি কাতর।

এরপর দীর্ঘকাল সেই বারো টাকা ফাঁকি দেবার জন্য অনুশোচনা বোধ করেছি। অনেকবার মনে হয়েছে, আবার সিমলায় গেলে কালীবাড়িতে সেই টাকাটা শোধ দিয়ে আসব। কিন্তু সিমলায় আর দ্বিতীয়বার যাওয়ার কোনও উপলক্ষ ঘটেনি। এত বছর বাদে বারো টাকা শোধ দিতে গেলে ওরা কত টাকা সুদ চাইবেন কে জানে! তাতে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যেতে পারে। অবশ্য সেই আমলের খাতাপত্রেও আমাদের নাম পাওয়া যাবে না, আমরা তো ভ্রমণ করেছি প্রশান্ত ও সুশান্ত দাশগুপ্তর ছদ্মনামে!

প্রশান্তর কাছ থেকে পাস নিয়ে আমরা কয়েক বছর এরকম অভিযান চালিয়েছি, মাঝে মাঝে ছোটখাটো বিপদে পড়তে হয়েছে বটে, সে এমন কিছু না। শুধু যে বহু শহর ও ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থানে ঘুরেছি তাও নয়, দেখেছি মানুষ, নানা রকমের মানুষ, বহু ভাষাভাষী মানুষ, বাংলার বাইরে গিয়ে ভারত নামে দেশটার রূপও বোঝা গেছে। ভাষার জন্য তেমন কোনও অসুবিধে হয়নি, তামিল-তেলেগুদের দেশে গিয়েও ভাঙা ভাঙা ইংরিজি ও আকার-ইঙ্গিতে কাজ চলে গেছে। দু'-একবার মজাও হয়েছে বেশ। ট্রেনে রিজার্ভেশনের কোনও বালাই ছিল না, ঠেলাঠেলি করে উঠে পড়তে হত থার্ড ক্লাস কামরায়। তখন টু-টিয়ার, থ্রি-টিয়ার চালু হয়নি, তলার বেঞ্চ যাত্রীদের, ওপরের তাক মালপত্র রাখার জন্য। আমাদের সঙ্গে মালপত্র সামান্য, কোনওক্রমে ওপরের তাকে উঠে শুয়ে পড়তাম পা ছড়িয়ে। পাঁউরুটি আর জ্যামের শিশি থাকত সঙ্গে, এবং কলা, যাত্রাপথে তাই দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি হত। একবার সেইরকমভাবে প্রাতরাশ সেরেছি, গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে নীচে নেমে হাত ধোওয়ার প্রবৃত্তি হয় না। দীপকের একটি সুদৃশ্য বড় ফ্লাস্ক ছিল, সেই ফ্লাস্কের ঢাকনায় জল ঢেলে আঙুল ডুবিয়ে নেওয়া, তারপর সেই ময়লা জল ফেলতে হবে, দীপক ঝুঁকে পড়ে নীচের তলার এক ব্যক্তির দিকে ঢাকনাটা এগিয়ে দিয়ে বলল, ফেক দেও না ভাই! লোকটি একবার দীপকের মুখের দিকে একবার ঢাকনাটার দিকে তাকাল, তারপর সেটা ফেলে দিল চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে। দীপক আঁতকে উঠে হা-হা করতে লাগল, হাসতে লাগল অন্য যাত্রীরা, সেই লোকটি সরল মুখে এদিকে চাইছে, তাকে ফেলে দিতে বলা হয়েছে, সে ফেলে দিয়েছে, এতে দোষ কী হয়েছে সে বুঝতেই পারছে না! ঢাকনার অভাবে কানা হয়ে গেল ফ্লাস্কটা! একপাটি জুতোরই মতন

ফ্লাস্কেরও শুধু ঢাকনা কোথাও কিনতে পাওয়া যায় না।

আমাদের দুই সদস্যের দলটির দীপকই নেতা। অন্যান্যদের সঙ্গে বেশির ভাগ কথাবার্তা সে-ই বলে। সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে কয়েক মিনিটের মধ্যে ভাব জমিয়ে ফেলার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তার। মাঝে মাঝে গোলমালও করে ফেলত। যে কামরায় একজনও বাঙালি নেই, সেখানে সে অন্য যাত্রীদের নিয়ে রসিকতা করত বাংলায়, এক একজনের নাম দিয়ে দিত, যেমন, কেউ হোঁদলকুতকুত, কেউ কাকেশ্বর কুচকুচ, কেউ গজেন্দ্রগামিনী। আমাদের দু'জনেরই ঘড়ি নেই, সময় জানতে হত অন্যদের কাছ থেকে। একবার দুপুরে এক স্থানে ট্রেন অনেকক্ষণ থেমে আছে, দারুণ গরম আর অস্বস্তিকর অবস্থা, নীচে একদল লোক দুর্বোধ্য ভাষায় গলা চড়িয়ে তর্ক করছে অনেকক্ষণ, দীপক আমাকে বলল, ওই বেড়ালচোখো কালো মানিকটাকে জিজ্ঞেস করো তো কটা বাজে! আমি সেই লোকটির দিকে হাত তুলে, কবজিতে আঙুল ছুঁইয়ে ইঙ্গিতে সময় জানতে চাইলাম। লোকটি পরিষ্কার বাংলায় বলল, পৌনে তিন। আমার গায়ের রং কালো বলে কালোমানিক বানালে, কিন্তু বেড়ালচোখো কেন বললে ভাই?

এরকম অবস্থাকেই বলে, ধরণী দ্বিধা হও!

ভ্রমণের সময় আমাদের নাম প্রশান্ত ও সুশান্ত, কিন্তু দীপক নিজের নামটি এমন ভালোবাসে যে অন্য নাম মনে থাকে না। অনেক জায়গায় লেফ্‌ট লাগেজে আমি প্রশান্ত দাশগুপ্ত নামে ব্যাগ জমা দিয়েছি, ফিরে এসে সেগুলো ছাড়াবার সময় আমার ভাই সই করেছে দীপক মজুমদার! একবার চলন্ত ট্রেনে চেকার এসে পাসটি পরীক্ষা করতে করতে আমাদের নাম জিজ্ঞেস করল, আমি কিছু বলার আগেই আমার ভাই বলে বসল দীপক মজুমদার! চেকার সাহেবের ভুরু কুঁচকে যেতেই সে-বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, ডাক্‌নাম, ওটা ওর ডাকনাম, বাঙালিদের তিন-চার রকম ডাক্‌নাম হয়, আমাদের আসল নাম দাশগুপ্ত! চেকার চলে যাবার পর দীপককে ভর্ৎসনা করতে যেতেই সে এক অকাট্য যুক্তি দিয়ে বসল। বলল, লোকটা যদি বাবার নাম জিজ্ঞেস করত? তুমি নিজের নাম যা-খুশি বলতে পারো, কিন্তু বাপের নাম বদলাতে পারবে?

যেবার ওয়ালটেয়ারের দিকে যাই, সেবারে মজা হয়েছিল খুব। এখন বিশাখাপত্তনম বা ভাইজাগ নামেই সকলে শহরটিকে চেনে, তখন ওয়ালটেয়ার নামটিই প্রচলিত ছিল বেশি, অনেক সাহেব-সুবো তখনও রয়ে গিয়েছিল সেখানে। নীল সমুদ্র ও শৈলশিখার সমন্বিত সেই নগরটি বড়ই মনোহর। সেখানে কী করে যেন আমরা একটা যাযাবর দলের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিলাম। যাযাবর কিংবা নৌটঙ্কির দলও হতে পারে, পনেরো-কুড়ি জন নারী-পুরুষের একটি গোষ্ঠী, তারা পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, হঠাৎ জনবহুল কোথাও থেমে গিয়ে গান ও নাচ শুরু করে, একটা অ্যালুমিনিয়ামের থালায় বেশ কিছু পয়সা পড়ে, দুপুরে কোনও মাঠের মধ্যে ইটের উনুন বানিয়ে নিজেরাই রান্না করে খায়, রাত্তিরে শুয়ে থাকে কোনও মন্দিরের চাতালে। অর্থাৎ 'ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে' একেবারে আক্ষরিকভাবে সত্য ওদের জীবনে। দীপকের উদাত্ত গানের গলা, বাংলা ছাড়াও অনেক রকম গান জানে, 'পিয়া মিলন কো জানা আ আ আ', এই গানটি হাত-পা ছুড়ে চমৎকার গায়, আমিও মোটামুটি দোয়ারকির কাজ চালাতে পারি, আমাদের দু'জনকে তারা বিনা প্রশ্নে দলে নিয়ে নিল। আমরা অবশ্য রাত্তিরবেলা শুতে যেতাম এক ধর্মশালায় আর ওদের সঙ্গে খেতাম শুধু দুপুরে। আমাদের বয়স আর একটু বেশি হলে ওই দলের কোনও যাযাবরীর প্রেমে পড়ে তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের নায়কের মতন হয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু ছিল না, কিন্তু আমরা প্রেমিক হলেও মেয়েরা পাত্তা দেবে কেন!

মাত্র চারদিন ছিলাম সেই দলের সঙ্গে। নির্দিষ্ট কোনও বাসস্থান নেই, মাথার ওপর আচ্ছাদন পর্যন্ত নেই, আগামীকাল কী করে খাদ্য জুটবে তারও ঠিক নেই, ঝড়-বৃষ্টি হলে রাস্তার নাচ-গানের দর্শক-শ্রোতা জোটে না, এর ওপর আছে পুলিশের উৎপাত, তবু ওরা কী করে এমন আনন্দে মেতে

থাকে, সেটাই রহস্য। সব সময় ইয়ার্কি-ঠাট্টা, হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে, একজনের পাত থেকে আর একজন খাবার তুলে নেয়, তাতে নকল বিবাদ হয়, অন্যরা তখনও হাসে। মনে হয় যেন এদের চেয়ে সুখী আর কেউ নয়! চারদিন কেন, সারা জীবনই হয়তো আমরা ওদের সঙ্গে মিশে যেতে পারতাম, কিন্তু হঠাৎ দুটি ছেলের ভেদবমি শুরু হয়ে গেল, অর্থাৎ কলেরা, কলেরা অত্যন্ত ছোঁয়াচে, তখন চিকিৎসাও তেমন কিছু ছিল না, বিদেশ বিভুঁই-এ কলেরায় প্রাণত্যাগ করতে তেমন ইচ্ছে হল না আমাদের, সুতরাং ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতেই হল।

ওই দলের এক তরুণীর নাম ছিল চুলবুলি, হ্যাঁ, এরকমই নাম অন্যদেরও। সে খুব একটা সুন্দরী ছিল না, আধ-ময়লা রং, সামান্য ট্যারা এবং তার বাঁ হাতের পাঞ্জাটা সম্পূর্ণ কাটা, মনে হয় যেন কেউ এক কোপে তার কবজি থেকে কেটে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল, সে কাহিনী শোনা হয়নি। তবু তার জীবন-স্ফূর্তি কম ছিল না একটুও, সেই নুলো হাত দিয়েই রঙিন ঘাগরা পরে সে এমন নাচের তরঙ্গ তুলত যে চোখ ধাঁধিয়ে যেত। পরবর্তীকালে দীপক যখন 'বেদনার কুকুর ও অমল' নামে একটি নাটক লেখে তখন বেদনার চরিত্রে এসেছিল ওই চুলবুলির অনেকখানি আদল। দীপক লিখেছিল বলেই ওই বিষয়টি আমি কখনও স্পর্শ করিনি।

ঠিক বিপদ নয়, মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল হায়দরাবাদে। হায়দরাবাদ তখনও নেটিভ স্টেট। কাশ্মীরের গরিষ্ঠ সংখ্যক অধিবাসী মুসলমান, কিন্তু রাজা ছিলেন হিন্দু। সেই কাশ্মীর ভারতে যুক্ত হওয়ার ফলে যে চরম দুর্ভোগ শুরু হয়, তা আমরা এখনও ভোগ করছি। ভারতের মধ্যস্থলে হায়দরাবাদ রাজ্যটির নিজাম মুসলমান, অধিবাসীরা মিশ্রিত, নিজাম ভারত ইউনিয়নে যোগ দিতে চাননি, যদিও ভৌগোলিক কারণেই পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার অসুবিধে ছিল, তবু একদল রাজাকার বাহিনী ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে তুলছিল। সে সময় ভারতের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক এক বঙ্গসন্তান, প্রমথ চৌধুরীদের পরিবারের জয়ন্তনাথ চৌধুরী, তিনি সসৈন্যে হায়দরাবাদে ঢুকে নিজামকে ক্ষমতাচ্যুত করেন, কাশ্মীরের মতন পাকিস্তানি বাহিনী এত দূর এসে দখলদারি দাবি করতে পারেনি।

আমরা যখন হায়দরাবাদে যাই তখনও সেখানে নিজামের রাজত্ব চলছে। নিজাম তখন ভারতের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি, তার কৃপণতার নানা কাহিনীও প্রচলিত ছিল। শোনা যায়, তাঁর একটা খাবার টেবিল ছিল সম্পূর্ণ স্বর্ণময়, তাতে একসঙ্গে ষাটজন লোক বসে খেতে পারে। কিন্তু একসঙ্গে ষাটজন লোক খাইয়ে পয়সা খরচ করতে নিজাম মোটেই রাজি ছিলেন না। তখনও সেই স্বতন্ত্র দেশীয় রাজ্যে নিজামের নিজস্ব মুদ্রা চলছে। তার মূল্যমান ভারতীয় মুদ্রার চেয়ে কিছু কম। আমরা কোনও দোকানে ঢুকে বারো আনার (পঁচাত্তর পয়সা) খাবার খেয়ে ভারতীয় পাঁচ টাকা দিলে পাঁচ টাকা দু'আনা ফেরত পেয়ে কৌতুক বোধ করতাম খুব। জিনিসপত্রের দাম অবিশ্বাস্য রকম সস্তা। দীপক সব ব্যাপারেই সৌখিন। মাঝে মাঝেই সে তার কাবুলি জুতো পালিশ করায়। ওখানে এক মুচিকে দিয়ে জুতো পালিশ করে ভারতীয় আট আনা দিয়েছিল। মুচিটি দারুণ অবাক হয়ে মুদ্রাটি নেড়েচেড়ে দেখে হঠাৎ তার সব সরঞ্জাম গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল। পরে জেনেছিলাম, ওখানে জুতো পালিশের রেট মাত্র চার পয়সা, সে আট আনা পেয়েছে, তাও ভারতীয় মুদ্রায়, সেটাই বলতে গেলে তারা সারা দিনে উপার্জন। সে ভেবেছিল আমরা ভুল করে দিয়েছি, আবার ফেরত চাইতে পারি।

হায়দরাবাদে সকালবেলা পৌঁছে আমরা যথারীতি হোটেল না খুঁজে, স্টেশনের লেফ্‌ট লাগেজে ব্যাগ দুটো জমা করে বেরিয়ে পড়েছি। হায়দরাবাদ-সেকেন্দ্রাবাদ এই যুগ্ম শহরে দ্রষ্টব্য বস্তু অনেক। সলারজং মিউজিয়ামের তো তুলনা নেই। সারাদিন ঘোরাঘুরি করছি, সবচেয়ে বেশি আহ্লাদ হচ্ছে দারুণ বিরিয়ানি-গোস্ত পাওয়া যাচ্ছে অতি অল্প দামে। এত কম খরচ বলেই সন্ধেবেলা আমরা ঠিক করলাম, একবার অন্তত কোনও ভদ্রগোছের হোটেলে চেয়ার-টেবিলে বসে খাব। ঢুকে পড়লাম এক আলো ঝলমলে রেস্তোরাঁয়। মিনিউ কার্ডে খাবারদাবারের দাম দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, অর্ডার দিতে যাচ্ছি, দীপক হঠাৎ বলে উঠল, আগে সে একটু মদ খাবে। মদ? আমি প্রবল আপত্তি তুললেও

সে গ্রাহ্য করল না, আমি ও জিনিস কখনও ছুঁয়ে দেখিনি, কিন্তু দীপক জানাল, সে আগে খেয়েছে, বালিগঞ্জ অঞ্চলে বিখ্যাত ব্যক্তিদের বাড়িতে নাকি সবাই পান করে। শেষ পর্যন্ত দীপক শুধু নিজের জন্য এক গেলাসের অর্ডার দিল।

মদ্যপানের প্রসঙ্গে আমার এক বন্ধু বিমান মল্লিকের কথা মনে পড়ে। বিমান হাওড়ার এক বনেদি বাড়ির ছেলে। কয়েক বছর পর সে আমাকে লাইট হাউসে একটা সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। তখন লাইট হাউসের দোতলায় অত্যন্ত সাজানো-গোছানো একটি রেস্তোরাঁ-কাম-বার ছিল, সেখানকার বেয়ারাদের পোশাকের কী জাঁকজমক, মোগল-পাঠানদের মতো, মাথায় সুদৃশ্য পাগড়ি, গম্ভীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যবহার। ফিল্ম শুরু হতে দেরি আছে, সেই রেস্তোরাঁয় নিয়ে এসে কিছু খাবারের অর্ডার দিতে দিতে বিমান নিচু গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করল, একটু ড্রিঙ্ক করবে নাকি? ততদিনে আমার নীতিবাগিশতা কিছুটা কমে এসেছে, মনে হল, একবার চেখে দেখলে মন্দ কী! এক দীর্ঘকায় বেয়ারাকে ডেকে বিমান ফিসফিস করে বলল, আমাদের এমন কোনও মদ দিতে পারেন, যাতে মুখে গন্ধ পাওয়া যাবে না? বেয়ারাটি মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল। অবিলম্বে সে নিয়ে এল তলার দিকে সরু, ক্রমশ ওপরের দিকে চওড়া দুটি লম্বা সুদৃশ্য গেলাস ভর্তি পানীয়। সেটার নাম বলল গিমলেট। অর্থাৎ জিন ও লাইম। বিমানেরও সেই প্রথম হাতেখড়ি। সভয়ে এদিক ওদিকে তাকিয়ে দু'জনে চুমুক দিলাম একসঙ্গে, তারপরই মুখ দুটি উদ্ভাসিত হয়ে গেল এক দিব্য আনন্দে। এর নাম মদ? এত অপূর্ব সুস্বাদু? তবে লোকে এর এত বদনাম করে কেন?

এরও বেশ কয়েক বছর পর বিমান মল্লিকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল লন্ডন শহরে। বিমান এখন সেখানকার খ্যাতনামা ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। প্রথম যখন লন্ডনে দেখা হল, তখন সে আর্ট কলেজে পড়তে পড়তে সন্ধেবেলা কোনও পানশালায় আংশিক কাজ করে। কথায় কথায় সে জিজ্ঞেস করেছিল, সুনীল, তোমার মনে আছে লাইট হাউসের সেই রেস্তোরাঁয় আমাদের মদ খাওয়া? বাচ্চা ছেলে দেখে ব্যাটা আমাদের গালে চড় মেরেছিল। দাম নিয়েছিল মদের, কিন্তু এক ফোঁটাও মদ ছিল না, স্রেফ সরবত! এখন আমি জানি, আর যারই গন্ধ লুকোনো যাক, জিনের গন্ধ লুকোনো যায় না!

যাই হোক, সেবারে হায়দরাবাদে দীপক কী পান করেছিল জানি না, ছোট গেলাসে দিয়েছিল সবুজ রঙের পানীয়। সেইটুকু শেষ করেই দীপক ইংরিজি বলতে লাগল, রাস্তায় বেরিয়ে দু'হাত ছড়িয়ে বলল, আই অ্যাম ফ্লাইং! তারপর সে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে, আমাকে ধরে আনতে হয়। এইসব হুটোপাটির পর আমাদের স্টেশনে ফিরতে এগারোটা বেজে গেল। রাত দশটায় লেফ্ট লাগেজ রুম বন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের ব্যাগ দুটি ফেরত নেবার উপায় নেই। রাত্তিরেই অন্য ট্রেন ধরার কথা ছিল, তা আর সম্ভব নয়, এর মধ্যে বেশ শীত লাগতে শুরু করেছে। সেটা সেপ্টেম্বর মাস, দিনের বেলা বেশ গরম ছিল, ঘামে ভিজেছি পর্যন্ত, অথচ রাত্তিরে এমন শীত, এ কী আজব শহর! যত রাত বাড়ে, তত শীতও বাড়ে। থার্ড ক্লাসের যাত্রীদের অপেক্ষাগার উন্মুক্ত জায়গায়, সেখানে তিল ধারণের স্থান নেই। আমাদের বসে থাকতে হবে বেঞ্চে। ব্যাগে আমাদের সোয়েটার আছে, চাদর আছে, লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে ব্যাগ দুটো দেখাও যায়, শেষ পর্যন্ত আমরা ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে দোষারোপ করতে লাগলাম পরস্পরকে। ঝগড়ায় তবু যদি গা গরম হয়!

মধ্যরাত্রি পার হয়ে যাবার পর, প্ল্যাটফর্ম একেবারে শব্দহীন, শুনশান, তখন দুটি ভিখিরি কিংবা কুলিজাতীয় ব্যক্তি আমাদের অদূরে দুটি পুঁটলি নিয়ে বসল মেঝেতে। বেশ যত্ন করে তারা বিছানা পাতল, একটা বিড়ি শেষ করে শুয়ে পড়ল কম্বল চাপা দিয়ে। তাতে আমাদের শীতবোধ বেড়ে গেল অনেকগুণ, ওরা কী আরামে ঘুমোচ্ছে, আমাদের তুলনায় ওরা এখন রাজার মতন সুখী। কিছুক্ষণ পর দীপক আর সহ্য করতে পারল না, ওদের একজনের পাশে শুয়ে কম্বলটা টেনে নিল। লোকটি ঘুমের মধ্যে উঃ আঃ করে ঠেলল কয়েকবার, তারপর উঠে বসে দীপককে দেখল। দীপকের করুণ, ভয়ার্ত মুখ দেখে তার বোধহয় মায়া হল, বিনা বাক্য ব্যয়ে সে শুয়ে পড়ল আবার।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটির পাশে গিয়ে আমি কিন্তু শুতে পারলাম না। একটু চেষ্টা করেও উঠে আসতে হল। একজন ভিখিরি কিংবা কুলির পাশে শোব না, কম্বলটায় দুর্গন্ধ, এসব ভাবিইনি। আমার মুশকিল এই, আমি অন্যপুরুষ মানুষের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে কিছুতেই শুতে পারি না, মামা-কাকা-দাদা স্থানীয়দের সঙ্গেও না, আমার দারুণ অস্বস্তি হয়। লোকটির গায়ের সঙ্গে সেঁটে, ওইটুকু কম্বলের ভাগ নেওয়ার চেয়ে সারারাত শীত সহ্য করাও ভালো।

আঠারো

ভ্রমণের নেশা যত পেয়ে বসে, শুধু দূরদুরান্তে নয়, একটু সুযোগ পেলেই টুকটাক কাছেপিঠে, ততই আমার কলেজীয় পড়াশুনোর অবনতি হতে থাকে। কলেজ বদলের গ্লানি ও পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অনাগ্রহ, তার ফলে কবিতার খাতার পৃষ্ঠাগুলি ভরে যায়। দ্বিতীয় বছরের শেষে যাচাই পরীক্ষায় আমার ফল হল ভয়াবহ, কেমিস্ট্রি ও অঙ্কে পাস নম্বরের চেয়েও অনেক কম, ফিজিক্স ও বায়োলজিতে মোটামুটি পাস, ইংরিজি ও বাংলায় সকলের চেয়ে বেশি। কলেজ কর্তৃপক্ষ তবু আমাকে যাকে বলে 'অ্যালাউ' করে দিলেন। তাই শেষের দু'এক মাস রাত জেগে পড়াশুনো করে কোনওক্রমে আই এসসি উত্তীর্ণ হওয়া গেল। বিজ্ঞানের ছাত্র কিংবা গবেষক হওয়া যে আমার ললাটলিপি নয়, তা এর মধ্যেই বোঝা গেছে। যদিও দু'বছর এই সামান্য বিজ্ঞান পড়াশুনোই দারুণ কাজে লেগেছে পরবর্তী জীবনে। ডিগ্রি অর্জনের পাঠ শেষ করার পরই বিজ্ঞানের প্রতি আমার আগ্রহ জন্মায়, বিশেষত আকৃষ্ট হই ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যার প্রতি। গোটা বিংশ শতাব্দী জুড়েই বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতিতে প্রধান ভূমিকা ফিজিক্সের। তার মধ্যেও আমার বিশেষ আকর্ষণ অ্যাস্ট্রোনমির অসীম রহস্যে। অ্যাস্ট্রোলজি বা জ্যোতিষশাস্ত্রে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, কিন্তু অ্যাস্ট্রোনমির প্রতি আমি প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতন সারা জীবনের জন্য বাঁধা পড়ে আছি।

আমি জ্যোতিষীদের কাছে কখনও যাইনি, কিন্তু দু'-একটি মজার অভিজ্ঞতা আছে। উত্তর কলকাতায় ডাক্তার, কবিরাজদের মতনই জ্যোতিষীদের বহু চেম্বার ছিল, এ ছাড়া পথেঘাটে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী ঘুরে বেড়াত এবং ভীরু-বিশ্বাসীদের ভবিষ্যদ্বাণী করত টাকা রোজগারের জন্য। স্নাতক পরীক্ষার পর ফলাফল প্রকাশের মাত্র কয়েক দিন আগে এক নির্জন দুপুরবেলা বাইরের ঘরে একা বসে আমি কিছু পড়ছি বা লিখছি, হঠাৎ জানলার পাশে একজন সাধু এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তাঁকে দুটি টাকা দিতে হবে এবং তিনি আমার হাত দেখবেন। অন্য সময় হলে হাঁকিয়ে দিতাম, কিন্তু পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার আগে সকলেরই মন একটু দুর্বল থাকে বোধহয়। এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, দেখুন তো আমার পরীক্ষার রেজাল্ট কেমন হবে? সাধুবাবাজি অনেকক্ষণ ধরে আমার হাত নিরীক্ষণ করলেন, কয়েকবার চকিত, বিস্মিত দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন আমার মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে দিয়ে, কিছু না বলে, হন হন করে চলে গেলেন। আমার হতবাক অবস্থা! এর মানে কী, ডাহা ফেল? সত্যি কথা বলতে কী, ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল! লোকটি তো অনায়াসে আমাকে মিথ্যে কোনও স্তোকবাক্য দিয়ে দুটি টাকা উপার্জন করতে পারত। টাকা না নিয়েই চলে গেল, অর্থাৎ আমার এতই খারাপ অবস্থা যে তার বিবেকে বেধেছে! পুরো বিকেলটা বিমর্ষভাবে কাটিয়ে, তারপর দুশ্চিন্তা ঝেড়েই ফেললাম। বলাই বাহুল্য, সেবারে আমার পাস করা আটকায়নি! সেই সাধুটি প্রতারক নন, নিজের জ্যোতিষজ্ঞানের ওপর দৃঢ় আস্থা, অথচ সেই জ্ঞানটাই ভ্রান্ত।

এর বেশ কয়েক বছর পর এক সকালে থলি নিয়ে বাজারে চলেছি, হঠাৎ আমার সামনে পথ জুড়ে দাঁড়ালেন এক বিশাল চেহারার পুরুষ, মাথায় সর্পকুণ্ডলির মতন জটা, মুখভর্তি দাড়ি, গায়ে একটি কালো কম্বল জড়ানো এবং চোখের দৃষ্টি তীব্র ধরনের। অত্যন্ত দুর্বোধ্য হিন্দিতে তিনি যা বললেন, তার মর্ম এইটুকু বোঝা গেল যে তিনি আসছেন হিমালয় থেকে, যাবেন গঙ্গাসাগরে, সেখানে কিছু একটা যজ্ঞ করবেন, তাতে পাঁচ কিলো ঘি লাগবে, সেই বাবদ আমাকে পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করতে হবে। এর থেকে হাস্যকর প্রস্তাব আর কী হতে পারে? নিজেরাই ঘি খেতে পাই না, উনি কোথায় যজ্ঞের নামে ঘি পোড়াবেন, তাতে আমাকে সাহায্য করতে হবে? তিনি জলদগম্ভীর স্বরে আবার বললেন, ওই টাকা দিলে আমার পুণ্য হবে অনেক। আমার কপালে পুণ্যরেখা আছে ...। যে-মানুষ পরলোকে বিশ্বাস করে না, সে পুণ্যলোভী হতে যাবে কেন? তা ছাড়া আমি জ্ঞানত পাপ-টাপ কিছু করি না, সুতরাং বললুম, পথ ছাড়ুন, আমার কাছ থেকে কিছু সুবিধে হবে না। এবার তিনি কম্বল অনাবৃত করে দু'হাত দু'দিকে ছড়ালেন এবং বললেন, নাগা সন্ন্যাসী! তাঁর সম্মুখশরীর সম্পূর্ণ উলঙ্গ, রোমশ ও বলিষ্ঠ, কিন্তু তা দেখেই বা আমি ঘাবড়ে যাব কেন? সাধুটি চকিতে ডান হাতে আমার কপালে একটা টোকা মারলেন, তারপর সেই হাতটা দেখালেন আমাকে। হাতে একটা কোনও গাছের কাঁটা! হেসে তিনি বোঝাতে চাইলেন, আমার ললাটে বা ভাগ্যে এই কাঁটা বিঁধে ছিল, সেটা তুলে আনা হল। কাঁটাটি টিপতে লাগলেন দু' আঙুলে, সেটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল, সেই ধুলোর মতন কণ্টকচূর্ণ নস্যি ধরার মতন দু' আঙুলে রেখে টিপতে লাগলেন কিছুক্ষণ, তার থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল বেরুতে লাগল, রীতিমতন টপ টপ করে জলের ফোঁটা পড়ছে রাস্তায়। কী অলৌকিক কাণ্ডই না বটে! পকেট থেকে দুটো টাকা বার করে বললাম, তুমি তো বেশ ভালোই ম্যাজিক শিখেছ! ওই সব যজ্ঞফজ্ঞের কথা না বলে ম্যাজিক দেখাও না কেন? যাই হোক, তুমি একজন জাদুশিল্পী, তাই তোমাকে এই দর্শনী দিলাম!

চেয়েছিলেন পঞ্চাশ, দুটো টাকা পেয়েই বেশ খুশি, এ যে প্রায় চোর-বাজারের দরাদরি!

আরও অনেক বছর পর, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী, যিনি এক সংবাদপত্রে প্রতিদিন মানুষের জন্মতারিখ মিলিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, একশো জন বাঙালির হাতের পাঞ্জার ছবি ছাপিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করতে চান। তিনি আমার ডান হাতের তালুটি নির্বাচন করেছিলেন, আমি ছবি তুলতে দিতে অস্বীকার করে জানিয়েছিলাম, আমারটা নিয়ে কোনও লাভ নেই, মাতৃগর্ভে হাত মুঠো করে শুয়ে থাকার সময় তালুতে যেসব আঁকিবুঁকি রেখা ফোটে, তাতে মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের ইতিহাস লিখিত হওয়া সম্ভব, এ আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। জ্যোতিষীটি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বিস্মিত করেছিলেন আমাকে। ঝপ করে আমার ডান হাত ধরে বলেছিলেন, আপনি যে হাত দেখায় বিশ্বাস করেন না, সেটাও লেখা আছে আপনার হাতের রেখায়!

জ্যোতিষীদের সঙ্গে সেটাই আমার শেষ সংসর্গ।

অবশ্য ছাত্রজীবনে শখের জ্যোতিষী অনেকেই সাজে। তরুণী মেয়েদের নবনীত কোমল হাত অনেকক্ষণ ধরে রাখার সেটাই তো একমাত্র নীতিসম্মত উপায়। আমিও অনেক মেয়ের করকমল দু'হাতে ধরে বক-জ্যোতিষী সেজে অনর্গল মিথ্যে বলেছি। আমার সারা জীবনে কোনও সহপাঠিনী ছিল না, স্কটিশ চার্চ কলেজে একসময় আড্ডা দিতে যেতাম, বসন্ত কেবিনের আড্ডায় কে যেন দুষ্টুমি করে রটিয়ে দিয়েছিল যে আমি পণ্ডিতবাড়ির ছেলে, ভালো হাত দেখতে পারি। এই ধরনের রটনা যত অস্বীকার করা যায়, তত লোকের ভক্তি বাড়ে। তখন আমিও বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, ছেলেদের পারি না, শুধু মেয়েদের পারি। এক একজনের হাত ধরে অনেকক্ষণ বসে থাকতাম ধ্যানীর মতন, সেই হাতের ঘ্রাণ নিতাম। প্রত্যেকের হাতের ঘ্রাণ বিভিন্ন। প্রত্যেকটি মেয়েকেই বলতাম, তুমি একবার খুব দুঃখ পাবে। শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথার বদলে এই কথাটা শুনে তাদের আয়ত চোখে বিশ্বাস ফুটে উঠত। সুখ সম্পর্কে নানারকম

মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু সকলেই দুঃখকে বিশ্বাস করে, জানে যে দুঃখ অমোঘ। সেই কতকাল আগে গৌতম বুদ্ধ বলে গিয়েছিলেন এই কথা।

আই এসসি'র পর বিজ্ঞান শাখায় আমি আর ভর্তি হব না ঠিক করে ফেলেছিলাম, বাবাও আপত্তি করেননি। আমার বড় সাধ ছিল ডাক্তারি পড়ার। ছেলেবেলা থেকেই ডাক্তারদের সম্পর্কে আমার মনে একটা বীরপূজার ভাব ছিল। মনে হত, ডাক্তাররাই মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু, তাঁরা যে শুধু অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচান তাই-ই নয়, অনেক পরিবারকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেন। বাল্যকাল থেকে যে ক'জন চিকিৎসককে দেখেছি, প্রত্যেকেরই চেহারা সুন্দর, ব্যবহার মার্জিত, মনে হত, তাঁরা সাধারণ মানুষদের থেকে একেবারে আলাদা। আমার যেহেতু আদর্শের ভাবালুতা ছিল, তাই অনেক সময় স্বপ্ন দেখতাম, ডাক্তারি পাস করে গ্রামেগঞ্জে গিয়ে গরিব-দুঃখী মানুষদের পাশে পাশে থাকব। (অনেক ডাক্তারি ছাত্রই সম্ভবত জীবনের শুরুতে এরকম কিছু ভাবে, তারপর জীবন তাদের অন্য দিকে নিয়ে যায়!) তখন ছাত্রসংখ্যা এরকম ভয়াবহ ছিল না, টাকা থাকলে ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হওয়া কঠিন ছিল না এমন কিছু। কিন্তু আমার পক্ষে ওই স্বপ্নটি একেবারেই অলীক, পাঁচ বছর ধরে ডাক্তারি পড়ার অর্থ-সামর্থ্য আমি কোথায় পাব? সুতরাং বিজ্ঞান ছেড়ে কলা বিভাগ, এখন যাকে বলে হিউম্যানিটিজ। দু'বছরের অনার্স, আমার পক্ষে ইংরিজি কিংবা বাংলা নেওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু অস্বাভাবিক কোনও পথে ঠেলে দেওয়াই যে আমার নিয়তি। তখন সকলেরই ধারণা, ইংরিজি-বাংলা পড়লে চাকরি পাবার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না, তাই বাবা আদেশ দিলেন, আমাকে অর্থনীতি পড়তে হবে। অর্থনীতি নিয়ে পাস করলে ব্যাঙ্কের চাকরি পাওয়া যায় এবং ব্যাঙ্কের চাকরি লোভনীয়। এবারেও প্রেসিডেন্সি বাদ, যেতে হবে ছাত্রীবর্জিত কোনও কলেজে, সিটি কলেজের অর্থনীতি বিভাগটি নাকি জোরালো। আমহার্স্ট স্ট্রিটের সে কলেজটি আমাদের গ্রে স্ট্রিটের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়।

কিছুদিন বেশ উৎসাহের সঙ্গেই অর্থনীতির ক্লাস করেছি। গোড়ার দিকে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনৈতিক বিজ্ঞান যুগ্মভাবে থাকে, তার ইতিহাসের দিকটা আমাকে আকৃষ্ট করে। তারপর শুরু হয় অঙ্ক, ক্রমশ কঠিন অঙ্ক, খুব জোর করে মনঃসংযোগের চেষ্টা করলেও সেই অঙ্কের জটিলতায় আমি চক্ষে ধাঁধা দেখি, খুব অসহায় বোধ হয়। ক্লাসে বসে থাকতে থাকতে বুঝতে পারি, আমার মুখখানা ম্লান, ম্রিয়মাণ, অন্যরা আমার দিকে অবাকভাবে তাকায়। দু'-একটা পত্রপত্রিকায় তখন আমার কবিতা ছাপা শুরু হয়েছে, এক সহপাঠী একজন অধ্যাপককে সে কথা জানিয়ে দিতেই তিনি বিদ্রূপ করে বললেন, অ্যাঁ, কবি হয়ে তুমি ইকোনমিক্স পড়তে এসেছ? কবিতার সঙ্গে যে এর অহি-নকুল সম্পর্ক! তোমাদের এক কবি লর্ড বায়রন অঙ্ক সম্পর্কে কী বলেছিলেন জানো? দুই আর দুইয়ে কেন পাঁচ হবে না? হ্যাঁ হবে, বেশ করবে হবে!

হাত খরচের টানাটানিতে হ্যারল্ড ল্যাস্কির গ্রামার অফ পলিটিক্স বইখানা যেদিন কলেজ স্ট্রিটের পুরনো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দিই, সেদিনই বুঝেছিলাম, অর্থনীতিতে স্নাতক হওয়া আমার ইহজীবনে হবে না, কোনওরকমে পাস কোর্সে উতরে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। তখন আর অনার্সের বিষয় বদল সম্ভব ছিল না।

আমাদের সমসাময়িক ছিলেন অমর্ত্যকুমার সেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি বিভাগে, সম্ভবত আমাদের চেয়ে এক বর্ষ ওপরে। তখনই খুব সুখ্যাত ছাত্র। এই সেদিন অমর্ত্যকুমার সেন অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পাবার পর আমি একটি পত্রিকায় মন্তব্য করেছিলাম, এই মুহূর্তে অমর্ত্য সেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম অর্থনীতিবিদ, আর আমি নিকৃষ্টতম!

মধ্য পথেই অর্থনীতির ক্লাস এড়িয়ে বাংলা অনার্সের ক্লাসে গিয়ে বসে থাকতাম। সেখানে মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, ফণিভূষণ আচার্যের মতন উদীয়মান কবিদের সঙ্গে পরিচয় এবং একাত্মতা হয় সহজেই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তখন সিটি কলেজের অধ্যাপক, তাঁর গল্প-

কবিতার আমি সে সময়ে বিশেষ অনুরক্ত, তাঁকে দেখা ও তাঁর কথা শোনার আগ্রহও দারুণ। বিভূতি চৌধুরী এবং জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীও অত্যন্ত উচ্চমানের অধ্যাপক। তরুণ শঙ্করীপ্রসাদ বসু তখন সবেমাত্র সিটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেছেন। আমি বাংলা অনার্সের পরীক্ষা দিতে পারব না, তবু ওই সব ক্লাসেই কাটাই বেশি সময়।

ইতিমধ্যে দীপক মজুমদারও স্কুলের গণ্ডি শেষ পর্যন্ত পেরিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে। আগেই বলেছি, স্কুলের ছাত্র হিসেবে দীপক একেবারেই বেমানান ছিল, কলেজে এসে তার যথার্থ স্বরূপ বিকশিত হল, গানে-গল্পে-কবিতা-আবৃত্তিতে সে জনপ্রিয় হয়ে উঠল অচিরেই। এরই মধ্যে দীপক দ্বিতীয়বার জেল খেটে এসেছে, তার উপলক্ষটি ঘটেছিল আমাদের চোখের সামনেই। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস থেকে আমরা কয়েক বন্ধু পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছি, তখন প্রায়ই হেঁটে ফিরতাম পয়সা বাঁচাবার জন্য, তখন প্রতিটি দিনই ছিল ঘটনাবহুল। নানারকম সরকার-বিরোধী আন্দোলন লেগেই ছিল, যখন তখন মিছিল, অবরোধ, ট্রাম-বাস বন্ধ, সোডার বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি ও টিয়ার গ্যাস। সেদিনও সেরকম কিছু শুরু হয়েছিল, ঘন ঘন পুলিশের গাড়ি, লোকজন ছুটছে, এখানে সেখানে পথ-অবরোধ, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ট্রাম-বাস, তারই মধ্য দিয়ে অম্লানবদনে গল্প করতে করতে হাঁটছি আমরা। হেদো ছাড়িয়ে, রংমহল থিয়েটারের কাছাকাছি এসে হঠাৎ দীপক বলে উঠল, এখানে একটা রোড ব্লক করলে হয় না? আমাদের মতামতের অপেক্ষা না করেই সে রাস্তার ধারের একটা বড় টিনের ডাস্টবিন ধরে টানাটানি শুরু করল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাশের গলি দিয়ে বেরিয়ে এল একটা পুলিশের গাড়ি, টপাটপ পুলিশরা নেমে পড়তেই আমরা চোঁ চোঁ দৌড় লাগালাম, হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল শুধু দীপক।

তখনও আমাদের সন্ধের মধ্যেই বাড়ি ফেরার অভ্যেস, রাত সাড়ে আটটা-ন'টার সময় দীপকের মা আমাদের বাড়িতে খোঁজ নিতে এলেন। উত্তর কলকাতায় দীপকদের আর আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, দীপকের মা একা, অসহায়, চক্ষু দুটি সজল। দীপক ধরা পড়েছে আর আমরা পালিয়ে এসেছি, এজন্য আমার অপরাধবোধ হয় তাঁর কাছে। সেই রাতেই আশু আর আমি গেলাম বড়তলা থানায়, দারোগাবাবুর কাছে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে কাকুতি-মিনতি করে বললাম, আমাদের বন্ধুকে ছেড়ে দিন, ও ওর মায়ের একমাত্র সন্তান, সামনেই পরীক্ষা ...। দারোগাবাবু চোখ পাকিয়ে বাজখাঁই গলায় বললেন, সবই তো এক দলের। কেউ বাইরে, কেউ ভেতরে। তোমাদেরও কি ভেতরে যাবার সাধ হয়েছে নাকি? তিনি উঠে দাঁড়াতেই আমরা আবার দৌড় লাগালাম, পরীক্ষা নষ্ট করে জেল-খাটা বীরপুরুষ হবার সাধ আমাদের ছিল না!

সেবারে দীপকের দশ-বারো দিন হাজতবাস হয়েছিল শুধু, আগেরবারের মতন রাজনৈতিক বন্দির সম্মান পায়নি, এটা পেটি কেস, ডাস্টবিন টানার জন্য ক্রিয়েটিং পাবলিক নুইসেন্স। দীপকের বিচারের দিনে আমরা কয়েক বন্ধু গিয়েছিলাম আদালতে। জীবনে সেই প্রথম আমার আদালত-দর্শন। ব্যাঙ্কশাল কোর্ট কিংবা স্মল জজেজ কোর্ট, (কেন ব্যাঙ্কশাল কোর্ট নাম, তা আজও জানি না, এরকম কত শব্দ আমরা অর্থ না জেনে উচ্চারণ করে যাই।) সেখানে একটি কক্ষে সকাল দশটা থেকে বসে আছি। একটা কাঠের খাঁচার ওপাশে এক দল আসামীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি দীপককে, এর মধ্যে যেন আরও রোগা হয়ে গেছে, আমাদের সঙ্গে কথা বলার উপায় নেই, ইঙ্গিত চলছে চোখে চোখে, একের পর এক আসামীর বিচার চলছে, দীপকের কখন ডাক পড়বে তার ঠিক নেই। অনেক বছর পর বিনয় মজুমদারকে ছাড়াতে আমি আর তারাপদ রায় গিয়েছিলাম আদালতে, কিন্তু দীপকের বেলায় ওই প্রথমবার একটা সাঙ্ঘাতিক নাটকীয় ব্যাপার আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আদালতকক্ষটিতে বেশ ভিড়, দর্শক বা শ্রোতা বা পার্টির লোকদের জন্য কয়েকখানা মাত্র বেঞ্চি, অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। এক দিকের দেওয়াল ঘেঁষে বসে আছে পাঁচ-সাতটি স্ত্রীলোক, তাদের মধ্যে কেউ আবার মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে কেঁদে

উঠছে। এক সময় বিচার চলছে একটি যুবকের, চোখ দুটি এমন লাল যে মনে হয় তখনও নেশাগ্রস্ত, পান-খাওয়া ঠোঁট, চুল খাড়া খাড়া, লুঙ্গি ও সবুজ গেঞ্জি পরা, দেখলেই মনে হয় চোর কিংবা স্মাগলার কিংবা গুণ্ডা এরকম কিছু ছাপ মারা আছে তার গায়ে। সরকারি উকিলের একঘেয়ে বিবরণ চলছে, এরই মধ্যে হঠাৎ সেই যুবকটি এক লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল আসামীর কাঠগড়া থেকে, হিংস্র-ভাবে ছুটে এল সেই স্ত্রীলোকদের দিকে। ভয় পেয়ে সবাই সরে গেল, প্রায় চোখের পলকে কিছু বুঝতে না-বুঝতেই আমরা দেখলাম, ওদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোককে হিঁচড়ে বার করে যুবকটি তার মুখ চেপে ধরেছে, গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত! প্রথমে ভেবেছিলাম বুঝি সে স্ত্রীলোকটির একটা চোখ উপড়ে নিচ্ছে, তা নয়, যুবকটির হাতে লুকনো ছিল একটি ব্লেড, তা দিয়ে সে নাকটা কেটে দিয়েছে ওই স্ত্রীলোকটির। কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার, তার পরেই আদালতের রক্ষীরা এসে যুবকটিকে জাপটে ধরে পেটাতে শুরু করে, স্ত্রীলোকটির আধখানা নাক পড়ে আছে মাটিতে। আমরা তখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক, এসব ঘটনার মর্ম বোঝার কথা নয়, তবু অভিজ্ঞতা সব শিখিয়ে দেয়। লোকজনদের পরবর্তী সরব আলোচনা থেকে বোঝা গেল, যাকে আন্ডার ওয়ার্লড বলে, ওই যুবক ও স্ত্রীলোকেরা সেখানকার বাসিন্দা, ওদের নিজেদের মধ্যে কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে তার নাক কেটে দেওয়াই প্রতিশোধের রীতি। স্ত্রীলোকটি ঠিক কীভাবে বিশ্বাসঘাতিনী সে গল্প জানা হয়নি, কিন্তু যুবকটির জেদ ও সাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম!

দীপকের সঙ্গে স্কটিশ চার্চ কলেজে আড্ডা দিতে গিয়ে আলাপ হয় তার সহপাঠী আনন্দ বাগচীর সঙ্গে, তখনই প্রচুর পত্রপত্রিকায় ছাপা হয় তার কবিতা। ওদের আর এক সহপাঠী দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গল্প লেখে; দীপেন শারীরিকভাবে ছোটখাটো কিন্তু মানুষ হিসেবে খুব বড় মাপের, পরবর্তীকালে তার সঙ্গে আমার গভীর সখ্য হয়। সেই বয়েসেই দীপেন 'আগামী: মাঝি' নামে একটি উপন্যাস লিখে ফেলেছিল। আর এক বন্ধুর নাম স্বপন দাস, সেও বেশ লেখালেখি করে, ছবি আঁকে, সব সময় হাসতে ভালোবাসে। একদিন মাঝ রাত্তিরে একা ঘরে বসে বাঘের ছবি আঁকতে আঁকতে হঠাৎ তার ঘর বাঘের গায়ের গন্ধে ভরে যায়, ভয় পেয়ে সে ছবি আঁকা বন্ধ করে ফেলে!

কফি হাউসের আড্ডার সময়ও বাড়তে থাকে ক্রমশ। শুধু সাহিত্য নয়, রাজনীতির প্রসঙ্গ নিয়ে তর্কাতর্কিই হয় বেশি। সারা দেশের হাওয়া খুব গরম, সেই আঁচ থেকে গা বাঁচানো কারও পক্ষে সম্ভব নয়। দীপক তখন কমিউনিস্ট পার্টির উগ্র সমর্থক, দীপেনের পরিবার কংগ্রেসী। তার এক দিদি ও পিসি পশ্চিমবাংলার মন্ত্রীও হয়েছিলেন, কিন্তু দীপেন দৃঢ়ভাবে বামপন্থী। আমিও ওদেরই সহগামী। কমিউনিস্ট পার্টির স্টাডি সার্কেলে আমি তখন বস্তির ছেলেদের বিনা পয়সায় পড়াই, আবার দাদাদের কাছে রাজনীতির পাঠ নিই, ছাত্রদের মিটিং-মিছিলে যাই নিয়মিত। আমার রাজনৈতিক জীবন স্বল্পস্থায়ী, এই সময়কার দু'বছর তা তুঙ্গে উঠেছিল। ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতে প্রথম যে সাধারণ নির্বাচন হয়, তাতে কলকাতার উত্তর-পূর্ব কেন্দ্রের কমিউনিস্ট প্রার্থী হন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আমাকে একটি বুথে তাঁর পোলিং এজেন্ট হতে হয়েছিল। সে দায়িত্ব পেয়ে বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীর ভাব হয়েছিল, যদিও আমার নিজেরই তখন ভোট দেবার বয়েস হয়নি। সেবারে প্রায় সমস্ত বামপন্থী দলগুলি জোট বেঁধে সংযুক্ত সমাজবাদী সংস্থা গড়েছিল। বটকৃষ্ণ পাল এভিনিউয়ের একটি বুথে আমি পোলিং এজেন্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম, সামনে ভোটার লিস্ট, হাতে পেন্সিল, সন্দেহজনক ভোটারদের বাবার নাম, বয়েস ইত্যাদি নিয়ে জেরা করাই কাজ। সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ডিউটি, এর মধ্যে একবার কিছু খেতে হবে তো, আর কয়েকবার চা, সে জন্য আমাকে হাতখরচ দেওয়া হয়েছিল ছ'আনা (সাঁইত্রিশ পয়সা), আর আমার পাশে বসা কংগ্রেসের পোলিং এজেন্ট সগর্বে জানিয়েছিল, তার বরাদ্দ তিন টাকা, তা ছাড়াও কারা যেন

তাকে পাঠাচ্ছিল বিরিয়ানির প্যাকেট, ঘন ঘন চা। কিন্তু দৈন্যই যেন আমাদের গর্ব, শুধু রুটি আলুর দম খাওয়ার মধ্যে আছে আত্মত্যাগের আদর্শ, সে ছেলেটি চা খাওয়াতে চাইলে প্রত্যাখ্যান করেছি। সেই নির্বাচনে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সসম্মানে জয়ী হওয়ায় আমরা দল বেঁধে নাচানাচি করেছি রাস্তায়।

শুধু পোলিং এজেন্টের দায়িত্বই নয়, কাছাকাছি সময়ে একটি উপ-নির্বাচনে নকল ভোট দেওয়ার দীক্ষাও হয়ে গেছে। কাজটা তেমন কঠিন কিছু নয়, ভোটার লিস্ট দেখে খুঁজে বার করতে হয় কাছাকাছি বয়েসের ক'জনের নাম আছে, তাদের কে কে ভোট দেয়নি, সেই নাম মুখস্থ করে ছুটে যাওয়া। একবার ভোট দিলে আঙুলের ডগায় কালো টিপ দিয়ে দেয়, কে যেন আবিষ্কার করল দেশলাই কাঠির বারুদের দিকটা জলে ভিজিয়ে ঘষাঘষি করলে সেই দাগ উঠে যায়। সত্যি তাই, মিনিট পাঁচেক লাগে। বাগবাজারে বিভিন্ন বুথে শক্তি আর আমি একদিনে তিনটে ভোট দিয়েছি।

এর চেয়েও বেশি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছি ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে। ট্রাম চলাচল ব্যবসার মালিক তখনও এক ব্রিটিশ কোম্পানি। ওই সময় সরকারের অনুমোদন নিয়ে কোম্পানি ভাড়া বাড়ায় এক পয়সা। এখন এক পয়সা চোখেই দেখা যায় না, সে সময় মাত্র ওই এক পয়সার জন্য কী ধুন্ধুমার কাণ্ড হয়েছিল তা প্রত্যক্ষদর্শী কারও কারও হয়তো মনে আছে। তখন যে-কোনও উপলক্ষে কংগ্রেস সরকারকে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করে তোলাই বিরোধী দলগুলির উদ্দেশ্য। এই ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ আন্দোলনে জনসমর্থনও পাওয়া যায় প্রবলভাবে। সে সময় মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বিদেশে, প্রফুল্ল সেন অস্থায়ী দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তিনি প্রতিবাদীদের শক্তি ও জনরোষ বুঝতে পারেননি, ১৪৪ ধারা জারি করে, পুলিশকে লাঠি-গুলি চালাবার নির্দেশ দিয়ে আগুন আরও বাড়িয়ে দেন। যাত্রীরা ট্রামে উঠে পুরনো ভাড়া দেবে, কন্ডাকটার তা নেবে না, বচসা শুরু হবার একটু পরেই কীভাবে যেন ট্রামে আগুন লেগে যায়। প্রচুর ট্রাম-বাস পুড়েছিল, বোধহয় সেই সময় থেকেই ট্রাম-বাসে আগুন দেওয়া শুরু হয়। রাস্তার যেখানে সেখানে দেখা যেত দগ্ধ ট্রামের কঙ্কাল। প্রত্যেকদিন আমরা ছুটে যেতাম ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, সেটাই আন্দোলনের কেন্দ্র, শুরু হত পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ, তাড়া খেয়ে আমরা পালাতাম অলিতে-গলিতে, আবার ফিরে এসে ছুঁড়তাম আধলা ইট। লাঠির ঘা আমার পিঠে পড়েনি, তবে টিয়ার গ্যাসে কেঁদেছি প্রচুর। ইট তো ছুঁড়েছিই, একবার খানিকটা বেশি সাহস দেখিয়ে পায়ের কাছে এসে পড়া একটা টিয়ার গ্যাসের সেল সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছি এক পুলিশের মাথায়।

রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে আমার সশস্ত্র সংগ্রামের ভূমিকা শুধু ওই পর্যন্ত। না, বোমা ছুঁড়িনি, নিজের হাতে কোনও ট্রাম-বাসে আগুনও ধরাইনি, বন্দুক-পিস্তল কখনও ছুঁয়ে দেখি নি। এরপর ক্রমশ রাজনীতির সঙ্গে আমার সম্পর্ক আলগা হতে থাকে। দাদা শ্রেণীর নেতারা যখন কবিতা লেখা বিষয়ে উপদেশ ও খবরদারি শুরু করলেন, তখনই বুঝে গেল , এঁদের সংস্রবে আমি বেশিদিন টিকতে পারব না! কিছুদিন পর, ট্রাম ভাড়া আন্দোলনে সরকার শেষ পর্যন্ত পিছু হটে নতি স্বীকার করেছে বলে ছাত্রদের উদ্দীপনা তুঙ্গে। আর একটি কোনও তুচ্ছ কারণে কলেজ স্ট্রিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে আকস্মিকভাবে মারামারি শুরু হয়ে যায়, দু'পক্ষেরই হিংস্রতা বাড়তে বাড়তে গুলি চলতে লাগল, পুলিশের তাড়া খেয়ে আমরা এক দল সিনেট হলের এক পাশ দিয়ে ছুটে একটা গলির মতন জায়গায় ঢুকে টিনের দরজার পাল্লা বন্ধ করে দিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে একটা গুলি সেই দরজা ফুটো করে এল। চোখ বুজে রইলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য, শুধু ভাবছি, মরে গেছি না বেঁচে আছি? গুলিটা আমার বুকে লাগতেই পারত, লেগেছে পাশের ছেলেটির কাঁধে, সে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তাকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে মনে হল, যদি গুলিটা আমার বুকে লাগত, আমি প্রাণ দিতাম, সেই প্রাণদান কীসের

জন্য? তা দেশের কোন্ উপকারে লাগত? এ তো নিতান্তই নির্বোধের মতন মৃত্যু। এই ছেলেটিও কি বাঁচবে? কিংবা এর ডান হাতটাই যদি অকেজো হয়ে যায়, তাতেই বা কোন আদর্শ জয়ী হবে?

না। এভাবে প্রাণ দিতে আমি রাজি নই। এ পথ আমার নয়।

উনিশ

এক একটি বিকেল অন্যরকম।

এখন বাড়ির চেয়ে বাইরে থাকার সময় অনেক বেড়ে গেছে। এখন কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, বাবার হাতে মার খাবার আর ভয় নেই, শুধু বকুনি আর ভ্রূকুটিতে আমাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না, এখন গমন-আগমন যদৃচ্ছ। এই সময়টায় মা-বাবা-ভাই-বোনের চেয়েও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ প্রিয়তর হয়ে ওঠে।

সকালবেলা টিউশানি করতে বেরিয়ে পড়ি, ফিরে এসেই গরম ডাল-ভাত খেয়ে কলেজ অভিমুখে দৌড়, সেখানে সব কটি ক্লাসে হাজিরা দেওয়া কিংবা না-দেওয়া প্রতিদিনের ইচ্ছে বা মেজাজের ওপর নির্ভরশীল, তারপর কফি হাউসে এসে সুদীর্ঘ আড্ডা, একফাঁকে টুক করে উঠে গিয়ে আর একটি টিউশানি শেষ করে ফিরে এসে আবার আড্ডার মাঝখানে একটি চেয়ারে বসে পড়া। আমার নিজস্ব পড়াশুনো রাত্রে বাড়ি ফেরার পর। আড্ডার প্রধান বিষয় সাহিত্য, রাজনীতি এবং নারী-রহস্য। বেশ কয়েক বছর আমাদের আড্ডা ছিল সিগারেট ও নারীবর্জিত, পরে বন্ধুপত্নী হিসেবে কবিতা সিংহ যোগ দেন। অপর্ণা নাম্নী কিশোরীটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল অতি গোপন, বন্ধুবান্ধবদের সম্পূর্ণ অগোচরে আমি তার সঙ্গে দেখা ও চিঠি বিনিময় করতাম।

কিন্তু এক একটি বিকেল একেবারে অন্যরকম। যেন বুকের মধ্যে ঘুরপাক খেত এক প্রকারের গরম বাতাস, উল্টোপাল্টা হয়ে যেত প্রতিদিনের জীবনযাত্রা। কলেজ থেকে সহপাঠীদের কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে পড়ি একা, কফি হাউসে যাই না, হাঁটতে থাকি দিকশূন্যভাবে, কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কিছুই মনে আসে না, অপর্ণার সঙ্গে দেখা করতেও ইচ্ছে করে না। দুপুরে সে এক নির্জন ঘরে বসে পড়াশুনো করে, বাড়িতে শাড়ি পরে না, স্কার্ট-ব্লাউজ, চুল খোলা, রাস্তার ধারে জানলা, সেই জানলায় লোহার শিক, সেখানে দাঁড়ালে যেন জেলখানার গরাদের এপাশে ওপাশে আমরা দু'জন, হাত ছোঁওয়া যায়, চিঠি দেওয়া যায়। ইচ্ছে করলেই আমি সেখানে যেতে পারি, যাই না। বিকেলে সে গানের স্কুলে যায়, সেই স্কুল কখন ছুটি হয় জানি। গানের স্কুলের সামনের পার্কে সেই সময় অপেক্ষা করলে তার সঙ্গে দেখা হয়, কয়েক পা এক সঙ্গে হেঁটে এক ট্রামে ওঠা, জীবন ধন্য করার সুযোগ, তবু যাই না। শুধু শুধু ঘুরি দেশবন্ধু পার্কের পাশ দিয়ে, গঙ্গার ধারে, এমন সব রাস্তায় যেখানে চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হবে না। কেন সকলকে এড়িয়ে যাবার এই অদ্ভুত বাসনা জাগে এক এক বিকেলে, বুঝি না নিজেই। ঘুরতে ঘুরতে মনে হয়, আমি কী যেন একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি, কেউ টের পায়নি এখনও। কিছু একটা অন্যায় করে ফেলেছি, সেজন্য আমার স্বীকারোক্তি দেওয়া উচিত, কিন্তু অন্যায়টা নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়।

এই যে অজ্ঞাতসারে গভীর কোনও দোষ করে ফেলার অনুভূতি, এটা প্রায়ই ফিরে ফিরে আসে। এক এক সময় সেই অপরাধবোধ এমনই তীব্র হয় যে তারপরেই মনে হয়, বেঁচে আছি

কেন? টুপ করে মরে গেলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়। সেই মৃত্যুচিন্তা বড় মোহময়, যেন এক অনন্ত রহস্যের হাতছানি। রাস্তায় রাস্তায় পাগলের মতন ঘুরছি আর মনে হচ্ছে, এই পৃথিবী থেকে নিঃশব্দে হারিয়ে যাওয়াই তো সবচেয়ে ভালো। এইটাই একমাত্র সিদ্ধান্ত, যা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। এই হারিয়ে যাওয়া মানে কি আত্মহত্যা? সেরকমও ভেবেছি কয়েকবার। অথবা, কোনও বৃহত্তর কারণে প্রাণদান, যদি কোনও গৃহযুদ্ধ বা বিপ্লব শুরু হয়, ছুটে যেতে হবে একেবারে সামনে, কোথাও নাম থাকবে না, মুছে যাবে সব কিছু।

ষোলো-সতেরো থেকে একুশ-বাইশ বছর পর্যন্ত সময়সীমাটা অতি ভয়ঙ্কর, যেন আগুনের মধ্য দিয়ে পার হওয়া। এই বয়েসের ছেলেরা (মেয়েদের কথা জানি না) অতি তুচ্ছ কারণে প্রাণ দিতে পারে, এরাই যে-কোনও যুদ্ধে কামানের খাদ্য হয়, রাজনৈতিক নেতারা এদেরই সামনে ঠেলে দেয়। এর থেকে উত্তীর্ণ হওয়া অতি কঠিন পরীক্ষা। যৌবনের আগমনের অসহনীয় তীব্রতাই কি এর কারণ?

রাত্রে পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে কবিতা লেখা, তখনও মনে হত, কেন এসব লিখছি? কয়েকটি পত্রপত্রিকায় ছাপা হচ্ছে, দু'চারজন বাহবা দিচ্ছে, সেটাই কি সার্থকতা? শব্দ সাজানো, শব্দসন্ধান, মনোমতন সঠিক শব্দটি না পাওয়ার জন্য মধ্যরাত্রির ছটফটানি, এর কি কোনও মূল্য আছে? এক এক সময় সব কিছু ছিঁড়ে-ফিরে দিতে উদ্যত হয়েছি, কখনও কবিতার খাতা মাটিতে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়েছি তার ওপর, আপন মনে বলেছি, চাই না, এসব কিছু চাই না।

লেখার নেশা তখনও আমার ধরেনি, কিন্তু পড়ার নেশা রক্তে মিশে গেছে। একা থাকলেই চোখের সামনে ছাপা অক্ষর কিছু না-কিছু চাই-ই। ততদিনে প্রচুর বাংলা বই শেষ করে ইংরেজি বই ধরেছি। মনে আছে। স্কুলজীবনের শেষ দিকে আমি প্রথম যে ইংরেজি উপন্যাসটি সম্পূর্ণ পাঠ করি, সেটি অস্কার ওয়াইল্‌ডের 'দা পিকচার অফ ডোরিথান গ্রে'। সব ইংরেজি শব্দের মানে বুঝি না, তবু ঠিক করেছিলাম অভিধান না দেখেই পড়ে যাব, সেরকমভাবেই শেষ করেছি, বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কলেজে রাশিয়ান উপন্যাসগুলি মোহিত করে রেখেছিল, আমি সবচেয়ে ভক্ত হয়েছিলাম ডস্টয়েভস্কি'র। তাঁর 'নোট্‌স ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড' পড়ে একেবারে হতবাক। কবিতায় এক এক সময় এক এক জনের নাম হাওয়ায় ভাসে। তখন ইংরেজি কবিতায় টি এস এলিয়টের পর অডেন ও স্পেন্ডারকেই মনে করা হয় আধুনিকতম, এলিয়টের গুরু এজ্‌রা পাউন্ড নাৎসি বাহিনীর সমর্থক ছিলেন বলে অবজ্ঞার পাত্র। কফি হাউসে রাইনের মারিয়া রিল্‌কেই সবচেয়ে বেশি আলোচ্য, অনেকেরই হাতে রিল্‌কের কাব্যগ্রন্থ। কয়েক মাস বাদেই ঝোঁক গেল ফরাসি কবিতার দিকে, বদলেয়ার ও র‍্যাঁবো একসঙ্গে, ভের্লেইন তেমন পাত্তা পাননি, আর মালার্মের নাম উচ্চারণ করাই উচ্চভুরু বুদ্ধিজীবী হওয়ার লক্ষণ। আমার বেশি পছন্দ হয়েছিল পরবর্তীকালের আঁরি মিশো'র কবিতা।

বিদেশি সাহিত্যপাঠ তখন নব্য কবি-লেখকদের মধ্যে ফ্যাশন দস্তুর ছিল, কে নতুন কী পড়েছে তা নিয়ে বাগাড়ম্বর চলত প্রায়ই। কেউ কেউ অবশ্য শুধু মলাট মুখস্থ করে আসত, কারও কারও হাতে থাকত ভারী ভারী বই, তাদের একটু টেপাটেপি করলেই বোঝা যেত, বইগুলি বহন করাই তাদের কাছে বিদ্যার পরাকাষ্ঠা। কোনও কোনও অধ্যাপকেরও ক্লাসে হঠাৎ কোনও টাটকা বিদেশি বইয়ের নাম উল্লেখ করার বাতিক ছিল, একজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অর্নেস্ট হেমিংওয়ের সদ্য প্রকাশিত 'দা ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দা সি' উপন্যাসটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন একদিন, বইটি সংগ্রহ করে পড়ে ফেললাম, তারপর সেই অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দেখি, তিনি সমালোচনা পড়েছেন মাত্র, মূল বইটি ছুঁয়েও দেখেননি।

বাংলায় তখন চমৎকার সব অনুবাদও প্রকাশিত হত সিগনেট প্রেস থেকে। এরিখ মারিয়া রেমার্ক হয়তো খুব উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক নন, কিন্তু তাঁর 'অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' এবং 'থ্রি কমরেডস' মাতিয়ে রেখেছিল তরুণ মন। 'থ্রি কমরেডস'-এর সাবলীল বাংলা অনুবাদ

'তিন বন্ধু', বন্ধুত্বের এমন মর্মস্পর্শী কাহিনী পড়ে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন ছিল। রেমার্কের আরও ভালো উপন্যাস 'দা রোড ব্যাক', সেটিও বন্ধুত্বের কাহিনী কিন্তু সে বই কেন বাংলায় অনুবাদ হয়নি জানি না। রেমার্ক সৈনিক হিসেবে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, সেই অভিজ্ঞতাভিত্তিক লেখাগুলিতে ছিল, যাকে বলে অথেনটিসিটির সৌরভ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নিয়েও তিনি কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন, তা পরোক্ষ জ্ঞান থেকে রচিত বলেই কৃত্রিম লাগে। লটারিতে অনেক টাকা জিতে রেমার্ক আমেরিকায় গিয়ে থাকতে শুরু করেন, হলিউডের এক নায়িকাকে জয় করার জন্য ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস-এর মতন অভিনেতা ও ক্ষমতাবান পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন বলে শোনা যায়। সে যাই হোক, রেমার্ককে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কি আমেরিকানদের পছন্দ করেন? রেমার্ক বলেছিলেন, না। তবে কি জার্মানদের? না। ফরাসিদের? না। ইংরেজদের? না। তা হলে কোন জাতের মানুষদের পছন্দ করেন? রেমার্ক বলেছিলেন, আমি পছন্দ করি আমার বন্ধুদের! বন্ধুত্বের জয়গাথা যিনি রচনা করেছেন, আমাদের সেই বয়েসে তাঁকে তো ভালো লাগবেই!

আমার প্রতিদিনের সঙ্গী ছিল একখানি বই, মহাভারত। কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্য অনুবাদ সবকটি খণ্ড একসঙ্গে বাঁধানো, আমি কিনেছিলাম প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনের রেলিং-এর পুরনো বইয়ের দোকান থেকে, খুব শস্তায়। পাতাগুলি হলদেটে, অতি সন্তর্পণে ওলটাতে হয়, রোজ একটু একটু করে পড়ি, যে-কোনও জায়গা থেকে। এর আগে কাশীরামদাসের পদ্যানুবাদে মন বসাতে পারিনি, পরেও দেখেছি, যে-কোনও ক্লাসিক গ্রন্থের অনুবাদ পদ্যের চেয়ে গদ্যেই বেশি আকর্ষণীয় হয়। রাজশেখর বসুর গদ্য সারানুবাদ ভাষাগুণে ক্লাসিক হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য, কিন্তু মূলের যে ছড়ানো এলোমেলো ভাব, কাহিনীর মধ্যে কাহিনী, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের যখন তখন স্থানবদল (ম্যাজিক রিয়েলিজম?), ভদ্রতা-সভ্যতার দৃষ্টান্ত, এক একটি চরিত্রের গাম্ভীর্য ও বিষাদ, তার তুলনা অন্য কোনও গ্রন্থে পাইনি। আমার অনেক মনখারাপের দিনে মহাভারত পড়ে সান্ত্বনা পেয়েছি। না, সান্ত্বনা কথাটা হয়তো ঠিক হল না, বাস্তব বিস্মৃত হয়ে চলে তো গেছি সেই যুগে। আমার এক সাহিত্যবোদ্ধা মুসলমান বন্ধু মহাভারত পড়েনি, সে বলেছিল মহাভারত তাদের পাঠযোগ্য নয়, শুনে অবাক হয়েছিলাম। মুসলমানদের ধর্মান্তর গ্রহণের আগেকার যা কিছু ভারতীয় ঐতিহ্য, তার অধিকার তারা গ্রহণ করবে না কেন? মহাভারত হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ নয়, রাজা-রাজড়াদের যুদ্ধকাহিনী, অবশ্য তার মধ্যে অনেক দেবদেবীর সশরীর উপস্থিতি আছে। ক্রিশ্চানরা কি গ্রিক ও রোমান পুরাণ কাহিনীগুলো পড়ে না, যাতে প্যাগান দেবদেবীর কথা আছে? এমনকী এখনও তাদের ক্যালেন্ডারে দিনের নাম, মাসের নামে সেইসব দেবদেবীর নাম জড়িত (যেমন থার্সডে, জানুয়ারি), সেগুলি তো তারা বর্জন করেনি। মীর মশারফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' পড়ে আমি কত কেঁদেছি, সেটি আমার অন্যতম প্রিয় বই। আমার সেই বন্ধুটির নাম মইনুদ্দিন হুসাইন, সে লেখালেখির জগতে থাকেনি, অনেক বছর পর সে আমেরিকা থেকে চিঠিতে জানিয়েছিল যে সেখানে সে সংক্ষিপ্ত ইংরেজি অনুবাদে মহাভারত পড়েছে এবং মুগ্ধ হয়েছে, আমার কাছ থেকে রাজশেখরের বইটি চায়, আগে পড়েনি বলে অনুতপ্ত। সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি, মহাভারত-জ্ঞানে তিনি ঢের ঢের বামুন পণ্ডিতকে জব্দ করে দিতে পারেন। এখন অনেক বাঙালি মুসলমানের রচনায় মহাভারতের উল্লেখ শুধু নয়, নিজস্ব ভাষ্য পর্যন্ত দেখতে পাই।

বরানগরের এক কবিতাপাঠের আসর থেকে ফেরার পথে দীপক হঠাৎ বলে বসল, আমাদের কবিতার বই ছাপা হবে না কেন? বই না থাকলে কি কেউ কবি হয় নাকি? অবিলম্বে উদ্যোগ নিতে হবে। তখনও পর্যন্ত আমার সাকুল্যে দশ-বারোটি কবিতা ছাপা হয়েছে, দীপকের অনেকগুলি, তার বই ছাপা হতে পারে, আমার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু দীপক জেদ ধরল, ছাপা হবে যুগ্ম-কাব্যগ্রন্থ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের প্রথম বই যেভাবে বেরিয়েছিল।

দীপকের বাড়ি মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রিটে, পরদিনই সে পাড়ার এক প্রেসে দীপক হাজির হল তার ছায়াসঙ্গী সমেত। সে প্রেসের মালিক এই গোঁফ-না-ওঠা কবিদ্বয়কে দেখে নিশ্চিত কৌতুকবোধ করেছিলেন, তিনি আমাদের ভেতরের একটি ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কয়েকজন ইয়ার-বক্সী নিয়ে বিয়ার পান করতে করতে বললেন, পড়ো তো ভাই, তোমাদের কবিতা পড়ে শোনাও! আমরা পড়ছি, তিনি মাটিতে চাপড় মারতে মারতে বলছেন, বাঃ বাঃ, খাসা! অনেক পাকা পাকা কথাও জানো দেখছি! কয়েক বোতল বিয়ার উড়িয়ে দিয়েও কিন্তু তাঁর বিষয়-জ্ঞান অন্তর্হিত হল না, শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, বই ছাপতে তো ভাই টাকা লাগে! তোমরা কি টাকা জোগাড় করতে পারবে? বরং কোনও প্রকাশক পাকড়াও করো।

তখন পত্রপত্রিকার সংখ্যা ছিল অঙ্গুলিমেয়, নিজ ব্যয়ে কবিতাপুস্তক ছাপার রেওয়াজও তেমন চালু হয়নি। বই ছাপার খরচ সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং প্রকাশক ছাড়া গতি নেই। কেউ আমাদের বই প্রকাশ করতে রাজি হবে কি না, সে চিন্তাও দীপকের মাথায় এল না, সে অন্যান্য সব প্রকাশকদের বাতিল করে দিয়ে তৎকালীন বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশক সিগনেট প্রেসকে মনোনীত করে ফেলল, যেন সিগনেট প্রেসই আমাদের বই ছাপিয়ে ধন্য হবে!

সিগনেট প্রেস তখন বাংলা বইয়ের জগতে যুগান্তর এনে দিয়েছে। এঁদের আগে একমাত্র বিশ্বভারতীর বইগুলিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল, তা ছাড়া বাদবাকি সমস্ত প্রকাশনাতেই ছাপা, মলাট, বাঁধাইতে রুচির অভাব ছিল প্রকট। আনন্দ পাবলিশার্সের তখন অস্তিত্ব ছিল না। সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত, ওরফে ডি কে, বাংলা প্রকাশনাকে বিশ্বমানের কাছাকাছি পৌঁছে দেন। প্রভু গুহঠাকুরতার স্ত্রী নীলিমা দেবী দিলীপকুমার গুপ্তের শাশুড়ি, সেই নীলিমা দেবী নিজে একজন শিল্পী এবং ইংরেজি ভাষার কবি এবং তিনি ছিলেন জওহরলাল নেহরুর বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের বান্ধবী। সিগনেট প্রেসের প্রকাশনা শুরু হয় ইংরেজি বই দিয়ে, পরে গল্প শুনেছি, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এক সময় নীলিমা দেবীকে বলেছিলেন, আমার দাদা জেলে বসে একটা বই লিখেছে, তোরা ছাপার ব্যবস্থা করতে পারবি? জওহরলাল নেহরুর ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া প্রকাশিত হয় সিগনেট প্রেস থেকে।

বাংলার অপামর পাঠকসাধারণ সিগনেট প্রেসকে চেনে সুকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইগুলির জন্য। সুকুমার রায়ের বইগুলি কিছুকাল অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সিগনেট প্রেস থেকে সুকুমার রায়ের ছেলের আঁকা ছবি সংযুক্ত করে চমৎকার নতুন সংস্করণ বেরোল 'আবোল তাবোল' তারপর তাঁর অগ্রন্থিত কবিতাগুলি নিয়ে 'খাই খাই', যার বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল 'মৃত্যুর সাতাশ বছর পর লিখে পাঠিয়েছেন'। এ ছাড়াও উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, সুখলতা রাও, লীলা মজুমদার প্রমুখ, রায়চৌধুরী পরিবারের প্রায় সকলের বই, শিশুসাহিত্যে যে পরিবারের ছিল একাধিপত্য, প্রকাশ হতে থাকে সিগনেট প্রেস থেকে। অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনী, ক্ষীরের পুতুল, বুড়ো আংলা, শকুন্তলা দারুণ জনপ্রিয় হয়। দিলীপকুমারের সাহিত্যরুচি অতি আধুনিক, তিনি প্রকাশ করলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের বই, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর উপন্যাস। বিশেষত কবিতার প্রতি তাঁর টান-ভালোবাসা ছিল খুবই বেশি, জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' সিগনেট সংস্করণ প্রকাশের পরই ওই কবি প্রথম ক্ষুদ্র পাঠকগোষ্ঠীর বাইরে পরিচিতি পান। জীবনানন্দ দাশের অন্য বইগুলির নতুন সংস্করণের পর পর আকস্মিকভাবে অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া গেল 'রূপসী বাংলা', সে অবশ্য আরও পরের কথা। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ প্রধান কবিদের প্রত্যেকেরই বই বেরিয়েছে সিগনেট প্রেস থেকে, শুধু তাই নয়, তখনকার দু'জন তরুণ কবি, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও নরেশ গুহ'র বইও প্রকাশ করা হল সমান গুরুত্ব দিয়ে, দেশ পত্রিকায় প্রায় পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন, প্রচ্ছদ ও বিজ্ঞাপনের ভাষাতেও অভিনবত্ব এনেছে সিগনেট প্রেস, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ 'নীল নির্জনে'র

প্রচ্ছদে গভীর সমুদ্রের ঢেউ, আর নরেশ গুহর 'দুরন্ত দুপুরে'র হলুদ 'দুপুর রঙের মলাট'।

সিগনেট প্রেস থেকে নিয়মিত প্রচার করা হত 'টুকরো কথা', তাতে শুধু নিজেদের বইয়ের বিজ্ঞাপন নয়, সমস্ত উল্লেখযোগ্য বাংলা প্রকাশনার পরিচিতি, সাহিত্য সম্পর্কিত নানান সংবাদ এবং ধাঁধা। বিনামূল্যে, যে-কেউ নাম পাঠালেই বাড়িতে পাওয়া যেত ডাকে। শোনা যায়, এক সময় সাড়ে ন' হাজার গ্রাহককে পাঠানো হত টুকরো কথা, ডাকব্যয়ও সিগনেট প্রেসের। এ যেন ব্যবসায় নয়, বাংলা সাহিত্য প্রসারের সাধনা। কবিতার বই ছাপিয়ে কোনও প্রকাশকের সমৃদ্ধি হতে পারে না, সবাই জানে, কিন্তু দিলীপকুমার কী যত্ন করেই না ছাপতেন কবিতার বইগুলি, এক একটি নতুন বই হাতে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে হত। পরে শুনেছিলাম, অন্য বই যে-কোনও দিনই ছাপা হতে পারে, কিন্তু দিলীপকুমার কাব্যগ্রন্থগুলি ছাপার মেশিনে চাপাতে দিতেন শুধুমাত্র মেঘলা দিনে। কটকটে রোদ্দুরের দিনে নাকি কবিতার মুদ্রণ সুশোভন হয় না।

ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে খুব একটা মনোযোগ ছিল না দিলীপকুমারের। অত বড় বড় বিজ্ঞাপন, দামি কাগজে ছাপা, অথচ বইয়ের দাম তুলনামূলকভাবে কম। পঞ্চাশের দশকে একখানি বাংলা বই হঠাৎ অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, সেটি যাযাবর নামে এক ছদ্মনামধারী লেখকের 'দৃষ্টিপাত'। গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রম্য রচনা ধরনের, তবু নতুন ধরনের লিখনরীতির জন্য খুবই জনসমাদৃত হয়েছিল। সেই বইটির পাণ্ডুলিপি প্রথমে সিগনেট প্রেসে আসে, দিলীপকুমার সেটি পড়ে মনোনীতও করেছিলেন, বুঝেছিলেন এর সাফল্য সম্ভাবনা, তবু ছাপতে চাননি একটি বিশেষ কারণে। যাযাবর-এর প্রকৃত নাম বিনয় মুখোপাধ্যায়, তিনি দীর্ঘজীবী হয়েছেন ও আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু সেই প্রথম বইটি প্রকাশের সময় তিনি আত্মগোপন তো করেছিলেন বটেই, তা ছাড়া ভূমিকায় লেখা ছিল যে লেখক অকালমৃত। সেইসবের জন্য পাঠকদের মনে আরও রহস্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু চোখের সামনে লেখককে বসে থাকতে দেখতে পাচ্ছেন অথচ প্রকাশককে লিখতে হবে যে লেখক জীবিত নেই, এটা দিলীপকুমারের কাছে মনে হয়েছিল অনৈতিক, পাঠকদের সঙ্গে ছলনা, তাই তিনি পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়েছিলেন। অন্য প্রকাশক সেই এক বই ছেপে রাতারাতি ধনী হয়ে যায়।

সিগনেট প্রেসের ছোটদের বইগুলি ভালোই চলত, অন্য একটি বই থেকে অভাবনীয় সাফল্য আসে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এক সময় অশ্লীল লেখক হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি মুন্সেফ হিসেবে বাংলার মফস্বলে ঘুরে ঘুরে যতন বিবি, সারেঙ-এর মতন কয়েকটি অবিস্মরণীয় গল্পে বাংলার গরিব হিন্দু মুসলমানের চরিত্র ফুটিয়ে তোলেন, তিনি হঠাৎ প্রবলভাবে ধার্মিক হয়ে গেলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হয়ে লিখলেন তাঁর জীবনী, চার খণ্ডে 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ', শ্রীম রচিত কথামৃত সব সময়েই পাওয়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য জীবনীও আছে কয়েকটি, তবু এই বইটি যেন উন্মাদনা সৃষ্টি করে পাঠকদের মধ্যে, শুধু ভক্ত নয়, সাহিত্যপিপাসু পাঠকরাও বইটি সংগ্রহ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। দোকান খোলার আগেই সকাল থেকে এই বইটির জন্য ক্রেতাদের লাইন, এমনটি আর আগে কখনও দেখা যায়নি। বিজ্ঞাপনে দেখেছি, অল্প সময়ের মধ্যে এই বইয়ের ছিয়ানব্বই হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। দুঃখের কথা এই যে এ গ্রন্থের এত বিরাট সাফল্যের জন্যই নাকি সিগনেট প্রেসের পতন শুরু হয়। এখন যে আর সিগনেট প্রেসের নামও শোনা যায় না, তার অপ্রত্যক্ষ কারণ ওই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী।

দিলীপকুমার গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত প্রকাশক হয়েও কবিতা ভালোবাসেন, কিন্তু আমাদের মতন অর্বাচীন কবির সংখ্যা তো অনেক, তাঁদের সকলেরই কবিতার বই ছাপতে তিনি রাজি হবেন, এ চিন্তাও বাতুলতাযোগ্য। কিন্তু দীপক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কলেজ স্ট্রিটে সিগনেট বুকশপের কাউন্টারে একটি সুদর্শন যুবককে দেখা যায়, তার কাছ থেকে জানা গেল, রবিবার সকালে বাড়িতে গেলে

ডি কে-র সঙ্গে দেখা হতে পারে। সেই রবিবারের আগেই দীপক মলাট আঁকার বন্দোবস্ত করে ফেলতে চায়, এক সন্ধেবেলা হাজির হল সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তখনও চলচ্চিত্রের কোনও সম্পর্ক তৈরি হয়নি, তিনি ডি জে কিমার নামে একটি বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে শিল্পী হিসেবে চাকরি করেন, দিলীপকুমার গুপ্তও সেই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার, তিনি সিগনেটের বইগুলির মলাট সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে আঁকান। সত্যজিৎ রায় মলাট-শিল্পী হিসেবেই সকলের কাছে পরিচিত। দরজা খুলে দাঁড়ালেন সেই দীর্ঘকায় মানুষটি, আমাদের চেয়ে যেন প্রায় দেড়গুণ উচ্চতা, খুবই ভারী কণ্ঠস্বর, সেই তুলনায় দৃষ্টি স্নিগ্ধ। দীপক তাঁর কাছে যে প্রস্তাব দিল, তা ভাবলে আমি আজও লজ্জায় কুঁকড়ে যাই। দীপকের অটোগ্রাফ খাতায় রামকিঙ্কর বেইজের একটি অকিঞ্চিৎকর স্কেচ ছিল, দীপকের দাবি, ওই ছোট্ট স্কেচটা মাঝখানে রেখে বাকি প্রচ্ছদপটটি আঁকতে হবে সত্যজিৎ রায়কে, অর্থাৎ প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবে দু'জনের নাম যুক্ত থাকবে। এরকম প্রস্তাব শুনে সত্যজিৎ রায় যদি আমাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতেন তা হলে তাঁকে কিছুমাত্র দোষ দেওয়া যেত না। কিন্তু অতি ভদ্র মানুষটি সব শুনে মৃদু হাস্যে বললেন, কবিতাগুলি না পড়ে তো মলাট আঁকা যায় না! কবিতার মেজাজ বুঝতে হবে, একদিন পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসবেন, আমি দেখব নিশ্চয়ই।

সিগনেট প্রেসের অফিস ও মালিকদের বাড়ি এলগিন রোডে। উত্তর কলকাতা থেকে আমার ওদিকে বিশেষ যাওয়া হয় না, দীপক অবশ্য সব চেনে। এক রবিবার সকালে আমরা বাস থেকে নামলাম এলগিন রোডের মোড়ে, তারপর অনেকটা হেঁটে, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়ি ছাড়িয়ে, আর. সেনের জাহাজমার্কা বাড়ির পাশ দিয়ে এগোলাম একটা পাতাঝরা নির্জন রাস্তা দিয়ে। তখনও আমি জানি না, আমার প্রতিটি পদক্ষেপে আমি চলেছি একটা দারুণ পরিবর্তনের দিকে। এরপর আমার জীবনটাই বদলে যাবে। সেদিনের ঘটনার ছাপ পড়েছে আমার বাকি জীবনে। দীপক আমার সঙ্গে গেলেও ওর জীবনে কিন্তু সেই ছাপ পড়ল না।

কুড়ি

বাড়িটির সামনে প্রশস্ত গাড়ি-বারান্দা, সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই একজন ভৃত্য আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চেয়ে একটি স্লিপে নাম লিখতে বলল। কয়েক ধাপ শ্বেতপাথরের সিঁড়ির পর দু'দিকে দুটি ঘর, মাঝখান দিয়ে কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। দু'-এক মিনিট বাদেই ডানদিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি, খুবই হৃষ্টপুষ্ট, স্থূলকায়ই বলা উচিত, ঢোলা পা-জামা ও পাতলা সাদা পাঞ্জাবি-পরা, ইনিই স্বয়ং গৃহকর্তা দিলীপকুমার গুপ্ত। প্রথমে তাঁর দৃষ্টি চলে গেল আমাদের মাথার ওপর দিয়ে, আমাদের মতন মলিন পোশাক পরা, ধুলো মাখা পা, প্যান্টের সঙ্গে চটি, অকিঞ্চিৎকর চেহারার দুটি ছোকরাকে তিনি দর্শনার্থী হিসেবে ভাবতে পারেননি। কিন্তু আর কেউ নেই দেখে, 'আপনি' সম্বোধন করে সহৃদয়ভাবে বললেন, আসুন, আসুন।

ঘরটি বেশ বড়, তার একদিকে কয়েকটি সোফা ও নিচু টেবিল, অন্যদিকে লম্বা উঁচু টেবিল ও অনেকগুলি চেয়ার এবং প্রচুর বই। এর আগে উত্তর কলকাতায় দু'-একটি বনেদি বড়লোকের বাড়িতে আমার প্রবেশ ঘটেছে বটে, কিন্তু এরকম আধুনিক ধনী গৃহ দেখার সুযোগ এই প্রথম। সব কিছুই অতি ছিমছাম, নিখুঁতভাবে সাজানো, যেন একটু নড়াচড়া ঘটলেই ছন্দপতন ঘটবে,

তাই আড়ষ্ট হয়ে বসতে হয়। কার্পেট পাতা মেঝেতে চটি পরে আসাও যে উচিত হয়নি, তা তখন বুঝিনি। সত্যজিৎ রায়ের মতনই ডি কে'র কণ্ঠস্বরও ভরাট ও উদাত্ত, মুখখানি সদা হাস্যময়। আগে অনেক বাঙালিরই বেশ গমগমে গলার আওয়াজ হত, এখন আর তেমন শোনাই যায় না, অন্য অনেক কিছুর মতন বাঙালির কণ্ঠস্বরও সরু হয়ে গেছে!

ডি কে অতিশয় ব্যস্ত মানুষ। সাহেবি কোম্পানিতে উচ্চ চাকরি করেন এবং প্রকাশক হিসেবেও শীর্ষস্থানীয়। রবিবার সকালে তাঁর কাছে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও উমেদার আসার কথা, যদি সে রকম ভিড় থাকত, তিনি আমাদের মাত্র পাঁচ-দশ মিনিট সময় দিতেন, তা হলে পরবর্তী ঘটনাগুলি কিছুই ঘটত না। কোনও বিস্ময়কর কারণে সেদিন লোকজন আসেনি, শেষের দিকে কেউ এলেও ডি কে দেখা না করে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমাদের সঙ্গে তিনি কথা বললেন সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে! এর মধ্যে আমাদের জন্য প্লেটে সন্দেশ ও কাজুবাদাম এবং সুদৃশ্য ফ্রস্টেড গ্লাসে পাকা বেলের সরবত এসেছে, তারপর কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর চা। আমাদের দিকে তিনি গোল্ড ফ্লেকের টিন এগিয়ে দিয়েছেন। (সে সময়ে দামি ব্র্যান্ডের সিগারেট পঞ্চাশটি একসঙ্গে একটি টিনের কৌটোয় পাওয়া যেত, কৌটোগুলি বেশ মজবুত, অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের রান্না ঘরে সেইসব কৌটোয় রাখা হত নানা ধরনের মশলা, এখন সারা পৃথিবী থেকেই সিগারেটের সেই কৌটো-প্রথা উঠে গেছে।)

বলাই বাহুল্য, দীপকই মুখপাত্র, আমি প্রায় নিঃশব্দ। দীপক আমাদের দ্বৈত কাব্যগ্রন্থ ছাপার প্রস্তাব জানিয়ে, সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে মলাট আঁকাতে যে প্রায় রাজি করে ফেলেছে, তা উল্লেখ করতেও দ্বিধা করল না। ডি কে এ-প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিলেন না। তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন না, বরং প্রশ্ন করতে লাগলেন, আমরা কোথায় থাকি, কোন কলেজে পড়ি, কবে থেকে কবিতা লেখা শুরু করেছি, কবিতা লেখার জন্য বাড়ির মানুষদের প্রশ্রয় আছে কি না, কোথায় কবিতা ছাপা হয়। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান লেখকদের লেখা পড়ি কি না ইত্যাদি। অনেকটা আড্ডার মতন পরিবেশ হওয়ায় আমার আড়ষ্টতা খানিকটা কেটে যায়, এবং শেষোক্ত বিষয়টিতে দীপকের চেয়েও আমি স্বচ্ছন্দভাবে অংশ নিতে পারি, কারণ দীপক আমার মতন পড়ুয়া ছিল না। গোপাল হালদার যে শুধু প্রাবন্ধিক নন, যেমন সঞ্জয় ভট্টাচার্য নন শুধু কবি, এঁরা যে উপন্যাসও লিখেছেন, তা দীপক জানে না।

আলোচনার মধ্যপথে ডি কে বললেন, আপনারা কবিতার বই ছাপবেন, তার এত ব্যস্ততা কীসের? তার চেয়ে এক কাজ করুন না, আপনাদের বন্ধুবান্ধব, সমসাময়িক কবিদের অনেকের লেখা একসঙ্গে ছাপুন, যাতে বোঝা যায়, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, সুভাষ, নীরেন্দ্রনাথ, সুকান্তর পর বাংলা কবিতা কোনও বাঁক নিয়েছে, না একই রকম লেখা হচ্ছে। বাংলা কবিতার তারুণ্যের ধারাটি অনুধাবন করার আর কী উপায় আছে? অর্থাৎ নতুন একটি কবিতার পত্রিকা, যাতে শুধু তরুণ বয়স্কদেরই রচনা মুদ্রিত হবে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি, কিছু আলোচনার পর নামও ঠিক হয়ে গেল, 'কৃত্তিবাস'। ডি কে বললেন, বাংলা কবিতায় আদি কবিদের মধ্যে প্রধান কৃত্তিবাস, তাঁর নামের পত্রিকায় থাকবে অতি সাম্প্রতিক কবিতা, অর্থাৎ ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হবে আধুনিকতা। তিনিই প্রেস ঠিক করে দিলেন, পরদিন থেকেই আমরা মেতে উঠলাম রচনা সংগ্রহের কাজে।

তখন তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত কবির নাম শঙ্খ ঘোষ। সিটি কলেজের বাংলা ক্লাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই কবির কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছেন। 'পরিচয়' পত্রিকায় শঙ্খ ঘোষের কবিতা পড়ে আমরাও মুগ্ধ। তাঁর কবিতা তো পেতেই হবে। শঙ্খ ঘোষের কবিতা ভর্তি একটা আস্ত খাতা পেয়ে আমাদের কী উল্লাস! যাকে বলে 'মুক্তোর মতন' হস্তাক্ষর, প্রতিটি কবিতাতেই হীরকদীপ্তি। সম্ভবত সেই খাতায় তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করছিলেন, প্রথম পৃষ্ঠায় শুধু 'শ্রী' লেখা, সেই খাতা থেকে দীর্ঘতম কবিতাটি, 'দিনগুলি

রাতগুলি' মুদ্রিত হল প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা হিসেবে। সেই কবিতাটি একালের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাবলীর অন্যতম। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তও অল্প বয়েস থেকে কবিতা লিখছেন, সে সময় স্বনামধন্য। তিনি থাকেন সুদূর দক্ষিণ কলকাতায়, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ হয়নি, ডাকে পাঠিয়েছিলেন 'অবিনশ্বর' নামে একটি চমৎকার লেখা। দক্ষিণ কলকাতা নিবাসী আরও দু'জন কবি আলোক সরকার এবং অরবিন্দ গুহ তরুণদের মধ্যে সুপরিচিত, তাঁরাও আমাদের অনুরোধে সাড়া দিলেন। আলোক সরকার দুটি কবিতা পাঠালেন। এ ছাড়া অন্যান্যদের সঙ্গে আনন্দ বাগচীর দীর্ঘ কবিতা এবং দীপকের দুটি কবিতা, তার মধ্যে একটি শামসুর রাহমানকে উৎসর্গ করা। আমার কবিতাটিই সবচেয়ে দুর্বল, সেটি ছাপা হয়েছিল একেবারে শেষে। অকারণে আভিধানিক শব্দ প্রয়োগের লোভ সংবরণ করতে পারিনি। সে কবিতার নাম 'নীলিরাগ', তার মধ্যে একটি শব্দ ছিল ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা, পরবর্তী কালে লজ্জায় আমি সে কবিতাকে কোনও কাব্যগ্রন্থে স্থান দিইনি।

প্রথমে ঠিক ছিল দীপক ও আমার নামই সম্পাদক হিসেবে ছাপা হবে। দীপকের নাম তবু কেউ কেউ জানে, আমি প্রায় অজ্ঞাতকুলশীল। শুধু আমাদের নাম থাকলে কেউ গুরুত্ব দেবে কি না এই সন্দেহে আমরা দীপকের সহপাঠী আনন্দ বাগচীর নামও যুক্ত করে নিই। প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৬০, তখন বাংলায় সন-তারিখ লেখাই রীতি ছিল। মোট চল্লিশ পৃষ্ঠা, মূল্যবান কাগজ, মুদ্রণও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ওপরে-নীচে দুটি করে ঢেউ খেলানো রুল দিয়ে এর আগে কোনও কবিতা পত্রিকা ছাপা হয়নি। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের অন্যতম লক্ষণ এই যে শুধু রচনায় নতুনত্ব নয়, ছাপাতেও চোখে পড়ার মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অন্য পত্রিকা থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে হবে।

প্রথম সংখ্যাটি এখন হাতে নিয়ে দেখছি, সম্পাদকদের পক্ষ থেকে সবকটি গদ্য রচনাই আমার, নিয়মাবলী, সম্পাদকীয় এবং শেষে 'কাব্যসভা' নামে একটি প্রতিবেদন। অন্য সম্পাদকদ্বয় গদ্যে কলম ধরেননি। অবশ্য কৃত্তিবাসেরও আগে পত্রিকা সম্পাদনার কিছুটা অভিজ্ঞতা আমার ছিল, কলেজের প্রথম বর্ষে এসে, স্কুলের বন্ধুদের সহযোগিতায় আমি একটি ক্ষণস্থায়ী পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলাম। প্রথমে সে পত্রিকার নাম ছিল 'আগামী', পরে জানা গেল ওই নামে অন্য পত্রিকা আছে, তাই 'সাহিত্য' জুড়ে দেওয়া হল। সে পত্রিকার অধিকাংশ গদ্য-পদ্যই আমার কপোল-কল্পিত এবং কলম-নির্গত। অর্থাৎ যেসব বন্ধু জীবনে এক লাইনও কবিতা লেখেননি, আমার নিজের কবিতা ছাপিয়ে দিয়েছি তাদের নামে। দুটি সংখ্যার পরই সেই কৃশ পত্রিকাটি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করে। কৃত্তিবাস কিন্তু প্রথম সংখ্যা থেকেই জয় পতাকা তুলে ধরেছিল।

প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে এই নতুন পত্রিকা প্রকাশের যৌক্তিকতা বর্ণনার সঙ্গে এমন একটা প্রসঙ্গও যুক্ত হয়েছিল, যা এখন বিস্ময়কর মনে হয়। সেই ১৯৫৩ সালে আমি লিখেছিলাম, "বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে পাকিস্তানের (অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের) কবিদের স্থান প্রায় অনুল্লেখ্য। তাতে কোনও দুঃখ থাকত না—যদি না তাঁদের কেউ কেউ আশ্চর্য সার্থক কবিতাও লিখতেন। বাংলাদেশের শারীরিক মানচিত্রের মতোই কাব্যের মানচিত্রও খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু উভয় বঙ্গে বাংলা ভাষার পূর্ণ অধিকার সম্বন্ধে যেন আমাদের কখনও সন্দিগ্ধ না হতে হয়। পাকিস্তানের তরুণ কবিরা আমাদের সমদলীয়, সহকর্মীও। এ সংখ্যায় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হল না, কিন্তু আগামী সংখ্যায় আমরা নিশ্চয়ই সক্ষম হবো।" সেই সময় থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসছে, সে জন্য আমার মনে যে বেদনাবোধ ছিল, এই লেখায় তারই প্রতিফলন।

আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, কৃত্তিবাসে কবিতা লিখবে শুধু তরুণ কবিরা, কিন্তু প্রবন্ধ প্রার্থনা করা হবে প্রবীণদের কাছ থেকে। প্রথম সংখ্যাতেই আমরা দু'জন প্রবীণ কবির প্রবন্ধ সংগ্রহ

করতে পেরেছিলাম। এঁদের মধ্যে অতিশয় বিখ্যাত সমর সেন হঠাৎ কবিতা লেখা ছেড়ে দেবার কথা ঘোষণা করে বসে আছেন, বাংলা ভাষাতেই আর কিছু লিখবেন না এমন একটা যেন প্রতিজ্ঞা, তাঁর কাছ থেকে রচনা জোগাড় করা কম কঠিন ব্যাপার নয়। লেখাটি ছোট, কিন্তু মূল্যবান। নতুন কবিদের স্বাগত জানিয়েও তিনি লিখেছিলেন, "দেশের মাটির, দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বলতে গেলে সবে মাত্র শুরু হয়েছে, আত্মীয়তায় এখনও পরিণত হয়নি। ফলে নতুন প্রভাবে বাগাড়ম্বরের দিকে বাঙালির স্বাভাবিক ঝোঁক আরও প্রখর হতে পারে, মানবিকতার নামে কীর্তনের ভাবালুতা আবার আসতে পারে এবং কবিরা ভুলে যেতে পারেন যে বুদ্ধি ও আবেগের সমন্বয়ই সার্থক কবিতার উৎস।" অপর কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র পরে গায়ক ও আই পি টি এ'র কিছু গানের সুরকার হিসেবেই বেশি পরিচিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেই সময় তাঁর বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা "মধুবংশীর গলি" শম্ভু মিত্রের আবৃত্তিতে খুবই জনপ্রিয়। তাঁর প্রবন্ধের বক্তব্য, আধুনিক কবিতা থেকে সুর ও গীতিময়তা বিদায় নিয়েছে, তার বদলে পশ্চিমি কায়দায় বিচিত্র বাগবিন্যাস ও আঙ্গিক সর্বস্বতা এসে পড়ায় এই সব কবিতা সাধারণ জনমানস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। "কবিদের হাতে আশ্চর্য পেকে উঠল (সেই রাগ বিন্যাস)। কিন্তু সে পাকা হাতের ফল প্রাকৃত জনের আস্বাদনের বস্তু হল না। বিশেষ করে আমাদের দেশের অর্ধশিক্ষিত নিরক্ষর জনসাধারণের নাগালের বাইরে সৌখিন বাবুদের কাব্য-কাননের মাকাল ফলের মতই তা ঝুলে রইল। এই ভাব-সমাধি অবশ্য কিছু পরিমাণে ঘা খেল গত দশ-বারো বছরের প্রগতি আন্দোলনের ঢক্কা নিনাদে। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিবাদী ও মার্কসমন্য ভাবধারার চাপেও এই সংকট থেকে ত্রাণের উপায় পাওয়া গেল না।"

প্রথম সংখ্যায় কয়েকটি বইয়ের বিজ্ঞাপন ছাড়া অন্য কোনও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয়নি। মলাটের পরেই পৃষ্ঠা জোড়া সিগনেট প্রেসের 'বনলতা সেন', যার ওপরে লেখা, '—১৩৫৯-এর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ—নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনের নির্বাচন'। ওই নির্বাচন অনুযায়ী জীবনানন্দ দাশ একশো এক টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন, তাঁর জীবিতকালে একমাত্র পুরস্কার।

কৃত্তিবাস ত্রৈমাসিক পত্রিকা, প্রতি সংখ্যার দাম আট আনা। আমরা ঘাড়ে করে পত্রিকাগুলি বিভিন্ন স্টলে দিয়ে এসেছিলাম, ছাপা হয়েছিল পাঁচশো, কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত কপি নিঃশেষ। কিন্তু বিক্রি হলেই যে দাম পাওয়া যাবে তার কোনও ঠিক নেই, প্রধান বিক্রেতা কলেজ স্ট্রিটের পাতিরাম। সে দোকান থেকে আমরা নিয়মিত পত্র-পত্রিকা কিনি, মুখ চেনা, অতি মধুর ব্যবহার, কিন্তু টাকা চাইলেই বলে, সোমবার আসবেন। সে এক অনন্ত সোমবার। দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর মোড়ের এক স্টলেও অনেক কপি কাটতি হয়েছিল, কিন্তু সেখানে টাকা চাইতে গিয়ে ট্রাম ভাড়া দিতে দিতেই আমরা ফতুর! কখনও সখনও দু'পাঁচ টাকা পেলেও তা পরবর্তী সংখ্যার জন্য জমিয়ে রাখা যায় না, তাই প্রতি সংখ্যাতেই নতুন করে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল যথাসময়ে হেমন্তকালে, এবারে অন্যান্যদের সঙ্গে যুক্ত হল দু'জন অতি তরুণ, উৎপলকুমার বসু ও প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়। আমার সহপাঠী মোহিত চট্টোপাধ্যায়, ফণিভূষণ আচার্য ও শিবশম্ভু পালকেও নিয়ে আসা হল, আগের বারের বিশিষ্ট কবিরা তো রইলেনই। শঙ্খ ঘোষ কবিতার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু দে'র 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' নামের কাব্য গ্রন্থটির এক সাহসী সমালোচনাও লিখলেন এ সংখ্যায়।

তখন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ঠিক বারো বছর কেটেছে, অর্থাৎ এক যুগ। আমরা দাবি করছি এটাই আধুনিক যুগ, কিন্তু সেই সময়েও রাবীন্দ্রিক ও আধুনিকদের দ্বন্দ্ব শেষ হয়নি। মুশকিল হচ্ছে এই যে, এই দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথকে অনাধুনিক আখ্যা দিতে হয়, সেটাও ঠিক নয়। আধুনিক কবি হিসেবে যারা মার্কামারা, সেই প্রধান কবিরা সকলেই তখন জীবিত এবং সৃষ্টিশীল, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কিছু কিছু বাহবা ও পিঠ চাপড়ে দিলেও আধুনিক কাব্য নিয়ে ঠাট্টা তামাসাও করতেন। যে-কোনও আন্দোলনই প্রথম দিকে উগ্র হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই উগ্র আধুনিকতা ঠিক

মেনে নিতেও পারতেন না। রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের মধ্যে কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ বাগচী প্রমুখ বুদ্ধদেব-বিষ্ণু দে-অমিয় চক্রবর্তীদের তুলনায় কম জনপ্রিয় *ছিলেন না*, বরং বেশিই ছিলেন। মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছিলেন মাঝামাঝি অবস্থানে।

আধুনিক কবিরা পাঠকদের কাছে বারবার আধুনিকতা নিয়ে সরব হতেন, হতে বাধ্য ছিলেন, কারণ অধিকাংশ বাঙালি পাঠকই তখনও এই আধুনিকতার মর্ম স্পর্শ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। রবীন্দ্র অনুসারী কবিরা এর মধ্যেই অনেকে পাঠ্য পুস্তকে স্থান পেয়ে গেছেন, কিন্তু আধুনিক কবিরা অপাঙক্তেয়। তবে সিগনেট প্রেসের মতন এত বড় শক্তিশালী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে আধুনিক কবিরা নব বলে বলীয়ান হয়েছিলেন। ডি কে আধুনিক কবিতার প্রবল সমর্থক, শুধু এই সব কবিতার বই ছাপতেনই না, প্রচারও করতেন বহু অর্থ ব্যয়ে।

সেই আধুনিকতার প্রচারের অঙ্গ হিসেবেই তিনি আয়োজন করলেন এক বিশাল কবি সম্মেলনের। তার আহ্বায়ক আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এরই সমসময়ে এঁরা দু'জন 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' নামে একটি চমৎকার কাব্য সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন, তাতে 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার 'তুমি' নামে কবিতাটি গ্রহণ করা হয়েছিল দৈবাৎ। সে সংকলনের প্রথম কবিতা রবীন্দ্রনাথের, সব শেষটি আমার, 'রবীন্দ্রনাথ থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত', কোনও এক বিজ্ঞাপনে এ রকম ঘোষণা দেখে আমার তো রোমাঞ্চিত হবারই কথা। এই কবি সম্মেলনেও কৃত্তিবাসের বেশ কয়েকজন কবি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, দীপক এবং আমিও। হয়তো তাতে ডি কে'র খানিকটা পক্ষপাতিত্ব ছিল, এখানেও জন্মসাল হিসেবে আমিই সর্ব কনিষ্ঠ, তালিকায় সবার শেষে নাম।

১৯৫৪ সালে ২৮-২৯ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে সেই কবি সম্মেলন বাংলা কবিতায় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য। এর আগে এতবড় কবিদের সমাবেশের কোনও বিবরণ পাইনি, পরেও এ পর্যন্ত আর দেখিনি। তখনও রবীন্দ্রসদন হয়নি। সিনেট হলটিই কলকাতার সর্ববৃহৎ সভাকক্ষ, তার সম্মুখভাগ ক্লাসিকাল গাম্ভীর্যমণ্ডিত, কোনও মূর্খের দল কিছুদিন পরেই সেটি ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অত বড় হলঘরটি ভর্তি করে শ্রোতারা দু'দিন ধরে কবিতা পাঠ শুনেছে। সে যেন আধুনিকতার সমর্থকদেরই মিলন স্থান। সেখানেই জীবনানন্দ দাশের স্বকণ্ঠে কবিতা পাঠ প্রথম ও শেষবার শুনেছি। এই কবি সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ 'কৃত্তিবাস'-এ লিখেছিলেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।

আগেই লিখেছি যে সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্তের সঙ্গে প্রথমবার দেখা হওয়ার পরই আমার জীবনের একটা পট পরিবর্তন হয়, তা শুধু কৃত্তিবাসের জন্যই নয়, আরও কারণ ছিল, তবে কৃত্তিবাস পত্রিকা প্রকাশও আমার পক্ষে অবশ্যই একটা বড় ঘটনা। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আমার মধ্যে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, তাতে আমার মনের অনেক মেঘ কেটে যায়। এর কিছুদিন আগে যে অস্থিরতা ছিল, এক একটি বিকেলে কারুর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হত না, মনে হত জীবনটাই অর্থহীন, মরে গেলেই বা ক্ষতি কী, এই সব উটকো চিন্তা একেবারে দূর হয়ে গেল, পত্রিকার জন্য লেখা জোগাড় করা, প্রেসে যাওয়া, প্রুফ দেখা, বিজ্ঞাপনের জন্য ঘোরাঘুরি, এ সবই মনে হয় খুব প্রিয় কাজ। যখনই আমি কোনও তৃপ্তিজনক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তখনই আমার যৌন আবেগ বৃদ্ধি পায়। তখন অপর্ণা নাম্নী মেয়েটির সঙ্গে আমার প্রণয় পর্বও খুব গাঢ় হয়ে উঠেছে, যদিও তাতে যৌনতার স্থান বা অবকাশ বা সুযোগ ছিল না। সেই অবরুদ্ধ যৌন আবেগ মুক্তি পায় কবিতার খাতার পৃষ্ঠায়।

'কৃত্তিবাস' প্রকাশের প্রধান কৃতিত্ব দীপকের। আবার সেই দীপকের হাতেই এই পত্রিকা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে বসেছিল। মাত্র তিনটি সংখ্যা বার করার পরই দীপকের উৎসাহ হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে যায়। সারা জীবনে কোনও ব্যাপারেই সে বেশিদিন মন বসাতে পারেনি। মাঝে

মাঝেই সে বলতে শুরু করল, শুধু শুধু অন্যদের লেখা ছাপাবার জন্য আমরা এত খাটা-খাটুনি করতে যাব কেন? দীপক বলছে 'অন্যদের লেখা', আমার মতে তা 'আমাদের লেখা', আমাদের বয়সি অনেকে মিলেই তো নতুন ন্যায্য আন্দোলনের সূত্রপাত করতে হবে। দীপকের মতে, অন্যরা শুধু লেখা দিয়েই খালাস, আমাদের দু'জনকে টাকা জোগাড়, স্টলে স্টলে ঘোরা ও প্রেসের অন্ধকারে বসে প্রুফ দেখে সময় খরচ করতে হয়! আমার মতে, সম্পাদকদেরই এই ভার নেওয়া স্বাভাবিক। দীপকের সঙ্গে তর্ক শুরু হয়, একদিন সে বলেই ফেলল, পত্রিকা বন্ধ করে দাও! আমার তখন নেশা ধরে গেছে, সব সময় ভাবি, খেতে পাই বা না পাই, জামা-জুতো কিনতে পারি বা না পারি, কৃত্তিবাস বেরোবেই! প্রথম থেকেই পত্রিকার দফতরের ঠিকানা মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রিটে দীপকের বাড়ি। এক সকালে দীপক হঠাৎ টেবিল থেকে ফাইলগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, দুর ছাই! এগুলো দেখলেই আমার রাগ হয়! ফাইলগুলো কুড়িয়ে আমি নিয়ে এলাম আমাদের বাড়ি। পরের সংখ্যা থেকেই কৃত্তিবাসের সম্পাদকীয় দফতরের ঠিকানা বদল হয়।

ততদিনে আমাদের বাসা বদলও করতে হয়েছে, বাড়িওয়ালার সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমায় পেরে না উঠে গ্রে স্ট্রিট ছেড়ে উঠে আসতে হয়েছে বাগবাজারের বৃন্দাবন পাল লেনে। এ বাড়িটাও খুবই পুরনো ও স্যাঁতসেঁতে হলেও একতলায় আমাদের ঘরের সংখ্যা তিনটি, তার মধ্যে একটা ঘর একেবারে বাইরের দিকে। সেই ঘরটি আমার ও কাকার দখলে। হাসপাতালের খাটের মতন দুটি লোহার খাট পাতা। আমার কাকা সাহিত্যের ধার ধারেনি। তার আড্ডার বৃত্ত আলাদা, দিনের বেলা সে প্রায় বাড়িতে থাকে না, তখন খাট দুটির বিছানা গুটিয়ে আমার বন্ধুদের আড্ডা চলে। এর আগের বাড়িতে বন্ধুদের এনে বসাবার মতন কোনও জায়গা ছিল না, এবারে কোনও ক্রমে একটা বৈঠকখানা হল। সেই ছোট্ট ঘরটিতে এক একদিন কী করে পনেরো-কুড়ি জনের স্থান সঙ্কুলান হয়ে যেত, তা ভাবলে এখনও বিস্ময় জাগে। পুরনো আমলের বাড়িগুলিতে জানালার পাদদেশে অনেকখানি চওড়া বেদি মতন থাকত, তাতেও বসতে পারত দু'তিন জন। তারাপদ রায়ের নাচানাচিতেও যে আমাদের সেই জরাজীর্ণ খাট ভেঙে পড়েনি, সেটাও কম বিস্ময়ের নয়। তারাপদ অবশ্য এসেছিল কয়েক বছর পর, তার আগে শক্তি ও শরৎকুমার।

কৃত্তিবাসের পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে রচনা সংগ্রহ থেকে প্রুফ দেখা পর্যন্ত সব কাজই আমাকে করতে হয়, দু'তিনবার প্রুফ দেখতাম বলে অধিকাংশ লেখাই আমার মুখস্থ হয়ে যেত। চতুর্থ সংখ্যাটি হাতে নিয়ে দেখছি, এখনও অনেক কিছু মুখস্থ আছে, এমনকী গদ্য পর্যন্ত। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতন এই সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে সালেহ আহমদ ও সৈয়দ শামসুল হক-এর কবিতা সংগ্রহ করা গিয়েছিল। সে সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন অম্লান দত্ত, 'ভাষার সাধনা'। তার অবিস্মরণীয় প্রথম দুটি লাইন: "সব ভালোবাসারই দুঃখ আছে; ভাষাকে ভালোবাসার দুঃখ কম নয়। ভাষাকে যে ভালোবাসে না, এ দুঃখ সে বুঝবে না।"

খুবই আফসোসের কথা এবং বাংলা কবিতার বিরাট ক্ষতি, ভাষার প্রতি দীপকের ভালোবাসা এই সময় থেকে স্তিমিত হতে শুরু হয়। সে সময় সে ঝুঁকেছিল নাটক-অভিনয়ের দিকে, তার মুখে সর্বক্ষণ "বহুরূপী", শম্ভু মিত্র-তৃপ্তি মিত্রের নাম, তার উপাস্য দেবতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ইনি মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় অভিনেতা। কোনও একটা নাটকে বাল্মীকি-র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বলে এঁর ডাক নামই হয়ে যায় মহর্ষি, বহুরূপী নাট্যদলেরও ইনি প্রধান উপদেষ্টা।

কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অভিলাষ নিয়ে দীপক সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্তর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, সারা জীবনেই তার একটিও কবিতার বই প্রকাশিত হল না। আর সিগনেট প্রেসের ওই বাড়ির সকলের সঙ্গে আমার পরিচয়, সংযোগ ও ঘনিষ্ঠতা রয়ে গেল সুদীর্ঘকাল।

একুশ

কৃত্তিবাস পত্রিকার সূত্রে কয়েকবার দিলীপকুমার গুপ্তর কাছে যাতায়াতের পর একদিন তিনি প্রস্তাব দিলেন, পত্রিকা ছাড়াও তরুণদের নিয়ে একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়লে কেমন হয়? যেখানে গান, কবিতা পাঠ, সাহিত্য-বিতর্ক ও নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি। আগে প্রতিষ্ঠানের একটি নাম দরকার, যেমন-তেমন নাম হলে চলবে না, বাংলার সেরা বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে নির্বাচন করতে হবে অভিনব একটি নাম। সে জন্য তিনি আমাকে পাঠালেন নীহাররঞ্জন রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র প্রমুখ কয়েকজনের কাছে। এঁরা সবাই বাংলার সংস্কৃতি জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, আমার পক্ষে অতি দূরের মানুষ, কয়েকজনকে চর্মচক্ষে দেখিইনি, দু'-একজনকে সভা-সমিতিতে শ্রোতার আসনে বসে দেখলেও কথা বলার সুযোগ ঘটেনি। ডি কে-র প্রস্তাবটি যে অদ্ভুত, তা মানতেই হবে। আমরা একটা ক্লাব খুলতে যাচ্ছি, তা নিয়ে ওই সব বিখ্যাত ব্যক্তিরা মাথা ঘামাতে যাবেন কেন? ওঁরা সবাই ব্যস্ত, শুধু আমার নাম শুনলে নিশ্চিত দেখাই করতেন না, কিন্তু সিগনেট প্রেসের দিলীপ গুপ্ত পাঠিয়েছেন শুনে কেউ প্রত্যাখ্যান করেননি, আমি তাঁদের সামনে লাজুক মুখে বিনম্রভাবে বক্তব্যটি জানাতে প্রায় সকলেই অবাক হয়ে ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, ক্লাবের নাম? আচ্ছা, পরে ভেবে দেখব। শুধু শম্ভু মিত্র আমাকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে ব্যঙ্গের সুরে বলেছিলেন, আমরা নাম দেনেওয়ালা নই! যারা নিজেদের ক্লাবের নাম নিজেরা ঠিক করতে পারে না, তাদের নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে ঠিক বারো বছর আগে, তিনি বেঁচে থাকলে ডি কে আমাকে তাঁর কাছেও পাঠাতেন অবশ্যই, এবং রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিত নাম দিয়ে দিতেন, নাম দিতে ভালোবাসতেন তিনি। যাই হোক, আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর, ডি কে নিজেই ক্লাবটির নাম দিলেন, 'হরবোলা'। পরে অনেকেই স্বীকার করেছেন, কোনও সঙ্গীত-নাটক-আবৃত্তির প্রতিষ্ঠানের এই নাম অতি যথার্থ। হরবোলার সভাপতি দিলীপকুমার গুপ্ত, আমি সম্পাদক, বন্ধু-বান্ধব অনেককেই চটপট এর সদস্য করে নেওয়া হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাবু কালচারের যুগে যে-সব ধনী পৃষ্ঠপোষকের সমিতির কথা শোনা যেত, হরবোলা সম্ভবত তারই শেষতম উদাহরণ। সদস্যদের কোনও চাঁদা নেই, প্রত্যেক অধিবেশনে প্রচুর খাওয়া-দাওয়া, এক একদিন কলকাতার এক একটি নাম করা দোকানের সন্দেশ, বিশেষভাবে অর্ডার দিয়ে প্রস্তুত করা সিঙ্গাড়া বা চপ, বারবার সুদৃশ্য কাপে দামি দার্জিলিং চা, অনেকগুলি গোল্ড ফ্লেকের টিন ছড়ানো, কোনও কোনও সদস্য এক একবার তার থেকে মুঠো করে পাঁচ-সাতটা সিগারেট তুলে পকেটে ভরে নিত। বেশি রাত হলে ডি কে নিজে গাড়ি চালিয়ে সেই এলগিন রোড থেকে শ্যামবাজার পৌঁছে দিতেন আমাদের কয়েকজনকে, যাদের বাড়ি হাওড়া কিংবা বরানগর, চুপি চুপি তাদের পকেটে গুঁজে দিতেন ট্যাক্সির ভাড়ার টাকা।

হরবোলার প্রথম অধিবেশনে ডি কে এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি হবেন নাট্য পরিচালক। গায়ের রং একেবারে চকচকে পালিশ করা কালো, ধপধপে সাদা কলিদার পাঞ্জাবি ও ধুতি পরা, তাঁর সঙ্গে বেমানান হাতের একটা চটের থলে ও পান খাওয়া লাল ঠোঁট। এঁর মুখের ভাষাও চমকপ্রদ, আমাদের জনে জনে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন,

বাবুটির নাম কী? বাবুটির কী করা হয়? নিবাস কোথায়? এই নাট্য পরিচালকের নাম কমলকুমার মজুমদার। আমি এই নাম আগে শুনিনি, এঁর সম্পর্কে তখনও কিছুই জানতাম না। যদিও কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের একটি বিশেষ মহলে তিনি সুপরিচিত এবং ইংরেজিতে যাকে বলে এনিগম্যাটিক ক্যারেকটার। কমলকুমারের স্কুল-কলেজের কোনও ডিগ্রি নেই, অথচ অনেক বিষয়ে জ্ঞানী, আচার-আচরণ খাঁটি বাঙালির মতন, অথচ ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ জ্ঞান, চটের থলিটির মধ্যে থাকে দুর্লভ ফরাসি গ্রন্থ, অনেক আই সি এস এবং আই এ এস অফিসারদের ফরাসি শিখিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ ভক্ত, অথচ নিজের মুখের ভাষা কাঁচা বাংলা, তাতে আদিরসাত্মক শব্দের ছড়াছড়ি, ছবি আঁকেন, কাঠ খোদাই করেন, অনেক প্রখ্যাত শিল্পী সম্ভ্রম করেন তাঁকে, এবং কোনও রহস্যময় কারণে সে সময় তিনি নিজের বাসস্থানের কথা কাউকেই জানান না।

এবং কমলকুমার একজন লেখক। বিষ্ণু দে, নবযুগ আচার্য সম্পাদিত 'সাহিত্যপত্র'তে তাঁর 'জল' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে, সে রকম ভাষা ও আঙ্গিকের তুলনা বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নেই। এ সবই অবশ্য জেনেছি আস্তে আস্তে এবং কৃত্তিবাসের দলবলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলেই কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্য সৃষ্টির মূলধারা শুরু হয়। প্রথম দর্শনে মানুষটিকে শুধু বিচিত্র মনে হয়েছিল।

প্রথম নাটক ঠিক হল, সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', কারণ বাংলা প্রহসনের প্রবাহটি শুকিয়ে আসছে, সেটিকে আবার জাগানো দরকার এবং সুকুমার রায়ের এই রচনাটি প্রহসনের চেয়েও আরও অনেক কিছু। প্রথমেই কমলকুমার ঘোষণা করলেন, ভূমিকা বণ্টন ও মহড়া শুরু করার আগে প্রত্যেককে উচ্চারণ চর্চা ও গান শিখতে হবে। গানের জন্য ডি কে নিয়ে এলেন দু'জনকে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং সন্তোষ রায়। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র শুধু কবি নন, গায়ক ও সুরকার, আই পি টি এ-র উদ্বোধন সঙ্গীত 'এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো, অন্ধকারের এই দ্বার' গানটির লেখক ও সুরকার এবং তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড আছে। সন্তোষ রায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গুরু, তিনি ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের কাছে নাড়া বেঁধেছিলেন। পুনরুক্তি দোষ হলেও সন্তোষ রায় সম্পর্কে এই কাহিনীটি এখানেও বলা দরকার। অসাধারণ উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনও প্রকাশ্য অনুষ্ঠান-জলসায় গান করতেন না কিংবা গান রেকর্ড করেননি, কারণ ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে অন্তত দশ বছর রেওয়াজ না করে তিনি প্রকাশ্য আসরে গাইতে পারবেন না। সেই দশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ফৈয়াজ খান দেহরক্ষা করেন, সন্তোষ রায় তাই আজীবন গুরুর কাছে দেওয়া সেই শপথ ভঙ্গ করেননি। এসব শুনলে এখন গল্প বলে মনে হয় না?

প্রথম কিছুদিন সন্তোষ রায়ের কাছে সা-রে-গা-মা সাধতে হল। তাও হারমোনিয়ামের সা-রে-গা-মা নয়, এক দমে যতক্ষণ সম্ভব শুধু সা বলতে হবে, গলা কাঁপালে চলবে না, তেমন ভাবেই রে, গা, মা, পা ইত্যাদি। তারপর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সকলকে একযোগে শেখাতে লাগলেন একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত, 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে'।

কয়েক মাস এরকম চলার পর শুরু হল নাটকের মহড়া। মঞ্চস্থ করার কোনও ব্যস্ততা নেই, আগে সব কিছু নিখুঁত হওয়া দরকার। ডি কে সব কিছুতেই পারফেকশানিস্ট। আমার কাছে নাটকের মহড়ার চেয়েও অনেক বেশি আকর্ষণীয় ওই সব মহারথীদের কাছে গল্প শোনা। কমলকুমার ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের অফুরন্ত গল্পের ভাণ্ডার, প্রধানত সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কিত, তা ছাড়াও অসাধারণ সব রসিকতায় পরস্পর টক্কর দিতেন, আর সন্তোষ রায় জানতেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মহীরুহ সদৃশ শিল্পী ফৈয়াজ খান, আবদুল করিম খাঁ, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, গহর জান, হীরাবাঈ বরোদেকার, আলাউদ্দীন খাঁ সম্পর্কে কত না কাহিনী, প্রায় আক্ষরিক অর্থেই এসব কাহিনী আমি হাঁ করে গিলতাম। সন্তোষ রায়ের কাছে এসব গল্প, এবং

মাঝে মাঝে তিনি ওই সব শিল্পীদের গান গাইতেন দু'-চার লাইন, সে সব শুনে শুনেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্পর্কে আমার আগ্রহ ও নেশা ধরে যায়। (পরে অমিয়নাথ সান্যাল রচিত অনবদ্য ভাষায় এই ধরনের কাহিনী 'স্মৃতির অতলে' পাঠ করেও মুগ্ধ হয়েছি। অনেক কাল পরে কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কুদরত্-রঙ্গিবিরঙ্গী' এই ধারারই একটি অসাধারণ গ্রন্থ।)

ডি কে যদিও বাংলা সাহিত্যের সুষ্ঠু প্রকাশনা ও প্রচারের উদ্যোগী ছিলেন, বিদেশি সাহিত্যও তাঁর খুব ভালো পড়া ছিল। আড্ডায় প্রসঙ্গক্রমে তিনি ডস্টয়েভস্কি কিংবা জেম্স জয়েসের কথা বলতেন। তাঁর মুখেই আমি প্রথম ফ্রান্ৎস কাফকার 'মেটামরফসিস' কাহিনীটি শুনি। কাফ্কা তখনও বাঙালি লেখকদের মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন না, কমলকুমার ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রও প্রথম সে গল্পটি শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। ডি কে-র গল্প বলার বিশেষ একটা ভঙ্গি ছিল। একদিন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে'র 'দা শর্ট অ্যান্ড হ্যাপি লাইফ অফ ফ্রান্সিস ম্যাককম্বার' গল্পটি পুরোপুরি এমনভাবে বললেন, যা ঠিক কথকতা নয়, সাহিত্যগুণ অক্ষুণ্ণ রইল, তবু কাহিনীর দৃশ্যগুলি যেন চোখের সামনে জাজ্বল্যমান। একটু ইচ্ছে প্রকাশ করলেই ডি কে এই সব বই পড়তেও দিতেন, আলবিয়ার কামুর 'দা আউটসাইডার' উপন্যাসটি তিনি উপহার দিয়েছিলেন আমাকে।

স্কুল বা কলেজে আমি যা শিখেছি, তার চেয়ে ঢের বেশি শিক্ষা পেয়েছি হরবোলার আসরে। এতদিন আমার কোনও দিক নির্দেশ ছিল না। পারিবারিক পরিবেশ কিংবা যাদের সঙ্গে চলাফেরা করেছি, সে সব থেকে এখানকার পরিবেশ কত আলাদা। এরা সব বিদগ্ধ, সুরুচিসম্পন্ন মানুষ, অথচ খুব সহজ-স্বাভাবিক ব্যবহার। এর আগে আমি পাড়ার লাইব্রেরি থেকে এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে চেয়েচিন্তে বাংলা বই প্রচুর পড়েছি। ইংরিজিও কিছু কিছু, কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যের প্রধান প্রধান কীর্তিগুলি সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না, এখানে কমলকুমারের কাছ থেকে জানতে পারি ফরাসি সাহিত্যের রেখা চিত্র, ডি কে ঠিক ধারাবাহিকভাবে না হলেও রুশ-জার্মান-ইংরেজি সাহিত্য থেকে নানা রকম দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতেন, সেই সব শুনে শুনে আমার খিদে বেড়ে যেত, আমি আরও জানতে ও পড়তে চাইতাম। একদিন কথায় কথায় ডি কে বলেছিলেন, হ্যাঁ পড়বেন, অনেক কিছু পড়তে হবে, লেখার চেয়েও পড়ার জন্য বেশি সময় দেওয়া দরকার, তবে যা পড়বেন, তা নিজের লেখায় যতদূর সম্ভব উল্লেখ না করাই ভালো। অনেক বাঙালি লেখকের লেখায় দেখি, অকারণে বিদেশি বই বা লেখকদের নাম মাঝে মাঝে ফুটে বেরোয়, তখন বুঝি যে পড়াশুনো ঠিক হজম হয়নি এই সব লেখকদের। লেখা মানে তো নিজের কথা, তা যত সরল ও আন্তরিক হয়, ততই তা মানুষের মনে দাগ কাটে। আধুনিকতা মানে মৌলিক কিছু চিন্তা করা, তা বলে হাতঘড়ি পায়ে বাঁধা আধুনিকতা নয়! ডি কে-র এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে আজও মনে পড়ে। কথাগুলি কিন্তু একজন লেখকের প্রতি প্রকাশকের উপদেশ বলে গণ্য করা ঠিক হবে না, উনি বলেছিলেন সাধারণভাবে সব লেখক সম্পর্কেই, আমি তখনও লেখক হইনি, আমার বয়েস সে সময় কুড়িরও কম। অনেক বছর অতি ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ডি কে-র কাছে আমার কোনও বই ছাপার প্রসঙ্গই ওঠেনি, সে সাহসই আমার ছিল না। যখন সিগনেট প্রেসের একেবারে শেষ দশা, ডি কে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তখন আমার একটি মাত্র উপন্যাস, 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ওই গৌরবময় প্রকাশনীর নামাঙ্কিত হয়ে বেরোয়।

যে-ঘরে হরবোলার মহড়া চলত, তার বিপরীত দিকের একটি ঘরে আসতেন নরেশ গুহ, তিনি সিগনেট প্রেসের আংশিক কর্মী ছিলেন, 'টুকরো কথা' লিখতেন। সিগনেট প্রেসের এরকম আংশিক কর্মী ছিলেন আরও অনেকে, শুনেছি। এক প্রখ্যাত কবিকে একটি বৈষ্ণব পদাবলী সঙ্কলনের সম্পাদনার ভার দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেদিন থেকে, কাজ শুরু নয়, ও বিষয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন, সেদিন থেকেই মাইনে পেতেন। সে-চিন্তা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। কমলকুমারও বেতন পেতেন, তাঁর কাজটি ছিল ভারী মজার। সিগনেট প্রেসের দুটি দোকান

ছিল কলেজ স্ট্রিট ও রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এ, দুটি দোকানেরই সামনের দিকে লম্বা র‍্যাকে নতুন নতুন বই সাজানো থাকত, যাকে বলে ডিসপ্লে। প্রতি সপ্তাহে বদলে যেত বইগুলি। কমলকুমার ছিলেন রঙের উপদেষ্টা, অর্থাৎ কোন রঙের মলাটের পাশে অন্য বই রাখা হবে, তিনি তার নির্দেশ দিতেন। আমরা তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকবার গেছি কলেজ স্ট্রিটের দোকানে, তিনি কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন, আরেঃ, ওই ক্যাটকেটে হলদে বইটা ছাই রঙের পাশে রেখেছে, সরাও, সরাও, চোখে লাগছে, এক কোণে নিয়ে এসো, লাল রং একেবারে তলায়... এই রকম। সব মিলিয়ে বড় জোর পাঁচ মিনিট, তার জন্য মাইনে?

হরবোলার সূত্রে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের সামনাসামনি দেখার সুযোগ ঘটেছে। হঠাৎ বাইরে বাজখাঁই গলা শুনলেই বোঝা যেত, এসেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বুদ্ধদেব বসু আসতেন নিঃশব্দে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কণ্ঠ আনুনাসিক। জীবনানন্দ দাশকে দেখেছি মাত্র একবার, সত্যজিৎ রায় আসতেন প্রায়ই, সে সময় তিনি শুধুই একজন মলাট-শিল্পী, এবং নীহাররঞ্জন রায়ের আবির্ভাব ছিল রাজকীয়। আমাদের দ্বিতীয় নাটকের মহড়ার সময় আবু সয়ীদ আইয়ুব আসতেন ঘন ঘন, দারুণ রূপবান পুরুষ। নাটকটির অন্যতম নায়িকা তখন তাঁর প্রেমিকা! সেই গৌরী দত্ত পরবর্তীকালে হন গৌরী আইয়ুব, বিয়ের পর বেশ কয়েক বছর তিনি নিজের নাম লিখতেন গৌরী আইয়ুব দত্ত।

সত্যজিৎ রায়কে তখনও আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পাইনি, নিজের কাজ নিয়ে আসা-যাওয়া করতেন। যদিও হরবোলার ছাপানো প্যাডে তাঁর নাম উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম, কিন্তু সম্ভবত সেই সময় থেকেই তিনি ‘পথের পাঁচালী’ নির্মাণ নিয়ে ব্যস্ত, আমাদের নাটকের ব্যাপারে তিনি মন দিতে পারেননি। শুধু মঞ্চ সজ্জা পরিকল্পনার জন্য তাঁর সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। কমলকুমারের সঙ্গে একদিন কথা বলার পর তিনি জানালেন যে কমলবাবু যে রকম ভেবেছেন, তার ওপরে তাঁর আর কিছু বলার নেই। সত্যজিৎ রায়কে কমলকুমার আড়ালে ডাকতেন ঢ্যাঙাবাবু। তাঁর শারীরিক দৈর্ঘ্য নিয়ে নানান রঙ্গ রসিকতাও হত, যদিও সেই বয়সের সত্যজিৎ রায়ের মতন সুপুরুষ সারা পৃথিবীতেই দুর্লভ। তাঁর সঙ্গে কমলকুমারের এক বিশেষ ধরনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। ‘পথের পাঁচালী’ মুক্তি পাবার পর কমলকুমার ব্রত পার্বণ, বাস্তু সাপ ইত্যাদি খুঁটিনাটির কিছু ভুল ধরেছিলেন, তাতে সত্যজিতের অপ্রসন্ন হবারও কথা, হয়েওছিলেন, যদিও পরবর্তীকালে তিনি স্বীকার করেছিলেন, কমলবাবুকে খুশি করার মতন বাংলার সামাজিক জ্ঞান তাঁর নেই। কমলকুমার কিন্তু অন্য কারওর মুখে সত্যজিতের নিন্দে সহ্য করতে পারতেন না। সব বিখ্যাত ব্যক্তিদেরই বিরূপ সমালোচনা কিংবা অকারণ কটু-কাটব্য করার মতন কিছু লোক থাকে, একবার এক ব্যক্তি কমলকুমারের সামনে সত্যজিৎ সম্পর্কে অযৌক্তিক নিন্দে শুরু করতেই কমলকুমার চটে গিয়ে বললেন, ও কথা বলো না, বলো না। একটা পেঁপেগাছের তলায় দাঁড়িয়ে বললে পেঁপেগুলো পর্যন্ত তেতো হয়ে যাবে!

হরবোলার সদস্যরা প্রায় সবাই আমারই বয়েসি, অল্পকালের মধ্যেই কমলকুমার হয়ে যান কমলদা, তেমনই সন্তোষদা, আর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বটুকদা নামেই সর্বজনপরিচিত ছিলেন। কিন্তু দিলীপকুমার ওঁদের চেয়ে বয়েসে কিছু ছোট হলেও আমাদের দিলীপদা হননি, তিনি শুধু ডি কে। এঁরা সকলেই আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে বয়েসের কোনও বিভেদ বুঝতে দিতেন না। ডি কে সাহেবি কোম্পানির বড় সাহেব, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় পারতপক্ষে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন না, তাঁর বাংলা পরিশীলিত, রসিকতার সময়েও একটিও অপ-শব্দ থাকে না, ওদিকে কমলকুমারের প্রায় সব রসিকতাই আদিরসাত্মক, ডি কে তা উপভোগ করেন উচ্চহাস্যে। বটুকদাও রসের গল্পের ভাণ্ডারী, বিশেষত তাঁর ভূতের গল্পের প্রচুর স্টক, সবই নাকি তাঁর নিজের দেখা বা শোনা, সেইসব মজাদার ভৌতিক কাহিনীগুলি তিনি লিখলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমতুল্য হতে পারতেন।

কমলদা পরনিন্দা খুব ভালোবাসতেন। বলা যায়, পরনিন্দা ব্যাপারটাকে তিনি উন্নীত করতেন আর্টের পর্যায়ে। সমাজে যাঁরা অতি প্রসিদ্ধ ও শ্রদ্ধেয়, তাঁদের ভাবমূর্তি ভাঙার জন্য তাৎক্ষণিক গল্প বানানোর দারুণ দক্ষতা ছিল তাঁর, ইংরিজিতে যাকে বলে ডিবাংকিং, কিন্তু বিন্দুমাত্র তিক্ততা থাকত না, শুধুই রঙ্গরস। বঙ্কিমচন্দ্র আর শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া কাউকেই বাদ দিতেন না, মৃত বা জীবিতও সমতুল্য। সে সব অনেক গল্পই আমার মনে আছে, কিন্তু এখানে লেখা উচিত হবে না, কারণ কমলকুমার মজুমদারকে যা মানায়, আমার মতন ক্ষুদ্র ব্যক্তির তো তা সাজে না! তাঁর এই রকম তামাসা-প্রবণতা বোঝাবার জন্য একটি তুলনামূলকভাবে নিরীহ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।... রানাঘাট স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি জমিদার ও বিরাট বিখ্যাত ব্যক্তি, তাঁকে দেখা মাত্র অনেক লোকের পদধূলি নেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা, কিন্তু সেখানে কেউ তাঁকে চিনতে পারছে না। তিনি একজন লোকের কাঁধে চাপড় দিয়ে বললেন, ওহে, আমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর! লোকটি পাশের অন্য একটি লোকের দিকে ফিরে বলল, আমাদের অনেকেরই অর্শ আছে, তা বলে এমন জাহির করে বেড়াই না!

বাইশ

হরবোলা ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার আর একটি বড় প্রাপ্তি, একজন নতুন বন্ধু। আমার বন্ধুভাগ্য সারাজীবনই খুব ভালো, তাদের সাহচর্যে শুধু যে আনন্দ পেয়েছি তাই-ই নয়, প্রত্যেকের কাছ থেকেই কিছু না কিছু শিখেছি। অনেক সময়ই মনে হয়েছে, আমার বেশ কয়েকজন বন্ধুর ভালোবাসার ক্ষমতা আমার চেয়ে অনেক বেশি, কেউ কেউ বেশি প্রশ্রয় দিয়ে আমাকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে, যাতে অনেক ক্ষুদ্রতার মুখোমুখি হতে হয়নি। প্রথম যৌবনের বন্ধু নির্বাচনের ওপর মানুষের পুরো জীবনের গতি অনেকটা নির্ভর করে, এ কথা ঠিকই। সুনন্দ গুহঠাকুরতা অর্থাৎ বুড়্‌ঢার সঙ্গে বন্ধুত্ব না হলে আমার জীবন অনেকটা অপূর্ণ থেকে যেত।

কলেজ স্ট্রিটে সিগনেট প্রেসের দোকানটিতে বই কেনা ছাড়াও এমনিই মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগত। ছোট্ট দোকান, চমৎকারভাবে সাজানো, যে-কোনও নতুন বই হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখা যায়। সব রকম কবিতার বইয়ের স্টক এই দোকানেই সবচেয়ে বেশি, কর্মচারীদের ব্যবহার বিনীত ও ভদ্র, মাঝে মাঝে কিছু উপহারও পাওয়া যায়, যেমন 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' প্রকাশ উপলক্ষে দোকানে আগত প্রত্যেককে একটি করে কারনেশান দেওয়া হয়েছিল মনে আছে। সেই দিনটিতে ওই দোকানে শিবরাম চক্রবর্তীকে প্রথম দেখি, গোলাপ ফুলটি হাতে নিয়ে তিনি বললেন, আমি অকৃতদার, এটা নিয়ে এখন কী করি বলো তো? পয়সা খরচ করে বাসে চেপে সেই দক্ষিণ কলকাতায় গিয়ে কাবেরীকে এটা উপহার দিতে হবে! (কাবেরী অর্থাৎ পরবর্তীকালের কাবেরী বসু, বাংলা চলচ্চিত্রে অসাধারণ সুন্দরী নায়িকা হয়েছিলেন কয়েক বছরের জন্য।)

মাঝে মাঝে স্বয়ং ডি কে দাঁড়াতেন কাউন্টারের ওধারে, উপন্যাস-ক্রেতাকেও কবিতার বই কেনার জন্য পেড়াপিড়ি করতেন। অন্যান্য দিনে দোকান কর্মীদের যে মধ্যমণি, সেই যুবকটিও অতীব দর্শনীয়। বাঙালিদের তুলনায় বেশি ফর্সা, খুবই সুঠাম, সুগঠিত শরীর, অনেকটা গ্রিসিয়ান, ব্যবহারের শিষ্টতায় বৈষ্ণবদেরও হার মানায়। পরে জেনেছিলাম, সে আসলে অতি দুর্দান্ত প্রকৃতির ছেলে, কিন্তু কাউন্টারে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ যেন ভিজে বেড়ালটি। হরবোলা

শুরু হবার পর জানলাম, এর নাম সুনন্দ গুহঠাকুরতা, সম্পর্কে দিলীপকুমার গুপ্তের শ্যালক, একই বাড়িতে থাকে। দু'দিন আলাপের পরই তার সঙ্গে আমার তুই তুই সম্পর্ক হয়ে গেল। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, বন্ধুত্বের গাঢ়তার তারতম্যের ওপর তুই-তুমি-আপনি সম্বোধন নির্ভর করে না, সে সময় কফি হাউস-বান্ধবদের সঙ্গে ব্রাহ্ম কায়দায় আপনি আপনি করার রেওয়াজ ছিল, শক্তি বিশ্বসুদ্ধু সকলকে তুই-তুকারি করত, কিন্তু আমার সঙ্গে তুমি'র নীচে নামেনি।

আমার অন্যান্য বন্ধু সকলের সঙ্গেই বুড়্ঢার পরিচয় হয়েছিল একই সময়ে, কিন্তু আমার সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল সবচেয়ে বেশি। কেন, তা ব্যাখ্যা করা যায় না। আপাতভাবে আমাদের দু'জনের কোনও মিলও নেই। বুড়্ঢা যেমন রূপবান, তেমনই গুণবান এবং ধনী পরিবারের সন্তান, আর আমার চেহারা পাঁচপেঁচি ধরনের, ছাত্র হিসেবে অতি সাধারণ এবং পারিবারিক অবস্থা আগেই ব্যক্ত করা হয়েছে। তবু পরবর্তী বহু বছর সে আমার সঙ্গে এমন সম্পর্ক রেখেছে, যেন আমরা দু'জনে অবিচ্ছেদ্য। বুড়্ঢার একটি জীবনী আমার আলাদাভাবে লেখার ইচ্ছে আছে, এখানে সংক্ষেপে কিছু কথা জানানো দরকার।

তার মতন এমন মেধাবী মানুষ আমি আর এ পর্যন্ত দেখিনি। তখনকার দিনে ইংরিজি মিশনারি স্কুলগুলো সম্ভবত ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল, সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষায় সারা এশিয়ার মধ্যে বুড়্ঢা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। সচ্ছল পরিবারের এরকম ভালো ছাত্ররা সবাই এর পরে বিলেত যায়, বুড়্ঢাকে যেতে দেওয়া হয়নি, কোনও উচ্চশিক্ষার দিকেও সে যেতে পারেনি, ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে পড়তে বলা হয়েছিল বি কম। সে পারিবারিক পুস্তক প্রকাশনার ভার নেবে, তখন হিসেব-নিকেশের এই জ্ঞান তার কাজে লাগবে, এরকমই ভেবেছিলেন তাঁর অভিভাবকরা। প্রবল ক্ষোভ ও অনিচ্ছায় এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বি কম পরীক্ষা দিয়ে সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়। পড়াশুনোর দিকে তার ঝোঁক অদম্য, ইংরিজি তো সে খুব ভালো জানেই, কিছুদিন পর সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি ভাষার এম এ ক্লাসে ভর্তি হল, সেটা সন্ধেবেলা পড়া যায়, এই ছিল সুবিধে, আমাকেও সেখানে টেনেছিল। কিছুদিন পরই আমার ধৈর্যচ্যুতি হয়, এখানেও ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দিই, বুড়্ঢা যথারীতি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হল। পরবর্তীকালে, মুম্বই ও বিদেশে থাকার সময় বুড়্ঢা সর্বমোট একুশটি ভাষা শিখেছিল, গ্রিক ও সোয়াহিলি সমেত। প্রতিটি ভাষা শুধু লেখা ও বলা নয়, তার ব্যাকরণ ও উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যও জানত পুরোপুরি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পর আমাদের দেশে এরকম বহু ভাষাবিদ আর কেউ নেই বোধহয়, অথচ বুড়্ঢার কথা ক'জন জানে? তার জীবনটাই একটা কক্ষচ্যুত গ্রহের মতন।

বুড়্ঢার বন্ধুবাৎসল্যও অসাধারণ। সিনিয়ার কেমব্রিজ পড়া তার সহপাঠী অন্য একটা বন্ধুদল ছিল নিশ্চিত, যারা ইংরিজি গান শোনে, হোটেলে গিয়ে নাচে, গাড়ি নিয়ে লং ড্রাইভে যায়, বান্ধবীদের নিয়ে কানামাছি খেলে। বুড়্ঢার সেই বন্ধুদের আমি দেখিনি, কেন সে তাদের থেকে দূরে সরে গিয়ে আমাদের মতন নিছক বাংলা-বলা উত্তর কলকাতার কয়েকটি যুবকের দিকে ঝুঁকলো তাই বা কে জানে! ইংরিজি মাধ্যমে শিক্ষিত হয়েও সে বাংলা সাহিত্য পড়েছিল গভীরভাবে। একথা লিখতে লিখতে ভাবছি, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটা এমন অদ্ভুতভাবে বদলে গেল কী করে? তখন ইংরিজি মাধ্যমে পড়া, ইংরিজি আবহাওয়ায় মানুষ হয়েও তো অনেক বাঙালি ছেলেমেয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে জড়িয়ে রাখত জীবনের সঙ্গে। এখন সেরকম আর দেখা যায় না কেন? তখনও তো ওই সব ছেলেমেয়েদের বাংলা জ্ঞান জীবিকার কোনও কাজে লাগত না, বাংলা পড়ত মাতৃভাষার গর্বে, ভালোবাসার টানে। আফ্রিকার সুদূর প্রান্ত থেকেও বুড়্ঢা বহু বছর পরে আমাকে চিঠি লিখেছে, যেমন সুন্দর হাতের লেখা, তেমনই নিখুঁত বাংলা। অনেক বাংলায় এম এ পাশ করা ছেলেমেয়েরও বানান ভুল দেখেছি, কেউ কেউ শূন্য না লিখে শূণ্য লেখে, আমারও মাঝে মাঝে ভুল হয়, কিন্তু বুড়্ঢার একটি বানানও ভুল দেখিনি

কখনও।

হরবোলার আসর বসত শনি আর রবিবার, কিন্তু বুড়্‌ঢার সঙ্গে সম্পর্ক এমন হয়ে দাঁড়াল যে প্রতিদিনই দেখা হওয়া চাই। সন্ধে সাড়ে সাতটায় দোকান বন্ধ করে সে আড্ডায় বসতে চায়। বুড়্‌ঢার আড্ডার নেশা পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছে যেত এক একদিন। আগেই লিখেছি, বুড়্‌ঢার সূত্রে আমি ওর খুড়তুতো ভাই-বোন মুনা আর ভাইয়াকে পড়াতে শুরু করি। তারপর দক্ষিণ কলকাতায় আরও টিউশানি করতে হয়, সেটাই আমার জীবিকা, তাই অধিকাংশ সন্ধেতেই আমি বাধ্যতামূলকভাবে আড্ডায় অনুপস্থিত। একদিন রাত সাড়ে আটটায় টিউশানি সেরে বাসে চেপে ফিরছি, হঠাৎ এলগিন রোগের মোড়ে শুনতে পেলাম, রাস্তায় কে যেন খুব জোরে জোরে চিৎকার করে সুনীল, সুনীল বলে ডাকছে। সুনীল নাম তো কতজনেরই হতে পারে। ভিড়ের বাসে দাঁড়িয়ে আমি জানলা দিয়ে কিছু দেখতেও পাচ্ছি না, তবু যেন চুম্বকের টানে, সবাইকে ঠেলে ঠুলে চলন্ত বাস থেকেই নেমে পড়লাম। দেখি যে, আমার দেবকান্তি বন্ধুটি সহাস্য মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম, তুই কী করে বুঝলি যে আমি এই বাসেই ফিরব? বুড়্‌ঢা বলল, আধ ঘণ্টা ধরে আমি এখানে দাঁড়িয়ে যত বাস আসছে, প্রত্যেকবার তোর নাম ধরে ডাকছি, জানি যে একটা না একটাতে তুই থাকবিই!

এরকমভাবে কোনও বন্ধুকে ক'জন বন্ধু ডাকে?

সেই সময় দোলের দিন সারা কলকাতা জুড়ে বীভৎস কাণ্ড হত, জল-কাদা, আলকাতরা, বাঁদুরে রং ছোঁড়াছুঁড়ি, মারামারিও হত, বিকেল পর্যন্ত সমস্ত গাড়ি ঘোড়া বন্ধ। সেরকমই এক দোলের দিন সকালে আমাদের বৃন্দাবন পাল লেনের বাড়ির রাস্তার দিকে জানলায় দেখি বুড়্‌ঢার মুখ। কী করে এলি? কেন, হেঁটে! ভোরবেলা রওনা হয়ে এলগিন রোড থেকে সে বাগবাজার পর্যন্ত হেঁটে এসেছে শুধু আড্ডার টানে! তখন কয়েক বছর আমাদের খুব তাস খেলার নেশা ধরেছিল, ভাস্কর দত্তর বাড়িতে দু'খানা বৈঠকখানা, সেখানে খেলা চলে, এক একদিন দুপুর বারোটা-একটা থেকে শুরু হয়ে রাত দশটা পর্যন্ত। ভাস্করের দাদারা খুব সহৃদয়। তাঁরা আপত্তি করেন না, বরং ভেতর থেকে অনবরত চা ও জলখাবার আসে। ভাস্কর ও আমি ছাড়া আশু, উৎপল রায়চৌধুরী, শুভেন্দু দত্ত এইরকম ক'জন খেলুড়ে। দীপক ও শক্তি তাস খেলা একেবারে সহ্য করতে পারে না, তারা বিরস মুখে কিছুক্ষণ বসার পর সরে পড়ে। একসময় বুড়্‌ঢা এসে যোগ দিল এই আসরে। তারপর আমরা জানতাম, খেলার দিন আর কেউ আসুক বা না আসুক, ঝড়-বাদল, ভূমিকম্প, পুলিশের গুলি, বন্‌ধ (তখন হরতাল বা ধর্মঘট বলা হতো) যাই-ই হোক না কেন, বুড়্‌ঢা আসবেই! সে সবচেয়ে বেশি জোরে চিৎকার করবে, ইংরেজি-বাংলায় নানারকম রসিকতা শোনাবে, হঠাৎ হঠাৎ গান গেয়ে উঠবে। এরই মধ্যে সে সন্তোষ রায়ের কাছে নাড়া বেঁধে অতি অল্প সময়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে দক্ষ হয়ে উঠেছে, যে-কোনও গানের আধলাইন শুনেই বলে দিতে পারে রাগ রাগিণী। এ ছেলের যে অনেক গুণ!

তখনও আমরা শুধু ব্রিজ খেলতাম, তিন তাসের জুয়া ধরেছি অনেক পরে। গোপনে মদ্যপানও শুরু হয়নি।

বুড়্‌ঢাই আমাকে মদ্যপানে প্রকৃত দীক্ষা দেয়। ততদিনে বেশ কিছু বিদেশি সাহিত্য এবং লেখক ও শিল্পীদের জীবনী পাঠ করে মদ্যপান সম্পর্কে ভীতি ও নৈতিক আপত্তি অনেকটা কেটে গেছে, বরং বেশ কৌতূহল জন্মেছে। এ দেশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিল্পী গোপাল ঘোষ সম্পর্কেও নানা গল্প প্রচলিত। বুড়্‌ঢাদের সামাজিক পরিবেশে প্রকাশ্যে মদ্যপান গর্হিত কোনও ব্যাপার নয়, সন্ধের পর কোনও পরিচিত অতিথি এলে চায়ের বদলে অন্য কোনও কঠিন পানীয়ে রুচি আছে কি না জিজ্ঞেস করা হয়। আমার বন্ধুদের মধ্যে দীপক ও শক্তি ছাত্র বয়েসেই অনেকবার মদ্যপান ও সিগারেট টেনেছে বলে জানিয়েছিল। আমি বিমান মল্লিকের সঙ্গে লাইট হাউসের সেই সরবত ছাড়া কিছু খাইনি। প্রথম সিগারেটে টান দিয়েছি জীবনানন্দ দাশের শ্মশানে

যাত্রায়। আমাদের অনভিজ্ঞতার কথা শুনে বুড়্‌ঢা বলল, চল, তোদের একদিন ভালো জায়গায় খাওয়াব।

সে আমাদের নিয়ে গেল গ্র্যান্ড হোটেলে! এ যেন রূপকথার মতন অবিশ্বাস্য। গ্র্যান্ড হোটেলে যে আমাদের মতন সাধারণ মানুষদের প্রবেশ অধিকার থাকে, সেটাই তো জানতাম না। সেই পঞ্চাশের দশকেও কলকাতায় প্রচুর সাহেব-মেমের ভিড় ছিল, অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সংখ্যাও প্রচুর, ওসব বড় বড় হোটেলে পোশাক পরিচ্ছদেরও নিয়মকানুন থাকা সম্ভব, আমি তো প্যান্টের ওপর দিয়ে না-গোঁজা শার্ট আর চটি পরি। পোশাক নিয়ে আমার হীনম্মন্যতাবোধ উড়িয়ে দিয়ে বুড়্‌ঢা বলল, ধ্যাৎ, পয়সা দিয়ে খাব, কে কী বলবে!

আশু, ভাস্কর, উৎপল রায়চৌধুরী ও আমি বুড়্‌ঢার সঙ্গে গিয়ে বসলাম বার কাউন্টারে, উঁচু টুলে, একেবারে ইংরিজি সিনেমার মতন। সোডা-মেশানো হুইস্কিতে প্রথম চুমুক দিয়ে বেশ বাজে গন্ধ লাগল, কিন্তু মুখের রেখায় তা প্রকাশ করলে চলবে না, সঙ্গে কাজুবাদাম ও কাবাব-টাবাব দিয়ে পরবর্তী চুমুকগুলি সামলে নিতে হল। সেই প্রথম দিনটিতেই মজা হয়েছিল বেশ। বুড়্‌ঢা ধরেই নিয়েছিল, আমাদের একেবারেই অভিজ্ঞতা নেই, এক-দু' পেগেই কাত হয়ে যাব। কিন্তু নেশার মর্ম যারা বোঝে না, তাদের সহজে নেশা হতেও চায় না। নভিসরা হয় আগে থেকেই ভয় পায়, অথবা অকুতোভয়। বুড়্‌ঢা যে-ই জিজ্ঞেস করছে, আর একটা? আমরা মাথা নাড়ছি। পেগের পর পেগ উড়ে যেতে লাগল। চার পেগের পর আমি টয়লেটে যেতেই বুড়্‌ঢা আমার পাশে এসে ফিসফিস করে বলল, আমি ভেবেছিলাম, তোরা বেশি খেতে পারবি না, তাই খুব বেশি টাকা আনিনি, এবার তুই বলবি, তুই আর পারছিস না! সে আমলে গ্র্যান্ড হোটেলেও স্কচের পেগ পাঁচ-ছ' টাকার বেশি ছিল না, একশো টাকা খরচ করা রীতিমতো বিলাসিতা। শুরুর দিনেই চার পেগ করে খেয়ে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামলাম, কারোর পা টলল না, নেশার ব্যাপারটা বোঝাই গেল না। গ্র্যান্ড হোটেলেও জল মেশাত নাকি?

আমাদের মদ্যপানের দ্বিতীয় দীক্ষাগুরু কমলকুমার মজুমদার, সে এক দৃশ্যান্তর বটে। গ্র্যান্ড হোটেলের স্কচের পরই খালাসিটোলায় টিনের চালের শুঁড়িখানায় ধেনো! সেই বাংলা মদের ডাক নাম ছিল মা-কালী, কেউ কেউ ঠোঁট বেঁকিয়ে ইংরিজি করে বলত মেকলে! অনেক বছর পর উত্তমকুমারের দৌলতে তার নাম হয় অমানুষ।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটকে বুড়্‌ঢা সেজেছিল রাম। ভূমিকা বন্টনের আগে কমলদা সকলের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। সকলে তাতে উৎরোয়নি, যেমন শক্তি ও ভাস্কর, দু'জনেই এমনিতে কথাবার্তায় চৌকশ, কিন্তু মঞ্চে অনড়। আমি মনোনীত হয়েছিলাম কোনওক্রমে। নাটকের অভিনয়ের ব্যাপারে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতাগুলি শোচনীয়। কলেজে পড়ার সময়ও একবার নাটক করেছিলাম, গল্‌সওয়ার্দির 'অ্যান ইন্‌সপেকটর কল্‌স' নাটকটির ভাবানুবাদ, তাতে আমার সহ-অভিনেতা ছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সিটি কলেজে সে ছিল আমাদের চেয়ে এক বছরের জুনিয়ার। সৌমিত্র তখনও সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে আহ্বান পায়নি, অতি সুদর্শন, বুদ্ধিমান ও নরম স্বভাবের ছেলে, কবিতা লেখে। সৌমিত্রর তুলনায় আমার ভূমিকাটি বড়ই ছিল, আমিই ইন্‌সপেকটর, পার্ট ঠিকঠাক মুখস্থ করেছিলাম, কিন্তু সৌমিত্র ও অন্যান্যরা ভালো অভিনয় করলেও আমার জন্যই নাটকটি ডুবে যায়। যেখানে হাসির কথা নয়, সেখানেও দর্শকরা আমাকে দেখে হাসছিল। আসলে, আমার হাতে একটি মেয়ের বড় সাইজের ফটোগ্রাফ থাকার কথা, যেটি দেখিয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করতে হবে, তারা মেয়েটিকে চেনে কি না! নাটক শুরু হবার আগেও সেরকম একটি ফটোগ্রাফ জোগাড় করে রাখা হয়নি, শেষ মুহূর্তে কাছাকাছি একটা ফোটগ্রাফির দোকানের শো-কেস থেকে সুচিত্রা সেনের একটি ছবি খুলে আনা হয়। উল্টো দিক থেকেও সে ছবি দেখে হেসে গড়াচ্ছিল দর্শকরা।

হরবোলার নাটকে অবশ্য কোনও রকম ভুলত্রুটি হবার উপায় নেই। সিগনেট প্রেসের সেই

বাড়ির সামনে মস্ত বড় লন, সেখানে কলকাতার সবচেয়ে নামী ডেকরেটরদের দিয়ে মঞ্চ বাঁধা হয়েছে দেড়মাস আগে, প্রত্যেকদিন তার ভাড়া কয়েক শো টাকা, আমাদের যাতে কোনওরকম মঞ্চভীতি না থাকে সে জন্য দেড়মাস ধরে প্রতিদিন স্টেজ রিহার্সাল। পশ্চাৎপটে ছবিটবি কিছু নেই, শুধু পর্দাটি হালকা বেগুনি ও লেবু-হলুদ রঙে সমানভাবে বিভক্ত, অর্থাৎ চরিত্রগুলি মঞ্চের এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করলে তাদের পটভূমিকার রং বদলে যাবে। শুধু ফুটলাইট, ফোকাসের ব্যবস্থা রাখেননি কমলদা, অর্থাৎ তিনি খানিকটা যাত্রার আঙ্গিক মেশাতে চেয়েছিলেন। পোশাকের অভিনব পরিকল্পনাও তাঁর নিজস্ব। যেমন বনবাসী রামের অঙ্গে শুধু গাছের পাতার তৈরি বসন, সবুজ রঙের অয়েল ক্লথ কেটে কেটে সেই পাতার পোশাক বানানো হয়েছিল। বিভীষণের কোনও পোশাকই নেই। শুধু একটা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে গলায় কাঁধে গিঁট বাঁধা, যাতে ঠিক বকধার্মিকের মতন দেখায়, সে ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিল উৎপল রায়চৌধুরী। দীপক মজুমদার লক্ষ্মণ, গানগুলিতে জমিয়ে দিয়েছিল সে। আর হনুমান সেজেছিল রমেন গুহ, এখন সে কলকাতা বইমেলার অন্যতম কর্তাব্যক্তি, চমৎকার তার অভিনয়। ছোট ছোট ছেলেরা বানর সেনা, তাদের অন্যতম নীলাক্ষ গুপ্ত, যে এখন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রখ্যাত সমালোচক, রবিশঙ্করের সঙ্গেও তর্কযুদ্ধে নামতে দ্বিধা করে না। আমার ভূমিকা জাম্বুবানের, হাতে সবসময় হুঁকো, কোনওরকমে কাজ চালিয়ে দিয়েছি বলা যেতে পারে।

কমলকুমারের পরিচালনায় এরকম নাটক জমে যেতে বাধ্য। টিকিট ছিল না, আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল শুধু কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, সমস্ত পত্র-পত্রিকাতেই প্রশংসিত হয়েছিল। সৈয়দ মুজতবা আলী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি পত্রিকায় অনেকখানি লিখেছিলেন।

পরের নাটকটি খুবই কঠিন, রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'। এ নাটকটিকে মঞ্চসফল করা বেশ দুষ্কর, কোনওদিনই এ নাটকটির পূর্ণাঙ্গ অভিনয় হয়নি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আমলেও কিছু চরিত্র ও গান বাদ দেওয়া হত। কমলকুমার রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন না, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দপক্ষীয়, শ্রীরামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথকে চিনতেন কি না জানা যায় না। বিবেকানন্দ চিনতেন, অল্প বয়েসে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা করলেও শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে নাকি বিদ্রূপবাক্য উচ্চারণ করেছেন, কমলকুমারেরও মতামত সেইরকম। কিন্তু 'মুক্তধারা' নির্বাচিত হবার পর নাট্য-পরিচালক হিসেবে তিনি ঘোষণা করলেন, নাটকের একটিও শব্দ বা চরিত্র বাদ দেওয়া যাবে না, অন্তত ঐতিহাসিকভাবে 'মুক্তধারা'র সম্পূর্ণাঙ্গ অভিনয়ের কৃতিত্ব যেন 'হরবোলা' দাবি করতে পারে। এ নাটকে বহু চরিত্র, তাই আরও অনেক বন্ধুবান্ধব, চেনাজানাদের নিয়ে আসা হল, আগেরটি ছিল স্ত্রীভূমিকা বর্জিত, এবারে ডাকা হল দু' একজন বন্ধুর বোনকে, অতি রূপসী গৌরী দত্ত এসেছিলেন ডি কে-র আহ্বানে। তবু, ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান গাইবার মতন কেউ ছিল না আমাদের মধ্যে। ডি জে কিমার কোম্পানি থেকে ডি কে-র দু'জন সহকর্মী এসে যোগ দিলেন। একজন শ্যাম গুহ, মৃদুভাষী ও রসিক, তিনি শিল্পী, কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যার নাম-লিপি তাঁরই আঁকা। অন্যজন চূণীলাল শীল, অত্যন্ত সজ্জন ও সুপুরুষ, উদাত্ত গানের গলা।

হরবোলায় মাঝে মাঝে গান ও সাহিত্যবাসর হত বটে, কিন্তু নাটকের রিহার্সালেই ছিল বেশি আকর্ষণ। আগেরটির মতন এটারও রিহার্সাল চলে এক বছর ধরে। কমলকুমার এর মধ্যে আবার সাহিত্যরচনা শুরু করেছেন, আমরা কয়েকজন দিনের বেলাতেও তাঁর ছায়াসঙ্গী। একদিন অকস্মাৎ একটি নাম-না-জানা পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা' আমাদের পড়তে দিলেন। সে উপন্যাসের ভাষায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ।

নাটক পরিচালনার সময় তাঁর নির্দেশের ভাষাও চমকপ্রদ। একরকম বিশেষ গলার আওয়াজ বার করতে হবে। তিনি বললেন, মনে করো ট্রেনে চেপে দূরে কোথাও যাচ্ছ, সারা রাত ধরে

মাঝে মাঝে ঘুম আর জাগা, ভোরবেলা কোন একটা ছোট স্টেশনে ট্রেন থেমেছে, চোখ মেলে দেখলে, প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা, শুধু দূরে একটা ডাক শোনা যাচ্ছে, চা-গরম! ওইরকম চা-গরমের গলার আওয়াজটা চাই! একজনকে বিশেষভাবে হাঁটার নির্দেশ দিতে গিয়ে বললেন, মনে করো, মা এইমাত্র ঘর মুছে গেছেন, সেই ভিজে ঘরে কিছুক্ষণ হাঁটা বন্ধ রাখতে হয়, তুমি হঠাৎ ঢুকে পড়েছ, তখন মায়ের বকুনির ভয়ে পুরো পা না ফেলে, আঙুলের ডগা দিয়ে তাড়াতাড়ি যেমন যাও...। অভিজিতের একটা সংলাপে আছে, সুন্দর এই পৃথিবী, কমলদা নির্দেশ দিতে গিয়ে বললেন, এ কথাটা কোন্ দিকে তাকিয়ে বলবে? পৃথিবী কি শুধু তোমার সামনে? পেছনে নয়, ডানদিকে নয়, বাঁদিকে নয়? চতুর্দিকে ঘুরে বললে যাত্রা হয়ে যাবে। নিজের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলো, সুন্দর এই পৃথিবী...।

এ নাটকে তিনি আমায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিয়েছিলেন, যন্ত্ররাজ বিভূতি। আপাতত ভিলেন, আবার ট্র্যাজিক চরিত্রও বটে। একটা নীল-সাদা ডোরাকাটা আলখাল্লা আমার পোশাক, গলায় মস্ত বড় একটা ফুলের মালা। পার্ট ভোলার কোনও প্রশ্নই নেই, কারণ এতদিন ধরে রিহার্সাল চলেছে যে পুরো নাটকটি প্রত্যেকের মুখস্থ। দর্শকরা সবাই বিশিষ্ট, কারণ প্রবেশ আমন্ত্রণপত্রভিত্তিক, সমস্ত লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ও খ্যাতনামা নাগরিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দু'দিন অভিনয় হয়েছিল, একটিও দর্শক-আসন খালি ছিল না। হরবোলার কিছুটা নাম হয়েছে। সিগনেট প্রেসের প্রতিপত্তিশালী দিলীপকুমার গুপ্তর আমন্ত্রণ ক'জন অগ্রাহ্য করতে পারে! তা ছাড়া উচ্চপদস্থ রাজপুরুষরা অনেকেই কমলদার চ্যালা। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রে'রও বামপন্থীদের মধ্যে প্রচুর অনুরাগী, সে জন্য কার্ডের খুবই চাহিদা। অনেক মঞ্চ-চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্রের দু'জন প্রধানা নায়িকা, সুচিত্রা সেন ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে অরুন্ধতী আগে ছিলেন গুহঠাকুরতা, বুড়োদের আত্মীয়, ইনি এসেছিলেন প্রথম দিনেই। সুচিত্রা সেন এসেছিলেন কি না মনে নেই, তবে অরুন্ধতীর মুখখানা যেন নীলাভ আলো মাখা, তাঁর দু'পাশে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বিকাশ রায়। অতিথিদের তদারক করছেন সত্যজিৎ রায়। প্রথম সারির এক কোণে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও রাজেশ্বরী দেবী, তাঁদের সঙ্গে গল্প করছেন বুদ্ধদেব বসু। নাটক শুরুর আগে উইংসের আড়াল থেকে আমরা জুলজুল চোখে দেখছি এঁদের, আমাদের মতন অকিঞ্চিৎকর ছেলেমেয়েদের অভিনয় দেখতে এসেছেন বাংলার শ্রেষ্ঠ মানুষেরা!

প্রথম দিনে আমি একটা কাণ্ডই করে ফেলেছিলাম। আমার ওপর নির্দেশ ছিল, শেষ দৃশ্যে বিভূতি 'আমার বাঁধ কে ভাঙলে, বাঁধ কে ভাঙলে', এই কাতর আর্তনাদ করতে করতে গলার মালাটা ছিঁড়ে ফেলবে, যাতে ফুল ছড়িয়ে যায় সারা মঞ্চে। আমি অত্যুৎসাহে এত জোরে ছিঁড়লাম যে আধখানা মালা উড়ে গিয়ে পড়ল অরুন্ধতী দেবীর কোলে! পরে অনেকে বলেছিল, ও রকম আমি ইচ্ছে করে করেছি, কিন্তু তা সত্যি নয়!

তেইশ

পঞ্চাশের দশকের বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের ইতিহাস যদি অনুসরণ করতে যাই, তা হলে মনে হবে এমন সমৃদ্ধ দশক আর হয় না! শিল্পের প্রতিটি শাখাই উন্নত। বাংলার সাহিত্যিকরা ভারতে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ। এই দশকের গোড়াতেই বিভূতিভূষণ চলে গেলেও তাঁর খ্যাতি বাড়ছে দিন দিন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় প্রথম দিকে ফ্রয়েডীয়

মনোবিশ্লেষণ ধারার প্রভাব থাকলেও ক্রমশ তিনি ঝুঁকে পড়েন মার্কসবাদের দিকে, তারাশঙ্কর বিশাল পটভূমিকায় ফুটিয়ে তুলছেন জনমানসের প্রতিচ্ছবি। বনফুল ও সতীনাথ নিয়ে আসছেন বহির্বঙ্গ। কল্লোল যুগের লেখকরা প্রায় সবাই সক্রিয়, বুদ্ধদেব বসুকে ঘিরে গড়ে উঠেছে একটি লেখক গোষ্ঠী, প্যারিস শহরে যেমন জ্যাঁ ককতো, কলকাতায় তেমন বুদ্ধদেব বসু, যদিও তিনি মার্কসবাদ বিরোধী ছিলেন বলে তখনকার বামপন্থী হাওয়ায় তাঁর নিন্দুকের সংখ্যাও কম ছিল না। বিষ্ণু দে-কে ঘিরে বাম মনোভাবসম্পন্ন তরুণরাও একটা গোষ্ঠী তৈরি করে ফেলছে আস্তে আস্তে, জীবনানন্দের প্রস্থান এই দশকের মধ্য পথে, কিন্তু তার পরেই তাঁর কবিতার প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটিত হতে লাগল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তী কবিতা লিখছেন সম্পূর্ণ বিপরীত স্বাদের। অরুণ মিত্র লিখছেন এলাহাবাদ থেকে, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় দারুণ জনপ্রিয়।

শিল্প ও ভাস্কর্যেও বাঙালিরা শীর্ষস্থানীয়, রয়েছেন নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, রামকিঙ্কর, চিন্তামণি কর, পূর্ব পাকিস্তানে জয়নাল আবেদিন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর করছেন কুটুম কাটাম। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে আলাউদ্দিন খাঁ এবং রবিশঙ্কর ও আলি আকবর। বেশ মনে আছে, একটি অনুষ্ঠানে আলাউদ্দিনের দু'পাশে বসে বাজাচ্ছিলেন রবিশঙ্কর ও আলি আকবর, এঁরা দু'জনেই তখন ভারত-প্রসিদ্ধ, হঠাৎ এক সময় আলাউদ্দিন শ্রোতাদের উদ্দেশে বললেন, আমার পোলাডা আর জামাইডা সবে শিখতাছে, আপনেরা ক্ষমা-ঘেন্না করে নিবেন! আলাউদ্দিন মঞ্চে নাটকীয় কিছু করতে পছন্দ করতেন, সেদিন তবলায় সঙ্গত করছিলেন আল্লারাখা, হঠাৎ আলাউদ্দিন তাঁকে এক চড় মেরে বসলেন, আল্লারাখা নাকি লয় ঠিক রাখছিলেন না। তখন আলাউদ্দিন শিল্পীসমাজে সর্বমান্য, আল্লারাখা ক্ষমা চেয়ে নিজের দু'কান মুলে ফেললেন। অনেক বছর পর আমি ওস্তাদ আমির খাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আলাউদ্দিন সঙ্গীতগুরু হিসেবে তো তুলনাহীন, কিন্তু নিজে শিল্পী হিসেবে বড় ছিলেন? আমির খাঁ বিশেষ কোনও ঘরানা থেকে আসেননি। নিজস্ব মতামত প্রকাশে দ্বিধাহীন, আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, হাঁ, বহুৎ মোটা (ইন্দোর অঞ্চলের ভাষায় মোটা মানে মহান), লেকিন লয় জেরা কম থা। ব্যাপারটা মজার লেগেছিল বলে মনে আছে।

পঞ্চাশের দশকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে আমাদের মাতিয়ে রেখেছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র ও রাজেশ্বরী দত্ত, শুধু গুণ নয়, রূপের জন্যও এই তিনজনকে আনায়াসে বলা যায় থ্রি গ্রেসেস। পুরুষ কণ্ঠে দেবব্রত বিশ্বাস, সুবিনয় রায়কে ভালো করে পাই আরও পরে। আধুনিক গানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। তবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতেও সমান পারঙ্গম। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে প্রথম জনপ্রিয় করেন পঙ্কজকুমার মল্লিক, প্রত্যেক রবিবার সকালে রেডিয়োতে তিনি গান শেখান, সেই অনুষ্ঠানটিকে মনে হত জাতীয় জীবনের অঙ্গ। পঙ্কজ মল্লিক অবাঙালিদের কাছেও পরিচিত ছিলেন, নিউ থিয়েটার্সের অনেক হিন্দি ছবিতেও তিনি গাইতেন। পঙ্কজ মল্লিকের পর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যান, অন্য অনেক ধরনের গানও তিনি গাইতেন, সলিল চৌধুরীর সুরে ও বাণীতে 'কোনো এক গায়ের বঁধূ' গানটির রেকর্ড জনপ্রিয়তার সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়, যেখানেই যাই সেখানেই ওই গান, দু'পিঠ জোড়া বড় গানটি মুখস্থ না করে উপায় নেই। তেমনই জনপ্রিয় হয় সুকান্তর 'রানার', সত্যেন দত্তর 'পাল্কি চলে', সলিল চৌধুরীরই সুরে। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এসব গাইতেন না, প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছিলেন, তারপর চলে গেলেন শ্যামাসঙ্গীতে। প্রথম যে তিন গায়িকার কথা বলেছি, তাঁদের মধ্যে কণিকা ও রাজেশ্বরী থাকতেন অন্তরালে, কিন্তু সুচিত্রা জনসভায়, মিছিলে অংশগ্রহণ করে মাতিয়ে রাখতেন জনসাধারণকে। আব্বাসউদ্দিনের পর লোকসঙ্গীতের দিকটা কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ আবির্ভূত হলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী নামে এক নতুন শিল্পী। কী জোরালো, উদাত্ত তাঁর গলা। সারা ভারতে

নৃত্যজগতের সম্রাট তখন উদয়শঙ্কর, বাংলার মঞ্জুশ্রী চাকী ও সেবা মিত্র নামে দুটি তরুণীও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' এসে যুগান্তর ঘটিয়ে দিল বাংলা শুধু নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রে। উপেন্দ্রকিশোরের নাতি ও সুকুমার রায়ের ছেলে হয়েও সত্যজিৎ রায় প্রথম যৌবন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের কোনও খোঁজখবর রাখতেন না। ডি জে কিমার কোম্পানিতে চাকরি করতে যাবার পর সেখানকার ম্যানেজার ডি কে তাঁর বাংলা জ্ঞানের বহর দেখে জোর করে বাংলা বই পড়াতে শুরু করেন। তিনি সত্যজিৎকে প্রথম যে বইটি উপহার দিয়েছিলেন, সেটি তারাশঙ্করের 'কবি'। তারপর সত্যজিৎ অতি দ্রুত বাংলা সাহিত্যে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন, নিজেই নতুন স্বাদের কিশোর বাংলা সাহিত্য রচনায় অত্যন্ত সার্থক হন, ছড়া ও গানও লিখেছেন চমৎকার। সেগুলির ছন্দ-মিলে ত্রুটি নেই। এসব নাকি রক্তে থাকে। সিগনেট প্রেসের বইগুলির মলাট আঁকতে আঁকতে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের কিশোর সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু' পড়েই প্রথম তাঁর এই কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা মনে আসে। 'পথের পাঁচালী' মুক্তির দু'বছর পর ফরাসি দেশের ক্যান চলচ্চিত্র উৎসবে সেটি 'শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল' হিসেবে সম্মানিত হয়, তার আগেই কিন্তু কলকাতার লেখক-কবি-শিল্পীরা সিনেট হলে সত্যজিতের সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল, তার উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর। এই দশকেই পর পর মুক্তি পায় 'অপরাজিত', 'পরশ পাথর', 'জলসাঘর', 'অপুর সংসার' আর 'দেবী'। সেসব ছবি, প্রথম দেখার উন্মাদনার রেশ যেন এখনও রয়ে গেছে। পথের পাঁচালী দেখে কী কান্নাই কেঁদেছিলাম, সে কান্না অতি বিশুদ্ধ, মনকে পরিশ্রুত করে দেয়। এই দশকের মধ্যেই এসে যান মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, রাজেন তরফদার আর তপন সিংহ। মৃণাল সেনের 'নীল আকাশের নীচে' আর 'বাইশে শ্রাবণ' দেখেই মনে হয়েছিল, ইনি জয় করতে এসেছেন। সারা ভারত তখন বাংলার চলচ্চিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবনত। এর আগেও প্রমথেশ বড়ুয়া আর দেবকীকুমার বসু আনেক ভালো ছবি উপহার দিয়েছেন, কলকাতা ছিল হিন্দি ছবিরও বড় কেন্দ্র, নিউ থিয়েটার্স থেকে দ্বিভাষী ছবি তৈরি হত। কুন্দনলাল সায়গল কলকাতা থেকেই সর্ব ভারতীয় খ্যাতি পেয়েছিলেন, যতদূর জানি, রাজ কাপুর-শশী কাপুরদের বাবাও জড়িত ছিলেন কলকাতার চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে।

এক কালের বিখ্যাত ব্যবসায়িক থিয়েটারগুলির রমরমা তখন অনেকটা কমে গেছে বটে, কিন্তু গড়ে উঠেছে অনেকগুলি নাট্যদল। চলচ্চিত্রে সত্যজিতেরই মতন বাংলা নাট্যমঞ্চে যুগান্তর এনে দেন শম্ভু মিত্র, 'পথিক', 'ছেঁড়া তার' ও তারপর 'রক্তকরবী'। একেবারে সম্পূর্ণ নতুন উপস্থাপনা। বহুরূপীর মতনই আরও কয়েকটি দল বিশেষ ছাপ ফেলেছিল, যেমন গণনাট্য সঙ্ঘ, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ, থিয়েটার সেন্টার। আগেকার কালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর তখন নিজস্ব কোনও মঞ্চই নেই, তাঁকে পদ্মভূষণ খেতাব দেওয়া হলে তিনি অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, এর বদলে একটা জাতীয় নাট্যশালা গড়ে দিলে খুশি হতাম। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার সে আক্ষেপে আমল দেয়নি।

শুধু শিল্প সাহিত্য নয়, জ্ঞানচর্চাতেও তখন বাঙালিদের প্রাধান্য। বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু; প্রথম জনের নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হলেও পাননি পৃষ্ঠপোষকদের ধরাধরি করার অভাবে, আর দ্বিতীয়জনের নাম আইনস্টাইনের একটি থিয়োরির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে ছিলেন যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুশোভন সরকার প্রমুখ, ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, মুক্তচিন্তার আদর্শের নেতা আবদুল ওদুদ। বঙ্গের আকাশ ভরা এরকম বহু নক্ষত্র। এমনকী খেলাতেও কলকাতা দারুণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল, ১৯৫১ সালে ফুটবলের এশিয়ান গেমসের ফাইনালে ইরানকে হারিয়ে চাম্পিয়ন হয় ভারতীয় দল, এই দলের ন'জন

খেলোয়াড়ই কলকাতার ক্লাবের, একমাত্র গোলটি দিয়েছিলেন মেওয়ালাল।

সামাজিকভাবে এই দশকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কয়েকটি বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল, যার কৃতিত্ব অনেকটাই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর, আবার আংশিক ব্যর্থতার দায়ও তাঁরই। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হবার পর সমস্ত নাগরিকদের জন্য সমানভাবে একই রকম সিভিল ও পিনাল কোড জারি হওয়া স্বাভাবিক ছিল। ধর্মনির্বিশেষে একই রকম বিবাহবিধি ও নারী-পুরুষের সমান উত্তরাধিকার এবং ধর্মীয় বিভেদ, জাতি ভেদ ও অস্পৃশ্যতাকে কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে আইন প্রযুক্ত হলে ভারত ভবিষ্যতের অনেক সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারত, নেহরুর পরিকল্পনাও ছিল সে রকম। কিন্তু তুরস্কের কামাল আততুর্কের মতন দুঃসাহস ও মানসিক দৃঢ়তা তাঁর ছিল না। রক্ষণশীলরা তো আপত্তি করবেই, তাদের সংখ্যাও অনেক সময় বেশি হয়। প্রগতিপন্থীরা সব সময়ই সংখ্যালঘু, তবু তারাই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিদ্যাসাগর মশাই যখন বিধবাবিবাহ বিলের সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয়দের স্বাক্ষর ছিল অনেক বেশি। জওহরলাল নেহরু মূল আদর্শ থেকে খানিকটা পিছিয়ে এলেন, মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে স্পর্শ করলেন না, ভারতীয় কোড বিলের বদলে তিনি লোকসভায় উপস্থিত করলেন হিন্দু কোড বিল। হিন্দু রক্ষণশীলরা তা নিয়েও কম বিরোধিতা ও বাধার সৃষ্টি করেনি, কিন্তু এ ব্যাপারে নেহরু বামপন্থী দল ও নারী সংগঠনগুলির সমর্থন পেয়েছিলেন। যাই হোক, হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথম নিষিদ্ধ হল বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ। মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবাহের নিম্নতম বয়স ১৫ আর ছেলেদের ১৮, আর দু'জনেই ২১ বছর পূর্ণ করলে তারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের হলেও ধর্মান্তরিত না হয়ে বিয়ে করতে পারবে। স্বীকৃত হল বিবাহ বিচ্ছেদ, অত্যাচারিত হিন্দু নারীদের যে অধিকার ছিল না কখনও, এখন পৈতৃক সম্পত্তিতেও তাদের অধিকার জন্মাল। পরের দু'বছরে এরকম কয়েকটি আইনের সঙ্গে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আইনও পাস হয়ে গেল।

এর ফলে যত ব্যাপকভাবে সামাজিক পরিবর্তন হতে পারত, ততটা সম্পূর্ণ হতে পারেনি, কারণ কঠোরভাবে আইনগুলির প্রয়োগ হয়নি সর্বত্র, বিশেষত উত্তর ভারতে। বাল্যবিবাহ ও অস্পৃশ্যতার মতন কুৎসিত প্রথা এখনও রয়ে গেছে বহু জায়গায়। সমস্ত ভারতীয়দের জন্য সমান আইন প্রণয়নে ব্যর্থতার জন্যই দিন দিন জটিল হয়েছে কাশ্মীর সমস্যা, ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়েছে হিন্দু মৌলবাদ। রাষ্ট্রটি ধর্মনিরপেক্ষ হলেও প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা কাকে বলে তা বোঝানোই হয়নি সাধারণ মানুষদের। আইন প্রণয়ন করে সমাজ বদলানো যায় না, অমূল পরিবর্তনের জন্য চাই বিপ্লব, এরকম একটা মতবাদ তখন খুব চালু ছিল, আমরাও বিশ্বাস করতাম, কিন্তু বিপ্লবের পরেও জোরজবরদস্তি কিংবা সামরিক ধাঁচের শাসন ছাড়া অন্য কোনও দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেনি এ পর্যন্ত কোনও দেশ।

হিন্দু কোড বিল মান্য করা ও অস্পৃশ্যতা নিবারণের ব্যাপারে অনেকটাই অগ্রণী পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে এত জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বাঙালিদের কোনও গুরুত্বই ছিল না। সেই কারণে পশ্চিমবাংলার দুর্গতিও শুরু হয় এই দশকে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় শক্ত ধাতুতে গড়া মানুষ বলে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু খণ্ডিত বাংলায় তিনি একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাত্র, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর বহু দাবি ও প্রতিবাদে কর্ণপাত করেনি। স্বাধীনতার পরের বছরেই কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করা হয়েছিল, অনেক নেতাই তখন চলে যান আন্ডারগ্রাউন্ডে, দু'বছর পর কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে এই পার্টি আবার বৈধতার স্বীকৃতি পায়। প্রকাশ্যে প্রচার শুরু করে ও নির্বাচনে অংশ নেয়। কমিউনিস্ট পার্টি তখন নিতান্তই শহরভিত্তিক, কলকাতাতেই প্রধান শক্তি, গ্রামাঞ্চলে কোনও প্রভাবই ছিল না বলতে গেলে। বিরোধীপক্ষ হিসেবে তাদের কর্মসূচী ছিল সরকারকে নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত ও অপদস্ত করা, ক্ষমতা দখল সে সময় তাদের দিবাস্বপ্নেও ছিল না। একবার খাদ্য আন্দোলনে দারুণ

বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা সৃষ্টির পর রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্য ঘোষ বলেছিলেন, শহরটা কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা দখল করে নিয়েছে, ঠিক আছে, আগামী নির্বাচনে গ্রাম থেকে সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে এসে ওদের দেখে নেব। সেবারে তিনি জিতেছিলেন বটে, কিন্তু এই উক্তির মাত্র আট বছর পরই নির্বাচনে অতুল্য ঘোষ সমেত বহু কংগ্রেসী নেতা গ্রামাঞ্চলেই ধরাশায়ী হন।

পঞ্চাশের দশকে শিল্প-সাহিত্যের এমন বিস্ময়কর বিকাশের পাশাপাশি অর্থনৈতিক অবনতি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার চিত্রটি অতি ভয়াবহ। মাথা পিছু উৎপাদন ও আয়ে পশ্চিমবাংলা ছিল শীর্ষে, কারখানার সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি, হঠাৎ শুরু হয়ে গেল অধঃপতন। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যনীতি তার জন্য অনেকখানি দায়ী তো বটেই। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুদের স্রোত বেড়েই চলেছে, জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক স্ফীতি সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে রাজ্য সরকার, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লি-সন্নিধানে পঞ্জাবি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যতটা তৎপর, সে তুলনায় দূরবর্তী বাঙালি উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে অনেকখানি। পঞ্জাবি উদ্বাস্তুরা বসতি পেয়েছে এদিককার পঞ্জাবে ও দিল্লিতে। যে-জন্য দিল্লি পঞ্জাবি-প্রধান শহর হয়ে ওঠে, আর বাঙালি উদ্বাস্তুদের পাঠানো হতে লাগল দণ্ডকারণ্যের প্রতিকূল পরিবেশে। সেখানে তারা কখনও স্বাবলম্বী হতে পারেনি। কিছু উদ্বাস্তু প্রেরিত হয়েছিল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে, সেখানকার চাষবাস ও মাছ ধরা জীবিকা বাঙালিদের অনুকূল, কিন্তু কোনও দুর্বোধ্য কারণে আন্দামানে উদ্বাস্তু পাঠানোর প্রবল বিরোধিতা করল বামপন্থীরা, তাদের বিক্ষোভে এ প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেল। আরও কয়েক লক্ষ বাঙালি উদ্বাস্তুদের আন্দামানে বসতির অধিকার দিলে সে দ্বীপপুঞ্জটি বাঙালি-প্রধান হয়ে যেতে পারত, সেই উদ্বাস্তুরা সরকারি ডোলের ওপর নির্ভরতা বর্জন করে নিজেরাই জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে নিত।

ব্রিটিশ আমলেও বিভিন্ন রাজ্যে রাজস্ব বণ্টনের একটা নির্দিষ্ট নীতি ছিল। কলকাতা ও মুম্বই শহর পেত সমানভাবে কুড়ি শতাংশ। স্বাধীনতা ঘোষণার রাতেই কলকাতার প্রাপ্য রাজস্ব কমিয়ে করা হয় পনেরো শতাংশ, মুম্বইয়ের বেড়ে যায়, কুড়ি থেকে একুশ শতাংশ হল। মাদ্রাজের পনেরো থেকে বেড়ে হল আঠারো। কলকাতার প্রাপ্য কমিয়ে দেবার সম্ভাব্য কারণ এই যে, এখন কলকাতা একটি ছোট রাজ্যের রাজধানী, কিন্তু এই শহর ও বন্দরের ওপরে যে উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্য নির্ভরশীল এবং খণ্ডিত বাংলায় জনসংখ্যার চাপ যে দারুণভাবে বেড়ে যাবে, তা বিবেচনা করা হল না, তা কতটা কেন্দ্রীয় সরকারের দূরদৃষ্টির অভাবে আর কতটা বাঙালির রাজনৈতিক শক্তির অভাবে, তা বলা শক্ত। আগে পাট উৎপাদন ও পাট শিল্পের রাজস্বের আশি ভাগ পেত কলকাতা, কেন্দ্রীয় সরকার তারও অনেকখানি কেড়ে নেয়। যে-কলকাতা এক সময় ছিল প্রাচ্যের উজ্জ্বলতম নগর, এই সময় থেকে তাকে জোর করে ঠেলে দেওয়া হয় অবনতির দিকে।

একদিকে শিল্প-সংস্কৃতির আকর্ষণ, অন্য দিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, এর মাঝখানে আমার মতন হাজার হাজার বেকার যুবক। আমাদের দু'কান ধরে যেন দু'দিকে টানাটানি চলছিল।

গ্র্যাজুয়েট হবার পর বাবা বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন, এবার আমাকে চাকরি খুঁজতেই হবে, আর উচ্চশিক্ষার দরকার নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা কার না থাকে? এ পর্যন্ত আমাকে কোনও কো-এডুকেশনাল কলেজে পড়তে দেওয়া হয়নি। কিন্তু ইউনিভার্সিটির ক্লাসে তো তা আর আটকানো যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেমকাহিনী নিয়ে লেখা হয় অনেক গল্প-উপন্যাস। কিন্তু ততদিনে অ্যাকাডেমিক পড়াশুনো সম্পর্কে আমার নিজেরও মোহ ঘুচে গেছে। চার বছরের কলেজজীবনে আমি যতটুকু শিখেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি শিখেছি নিজে অন্য বই পড়ে। একটার পর একটা ক্লাসে বসে অধ্যাপকদের বক্তৃতা শোনার কোনও আকর্ষণ ছিল না। তা ছাড়া ভগ্নস্বাস্থ্য বাবার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সাহায্য করা উচিত, এই বোধটাও ততদিনে জেগেছে। কিছু কিছু সহপাঠী চলে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমি শুরু করলাম

চাকরি খুঁজতে।

কিন্তু কোথায় চাকরি? হু হু করে বাড়ছে বেকারের সংখ্যা, সেই সঙ্গে চলেছে বিভিন্ন অফিসে ছাঁটাই। নতুন কোনও পদই তৈরি হয় না। বেকারদের এরকম করুণ অবস্থা নিয়েও নানা রকম রসিকতা চালু হয়েছিল। যেমন, কিছু কিছু বেকার ছেলে বিভিন্ন শ্মশানঘাটে গিয়ে বসে থাকত, কোনও মাঝবয়সি মড়া এলেই তারা শববাহকদের গিয়ে জিজ্ঞেস করত, দাদা, ইনি কোন অফিসে চাকরি করতেন? কী পোস্ট ছিল? তারপরই ছুটে গিয়ে বাড়িতে বসে দরখাস্ত লিখত, স্যার লারনিং ফ্রম দা বার্নিং ঘাট দ্যাট এ পোস্ট ইজ লাইয়িং ভেকান্ট ইন ইয়োর অফিস ......। আর একটি এই রকম, চিড়িয়াখানায় একটি ওরাংওটাং মারা গেছে, বিদেশ থেকে আর একটি আমদানি করতে সময় লাগবে, তাই একটি এম এ পাস ছেলে সেই স্টপ গ্যাপ চাকরি নিয়েছে, মৃত ওরাংওটাং-এর ছাল পরে সেজে থেকে সে লাফালাফি করে দর্শকদের আমোদ দেয়। যত বেশি নাচানাচি করে, তত খুচরো পয়সা পড়ে, সেটা তার উপরি পাওনা। একদিন অত্যুৎসাহে সে তারের জাল ধরে লাফালাফি করতে গিয়ে পড়ে গেল পাশের বাঘের খাঁচায়। বাঘটা গুটিগুটি এগিয়ে আসছে তার দিকে, ভয়ে তো তার প্রাণ উড়ে যাবার উপক্রম। বাঘটি খুব কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, দাদা ভয় পাবেন না, আমিও বাংলার এম এ!

আমি যে কত চাকরির জন্য দরখাস্ত ও ইন্টারভিউ দিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। সবই নিদারুণ প্রহসন। হয়তো দুটি মাত্র পদ আছে, দরখাস্ত পড়েছে দশ-বারো হাজার, তার মধ্যে থেকে বেছে দুশো জনকে ডাকা হয়েছে ইন্টারভিউতে। সেখানে ইন্টারভিউ বোর্ডের চার-পাঁচজন সদস্য সেইসব অসহায় বেকার যুবকদের নিয়ে নিষ্ঠুর ঠাট্টা-তামাসা করতেন। কারণ, তাঁদেরই কারও ভইপো-ভাগ্নের জন্য পদ দুটি তো আগেই ঠিক হয়ে আছে। কত উদ্ভট প্রশ্নই না তাঁরা বানাতেন। একবার রেলের এক কেরানির পদের জন্য লিখিত পরীক্ষায় আমি প্রথম হয়েছিলাম। তাতে কী, ভাইবা অর্থাৎ মৌখিক পরীক্ষায় বাতিল করে দেবার সুযোগ তো রয়েছেই! পাবই ধরে নিয়ে আমি ইন্টারভিউ দিতে গেছি, প্রশ্নগুলির উত্তরও পেরে যাচ্ছি, একজন প্রশ্নকর্তা কিছু জিজ্ঞেস না করে আমার জামার একটা বোতামের দিকে চেয়ে আছেন, সেখান দিয়ে একটা সুতো বেরিয়ে আছে, হঠাৎ এক সময় তিনি ঝুঁকে বোতামটা ধরে জোরে টান দিলেন, বোতামটা খুলে এল। তিনি ভর্ৎসনার সুরে বললেন, এমন আলগা বোতাম রাখতে হয়? নিশ্চয়ই তোমার মনোযোগের অভাব আছে। ব্যস, নাম খারিজ! তারপর থেকে সারাজীবন আমি রেল-কর্মচারী দেখলেই তাঁদের বোতামের দিকে নজর করি। আলগা-বোতাম কিংবা বোতাম-বিহীন জামা পরা রেল-কর্মী মোটেই দুর্লভ নয়। আর এক জায়গায় নানান প্রশ্নের পর একজন বোর্ড সদস্য আমায়িকভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি গল্প-কবিতা পড়ো, একটা কবিতা মুখস্থ বলতে পারো? আমি গড় গড় করে একটা কবিতা মুখস্থ বললাম তো বটেই, তাঁকে কবিতাপ্রেমিক ভেবে জানালাম, আমি নিজেও কবিতা লিখি। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠে তিনি বললেন, কবিতা লেখো? তা হলে তো তুমি একাজ পারবে না। কবিদের দায়িত্বজ্ঞান থাকে না।

তবু আমি স্বপ্ন দেখতাম। একটা ভালো ইন্টারভিউ দেবার পরই আশা করে থাকতাম, একটা লম্বা খাঁকি খামে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসে যাবে। রোজ ডাক বাক্স দেখি, সে চিঠি আসে না। কিন্তু কল্পনার খেলা চলতেই থাকে। রেলের কেরানির ইন্টারভিউয়ের পর আমি কল্পনায় নিজেকে বলতাম মনিহারি ঘাট কিংবা রাজা-ভাত-খাওয়া'র মতন ছোট্ট কোনও স্টেশনে, দেখতে পেতাম দূরের পাহাড়। ফরেস্ট রেঞ্জারের পদের ইন্টারভিউ দিয়েই আমি মনে মনে ঘুরে বেড়াতাম কোনও গহন অরণ্যে, পায়ে গামবুট, কাঁধে রাইফেল। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষা দিয়ে হয়ে যেতাম রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের নায়ক।

সিগনেট প্রেস ও হরবোলার সংসর্গে আমাদের ক্রিয়াকর্মের খবর মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত। আমাদের আত্মীয়স্বজনদের কেউ কেউ বলতেন, তুই অত সব বড় বড় লোকদের

চিনিস, দিলীপ গুপ্ত কত বড় কোম্পানির ম্যানেজার, নিজেদের পাবলিকেশন, ওঁদের কাছে চাকরির জন্য বলতে পারিস না? দিলীপ গুপ্ত ইচ্ছে করলেই.... আজকাল তো চেনাশুনো বা ধরাধরি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না! আমি মনে মনে নিজের কাছে কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ডি কে বা অন্যদের কাছে কক্ষনও কিছু চাইব না। ডি কে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করতেন না, আমিও নিজের দৈন্যদশার কথা ঘুণাক্ষরেও জানাইনি। চরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও কি নরেন দত্ত কালী ঠাকুরের কাছে গিয়ে চাকরি কিংবা চাল-ডালের সমস্যা ঘোচাবার জন্য কিছু চেয়েছিলেন? ডি.কে-র অধীনে চাকরি নিলে কি আমি তাঁর সঙ্গে নিয়মিত সাহিত্য-শিল্প আলোচনায় কিংবা রঙ্গ-রসিকতায় সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারতাম? পেটের খিদের চেয়েও আমার ওইদিককার খিদেটা বেশি ছিল।

চব্বিশ

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার আগে শুধু কবিতা সমন্বিত আর কোনও পত্রিকা বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে কি না ঠিক জানি না, দুটি-একটি প্রকাশিত হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ইতিহাসে স্থান রাখতে পারেনি। 'কবিতা' পত্রিকা সগৌরবে চলেছে পঁচিশ বছর, তারপরেও অন্যদের সম্পাদনায় অনিয়মিতভাবে কিছুদিন। সারা পৃথিবীতেই শুধু কবিতার পত্রিকা অতি দুর্লভ, বুদ্ধদেবের 'কবিতা' পত্রিকা ইংরিজি পোয়েট্রি ম্যাগাজিনের সঙ্গে তুলনীয়। 'কবিতা'র দৃষ্টান্তে বাংলায় বেশ কয়েকটি এরকম পত্রিকা বেরোতে শুরু করে, কিছু কিছু স্বল্পজীবী, কিন্তু বহুবছর ধরে চলেছে প্রধানত 'শতভিষা' এবং 'কৃত্তিবাস', পরবর্তীকালে 'কবিপত্র' ; 'একক' নামে একটি পত্রিকা বয়েসের হিসেবে অন্য সব কটিকে ছাড়িয়ে গেলেও আধুনিক বাংলা কবিতায় সে পত্রিকাটি বিশেষ কোনও ভূমিকা নিতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

কৃত্তিবাস পত্রিকার সুনামের চেয়ে দুর্নামই ছিল বেশি, আমরা সেটাই খুব উপভোগ করতাম। আমাদের ঝোঁক ছিল ভাঙচুর করার দিকে, প্রথা ভাঙা, ছন্দ ভাঙা, নৈতিকতা ভাঙা, মূল্যবোধ ভাঙা। শব্দ নির্বাচনে বেপরোয়া। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, ওগুলো সব চেঁচামেচির কবিতা, অশ্লীল, রক্তমাংসের বাড়াবাড়ি, সূক্ষ্ম রস নেই, বিশুদ্ধ কবিতা নয়, এবং মূল কবির দলটি উচ্ছৃঙ্খল, অসামাজিক। এসব নিন্দে গায়ে মাখতাম না, কারণ সত্যি তো আমরা সে রকম, 'বিশুদ্ধ কবিতা' শুনলেই আমাদের হাসি পেত। না, আমরা নিরামিষ শব্দের ভক্ত ছিলাম না।

আমরা কোনও ইস্তাহার ছাপিয়ে নতুন কাব্য আন্দোলন শুরু করিনি, একটি পত্রিকায় অনেকেই লেখে, যেমন শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কিংবা আলোক সরকার প্রমুখ বহু বছর ধরে কৃত্তিবাসে নিয়মিত লিখছেন, কিন্তু তাঁদের শব্দ ব্যবহার উচ্চকিত কিংবা জীবনযাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল এরকম কোনওক্রমেই বলা যাবে না, বিশেষত শঙ্খ ঘোষ অপ্রত্যক্ষভাবে কৃত্তিবাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন এমনও দাবি করা যেতে পারে। তবু একটা পত্রিকাকে ঘিরে আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যাদের কবিতার আঙ্গিক পরস্পরের থেকে একেবারেই আলাদা, তবু কোথাও যেন মানসিকতার একটা মিল থেকে যায়, জীবনযাপন আহার-বিহারও চলতে থাকে একসঙ্গে। যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও তারাপদ রায়ের কবিতার অবস্থান যেন সম্পূর্ণ দুই বিপরীত মেরুতে, তবু কৃত্তিবাসের সূত্রে দু'জনের গভীর সখ্য গড়ে ওঠে।

সেই সময়ে কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে ছিল অল্পবয়সি কবি, লেখক, শিল্পী, গায়ক, সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টান্তে নতুন চলচ্চিত্র-পরিচালক হবার স্বপ্ন-দেখা তরুণদেরই আধিপত্য। কফি

হাউস কালচার নামে একটা ব্যাপার ছিল, পরবর্তীকালে যা অনেকটাই বদলে যায় শুনেছি। এসপ্লানেডের কাছে সেন্ট্রাল এভিনিউ কফি হাউসেও একটা আড্ডা ছিল, প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের, সেখানে কমলকুমার মজুমদার, সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, বিনয় ঘোষ প্রমুখ যেতেন। তৃতীয় সংখ্যার পর কৃত্তিবাসের দফতর আমার বাড়ির ঠিকানায় হলেও অধিকাংশ কাজকর্ম চলে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে, এক একটা পত্রিকার এক একটা টেবিল, কবি ও গল্প লেখকদের টেবিলও আলাদা। সমবয়সি গল্প-লেখকদের সঙ্গে তখনও আমাদের বিশেষ সংস্রব নেই, যদিও আমি নিজে টুকটাক শখের গল্প লিখি। শুনেছিলাম আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায় ছোট গল্প ছাপা হলে পনেরো টাকা পাওয়া যায়, বেকার অবস্থায় শুধু টিউশানির টাকায় চলে না, কৃত্তিবাসের জন্যও খরচ আছে, তাই উপার্জন বাড়াবার জন্য আমি পরীক্ষামূলকভাবে একটি ছোট গল্প ডাকযোগে পাঠিয়ে ছিলাম রবিবাসরীয় বিভাগে। ছাপা হয়ে গেল। তারপর থেকে মাঝে-মাঝেই পাঠাই, একটাও ফেরত আসেনি, বরং মানি অর্ডার আসে। টাকা রোজগারের আর একটা নিশ্চিত উপায় ছিল, আনন্দমেলার পৃষ্ঠায় ছোট পদ্য বা ছড়া ছাপা হলেই পাঁচ টাকা। সেগুলি মনোনীত হবার একটি রহস্যও এক বন্ধু শিখিয়ে দিয়েছিল, এমনি যে-কোনও বিষয়ে ছড়া পাঠালে দেরি হতে পারে, কিন্তু কোনও মহাপুরুষের জন্মদিন উপলক্ষে ছড়া-কবিতা লিখে পাঠালে নির্দিষ্ট দিনটিতে ছাপা হবেই। আমি বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রামকৃষ্ণ প্রমুখের জন্ম-তারিখ একটা খাতায় লিখে রেখে, দিন দশেক আগে একটি করে স্তুতিমূলক কবিতা লিখে পাঠাতাম, কোনও কোনও মাসে দুটোও প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের দেশে তো মহাপুরুষের অভাব নেই।

যাই হোক, রবিবাসরীয়তে আমার নিয়মিত গল্প ছাপা হলেও আমি গল্প-লেখক হিসেবে কল্কে পাইনি, বরং আমাদের দলের শংকর চট্টোপাধ্যায় গল্প এবং কবিতা দুটোই লেখে। স্বাস্থ্যবান, ফর্সা, সুপুরুষ শংকর নিমেষের মধ্যে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিতে পারে। এমন দরাজ গলায় হাসতে ও নিঃস্বার্থভাবে অন্যের প্রশংসা করতে আমি আর কারওকে দেখিনি। শংকর আমাদের টেবিলে কিছুক্ষণ বসে, আবার গল্প লেখকদের টেবিলে উঠে যায়। তার গল্প লেখক বন্ধুরা তাকে ঠাট্টা করে বলে, দু' নৌকোয় পা দিয়ে আর কতদিন চলবি রে, শংকর! কবিতা-টবিতা ছাড়! তবু শংকর নিয়মিত যোগ দিত আমাদের টেবিলে, পরবর্তীকালে তাদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ির বৈঠকখানার আড্ডায় সে কবি ও গল্পকারদের মিলিয়ে ছিল, কয়েকজন শিল্পীও যোগ দিত সেখানে। সম্ভবত শংকরের সূত্র ধরেই সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আমাদের দলে যোগ দেয়। এক লাইনও কবিতা লেখে না সন্দীপন, কিন্তু কবিতার প্রতিই তার চুম্বুক টান, এক একটি শব্দের রহস্য নিয়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে যেতে পারে। বাকবৈদগ্ধে সন্দীপনের তুলনা নেই। জীবনানন্দের অনেক কবিতা তার মুখস্থ। কিছুদিন পর সে আর গল্প লেখকদের কাছে যায়ই না, আমাদের সঙ্গেই সর্বক্ষণ তার ওঠা-বসা। এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বছরের পর বছর সন্দীপন কৃত্তিবাসে এক লাইনও লেখেনি, তবু সে কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান হিসেবে পরিচিত হয়েছিল। অন্য কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত তার গল্প পাঠ করে আমরাও বিমোহিত যাকে বলে, প্রথম থেকেই তার গদ্য ভাষা নিজস্ব ও নতুন। পরের দিকে সন্দীপন কৃত্তিবাসের অনেক ভার নেয়।

আমাদের পাশের টেবিলে প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকটি ছাত্র নিয়মিত বসে, তারা কে কী লেখে জানি না। তাদের মধ্যে একজনের মুখে দাড়ি-গোঁফ, মাথায় পাতলা চুল, সে সর্বক্ষণ বিড়ি খায়। বিড়ি বিষয়ে একটি তত্ত্বও সে শোনাত, বিড়ি হচ্ছে অভিমানী প্রেমিকার মতন, তাকে ঘন ঘন চুম্বন দিতে হয়, চুমু দিতে দেরি হলেই সে মুখ কালো করে ফেলে...ইত্যাদি। ক্রমশ জানা গেল, এই দাড়িওয়ালা ছেলেটি স্ফুলিংগ সমাদ্দার ছদ্মনামে ছোটখাটো গদ্য লেখে, ওর আসল নাম শক্তি চট্টোপাধ্যায়। 'কুয়োতলা' নামে শক্তি একটি ছোট উপন্যাসও লিখেছিল, তার ভাষা

ব্যবহার তুলনাহীন। টেবিল বদল করতে শক্তির বেশি দিন লাগেনি। শক্তি অল্প বয়সে কিছু হাত মক্সো করা কবিতা লিখেছিল, ছাপাও হয়েছিল, সেগুলি অকিঞ্চিৎকর। পরে কবিতা ছেড়ে সে গদ্যই লিখত শুধু। প্রথম দিকে সে গদ্য-লেখক হিসেবেই পরিচিত ছিল, কৃত্তিবাসের দলে যোগ দিয়ে তার কবিতা লেখার জোয়ার আসে। কৃত্তিবাসে তার প্রথম কবিতা 'সুবর্ণরেখার জন্ম' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল। শক্তি বাগবাজারে আমার প্রায় প্রতিবেশী, অচিরকালের মধ্যেই আমরা প্রতিদিনই দুপুর থেকে মধ্য রাত্রি একসঙ্গে কাটাতে শুরু করি।

শক্তি ও সন্দীপনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর আমার প্রায়ই মনে হত, আমার চেয়ে ওদের দু'জনেরই জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বেশি। যদিও ওদের তুলনায় আমাকে পরিশ্রম করতে হয় অনেক বেশি, ওরা বাড়ি থেকে হাত-খরচ পায়, আমাকে দু'বেলা টিউশানি করে খেটে খেতে হয়, পূর্ব বাংলার গ্রাম, নদী ও মাইল মাইল পাটখেত দেখার অভিজ্ঞতা ওদের নেই, দীপকের সঙ্গে আমি ভারতের নানা প্রান্তে যেমন ঘোরাঘুরি করেছি, যেমন ঝুঁকিবহুল দিন কাটিয়েছি, তেমনভাবে ওরা বিশেষ কোথাও যায়নি, তবু যেন জীবন সম্পর্কে ওদের কিছু কিছু স্পষ্ট ধারণা আছে, যা আমার নেই। অনেক ব্যাপারে আমি ওদের তুলনায় অনভিজ্ঞ। খানিকটা সরলও হয়তো। ওরা স্কুল বয়স থেকেই বিড়ি-সিগারেট খায়, আমি খানিকটা দ্বিধার সঙ্গে সদ্য দু'-একটা টানতে শুরু করেছি। বিশেষত মেয়েদের সম্পর্কে ওদের মন্তব্য শুনে আমি রীতিমতো হীনম্মন্যতায় ভুগতাম, ওরা শরীরটরির সম্পর্কে অনেক কিছুই যেন জেনে গেছে, ওসব যেন জলভাত, আর আমি তখন পর্যন্ত মাটির প্রতিমা ছাড়া কোনও নারীর বুকও স্পর্শ করিনি, আমার গোপন প্রেমিকার শুধু হাত ধরে থাকি, দু'-একবার ঝটিতি চুম্বন করেছি মাত্র, তাতেই হৃৎকম্প হয়েছে। শুধু ওরা দুজন নয়, অন্য কোনও কোনও বন্ধুর কথা শুনে মনে হত, বিছানা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না হলে জীবনকে চেনাই যায় না, তা হলে আমি তো নিতান্ত শিশু। সাহিত্য সম্পর্কেও ওরা স্পষ্ট মতামত দেয়, অনেক লেখাই পছন্দ করে না, উড়িয়ে দেয়, অথচ আমার অনেক লেখাই ভালো লাগে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালো লাগে বলে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর যতনবিবি সিরিজের গল্পগুলি কেন নস্যাত করে দিতে হবে, কিংবা জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে মুগ্ধতা থাকলে কেন যে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা পড়বই না, তা আমি বুঝতে পারি না। ফ্রান্‌ৎস কাফকাকে ভালোবাসলে কেন বাদ দিতে হবে শেখব কে?

বেশ কয়েক বছর আমি বোধহয় এই বন্ধুমণ্ডলীর নেতা গোছের ছিলাম। অবোধ নেতা! কৃত্তিবাসের সম্পাদক হিসেবেও ছিলাম বেশ কড়া, যে যা লেখা দিয়েছে তাই-ই ছাপিনি। অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুরও কোনও কোনও লেখা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছি, আর একটা দাও। লেখা ছাড়াও, অন্যান্য সময়ের দৌরাত্ম্যে, কখনও খুব বাড়াবাড়ি হলে আমি সন্দীপন ও শক্তিকে প্রচণ্ড ধমকেছি, শক্তিকে তো বেশ কয়েকবার চড়চাপড় মেরেও ধাতস্থ করতে হয়েছে, শক্তি একমাত্র আমাকেই কিছুটা ভয় পেত। বন্ধুদের কাছে আমি ব্যক্তিত্ব ফলাবার চেষ্টা করলেও ভেতরে ভেতরে [illegible] আমি ওদের চেয়েও অনেক দুর্বল তা হয়তো ওরা কখনও টেরও পায়নি।

সন্ধেবেলা বৃন্দাবন পাল লেনের বাড়ির বাইরের ঘরে বসে আড্ডা ও পত্রিকার প্রুফ দেখাটেখা চলছে, রাস্তার দিকে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল এক যুবক, পুরোদস্তুর সুট-টাই পরা অফিসার-সুলভ চেহারা, তিনি জানালেন যে কৃত্তিবাস পত্রিকার ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এসেছেন, একটি কবিতা জমা দিতে চান। কবিতার তলায় নাম লেখা, নমিতা মুখোপাধ্যায়। এ নাম আমাদের অপরিচিত নয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়, কবিদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা গুনতে এক আঙুলও লাগে না, সুতরাং সকলেরই নাম মনে থাকে। (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বলতেন, বাঙালি কবিদের সংখ্যা কত? সতেরো শো একষট্টি, এই মুহূর্তে আর একজনের জন্ম হল, সংখ্যাটা লিখুন, লিখুন, এখন কিন্তু সতেরো শো তেষট্টি হয়ে গেছে!) তখন বড় বড় পত্রিকাগুলির শারদীয় সংখ্যায় সুযোগ পাওয়া সার্থকতার চরম বলে গণ্য হত, নমিতা

মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সম্ভবত 'যুগান্তর' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাতেও ছাপা হয়।

হাত বাড়িয়ে কবিতা নিতে গেছি, কিন্তু যুবকটি বললেন, তিনি কবিতাটির বাহক মাত্র নন, তিনিই ওই ছদ্মনামে লেখেন, তাঁর নিজের নাম শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, আমরা অট্টহাস্য করে উঠলাম। প্রায় আক্ষরিকভাবেই, যেমন শরৎকুমারকে ঘরের মধ্যে এনে গলার টাই খুলে ফেলানো হল, তেমনই ছাড়িয়ে নেওয়া হল ছদ্মনাম। এ ব্যাপারে শক্তিরই উৎসাহ ও উদ্যোগ সবচেয়ে বেশি। মেয়েরা কবিতা লিখতে পারে, এটাই মনে মনে বিশ্বাস করে না শক্তি, একবার লিখেও ফেলেছিল সে কথা, মেয়েদের ছদ্মনামে কেউ লিখবে এটা তার কাছে অসহ্য। শরৎকুমার আমাদের চেয়ে দু'-তিন বছরের বড়, চ্যার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, বিদেশি কোম্পানিতে উঁচু চাকরি করেন। আমরা সবাই তখন দলকে দল বেকার, শুধু সন্দীপন এম এ পাঠ সম্পূর্ণ না করেই চাকরি পেয়ে গেছে করপোরেশনে কোনও এক সূত্রে। আমাদের তুলনায় শরৎকুমার জীবনে প্রতিষ্ঠিত যাকে বলে।

কথায় কথায় জানা গেল, শরৎকুমার থাকে দেশবন্ধু পার্কের পাশে, অর্থাৎ আমাদের কাছাকাছি, এরপর থেকে তার সঙ্গে প্রায় প্রতি সন্ধেতেই দেখা হয়। দিনেরবেলা সে গম্ভীর, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অফিসার, হাতে গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ, সন্ধেবেলায় অফিস থেকে বেরিয়েই সে গলার টাই খুলে ফেলে অন্য মানুষ। আমি তখন পর্যন্ত সুট তো দূরের কথা কোটই গায়ে দিইনি, শীতকালে সোয়েটার বা আলোয়ান জড়িয়ে চালিয়ে দিই, টাই পরার প্রশ্নই ওঠে না, অন্যদেরও বেশবাস একই রকম। সুতরাং টাই পরা বন্ধু একেবারেই বেমানান। বুড়ো যখন সিগনেটের দোকান ছেড়ে এয়ার ফ্রান্সে বড় চাকরি নেয়, তখনও সে একদিনও টাই পরে আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে আসেনি। টাই খুলে ফেললেই শরতের যেন সম্পূর্ণ রূপান্তর হয়ে যেত, রবীন্দ্রলাল রায়ের গল্প আছে, 'দিনের খোকা রাতে', অনেকটা সেইরকম। শরতের মতন এমন বন্ধুবৎসল ও সুরসিক মানুষ অতি দুর্লভ। তার সমস্ত রঙ্গরসই স্বতঃস্ফূর্ত ও তাৎক্ষণিক। কারও কারও রসিকতায় শ্লেষ থাকে, অন্যদের প্রতি খোঁচা থাকে, কিন্তু শরতের হাস্য-পরিহাস একেবারে নিষ্কলুষ, যেন সে নিজের আনন্দেই মজে আছে। স্বনামে লিখতে শুরু করে তার যেন জন্মান্তর ঘটে, কবিতায় নিজস্ব আভা আসে, তার 'খুকি-সিরিজ'-এর কবিতাগুলি আজও সমানভাবে স্মরণীয়। সে র‍্যাঁবো ও ভের্লেনের কিছু কবিতার অনুবাদ করেছিল, সেগুলির সঙ্গে নিজের কবিতা মিলিয়ে বেরোয় তার বই, 'র‍্যাঁবো, ভের্লেন ও নিজস্ব', আমিই সেটির প্রকাশক। ততদিনে কৃত্তিবাস প্রকাশনী চালু হয়ে গেছে, কবিরা নিজেরাই খরচ দেয়, আমরা কয়েকজন প্রেসে যাওয়া-আসা, প্রুফ দেখা ইত্যাদি কাজ করে দিই। আনন্দ বাগচীর 'স্বগত সন্ধ্যা'-ই সম্ভবত এখানকার প্রথম বই। ফণিভূষণ আচার্যের 'ধূলি মুঠি সোনা'-ও কৃত্তিবাস থেকে বেরিয়ে বহু কাব্য-প্রেমিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত গ্রন্থ সংখ্যা কম হয়নি। পয়সার অভাবে আমার নিজের কোনও কাব্যগ্রন্থ তখন কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকে বেরোয়নি, শক্তিরও না।

প্রণব মুখোপাধ্যায় একেবারে প্রথম দিক থেকেই কৃত্তিবাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল, তখন সে প্রচুর কবিতা লেখে, তার স্বভাবে এমনই স্নিগ্ধতা ও আন্তরিকতা আছে যে খুব সহজেই তার সঙ্গে সকলের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এমনকী সন্দীপনকে তখন খানিকটা উন্নাসিক মনে করা হত, অনেককেই সে মেশার যোগ্য বলে গণ্য করত না, সেই সন্দীপনের সঙ্গেও প্রণবের সুসম্পর্ক হয়ে যায়, শরতের সঙ্গেও তার গভীর বন্ধুত্ব খুব স্বাভাবিক ছিল। প্রণব নিজে তো চমৎকার লিরিকধর্মী কবিতা লিখতই, কবিতার প্রতিই তার এত ভালোবাসা ছিল যে সকলেরই কবিতা পড়ে মুখস্থ করে ফেলত। আমাদের কারও কবিতা হারিয়ে গেলে প্রণবের শরণাপন্ন হতাম, প্রণব সে কবিতা কবে, কোন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে এবং অনেকগুলো পঙ্‌ক্তি বলে দিত ঝরঝর করে। অসাধারণ তার স্মৃতিশক্তি। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সে পিসতুতো ভাই, নীরেনদারও স্মৃতিশক্তি কত ভালো সবাই জানে, কিন্তু প্রণবের স্মৃতিশক্তি বোধহয় তার দাদার চেয়েও বেশি।

বাংলা ব্যাকরণ ও বানান জ্ঞানও তার গভীর, কখনও কখনও সে আমার তো বটেই, এমনকী শক্তিরও, যার ব্যাকরণ জ্ঞান নিয়ে গর্ব ছিল, ভুল সংশোধন করে দিত। একবার 'মীনাক্ষী' শব্দটি নিয়ে শক্তি ও আমি দু'জনেই সংশয়ে পড়েছিলাম। মৎস্য আকারের চক্ষু, মীন+অক্ষি, সাধারণ নিয়মে মীনাক্ষি হওয়া উচিত, দীর্ঘ ঈ কার কেন হবে? প্রণব বুঝিয়ে দিল যে ব্যাকরণের সব উদাহরণই পুরুষ-প্রধান, মূল কথাটা মীনাক্ষ, তার স্ত্রী লিঙ্গে মীনাক্ষী। এই মীনাক্ষী নাম্নী এক তরুণী যে পরে শক্তির স্ত্রী হবে, তা কিন্তু তখনও ঠিক ছিল না। বুদ্ধদেব বসুর কন্যা মীনাক্ষীর কথাই আমাদের বেশি মনে পড়ত। আমরা কেউ তার কাছাকাছি যাবার আগেই জ্যোতির্ময় দত্ত তাকে হরণ করে নিয়ে যায়।

সম্ভবত প্রণবের বন্ধু হিসেবেই উৎপলকুমার বসু কৃত্তিবাসের দলে যোগ দেয়। সে প্রণবেরই সমবয়সি, আমাদের চেয়ে কিছু ছোট। উৎপল খুবই সুদর্শন এবং বেশ লাজুক ও মৃদুভাষী। আড্ডার সময় সে বেশি কথা বলে না, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন এক-আধটা মন্তব্য করে যে তাতেই ফুটে ওঠে তার রসবোধ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। উৎপল বিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু বিদেশি সাহিত্য পড়েছে প্রচুর, প্রথম থেকেই তার কবিতায় ফুটে ওঠে পরাবাস্তবতা। প্রথম থেকেই সে অনন্য। উৎপলের মা ও বাবা দু'জনেই চলে যান অকালে, আমাদের সঙ্গে পরিচয়ের কিছুদিন পরেই জানা গেল, উৎপল পৈতৃক বাড়িতে সম্পূর্ণ একা থাকে। আমাদের আড্ডাস্থলের খুব অভাব, মাঝে মাঝেই দল বেঁধে গেছি ওর বাড়িতে, বহু উপদ্রব করেছি, উৎপলও আড্ডার নেশায় এমনই মেতে যায় যে লাজুকতা খসিয়ে সে নিজেই অন্যদের ডাকাডাকি করে ও যথেচ্ছাচারে মেতে ওঠে। তারপর সেই বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল, উৎপল ফ্ল্যাট ভাড়া নিল রয়েড স্ট্রিটে, প্রায় সাহেব পাড়ায়, বাবুর্চি তার রান্না করে দেয়, এও যেন সাহেবি ধরন-ধারণ, আমাদের কাছে ঈর্ষণীয়। এক সময় সত্যিকারের এক ইংরেজ সাহেব উৎপলের ওই ফ্ল্যাটে আশ্রয় নিয়েছিল, ঘর-মোছা, বাসন মাজার মতন কাজ করতেও তার দ্বিধা ছিল না। কয়েক বছর বাদে, ভাস্কর দত্তের প্ররোচনায় উৎপল নিজেই চলে গেল সত্যিকারের সাহেবদের দেশে। ভাস্কর প্ররোচনা দিয়েছিল, না উৎপলই ভাস্করকে লন্ডনে পাড়ি.দেবার জন্য ভজিয়েছিল, তা ঠিক মনে নেই। অবশ্য, ওদের আগেই যে আমি বিদেশে যাব, তা তখন আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল!

সম্ভবত অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তই পরচিয় করিয়ে দেন প্রাণবেন্দু দাশগুপ্তর সঙ্গে। পদবীর মিল থাকলেও ওদের মধ্যে আত্মীয়তা নেই, তবে প্রতিবেশী এবং গুরু-শিষ্যের মতন সম্পর্ক। অচিরকালের মধ্যেই প্রণবেন্দুর কবিতায় নিজস্বতার আভা দেখা দেয়। মানুষটিও মৃতুভাষী কিন্তু আড্ডাপ্রিয়। পরবর্তীকালে প্রণবেন্দুর যখন আমেরিকান স্ত্রী হয়, বাড়িতে খেতে হত সুপ ও স্যান্ডুইচ, তখন মাঝে মাঝেই বাংলা ভাত-ডাল-চচ্চড়ি খাবার টানে সে সুদূর যাদবপুর থেকে প্রায়ই নাগেরবাজারে আমাদের বাড়িতে আসত দুপুরের দিকে। মেম-বউয়ের আপত্তিতে তাকে নস্যি নেওয়া ও পান খাওয়া ছাড়তে হয়েছিল, তবু ভীতু ভীতু সেজে সে বাড়ির বাইরে এক সঙ্গে দুটি পান খেয়ে মুখ ধুয়ে ফেলত, গোপনে নস্যিও চালু রেখেছিল অনেক দিন।

একটা সময়ে কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিল তন্ময় দত্ত। আমাদের চেয়ে চার-পাঁচ বছরের ছোট, প্রেসিডেন্সি কলেজের নাম করা ছাত্র, কিন্তু এক কবিতার জন্য এমনই একটা ঘোরের মধ্যে পড়েছিল যে প্রায় ছাড়তে বসেছিল পড়াশুনো, কলেজে যাওয়া বন্ধ করে মেতে ওঠে বোহেমিয়ান জীবনযাত্রায়। শক্তির সঙ্গেই তার সখ্য হয়েছিল বেশি এবং শক্তির চেয়েও তার এক একটি কবিতা বেশি মুগ্ধ করে দিত সবাইকে। তন্ময়ের কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপিও তৈরি হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাপা হল না। কোনও এক কারণে প্রবল অভিমান নিয়ে সে হঠাৎ কবিতার জগৎ ছেড়ে চলে যায়। পরে সে বড় বড় কম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়ে দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে, সাহিত্য গোষ্ঠীর সঙ্গে কোনও সংস্পর্শ রাখেনি।

কবিদের মধ্যে রমণীদের সংখ্যা তখন ছিল ভয়াবহ রকমের কম। প্রথম দিকে শুধু কবিতা

সিংহ, বেশ কিছু পরে, দেবারতি মিত্র, বিজয়া মুখোপাধ্যায় ও নবনীতা দেবসেনকে পাওয়া যায়। বিজয়ার সঙ্গে শরৎকুমারের পরিচয়ের পর সে আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে যায়, আর নবনীতা বেশ কিছু বছরের জন্য বিদেশে অদৃশ্য হয়ে গেলেও কবিতাকে ভোলেনি, পারিবারিক ট্র্যাজেডি সঙ্গেও গদ্য ও কবিতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে প্রবল ভাবে।

কৃত্তিবাস পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তরুণ কবি ও লেখকদের সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব জমে ওঠে, তখন আস্তে আস্তে অন্যান্য বাল্যবন্ধু, স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে একটু একটু দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়, আর নিয়মিত দেখা কম হয়। কিন্তু একমাত্র ভাস্কর, জীবনে এক লাইনও কবিতা না লিখে চলে এল এই দিকে, সারা জীবনের মতন কৃত্তিবাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়ে গেল। লেখক বন্ধুদের সকলেরই খুব আপন মানুষ ভাস্কর, ভাস্কর না থাকলে কোনও আড্ডা বা দৌরাত্ম্যপনাই জমে না। ভাস্কর বহু বছর বিলেতে গিয়ে রইল, কিন্তু এদিককার প্রতি তার টান একটুও কমেনি। দশ বছর পরেও শক্তি বা সন্দীপনের সঙ্গে দেখা হলে এমনভাবে কথা বলেছে, যেন গতকালই উঠে গেছে আড্ডা ছেড়ে।

আমরা অনেকেই তখন উত্তর কলকাতায় থাকি, শুধু সন্দীপন হাওড়ায়, কয়েকজন মধ্য কলকাতায়, দক্ষিণ কলকাতার সঙ্গে যোগসূত্র ছিল শংকর চট্টোপাধ্যায়। দেশপ্রিয় পার্কের এক কোণে, সুতৃপ্তি নামে চায়ের দোকানে রবিবার সকালের আড্ডায় মাঝে মাঝে যোগ দিয়ে আলাপ হয় অরবিন্দ গুহ, আলোক সরকার, দীপংকর দাশগুপ্ত প্রমুখের সঙ্গে। শংকরের দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিমল রায়চৌধুরী ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, এরা এক লাইনও কবিতা লেখে না, কিন্তু এদের ব্যক্তিত্ব যে-কোনও মানুষকে এক ঘণ্টার মধ্যে কাবু করে ফেলতে পারে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তখনই ছোট গল্পকার হিসেবে বিখ্যাত, বিমল রায়চৌধুরীও কবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে কয়েকটি অসাধারণ গল্প লিখেছিল। বন্ধুদের মধ্যে সকলের চেয়ে কম বয়সে বিমল বিয়ে করে কবিতা সিংহকে। স্ত্রীর নাম ও বন্ধুর নাম মিলিয়ে তার ছদ্মনাম কবিশঙ্কর। দুঃখের বিষয় হঠাৎ সে গল্প লেখা ছেড়ে দেয়, তাতে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতিই হয়েছে। পরবর্তীকালে তার পরিচয় ছিল কবিতা সিংহের স্বামী, তাতে তার আপত্তিও ছিল না। ক্ষুরধার বুদ্ধি ছিল বিমলের, দারুণ বাকচাতুর্য, কথায় কথায় রসিকতা। তবে তার রসিকতা শরৎকুমারের বিপরীত, তাতে কারও না কারও প্রতি দংশন থাকত, আবার উপভোগ্যও হত বটে। তবে অরবিন্দ গুহ উপস্থিত থাকলে আর কেউ পাত্তাই পেত না। আমার চেনা সব মানুষদের মধ্যে রসিকতার সম্রাট হলেন অরবিন্দ গুহ। বিরল কেশ, ছোটখাটো মানুষটি, বাক্য যেমন তেজী, ভেতরটা তেমনই রসে টইটম্বুর। অরবিন্দ যেমন তৎক্ষণাৎ কথার পিঠে কথার খেলা বানাতে জানে, তেমনই তার দেশ-বিদেশের রসিকতার সংগ্রহও প্রচুর। নাঃ, তারাপদ রায়ও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কখনও পারেনি। অরবিন্দ ইন্দ্রমিত্র ছদ্মনামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অসাধারণ ও জনপ্রিয় জীবনী লিখেছে, সেই বিদ্যাসাগর নিয়েই তার একটি রসিকতা আমার আজও মনে আসে। ... স্বর্গে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কোলে বসে আছে মেরিলিন মনরো, দু'জনে গলা জড়াজড়ি। পাশ দিয়ে যেতে যেতে তা দেখে লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বিদ্যাসাগর তাঁকে ডেকে বললেন, এই লজ্জা পাচ্ছিস কেন, এদিকে আয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমতা আমতা করে, বিবসনা মেরিলিন মনরো'র দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, গুরুদেব, আপনি দেশের জন্য কত কী করেছেন, কত কৃচ্ছ্রসাধনা, সেই পুণ্যফলে আপনার এরকম একটি সুন্দরী নারী তো এখানে প্রাপ্য হতেই পারে! বিদ্যাসাগর মশাই দু' আঙুলে হরপ্রসাদের পেটে চিমটি কেটে বললেন, ওরে, তুই আজও মূর্খ রয়ে গেলি? বুঝলি না, এটা কি আমার পুণ্যফল, না এই মেয়েটির পাপের শাস্তি!

অরবিন্দ গুহ তখন কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিলেন এবং লিখতেন খুব রোমান্টিক প্রেমের কবিতা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় রসিকতা জানে না, একটাও অ্যানেকডোট বলতে পারে না, সে নিজেই

জীবন্ত কৌতুক। তখন শ্যামলের কী সুন্দর চেহারা, (এখনও তেমন মলিন হয়নি), ফিনফিনে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি ও ধুতি পরা, মাথার ঈষৎ কোঁকড়া চুল পাট করে আঁচড়ানো, সরল, নিষ্পাপ মুখখানি দেখলে মনে হয় যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, কথা বলে মিষ্টি গলায়, এবং অনর্গল মিথ্যে বলে যায়। যেমন তার পিসতুতো দাদা অমুক ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, মাসতুতো ভাই জওহরলালের প্রাইভেট সেক্রেটারি, জ্যাঠতুতো দিদি কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর স্ত্রী, খুড়তুতো বোন বম্বে ফিল্মের নায়িকা, সেজো পিসেমশাই দুর্গাপুর স্টিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ইত্যাদি। এর সবগুলি মিথ্যে নয়, ওদের পরিবারটি বিশাল, তার মধ্যে কয়েকজন সত্যিই উচ্চ পদে আসীন, কিন্তু শ্যামলের অম্লান বদন দেখে ধরা যেত না, কোনটি সত্যি আর কোনটি মিথ্যে! শ্যামল হঠাৎ আফগানিস্তান বেতারের পুস্তু ভাষায় সংবাদ শোনাতে পারে, উর্দু ভাষায় শোনাতে পারে লখনউ-এর এক বারবনিতার কাহিনী, রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে, হলঘর ভর্তি কেরানিদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একদিন বলেছিল, আমার এখানে স্নেক ড্যান্স দেখাতে ইচ্ছে করছে, নাচব? এবং শ্যামলের পক্ষেই সত্যি নাচ শুরু করা সম্ভব।

আমরা সবাই মিলে প্রায় সর্বক্ষণ এই ধরনের মজা ও হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে জীবনটাকে হালকা করে দেখতে চেয়েছি। চারপাশের পরিবেশ যতই সঙ্কটজনক ও ভয়াবহ হয়ে উঠছে, ততই আমরা অগ্রাহ্য করে চলেছি সেসব। অনেক প্রতিকূল অবস্থাতেও হার স্বীকার করিনি, যোগ দিইনি ইঁদুর দৌড়ে। দাঁতে দাঁত চেপে সাহিত্য করতে চাইনি, তাচ্ছিল্য করেছি অমরত্বের হ্যাংলামিকে।

শ্যামলের সঙ্গে খুব অল্প দিনেই আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায় এবং প্রায় প্রথম দিন থেকেই সে আমাকে তুই সম্বোধন করে। কৃত্তিবাসে শ্যামলের লেখার খুব শখ, অথচ সে কবিতা লেখে না। একবার 'সুন্দর' নামে তার একটি ছোট কাব্যময় রম্যরচনা ছাপা হল। তারপর সে একদিন আমার বাড়িতে এসে পড়ে শোনাল 'বিদ্যুৎচন্দ্র পাল বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য' নামে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক ও স্বাদের একটি গল্প, কবিতা পত্রিকার সমস্ত রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে আমি সেটা ছেপে দিলাম। সে জন্য কৃত্তিবাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আমাকে ভর্ৎসনা করেছিল, কিন্তু গল্পটির তারিফ করেছিল অনেকেই। বহু বছর পর শ্যামল আবার বিভিন্ন ভূমিকায় ফিরে আসে কৃত্তিবাসে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্তও দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা, তবে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল অনেক পরে। দীর্ঘদেহী সমরেন্দ্রকে দেখে মনে হত যেন বয়স্ক বালক, কারণ দায়িত্ববান, বন্ধুবৎসল, সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন হলেও সে তার বিশুদ্ধ সারল্য বজায় রাখতে পেরেছে, যা আমরা অনেকেই ক্রমশ হারিয়েছি। বিশাল তার হৃদয়, নিঃশব্দে কত জনকে যে সে সাহায্য করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। দেশভাগ ও স্বাধীনতার প্রত্যাশা পূরণের ক্ষোভ ফুটে উঠেছে তার কবিতায় এবং রয়েছে বিশ্ব-পরিপ্রেক্ষিত। অবশ্য রসিকতাতেও সমরেন্দ্র অন্যদের চেয়ে কম যায় না, এবং প্রাণ খুলে হাসতে পারে। কৃত্তিবাসে সে দেরি করে যোগ দিলেও এক সময় সে অন্যতম প্রধান হয়ে ওঠে, আমি ছেড়ে দেবার পর কয়েক বছর সমরেন্দ্রই হয়েছে কৃত্তিবাস পত্রিকার সম্পাদক।

তারাপদ রায়েরও বাড়ি দক্ষিণে, কিন্তু তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় আমার সেই বৃন্দাবন পাল লেনের বাড়িতে। এক সকালের আড্ডায় অকস্মাৎ এসে হাজির, ছিপছিপে, অনতিদীর্ঘ শরীর, শরতের মতন এরও পরনে প্যান্ট-কোট, তবে সুট নয়, অনেকটা সার্কাসের পোশাকের মতন, হলুদ রঙের প্যান্ট, সবুজ রঙের কোট, সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার কণ্ঠস্বর, মাইকের চেয়েও জোরালো বলে অনেকে বলত অমায়িক, আমি বলতাম কম্বুকণ্ঠ। তারাপদ তখন হাবড়ায় একটা স্কুলে মাস্টারি করে, সেখানেও তার একটি বাসস্থান আছে, শনি-রবিবার আসে কলকাতায়, সঙ্গে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে। তার আগমনের মিনিট দশেক পরেই মনে হল, এ ছেলেটি এতদিন বাইরে ছিল কেন? কৃত্তিবাসের দলে এর স্থান অবধারিত। যে-কোনও আড্ডায় তারাপদই মধ্যমণি।

নিজের সব কবিতা তার মুখস্থ থাকে, অন্যদেরও কবিতা অনর্গল বলে যেতে পারে। তারাপদকে ভালোবাসে না এমন মানুষ নেই, আবার তার গান শুনে ভয় পায় না, এমন মানুষও কেউ আছে কি না সন্দেহ। কৃত্তিবাসের কোনও এক সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কবিতা ছাপার রেকর্ড তারাপদ রায়ের, একবার তার 'সপ্তদশ অশ্বারোহী ও একটি' নামে আঠেরোটি কবিতা ছাপা হয়েছিল। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন' বেরোয় কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকে।

প্রথম দিন এসেই তারাপদ হাসি-ঠাট্টা-আমোদে জমিয়ে দিয়ে একটু পরে তার গায়ের কোটটি খুলে ফেলল। গরমের জন্য সার্টও। তারপর সে একটা খাটের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি প্যান্টটাও খুলে রাখতে চাই, নইলে ইস্তিরি নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা নির্বাক ও সন্ত্রস্ত, তারাপদ অট্টহাস্য করতে করতে খুলতে লাগল প্যান্টের বোতাম। তখন দেখা গেল, তলায় রয়েছে একটা পুরো পা-জামা। এর পরেও সে জানাল, পা-জামাটাও খুলে রাখতে পারি, কোনও অসুবিধে নেই। এবারে সমবেত না-না শুনে সে লাফিয়ে নেমে পড়ে বলল, দারুণ খিদে পেয়েছে। এ বাড়ির লোকরা বুঝি খুব কৃপণ, খাবারটাবার কিছু দেয় না?

এইভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে কৃত্তিবাসের নিজস্ব পরিবার।

পঁচিশ

আমাদের গ্রামের একটা রাস্তার ধারে ছিল এক বিশাল বনস্পতি, সেটি অশ্বত্থ গাছ, বাল্যস্মৃতিতে মনে হয় যেন অত ডালপালা ছড়ানো বড় গাছ পৃথিবীতে আর নেই। তাতে অনেক রকম পাখির বাসা, মগডালে বসে থাকে শকুন, মাঝে মাঝে পাতার আড়াল থেকে ডেকে ওঠে তক্ষক। মহাভারত পড়ে মনে হত, তক্ষক একটি অতি বিষধর সর্প, তাই ডাক শুনলেই ভয় লাগত, আসলে যে সেটি গিরগিটির মতনই প্রায় নিরীহ প্রাণী, তা জানতে লেগে গিয়েছিল অনেকদিন।

বট কিংবা অশ্বত্থের মতন দুই মহাদ্রুমেরই ফল খুব ছোট ছোট। দুপুর রৌদ্রে এরা অনেকখানি ছায়া দেয়, পথিকেরা সেই ছায়ায় বিশ্রাম করে, ঘুমোয়। তাদের শরীরে যাতে আঘাত না লাগে সেইজন্যই এরা বড় আকারের ফল ফলায় না। এ রকম একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে। যত বড় গাছ, তত বড় ফল হবে, এরকম নিয়ম প্রকৃতিতে নেই। আমাদের দেখা সবচেয়ে বড় ফল কলার কাঁদি ও কাঁঠাল, এ দুটো গাছই আকারে বট-অশ্বত্থের তুলনায় শিশু।

এই অশ্বত্থ গাছটির ছায়ায় কোনও-পথিককে বিশ্রাম নিতে দেখিনি, অশ্বত্থের একটা ডাল হঠাৎ নিচু হয়ে এসে খুব পিটিয়েছিল এক ডাক্তারকে। আমাদের ইস্কুলে যেতে হত অশ্বত্থ গাছটির পাশের রাস্তা দিয়ে, দিন-দুপুরেও একা থাকলে ঢিপ ঢিপ করত বুক, মেঘলা বিকেল কিংবা সন্ধে হলে তো কথাই নেই, চোখ বুজে দৌড় লাগাতাম, আর অনবরত বলতাম, রাম, রাম, রাম, রাম। রাম স্বয়ং ভগবান, তাঁর নাম শুনলেই ভূত-পেত্নীরা ভয়ে কাছে আসে না, এটা বহুদিনের সংস্কার। যদিও সূর্পণখা নামে এক পেত্নী রামকে বিয়ে করতে চেয়ে বেশ কাছে এসেছিল।

ইস্কুল-বয়স ছাড়াবার আগেই আমি জেনে গিয়েছিলাম, রাম পদ্যে লেখা একটি উপন্যাসের চরিত্র, মোটেই ভগবান নয়। রামায়ণের গল্প আগে অন্যদের মুখে শুনেছি, বারাণসীতে কথকরা এই কাহিনীর সঙ্গে নিজস্ব টীকা-টিপ্পনী ও ভক্তিরস জুড়ে দিতেন, নিজে কয়েকবার পাঠ করার পর রামায়ণ অন্যভাবে ভালো লাগে। কিন্তু অবতারতত্ত্ব আমার মনে কখনও দাগ কাটেনি।

স্বর্গের দেব-দেবীদের আমার খুব আকর্ষণীয় সব গল্পের চরিত্র বলেই মনে হয়েছে। ভগবান বা ঈশ্বর নামে এক সর্বশক্তিমান সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কুয়াশা মাখা সংশয় ছিল আরও কিছুদিন, তবে ভূত-প্রেতের ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছিলাম। মৃত্যুর পর মানুষকে পুড়িয়ে ফেললে সব শেষ হয়ে যায়, কঙ্কাল শরীর নিয়ে খটখটিয়ে কারওকে ভয় দেখানো আর তার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়, ওই সব গল্পে বহুদিনের সংস্কারের জন্যই রোমহর্ষণ হয়। মানুষের প্রাণবায়ু বহির্গত হবার পরেও অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব চমৎকার কল্পনা হতে পারে, তবে নিছকই কল্পনা মাত্র।

বসুমতী সংস্করণের সস্তায় খণ্ডে খণ্ডে উপনিষদের অনুবাদ পাওয়া যেত, সেগুলি পড়তে ভালো লেগেছে, কিন্তু তার মধ্যে ঈশ্বরকে পাইনি। রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদে বেদও পড়া হয়ে গেল। তখন ধর্মগ্রন্থগুলির পৃষ্ঠায় ঈশ্বরকে খোঁজার নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল। চৌরঙ্গিতে 'বাইবেল সোসাইটি' নামে একটি বাড়ি আছে। সে বাড়ির ভেতরে কী হয় জানি না, আমি কখনও প্রবেশ করিনি, তবে বাইরের দিকে একটা কাচঘেরা জানলায় খোলা থাকত একটি বাইবেল, প্রতিদিন তার এক পৃষ্ঠা উল্টে যেত, আমি ওদিক দিয়ে যাবার পথে সেই পৃষ্ঠাটি পড়ে নিতাম। বড় বড় হোটেলের প্রত্যেক ঘরে একটি করে বাইবেল রাখা থাকে, কোনও একটি প্রতিষ্ঠান সেগুলি বিনা পয়সায় দেয়। সে বাইবেলের কপি সুটকেসে ভরে নিয়ে এলে তা চুরি করা হয় না। উৎসাহী প্রচারকরা খুশিই হয়। আমি তখনও পর্যন্ত কোনও বড় হোটেলে থাকিনি, কিন্তু আমার এক বন্ধুর দাদা দিল্লির হোটেল থেকে একখানা গিডিয়ন বাইবেল নিয়ে এসেছিলেন ও পড়তে দিয়েছিলেন আমাকে। এর পর একটা দুর্বোধ্য, কষ্টকল্পিত ভাষায় বাংলা বাইবেলও জোগাড় করা গিয়েছিল।

বি এ পরীক্ষা দেবার পর, মাঝখানের সাড়ে তিন মাস বাদ দিয়ে, আমি টানা পাঁচ বছর বেকার ছিলাম। এই পাঁচটা বছর আমার কী যে আনন্দে কেটেছে, তা বোঝানো শক্ত। বলা যেতে পারে, এক হিসেবে এই পাঁচ বছর আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। অর্থাভাব ছিল খুবই। পেটে জ্বলত ধিকিধিকি খিদে, তবু স্বাধীনতা ছিল অগাধ। এখনও আমি বেকারদের ঈর্ষা করি।

বেকাররা দুপুরবেলা বাড়িতে শুয়ে-বসে কাটালে সকলের করুণার পাত্র হয়। চাকুরিজীবীদের মতনই দশটা-সাড়ে দশটায় গরম গরম ডাল-ভাত খেয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি, তারপর সামনে থাকে সুদীর্ঘ দুপুর ও বিকেল, এর মধ্যে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার দুর্লভ সুযোগ ঘটে কোনও কোনওদিন মাত্র এক-আধ ঘণ্টার জন্য। কয়েকজন বন্ধু চাকরি পেয়েছে, তাদের অফিসে দেখা করতে গেলে তারা ডিম সেদ্ধ ও চা খাওয়ায়, কিন্তু কয়েকবার যাওয়ার পরই উপলব্ধি হয় যে ব্যাপারটা হ্যাংলামির পর্যায়ে পড়ে যাচ্ছে। অনেক বন্ধু এম এ পড়ছে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হয়েও মাঝে মাঝে তাদের ক্লাসে যোগ দিয়েছি। কোনও বাধা ছিল না, অধ্যাপকরা আপত্তি করতেন না, তবু অস্বস্তি বোধ করতাম। কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে, তারা আমাকে আড় চোখে দেখে, কথা বলে না। নিজেকে মনে হয় হংসদের মধ্যে বক, কিংবা পাখির খাঁচার পাশে ক্ষুধার্ত বিড়াল!

সবচেয়ে ভালো সময় কাটে কোনও লাইব্রেরিতে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে, যেতে বাস ভাড়া লাগে। কিন্তু কোনওক্রমে পৌঁছতে পারলে বড় পবিত্র আরাম হয়। বাড়িটি ঐতিহাসিক, চারপাশের বড় বড় গাছপালা ও মখমলের মতন সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। চার পয়সার ট্রাম ভাড়া দিয়ে এসপ্লানেড পর্যন্ত এসে, তারপর ময়দানের মধ্যে দিয়ে কোনাকুনি হেঁটে পৌঁছে যেতাম সেখানে। সদস্যপত্র না থাকলেও একটা কিছু পরিচয়পত্র দেখালেই পাওয়া যেত এক দিনের ছাড়পত্র, তারপর ভেতরে ঢুকে অবাধ বিচরণ। অনেক মানুষ বসে আছে। কিন্তু পড়ুয়ারা কেউ কথা বলে না, নিস্তব্ধ হলঘরে শুধু শোনা যায় কাগজের খসখস শব্দ। ইচ্ছে অনুযায়ী যে কোনও বই পড়া যায়, সেখানেই প্রথম এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা স্বচক্ষে দেখি, এবং সেই বিস্ময়কর জগতে প্রবেশ করি।

এ ছাড়া ছিল ইউ এস আই এস এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরি। সেখানে বই নিয়ে পড়তে কিংবা বসে থাকতে পয়সা লাগে না। কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ি থেকে পায়-হাঁটা দূরত্বে একটা খুব নিরিবিলি লাইব্রেরি আমি আবিষ্কার করে ফেললাম। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ওপরে ব্রাহ্মসমাজের মন্দির, তার সঙ্গে যুক্ত একটি গ্রন্থাগার। মাঝে মাঝে চাকরির ইন্টারভিউ দেওয়া ছাড়া অধিকাংশ দুপুরই কাটতে লাগল এখানে। এমন সুন্দর পরিবেশ ও বহু দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংগ্রহ, তবু পাঠকের সংখ্যা খুবই কম, প্রায় দিনই আমি ও গ্রন্থাগারিক ছাড়া আর তৃতীয় কোনও মনুষ্যের মুখ দেখা যেত না। গ্রন্থাগারিক মহাশয়টি কৃশ চেহারার প্রৌঢ়, আমাকে তিনি সস্নেহদৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর কাছে কোনও একটি বইয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রাসঙ্গিক দশখানি বইয়ের কথা জানাতেন সবিস্তারে।

এখানে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনূদিত কোরান গ্রন্থ পড়ার সুযোগ পেলাম। এবং ইসলাম ধর্ম বিষয়ক নানা প্রবন্ধ। ঈশানচন্দ্র ঘোষের জাতক কাহিনী এবং ত্রিপিটকের অংশবিশেষ। গৌতম বুদ্ধের জীবনকথা। আমার আগ্রহ বুঝে গ্রন্থাগারিক মহোদয় সমস্ত ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ জোগান দিয়ে যেতে লাগলেন। আমিও গিলতে লাগলাম ক্ষুধার্তের মতন।

বছর দু'-একের মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম-বিষয়ক গ্রন্থগুলি মোটামুটি পড়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ধর্ম সম্পর্কে আমার পুরোপুরি অবিশ্বাস জন্মে যায়। সবগুলিই সুখপাঠ্য, কবিত্বপূর্ণ, ব্যঞ্জনাময়, কিন্তু কোনও অলৌকিক মুখ-নিসৃত শুধু এটুকু না মানলে, সবই সুললিত উপদেশাত্মক বাণী ও উদাহরণস্বরূপ কাহিনী, সেগুলি আচরণ ও পালন করা ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। যেহেতু আমি জন্মান্তর ও স্বর্গ-নরকের বিশ্বাস আগেই বরখাস্ত করে ফেলেছি, তাই অলৌকিক উচ্চারণও মানতে পারি না।

এইসব পড়তে পড়তে একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেললাম! বড় বড় ধর্মগুলির যাঁরা প্রবক্তা, তাঁরা কেউ লেখা-পড়ার ধার ধারেননি! গৌতমবুদ্ধ কিছু লিখে যাননি, যিশুও না। হজরত মহম্মদও না, এমনকী একালের শ্রীচৈতন্যদেব বা শ্রীরামকৃষ্ণও না। কিছু লেখেননি, পড়াশুনোও কতটা করেছেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না, তবে সূর্য যে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে না এবং নক্ষত্রগুলি চুমকির মতন আকাশের গায়ে সাঁটা নয়, মহাকাশ সম্পর্কে এই প্রাথমিক জ্ঞান যে ওঁদের কারও ছিল না, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এই প্রাথমিক জ্ঞানই কিন্তু মানুষের চিন্তাজগতে বিবর্তন এনে দিয়েছে।

পড়াশুনোর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও ধর্মের প্রবক্তাদের কী বিপুল খ্যাতি! বুদ্ধ-যিশু-মহম্মদের বিশ্বব্যাপী খ্যাতির তুলনায় শেক্সপিয়ার-টলস্টয়-গ্যেটে-রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি প্রায় তুচ্ছই বলা যায়। ওই সব প্রবক্তারা প্রেরিত পুরুষ হোন বা না হোন, অসাধারণ পুরুষ ছিলেন অবশ্যই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বেও জীবনের যে উপলব্ধি, তার অধিকারী ছিলেন এবং পালন করে গেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা।

হিন্দুধর্মের কোনও ঐতিহাসিক প্রবক্তা নেই। শ্রীকৃষ্ণ কিংবা রাম, কারওই অস্তিত্ব ইতিহাস-স্বীকৃত নয়। ত্রিপিটক-কোরান-বাইবেলের মতন হিন্দুধর্মের কোনও সর্বমান্য ধর্মগ্রন্থ নেই। অনেক হিন্দুর মতে অবশ্য বেদই সেই গ্রন্থ। কিন্তু বেদ কী? যেসব হিন্দু বেদকে হিন্দুধর্মের আকরগ্রন্থ বলে মানেন, তাঁদের মতে বেদ অপৌরুষের, অর্থাৎ কোনও মানুষের রচনা নয়, ঈশ্বরের বাণী। আবার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলেছেন, বেদ হচ্ছে বিভিন্ন ঋষির মুখে মুখে রচনা করা কতকগুলি কবিতার সংকলন, পলগ্রেভ সম্পাদিত 'গোল্ডেন ট্রেজারি'র মতন। (এক সময় এই ইংরিজি কবিতা-সংকলনটি এদেশেও কলেজপাঠ্য ছিল।) আমি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতটাই মানি। তা হলে তো দেখা যাচ্ছে, হিন্দুধর্ম সৃষ্টি করেছেন কবিরা, বেদ-উপনিষদ-মহাভারত-রামায়ণ-গীতা-পুরাণ সমূহ সব তো কবিদেরই রচনা, এগুলি থেকে যে জীবনযাপনের সূত্র ফুটে ওঠে তাই-ই তো হিন্দু ধর্ম,ধর্মের বদলে জীবনদর্শনও বলা যায়।

কবিদের সৃষ্টি, তাই কিছু অযৌক্তিক উচ্ছ্বাস এবং বৈপরীত্যও আছে। এবং যেহেতু অনেকে মনে করে কবিতা লেখা খুব সোজা, অকবিরাও কবিতা লিখতে চায়, সেজন্য একালেও অনেক অকবি হিন্দুধর্মের শাখা-প্রশাখা বাড়িয়েই চলেছে, সৃষ্টি করা হচ্ছে নতুন নতুন দেব-দেবী, যেমন বিশ্বকর্মা, সন্তোষীমা, শান্তিনিকেতনে টুরিস্টলজের কাছে লজেশ্বর শিব! মুসলমানদের 'হাদিস'-এর মতন হিন্দুদের মধ্যেও 'মনুসংহিতা' নামে একটি গ্রন্থ প্রচারিত হয়েছিল, কিন্তু গ্রন্থটি একে তো অর্বাচীন, তার ওপরে এমন কবিত্বহীন, পরস্পর বিরোধী, অতি রক্ষণশীল, নারীবিরোধী কথা-বার্তায় পূর্ণ যে ইদানীং শিক্ষিত হিন্দুরা সে বইটির কথা উচ্চারণ করেন না।

যে কোনও বিশেষ ধর্মাবলম্বী মানুষরা মনে করে যে তাঁদের ধর্মের প্রেরিত পুরুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিদাতা, তাঁর নির্দেশিত আচরণগুলি ভক্তিভরে অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই জীবনের সার্থকতা। কিন্তু সেই প্রেরিত পুরুষের কথা কিংবা সেই ধর্মের আচরণবিধির কথা কিছুই না জেনে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের বহু সংখ্যক মানুষও তো সার্থক জীবনযাপন করতে পারে। অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির কাছে ধর্মীয় সারসত্য বলে কিছু নেই। তবু, এক ধর্মের মানুষ, বাকি মানুষদের মনে করে পাপী বা পতিত। যাজক, মোল্লা ও পুরোহিত শ্রেণী এরকমই প্রচার করে থাকে অনবরত। শ্রীরামকৃষ্ণ 'যত মত তত পথ' উচ্চারণ করে অতি বাস্তব সত্য কথা বলেছিলেন, কিন্তু কোনও মতাবলম্বী লোকেরাই তা মানতে পারে না, এমনকী শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হিন্দুরাও না। অন্য ধর্মকেও সমান উপযোগী মনে করলে নিজের ধর্মের বিস্তার হবে কী করে? তা হলে তো দীক্ষাদান প্রাথাটাই উঠে যাওয়া উচিত। যে কোনও ব্যবসায়ীই যেমন তার সহব্যবসায়ীদের সমকক্ষ মনে করে তৃপ্ত হতে পারে না, ছলে-বলে-কৌশলে অন্য ব্যবসায়ীদের দমন করতে চায়, ধর্মপ্রচারেরও সেই একই নীতি। ব্যবসায়ীরা যেমন তাদের ইচ্ছেমতন মূল্যমান নির্ধারণ করে, সাধারণ মানুষ তাদের কাছে অসহায়, ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রচারিত মূল্যবোধের কাছেও সাধারণ মানুষের সেই একই অবস্থা, অনেকে বিবেক-বুদ্ধি পর্যন্ত বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়।

ধর্ম সম্পর্কে এত রকম চিন্তাভাবনা করেও আমি একবার অতি ছেলেমানুষী করে ফেলেছিলাম। অর্থাৎ আমার অকালপক্ব মস্তিষ্কে এই সব জ্ঞানের কথা ঠিক হজম হয়নি আরকী!

ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থাগারে আমি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী পড়ি, তখন বইটি দুর্লভ ছিল। রামমোহন রায়ের জীবনী, রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী, কেশবচন্দ্র সেনের রচনাবলী পড়তে পড়তে আমি যেন ফিরে যাই ঊনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় দিনগুলিতে, ওই সব মানুষদের দেখতে পাই স্বচক্ষে, একা একা রোমাঞ্চিত হই, সেই নির্জন লাইব্রেরিঘরে শুনতে পাই ব্রাহ্মসমাজের তরুণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর। হঠাৎ একদিন ঠিক করলাম আমার জন্মসূত্রে হিন্দু পরিচয়টা মুছে ফেলতে হবে, আমি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হব। যার কোনও ধর্মেই আস্থা নেই, তার ধর্মান্তর গ্রহণ যে চরম মূর্খতা বা পাগলামি, সেটা তখন আর মাথায় আসেনি। আমার ঘোর লাগার মতন অবস্থা, যেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেই আমি দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র-শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসার অধিকার পাব।

কী করে ব্রাহ্ম হতে হয় জানি না। চোখের সামনে শুধু একজন ব্রাহ্মকেই দেখি, এখানকার গ্রন্থাগারিক। ঝোঁকের মাথায় তাঁর কাছে গিয়ে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলাম খুব আবেগের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন? তিনি শান্তভাবে আমার সব কথা শুনে বললেন, হ্যাঁ, সাহায্য করতে পারি। কিন্তু এত ব্যস্ততার কী আছে? আরও চিন্তাভাবনা করো, তোমার নিজের ধর্মে কী কী অভাব বোধ করছ, অন্য ধর্মে এসে নতুন কী পাবে আশা করছ, সেটা ঠিক মতন উপলব্ধি করো, তারপর না হয় দেখা যাবে। বছরখানেক সময় নাও। এখন বই পড়ছ, আরও পড়ো!

সেই গ্রন্থাগারিক মহোদয় আমার দারুণ উপকার করেছিলেন, আমার ঘোর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষ যেমন আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এক বছর অপেক্ষা করতে পারে না,

ততদিনে তার ইচ্ছেটাই অন্তর্হিত হয়ে যায়, আমারও সেই অবস্থাই হল, আমি আর কখনও ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাইনি, ধর্মবিদ্বেষীও হইনি। নাস্তিকতাও প্রচার করিনি, এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকাই শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে। তবে, ধর্মান্ধতার নানান উদাহরণ কিংবা যুক্তিহীন আচার-বিচার মান্য করার ঝোঁক যখন চতুর্দিকে দেখি, তা নিয়ে মনে মনে হাসাহাসি করার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

চাকরির জন্য বহু ইন্টারভিউ দিয়ে ব্যর্থ হতে হতে একবার আমার একটা কাজ জুটে গেল। আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইউনেস্কো থেকে একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। খানিকটা অভিনব, এই কার্যক্রমটি শুধু বয়স্ক মানুষের জন্য। গ্রামের 'দিন আনি দিন খাই' শ্রেণীর অজস্র মানুষের অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত নেই, অঙ্ক জানে না বলে মহাজনরা অনবরত তাদের ওপর ঋণের ভার চাপিয়ে দেয়, এরা কোনওদিনই ইস্কুলে যাবে না, সান্ধ্য বিদ্যালয় খুলে জোর করে টেনে আনলেও এদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক তো নেই। অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও এরা অশিক্ষিত তো নয়, প্রকৃতি থেকে অনেক রকম পাঠ নিয়েছে, জীবন থেকে সঞ্চয় করেছে প্রচুর অভিজ্ঞতা, দুধের শিশুদের প্রথম পড়াবার মতন অজ, আম, ইট দিয়ে শুরু করলে এরা উৎসাহ পাবে কেন?

সুতরাং বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য আলাদা ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা প্রয়োজন, এবং সেজন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে এইসব মানুষদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে হবে, এরা কোন ভাষায় অভ্যস্ত, প্রতিদিনের জীবনে কী কী শব্দ ব্যবহার করে। ইউনেস্কোর পরিকল্পনাটি সে রকম। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখে কাজটি পেয়ে গেলাম আমি।

হাবড়া-আশোকনগরের কাছে বাণীপুরে একটি বেসিক ট্রেনিং কলেজ আছে, আমাদের আস্তানা হল সেখানে। পরিবেশটি ভারী সুন্দর, চতুর্দিকে অজস্র ফুল, চতুর্দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দ কোলাহল। ইউনেস্কোর প্রজেক্টে আমার মতন কাজ পেয়েছে কুড়ি জন, আমাদের থাকতে দেওয়া হল একটি লম্বা ডরমেটরিতে, মেঝেতে খড় বেছানো, তার ওপর শতরঞ্চি-চাদর বিছিয়ে শয্যা, মাথার কাছে সুটকেস, এই এক একজনের এলাকা। সৌভাগ্যবশত আমার এলাকাটি দেয়াল ঘেঁষে, এক কোণে।

এর আগে অনেকবার ভ্রমণে গিয়েছি বটে, কিন্তু বাড়ির বাইরে এই প্রথম আমার স্থায়ীভাবে থাকা। বাচ্চা ছেলের মতন বাবা আমাকে বাক্স-প্যাটরা সমেত সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে দিতে এলেন। যে-হেতু তিনি বয়েজ স্কাউট মাস্টারও ছিলেন, তাই খড়ের বিছানা দেখে তাঁর মোটেই আপত্তি হল না, প্রথম জীবনে তো কষ্ট করতেই হবে। (সেই খড় থেকে একদিন একটা সাপ বেরিয়েছিল, বাড়িতে সে কথা জানাইনি।) বাবা খুব আশা করেছিলেন, এই অভিজ্ঞতা থেকেই আমার পরে স্থায়ী চাকরি হবে, নিয়োগপত্রে সে-রকম ইঙ্গিত ছিল। এখন অবশ্য স্টাইপেন্ড বা হাতখরচ মাসে মাত্র পঁচাত্তর টাকা, তার থেকেই রোজ খেতে হবে ক্যান্টিনে। সে যাই হোক, তবু তো চাকরি, বাবা তাঁর স্কুলের সহকর্মীদের কাছে সগর্বে বলতে পারবেন, অজস্র বেকার যুবকদের মধ্যে তাঁর ছেলে একটা চাকরি পেয়ে গেছে। কয়েকখানা পোস্ট কার্ড রেখে গেলেন, নিয়মিত চিঠি লেখার জন্য।

এই প্রকল্পটির পরিচালক ছিলেন বিশিষ্ট গাঁধীবাদী সমাজ সেবক বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, তখনই তাঁর বয়েস সত্তরের বেশি, কিন্তু উদ্দীপনায় ভরপুর, এবং কঠোর আদর্শবাদী হলেও বেশ আধুনিকমনস্ক ও রসিক। বর্ধমানের কলা নবগ্রামে তাঁর নিজস্ব একটি আশ্রমের মতন প্রতিষ্ঠান ছিল, সেটাও আমাদের দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন একবার। গ্রাম-উন্নয়নের জন্য তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু একটা ব্যাপারে খুব মজা পেয়েছিলাম। সব কিছুই কাজে লাগানো যায়, এমনকী মানুষের মল ও মূত্র পর্যন্ত বাজে খরচ না করে সার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, এই নীতি অনুযায়ী সেখানকার শৌচাগারে এক জায়গায় মূত্র ত্যাগ আর পৃথক আর এক জায়গায় মলত্যাগ করার ব্যবস্থা, দুটো মিশিয়ে ফেললেই মুশকিল! কাজটা কিন্তু সহজ নয়

মোটেই!

সকালবেলা কিছুক্ষণ ওয়ার্কশপ, তারপর বিজয়দা আমাদের নিয়ে যেতেন কাছাকাছি গ্রামগুলিতে। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লাঙল চালনারত কৃষকের সঙ্গে কথা বলে বুঝে নিতে হবে, তার পরিচিত শব্দভাণ্ডার কতখানি। মোটামোটা অভিধানে যতই শব্দ থাকুক, অধিকাংশ মানুষ আড়াইশো-তিনশো শব্দ ব্যবহার করে চালিয়ে দেয় সব কাজ। প্রতিশব্দ কিংবা সমার্থক শব্দের ব্যবহার প্রায় নেই-ই বলতে গেলে। যেমন মাটিকে মৃত্তিকা বললে কৃষকটি বুঝবে না। জমি সে চেনে, ভূমি চেনে না, আবার কিছু কিছু স্থানীয় শব্দ সে ব্যবহার করে, যার অর্থ আমরা বুঝি না।

আমার সবচেয়ে চমক লেগেছিল, তাদের ছবি বিষয়ে অজ্ঞতা দেখে। যে ব্যক্তি জীবনে কোনওদিন একটি বইয়েরও পৃষ্ঠা উল্টে দেখেনি, সে বইতে ছাপা ছবি দেখে চিনতে পারে না। আমরা বাচ্চা বয়স থেকে বইতে ছাপা ফুল, পাখি, গাছ, মানুষ, বেড়াল-কুকুর দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, বাস্তব চেহারার চেয়ে ছবিতে যে আকৃতি সঙ্কোচন হয়, তা আমরা এমনি এমনি শিখে যাই, অর্থাৎ বাঘ দেখলে বেড়াল মনে হয় না। হাতিকে মনে হয় না ইঁদুর। কিন্তু যে কখনও ছাপা ছবি দেখেনি, সে এই আকৃতি সঙ্কোচনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আমি একজন চাষাকে বইতে ছাপা একটি বটগাছের ছবি দেখিয়েছিলাম, সে চিনতে পারেনি, কাছেই একটা সত্যিকারের বটগাছ, সে দিকে আঙুল নির্দেশ করলেও সে অবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা নাড়তে থাকে। অর্থাৎ বয়স্ক-শিক্ষা মানে শুধু অক্ষরজ্ঞান বা শব্দ পাঠ নয়। ছবি দেখিয়ে শেখানো দরকার, যদিও প্রকল্পটিতে তার কোনও উল্লেখ নেই।

পূর্ব বাংলার জ্ঞানের বাল্যস্মৃতি ছাড়া এই প্রথম আমার গ্রামের সঙ্গে খানিকটা প্রত্যক্ষ পরিচয় হল। যতই দরিদ্র হোক, গ্রামের যে কোনও মানুষের বাড়িতে গেলেই কিছু না-কিছু খেতে দেবেই। মুড়ি, চিঁড়ে, কলা, এক বাড়িতে দেবার মতন কিছুই ছিল না, শুধু উঠোনের মাচায় ঝুলছিল কচি শশা, তাই কয়েকটা ছিঁড়ে এনে দিল। খোসাসুদ্ধু সেই শশা কচকচিয়ে চিবিয়ে পরম তৃপ্তি পেয়েছিলাম। এক গ্রামের এক কবির সঙ্গেও পরিচয় হল। তিনি সেদিন এক মেথরকে নেমন্তন্ন করে এনে নারায়ণজ্ঞানে পুজো করে খাওয়াবেন ঠিক করেছিলেন, মেথরটির প্রায় প্রাণান্তকর অবস্থা, মুখখানি অতি করুণ, পালাতে পারলে বাঁচে। সেই কবির সঙ্গে আমার দীর্ঘদিন পত্রালাপ ছিল।

বেশ ভালোই দিন কাটছিল, এই ক্যাম্পাসে মেয়েরাও থাকত, তাদের সঙ্গে চোখাচোখি ও ভাবসাব হয়ে গেল, এরা সবাই ভাবী-শিক্ষিকা, কিন্তু তখনও ছিল ছাত্রী-সুলভ উচ্ছলতা। আমার বন্ধুদেরও ভালো একটা বেড়াবার জায়গা হয়ে গেল, তারা শনি-রবিবার আসে আড্ডা দিত। আর প্রাণের বন্ধু বুঢ়্ঢা— সে পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারে না, সে সপ্তাহের মাধখানেও বিকেলবেলা ট্রেন ধরে চলে আসে, সঙ্গে আনে প্রচুর খাবারদাবার, আমরা কোনও মাঠে গিয়ে বসি। কলকাতা খুব দূর নয়, কিন্তু আমি একবারও যাইনি, কল্পনায় দেখি কফি হাউসের আড্ডা, বেশ একটা নির্বাসিত নির্বাসিত ভাব উপভোগই করি। বুঢ়্ঢা কথাবার্তায় খুব তুখোড় হলেও মেয়েদের কাছে ভিজে বেড়াল, তার সঙ্গে এখানকার একটি তেজী যুবতীর আলাপ করিয়ে দেবার পর সে এমনই মুগ্ধ হয়ে গেল যে তার যখন-তখন চলে আসার কারণ আমি না সেই যুবতীটি, তা বোঝা শক্ত হয়ে পড়ল। প্রেম প্রেম হয় আর কী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর এগোলো না।

একটা ব্যাপারে খুব কৌতুক বোধ করতাম। সপ্তাহে দু'দিন ওয়ার্কশপে কলকাতা থেকে ডেকে আনা হত এক শিশু সহিত্যিককে, তিনি আমাদের বাংলা বাক্য গঠন শেখাবেন। আমি ততদিনে রীতিমতো একখানা কবি, গদ্যও লিখেছি এদিক সেদিক, আমাকে বাংলা শেখাবে এক শিশু সাহিত্যিক? অত্যন্ত সব কূট প্রশ্ন করে তাঁকে নাস্তানাবুদ করে দিতাম। পরে অবশ্য সেই শিশু সাহিত্যিকটির সঙ্গে আমার বেশ সৌহার্দ্য হয়ে যায়।

কথা নেই, বার্তা নেই, দু' মাস বাদে প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে গেল! সম্ভবত ইউনেস্কোর প্রস্তাব ছিল, প্রথম দু মাস অর্থ সাহায্য করা হবে, তারপর ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারকে ভার নিতে হবে। ইউনেস্কোর অর্থস্রোত বন্ধ হতেই সরকার চোখ বুজে মুছে ফেলল পুরো প্রকল্পটি। আমরা আবার বেকার।

এই দু' মাসের মধ্যে আমাদের কয়েকজনকে দিয়ে বই লেখাবার ব্যবস্থাও হয়েছিল। গ্রামের মানুষ সারা দেশের অনেক খবরই জানে না। তাদের জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বই লিখতে হবে, গল্পচ্ছলে, সরল ভাষায়। তখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে খুব হইচই চলছে, (হিন্দিতে বলা হত পাঁচশালা পরিকল্পনা, তা নিয়ে রসিকতাও কম ছিল না।) আমার ওপর ভার পড়ল সেই বিষয়টি বুঝিয়ে একটি পুস্তিকা রচনার। ও লিখতে আমার আর কতক্ষণ লাগবে, বড় জোর দু'তিন ঘণ্টা! সে পুস্তিকাটি ছাপাও হয়েছিল, নাম শুধু 'পরিকল্পনা', গোটা গোটা অক্ষরে, ষোলো পৃষ্ঠা, হলুদ মলাটে আমার নামটি জ্বলজ্বল করছে। আমার জীবনের সেটিই প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। শুনেছি ছাপা হয়েছিল পনেরো-বিশ হাজার কপি, বিতরিত হয়েছিল বিনা মূল্যে। সে বই কেউ পড়েছে কি না, কিংবা কারও কোনও উপকারে লেগেছে কি না, তা জানি না। অচিরেই সে পুস্তিকা মিলিয়ে গেছে কালের অতলে।

ছাব্বিশ

স্বাধীনতার সাত বছর পর ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির সীমানা পুনর্গঠনের জন্য একটি কমিশন হয়। দেশভাগের পর খণ্ডিত পশ্চিমবাংলা ধনে-মানে হীনবল, মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের অনেক দাবিই দিল্লির প্রভুরা আমল দেয় না। বিহারের পূর্ণিয়া ও মানভূম জেলায় বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা প্রচুর, সেইসব অঞ্চল পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠেছিল, কমিশনের রিপোর্টে তার অনেকটাই নস্যাৎ করা হল। অসম রাজ্য থেকে এই প্রথম শুরু হল বাঙালি বিতাড়ন, বিহার এবং ওড়িশাতেও বাঙালি বিদ্বেষের কালো কালো ধোঁয়া উড়ছে, সব দোষ উদ্বাস্তুদের নামে, কিন্তু সে বেচারিরা যাবে কোথায়, তা কেউ বলে না।

এরই মধ্যে বিধানবাবু হঠাৎ পশ্চিমবাংলা ও বিহার, এই রাজ্য দুটি জুড়ে দেবার প্রস্তাব আনলেন। তিনি কী কী যুক্তি দিয়েছিলেন, তা ঠিক মনে নেই, কিন্তু প্রস্তাবটি অনেকের কাছেই অদ্ভুত ও অবাস্তব মনে হয়েছিল। বিহার খনিজ সম্পদে ধনী, মাটির নীচে কয়লা, লোহা ও তামার আকর প্রচুর, আর পশ্চিমবাংলায় রয়েছে নানান কলকারখানা, এই সংযুক্তিতে তাই সুফল হবে ভাবা হয়েছিল? কিন্তু ভাষার কী হবে? একটু আগেই ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যের সীমানা নির্ধারিত হয়েছে, তা হলে এই যুগ্ম রাজ্যটিতে কোন ভাষা প্রধান হবে? এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হয় পশ্চিমবঙ্গেই, বিহার চুপ করে ছিল, তার অর্থ কি বিহারবাসীদের কাছে প্রস্তাবটি ছিল লোভনীয়? বিধানবাবু কি ভেবেছিলেন, পশ্চিমবাংলা থেকে বাংলা ভাষা মুছে যায় তো যাক! তা অসম্ভব কিছু নয়, তাঁর সাহিত্যবোধ কিংবা বাংলা ভাষার প্রতি দরদের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তিনি অনর্গল ভুল বাংলায় বক্তৃতা দিতেন।

কলেজ ছাড়ার পর আমি ঠিক করেছিলাম, আর কখনও মিছিলে হাঁটব না, কিন্তু তখন আমি বাংলা ভাষা নিয়ে এমনই স্পর্শকাতর যে কেউ বাংলা সম্পর্কে সামান্য কটূক্তি করলেও গায়ে যেন ছ্যাঁকা লাগে, এই প্রসঙ্গে কয়েকবার মারামারিও করেছি, সুতরাং এই সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে নেমে পড়লাম রাস্তায়। পুলিশের লাঠি-গুলি খেতেও অরাজি নই।

তখন যে কলকাতাকে মিছিলনগরী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, তা মোটেই অসত্য নয়। খাদ্য আন্দোলন, ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি, শিক্ষকদের বেতন, ছাত্রদের বেতন, এরকম নানা উপলক্ষ ছাড়াও রাজনৈতিক কারণেও দিনের পর দিন মিছিল লেগেই থাকত, এই সব মিছিলের ওপর পুলিশের লাঠি ও গুলি চালনা ছিল ব্রিটিশ আমলের চেয়েও বেশি। শিক্ষক আন্দোলনের মিছিলে আমার বাবাকেও যোগ দিতে দেখেছি। চুয়ান্ন সালে শিক্ষকরা টানা চল্লিশ দিন ধর্মঘট করেন এবং তাঁদের এক মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ছ'জন আরও বহুজন আহত। শিক্ষক হত্যার কলঙ্ক ইংরেজদেরও হাতে লাগেনি।

বিহার-বাংলা সংযুক্তির বিরুদ্ধে একটি বিশাল জনসভা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে, তার পরবর্তী আন্দোলন শুধু কলকাতায় নয়, ছড়িয়ে পড়ে জেলায় জেলায়। সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে যোগ দিতে আসে। বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে নিয়ে আমি প্রায় প্রতিদিনই বিক্ষোভ মিছিলে গিয়ে লাফালাফি করেছি। আমার খুব শখ ছিল একবার অন্তত জেলে যাবার। কত রকম কারাবাসের কাহিনী পড়েছি, স্বদেশি আমলে আমার জেলে যাবার সুযোগ ছিল না, না হয় স্বাধীন দেশেই একবার জেলের অভ্যন্তর দেখে আসব, খেয়ে আসব লপ্‌সি! একদিন মিছিলের সামনের দিক থেকে পৌঁছে গেছি ওয়েলিংটন স্কোয়ার পর্যন্ত, বিধান রায়ের বাড়ির সামনে পুলিশ আন্দোলনকারীদের ধরে ধরে তুলতে লাগল কালো গাড়িতে, আমি ঠেলেঠুলে তাদের দিকে এগোচ্ছি, কিন্তু পুলিশগুলো এমনই পাজি যে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গিয়ে রাস্তা কর্ডন করে দিল, আমি সেই কর্ডন ভেদ করে যাবার চেষ্টা করতেই একজন প্রবল ধাক্কায় ফেলে দিল মাটিতে। সম্ভবত প্রিজন্ ভ্যান ভর্তি হয়ে যাওয়ায় তারা এর পর লাঠি চালাবার সিদ্ধান্ত নেয়। আমার আর জেলে যাওয়া হল না।

অবশ্য এই আন্দোলনের তীব্রতায় বিধান রায় যে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হলেন, তাতে ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বোধ করেছিলাম, যদিও এতে আমার ভূমিকা সেতুবন্ধে কাঠবিড়ালির মতন।

পূর্ব পাকিস্তানে যে-রকম ভাষা আন্দোলন চলছিল, পশ্চিমবাংলায় সেরকমভাবে কোনও রাজনৈতিক দলই বাংলা ভাষা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেনি, প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু প্রয়োজন খুবই ছিল। তাদের দূরদৃষ্টির অভাবে ক্রমশ পশ্চিমবাংলায়, তথা সারা ভারতেই বাংলা ভাষার স্থান সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। কেন্দ্রীয় সরকার যোগাযোগের ভাষা হিসেবে হিন্দি ও ইংরেজিকে গ্রহণ করেছে, রাজ্য সরকারও সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের উদ্যোগ নিল না, তা হলে বাংলা ভাষার গুরুত্ব বা মর্যাদা রইল কোথায়? হিন্দি ভাষার প্রচার ও প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ বাড়তে লাগল প্রতি বছর, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির সমৃদ্ধির জন্য দাবি জানাল না কেউ। বাংলার বাইরে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি প্রভৃতি অনেক রাজ্যেই বাংলা মাধ্যম স্কুল চলত গৌরবের সঙ্গে, সেগুলি দুর্বল হয়ে যেতে লাগল, প্রবাসী বাঙালি ছেলেমেয়েরা আর বাংলা শিখতে আগ্রহ বোধ করে না। হিন্দি ফিল্মের আগে তেমন দাপট ছিল না, এখন সেগুলি প্রবল হয়ে তেড়ে এসে দখল করে নিতে লাগল পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ সিনেমা হল, আকাশবাণীতেও 'বিবিধ ভারতী' নামে এক অদ্ভুত তরঙ্গে অনবরত প্রচারিত হতে লাগল লঘু রুচির হিন্দি গান। বাংলার চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত জগতের অনেক প্রতিভাবানদের লোভনীয় হাতছানি দিয়ে টেনে নিয়ে গেল হিন্দি ফিল্মের জগৎ।

'হরবোলা'-র যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আমি বর্ধিত হচ্ছিলাম, তা লুপ্ত হয়ে গেল অকস্মাৎ। অর্থাভাবের কোনও প্রশ্নই ছিল না, উৎসাহেরও অভাব ছিল না, তবু এই সংস্থাটি বন্ধ হয়ে গেল কমলকুমার মজুমদার ও দিলীপকুমার গুপ্ত নামে দুই প্রবল ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে। এরকম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষরা বেশিদিন অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা চালাতে পারেন না, সহ্য করতে পারেন না বিরুদ্ধ মত বা সমালোচনা। যেমন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "দুই বনস্পতি মধ্যে রাখে

ব্যবধান/লক্ষ লক্ষ তৃণ একত্রে মিশিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন।" আমাদের মতন তৃণদলের মাঝখানে কমলকুমার ও ডি কে ছিলেন দুই বনস্পতি, কিছুদিনের জন্য দু'জনের গাঢ় বন্ধুত্বও ছিল, কিন্তু নাটক পরিচালনার ব্যাপারে অতি সামান্য কারণে এঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। একটিও কটু বাক্য উচ্চারিত হয়নি, তবু এক সন্ধেবেলা দু'জনে দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। ওঁদের মধ্যে মিলন ঘটাবার অনেক চেষ্টা করেছি আমরা, পলাতক ও আত্মগোপনকারী কমলকুমারকে ধরে এনে ডি কে-র সামনে দাঁড় করিয়েছি, দু'জনেই দারুণ ভদ্রতার সঙ্গে সহাস্যে আলিঙ্গন করলেন, কিন্তু মাঝখানের ফাটল আর জোড়া লাগল না। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'মুক্তধারা' নাটক বেশ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করার পর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লম্বকর্ণ পালা'-র রিহার্সাল দিতে দিতে মাঝপথে 'হরবোলা' ভেঙে গেল।

তারপর ডি কে-র সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ কমে গেলেও আমরা রয়ে গেলাম কমলকুমারের প্রায় প্রতিদিনের সঙ্গী, বা ছায়াসঙ্গী বা অনুচর বা চেলা। 'কৃত্তিবাস' প্রকাশের ব্যাপারে সিগনেট প্রেসের কর্ণধার হিসেবে ডি কে অনেক সাহায্য করেছিলেন, তারপর একটি পত্রিকাকে স্বাবলম্বী হতেই হয়। স্বাবলম্বী হওয়া মানে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, এ ব্যাপারে দীপকের যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল, সে হোমরাচোমরা ব্যক্তিদের বশীভূত করে ফেলতে পারত কথাবার্তায়। কিন্তু দীপক কৃত্তিবাস থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিলে আমি খানিকটা বিপদে পড়েছিলাম ঠিকই, বিজ্ঞাপন জোগাড় করার ব্যাপারে আমি একেবারেই অযোগ্য। আমার চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা এই যে, আমি কোথাও নিজেকে জোর করে উপস্থাপিত করতে পারি না এবং প্রত্যাখ্যান একেবারে সহ্য করতে পারি না। যেখানে প্রত্যাখ্যানের সামান্য সম্ভাবনা থাকে সেখানে কিছু চাই না, সেখানে যাই না। এমনকী নিশ্চিত সম্মতির আভাস না পাওয়া পর্যন্ত আমি কোনও মেয়ের কাছেও চুম্বন প্রার্থনা করিনি। তা হলেও কি জীবনে কখনও আমাকে প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে হয়নি? হয়েছে অবশ্যই, অনেক সময় নিজের অনিচ্ছায় বা অন্যের তাড়নায় মানুষকে অনেক জায়গায় যেতে হয়, কিছু চাইতে হয়। সংস্কৃতে একটা কথা আছে, যাচ্ঞা মোঘা বরমধি গুণে নাধমে লব্ধকামা। অর্থাৎ, অধমদের কাছে কিছু চেয়ে লব্ধকাম হওয়ার বদলে গুণসম্পন্ন কারও কাছে কিছু চেয়ে ব্যর্থ হওয়াও ভালো। কিন্তু এ যুগে অধমদের হাতেই যে বেশি ক্ষমতা! এবং তারা কিছু দেবার আগে ক্ষমতা দেখাতে চায়।

সে যাই হোক, বিজ্ঞাপন সংগ্রহই তো কঠিন ব্যাপার, তার টাকা আদায় করারও অনেক ঝামেলা। আমি আর ওসব ঝকমারির মধ্যে যেতাম না। আমি টিউশানি-নির্ভর বেকার, সেই টিউশানির টাকা কিছু লুকিয়ে রাখতাম, সন্ধেবেলার একটা টিউশানির কথা বহুকাল গোপন রেখেছিলাম বাড়িতে, কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত যেতাম হেঁটে হেঁটে, ট্রাম-বাসের ভাড়া বাঁচাবার জন্য, বন্ধু-বান্ধবরা কিছু কিছু সাহায্য করতেন, তাতেও কুলোত না, তাই একটি অসৎ উপায়ও অবলম্বন করতে হত। প্রতি সংখ্যার জন্য কাগজ কিনতে হত নগদ, দপ্তরিখানাতে পুরো টাকা না মেটালে বাঁধানো পত্রিকা দেয় না, কিন্তু প্রেসে ধার রাখা যায়। সেই জন্যই প্রেস পাল্টাতাম ঘন ঘন। কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে ফর্মা ছাপিয়ে নিয়ে সেই যে গা-ঢাকা দিতাম, আর সে প্রেসের রাস্তাও মাড়াতাম না। বাংলা কবিতার জন্য সেইসব প্রেস মালিকগণ কিছু স্বার্থ ত্যাগ করছেন, এই রকমই ধরে নেওয়া হত। অবশ্য কোনও কোনও প্রেস-মালিকের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ও বোধহয় ছিল, অন্তত একজন প্রেস মালিকের কাছে বছর দু'-এক বাদে দৈবাৎ ধরা পড়ে যেতেও তিনি আমার গলা চেপে ধরেননি, আমি সেই ধারের কথা উত্থাপন করতেই তিনি হেসে হাত নেড়েছিলেন। অনেক বছর বাদে তরুণ প্রেসের মালিক গণেশচাঁদ দে কবিতা লেখা ও পত্রিকা প্রকাশের মতন সম্পূর্ণ অলাভজনক কাজে কয়েকটি শিক্ষিত যুবক এত সময় ও উদ্যম ব্যয় করে দেখে এমনই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন স্বেচ্ছায়।

কোনও রহস্যময় কারণে কমলদা সেসময় তাঁর বাসস্থানের কথা গোপন রাখতেন। রাত্তিরের দিকে শ্যামবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিতে দিতে হঠাৎ চলি বলেই লাফিয়ে উঠে পড়তেন একটা চলন্ত বাসে। পরে অবশ্য, ডি কে-র সঙ্গে বিবাদের সময় আমরা গোয়েন্দাগিরি করে তাঁর বাড়ি খুঁজে বার করেছিলাম। সেই সময় তিনি থাকতেন পাতিপুকুরে, নিজের স্ত্রীকে করে রেখেছিলেন অন্তরালবর্তিনী এবং তাঁকে সম্বোধন করতেন বড় বউ! কথাবার্তার মাঝখানে একসময় তিনি বলতেন, বউ বউ, এদের চা-টা দাও! তখন পর্দার আড়াল থেকে একটি ফর্সা হাত ওমলেট ও চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিত। আমাদের মতন ছোটদের কাছেও কমলদা তাঁর স্ত্রীকে কেন লুকিয়ে রাখতেন, তা কোনওদিনই জানতে পারিনি। বহুকাল পরে বউদি দয়াময়ী মজুমদারকে সামনাসামনি দেখি, তিনি অত্যন্ত রূপসী তো বটেই, বুদ্ধিমতী ও বিদূষী, শেষ জীবনে লিখতেও শুরু করেন।

ওই পাতিপুকুরের বাড়িতেই কমলদার ছোট ভাই, বিখাত শিল্পী নীরোদ মজুমদার ও তাঁর ফরাসি স্ত্রীকে প্রথম দেখি। দুই ভাইয়ে যেমন গলাগলি, তেমনই আদি রসাত্মক ঠাট্টা-ইয়ার্কিতেও কোনও আড় নেই। নীরোদ মজুমদার সদ্য ফরাসি দেশ থেকে দামি দামি সব আসব নিয়ে এসেছেন, আমরা কয়েকজন হঠাৎ উপস্থিত হওয়ায় আমাদেরও একটু একটু স্বাদ নিতে দিলেন। পাতিপুকুরে খুব মাছির উপদ্রব, গায়ে এসে তো বসেই, গেলাসের সুরার মধ্যেও ঢুকে পড়ে, পাখার বাতাসেও তারা যায় না। নীরোদ মজুমদারের স্ত্রী মাছির উৎপাতে সন্ত্রস্থ, আমরাও খুব লজ্জা বোধ করছি, একসময় তাঁর স্বামী এক বুদ্ধি বার করে বললেন, দাঁড়াও জব্দ করছি মাছি ব্যাটাদের। এক প্রকার মিষ্টি মদ তিনি ফোঁটা ফোঁটা করে ছড়িয়ে দিলেন মেঝেতে, বললেন, এইবার দ্যাখো মাতাল মাছি! সত্যিই, সেই ঝাঁক ঝাঁক মাছি মদের ফোঁটার ওপর বসে, একটু বাদেই নেশার ঝোঁকে উল্টে উল্টে পড়ে যেতে লাগল, আর তাদের ওড়ার ক্ষমতা রইল না। অনেক জন্তুজানোয়ার, কীটপতঙ্গ, এমনকী মাছিও মদ ভালোবাসে। মাছের চারে মদ মিশিয়ে দিলে যে বেশি মাছ ধরা পড়ে, তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ডি কে-র ভাই মানিক গুপ্ত তাঁর পোষা একটি অ্যালসেশিয়ান কুকুরকে প্রতি সন্ধেবেলা হুইস্কি না দিলে সে এমন রাগারাগি করত যে শেষ পর্যন্ত সে কুকুরকে তিনি গুলি করে মেরে ফেলতে বাধ্য হন। চিনে পাড়ায় দেখেছি একটি মাতাল বাঁদর, আর উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে একটি এমনই লোভী হাতি দেখেছি, যে কুলি বস্তিতে ঢুকে পড়ে হাঁড়িয়া নামে মদ শুঁড় দিয়ে চোঁ চোঁ করে টেনে নিয়ে দারুণ নেশাগ্রস্ত হয়ে আর চলতে পারত না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে দুলতে মার খেত!

নীরদ মজুমদার কলকাতায় এসে পাকাপাকি থাকবার সময় আমাদের সঙ্গে ভালো পরিচয় হয়। শক্তি ও আমার যুগ্ম কাব্যগ্রন্থ 'সুন্দর রহস্যময়'-এর জন্য তিনি কয়েকটি চমৎকার ছবি এঁকে দিয়ে আমাদের ধন্য করেছিলেন।

আমরা কমলদার পাতিপুকুরের বাড়ি আবিষ্কার করায় তিনি খুশি হননি, অচিরেই বাসস্থান বদল করে তিনি আবার অজ্ঞাত স্থানে চলে যান। এরকমভাবে তিনি বহুবার বাড়ি বদল করেছেন, শুনেছি। সুতরাং, তাঁর সঙ্গে দেখা করার একমাত্র উপায় ছিল খালাসিটোলার পানশালায় হানা দেওয়া। এটা 'হরবোলা' ভেঙে যাবার পরের কথা।

কমলকুমারের সঙ্গে ভালোমতো পরিচয় হবার আগে যারা প্রথম প্রথম তাঁর বাক্যালাপ শুনবে, তাঁরা আঁতকে আঁতকে উঠবে। যেমন, কথায় কথায় তিনি উঁচু জাত, নিচু জাতের প্রসঙ্গ তোলেন, ছোটলোক-ভদ্রলোকের তফাত করেন, কোনও মুসলমানের মুখের ওপর বলেন ব্যাটা মোছলমান, দেশ স্বাধীন হবার বদলে ইংরেজ আমল ভালো ছিল, এখনও আবার ইংরেজদের ডেকে এনে এ দেশ শাসন করার কন্ট্রাক্ট দেওয়া উচিত, এরকম মতামত ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেন না। এ সবই যে এক ধরনের তির্যক রসিকতা, তা বুঝে উঠতে সময় লাগে। খালাসিটোলায় একাধিক মুচি, মেথরের সঙ্গে তাঁর গলাগলি, অনেক বিখ্যাত, উচ্চবংশীয়দের

নাম শুনলেই তিনি নাক সিঁটকোন, হুমায়ুন কবীর, আতাউর রহমান কিংবা বেলাল চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর দারুণ বন্ধুত্ব! তিনি রামকৃষ্ণ ভক্ত বলেই ব্রাহ্মদের বিরোধী, সে কারণেই রবীন্দ্রনাথকেও 'বেহ্ম' বলে অবজ্ঞার ভাব দেখান, অথচ 'মুক্তধারা' অভিনয়ের সময় তিনি স্থির করেছিলেন, একটি শব্দও বাদ বা বদল করা চলবে না! একাত্তর সালে বাংলাদেশ যুদ্ধ শুরু হবার সময়ে তিনি গভীর বিস্ময়ে ভুরু তুলে বলেছিলেন, অ্যাঁ, মোছলমানরাও বাঙালি হতে চায়, বলে কী? তাঁর মতে, শুধু পশ্চিমবাংলার কায়স্থরাই বাঙালি, হিন্দু ব্রাহ্মণরাও বাঙালি হবার যোগ্য নয়! বলাই বাহুল্য, এর সঙ্গে ইতিহাস-ভূগোলের কোনও সম্পর্ক নেই, এসব কথা সেভাবে গ্রহণ করাও উচিত নয়, এসব কমলকুমার মজুমদার নামে এক সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত, অসাধারণ মানুষের চমকপ্রদ উক্তি! অন্য কারওর সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে না। সঙ্গী-সাথীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধাভক্তি আদায়ের বিন্দুমাত্র বাসনা তাঁর ছিল না, কেউ সেরকমভাব দেখালেই তিনি হা হা করে হেসে উঠে একটা অতি আদি রসাত্মক রসিকতা করে বসতেন। বাঙালি মুসলমানদের সম্পর্কে ওই ধরনের উক্তি করা সত্ত্বেও এ তথ্য এখানে জানিয়ে রাখা ভালো যে মুক্তিযুদ্ধের সময় ওদিক থেকে আগত অনেক লেখক-বুদ্ধিজীবীকে তিনি সাদর আলিঙ্গন দিয়েছিলেন এবং অন্য অনেক সময় কথাপ্রসঙ্গে বারবার বলতেন, মুসলমানদের মতো আতিথেয়তা দিতে হিন্দুরা জানে না।

কমলকুমারের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ স্বশিক্ষিত, বহু বিষয়ে ছিল গভীর জ্ঞান, তাঁর মুখের ভাষা ও লেখার ভাষায় আকাশ-পাতাল তফাত বলতে গেলে। তাঁর কথ্যরীতি খুবই চটুল, তারই মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ ঝলসে উঠত প্রজ্ঞা, ইংরিজি করে বলতে গেলে প্রফাউন্ড ও প্রফেনের এমন সংমিশ্রণ অতি দুর্লভ। মানুষটি সব সময় জীবনরসে ভরপুর, তাকে কখনও গম্ভীর কিংবা সত্যি সত্যি ক্রুদ্ধ হতে দেখিনি। তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য, তিনি কোথাও বসতে চাইতেন না, খালাসিটোলায় টেব্‌ল-বেঞ্চ থাকলেও কমলকুমার মদ্যপান করতেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া। তখনকার খালাসিটোলা ছিল কলকাতার সবচেয়ে শস্তা দিশি মদের পানশালা, টিনের ছাদ ঘেরা বিশাল জায়গা, বাইরে থেকে কিছু বোঝাই যেত না। পরবর্তীকালে কোনও কোনও সাহেব, যেমন বিখ্যাত কোনও ফরাসি শিল্প সমালোচক কিংবা ইংরেজ কবি কমলকুমারের সম্পর্কে জেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করলে তাঁদের আসতে হত ওই খালাসিটোলাতেই, কমলকুমার গেলাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতেন তাঁদের সঙ্গে। এরা কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, একসঙ্গে এত মানুষকে এক জায়গায় শুধু মদ্যপান করতে তাঁরা আর কোথাও দেখেননি। পৃথিবীর অন্য সব জায়গার মদ্য পানশালায় খাবারদাবারেরও ব্যবস্থা থাকে, আমাদের দেশেও সেই একই নিয়ম, খালাসিটোলায় সেই নিয়মের চোখে ধুলো দেবার জন্য পাওয়া যেত অতি ক্ষুদ্র প্লাস্টিকের থালায় কিছুটা আদা আর কয়েকটি ছোলা, ওটাই খাদ্য। মুচি-মেথর-মুদ্দোফরাস, চোর-পকেটমার-গুণ্ডা, কেরানি ও বেয়ারা, কবি ও সম্পাদক, সবাই সেখানে সমান। এক নম্বরের বাংলা মদ অতি কড়া, যাকে বলে তরল-গরল, তা এক গেলাস ভর্তি করে, জল বা সোডা এক বিন্দু না মিশিয়ে, কমলকুমার আগে তাঁর হাতের একটি আংটি গেলাসে ছুঁইয়ে নিতেন, (সে আংটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম লেখা!) তারপর ঢক ঢক করে এক চুমুকে শেষ করে ফেলতেন সবটা। আমাদের মধ্যে শক্তিই একমাত্র কমলদার এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করত, আমি দু'-একবার চেষ্টা করেও পারিনি, আমায় সোডা মেশাতে হতই। এক গেলাস শেষ করার পর দ্বিতীয় গেলাস নেবার আগে কমলদা একটা কলে খুব ভালো করে মুখ কুলকুচো করতেন। তাঁর মতে, এতে নাকি দাঁত ঠিক থাকে। লিভারের কী হবে, তার চিন্তা নেই, দাঁতের জন্য চিন্তা!

খালাসিটোলা রাত ন'টায় বন্ধ হবার পর বাইরে বেরিয়ে সরষের তেলে ভাজা গরম গরম ওমলেট খাওয়া ও তার পরেও বহুক্ষণ ওয়েলিংটনের মোড়ে পুরনো বইয়ের দোকানগুলির

সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা। এক প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে, পৃথিবীর বহু বিষয়ে কথা বলতেন কমলদা, আমরা মুগ্ধ শ্রোতা। সক্রেটিস যেমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিংবা চলতে চলতে তাঁর ভক্তদের জ্ঞানের কথা বলতেন, তাঁর অনুগামীদের বলা হত পেরিপাটেটিক ফিলোজফার, কমলকুমারও সেরকম, তিনিই আমাদের সক্রেটিস। তিনি দার্শনিক তো অবশ্যই।

কমলকুমার শারীরিকভাবেও বেশ শক্তিশালী পুরুষ। অত মদ্যপান করেও কখনও তাঁকে বেচাল হতে দেখিনি। তিনি উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান হলেও তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, অনিশ্চিত উপার্জন, তবু আমরা বয়েসে অনেক ছোট বলে মদের বোতল কেনার টাকা তিনিই জোর করে দেবেন। তিনি টাকা রাখতেন তাঁর হাতে ধরা বইয়ে, প্রতিদিনই কোনও না কোনও ফরাসি বই থাকত, সেই বইয়ের ভাঁজে। আড্ডার শেষে তিনি একাই ট্রামে চেপে চলে যেতেন তাঁর অজ্ঞাত বাসস্থানে। পরের দিকে অবশ্য তা জানা হয়ে যায়। তখন ইন্দ্রনাথ মজুমদার, কমলদার আপত্তি সত্ত্বেও, জোর করে ট্যাক্সিতে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসত। কমলদা নিঃসন্তান, ইন্দ্রনাথ মজুমদার শেষের কয়েক বছর যেভাবে নিঃস্বার্থভাবে কমলদার দেখাশুনো করেছে, তা অনেকের নিজের সন্তানও করে না।

কমলদার চরিত্রের আর একটি বৈপরীত্যের উদাহরণও দেওয়া দরকার। সিগনেট প্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হবার পর জীবিকার জন্য তিনি 'তদন্ত' নামে একটি গোয়েন্দা-রহস্য পত্রিকা বার করেছিলেন, তাতে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর'-এর মতন পুরনো লেখা পুনর্মুদ্রিত হত, অনেক লেখা কমলদা নিজে লিখতেন, আমরাও দু'-একটা লিখেছি কাঁচা হাতে। অতি দীনভাবে ছাপা, বাজে কাগজ, মলাটে রগরগে ছবি নেই, সেরকম রহস্য পত্রিকা চলবে কেন? পুরোটাই লোকসান, বন্ধ হয়ে গেল অচিরে। কয়েক বছর পর তিনি আর একটি পত্রিকার সম্পাদক হন, নাম 'অঙ্ক ভাবনা', এরকম পত্রিকা প্রকাশের কথা এ দেশে আগে কেউ চিন্তাই করেনি, এর বিষয় গাণিতিক দর্শন, অতি দুরূহ সব প্রবন্ধ। বহু লেখক অঙ্ক জিনিসটাকেই ভয় পায়, তার ওপর তার দর্শন! এ পত্রিকার পাঠক যেমন দুর্লভ, লেখক পাওয়াও তেমনই কঠিন। কয়েক সংখ্যা পরেই পত্রিকাটির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হল। 'অঙ্ক ভাবনা'-র সমস্ত দায়দায়িত্ব বহন করেছিল ইন্দ্রনাথ মজুমদার। একই ব্যক্তি একবার অতি লঘু রহস্য পত্রিকার সম্পাদক হন, আবার অতি গুরুগম্ভীর দর্শন-পত্রিকার, এর উদাহরণ কমলকুমারই একমাত্র!

এক রবিবার সকালে কমলদা তাঁর প্রথম উপন্যাস উপহার দিলেন আমাদের। উপন্যাসটি সম্পূর্ণ ছাপা হয়েছে একটি সাধারণ পত্রিকায়, আমি তার নামও জানতাম না, কমলদা পত্রিকাটি ছিঁড়ে, শুধু তাঁর উপন্যাসের অংশটুকু সেলাই করে দিয়েছিলেন, নাম 'অন্তর্জলী যাত্রা', প্রথম লাইনটি আজও মনে আছে, "আলো ক্রমে আসিতেছে, আকাশ মুক্তাফলের ন্যায় হিম নীলাভ।" সে উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতা, জীবনের কিছু কিছু ঘটনার মতন সম্পূর্ণ নতুন ও চিরস্থায়ী। ততদিনে সাধু বাংলা বিসর্জন দিয়েছে সমস্ত লেখক, কমলকুমারের রচনা শুধু সাধু বাংলায় নয়, তার বাক্যগঠনও আমাদের অপরিচিত, কোথাও কোথাও তা কঠিন দেওয়ালের মতন যেন অগম্য, তবু সেই দেওয়ালের ওপাশে যেন রয়েছে কী রহস্য, তাই বারবার পড়তে ইচ্ছে হয়, গোটা উপন্যাসটি অন্তত তিনবার পাঠের পর তার প্রকৃত মর্ম ও সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম হয়। হীরক-উদ্ধারের জন্য যেমন অনেক মাটি খুঁড়তে হয়, সেই রকমই কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস পাঠের পরিশ্রম সার্থক।

তাঁর মুখের ভাষা হাটে-বাজারের, আর সাহিত্যের ভাষা এত জটিল কেন, এ প্রশ্ন অনেকবার করেছি। তিনি যা উত্তর দিয়েছেন, তা অভিনব ও চমকপ্রদ হতে পারে, ব্যাখ্যা নয়। তিনি বলতেন, সাহিত্য হচ্ছে বাগ্‌-দেবী সরস্বতীর সঙ্গে কথা বলা। আমরা যে ভাষায় মাছের বাজারে, মদের দোকানে, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলি, সে ভাষায় শব্দের অধিষ্ঠাত্রীর সঙ্গে কথা বলা যায় না, সে জন্য নতুন ভাষা তৈরি করে নিতে হয়। এই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে ছাপা হয়েছিল

একটি ছোট প্রকাশনী থেকে, কমলকুমার রসিকতা করে বলেছিলেন, এক বছরে আমার বইটা বিক্রি হয়েছে পনেরো কপি, আর সতেরো জন ফেরত দিয়ে গেছে! তবু, যতই ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে পরিচিত হোন না কেন, এই সময় থেকে তিনি একজন পুরোপুরি লেখক।

কমলকুমার কবিতা লেখেন না, আমরা কৃত্তিবাস পত্রিকায় তাঁর কোনও রচনা ছাপতে পারি না, কারণ তখনও কৃত্তিবাসকে বিশুদ্ধ কবিতা পত্রিকা হিসেবে রাখতেই বদ্ধপরিকর। সন্দীপনের মতন বন্ধুও কৃত্তিবাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তবু সে এ পত্রিকার লেখক নয়। হঠাৎ আমার মস্তকে এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা এসে গেল। একই সঙ্গে দুটি আলাদা পত্রিকা বার করা হবে, পৃথক মলাট, কিন্তু দুটিরই নাম কৃত্তিবাস, একটি কবিতা, অন্যটি গল্পের। কয়েকজন বন্ধু এতে সমর্থন জানাল। আমার স্কুলের ও বাল্য-বন্ধুরা, যেমন আশুতোষ ঘোষ, উৎপল রায়চৌধুরী, ভাস্কর দত্ত প্রমুখ, এরা কেউ লেখে না কিন্তু গোড়ার দিকে কৃত্তিবাসকে অনেক সাহায্য করেছে, অন্যরা আস্তে আস্তে সরে গেলেও ভাস্কর রয়ে গেল আজীবন কবি-লেখকদের সঙ্গী। ভাস্করের বাড়িতে দুটো বৈঠকখানা, তারই একটিতে হল কৃত্তিবাসের নতুন কার্যালয়, কয়েকজনের চাঁদায় গড়া হল একটা তহবিল, শুরু হল দুই কৃত্তিবাসের কাজ। গল্পসংখ্যার জন্য নির্বাচিত হল দুটি মাত্র গল্প, কমলকুমার মজুমদারের 'ফৌজ-ই-বন্দুক' এবং সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী', দুটিই অসাধারণ গল্প এবং বাংলা সাহিত্যে নতুন স্বাদের। শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্বেচ্ছায় গল্প পত্রিকার দায়িত্ব নিতে চেয়েছিল, তার নাম মুদ্রিত হল সম্পাদক হিসেবে, কিন্তু সে এমনই অস্থির স্বভাবের যে সম্পাদকীয় পর্যন্ত লিখে উঠতে পারল না। সে সম্পাদকীয়ও লিখতে হল আমাকেই। সে সম্পাদকীয় থেকে কিছু কিছু বাক্য পরে অনেকে উদ্ধৃত করেছে দেখেছি। যথাসময়ে প্রকাশিত হল দুটি পত্রিকা, দুটির নাম কৃত্তিবাস, দু'রকম চেহারা, দুটিই পরিচ্ছন্নভাবে সুমুদ্রিত। পাঠক মহলে খুবই বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছিল। বাংলা ভাষাতে তো বটেই, আর কোনও ভাষাতেও এরকম অভিনব ব্যাপার ঘটেছে কি না জানি না।

দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য কমলকুমার লিখে দিলেন 'গোলাপ সুন্দরী', এ ছাড়া দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, মতি নন্দী প্রমুখ বন্ধুরা গল্প দিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়, কিন্তু গল্প-কৃত্তিবাসের আর দ্বিতীয় সংখ্যা বেরোতে পারেনি। কিছুটা অর্থাভাবে, কিছুটা বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে মতান্তরে ও কিছুটা আমার পারিবারিক দুর্যোগের কারণে এই উদ্যোগ আর নেওয়া যায়নি। কবিতার কৃত্তিবাসও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় বছরখানেকের জন্য। খুবই দুঃখের সঙ্গে কমলকুমারের 'গোলাপ সুন্দরী'-র মতন অমর গল্পটি আমি 'এক্ষণ' পত্রিকার জন্য তুলে দিয়েছিলাম নির্মাল্য আচার্যের হাতে।

অবশ্য কয়েক বছর পর, আগেকার নিয়ম ভেঙে, কবিতার কৃত্তিবাসেই প্রকাশিত হয়েছিল কমলকুমারের সম্পূর্ণ উপন্যাস, 'সুহাসিনীর পমেটম'।

সাতাশ

দক্ষিণ কলকাতায় রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এক সন্ধেবেলা তিনটি উজ্জ্বল যুবতী ওপরের দিকে মুখ করে ডাকছিল, এই বিশ্ব, বিশ্ব! কয়েক মুহূর্ত পরে তিনতলার ঝুল বারান্দায় একটি গেঞ্জি পরা যুবক এসে বলল, দাঁড়া আসছি!

দৃশ্যটি আমার কাছে এমনই চমকপ্রদ লেগেছিল যে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। ঈর্ষা হয়েছিল, টনটন করেছিল বুক। মেয়েরা ডাকছে একটি ছেলেকে? পাড়াপ্রতিবেশী উঁকিঝুঁকি

মারছে না, ছেলেটির বাড়ির লোক চোখ গরম করছে না? আমায় কোনও তরুণী কখনও এমনভাবে ডাকেনি, উত্তর কলকাতায় এরকম ঘটনা সম্ভবই নয়।

উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার জীবনযাত্রায় স্পষ্ট প্রভেদ ছিল পঞ্চাশ ও ষাট দশক পর্যন্ত। অনেক পরিবারে মহিলারা পর্দানশীন, কখনও বাড়িতে কোনও অনাত্মীয় আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হলে মাথায় ঘোমটা টেনে, মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখতেন। একই পরিবারের দুটি বালক বালিকা এক সঙ্গে বর্ধিত হচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, কিন্তু যেই তাদের বারো-তেরো বছর বয়স হয়ে গেল অমনি ছেলে ও মেয়ের শাসন প্রণালী ভিন্ন হয়ে যাবে। ওই বয়সের ছেলেরা বারমুখো হতে শুরু করে, ইস্কুলের গণ্ডি ডিঙিয়ে কলেজে গেলেই বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা, দল বেঁধে বাইরে যাওয়া, একটু রাত করে বাড়ি ফেরার ছাড়পত্র পেয়ে যেত। ওই একই বয়সি মেয়েরা বিকেলের আলো ফুরোবার আগেই বাড়িতে ফিরতে বাধ্য, অভিভাবকদের সঙ্গে ছাড়া সিনেমা-থিয়েটারে যাবার স্বাধীনতা ছিল না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনও যুবকের সঙ্গে বাক্যালাপ করলে টি টি পড়ে যেত। ঋতুমতী হবার পর থেকেই তাদের অপেক্ষা করতে হয় বিয়ের জন্য। এবং বিয়েতেই জীবনের পরাকাষ্ঠা। বিবাহ-পূর্ব প্রেম করার অভিজ্ঞতা থেকে তারা বঞ্চিত হলেও যৌন অভিজ্ঞতা যে একেবারে হত না তা নয়। মামাতো-পিসতুতো দাদা ও যুবক কাকার দল সুযোগ পেলেই দলাইমলাই করত তাদের শরীর। নিকট আত্মীয়দের দ্বারা আধা-ধর্ষিতা হয়নি, এমন নারী এ সমাজে দুর্লভ। কোনও নারীই মুখ ফুটে এর প্রতিবাদও করেনি, গোপন রেখেছে সারা জীবন।

কিছু ধনী পরিবারে ব্যতিক্রম হলেও দক্ষিণ কলকাতায় নারী-স্বাধীনতা ছিল অনেক বেশি। আমি অনেকগুলি বছর উত্তর কলকাতায় বাস করলেও ছাত্র বয়স থেকে যাতায়াত করেছি দক্ষিণ কলকাতায়, টিউশানির সূত্রে প্রবেশ অধিকার পেয়েছি অনেক পরিবারের অন্তঃপুরে। উত্তর কলকাতার অধিকাংশ মেয়ের মুখে যেন সব সময় ভীতু ভীতু ভাব, পুরুষদের দিকে স্পষ্ট চোখ মেলে তাকায় না, পারিবারিক শাসন তাদের মাথায় এমন গেঁথে গেছে, যেন রাস্তায় যে-কোনও সময় বাঘ-সিংহ তাদের খেয়ে ফেলবে। সেই তুলনায় দক্ষিণ কলকাতার মেয়েদের মুখগুলি স্বচ্ছ, ব্যবহার সাবলীল, তারা ছেলেদের চোখে চোখ রেখে কথা বলে। রাস্তায় স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করে। এই জন্যই বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, পৃথিবীর অনেক দেশ ঘোরার অভিজ্ঞতা তাঁর থাকলেও বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদের দেখা যায় গড়িয়াহাটের মোড়ে!

দক্ষিণ কলকাতায় আর একটি অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। কে যেন বলেছিলেন যে বিদ্যাসাগর মশাই নারীশিক্ষার প্রচলন করেছিলেন, কিন্তু তার ফল হল এই, এখনকার মেয়েদের সব ইস্কুল-কলেজই অফিসারদের বউ বানাবার কারখানা। কথাটা মর্মে মর্মে সত্যি। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত মহিলাই সমাজজীবনে কোনও রকম অংশগ্রহণ করেন না। দক্ষিণ কলকাতায় অনেক বিদূষী মহিলাকে দেখেছি, বিয়ের পর ছেলেমেয়েদের পরিচর্যা ও স্বামীর আন্ডার গারমেন্ট ও মোজা যথা সময়ে এগিয়ে দেওয়া ও পার্টিতে যাওয়া ছাড়া তাঁদের নিজস্ব কোনও পরিচয় নেই। এককালের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞানের নাম করা ছাত্রী হয়েও সে বিদ্যার কোনও প্রয়োগ হয় না বাকি জীবনে। অনেকের পড়াশুনোর অভ্যেসও চুকেবুকে গেছে। বড় বড় অফিসার কিংবা ব্যবসায়ীদের স্ত্রীদের কোনও চাকরি, এমনকী শিক্ষা-পেশা নেওয়ারও আগ্রহ দেখা যেত না, সেটা ঠিক সম্মানের ছিল না। এখন অবশ্য সে অবস্থা বদলেছে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মেধাবী পুরুষের দল পশ্চিম গোলার্ধে পাড়ি দিতে শুরু করে। প্রথম দিকে তারা কেউ কেউ মেম বিয়ে করে ফেলত, এখন তারা স্বদেশ থেকে বাছাই করা রূপসী ও বিদুষী বাঙালি মেয়েদের হরণ করে আনে। বিদেশে এসে সেই সব রমণীকুল চাকরি নিতে বাধ্য হয়। কত রকমের যে চাকরি!

অপর্ণা উত্তর কলকাতার মেয়ে হলেও, সে নিছক প্রথার অনুগামিনী ছিল না, বরং খানিকটা

প্রতিবাদী। তখনও নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয়নি বটে, কিন্তু তার মধ্যে ওই চিন্তার বীজ ছিল। অবশ্য প্রেমেও বিশ্বাস ছিল খুব। সে প্রচুর কবিতা পড়ত এবং তার মন ছিল মূলত রোমান্টিক। বিয়ের চিন্তা করত না, তার বাসনা আরও অনেক পড়াশুনো করে অধ্যাপিকা হবে। তাদের বৃহৎ ক্ষয়িষ্ণু বনেদি পরিবারে শাসনব্যবস্থা শিথিল, কেউ যেন কারওকে নিয়ে মাথা ঘামায় না।

শাসন না থাকলেও কিছু সামাজিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করা সহজ নয়। কোনও পুরুষ যখন তখন সে বাড়ির কোনও মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারে না। তিন মহলা বাড়ি, সবাই থাকে ওপরে, একতলা খালি, সেখানে গিয়ে কাজের লোকদের বলতে হয় খবর দিতে। ও-বাড়ির কাজের লোকেরা কর্তাবাবু কিংবা দাদাবাবুদের খবর দিতে অভ্যস্ত, কোনও দিদিমণিকে ডেকে দাও বললে তারা বিচিত্র চোখে তাকাবে, তারপর সেই যে অদৃশ্য হয়ে যাবে, আর ফিরবে না। আমি অবশ্য সে রকম চেষ্টাও কখনও করিনি, যেতাম বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে, বিকেলে। অপর্ণার সঙ্গে আমার সব রকম ভাব বিনিময় হত গোপনে হস্তান্তরিত চিঠিতে।

আমি যখন বেকার অবস্থায় ঘোরাঘুরি করছি, অপর্ণা তখন প্রস্তুত হচ্ছে বি এসসি পরীক্ষা দেবার জন্য। আগে তবু তার কলেজে যাবার পথে কিংবা গানের ইস্কুলের সামনে চকিতে দেখা হত, এখন কলেজ নেই, গানের ইস্কুলেও যায় না। আমি কল্পনায় দেখতে পাই, তাদের বিডন স্ট্রিটের প্রকাণ্ড বাড়িটার একতলার একটি ঘরে অপর্ণা ফিজিক্সের অঙ্ক কষছে, তার কলম ধরা আঙুলে কালি লেগেছে, মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ছেয়ে আছে পিঠ। কী পোশাক পড়ে আছে সে? দিনের পর দিন দেখা না হলে শুধু বুক নয়, তলপেটেও ব্যথা হয়। ওদের বাড়ির সদর দরজা সব সময় খোলা থাকে। বাইরে বসে ঝিমোয় এক বুড়ো দারোয়ান, সে আমাকে চেনে, আমি ভেতরে যেতে চইলে বাধা দেবে না। একতলার ঘর, তাই চাকরবাকরদের সাহায্য নিতে হবে না, আমি যদি দুপুরবেলা তার ঘরে গিয়ে অন্তত দশ মিনিট কথা বলে আসি, তাতে পৃথিবীর কী এমন ক্ষতি হয়! জানি, ও-বাড়ির কাকা-দাদারা আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে দুর্ব্যবহার করবে না, কেউ হয়তো দেখতেও পাবে না, তবু, তবু আমার যাওয়া হয় না। আমি যদি সপ্রতিভ, সাহসী যুবক হতাম, তা হলে অনায়াসে অপর্ণার পড়ার ঘরে ঢুকে পড়া যেত, কিন্তু আমি যে সেরকম নই, দুর্মর লজ্জা বা সঙ্কোচ কাটাতে পারি না, কেউ যদি দেখে ফেলে সামান্য ভ্রূকুটিও করে তা সহ্য করতে পারব না।

এমনিই বিডন স্ট্রিটে অপর্ণাদের বাড়ির সামনে দিয়ে একবার হেঁটে যাই প্রতি দুপুরে, যেন চুম্বকের টানে। আগের রাতে লেখা কবিতাটা তাকে দেখাতে ইচ্ছে হয়। একদিন লক্ষ করলাম, তাদের বাড়ির পাশে একটা সরু গলি আছে, সেদিকে দুটি জানলার মধ্যে একটি বন্ধ, একটি খোলা। চুপি চুপি সেই জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘরের মধ্যে কয়েকটা বড় বড় আলমারি, অনেকগুলি চেয়ার ও দুটো টেবিল, তার মধ্যে দূরবর্তী টেবিলটার সঙ্গের চেয়ারে বসে আছে অপর্ণা, এদিকে পিঠ ফেরানো। আমি সেদিকে ভিখারির মতন, তৃষ্ণার্তের মতন তাকিয়ে রইলাম নিঃশব্দে। শুধু একটা পিঠ, শাড়ি খসে পড়া, গোলাপি রঙের ব্লাউজে অনেকখানি ঢাকা পিঠ, দুই কাঁধ ও মাথার পেছনটা, তাতেঁ এতই মায়া, এতই টান।

প্রথম দিন কথা না বলেই ফিরে এসেছি, দ্বিতীয় দিন নাম ধরে ডাকলে অপর্ণা দূরের চেয়ারে বসেই কথা বলেছে, তৃতীয় দিনে আমার অনেক কাকুতি-মিনতিতে একবার উঠে এসেছে জানলার কাছে। চিঠির ভাষা ও স্পর্শের ভাষার মধ্যে কোনটা কার চোখে বেশি জোরালো তা বলা কঠিন, তবে দ্বিতীয়টি বাদ দিলে প্রথমটা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায়। শুধু হাতে হাত ধরা, সান্নিধ্যের সুগন্ধ, মাঝখানে জানলার গরাদ, খুবই কাটছাঁট করা রোমিও-জুলিয়েটের দিশি সংস্করণ বলা যেতে পারে।

পঞ্চম দিনে হঠাৎ পেছনে দেখি কয়েকটি কালো ছায়া। গোটা চারেক ছেলে কোমরে হাত দিয়ে আমাকে ঘিরে দাড়িয়েছে, তাদের একজনের গলায় রুমাল বাঁধা। আমার বুক কেঁপে উঠল, চোখের

ইঙ্গিতে অপর্ণাকে জানলা বন্ধ করে দিতে বলে আমি সরে এলাম সেখান থেকে। আমার প্রধান চিন্তা হল, ওরা আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করুক, অপর্ণার বাড়ির লোক যেন কিছু জানতে না পারে!

গলায় রুমাল বাঁধা ছেলেটি আমার চুলের মুঠি চেপে ধরে প্রাকৃত ভাষায় যা বলল, তার একটাই অর্থ, বে-পাড়ার কোনও ছেলের এ পাড়ার কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা তারা সহ্য করবে না। আমার প্রধান আযোগ্যতা আমি বে-পাড়ার ছেলে। ওরা পাড়ার সব মেয়ের সনিযুক্ত অভিভাবক। আমি বীরপুরুষ নই। চারজন পাড়ার মাস্তানের সঙ্গে যুঝে যাবার সাহসও আমার নেই। বিনা প্রতিবাদে মার খেলাম; একটাও শব্দ উচ্চারণ করিনি বলে অল্প সময়ের মধ্যে দু'চারটে লাথি-চড় মেরে ছেড়ে দিল। ঘন দুপুর, রাস্তায় বেশি লোক নেই, অপর্ণাদের বাড়ির ওপরের জানলায় কেউ দাঁড়ায়নি, টের পাইনি কেউ।

জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারদের সীমানা নির্ধারিত থাকে। বাঘ-সিংহরা নিজস্ব সীমানা অতিক্রম করে না। শহরের কুকুরাও কারওকে তাড়া করে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থেমে যায় এক জায়গায়। যেন ঠিক তার পরেই অন্য পাড়ার কুকুরদের এলাকা। মানুষের মধ্যেও এরকম গণ্ডি রয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে।

সেই পাড়ার মাস্তানরা আমার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি, বরং উপকারই করেছে। এ ধরনের শারীরিক অপমান ছাড়াও নানান ধরনের অপমান তো প্রায়ই সহ্য করতে হয়। সামনা সামনি যে-গুলির উত্তর দেওয়া যায় না, সেগুলির জন্য ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ জমা হয়, সেই ক্ষোভ থেকে জমাট বাধে বাষ্প, যেমন মেঘ, যেমন ধারাবর্ষণ, সেই রকমই, অপমান ও ক্ষোভের থেকে কান্নাকাটি নয়, তার মুক্তি হয় শব্দ ও ধ্বনিতে। সেই রাত্রেই আমি লিখেছিলাম একটা প্রতিশোধের কবিতা, 'মহারাজ, আমি তোমার', তাতে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই, আছে অন্য রকম ভাষা ব্যবহার, ওই মাস্তানদের গালাগালিকে আমি অর্থহীন শব্দে রূপান্তরিত করেছিলাম।

বাড়িতে আমার নিজস্ব ঘর নেই, দিনের বেলা কবিতা লেখা যায় না, এক ঘরে ভাই-বোনরা ও ছোট কাকা লেখাপড়া করে, আমি অন্য লোকজন থাকলেও কিংবা নানা কলরবের মধ্যেও গদ্য লিখে যেতে পারি, কিন্তু কবিতা লেখার সময় নিস্তব্ধতা ছাড়া আর কারওর সঙ্গ সহ্য করতে পারি না। সুতরাং কবিতার খাতা খুলে বসি সকলে ঘুমিয়ে পড়ার পর। তখন স্তব্ধ নগরী, শুধু মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে রাস্তার কুকুর, আর সামনের বাড়ির ছাদে প্রায়ই একটা পেঁচা এসে বসে। চরকা ঘোরানোর শব্দের মতন সে খ্যা-র-র খ্যা-র-র করে ডাকে। এক এক রাত্রির তৃতীয় প্রহরে বাবা জেগে উঠে বাথরুমে যাবার পথে আমার ঘরে আলো জ্বালা দেখে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বলেন, পরীক্ষার আগে তো কোনও দিন এত রাত জেগে লেখাপড়া করতে দেখিনি!

কবিতা লিখে যে কিছুই পাওয়া যায় না, তা তো সবাই জানি। অর্থ, খ্যাতি, কীর্তি, কোনও কিছুই পাবার সম্ভাবনা নেই, তবু রাত জেগে কেন এই আয়ুক্ষয় তার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। এ এক সাঙ্ঘাতিক গুপ্ত নেশা, সেইজন্যই অনেকে কৈশোর-যৌবনে দু'চার বছর কবিতা লেখার হাত মকসো করে, তারপর লেখালেখি ফেলে বহুদূরে সরে যায়।

আমার বেকারত্বের তৃতীয় বছরে অবস্থাটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগল। বেকার মানে আমি অকর্মণ্য তো নই, সকাল সন্ধ্যায় তিনটে টিউশানি করি, লেখালেখি ও একটি পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও ব্যস্ত, তবু যে দশ-পাঁচটায় কোথাও নিযুক্ত নই, সেটাই যেন উপহাসের বিষয়। অনেকে জেনেশুনেও জিজ্ঞেস করে, কীরে, এখনও কোনও চাকরি পেলি না? আমি একজন সুস্থ-সমর্থ যুবক, মোটামুটি শিক্ষিত, তবু আমার স্বাধীন দেশ যে আমাকে কোনও কাজ দিতে পারছে না, সেটা কি আমার দোষ? আমার চেষ্টার তো কোনও ত্রুটি নেই।

বেকার অবস্থার সবচেয়ে খারাপ দিক, আস্তে আস্তে হীনম্মন্যতা জন্মে যায়। বেকাররা মনে করতে থাকে, তারা অপদার্থ, তাদের দ্বারা কোনও কাজই হবে না, তারা সমাজের বোঝা। এই হীনম্মন্যতা কাটাবার জন্যই কেউ কেউ চুরি, ডাকাতি, জালিয়াতির মধ্যে ঢুকে পড়ে, রাজনৈতিক

দলের পোষা গুণ্ডা হয়।

এর মধ্যে অবশ্য আমি আর একটি লোভনীয় কাজের সুযোগ পেয়েও হারিয়েছি নিজের দোষে। আমার বন্ধু আশু নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানির অফিসার্স ট্রেনি হিসেবে যোগ দিয়েছিল, সেখানে সে আমাকেও একটা ব্যবস্থা করে দিল। তখনও জীবন বিমা জাতীয়করণ হয়নি, সবই প্রাইভেট কোম্পানি, তার মধ্যে নিউ ইন্ডিয়া বেশ নামজাদা। এই ট্রেনিং সম্পূর্ণ করলে উচ্চ বেতনে নিযুক্ত করা হবে। ভারতের যে-কোনও প্রান্তে পাঠাবে। এমনকী বিদেশেও যাবার সম্ভাবনা আছে। ট্রেনিং-এর সময়ও এরা ভালো টাকা দেবে।

বেহালার কাছে একটি বাগানওয়ালা বড় বাড়িতে এই কোম্পানির ট্রেনিং সেন্টার। একদিন বাক্স-বিছানা নিয়ে উপস্থিত হলাম সেখানে। মোট দু' মাসের প্রশিক্ষণ, তার মধ্যে সতেরো দিনের বেশি কোনওক্রমেই আমার পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব হয়নি। ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে পি টি অর্থাৎ সারিবদ্ধভাবে ব্যায়াম, তারপর ছুরি-কাঁটা ধরে ব্রেক ফাস্ট, তারপর ক্লাস, মধ্যে একবার লাঞ্চ, আবার ক্লাস, আবার ক্লাস। সারাক্ষণ প্যান্ট-শার্টের সঙ্গে জুতো মোজা পরে থাকতে হবে, এবং গলায় টাই (আশু আমাকে একটাই ধার দিয়েছিল) এবং সর্বক্ষণ ইংরিজি বলতে হবে, এমনকী পাশের বন্ধুর সঙ্গে ফিসফিস করেও বাংলা কথা চলবে না, এমন নির্দেশ ছিল। এ সব তবু যদিও বা মান্য করা যায়, কিন্তু ক্লাসের পর ক্লাসে শুধু টাকাপয়সার কথা, লাইফ টার্ম আর এনডাউমেন্ট, অ্যাকসিডেন্ট বেনিফিট, যার বয়স পঁচিশ তার পনেরো হাজার টাকার কুড়ি বছরের এনডাউমেন্টে কত সুদ, অ্যাকচুয়ারিরা কী পদ্ধতিতে মানুষের আয়ুর গড় করে, এসব শুনতে শুনতে আমার মাথা খারাপ হবার জোগাড়। দু'সপ্তাহেই বুঝে গেলাম যে এ অফিসার হবার মতন প্রতিভা আমার নেই। বোধহয় ট্রেনিং-এর মধ্যপথে ছাড়া চলবে না, এরকম একটা শর্ত ছিল, আমি পেছনের বাথরুমের দরজা দিয়ে, বাক্স-বিছানা মাথায় নিয়ে বাগানের মধ্য দিয়ে দৌড়ে পালালাম এক শেষ রাতে, আশুকেও না জানিয়ে। বাড়িতে পৌঁছবার পর আমাকে দেখে নিশ্চয়ই সকলের মনে পড়েছিল পাগলা দাসুর কথা। আবার সে এসেছে ফিরিয়া!

হাবড়ায় বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের চাকরি চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার কোনও ভূমিকা ছিল না, সে প্রকল্পটাই মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। বেহালার চাকরিটা রাখতে পারিনি নিজের দোষে। সবাই তো সব কিছু পারে না!

আমার জ্যাঠামশাই উদ্বাস্তু হয়ে এসে অনেক কষ্ট করার পর কোনওক্রমে একটি চাকরি জুটিয়েছিলেন মার্টিন অ্যান্ড বার্ন কোম্পানিতে। তিনি জানালেন, তাঁর এক সহকর্মী কিছু কিছু নতুন ছেলেকে চাকরিতে ঢোকাচ্ছে। সেই ব্যক্তিকে খুশি করতে পারলেই আমার চাকরি হয়ে যাবে। বাবা যেন আশার আলো দেখতে পেলেন। এক রবিবার সন্ধেবেলায় বাবা ও জ্যাঠার সঙ্গে সুবোধ বালকের মতন আমি বেলেঘাটায় গেলাম সেই ব্যক্তিটির বাড়িতে। মানুষের কতরকম পরিচয় থাকে, প্রেমিকার চোখে আমি উদীয়মান কবি, কফি হাউসের বন্ধুদের কাছে কড়া সম্পাদক, প্রেসের মালিকের কাছে চতুর প্রতারক আর এখন আমি ভিজে বেড়াল বেকার সেজে যাচ্ছি গুরুজনদের সঙ্গে।

অন্ধকার অন্ধকার সরু গলি, বেলেঘাটা তখন ঠিক শহরের অন্তর্গত ছিল না, শহরতলী, প্রকৃত শহরবাসীদের কাছে বেশ একটা ভয়ের জায়গা, দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় বেলেঘাটায় অনেক বীভৎস খুনোখুনির কাহিনী শোনা গেছে। কেউ কেউ বলত, বাপের ব্যাটা বেলিয়াঘাটা। এখানকার বস্তিতে অনেক নামকরা গুণ্ডা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘাপটি মেরে থাকে। আমরা যার কাছে গেলাম, সে খুনী বা গুণ্ডা নয়, তাদের চেয়েও অনেক নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ, কথা বলে ঠাণ্ডা গলায়। সিড়িঙ্গে চেহারা, খালি গা। জ্যাঠামশাই বিগলিতভাবে লোকটির নানারকম তোষামোদ করতে করতে, আমাদের পারিবারিক অবস্থার কথা জানিয়ে, তার হাত চেপে ধরে বললেন, অমুকবাবু, আপনাকে এর একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতেই হবে, আপনি দয়া করলে

ঠিকই পারবেন। লোকটি জ্যাঠামশাইয়ের ওসব কথায় কানই দিল না, আমার আপাদমস্তক এমনভাবে চোখ বুলোতে লাগল, যেন হাটে গিয়ে গোরু-ছাগলের স্বাস্থ্য দেখছে। তারপর আমাকে সংক্ষিপ্ত দুটি প্রশ্ন করলেন। আমি রাজনীতি করি কি না, এবং আমি বার্নপুরে যেতে রাজি আছি কি না। আমি সজোরে মাথা নেড়ে প্রথমটিতে না এবং দ্বিতীয়টিতে হ্যাঁ জানালাম। লোকটি এবার বাবা-জ্যাঠার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে হয়ে যাবে। সামনের মাসেই পয়লা তারিখে জয়েন করুক। মাইনে আপাতত সব মিলিয়ে দেড়শো।

আমার বুকটা ধক করে উঠল, ঝলমলিয়ে উঠল বাবা-জ্যাঠার মুখ। কয়েক মুহূর্তের জন্য মাত্র, এর পরেই লোকটি জানাল যে আঠারো শো টাকা সেলামি দিতে হবে, টাকা জোগাড় করে আনলেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওয়া যাবে।

এক সঙ্গে আঠারো শো টাকা মানে অনেক টাকা! আমাদের বাড়ি ভাড়া তখন পঁয়তাল্লিশ টাকা, ভালো ইলিশ মাছের সের তিন টাকা, সিনেমার টিকিট আট আনা, এক টাকায় ষোলোটি রসগোল্লা ও একটি ফাউ। জ্যাঠামশাই হতাশভাবে বিড়বিড় করতে লাগলেন, এক বছরের মাইনে! লোকটি তখন খানিকটা দয়া দেখাবার ভঙ্গিতে বললেন, ঠিক আছে ন'শো টাকা নগদ দিয়ে যান, তারপর এক বছর প্রতি মাসে মাইনে পেলে আমাকে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে যাবেন। কথার খেলাপ করবেন না তো?

জ্যাঠামশাই জিভ কেটে বললেন, ছি ছি, কী যে বলেন, আমরা ব্রাহ্মণ, আমরা না খেয়ে মরে গেলেও সত্য রক্ষা করি।

এর উত্তরে লোকটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন যে, আজকাল অনেক বামুনের ছেলেও অফিসের পিওন কিংবা জুতোর দোকানের কর্মচারী হয়। কথার খেলাপ করলে কীভাবে ছ'মাসের মধ্যে চাকরি খেয়ে নিতে হয় তাও তিনি জানেন।

ন'শো টাকা জোগাড় করার জন্য বাবা এক মাসের সময় চাইলেন।

বাইরে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাবা ও জ্যাঠা কী ভাবে ন'শো টাকা জোগাড় করা যায়, কার কাছে ধার পাওয়া যেতে পারে, এই সব আলোচনা করতে লাগলেন নিচু গলায়। আমি কোনও দিন বাবার মুখের ওপর কথা বলার সাহস পাই না, কিন্তু এমনই গা জ্বলছিল যে বেশ উঁচু গলায় বলে উঠলাম, বাবা, এ চাকরি আমি করতে চাই না।

এই প্রথম বাবা আমার কথা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিলেন। ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, ঠিকই বলেছিস, এরকম চশমখোরের কাছে চাকরি নেওয়া যায় না।

অত্যাশ্চর্য ব্যাপার এই যে, এর কিছুদিন পর, একই সঙ্গে ডাকযোগে আমি দুটি চাকরির নিয়োগপত্র পেয়ে গেলাম। কয়েক বছর ধরে যে প্রচুর পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ দিয়েছি, তারই অপ্রত্যাশিত সুফল। দুটিই একই রকমের চাকরি, সমান মাইনে, একটি হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ডে, অন্যটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দফতরে। এর মধ্যে কোনটি নেওয়া যায় তা নিয়ে বাবা অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন, আমাদের দমদমের দাদু, যিনি আত্মীয়গোষ্ঠীর প্রধান, তিনি পরামর্শ দিলেন, সরকারি চাকরিটিই নেওয়া উচিত, কারণ সরকারের চাকরি হচ্ছে লক্ষ্মী, একবার পেলে সারাজীবনের জন্য নিশ্চিন্ত, চাকরি যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই আর ধাপে ধাপে কিছু উন্নতি হবেই।

মৌলালির মোড়ের কাছে কয়েকটি বিশাল আকারের গুদাম আছে, তার অফিসের নাম সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স, সংক্ষেপে সি এম এস, এর কাজ ওষুধ কোম্পানিগুলির কাছ থেকে টেন্ডার ডেকে এক সঙ্গে অনেক ওষুধ কেনা, তারপর সেই ওষুধ রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে, অনাথ আশ্রমে, জেলখানায় নিয়মিত জোগান দেওয়া। সেই অফিসে আমি যোগ দিলাম কনিষ্ঠ কেরানি হিসেবে। যতই সাধারণ চাকরি হোক, তবু কারওকে ধরাধরি করে কিংবা ঘুষ দিয়ে পেতে হয়নি। এইটুকু শ্লাঘা অন্তত বোধ করা যায়। এবং সেই সরকারি চাকরিও আমি এক সময়ে ছেড়ে দিয়েছি স্বেচ্ছায়।

আঠাশ

পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় শীত ঋতুর প্রধান আকর্ষণ ছিল ক্রিকেট খেলা ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর। কোনওটাই গরিব লোকদের জন্য নয়, অথচ গরিবেরও তো ঘোড়া রোগ হয়।

ফুটবল খেলা নিয়েও উত্তেজনা ছিল প্রচুর, কিন্তু ওই খেলা আমাকে কখনও তেমন আকৃষ্ট করেনি। ইস্কুলে পড়ার সময় ফুটবল টিমে কখনও কখনও দ্বাদশ ব্যক্তি হয়েছি, তা শুধু ছুটি পাবার জন্য। ময়দানে মহারথীদের ফুটবল খেলা দেখতে গেছি কয়েকবার মাত্র। ক্রিকেট আর ফুটবলের দর্শক একেবারে আলাদা, ফুটবল খেলা গরিব লোকরাও দেখতে যেতে পারে ছ' আনার টিকেট কিনে এবং ইচ্ছেমতো গালাগাল করা যায়। এমনকী টিকিট না কিনেও ফুটবল খেলা দেখা যায়, মাঠের বাইরে উঁচু র‍্যামপার্টে দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ পেরিস্কোপও বানিয়ে নিত ভাঙা আয়না দিয়ে।

আমি ফুটবল মাঠে গিয়ে স্বস্তি বোধ করিনি অশ্রাব্য-কুশ্রাব্য গালাগালির জন্য। শব্দ ব্যাপারে আমার এমন স্পর্শকাতরতা ছিল যে খারাপ ভাষা একেবারে সহ্য করতে পারতাম না। যদিও আমি কোনও শব্দেরই শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিচার করি না, অপছন্দ করি অপপ্রয়োগ। অকারণ খিস্তি-খেউড় আমার গায়ে যেন বেঁধে। গল্প-উপন্যাসে, বাস্তবতার খাতিরে আমি কোনও-কোনও চরিত্রের সংলাপে এরকম কিছু শব্দ বসিয়েছি কখনও, কিন্তু নিজের মুখে শালা পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারি না। হয়তো এটা আমার দুর্বলতা।

ফুটবলের ভক্তরা সব মার্কামারা। আমার পূর্ব বাংলায় জন্ম, সুতরাং আমাকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থক হতেই হবে। মুসলমান হলেই মহামেডান ক্লাবের পক্ষে, আর মোহনবাগানের সমর্থকরা সব ঘটি। মোহনবাগানের কাছে ইস্টবেঙ্গল তিন গোলে হেরেছে, রাস্তায় চেনাশুনো লোকেরা সেদিন আমাকে দেখেই বলেন, কীরে, দিলুম তো তোদের...হজম করতে পারবি তো...। অথচ আমি সেদিনের খেলার খবরই রাখি না। ইস্টবেঙ্গল হারলে আমার মন খারাপ হবেই, সবাই ধরে নেয়। পরবর্তীকালে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও দিব্যেন্দু পালিতের মধ্যে খেলা সম্পর্কে যেরকম আগ্রহ ও উত্তেজনা দেখেছি, আমার সেরকম ছিল না কোনওদিন। খেলা দেখতে যাই না, কিন্তু খেলা সম্পর্কিত লেখা পড়তে ভালো লাগে। সে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে মতি নন্দী।

ফুটবলই আসল উত্তেজনার খেলা, সে তুলনায় পাঁচ দিনের ক্রিকেট টেস্ট প্রায় স্পন্দনহীন। ক্রিকেট মাঠের পরিবেশটাই ছিল আকর্ষণীয়, সেখানে সবাই সেজেগুজে যায়, সঙ্গে ওয়াটার বটল ও টিফিন ক্যারিয়ার, মেয়েরা নিয়ে যায় উলবোনার সরঞ্জাম ও সানগ্লাস, কেউ চেঁচিয়ে কথা বলে না, এক ঘণ্টা ধরে একটাও রান হচ্ছে না, কিন্তু মুস্তাক আলির লেট কাটের বাহার দেখে হাততালি দিতে হয়।

ক্রিকেট টিকিটের দাম বেশি, আমার সাধ্যের বাইরে। টিকিট দুর্লভও বটে, ক্ষমতাশালী ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায় আগেই। ক্রিকেটের মাঠে কে যাচ্ছে আর কে যাচ্ছে না, তাতেই নির্ণয় হয় সামাজিক অবস্থানের তারতম্য। আমাদের মধ্যে বুঢ্ঢাই সবচেয়ে বিত্তশালী পরিবারের ছেলে, তার তো টিকিট থাকবেই, কিন্তু এমনই তার বন্ধুপ্রীতি, পাঁচদিনের মধ্যে দিন দু'-এক সে আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিত মাঠে। শুধু টিকিট নয়, সঙ্গে কেক-পেস্ট্রির বাক্স ও ওয়াটার বটলে জলের সঙ্গে জিনের ভেজাল। আমি লেটকাট, গ্লান্স ও কভারড্রাইভের মর্ম

বুঝতাম না, অন্যদের দেখাদেখি হাততালি দিতাম। ডন ব্র্যাডম্যানকে স্বচক্ষে দেখিনি, তবে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে গারফিল্ড সোবার্সের সাবলীল খেলা। আমার মতে, তিনিই ক্রিকেট দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ। একবার প্লেনের গোলমালে তিনি পৌঁছলেন একেবারে খেলার দিন সকালে, এয়ারপোর্ট থেকে সোজা ইডেন গার্ডেনে, সামান্যতম ক্লান্তির চিহ্ন নেই, হাসতে হাসতে পঁচাত্তর রান করলেন, উইকেট নিলেন পাঁচটা।

ক্রিকেট মাঠের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ সুন্দরী রমণীদের দেখা। সেজন্য চোখ অধিকাংশ সময় সামনের দিকে নয়, এদিক-ওদিক ঘোরে। একবার আমার অদূরবর্তী এক রমণী রোদ-চশমায় চোখ ঢেকেছিলেন সর্বক্ষণ, অকস্মাৎ সেটা খুললেন, তাতেই আমার হৃৎস্পন্দন অনেক দ্রুত হল, যেন কোনও নিষিদ্ধ সৌন্দর্য দৈবাৎ দেখে ফেললাম! যেন আগাগোড়া কালো বোরখায় ঢাকা কোনও ইরানি রমণীর গোলাপের পাপড়ির মতন ওষ্ঠাধর হঠাৎ দেখার রোমাঞ্চ। ঘটনাটির উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, এই রকমই ছিল আমাদের তৎকালীন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সুখ।

সারা শীতকাল জুড়ে অনেকগুলি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জলসা হত, তার অধিকাংশই উত্তর কলকাতায়। উত্তরেই বনেদি বড়লোকদের বাস, দক্ষিণে বসতি স্থাপন করছে নব্য ধনীরা। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাবু কালচারের কিছুটা রেশ পরের শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিল। সেইসব বনেদি বাবুদের আর যত দোষই থাক, তাঁদের অনেকে ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক। বাঙালিদের মধ্যে বড় খেলোয়াড় বিশেষ জন্মায় না। কিন্তু বাঙালিরা খেলাপাগল। সেরকমই, রবিশঙ্কর-আলি আকবরের আগে সর্বভারতীয় মার্গসঙ্গীতের জগতে বাঙালি শিল্পী তেমন ছিল না। কিন্তু সমঝদার হিসেবে বাঙালিদের সুনাম ছিল। অনেক পরে ওস্তাদ আমির খানের কাছে শুনেছি, তাঁদের আমলে কলকাতার শ্রোতাদের কাছে সমাদর না পেলে সর্বভারতীয় সুনাম অর্জন করা যেত না। যেজন্য তিনি প্রথম যৌবনে কারও আহ্বান ছাড়াই ইন্দোর থেকে চলে এসেছিলেন কলকাতায়, ধনী পরিবারের দরজায় দরজায় ঘুরেছেন সুযোগ পাবার জন্য, রাত কাটিয়েছেন বাইজিপল্লীর এক দারোয়ানের খাটিয়ায় ফুটপাতে শুয়ে।

আমার সঙ্গীতরুচি একটু বিচিত্রই বলতে হবে। খুব ভালোবাসি পল্লীগীতি এবং উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, মাঝখানের গানগুলি সম্পর্কে তেমন প্রাণের টান নেই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা আলাদা, তা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রধানত ভাষার মাধুর্যে। শ্যামপুকুরের মিত্র-বাড়িতে টিউশানি করতাম, সেই সূত্রে ওদের আত্মীয়, পাথুরেঘাটার বিখ্যাত ঘোষদের প্রাসাদে, ঘরোয়া আসরে ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলির গান সামনাসামনি বসে শুনেছি কয়েকবার। আমার যদি কোনও উপাস্য দেবতা থাকত, তা হলে বড়ে গুলাম আলিকে সেই আসনে বসাতাম।

উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের জলসার টিকিটের দামও বড় বেশি। আমরা রঙ্গালয়ের সামনের রাস্তায় খবরের কাগজ পেতে, গায়ে কম্বল জড়িয়ে সারারাত জেগে গান শুনতাম দল বেঁধে, একজন কেউ ঘুমিয়ে পড়লে অন্যরা তার কানে কু দিত। সেই সময় জনতার দাবিতে বাইরে মাইক দেওয়া হত, অর্থাৎ রঙ্গালয়ের মধ্যে যদি শ্রোতার সংখ্যা হয় হাজারখানেক, বাইরের শ্রোতা হাজার হাজার।

বাইরে বসে কিছুটা শীতের কষ্ট হলেও গান-বাজনা শোনার কোনও অসুবিধে নেই, শুধু বিস্বাদ লাগত নাচের সময়। নাচ তো দেখার জিনিস, শোনার নয়। ভেতরে লাস্যময়ী রোশনকুমারীর দুর্দান্ত নাচের সঙ্গে তবলায় লড়ে যাচ্ছেন শামতাপ্রসাদ, বাইরে বসে শুধু রুমু ঝুমু আর চটাং পটাং শব্দ শুনে তার কতটুকু উপভোগ করা যায়?

টিকিট কেনার ক্ষমতা ছিল বুদ্ঢার, প্রত্যেক জলসায়ই একখানা টিকিট থাকত তার, কিন্তু গান শুনত আমাদের সঙ্গে ফুটপাতে বসে। তার টিকিটে আমরা পালা করে এক একজন ভেতরে

গিয়ে দেখে আসতাম শিল্পীদের সশরীরে। বড়ে গুলাম আলির মুখের এক দিকে একটা আলুর মতন বড় আঁব ছিল, এক বছর দেখলাম, সেটা অপারেশন করিয়ে গোল মুখ নিয়ে এসেছেন। হীরাবাঈ বরোদেকর প্রত্যেক বছর বেহাগ গাইবেনই। এবং সে গানের সময় তাঁর আগাগোড়া চোখ বোজা থাকে। বাইরে বসে তো আর এসব বোঝা যায় না।

কিন্তু নাচের সময় কে ভেতরে যাবে? বুঢ্ঢার এমনই বন্ধুপ্রীতি, সে সুযোগও সে একা নিতে চায় না। ঠিক হল, লটারি হবে, সেই অনুযায়ী এক একজন পনেরো মিনিট করে ভেতরে ঘুরে আসবে। প্রথম সুযোগ পেল দীপক, মধ্যরাত্রে সেই যে সে টিকিট নিয়ে ঢুকল, বেরোল ভোরবেলা। দীপককে তো কিছু বলবারও উপায় নেই। যতই তাকে বকাঝকা করো, সে শুধু প্রবল হাসতে-হাসতে দুদিকে মাথা দোলাবে।

আমাদের মধ্যে সত্যিকারের গানের গলা ছিল দু'জনের, দীপক ও বুঢ্ঢার। বুঢ্ঢার কণ্ঠস্বর ফৈয়াজ খাঁর ধরনের, সুমিষ্ট নয়, উদাত্ত, যাকে বলে দানাদার। উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে তালিম নিয়ে সে রাগ-রাগিণী গুলে খেয়েছিল, অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক লাইন শুনেই বলে দিত কোন রাগের ওপর ভিত্তি করা। এই গানের জগৎ ছেড়ে সে একসময় চলে গেল আফ্রিকায়। দীপক প্রথাগতভাবে গান শেখেনি, কিন্তু সে ছিল স্বভাবগায়ক। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তার দক্ষতা ছিল না, কিন্তু অন্য বহু ধরনের গান সে একবার-দু'বার শুনেই ধারণ করে নিত কণ্ঠে। প্রচুর রবীন্দ্রসঙ্গীত তো সে জানতই, তা ছাড়াও আই পি টি এ-র অনেক গান, সঙের গান, যাত্রার গান, এসব তার কাছে বারবার শুনে শুনে আমারও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, আমাদের 'হরবোলা'র সঙ্গীতশিক্ষক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বলতেন, দীপক ভবিষ্যতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে জনপ্রিয় হবে। এবং সেটাই হতে পারে তার জীবিকা। দীপক আমেরিকায় গিয়ে তার জীবনটাকেই ঘুরিয়ে দিল অন্য দিকে।

আমি সরকারি অফিসে কাজ পাওয়ার পর প্রথম প্রথম কিছুদিন ঠিক দশটার সময় হাজিরা দিই ও সারাদিন ভক্তিভরে ফাইলপত্রে চোখ ডুবিয়ে রাখি। কয়েক মাসের মধ্যেই হয়ে উঠলাম সহকর্মীদের কাছে উপহাসের পাত্র। একটা লম্বা হলঘরে প্রায় শ'খানেক কেরানির বসবার জায়গা, বেলা এগারোটা পর্যন্ত শতকরা ষাট-পঁয়ষট্টিটি চেয়ারই শূন্য থাকে এবং বিকেল চারটের পর দশ-বারোটির বেশি মুণ্ড দেখা যায় না। একজন সুপারিনটেন্ডেন্ট বসেন সেই কেরানিদের সঙ্গেই, সামনের দিকে ছোট ছোট কয়েকটি খোপে আফিসারদের স্থান। অফিসটি মৌলালির মোড়ে, রাইটার্স বিল্ডিংসে আমাদের সদর দফতর, সেখানে যাবার সুযোগ বা সৌভাগ্য আমার হয়নি কখনও। পাশের সহকর্মীটি একদিন আমাকে বললেন, সারাক্ষণ চেয়ারে বসে থাকেন, আপনার যে পায়ে বাত ধরে যাবে ভাই! এত কী কাজ করেন বলুন তো? কথাটা সত্যি, আমার ওপর যে কাজের বরাদ্দ, তা শেষ করতে বড়জোর মাত্র দু'ঘণ্টা লাগে। সরকারি কর্মচারীরা কাজে ফাঁকি দেয় বলে যে বদনাম আছে, তার মূল কারণ আমি বুঝে গেলাম কয়েক মাসের মধ্যে। এঁরা কাজে ফাঁকি দেন না, এঁদের কাজই কম, সাত ঘণ্টা পরিশ্রমের উপযুক্ত কাজই নেই, তাই অধিকাংশ সময় এঁরা নিজের চেয়ার ছেড়ে অন্যত্র ঘোরাঘুরি করেন। কাজ কম থাকলেই কাজে আলস্য আসে বেশি, এক সপ্তাহের কাজ ইচ্ছে করলে একদিনেই শেষ করে ফেলা যায় বলে, কেউ কেউ চার-পাঁচদিন ফাইলে হাতই ছোঁয়ান না। মাত্র পাঁচ-সাতজন বিকেল পাঁচটার পরেও বাড়ি যেতে চান না, তাঁদের আকর্ষণ অন্য। তাও বুঝেছি অনেক পরে।

একজন সহকর্মীর কথা বিশেষভাবে মনে আছে। ছিপছিপে চেহারা, মাথার চুল কাঁচা-পাকা, মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ, কিন্তু হাসি মাখা। প্রথম প্রথম তাঁর নামটাই বুঝতে পারতাম না, অন্যরা তাঁকে রণকালী সাহেব বলে ডাকতেন। রণকালী কী করে পুরুষের নাম হয়, আবার তার সঙ্গে সাহেব? যথাসময়ে জানা গেল, তাঁর প্রকৃত নাম রওনক আলি, বেলা এগারোটা আন্দাজ অফিসে এসে চেয়ারে কোটটা ঝুলিয়ে একটু পরেই বেরিয়ে যান, ফেরেন বিকেল চারটের দিকে। অন্য

সহকর্মীদের কাছে জানা গেল, ইনি দুপুরে চার ঘণ্টা বড়বাজারের একটি দোকানে পার্ট টাইম অ্যাকাউনট্যান্টের কাজ করেন। একদিন রওনক আলি আমাকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আমি তো মাইনরিটি কমিউনিটি, তাই আমাকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করে না! মানুষটি ভারী রসিক। কোটের পকেটে পানের ডিবে থাকে, তার থেকে অন্যদের অকাতরে পানের খিলি বিতরণ করেন এবং কক্ষনও একা চা পান করেন না। চা-ওয়ালা ছোকরা এলেই তিনি আশেপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আর কে কে চা খাবেন? অফিসারদের সম্পর্কে তাঁর ছিল দারুণ তাচ্ছিল্যবোধ, একদিন আমায় বলেছিলেন, অফিসাররা কোন শ্রেণীর মানুষ বলুন তো? রাইটার্স বিল্ডিংসে যান, দেখবেন, পাশাপাশি তিনখানা করে বাথরুম থাকে, তাতে লেখা, মেল, ফিমেল আর অফিসার্স! এটা সত্যি কি না, আমি কখনও মিলিয়ে দেখিনি।

বন্ধুরা মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে। শক্তি কোনও আত্মীয়ের সুবাদে এক সাহেবি নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষানবিস অফিসার হয়েছে, বাড়ি থেকে প্যান্ট-কোট ও টাই পরে বেরোয়। কিন্তু স্যুট-পরা, ইংরিজি-বলা অফিসার হওয়া শক্তির নিয়তিতে নেই, সে কর্মক্ষেত্রে না গিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়, খুব গরমের দুপুরে আমার টেবিলের সামনে বসে থাকে, নানারকম চক্ষুর ইঙ্গিতে আমাকে বেরিয়ে পড়বার জন্য প্ররোচিত করে। তখনও অফিস ফাঁকি দেবার মতন সাহস সঞ্চার করে উঠতে পারিনি, তাই ওকে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলি। একদিন শক্তি অতি দ্রুত পকেট থেকে একটি ছোট্ট বোতল বার করে আমার জলের গেলাসে কিছু মিশিয়ে দিল। আমি আঁতকে উঠলাম, চতুর্দিকে এত সহকর্মীর চোখ, তার মধ্যে অফিসে বসে প্রকাশ্যে মদ্যপান? শক্তি থাকে মামার বাড়িতে, আমার পারিবারিক অবস্থা অনেক খারাপ, এ চাকরি আমাকে রক্ষা করতেই হবে! এরপর শক্তি এলেই তাকে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি, দেড়-দু'ঘণ্টা বাইরে থাকা তবু কম অপরাধ।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তও আসে মাঝে মাঝে, সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের ভালো ছাত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর স্নেহাশ্রিত, গম্ভীরভাবে কথাবার্তার মধ্যে অনেক আভিধানিক শব্দ মিশিয়ে দেয় এবং চা খেতে খেতে প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করে। কবিতা বিষয়ে নতুন কী ভাবছেন? এর উত্তর আমি খুঁজে পাই না। কারণ আমি তো কবিতা বিষয়ে কিছুই ভাবি না, কবিতা লিখি, যা মনে আসে, পাগলের মতন, রাত-জাগা মস্তিষ্কে, কবিতার তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাইনি, সেইজন্যই বোধহয় প্রতিটি কবিতা লিখে ফেলার পরই মনে হত, ঠিক হল না, আবার কাটাকুটি, আবার লেখা, যেন সবটাই অর্থহীন প্রয়াস। ছাপার আগে নিজের লেখা বন্ধুদের শোনাবার ব্যাপারেও আমার সঙ্কোচ ছিল খুবই।

একদিন দীপক এসে বলল, বসব না, সময় নেই, শোনো, আজ সন্ধেবেলা কোনও কাজ রেখো না, টিউশানি থাকলেও যেও না, সাতটার মধ্যে চলে আসবে আমার বাড়িতে। আমি আজ বিয়ে করছি।

তখন লক্ষ করলাম, দীপকের এক হাতের কব্জিতে একটা হলুদ সুতো বাঁধা।

এর থেকেও বেশি চমক আমার জন্য অপেক্ষা করছিল বিবাহ-বাসরে।

স্কটিশ চার্চ কলেজ-আমল থেকেই দীপকের এক বান্ধবী ছিল, তার সঙ্গে প্রকাশ্যে ঘোরাঘুরি করত, যে সৌভাগ্য আমাদের অনেকেরই ছিল না। সে মেয়েটি বড়ই নরম ও মধুর স্বভাবের, এমনই একনিষ্ঠ তার প্রেম যে অন্যদের দিকে ভালো করে তাকাতই না, সে অনেক সময় দীপকের হাতখরচ জোগাত, নিয়মিত বই কিনে উপহার দিত দীপককে।

সন্ধেবেলা গিয়ে দেখি, পাত্রী বদল হয়ে গেছে! শুধু তাই নয়, বধূবেশিনী এই মেয়েটিকে দেখেও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। এই মেয়েটিকে আবার আমাদের আর এক যাদবপুরের কবি-বন্ধুর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বলেই জেনে এসেছি এতদিন। সেই বন্ধুটির সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ে হবে, এটা ছিল যেন অবধারিত ব্যাপার, কয়েকদিন আগেও ওদের দু'জনকে

দেখেছি একসঙ্গে। হঠাৎ দীপক কী করে সব ওলটপালট করে দিল এবং এত তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করতেই বা চাইছে কেন, তা জানতে পারিনি। কিন্তু দীপকের এই কাণ্ডটি সংশ্লিষ্ট চারজন নারী-পুরুষের জীবনেই সুখকর হয়নি। পরবর্তী কয়েক বছরের হতাশা, যন্ত্রণা ও তিক্ততার ইতিহাস আমি লিখতে চাই না।

বিবাহবাসরের আয়োজনটি ছিল অনাড়ম্বর ও সংক্ষিপ্ত। কুড়ি-পঁচিশজন বন্ধু ও নিকট আত্মীয়, পুরুতের বদলে একজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এবং মন্ত্রের বদলে রবীন্দ্রসঙ্গীত। নববধূ ও বরের দুটি গান মনে দাগ কেটে আছে, কারণ তা যেন এই অনুষ্ঠানের ঠিক উপযোগী ছিল না। নববধূটি খুবই ভালো গায়িকা, সে গাইল, 'এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে'—শেষের দিকে তার চোখের কোণে চিকচিক করছিল অশ্রুবিন্দু। আর দীপক গাইল তার প্রিয় 'তাসের দেশ'-এর গান, যাবোই আমি বাণিজ্যেতে যাবোই।

কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকানে আবদ্ধ না থেকে বুঢ়া কাজ নিয়েছিল এয়ার ফ্রান্স নামে বিমান সংস্থায়। অসাধারণ গুণী ও বাকপটু হওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে বুঢ়া অস্বাভাবিক রকমের লাজুক, দীপকের ঠিক বিপরীত, একথা আগেই উল্লেখ করেছি। অফিসে এক সহকর্মিণীর সঙ্গে পরিচয় হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বুঢ়া আমাকে জানাল যে মেয়েটিকে সে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে ফেলেছে।

বিবাহ দু'জন মানুষের নিজস্ব ব্যাপার এবং বুঢ়া যখন কথা দিয়ে ফেলেছে, তখন অন্যদের মতামত জানাবার প্রশ্নই ওঠে না। মেয়েটি বাঙালি ক্রিশ্চিয়ান, কিন্তু তাদের পরিবারের ধরন-ধারণ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মতন, তাঁরা কেউ বাংলায় কথা বলেন না। দিলীপকুমার গুপ্ত এবং গুহঠাকুরতাদের যৌথ পরিবারটি তখন বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান, সেই পরিবারের সবচেয়ে উজ্জ্বল সন্তানের স্ত্রী হয়ে যিনি এলেন, তাঁর সঙ্গে বাংলা সংস্কৃতির কোনও সংযোগ নেই, কিছু জানতেও চান না।

বিবাহের প্রথম অনুষ্ঠানটি হল ক্যাথলিক মতে, রাইটার্স বিল্ডিংসের পাশের চার্চটিতে। এরকম অনুষ্ঠান দেখার অভিজ্ঞতা আমার প্রথম, ভাবগম্ভীর পরিবেশে যন্ত্রসঙ্গীত ও বাইবেল-উচ্চারণ, বরযাত্রীদেরও মাঝে মাঝে নিলডাউন হতে হয়। তারপর গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে রিসেপশান, তখন হোটেলটি বেশ সুখ্যাত ও জমকালো ছিল, বিশাল হলে অগণিত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই হাতে হাতে লাল রঙের সুরা, বর-বধূর প্রকাশ্য চুম্বন ও পরবর্তী নাচ, আমার মতন ভেতো বাঙালিরা এসব সাতজন্মেও দেখেনি।

আমাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে বুঢ়াও যাতে ভেতো বাঙালি না হয়ে যায়, সে বিষয়ে তার স্ত্রী সতর্ক ছিল প্রথম থেকেই। ক্রমশ আমাদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। কিছুদিন পরেই বুঢ়া চাকরি বদল করে চলে যায় মুম্বই, সেখান থেকে আফ্রিকা। কলকাতার সাহিত্য-শিল্পের জগৎ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পুরোপুরি। একসময় ডি কে অসুস্থ হয়ে পড়লে সিগনেট প্রেসও দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে, বাংলা প্রকাশনাগোষ্ঠীর শীর্ষস্থান থেকে নেমে যায় নীচে। বুঢ়ার মতন একজন হৃদয়বান ও প্রতিভাবান বন্ধুকে হারাবার কষ্ট আমি সারাজীবনেও ভুলতে পারিনি।

অপর্ণা নাম্নী মেয়েটির সঙ্গে আমার গোপন প্রণয় কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছিল অনেকখানি। একসময় বিয়েটিয়ে করার প্রশ্ন আসবেই। আমি টানা পাঁচ বছর বেকার ছিলাম, তারপর যে চাকরি পেয়েছি তাও সামান্য ধরনের, এর মধ্যে সংসারী হওয়া খুবই অবাস্তব ব্যাপার। সে রকম কোনও ইচ্ছেও আমার জাগেনি, কিন্তু মেয়েটির প্রতি চাপ আসছিল নানারকম। সে সুশ্রী তো বটেই, তা ছাড়া স্নাতকোত্তর পড়াশুনো করছে, তার পাণিপ্রার্থীরা আশেপাশে ঘুর ঘুর করে। অনেক সুযোগ্য পাত্র ও ধনীপুত্রদের অগ্রাহ্য করেও সে আমার মতন একজন দীনহীনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে আমাকে বিশেষ মান দিয়েছিল। কিন্তু তাদের

পরিবারে বিশৃঙ্খলা ছিল নানারকম। সে পরিবেশ থেকে সে বেরিয়ে আসতে চাইছিল পড়াশুনো শেষ করার জন্য। একটি যুবক তাকে বিয়ে করার শর্তে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। একদিন খুবই বিপন্ন অবস্থায় অপর্ণা আমাকে জানাল যে, আমি ডাক দিলে সে যে-কোনওদিন এক বস্ত্রে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে থাকতে রাজি আছে। অথবা আমি কি তাকে অনুমতি দেব অন্য একজনকে বিয়ে করার জন্য?

আমি সেই ডাক দিতে পারিনি। অনুমতির ব্যাপারটাও অবান্তর মনে হয়েছিল। ভালোবাসা কি বন্ধন? তার ওপর আমার কি কোনও অধিকারবোধ ছিল? তাকে জীবনসঙ্গিনী করার মতন যোগ্যতাই ছিল না আমার। আমার রুগ্‌ণ বাবা, মা, ছোট ছোট ভাইবোনের সংসারে তাকে টেনে আনা হত নিষ্ঠুরতা, আর ওঁদের ছেড়ে অপর্ণাকে নিয়ে আলাদা বাসা বাঁধার চিন্তাও করতে পারি না। অপর্ণাও যে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছে, তার পক্ষে আর অপেক্ষা করাও সম্ভব নয়, তাও আমি বুঝি।

গঙ্গার ধারে সান্ধ্য নিরালায় আমার হাত চেপে ধরে অপর্ণা বলেছিল যে, তার বিবাহে নিশ্চিত আমার নিমন্ত্রণ হবে, আমি যেন সেদিন না যাই, কিছুতেই যাব না, কথা দিতে হবে।

তার সঙ্গে আর সারাজীবনেও দেখা হবে না, এ কথাও দিয়েছিলাম।

তখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে ব্যর্থ প্রেমিকদের আদর্শ ছিল শরৎচন্দ্রের দেবদাস। পানশালায় কেউ কমলদার সামনে ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী শোনাবার চেষ্টা করলেই তিনি বলতেন, এবার তোমার লিভারটি দেবদাস হয়ে যাবে। আমার জীবনের এই পর্বটি আমি বন্ধুবান্ধবের কাছে সযত্নে গোপন রেখেছিলাম, সুতরাং আমাকে কেউ ব্যর্থ প্রেমিক বলে সন্দেহও করেনি। কিন্তু গোপনীয়তার একটা বোঝা আছে। সে গোপনীয়তা সিন্ধবাদের কাঁধের বৃদ্ধের মতন ক্রমশ ভারী হয়ে চেপে বসে। তখন নিজেকে প্রকাশ করতেই হয়। প্রকাশ করার একমাত্র উপায় কবিতায়।

একদিন বিকেলে কলেজ স্ট্রিটে এক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গেলাম। দিকভ্রান্তের মতন ছুটোছুটি করছে মানুষজন, পুলিশের গাড়ি ও টিয়ার গ্যাস, চিৎকার ও ধাক্কাধাক্কি, গণ্ডগোলের উপলক্ষটা কী তা জানি না, তবু এসব গা-সহা ব্যাপার, টুক করে পাশ কাটিয়ে কোনওক্রমে কফি-হাউসে ঢুকে পড়তে পারলেই হল, সেখানে বন্ধুরা কেউ-না-কেউ থাকবেই। কিন্তু এগুনো যাচ্ছে না, পলায়মানদের স্রোত বিপরীত দিকে, হঠাৎ দেখি প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে বন্দুক উঁচোনো পুলিশ, তাদের নির্দেশে কাছাকাছি লোকজন মাথার ওপর হাত তুলে হাঁটছে। আমাকেও হাত তুলতে হল, এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি, সবাই যেন চৈতন্যদেবের শিষ্য। আমার মধ্যে অসহ্য রাগ পুঞ্জীভূত হতে লাগল, কেন আমাকে হাত তুলতে হবে, কেন আমাকে কফি হাউসের দিকে যেতে দেওয়া হবে না? কেন আমাকে মিশে যেতে হবে স্রোতের সঙ্গে? আমি থমকে দাঁড়াতেই অন্যরা ঠেলাঠেলি করতে লাগল, তবু আমার হুঁস নেই। যেন আমি এই দুনিয়ায় চরমতম একা, আমার কোনও বন্ধু নেই, পরিজন নেই, এই কলেজ স্ট্রিট থেকেও সবাই অদৃশ্য হয়ে গেছে, পুলিশরাও উধাও, একটাও বাতি জ্বলেনি, দোকানপাট বন্ধ, অন্ধকারে নিথর হয়ে পড়ে আছে রাস্তা। আমি ও রাস্তা, রাস্তা ও আমি, আমি দুলছি, রাস্তাটাও দুলছে।

কয়েক মুহূর্তের এই ঘোর, তারপর রুমাল দিয়ে নাকের রক্ত মুছতে মুছতে মনে হল, অপর্ণার সঙ্গে আর কোনওদিন দেখা হবে না। সেই বিচ্ছেদের শূন্যতা যে এতখানি, আগে টের পাইনি তো!

উনত্রিশ

কৃত্তিবাস পত্রিকার তরুণ কবি গোষ্ঠীর ডাক পড়ে ছোটখাটো নানান কবি সম্মেলনে। তাদের যে খুব কবিত্বের খ্যাতি ছড়িয়েছে তা নয়, তবে নানান রকম গল্প ছড়িয়েছে, এবং আর একটা সুবিধে, একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই এক ঝাঁককে পাওয়া যায়। এখন যেমন মফস্বলের ছোট ছোট শহরেও যখন-তখন কবি সম্মেলন হয়, পঞ্চাশের দশকের আগে এর তেমন রেওয়াজ ছিল না। তার আগে, কবিদের বদলে বেশি খাতির ছিল কথা সাহিত্যিকদের, তাঁরা মুগার পাঞ্জাবি পরে, গলায় চাদর দিয়ে বিভিন্ন সভার সভাপতি ও প্রধান অতিথি হতেন। উদ্যোক্তাদের শ্রদ্ধা ও অবহেলা দুই-ই তাঁদের সহ্য করতে হত। নিয়ে যাওয়ার সময় এক রকম, ফেরার সময় আর এক রকম। এ নিয়ে অনেক মজার ঘটনা সেকালের লেখকরা অনেকেই লিখেছেন। শুনেছি, দুই বিভূতিভূষণই ফেরার ট্রেন ভাড়া অগ্রিম হাতে না-নিয়ে কোথাও যাবার জন্য সম্মতি দিতেন না।

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও অকালমৃত সুকান্ত ছাড়া অন্য সব কবিই একটি ছোট বৃত্তের বাইরে অজ্ঞাত ছিলেন। সেইজন্যই সবান্ধব অরুণকুমার সরকার কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে 'আরও কবিতা পড়ুন' আন্দোলন শুরু করেন।

সম্ভবত সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্তর উদ্যোগে সিনেট হলে যে-বিরাট আকারের কবি সম্মেলন হয় এবং তা বহুল প্রচারিত হয় বলেই তারপর থেকে পাড়ায় পাড়ায় কবিতা পাঠের আসর বসাতে ক্লাবগুলি উৎসাহ পায়। মফস্বলেও কিছু একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বাসনা হলে কবি সম্মেলনই সবচেয়ে সুবিধেজনক। গান-বাজনার আসরে একজন তবলচিকেও কিছু পয়সা দিতে হয়, কবিদের ক্ষেত্রে সে-বালাই নেই, এমনকী বাস ভাড়া-ট্রেন ভাড়াও না দিলে চলে, গোটা দুয়েক ঠাণ্ডা নিমকি-সিঙ্গাড়া ও ভাঁড়ের চা-ই আপ্যায়নের পক্ষে যথেষ্ট। কবিদের মতন হ্যাংলা প্রাণী আর হয় না, তারা ডাকলেই যায়।

মফস্বলের কবি সম্মেলনের জন্য অন্তত পনেরো জন কলকাতার কবি চাই, তার সঙ্গে স্থানীয় কবিযশোপ্রার্থীরা তো আছেই। আমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন-দু'জন বয়স্ক, আর বাকিদের কেউ নাম জানুক বা না-জানুক, কলকাতার ছাপ থাকাই যথেষ্ট। এক সঙ্গে আট দশজনকে পাওয়া যায় বলে কৃত্তিবাসের দলের বেশ চাহিদা ছিল।

আমরা যে-কোনও জায়গা থেকে ডাকলেই সাড়া দিতাম, একসঙ্গে যাওয়া, অনবরত আড্ডা ও হুল্লোড়ের আকর্ষণে। সবচেয়ে আগ্রহ ছিল শক্তির, যে কোনও ছুতোয় কলকাতার বাইরে যাবার জন্য সে ছটফট করত। একা নয়, সঙ্গে বন্ধুদেরও চাই। আমরা কেউ কেউ কখনও অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকলেও শক্তি জোর করে টেনে নিয়ে যাবেই। এবং যেসব মফস্বলের উদ্যোক্তারা কম খরচে সংস্কৃতির হোতা হিসেবে তৃপ্তি বোধ করতেন, তাঁদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ত শক্তি। কবিতা পাঠ শেষ হতে-না-হতেই সে ঘোষণা করত, আমরা কয়েকজন এখানে রাত্তিরে থাকব! নৈহাটি কিংবা চন্দননগর থেকে রাত্রে ফিরে আসার কোনও অসুবিধে নেই, তবু শক্তি ফিরবে না। উদ্যোক্তারা এ জন্য প্রস্তুত নয়, কিন্তু সদ্য চেনা কারওকে কয়েক মিনিটে বংশবদ করে ফেলার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল শক্তির, আমি যেমন লোকের কাছে মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারি না, শক্তি ঠিক তার বিপরীত, চারিদিকে আদেশ ছড়াতে তার কোনও দ্বিধা নেই।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে নধর চেহারার ব্যক্তিটির কাঁধে চাপড় মেরে বলত, আমাদের থাকার বন্দোবস্ত করো, রাত্তিরে খাব, মাংস রাঁধবে, আর আনুষঙ্গিক আনাও! তারপর সারা রাত্রিব্যাপী তাণ্ডবে সবাই তটস্থ। কেউ কেউ মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাকিয়ে থাকত তার দিকে, শক্তিকে গুরু মেনে দীক্ষা নিত, জীবনে প্রথম স্পর্শ করত কারণ বারি। এক সময় সারা বাংলা, এপার বাংলা-ওপার বাংলা, শক্তি অনুকারী ক্ষুদে-শক্তিতে ভরে গিয়েছিল, যাদের আচার-আচরণ শক্তির মতন কিন্তু লেখার বেলায় টুঁ টুঁ। শক্তির বাউণ্ডুলেপনা অনেকেই দেখেছে, সে যে লেখার জন্য কত পরিশ্রম করেছে, তা অনেকেই জানে না। শক্তির প্রস্তুতিপর্ব সুদীর্ঘ। পরিণত বয়েসে শক্তি পরিশ্রম বিমুখ হয়ে পড়ে, সম্ভবত শারীরিক কারণে।

শুধু কবি-সম্মেলন উপলক্ষেই নয়, এমনিতেও প্রতি মাসে একবার দু'বার আমরা বেরিয়ে পড়তাম কোনও অদেখা জায়গার উদ্দেশে। ছাত্রজীবন শেষ করার পর বন্ধুরা অনেকেই ছড়িয়ে পড়েছে নানা জায়গায়। তারা কে কোথায় চাকরি পেয়েছে জেনেই আমরা হঠাৎ কিছু না-জানিয়ে হাজির হতাম সেখানে। দীপক দূরে সরে যাবার পর শক্তি আর আমি ভ্রমণসঙ্গী। আমরা দু'জনেই যখন বেকার ছিলাম, তখন চাকরিপ্রাপ্ত বন্ধুদের কাছে গিয়ে হামলা করার অধিকার বোধ ছিল আমাদের। এইভাবে পশ্চিম বাংলার এমন কোনও জেলা, মহকুমা, ছোট শহরও নেই, যা আমরা দেখিনি। সারা বাংলা আমাদের হাতের তালুর মতন চেনা। এমনকী ভারতের কোনও রাজ্যই আমরা অদেখা রাখিনি।

শ্রীরামপুর শহরের একটি কবি সম্মেলনে বেশ মজার ব্যাপার ঘটেছিল। তখন সবেমাত্র আমার কবিতা ছাপা শুরু হয়েছে, শক্তি তখনও কবিতার জগতে আসেনি।

সেখানে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের। তিনি কল্লোল যুগের ডাকসাইটে কবি ছিলেন, ক্রমশ কবিতার জগৎ থেকে সরে যান, বা তখনও লেখেন, কিন্তু তাঁর কবিতার ভাষা পিছিয়ে পড়েছে। তিনি ছোট গল্পের লেখক হিসেবেই বেশি বিখ্যাত এবং ছোটদের জন্যও চমৎকার লেখেন। তারপর সিনেমা পরিচালনায় মেতে ওঠেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, এই দু'জন লেখক চলচ্চিত্র-পরিচালক হিসেবে বেশি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সেই সময় প্রেমেন্দ্র মিত্র অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো-র একজন সলাহকার না কী যেন, অর্থাৎ উপদেষ্টা।

সভাপতির জন্য সবাই অপেক্ষা করছে, তিনি আসছেন না, আসছেন না, এক সময় তাঁর আশা ছেড়ে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের আকর্ষণেই সম্ভবত শ্রীরামপুর লাইব্রেরি হলে জনসমাগম হয়েছিল প্রচুর, বাইরে প্রবল বৃষ্টি, ঘণ্টা দেড়েক পরে আমার নাম ঘোষিত হল। আমি দু' চার লাইন পাঠ করেছি মাত্র, হঠাৎ বাইরে শোনা গেল গোলমাল, কিছু লোক সেদিকে ছুটে গেল, প্রেমেন্দ্র মিত্র শেষ পর্যন্ত এসেছেন, কলকাতা থেকে সোজা ট্যাক্সিতে। তাঁকে সমাদর করার জন্য উদ্যোক্তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আনা হল মঞ্চে, তারপরেও চলতে লাগল কথাবার্তা। আমি মাইক্রোফোনের কাছে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছি চুপ করে। এ রকম অবস্থায় যে-কোনও তরুণ কবির সর্বাঙ্গে রাগের জ্বালা শুরু হবেই, যদিও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কোনও দোষ নেই, কোনও অনিবার্য কারণে তিনি মাঝপথে আটকে পড়তেই পারেন। উদ্যোক্তাদের আদিখ্যেতা চলছেই দেখে আমি দূর ছাই বলে মাইক ছেড়ে সরে এলাম। কোলাহল খানিকটা প্রশমিত হবার পর অনুষ্ঠান আবার শুরু হলে নাম ডাকা হল পরবর্তী কবির। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র আমার মধ্যপথে থেমে যাওয়া লক্ষ করেছিলেন, যদিও তাঁর সঙ্গে আমার কখনও পরিচয় হয়নি, তিনি আমার মুখ চেনেন না, নামও না জানারই কথা। পরের কবি মঞ্চে ওঠার আগে প্রেমেন্দ্র মিত্র আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে ডাকলেন। আমি দূর থেকে হাত নেড়ে জানালাম, আমি আর পড়তে চাই না। অত জোর বৃষ্টি না পড়লে ততক্ষণে আমি হল ছেড়েই চলে যেতাম। অত বিখ্যাত ও ব্যস্ত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্র মিত্র অনুভব করেছিলেন এক সদ্য তরুণের অভিমান, তিনি সভাপতির আসন ছেড়ে নেমে এসে আমার হাত ধরে বলেছিলেন,

আমার অনুরোধে আর একবার পড়ো।

এরপর আর একজন প্রবীণ কবির সামনে ঔদ্ধত্য দেখানো চলে না। কোনওক্রমে একটি কবিতা পড়ে দিলাম। তিনি আমার কাছ থেকে কবিতার পাণ্ডুলিপিটি চেয়ে নিলেন এবং ফেরার সময় প্রায় জোর করেই তাঁর ট্যাক্সিতে তুলে নিলেন আমাকে।

এটা একটা আকস্মিক ঘটনা, কিন্তু এর ফল হল এই, দিন দশেক পরে রেডিয়ো-র এক কবি সম্মেলনে আমি আমন্ত্রণ পেয়ে গেলাম। অনেকের মতে, এ খুব সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ, সে সময়ে রেডিয়োতে সুযোগ পাওয়া ছিল দুর্লভ ব্যাপার, রেডিয়োতে একবার যে-গান গেয়েছে, সে 'রেডিয়ো আর্টিস্ট' হিসেবে গর্বের সঙ্গে কলার উঁচিয়ে হাঁটত, বহু কবি নিজেদের কবিতা সমেত আবেদন পত্র জমা দিয়ে মাসের পর মাস দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করত এবং অনেকেই নিরাশ হত। আমার বয়েসি কোনও কবির সুযোগ পাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। হঠাৎ আমি নিজে কোনও চেষ্টা না করেই রেডিয়ো আর্টিস্ট হয়ে গেলাম।

সে কবি সম্মেলনটি ছিল অভিনব। রেডিয়ো-র অনুষ্ঠান শুধুমাত্র শ্রাব্য, কিছু দেখা যায় না, কিন্তু সেই অনুষ্ঠানটি যুগপৎ দেখার ও শোনার। তখনও ময়দানে নতুন রেডিয়ো অফিস খোলা হয়নি, ডালহাউসি স্কোয়ারের কাছে গারস্টিন প্লেস নামের রাস্তায় (অনেকে বলত ডাস্টবিন প্লেস) ছিল পুরনো বেতার কেন্দ্র। এখানেই নজরুল ইসলাম তাঁর শেষ অনুষ্ঠানের মধ্যপথে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এখানেই নাকি সায়গল অন্যের হাত থেকে মাইক কেড়ে নিয়ে মাঝপথে নিজে গান ধরেন। সেই বাড়ির ছাদেই মঞ্চ বেঁধে কবিতা পাঠের ব্যবস্থা, দু'-তিনশো জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল শ্রোতা হিসেবে, এবং একই সঙ্গে অনুষ্ঠানের জ্যান্ত সম্প্রচার চলছিল। আমি ছিলাম কনিষ্ঠতম কবি। পরদিন সব সংবাদপত্রে বেশ করে ছবি ছাপা হয়েছিল এই অনুষ্ঠানের, সেই ছবিতে কেউ কেউ নাকি চিনতেও পেরেছিল আমাকে। খুব সম্ভবত সংবাদপত্রে সেই আমার প্রথম ছবি।

এরপর প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে আমার সারাজীবনের মতন একটা যোগাযোগের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়।

সত্যজিৎ-পূর্ব বাংলা ছায়াছবিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র অনেকগুলি ছবির পরিচালক ও কাহিনীকার ছিলেন, সেগুলির নামও কেউ মনে রাখেনি। তাঁর স্বভাবটাই ছিল অগোছালো ও ঢিলেঢালা। এ রকম একটা গল্প প্রচলিত ছিল যে, একবার তিনি 'ডাকিনীর চর' নামে একটি ফিল্মের শুটিংয়ের জন্য নায়িকা ও অন্য কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে চলে গেলেন সুন্দরবনের কোনও দ্বীপে। কিন্তু ক্যামেরা ও ক্যামেরাম্যানকেই সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গেলেন। সম্ভবত এটা গল্পই। তবে তিনি অনেক প্রযোজকদের জন্য চিত্রনাট্য লিখে দেবার প্রতিশ্রুতি ও অগ্রিম নিয়েও কতবার যে তাদের ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দিতেন, তা অনেকেই বলেছেন। তিনি গল্প-উপন্যাসও লিখতেন খুব কম, কিন্তু সম্পাদকরা বিশেষ পছন্দ করতেন তাঁর লেখা, বহু-শারদীয় সংখ্যার সম্পাদককে তিনি নাকানি-চোবানি খাইয়েছেন। যখন তাঁর পর্যায়ের অন্য লেখকরা শারদীয় সংখ্যায় লেখার জন্য বিষম ব্যস্ত, তখন প্রেমেন্দ্র মিত্র বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে অন্য কোথাও সারাদিন তাস খেলে কাটাচ্ছেন। আমিও কয়েকবার তাঁর সঙ্গী হয়েছি ব্রিজ খেলায়। কালবার্টসনের থিয়োরির ওপর তিনি তাঁর নিজস্ব আজবার্টসন থিয়োরি প্রয়োগ করতেন।

অনেক ফিল্মের মধ্যে তাঁর 'ভাবীকাল' নামে একটি ফিল্মে কিছু আধুনিক আঙ্গিকের পরীক্ষা ছিল। পরবর্তীকালের কোনও আলোচনায় তাঁর এই ছবি একটুও স্বীকৃতি পায়নি বলে তাঁকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুনেছি। তাঁর 'কালো ছায়া' নামে একটি ফিল্ম নিয়ে একটি অপ্রীতিকর বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বুদ্ধদেব বসু অভিযোগ করেন যে তাঁর লেখা একটি কিশোর রহস্যকাহিনী থেকে ওই ফিল্মের গল্প স্বীকৃতি না-দিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। এ নিয়ে মামলা মোকদ্দমারও উদ্যোগ হয়েছিল, তখন প্রেমেন্দ্র মিত্র সংবাদপত্রে একটা মজার বিবৃতি দেন, হ্যাঁ, কাহিনীটি

আমার নিজস্ব নয় ঠিকই। তবে বুদ্ধদেব যেখান থেকে নিয়েছে, আমিও নিয়েছি সেখান থেকেই!

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'কল্লোল যুগ' পাঠ করে জেনেছিলাম, অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব এই তিনজন লেখক পরম বন্ধু। সেই ছবিটিই আমার মনে গেঁথে ছিল। তবে, তাঁদের যৌবনের সেই বন্ধুত্বে মধ্য বয়সে ফাটল ধরে, বেশ দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। অচিন্ত্যকুমার ও প্রেমেন্দ্র তবু পাশাপাশি থাকতেন, বুদ্ধদেব আলাদা হয়ে যান অনেকখানি। একবার কিছু একটা উপলক্ষে মহাবোধি সোসাইটিতে এক সভায় তিনজনেই উপস্থিত ছিলেন, উদ্যোক্তারা তাঁদের পাশাপাশি বসার ব্যবস্থা করেন প্রথম সারিতে। বাংলা সাহিত্যের সেই বিখ্যাত ত্রয়ীকে একসঙ্গে দেখে আনন্দে বুক ভরে গিয়েছিল। তখন তাঁদের ব্যবহারে কোনও আড়ষ্টতা ছিল না, গল্প করছিলেন সহাস্যে।

একবার বুদ্ধদেব বসুর বাড়ির আড্ডায় কয়েকজন তরুণ ওঁকে খুশি করার জন্য, প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যর সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভালো নয় জেনে, বক্রভাবে কথা বলছিল শেষোক্ত দু'জন সম্পর্কে। হঠাৎ বুদ্ধদেব সাংঘাতিক রেগে উঠে তীব্র গলায় বললেন, তোমরা অচিন্ত্যর 'দুইবার রাজা' পড়েছ? পড়েছ প্রেমেনের 'সংসার সীমান্তে'? কথায় কথায় তোমরা বিদেশি লেখকদের নাম করো। এঁদের লেখা তাঁদের অনেকের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এঁরা নিজের বন্ধুদের নিন্দা করতেন না কখনও, শুনতেও চাইতেন না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব বসু দুই বিপরীত মেরুর লেখক, তবু বুদ্ধদেবের মুখে আমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা শুনেছি। এঁদের মধ্যে কখনও বন্ধুত্ব ছিল কি না জানি না, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লেখক সংঘে এঁরা একত্র হয়েছিলেন, পরে রাজনৈতিক বিশ্বাসে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। বুদ্ধদেব বসুর 'শেষ পাণ্ডুলিপি' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রের অনেকখানি আদল আছে।

এই ত্রয়ীর মধ্যে সবচেয়ে কম লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তবু বেশ কিছু বছর তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল অনেক বেশি। লেখার ব্যাপারে এমন অলস অথচ তিনি যে কী বিষম পড়ুয়া ছিলেন তার পরিচয় পেয়ে বারবার বিস্মিত হয়েছি। দেখা হলেই তিনি আমার বা অন্যান্য তরুণ লেখকদের রচনার উল্লেখ করতেন। যখন তাঁর চক্ষু খারাপ হতে শুরু হয়, তখনও তিনি ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে পড়তেন। এত কষ্ট করেও পড়েন কেন প্রেমেনদা? জিজ্ঞেস করলে বলতেন, পড়ার নেশা যে ছোটবেলা থেকে, কিছু-না-কিছু না পড়লে ভাত হজম হয় না। যখন ম্যাগনিফায়িং গ্লাসেও কুলোত না, তখন মাইনে করা লোক রেখেছিলেন, যিনি শুধু খবরের কাগজ নয়, পত্র-পত্রিকার নতুন গল্প-উপন্যাস-কবিতাও পড়ে শোনাতেন তাঁকে।

আমি যেবারে প্রথম বিদেশে যাই, সেবারে প্রেমেন্দ্র মিত্রও আমেরিকা সফরের সরকারি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। আমি অনেকদিন নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্টে থাকব, নিজে রান্না করে খাব, তাই ওঁকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিলাম, একবার আমার ওখানে যেতে। উনি সাগ্রহে রাজি হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, প্রথমেই আমার কাছে যাবার ব্যবস্থা করবেন। তারপর মাসের পর মাস কেটে গেল, বছর ঘুরে গেল, তিনি এলেন না। কোনও খবর নেই। ফিরে এসে তাঁকে প্রশ্ন করে জানা গেল, নিউ ইয়র্কে নেমেই তিনি টের পেলেন, দারুণ শীত, অত শীত তার সহ্য হবে না, তাই কয়েকদিনের মধ্যেই সফর বাতিল করে ফিরে এসেছিলেন। যিনি কত রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লিখেছেন, সেই লেখক তুচ্ছ শীতের ভয়ে আমেরিকা দেখলেন না। এটা বেশ মজার ব্যাপার!

তিনি আরও গল্প বলেছিলেন যে, কিছুদিনের জন্য তাঁকে বম্বে নিয়ে গিয়েছিলেন বিখ্যাত প্রযোজক বিমল রায়। তখন বম্বের ফিল্ম মহলে বাঙালি লেখকদের গল্প ও চিত্রনাট্যের খুব কদর ছিল। যেমন বাংলা ফিল্মের স্বর্ণযুগে অনেক লেখকই চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রবোধকুমার সান্যাল কিংবা সমরেশ বসুর মূল উপার্জন বই বিক্রি থেকে নয়, সিনেমার

কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার হিসেবে। বম্বেতে উপার্জন আরও বেশি। প্রেমেনদাকে আলাদা ফ্ল্যাট ও অনেকরকম সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন থাকার পরেই প্রেমেনদা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, কারণ বম্বের সব মাছেই কেমন যেন আঁশটে গন্ধ, তিনি খেতে পারেন না। মাছেরই যদি স্বাদ না পাওয়া যায়, তা হলে আর টাকা রোজগার করে লাভ কী! তিনি এক বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ, চলেও আসতে পারেন না মধ্যপথে, একদিন বেপরোয়া হয়ে কারওকে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি কলকাতার ট্রেনে উঠে বসলেন।

কিছুদিন আমরা দু'জনেই ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভ্‌লপমেন্ট কর্পোরেশনের জুরি বোর্ডের সদস্য ছিলাম। একদিন মিটিং সেরে নিচে নেমে এসে আমি প্রেমেনদার জন্য ছুটোছুটি করে ট্যাক্সি ধরার চেষ্টা করছি, কোনও ট্যাক্সিই যেতে রাজি হচ্ছে না, তিনি বললেন, চলো, খানিকটা হেঁটেই যাই। এত বিখ্যাত একজন লেখকের পাশে আমি হাঁটছি, ভেবেই আমার রোমাঞ্চ হচ্ছিল। প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়েও তাঁর সুন্দর চেহারা, দৈর্ঘ্যে কিছুটা কম, ফর্সা রং ও মাথা ভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। এক সময় বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা প্রবর্তনের জন্য ইনি এবং এঁর বন্ধুরা কী তুলকালাম কাণ্ডই না করেছেন! ইনি হাঁটছেন রাস্তা দিয়ে, লোকে চিনতে পারছে না?

আমার খানিকটা অপরাধবোধও হচ্ছিল। জীবনে একবারই আমি ওর সঙ্গে অপব্যবহার করেছি। সেবারে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল এমন এক ব্যক্তিকে, যাকে কোনওক্রমেই লেখক বলা চলে না। তিনি ছিলেন ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি, একটি প্রকাণ্ড বিদ্যালয়ের মালিক, অনেককে নাকি দাক্ষিণ্য বিতরণ করতেন। তখন অন্য কোনও পুরস্কারের প্রবর্তন হয়নি। সরকারি রবীন্দ্র পুরস্কার বিশেষ সম্মানের, বিচারকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রও ছিলেন। তিনি কী করে এমন ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন? সম্ভবত এটাও ওঁর ঢিলেঢালা স্বভাবের জন্য, কেউ এসে অনেক করে ধরেছে, উনি না বলতে পারেননি। রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত পুরস্কারের এমন অপব্যবহারে অনেকেই খুব ক্ষুব্ধ। এক বন্ধুর বাড়িতে সন্ধেবেলা আড্ডা দিতে দিতে ঠিক হল, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হোক। টেলিফোনের ওপর একটা কাপড় চাপা দিলে কণ্ঠস্বর বদলে যায়, আমি মিথ্যে করে বললাম, প্রেমেনদা, আমার নাম অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া কলেজে পড়াই, আপনার বাড়িতে অনেকবার গেছি, চিনতে পারছেন? যে-নামের কোনও অধ্যাপকের অস্তিত্ব নেই, সে নাম শুনেও উনি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন চিনতে পারব না? কেমন আছে অবনী? তোমার মা-বাবা সব ভালো তো? অবনী বলল, একদিন আপনার বাড়িতে তিলের নাড়ু নিয়ে গিয়েছিলাম, অনেকদিন আগে, আপনার মনে থাকবার কথা নয়। উনি বললেন, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ অবশ্যই মনে আছে, চমৎকার স্বাদ ছিল। অবনী বলল, প্রেমেনদা, আমি আপনার কত ভক্ত তা তো জানেন, একটা ব্যাপারে মনে বড় আঘাত পেয়েছি, আপনি ওমুককে রবীন্দ্র পুরস্কার কেন দিলেন? উনি বললেন, দেখো, সাহিত্যের বিচার খুব শক্ত, আজ যেটা তোমাদের ভালো লাগছে না, ভবিষ্যতের পাঠক হয়তো—। অবনী বলল, তা হলে যে ওই খগেনকুমার, যে পাতলা পাতলা গোয়েন্দা কাহিনী লেখে তাকেও রবীন্দ্র পুরস্কার দেবেন? কেন না, ভবিষ্যতের বিচারে—। আমার এ রকম ইনুনি-বিনুনি কথা দু'একজন বন্ধুর পছন্দ হয়নি। একজন আমার হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নিয়ে বলল, অ্যাই শালা প্রেমেন! সঙ্গে সঙ্গে আমি কানেকশান কেটে দিই।

প্রেমেনদার সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হল, এখন সেই দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করাই উচিত। তাঁকে সব খুলে জানাতে তিনি খুব হাসলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, তবে একলা আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন, বিচারকদের মধ্যে আরও তো তোমাদের চেনা কয়েকজন ছিল। তারা আমাকে এমন বোঝাল—সেদিন শালাটা কে বলেছিল? অমুক, তাই না? ওর লেখাও আমি খুব পছন্দ করি।

একটি সভায় আমি বলেছিলাম, প্রেমেনদা, আপনি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়। উনি

হকচকিয়ে তাকাতেই আবার বলেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ একাশি বছরে মারা গেছেন, আপনার বয়েস এখন চুরাশি।

আর একটি সভায় উনি খুব লজ্জায় ফেলে দিয়েছিলেন আমাকে। 'একালের কবিতা' নামে একটি সংকলন সম্পাদনা করেছিলাম, অধিকাংশ বাংলা কবিতা সংকলন শুরু হয় রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে, আমি ঠিক করেছিলাম রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথের মতন বহু ব্যবহৃত কবিদের বাদ দিয়ে শুরু করা হবে জীবিত প্রধান কবি অরুণ মিত্র থেকে, যাতে শেষের দিকে অনেক তরুণ কবিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বইটির উদ্বোধন হবে বইমেলার মঞ্চে। পাশের টেবিলে বসে আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তিনিও একটি কিশোর সংকলন সম্পাদনা করেছেন। সভা শুরু হবার আগে তিনি আমাকে বললেন, দেখি, তুমি কী বই বার করছ? পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তিনি সবিস্ময়ে বললেন, এ কী, তুমি আমার কবিতা নাওনি? স্বয়ং একজন প্রধান কবি এ প্রশ্ন করলে কী উত্তর দেওয়া যায়? আমি আমতা আমতা করে বললাম, প্রেমেনদা, এটা একটু অন্যরকম, আপনার সমসাময়িক অনেককেই, যেমন বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ এঁদেরও নেওয়া হয়নি। প্রেমেনদা অসহিষ্ণুভাবে হাত নেড়ে বললেন, আরে, ওরা তো সব মরে গেছে। আমি এখনও বেঁচে আছি, বেঁচে আছি।

আমি লজ্জায় অধোবদনে বলেছিলাম, আমারই ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করুন, পরের সংস্করণে অবশ্যই—। এর কয়েকমাস পরেই তিনি পৃথিবী ত্যাগ করেন। তাঁকে শেষবার দেখতে গিয়ে ওই কথাটাই মনে পড়ছিল বারবার, আমি তো এখনও বেঁচে আছি, বেঁচে আছি!

তিরিশ

মাঝে মাঝে বাড়ি বদল করা ভাড়াটে বাসিন্দাদের নিয়তি। ভাড়ার উর্ধ্বগতি থামার কোনও লক্ষণ নেই, বরং লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। চালের দাম থেকে মাছের দাম সবাই মাথা তুলে লম্বা হয়ে যাচ্ছে, ট্রামের ভাড়া এক পয়সা বাড়ানোর প্রতিবাদে তুলকালাম কাণ্ড হয়ে গিয়েছিল, সেই ভাড়া এখন দ্বিগুণ। সব জিনিসেরই দাম বাড়ে, শুধু টাকার দাম কমে।

যতই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকুক শুরুতে, কয়েক বছরের মধ্যেই অধিকাংশ ভাড়াটে-বাড়িওয়ালার সম্পর্ক হয়ে যায় অহি-নকুলের মতন। বাজারদর অনুপাতে বাড়িওয়ালা ভাড়া বাড়াতে চাইবেই, ভাড়াটে বেচারির উপার্জন না বাড়লে সে-ই বা বেশি দেয় কী করে, সুতরাং শুরু হয় মন কষাকষি, কথা বন্ধ, জল বন্ধ, কোথাও কোথাও লাঠালাঠিও বাদ থাকে না। এর পরের পর্ব মামলা-মোকদ্দমা। এখন শুনছি, ভাড়াটেরা বাড়ি ছাড়ার সময় বাড়ির মালিকের কাছ থেকেই প্রচুর টাকা আদায় করে নেয়, তা কয়েক লক্ষও হতে পারে, কারণ মামলায় বাড়িওয়ালাদের জয়ের আশা সুদূর পরাহত, আইন ভাড়াটিয়াদেরই বেশি পক্ষে। সে সময়ে আমরা বাড়িওয়ালার তহবিল থেকে টাকা খসাবার মতন একটা অদ্ভুত কথা একেবারেই শুনিনি, আর মামলা করার মতন সময় বা মানসিকতা আমার বাবার একেবারেই ছিল না। বাড়িওয়ালা বিশেষ চাপ দিলে আমরা পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতাম অন্য জায়গায়।

বাগবাজারে বৃন্দাবন পাল লেনের বাড়িওয়ালা আমাদের উঠে যাবার নোটিস দিয়ে অশেষ উপকার করলেন। শশব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি করতে করতে আমরা এমন একটা বাড়ি পেয়ে গেলাম, তেমন ভালো বাড়িতে আমরা আগে কখনও থাকিনি। এবং অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্যি যে ভাড়া আগের বাড়ির চেয়েও কম। এই সৌভাগ্যটি ঘটল বাবার এক প্রাক্তন ছাত্রের

সৌজন্যে। তিনি সপরিবারে এমন একটি বাড়িতে থাকতেন, যেটাকে বেওয়ারিশ বলা যায়। বাড়িওয়ালার কোনও খোঁজ নেই। বছরের পর বছর কেউ খোঁজ নিতে আসে না, আগেকার ঠিক করা ভাড়া রেন্ট কন্ট্রোল অফিসে মাসে মাসে জমা দিয়ে এলে ভাড়াটের পুরোপুরি অধিকার বজায় থাকে। সেই ছাত্রটি কোথাও বদলি হয়ে যাচ্ছেন, তিনি এমন বাড়িটি তাঁর মাস্টারমশাইকে উপহার দিয়ে যেতে চান।

শ্যামপুকুর স্ট্রিটে সমাজপতি স্মৃতি সমিতির লাইব্রেরির উল্টোদিকের গলিতে সেই বাড়ি। এর আগে আমরা শুধু দু'-আড়াইখানা ঘরের ফ্ল্যাটে থেকেছি, কখনও একতলা ছেড়ে দোতলায় উঠিনি, এটা একেবারে পুরো বাড়ি, এবং দোতলা। এই প্রথম আমি যে শুধু সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা ঘর পেলাম তাই-ই নয়, মা-বাবা, ভাই-বোনেরা সবাই দোতলায়, একতলায় আই অ্যাম দা মনার্ক অফ অল আই সার্ভে বলতে পারি অনায়াসে।

সামনের দিকের বসবার ঘরটি হয়ে গেল কৃত্তিবাস পত্রিকার কার্যালয়, সেখানে অফুরন্ত আড্ডার সুযোগ। আমার স্বাধীনতাও বেড়ে গেল অনেকখানি, তখন উড়নচণ্ডীপনার চূড়ান্ত অবস্থা, কত রাতে বাড়ি ফিরি তার ঠিক নেই, আমার ভাত ঢাকা থাকে একতলায়, আমি চোরের মতন পা টিপে টিপে ঢুকি, ওপরতলায় সবাই তখন ঘুমে আচ্ছন্ন, শুধু মা সদর দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনে আমার ফেরা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর ঘুমোতেন, এবং সকালবেলা ভাতের থালাটা পরীক্ষা করে দেখতেন, আমি খেয়েছি কি না।

বাড়িটার চেহারা অবশ্য খুবই কদাকার, বাইরে থেকে কেউ দেখলে ভয় পেয়ে যাবে। প্রায় সুকুমার রায়ের বুড়ির বাড়ির মতন অবস্থা। বাড়িওয়ালার খোঁজ নেই, তাই বহুকাল কোনও রকম রঙের পলেস্তারা দেওয়া কিংবা সংস্কার করাও হয়নি। দোতলায় রাস্তার দিকে একটা বারান্দা এমন বিপজ্জনকভাবে ঝুলে আছে যে, যে-কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে, অন্যান্য ঘর থেকেও মাঝে মাঝেই ইট ও চলটা খসে খসে পড়ে। তা পড়ুক, তবু তো খোলামেলা, হাত-পা ছড়িয়ে থাকার মতন নিজস্ব একটা গোটা বাড়ি। এর অবস্থানটিও খুব সুবিধেজনক, বাবার ইস্কুল মাত্র দু'-তিন মিনিটের রাস্তা। অত কাছে একটা ভালো লাইব্রেরি। ওটা সিনেমাপাড়া, মা অনায়াসে ম্যাটিনি শোতে বাংলা সিনেমা দেখে আসতে পারেন। শুনেছিলাম, এককালের খ্যাতিমান নায়ক রবীন মজুমদার ওই রাস্তাতেই থাকেন, তাঁকে দেখিনি অবশ্য, প্রায়ই দেখতাম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে, তিনি লেখকও ছিলেন। কিন্তু মহালয়ার ভোরে রেডিয়োতে আনুনাসিক চণ্ডীপাঠের জন্য তাঁর খ্যাতি তাঁর লেখকসত্তাকে ঢেকে দিয়েছিল।

ওই রাস্তায় আরও একজন তৎকালীন উপন্যাস-লেখক থাকতেন, প্রাণতোষ ঘটক, তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় না হয়েই একবার প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক এবং খুব প্রতিপত্তিশালী মানুষ। সে সময় বসুমতী সাহিত্য মন্দির ছিল বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। খবরের কাগজ ছাড়াও সেখান থেকে প্রকাশিত হত মাসিক ও সাপ্তাহিক বসুমতী এবং সুলভে বহু অমূল্য ক্লাসিক গ্রন্থ। বসুমতী সংস্করণের অনেক সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ পড়ে আমরা খুবই উপকৃত হয়েছি।

কবিতার সঙ্গে টাকা-পয়সার কোনও সম্পর্ক নেই, উপার্জন বৃদ্ধির জন্য আমি বিভিন্ন বাংলা দৈনিকের রবিবাসরীয় পৃষ্ঠার জন্য গল্প লিখে পাঠাতাম। ছাপাও হয়ে যেত, পেতাম প্রতিটির জন্য দশ-পনেরো টাকা। বসুমতীর রবিবাসরীয়তেও প্রকাশিত হল একটি গল্প, ছবিটবি দিয়ে। তারপর মাসের পর মাস কেটে যায়, সেই গল্পের পারিশ্রমিক, যার গালভরা অন্য নাম সম্মানদক্ষিণা, তা আর আসে না। আমি পত্র-পত্রিকার অফিসে তখন পর্যন্ত যাইনি, ডাকে লেখা পাঠাই, ছাপা হলে ডাকেই পত্রিকার কপি আসে, কয়েক জায়গা থেকে মানিঅর্ডারও আসে। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম বলে ধরে নিয়েছিলাম। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে আড্ডার মধ্যিখান থেকে উঠে দু-একবার 'পরিচয়' পত্রিকার দফতরে গেছি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে,

সেখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দর্শন পাই। আর 'পূর্বাশা' পত্রিকার দফতরে আমি গিয়েছিলাম বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি পেয়ে, তিনি সেখানে সন্ধেবেলা দফতর সামলাতেন। কবিতা মনোনীত করে রেখেছিলেন আগেই, তবু ডেকেছিলেন, কারণ কৃত্তিবাসের দলবল সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ছিল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইছিলেন সবার কথা। 'দেশ' ও আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার অনেকগুলি লেখা ছাপা হয়ে গেলেও আমি কখনও ঢুকিনি সুতরকিন স্ট্রিটে (তখন রাস্তাটির এই নামই ছিল), ওখানকার নতুন কার্যালয় ভবনটিতে, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একটি চিঠি পেয়ে, প্রথম পা দিই। এখানেও কোনও লেখার অলোচনার জন্য নয়, নীরেনদা আমাকে ডেকেছিলেন একটি নাটকে অভিনয়ের ব্যাপারে। ওঁর একটি কাব্যনাটকের অভিনয়ের মহড়া তখন চলছিল দিলীপ রায়ের পরিচালনায় (ডি এল রায়ের ছেলে এবং রজনীকান্ত সেনের নাতি, এই দুই গায়ক দিলীপ রায়ের কথা আমরা জানি, তৃতীয় দিলীপ রায় ছিলেন কবি।)। নীরেনদা হরবোলায় আমার অভিনয় সম্ভবত দেখেছিলেন, তাই আমার অভিনয়-প্রতিভা সম্পর্কে আশান্বিত হয়েছিলেন। দু'-একবার রিহার্সাল দিয়ে কেন যেন শেষ পর্যন্ত সে-নাটকে আমার মঞ্চে নামা হয়নি। কবিতা না লিখে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর অভিনেতা হবার সম্ভাবনা আমার যথেষ্টই ছিল, কিন্তু ও লাইনে আমি লেগে থাকতে পারিনি।

এসব অনেক পরের কথা, তার আগে বসুমতী, কারও আমন্ত্রণ ছাড়াই সেখানে যেতে হয়েছিল আমাকে। কফি হাউসের বন্ধুরা বলল, বসুমতী অফিসে নিজে না গেলে টাকা পাওয়া যায় না। তাই গেলাম একদিন, চেনার কোনও অসুবিধে নেই। বউবাজার স্ট্রিটে বিশেষ দ্রষ্টব্য বাড়ি। ভেতরে ঢুকে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দেখি সামনেই সম্পাদকের ঘর, দরজার বাইরে তাঁর নামও লেখা। আমি আমার উদ্দেশ্যর কথা ব্যক্ত করতেই তিনি বিরক্তভাবে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে অতি কটু মুখভঙ্গি করে বললেন, টাকা? যাও, যাও এখান থেকে!

এ কথা ঠিক, এমন তুচ্ছ ব্যাপারে স্বয়ং সম্পাদককে বিরক্ত করা অনুচিত। কিন্তু আমি তো অনভিজ্ঞ। তখনও দাড়ি-গোঁফ কামাই না। প্রথম বাক্যটিতে বিনয়েরও অভাব ছিল না। তিনি বলতেই পারতেন, অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে গিয়ে খোঁজ নাও। কিংবা কাউকে ডেকে আমাকে যথাস্থানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে পারতেন, তিনি তা করলেন না। পোকামাকড়ের মতন অবজ্ঞা করলেন আমাকে।

যে সম্পাদক তরুণ লেখকদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করেন না, তাঁকে আখেরে পস্তাতেই হয়। কারণ, প্রবীণ বা খ্যাতিমান লেখকরা শারীরিকভাবে অজর, অবিনশ্বর নন, তরুণদের জন্য রাস্তা খোলা রাখতেই হয়। তা ছাড়া কী করে ভুলে যান যে তাঁরাও এক সময় তরুণ ছিলেন?

লেখা ছাপা হয়েছে, অথচ টাকা পাব না কেন? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, টাকা? তোমার নাম ক'জন জানে? তোমার মতন নতুন একজনের লেখা আর নাম ছাপা হয়েছে, তাই তো যথেষ্ট!

এমন কথা শুনেও আত্মাভিমানে ঘা লাগবে না, এরকম কোনও তরুণ লেখক থাকতে পারে? আমি তেজের সঙ্গে বললাম, নতুন আর পুরনোতে কী যায় আসে, আপনার পত্রিকায় এক পৃষ্ঠা জুড়ে আমার গল্প ছাপা হয়েছে, সেই জায়গাটার দাম দেবেন না? তা হলে ছাপতে গেলেন কেন?

তিনি পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে একটা পাঁচ টাকার নোট আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, যাও। বিদায় হও!

আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকাটা তুলে হাতের মুঠোয় গোল্লা পাকিয়ে তাঁর দিকে আরও জোরে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, আমি কি ভিখিরি নাকি? এ টাকা দিয়ে আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েদের চানাচুর খাওয়াবেন।

তিনি হেড অফিসের বড়বাবুর মতন রেগে আগুন, তেলেবেগুনে হয়ে ঘন ঘন বেল টিপে ডাকতে লাগলেন দারোয়ানকে। কিন্তু দারোয়ানের হাতে গলা ধাক্কা খাবার আগেই আমি দৌড়ে নেমে এসেছি রাস্তায়।

এই অপমানের জন্য অসম্ভব রাগে জ্বলেছি বেশ কিছুদিন। প্রায়ই দাঁতে দাঁত চেপে ভাবতাম, নিশুতি রাতে একদিন কেরোসিন তেল নিয়ে গিয়ে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে আগুন জ্বেলে দিয়ে আসব। কেরোসিনের টিন জোগাড় করে উঠতে পারিনি বলেই হয়তো সে সঙ্কল্প কাজে পরিণত হয়নি।

সম্ভবত আমার মতন আরও অনেক তরুণ লেখকের ক্রোধ ও অভিমানের দরুনই বসুমতী সাহিত্য মন্দির ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হতে শুরু করে। ওরকম ঐতিহ্যসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানটি কয়েক বছরের মধ্যেই একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। অনেক পরে রাজ্য সরকার সেটি অধিগ্রহণ করেও রক্ষা করতে পারেননি।

মাঝে মাঝে এরকম দু'-একটা গল্প লিখতাম বটে, কিন্তু গদ্য লেখায় ঠিক মন ছিল না। প্রকৃত আনন্দ কবিতার প্রথম পঙক্তিটি বিদ্যুৎ ঝলকের মতন অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হওয়ায়, সঠিক শব্দটি খুঁজে পাওয়ার জন্য যে আকুলি-বিকুলি তাতেও আছে সুখ, কোনও কোনও যন্ত্রণাও যেমন মধুর। তবে গল্প লেখার জন্য মানি অর্ডারে পনেরো টাকা পেলেও যে খুবই চনমনে বোধ করতাম, তাও ঠিক।

আমাদের এ-বাড়ির দোতলার বিপজ্জনক ঝুল বারান্দাতে মাঝে মাঝে ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়াতাম। কারণ সরু রাস্তার ওপারের দৃশ্যটি বড় নয়নাভিরাম। সেখানে কোনও বনেদি ধনীর বাগান সমেত প্রকাণ্ড বাড়ি। অনেকেই তখন এই ধরনের বাড়িকে রাজবাড়ি বলত, অনেক সভ্য দেশের নগরীর মতন কলকাতারও বেশ কিছু বাড়ির সামনে বা পেছনে বাগান থাকত। লন্ডনের কোনও কোনও পল্লীতে যেমন একচিলতে হলেও প্রত্যেক বাড়িতে বাগান রাখা বাধ্যতামূলক। কলকাতার ব্যক্তিগত মালিকানার বাড়িগুলির সেইসব বাগান এখন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিছু নব্যধনী মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের বাড়িতে সে রকম বাগান এখন থাকলেও থাকতে পারে, বাঙালিদের আর বাগান পোষার ক্ষমতা নেই। শ্যামপুকুরের মোড়ে যে মিত্র বাড়িতে আমি টিউশানি করতাম, সে বাড়ির বাগান যেন একপ্রান্ত থেকে শেষ দেখা যায় না, এ বাড়িটির বাগান তেমন বড় নয়, এবং উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, পথচারীরা দেখতে পায় না, কিন্তু একেবারে পাশেই দোতলার বারান্দা থেকে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ পরিদৃশ্যমান। অনেক রকমের গাছপালা ফুলে-ফলে ভরা, প্রচুর পাখি আসে সেখানে। দেখতে দেখতে আমার মনে হত, এই বাগানটির প্রকৃত মালিক কে? জমিটির মালিক ও বাড়ির শরিকরা, কিন্তু যারা দেখে, তারাও তো বাগানের শোভার অংশীদার। বকুল, কাঁঠালিচাঁপা ফুলের গন্ধের ঝাপটা পর্যন্ত নাকে আসে।

এক একদিন সন্ধের সময় সেই বাড়ির চিলেকোঠা থেকে একটি রমণীর চিৎকার ও জোর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতাম। খুবই রহস্যময় মনে হত, যেন কোনও শত্রুপক্ষের রাজকন্যাকে ওখানে বন্দিনী করে রাখা হয়েছে। পাড়ার লোক অবশ্য বলত, ও বাড়ির একটি বউ বদ্ধ ও হিংস্র ধরনের পাগল, তাই তাকে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়, কিন্তু আমার মনে তখন বন্দিনী রাজকন্যার চিত্রটিই বদ্ধমূল হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে কবিতা লেখারও চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। কবিতার মধ্যে কাহিনীর আভাস তো থাকতেই পারে, টি এস এলিয়ট কিংবা আঁরি মিসো'র কবিতা পড়ে তা আমরা জেনে গেছি, তবু কিছু কিছু কাহিনী যেন গদ্যভাষা দাবি করে। সে গল্পটি অবশ্য আজও লেখা হয়নি।

বাবা এ বাড়িতে এসে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রম তাঁর শরীর আর নিতে পারছিল না। আমার ক্ষুদ্র চাকরির উপার্জনেও তেমন কিছু সাহায্য হয়নি। অল্প বয়স

থেকে দেখেছি, বাবা ছটফটে স্বভাবের, জোরে জোরে হাঁটেন, এখন তাঁর চলাফেরা অনেক শ্লথ হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে রাস্তায় থেমে গিয়ে চেয়ে থাকেন আকাশের দিকে। অথচ তাঁর বয়স বেশি না, সদ্য পঞ্চাশে পা দিয়েছেন। রক্তে উচ্চচাপ ও শর্করা অধিকাংশ শিক্ষকের নিয়তি, তা তো তাঁর আছেই। কিছুদিন আগে থেকে তাঁর এক অদ্ভুত ধরনের হাঁচি শুরু হয়েছে। তিনি সিগারেট খান না কিন্তু সব সময় নস্যি নেন, এমনকী যখন হাতে নস্যি থাকে না, তখনও দুটি আঙুল নস্যি ধরার ভঙ্গিতে থাকে। যারা নতুন নস্যি নেয়, তারা হাঁচবেই, পাকা নস্যিখোরদের কিন্তু হাঁচি আসে না। এত বছর নস্যি নেবার পর বাবা হাঁচতে শুরু করলেন, বিরাট জোরে, একবার শুরু হলে ত্রিশ-বত্রিশবারের কমে থামে না। তখন তাঁকে খুবই অসহায় দেখায়। ডাক্তারেরা জানালেন, এটা এক প্রকারের হৃদরোগ, এর নাম ডাইলেশান অফ হার্ট!

চাকরি করতে করতে আমি বাবা-মাকে খুশি করার জন্য একটা কাজ করে ফেলেছিলাম, আমি গ্র্যাজুয়েট হবার পর আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইনি বলে আমার মায়ের মনে একটা গোপন দুঃখ ছিল। তাঁর মামাতো ভাইরা উচ্চশিক্ষিত, আর তাঁর ছেলেরা কেউ এম এ পাস করবে না? আমার মেজো ভাই অনিল অবশ্য এম এ পাস করেছিল যথা সময়ে, কিন্তু তা অনেক দূরের কথা। তখনও এম এ পাস সম্পর্কে অনেকের মোহ ছিল। অ্যাকাডেমি পড়াশুনোয় আমার আর আগ্রহ ছিল না, কিন্তু মায়ের ক্ষোভের কথা জানতে পেরে আমি ভাবলাম, তা হলে একটা এম এ পরীক্ষা দিলেই তো হয় প্রাইভেটে। অর্থনীতি সম্পর্কে আমার ভীতি জন্মে গিয়েছিল, সবচেয়ে সহজতম উপায় বাংলায় এম এ ডিগ্রি অর্জন করা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তেমন সহজ হয়নি!

যতদূর মনে পড়ে, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় তো বটেই, দেবেশ রায়ও সেবার বাংলায় এম এ পরীক্ষা দেয়। এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায় আমারই মতন বি এ পাসের পর কোথাও চাকরি নিয়ে নির্দিষ্ট বছরের দু' বছর পরে এম এ পরীক্ষায় বসে। আমি তখন চাকরি, টিউশানি ও কৃত্তিবাস পত্রিকার সম্পাদনায় খুবই ব্যস্ত, সময় খুব কম, তারই মধ্যে কালিদাস বসু নামে এক বন্ধুর বাড়িতে পড়াশুনো করতে যাই মাঝে মাঝে, সেখানে মোহিত, শিবশম্ভু পাল, দিব্য ভট্টাচার্য ও নিতাই পালের মতন ভালো ছাত্রেরা অনেক নোট তৈরি করে রাখে। আমাদের অন্য বন্ধু ফণিভূষণ ভট্টাচার্য আগেই যথাসময়ে ভালো রেজাল্ট করে পাস করেছে। তার নোটও আমাদের কাজে লাগত। আবার কখনও যাই দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। দীপেনের পারিবারিক অবস্থানটি বিচিত্র, সে কট্টর কমিউনিস্ট হলেও তার এক দিদি ও পিসি, মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূরবী মুখোপাধ্যায় শুধু কংগ্রেস নেত্রী নন, সে আমলে মন্ত্রীও হয়েছিলেন। আমি রাজনীতি থেকে বিযুক্ত হলেও দীপেনের সঙ্গে ছাত্রজীবনের পরেও বেশ কয়েক বছর আমার গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, যদিও মাঝে মাঝে খুব তর্ক হত, আমার তুলনায় দীপেনের শরীরের আয়তন অর্ধেক হলেও এক এক সময় সে বলত, এক থাপ্পড় মারব!

আমি প্রচুর বাংলা বই পড়েছি বলে মনে করেছিলাম, বাংলার এম এ তুড়ি দিয়ে পেয়ে যাব। কিন্তু বই পড়া বা বাংলা জানা আর পরীক্ষা এক নয়। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী মুখস্থ করতে হয়, পালি ও প্রাকৃত ভাষা শিখতে হয় কিছুটা, এসব ধারণা ছিল না। কিন্তু একবার জলে নেমে সাঁতার না কেটে তো উপায় নেই। অন্যদের তুলনায় অনেক কম প্রস্তুতি নিয়ে আমি বসলাম পরীক্ষা দিতে। দীপেনের প্রতিভায় আমি এমনই মুগ্ধ ছিলাম যে আমার বিশ্বাস ছিল, দীপেনই সেবার প্রথম হবে।

মোহিতের মনে আছে কি না জানি না। সেবারে আমরা এম এ পরীক্ষাতেও টুকলি করার চেষ্টা করেছি। মাঝে মাঝেই সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি ছিটিয়ে দিতে পারলে রচনা ও অন্যান্য উত্তরপত্রের গৌরব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তত সংস্কৃত তো মনে গাঁথা নেই। একজন কেউ বন্ধু বুদ্ধি দিল, পরীক্ষা হলের হাই বেঞ্চে কাঠের ওপর কপিইং পেন্সিল দিয়ে কিছু লিখে রাখলে অন্য কেউ দেখতে পায় না, কাগজ নয় বলে ধরা পড়ারও ভয় নেই। অই পরীক্ষা শুরু হবার বেশ

আগে দ্বারভাঙ্গা হলে ঢুকে হাইবেঞ্চে অনেক সংস্কৃত শ্লোক লিখে রাখলাম। কিন্তু হায় নিয়তি! ঠিক মতন আলো না থাকলে কপিইং পেন্সিলের লেখা পড়া যায় না। আমাদের বসবার জায়গার কাছেই একটা জানলা। ইনভিজিলেটর বা পরিদর্শক মশাই সেই জানলায় হেলান দিয়ে আগাগোড়া একটা ডিটেকটিভ বই পড়তে লাগলেন। আমাদের কাছে কাগজ বা বই থাকলেও তা দেখে দেখে লেখা যেত। কিন্তু আলোর অভাবে কপিইং পেন্সিলের কোনও লেখাই কাজে লাগানো গেল না। সে ভদ্দরলোককে তো আর সরে যেতে বলতে পারি না!

এরপর কিছুদিন আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃসহ সময় কেটেছে। তখন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের আগেই বিভিন্ন অধ্যাপক-পরীক্ষকের কাছে নম্বর জানতে চাওয়ার রেওয়াজ ছিল। আটশো নম্বরের পরীক্ষা, প্রতিটি পেপারে পঞ্চাশ পঞ্চাশ দুটি ভাগ। কোনও অর্ধেক পেপারে পনেরোর কম নম্বর পেলে সে নম্বর আর যোগ হয় না। বন্ধুরা বিভিন্ন অধ্যাপকের কাছে গিয়ে নম্বর জেনে উল্লসিত হচ্ছে, আমার সময় কম তাই যেতে পারি না, শুধু একদিন গেলাম দল বেঁধে সুকুমার সেনের কাছে। তিনি উদারভাবে বলে দিচ্ছেন, তাঁর পেপারে কে পেয়েছে সাঁইত্রিশ, কে বত্রিশ, কে ছাব্বিশ। আমার ব্যাপারে তিনি একেবারে চুপ। বন্ধুরাও সন্ত্রস্ত। আমি মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার, আমি কি কুড়িরও কম পেয়েছি? তিনি উদাসীনভাবে নীরব। আঠেরো? তিনি নিরুত্তর! পনেরো? পূর্ববৎ! সেই বিশালকায় পণ্ডিত, যিনি অতি সহৃদয় ও ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তিনি আমায় কাঁপুনি ধরিয়ে দিলেন। তবে কি আমি এ পেপারে ফেল করেছি? অন্য পেপারগুলির তো খবরই জানি না!

তখন এম এ পরীক্ষায় থার্ড ক্লাসও ছিল। জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থার নাম থার্ড ক্লাস, লোকে এমনভাবেই কথাটা উচ্চারণ করত। কোনও একটা ফিল্ম খুবই খারাপ, লোকে মুখ বেঁকিয়ে বলত, থার্ড ক্লাস! ইলিশ মাছে স্বাদ নেই। লোকে মুখে তুলেই বলত, থার্ড ক্লাস। ট্রেনের কামরাও ছিল থার্ড ক্লাস। সেই জন্যই থার্ডের এই দুর্নাম। এখন ট্রেন ও এম এ পরীক্ষা থেকে থার্ড ক্লাস তুলে দেওয়া হয়েছে।

চূড়ান্ত ফলাফল বেরোবার কয়েকদিন আগে আমার মনে হল, তবে কি আমি বাংলায় এম এ পরীক্ষায় ফেল করব? তার চেয়েও খারাপ, থার্ড ক্লাস পাওয়া, ফেল করলে তবু একটা মিথ্যে অজুহাত ছিল, সবকটা পেপারে পরীক্ষা দিইনি, এ বছর ড্রপ করেছি। কিন্তু থার্ড ক্লাস? পরীক্ষা যে সবকটা দিয়েছি, তাও তো অনেকেই জানে! আমি একখানা বিতর্কিত উদীয়মান, না, প্রায় উদিত তরুণ কবি, একটি কবিতা পত্রিকার সম্পাদক, যে পত্রিকার বেশ নামডাক হয়েছে। সেই আমি বাংলা পরীক্ষায় ফেল করব কিংবা থার্ড ক্লাস? আমার তো থুতু ফেলে ডুবে মরা উচিত। ঝোঁকের মাথায় এম এ পরীক্ষা দিতে গিয়ে কী আহাম্মকিই না করেছি! পরীক্ষা দিতে নেই, পরীক্ষা না দিয়ে কত মানুষ কত উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তৈরি করে যায়।

খবরের কাগজে বেরোল, সেদিন এম এ পরীক্ষার ফলাফলের তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কয়েকজন বন্ধু ডাকতে এল আমাকে। সেই ভাঙা বারান্দায় (ভারে এক সময় তার এক অংশ সত্যিই ভেঙে পড়েছিল) দাঁড়িয়ে রইলেন বাবা আর মা। তাঁদের সেই ব্যাগ্র, ব্যাকুল মুখ মনে পড়তে লাগল বারবার। আমার বুকের মধ্যে ভূমিকম্প চলছে। ঠিক করেই ফেলেছি, ফেল বা থার্ড ক্লাস পেলে আর বাড়ি ফিরব না, আত্মহত্যার সাহস সঞ্চয় করতে যদি না পারি, নিরুদ্দেশে চলে যাব।

আমি যে আত্মহত্যা করিনি বা নিরুদ্দেশ যাইনি, তাতেই বোঝা যাবে যে আমি কোনওক্রমে সেকেন্ড ক্লাসই পেয়েছিলাম। সে স্থান কত ওপরে বা নীচে তা আর কে জানতে যাচ্ছে! এবং সে বছর কেউই ফার্স্ট ক্লাস পায়নি! কেন সুকুমার সেন আমাকে অত ভয় দেখিয়েছিলেন, তা আজও জানি না।

এম এ পাস করার পর দেবেশ, মোহিত, দিব্য এবং আরও অনেকে অধ্যাপনা শুরু করে।

দীপেন কী জীবিকা নিয়েছিল তা মনে নেই, সম্ভবত সে কমিউনিস্ট পার্টির ফুল টাইমার হয়ে এক সময় 'পরিচয়' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হয়েছিল। আমার ওই এম এ পরীক্ষাটা কোনও কাজেই লাগেনি। এমনকী আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেটটা নেবারও কোনও গরজ বোধ করিনি। অর্থাৎ নেওয়াই হয়নি কখনও। বাবা-মা খুশি হয়েছেন, তাই যথেষ্ট।

রেজাল্ট বেরোবার দিনও সন্ধের সময় আমাকে দক্ষিণ কলকাতায় টিউশানি করতে যেতে হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াতে পড়াতে বেশ অস্থির বোধ করছিলাম। কেন না, বন্ধু-বান্ধবরা অপেক্ষা করছে কলেজ স্ট্রিটে, রাত্তিরে অনেক হই-হল্লা হবে। দুর্বলতা চাপতে না পেরে এক সময় বলেই ফেললাম, জানো তো, আজ আমি এম এ পাস করেছি। ছাত্র-ছাত্রী দু'জনেই চমকিত এবং উৎফুল্ল। বিশেষত ছাত্রী অনুরাধার মুখে বিস্ময়, আনন্দ, বিষাদ খুব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। সে তক্ষুনি তার মাকে ডেকে আনল। কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা জানতেনই না যে সে বছর আমি এম এ পরীক্ষা দিয়েছি, সে কথা আমি সযত্নে গোপন রেখেছিলাম। তিনি সত্যিকারের চমকিত ও পুলকিত হয়ে আমার জন্য বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অনুরাধার আন্তরিক ঝলমলে মুখখানা দেখে আমার মনে হল, যাক, আমার অল্প পরিশ্রমে এম এ পরীক্ষা দেওয়াটার কিছুটা মূল্য আছে তা হলে।

একত্রিশ

প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখের ভোরে আমরা যেতাম জোড়াসাঁকোয়। এখন রবীন্দ্র জন্মোৎসব সবচেয়ে বেশ ঘটা করে হয় রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে, তখন জোড়াসাঁকোই ছিল মূল কেন্দ্র, প্রচুর ছেলেমেয়ে দিনটিকে পবিত্র জ্ঞান করে স্নানটান সেরে, শুদ্ধ বস্ত্র পরে হাজির হত সেখানে, অনেক লিট্‌ল ম্যাগাজিন গোষ্ঠীও উপস্থিত হত, কৃত্তিবাসের দলটিও জড়ো হত এক কোণে। বাংলার সমস্ত গায়ক-গায়িকা আসতেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, সঙ্গীতের আসর পরিচালনা করতেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন তিনি, আমাদের চোখে ঠাকুরবাড়ির একমাত্র জীবন্ত প্রতিনিধি, অবশ্য অন্য পরিচয়ে তিনি বাংলার ব্যর্থতম রাজনৈতিক নেতা। এমন একটি বিপ্লবী দল গড়েছিলেন, যার নেতা ছিল কিন্তু কোনও কর্মী ছিল না, তিনি কয়েকবার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে একবারও জয়ী হতে পারেননি।

জোড়াসাঁকোয় প্রচুর ভিড় হত, সেখানে আমরা বিক্রি করতাম কৃত্তিবাস পত্রিকা, নতুন সংখ্যা ছাড়াও পুরনো অবিক্রীত সংখ্যারও বেশ চাহিদা ছিল, আমরা ঘাড়ে করে নিয়ে যেতাম কয়েক বাণ্ডিল, ফেরার সময় এক কপিও থাকত না। পকেট ভর্তি খুচরো পয়সা, সদলবলে সেই দ্বিপ্রহরে কফি হাউসে আসর গুলজার করা হত। ওই রকম সময়েই কোনও এক বছরে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসটি বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় কফি বোর্ড। এই কফি হাউসটি কলকাতার অন্যতম সাংস্কৃতিক পীঠস্থান, অন্য রাজ্যের, এমনকী বিদেশেরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এখানকার পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। সুতরাং কফি হাউস বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। একদিন গিয়ে দেখি বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদে আমরা টেবিল দখল করে, মোমবাতি জ্বেলে চিৎকার করে গান গেয়েছিলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রতিবাদ আরও কয়েকদিন চলেছিল, তারপর সেখানকার কর্মীদের নিয়ে সমবায় গঠন করে আবার চালিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়, কফি হাউস বন্ধ হয়নি।

রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর আগে পাড়ায় পাড়ায়, মফস্বলে এরকম রবীন্দ্র-পূজার প্রচলন ছিল

না। শতবার্ষিকীর বছরে যত উৎসবের আয়োজন হয়, কোনও লেখককে কেন্দ্র করে তেমন উৎসব পৃথিবীর আর কোনও দেশেও হয়েছে বলে মনে হয় না। ইউনেস্কো একটি কার্যসূচি গ্রহণ করেছিল, ভারত সরকার এ দেশের প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে একটি রবীন্দ্রভবন স্থাপনের উদ্যোগ নেয় এবং পশ্চিম বাংলায় প্রতিটি জেলা শহরেও রবীন্দ্রভবন তৈরি হতে থাকে। বহু বিদেশি প্রসিদ্ধ লেখক ও মনীষী এসেছিলেন বিভিন্ন উৎসবে যোগ দিতে। তাঁদের মধ্যে ইতালিয়ান ঔপন্যাসিক আলবার্তো মোরাভিয়া হঠাৎ বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিলেন, তিনি নাকি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানেন না। আমন্ত্রণ পেয়ে ভারতে এসেছেন তাজমহল দেখতে।

পশ্চিম বাংলায় সেই পঁচিশে বৈশাখ দিনটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে পালিত হয়েছিল পুণ্যদিনের মতো। সকালবেলা শাঁখ বাজিয়ে, প্রভাতফেরি দিয়ে শুরু। রাসবিহারী এভিনিউ ধরে শ্বেতবস্ত্র পরা যে প্রভাতফেরির দলটি যাচ্ছিল গান গাইতে গাইতে, তার পুরোভাগে ছিলেন এক দীর্ঘকায় তরুণ, সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায়কে সম্ভবত আর কোনও মিছিলে কখনও দেখা যায়নি। 'রবীন্দ্রনাথ' নামে তাঁর তথ্যচিত্রটি প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল দিল্লিতে।

রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীতে বাঙালির এত উদ্দীপনার অন্য কারণও আছে। বাঙালিরা চতুর্দিকে মার খাচ্ছে অনবরত, মননে এবং শরীরেও। উদ্বাস্তুদের স্রোত অব্যাহত, শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাঁটা যায় না, রিলিফ ক্যাম্পগুলিতে অসংখ্য মানুষ জীবন্মৃতের মতন দিন কাটাচ্ছে। বিহার-ওড়িশা-মধ্যপ্রদেশের খানিক খানিক এলাকা নিয়ে তৈরি হয়েছে দণ্ডকারণ্য প্রকল্প, কিন্তু সেই পাহাড়ি, অরণ্যসঙ্কুল অচেনা পরিবেশে বাঙালি উদ্বাস্তুরা যেতে চায় না। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও তাদের পশ্চিম বাংলাতেই রেখে দিতে চায় ভোটের স্বার্থে, যদিও পশ্চিম বাংলায় ঠিক কোন কোন অঞ্চলে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, সে রকম কোনও পরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাননি। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খন্না বিদ্রূপ করে বিবৃতি দিলেন, দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার চেয়ে বিনা পরিশ্রমে ত্রাণ শিবিরে বা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে থাকতে চাওয়াটা বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্মগত রোগ! কর্মঠ পঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা তো এর মধ্যেই অনেকটা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। (পঞ্জাবি উদ্বাস্তুদের জন্য অর্থ বরাদ্দও যে হয়েছে অনেক বেশি। সে তথ্য উল্লিখিত হয় না।)

অসম রাজ্যেও (তখন বলা হত আসাম, এখনও ইংরেজিতে তাই লেখা হয়) ঢুকে পড়েছে প্রচুর উদ্বাস্তু। সে রাজ্যে বাঙালিরা সংখ্যাগুরু হয়ে যেতে পারে, এ জন্য অসমিয়ারা শঙ্কিত। এমনিতেই ব্যবসাবাণিজ্য ও চাকরির ক্ষেত্রে বাঙালিদের আধিপত্যের জন্য অসমিয়াদের মধ্যে মনে মনে ক্ষোভ জমছিল, তাদের ভাষা সম্পর্কে অনেক শিক্ষিত বাঙালির, এমনকী রবীন্দ্রনাথেরও মনোভাব সঠিক ছিল না। জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন-অধিনায়ক-এ অসম রাজ্যের নাম উল্লেখ নেই বলে সেখানকার বহু অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত বর্জন করা হয়। (আমি একবার অসম সাহিত্য সভার অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে জাতীয় সঙ্গীতের ঘোষণার পর সবাই উঠে দাঁড়াবার পর শুনলাম, সে জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন নয়, অন্য।) নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য অসমিয়ারা সচেতন হতে হতে ক্রমশ উগ্র হয়ে ওঠে, বাঙালিদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে এক সময় শুরু হল সংঘর্ষ, তার পরিণতি ষাট সালের ভয়াবহ বাঙালি-বিরোধী দাঙ্গা।

স্বাধীনতার পর ভারতীয়ত্ব বোধের চেয়েও প্রাদেশিকতা বাড়ছে অনেক বেশি। বিভক্ত রাজ্য হিসেবে ক্ষুদ্র পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা গুরুত্ব হারাচ্ছে দিন দিন, তাদের একমাত্র গর্বের বিষয় রবীন্দ্রনাথ।

শতবার্ষিকীর সময় আমাদের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। মহাজাতি সদনে এক বিশাল

উৎসবে আমাদের ডাক পড়েছিল সমবেতভাবে গান গাইবার জন্য। একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয়, গদ্য লেখকরা প্রায় কেউ-ই গান জানে না, অনেকের গলায় সুর নেই, কিন্তু কবিরা প্রায় সকলেই গান গাইতে পারে। কিংবা এমনকী বলা যেতে পারে যে, যাদের অন্তরে খানিকটা সুর আছে, তারাই কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হয়? আমাদের সমসাময়িক একজন গল্প লেখক একবার বিরক্তির সঙ্গে বলেছিল, কবির দল যখন তখন গান গেয়ে ওঠে কেন, সে ব্যাপারটা আমি বুঝি না!

যাই হোক, মহাজাতি সদনের মঞ্চে শক্তি, শরৎকুমার, প্রণব মুখোপাধ্যায়, আমি এবং আরও কেউ কেউ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শুরু করলাম গান, সামনে প্রচুর দর্শক-শ্রোতা। দু'-এক পঙ্‌ক্তি গাইতে না গাইতেই ভেতরে শুরু হল গুঞ্জন, তারপর কেউ কেউ চিৎকার করে কী যেন বলতে লাগল। কারণটা ঠিক বোঝা গেল না, শ্রোতারা আমাদের গান পছন্দ করছে না! কিন্তু সুর তো ভুল হচ্ছে না, এক এক জন এক এক দিকে যাচ্ছি না, আগে রিহার্সাল দিয়ে নিয়েছি। চ্যাঁচামেচি আরও বাড়ছে, লোকেরা কি আমাদের থামতে বলছে? আমরা খারাপ গাইছি না, থামব কেন? তারপর অবস্থা এমন হল, কয়েকজন চেয়ার তুলে মারতে এল আমাদের। উদ্যোক্তারা পর্দা ফেলে দিল, তাড়াতাড়ি আমাদের পেছনের দরজা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল বাইরে।

আমাদের অপরাধটা কী, তা বুঝতেই পারছি না, প্রাণ বাঁচাবার জন্য লাগালাম দৌড়।

পরে জানা গেল, গানের জন্য নয়, আমাদের অপরাধ আমরা প্যান্ট-শার্ট পরে গান গাইতে উঠেছিলাম মঞ্চে। রবীন্দ্রসঙ্গীত একটা পবিত্র ব্যাপার, প্যান্ট-শার্ট পরে গাইলে যে তার অপমান হয়, তা আমরা জানব কী করে? সুবিনয় রায়কে দেখেছি বটে, অন্য সময় তিনি স্যুট পরেন। কিন্তু মঞ্চে গান গাইতে বসার সময় ধুতি-পাঞ্জাবি। গায়িকারাও শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখেন গলা পর্যন্ত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জার্মানিতে যখন নিজের গান গেয়েছিলেন, তখন কি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ছিল?

কল্লোল যুগের যে-সব তরুণ লেখক-কবিরা রবীন্দ্র-বিরোধী বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা সবাই এই সময়ে পরিণত বয়েসে রবীন্দ্র-ভক্ত হয়ে গেছেন। শতবার্ষিকীর সভা-সমিতিতে তাঁদের উজ্জ্বল আসন। রবীন্দ্র-বিরোধিতার সঠিক মর্ম পাঠকরা কোনওদিন বুঝতে পারেননি। রবীন্দ্র-বিরোধীরা ব্যক্তিগতভাবে সকলে বরাবরই রবীন্দ্র-ভক্ত। রবীন্দ্র-বিরোধিতা যেমন এক সময় খুবই প্রয়োজনীয় ছিল, আবার রবীন্দ্র-সরোবরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত না হলে কারও পক্ষে বাংলা ভাষায় কিছু লেখাও সম্ভব নয়। আমাদের দশকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দূরত্ব হয়ে গেছে অনেকখানি, আমাদের পক্ষে আর রবীন্দ্র-বিরোধিতার কোনও কারণ ছিল না, কিন্তু যে-সব গুরুবাদী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতেন, যাঁরা বলতেন, রবীন্দ্রনাথের পর আর কিছুই পাঠযোগ্য লেখা হয়নি, তাঁদের প্রতি উষ্মায় অনেক সময় কটুবাক্য বেরিয়ে এসেছে!

শান্তিনিকেতনের উৎসব দেখার জন্য আমরা সদলবলে গিয়েছিলাম। সেখানে তখন প্রচুর জনসমাগম, কোনও গেস্ট হাউস-হোটেলে স্থান পাবার উপায় নেই। কিন্তু আমাদের কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর একজন শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করে, অনেকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে, গিয়েছি তার ভরসায়। কিন্তু আমরা কেন খবর না দিয়ে এসেছি এই বলে সে ভর্ৎসনা করে কোথায় মিলিয়ে গেল, আর তার পাত্তাই পাওয়া গেল না। রাত্রে ফেরার ট্রেন নেই, আমাদের শুতে হবে গাছতলায়, তাতেও কোনও অসুবিধে ছিল না, কিন্তু আমাদের সঙ্গে রয়েছে একটি যুবতী! সাতজন পুরুষ ও একটি যুবতী শুয়ে আছে গাছতলায়, এ দৃশ্য তখনকার শান্তিনিকেতনে কোনওক্রমেই অনুমোদিত হত না। তা ছাড়া কয়েকজন ভি আই পি-র পদার্পণে সুরক্ষা বাহিনীর কড়াকড়ি ছিল। এ সঙ্কট মোচনে এগিয়ে এল আমার এক কলেজের সহপাঠী অরুণ মজুমদার, সে তখন বিশ্বভারতীতে অর্থনীতির অধ্যাপক, তার ঘরটি ছেড়ে দিল আমাদের জন্য। একমাত্র বিমল রায়চৌধুরী ছাড়া আমরা সবাই অবিবাহিত, তার স্ত্রী কবিতা সিংহ অনেক সময়ই আমাদের

সহযাত্রিণী হয়, কফি হাউসের দু'-তিনখানা টেবিল জোড়া আড্ডায় সে-ই একমাত্র নারী সদস্য। অরুণের ঘরখানি খুবই ছোট, একটি মাত্র সরু খাট পাতা, সেটি দেওয়া হল বিমল-কবিতাকে, মেঝেতে আমরা বাকি ছ'জন। টিনের মধ্যে সার্ডিন মাছ যে-রকম থাকে, সেরকমই গায়ে গায়ে টাইট, এমনকী এপাশ-ওপাশ ফেরারও উপায় নেই। সারা রাত তো একভাবে শুয়ে থাকা যায় না। সেইজন্য পাশ ফিরতে হলে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ বা ডানদিকে ফিরে আবার শুয়ে পড়তে হয় খাপে খাপ মিলিয়ে। এরপর অনেক বছর ধরে আমাদের অন্যতম সঙ্গী ভাস্কর দত্ত অঙ্গভঙ্গি করে এ-গল্প বহু লোককে শুনিয়েছে। এর মধ্যে শক্তির স্বভাব লাথি ছোঁড়া, বিমল রায়চৌধুরী ঘুমের মধ্যে কথা বলে, কবিতা সিংহ একবার পড়ে গেল খাট থেকে—স্মরণীয় রাত্রি আর কাকে বলে!

তবু সেবারের পরমপ্রাপ্তি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাছ থেকে দেখা, তাঁর গান শোনা। এরপর যতবার তাঁকে দেখেছি, মনে হয়েছে, ইনি মর্ত্যের মানবী নন, কিন্নরী। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে যে-সব রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছি, সেগুলি মুখস্থ হয়ে গেছে, এবং সেই সব গান অন্য কারও কণ্ঠে ঠিক যেন মানায় না। 'রূপে তোমায় ভুলাবো না', গানটি বহুদিন অন্য কোনও গায়িকা গাইতে সাহস পাননি। তেমনই, 'বাজে করুণ সুরে'।

এর মধ্যে আবার বাবার মাঝে মাঝেই শরীর খারাপ হতে হতে এক সময় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। তাঁর টিউশানির উপার্জন বন্ধ হয়ে গেল, স্কুলের অর্ধ বেতন, সামনে আরও দুঃসময়ের আশঙ্কা। সেই সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে যতটা দায়িত্ব আমার পালন করা উচিত ছিল, আমি তা করিনি। মাইনের টাকা বাড়িতে দিতাম বটে, কিন্তু মনটা বারমুখো। সেই বয়সটায় বন্ধুদের সঙ্গে প্রায় সমকামীদের মতন নিবিড় সম্পর্ক। কয়েকজন বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে সারা দিনে একবার অন্তত দেখা না হলে সর্বাঙ্গে ছটফটানি শুরু হয়। বাড়িতে অভাব, তবু কৃত্তিবাস পত্রিকা বার করতেই হবে, এ এক ধরনের পাগলামিরই মতন।

বাবার চিকিৎসার অবশ্য ত্রুটি হয়নি। তখন বিধান রায়ের পরই দ্বিতীয় ধন্বন্তরী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত। তিনি সপ্তাহে একদিন বিনা পয়সায় রুগি দেখতেন, তা জেনে বাবাকে একদিন নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। সেদিন সাঙ্ঘাতিক রাগ ধরে গিয়েছিল, যদিও তা অসহায় মানুষের রাগ। এইসব বিখ্যাত, ব্যস্ত ডাক্তারদের বিনা পয়সায় রুগি দেখা নিছক ভড়ং বলে মনে হয়েছিল, উদারতার নাম ছড়াবার একটি প্রক্রিয়া। ভালো করে কিছুই শোনেন না, সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে অন্য বিষয়ে আলোচনা করতে করতে মাঝে মাঝে এদিকে তাকিয়ে হুঁ-হুঁ করেন। পাড়ার ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান দেখে একটি মাত্র ওষুধের নাম বদলে দিলেন, ওষুধের ডিপোয় চাকরি করি বলে আমিও বুঝতে পারি, সেটি আসলে একই ওষুধের ভিন্ন কোম্পানির ভিন্ন নাম। রোগী এবং তার সঙ্গীর দিকে একবার অন্তত পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দু'-একটি সান্ত্বনাবাক্য বলা কি চিকিৎসকদের দায়িত্বের অঙ্গ নয়? দু'-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করে যে-রোগীরা, তাদের জন্য এক গেলাস জল খাওয়াবারও ব্যবস্থা থাকে না।

ডাক্তারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার উল্টোদিকে গিয়ে ট্যাক্সি ধরতে হবে। অনবরত গাড়ি আসছে-যাচ্ছে, উদ্‌ভ্রান্তভাবে বাবা আমার হাত ধরলেন। রোগা হয়ে গেছেন অনেক, পাঞ্জাবি প্রায় ভেদ করে উঁচু হয়ে আছে পিঠের দু'দিকের হাড়, চামড়া শিথিল হয়ে গেছে, তাঁর হাতটি ঠাণ্ডা। বাচ্চা বয়সে যখন গ্রাম থেকে আসতাম, কলকাতার রাস্তার গাড়ি-ঘোড়ার বিপদ সম্পর্কে আমাকে সব সময় সচেতন করে দেওয়া হত, রাস্তা পার হবার সময় বাবা শক্তভাবে আমার হাত ধরে রাখতেন, তাঁর মুঠি দৃঢ়, ব্যক্তিত্বপূর্ণ। তারপর অনেক বছর পিতা-পুত্রের হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, পথও বদলে গেছে। এখন বদলে গেছে ভূমিকা, এখন পুত্রই হাত ধরে রাস্তা পার করাচ্ছে পিতাকে, গাঁক গাঁক শব্দে এগিয়ে আসছে দোতলা বাস, বাবা ভয় পেয়ে থমকে যাচ্ছেন, ছেলে মাঝ রাস্তায় বুক চিতিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিতেই বুঝিয়ে দিচ্ছে, ভয়ের কিছু নেই,

আমি তো আছি! বাবা বলছেন, ট্যাক্সি ভাড়া অনেক, তার দরকার কী, আমি বাসেই যেতে পারব। ছেলে এক সময় বাবার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে কথা বলার সাহস পেত না, কোনও কথার প্রতিবাদ করত না, এখন সেই ছেলেই বলছে, না, বাসে ঝাঁকুনি লাগবে, ট্যাক্সি ডাকছি। বাবার যে হাতে ছেলে অনেকবার জোরালো থাপ্পড় খেয়েছে, এখন দুর্বল হয়ে পড়া সেই হাতটিই ধরে ছেলে তাঁকে সাহায্য করছে ট্যাক্সিতে উঠতে।

অ্যালোপ্যাথিক ওষুধে কোনও উপকার হচ্ছে না দেখে আত্মীয়স্বজনদের পরামর্শে শুরু হল কবিরাজি চিকিৎসা। উত্তর কলকাতায় তখন অনেক নামজাদা কবিরাজ ছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে প্রবীণ কবিরাজ বনাম আধুনিক ডাক্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী লিখেছিলেন আরও কিছুদিন পর, তখনও পর্যন্ত কবিরাজি চিকিৎসায় অনেকেরই দৃঢ় আস্থা ছিল, আর মাত্র এক দশকের মধ্যেই কবিরাজরা ক্রমশ অদৃশ্য হতে শুরু করেন। একজন বেশ রাশভারী চেহারার কবিরাজ দেখতে লাগলেন বাবাকে, তাঁর ভিজিট অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদেরই সমান। আমি লক্ষ করলাম, কবিরাজরা ইংরেজি বলতে ভালোবাসেন, কথার মাঝে মাঝেই ইংরেজি শব্দ। অর্থাৎ বোঝাতে চান, অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের চেয়ে তাঁরা শিক্ষায় দীক্ষায় কম নন। অনেক কবিরাজই কিন্তু সংস্কৃত ভালো জানতেন, যে জ্ঞান অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের নেই, কিন্তু সংস্কৃত নিয়ে গর্ব করার দিন চলে গেছে। অনেক বাংলা অধ্যাপকেরও ইংরেজি বলার দুর্বলতা দেখেছি এই একই কারণে।

আমাদের দেশে কেউ কিছুদিন রোগে শয্যাশায়ী হলে আত্মীয়স্বজনরা তাঁকে দেখতে আসেন, এটাই প্রথা, না এলে মনে করা হয় তাঁদের সামাজিকতা বোধ নেই, আত্মীয়দের প্রতি টান নেই। প্রতিদিনই এক গুচ্ছ আত্মীয় আসেন, তাঁদের চা খাওয়াতে হয়, কুশল বিনিময়ের পরই তাঁরা রোগীর ঘরে বসেই গল্প জুড়ে দেন। সকলের গল্পই এক, তাঁরা ঠিক এই অসুখের লক্ষণযুক্ত রোগী আর কোথায় কোথায় দেখেছেন, এবং সেই রোগীরা কী ভাবে মারা গেছে! অনেকেই আবার শখের ডাক্তার, নিজস্ব কোনও ওষুধ বা টোটকার কথা বলবেন, থানকুনি পাতা দিয়ে কাঁচকলার ঝোল জাতীয় পথ্য বাৎলাবেন কিংবা ডাক্তার-কবিরাজ বদল করার পরামর্শ দেবেন। অনেকেরই একজন করে চেনা ডাক্তার থাকে, যাঁরা আর সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আত্মীয়স্বজন ছাড়াও বাবার পরিচিতের সংখ্যা অনেক, প্রাক্তন ছাত্ররাও আসেন, সকলেই উপদেশ নানারকম। সেইসব অভ্যাগতদের ধাক্কা সামলাবার ভার মায়ের ওপর দিয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রটি যখন তখন পালিয়ে যায়।

কিছুদিন কবিরাজি ওষুধ খেয়ে বাবার কোমা হয়ে গেল। তখন এত নার্সিংহোম হয়নি, হাসপাতালে পাঠাবার কথাও কেউ বলেনি। তাঁকে বাড়িতেই রাখা হল, অর্ধচেতন অবস্থা, মাঝে মাঝে কিছু বলে ওঠেন। তা ঠিক বোঝা যায় না। আমার দিদিমাও এসে আছেন কিছু দিন ধরে, মার সঙ্গে তিনিও নিয়েছেন সেবার ভার। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি প্রায় পলাতক হলেও তার অন্য দুটি ভাই ও বোন প্রায় সব সময়ই বাবার কাছাকাছি থাকে।

সপ্তাহ দু'য়েক পর তাঁর কোমার অবস্থা কেটে গিয়ে আবার জ্ঞান ফিরে এল পুরোপুরি, তিনি উঠে বসে নিজেই খাবার খেতে পারেন, খবরের কাগজ পড়েন, রেডিয়ো শোনেন। সারা বাড়িতে যে গুমোট বিষণ্ণভাব ছিল, সেটা কেটে গেল। বাবার কথাবার্তা বদলে গেল কিছুটা। এর আগে দেশ-বিভাগের ব্যথা-বেদনা তাঁকে কখনও প্রকাশ করতে দেখিনি। সংসার ও আশ্রিতদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতেই এত ব্যস্ত থাকতেন যে স্মৃতিচারণেরও সময় পেতেন না। দেশ বিভাগের পর গোড়ার দিকে তাঁর ধারণা ছিল, আরও অনেকের মতন, দশ বছরের মধ্যেই খণ্ডিত ভারত আবার জোড়া লেগে যাবে। সতেরোশো সাতান্ন, আঠারোশো সাতান্ন, আবার উনিশশো সাতান্নতে ঘটবে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু উনিশ শো সাতান্ন কেটে গেল, তার চার বছর পরেও সেরকম কোনও লক্ষণ তো দেখা গেলই না, বরং দু'দেশের মধ্যে

সম্পর্ক ক্রমেই বিষিয়ে যাচ্ছে, উৎকট এক সমস্যা হয়ে ঝুলছে কাশ্মীর।

কোমা থেকে সেরে ওঠার পর বাবা অনর্গল বলতে শুরু করলেন তাঁর দেশের বাড়ির কথা। এতদিন পর যেন তাঁর আবার মনে হল, তিনি পশ্চিমবাংলার নাগরিক নন, এখানে তো বাসা ভাড়া করে থাকা, তাঁর আসল বাড়ি পূর্ববঙ্গে। তিনি বলতে লাগলেন, অনেকদিন বাড়ি যাওয়া হয়নি, এবার যেতে হবে, দরজার একটা কব্জা বদল করা দরকার ছিল, বাতাবি লেবু গাছটায় এক সময় অনেক ফল হয়, গোয়ালন্দ ঘাটের সেই হোটেলের খাওয়া তোর মনে আছে? স্টিমার নেমে সেই হোটেলে খাব, তারপর নৌকোয়...ধুয়াসার গ্রামের পাশ দিয়ে...কত শাপলা ফুল ফুটেছে, চুনীকে লিখে দিলে সে মাদারিপুরে থাকবে, এই মাসেই যাব...(গ্রামে আমাদের এক নিকট প্রতিবেশীর পুত্রের নাম চুনী, তাঁকে আমরা চুনীকাকা বলে ডাকতাম। সেই পরিবারটি এদিকে চলে আসেনি, তখনও ওখানেই, দু'বছর আগে সেই চুনীকাকা মাদারিপুরের কাছেই রাস্তার ওপরে খুন হন, সে খবর আমরা জেনেছিলাম। বাবা এই রকম অনেক মৃত ব্যক্তিকেই জীবন্ত মনে করতে শুরু করলেন।)

একদিন সকালে বাবা আমাকে পাশে বসার ইঙ্গিত করে বললেন, তোর সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে। আমি বিছানার একপ্রান্তে বসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাবা চুপ করে রইলেন। যেন ঠিক কী ভাবে কথাটা শুরু করবেন, সেই ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। একটু পরে আবার বললেন, তোর সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে। তারপর আবার চুপ। নিশ্বাস ফেলছেন ক্লান্তভাবে। এইভাবেই কেটে গেল প্রায় আধ ঘণ্টা। ঘরে অন্য লোকজন এসে গেল।

সেই বিশেষ কথাটি আর আমার শোনা হল না। সেইদিন সন্ধের পর পূর্ব বাংলার মাইজপাড়া গ্রামের কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, টাউন স্কুলের শিক্ষক, সংসারযুদ্ধে বিধ্বস্ত সৈনিকের মতন শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করলেন মৃত্যুর কাছে। তাঁর বয়েস তখন একান্ন। জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বয়স সাতাশ, অন্য ছেলেমেয়েরা তখনও ছাত্র-ছাত্রী। তাঁর স্ত্রী মীরার শরীরে-মনে তখনও প্রৌঢ়ত্বের ছোঁয়া লাগেনি।

বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি কিছুই নেই। মৃত্যুকালে বাবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা ছিল এগারোশো টাকা। এই তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয়। অসুস্থ অবস্থাতেও মাঝে মাঝে বলতেন, টাকাটা তুলে দিতে হবে।

উইল করার কোনও প্রশ্ন নেই, মৃত ব্যক্তির ব্যাঙ্কের টাকা অন্য কেউ তুলতে পারে না, শ্রাদ্ধ-শান্তির খরচের জন্য আমাদের টাকা ধার করতে হয়েছিল। সাকসেশান সার্টিফিকেট নামে একটি অতি দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করে ব্যাঙ্ক থেকে সে টাকা তুলতে সময় লেগেছিল তিন বছর।

বাবা শেষবারের মতন একবার বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। যাওয়া হল না। শেষদিন তিনি আমায় কী বিশেষ কথা বলতে চেয়েছিলেন, সে কৌতূহল আমার রয়ে গেল আজীবন।

বত্রিশ

এক সময় পার্ক স্ট্রিটের নাম ছিল সাহেবপাড়া, ষাটের দশকের প্রথম দিকেও সেখানে অনেক সাহেব-মেম দেখা যেত, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছিল প্রচুর এবং তখনও পর্যন্ত বিদেশি পর্যটকরা কলকাতা শহরটিকে অচ্ছুত হিসেবে গণ্য করেনি। কলকাতা মিছিল-নগরী ছিল বটে কিন্তু নোংরা-আবর্জনাময় শহর হিসেবে বদনাম রটেনি, চৌরঙ্গি-ময়দান-জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি-দক্ষিণেশ্বর-বোটানিকাল গার্ডেনে ঘুরে বেড়াত নানা বর্ণের ও বিচিত্র পোশাক পরা

অসংখ্য পরদেশী ভ্রমণকারী। দূর থেকে তাদের দেখতাম, কখনও পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি। প্রথম যে বিদেশির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, তাঁর নাম অ্যালেন গিন্‌সবার্গ।

বুদ্ধদেব বসু একবার আমেরিকায় অধ্যাপনা সেরে এসে দেশ পত্রিকায় 'বিট বংশ ও গ্রীনিচ গ্রাম' নামে একটি চমৎকার রচনা লিখেছিলেন, সেটি পড়েই প্রথম বিট কবি-লেখক সম্প্রদায় যা বিটনিকদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে পারি। তার আগে জ্যাক কেরুয়াক, অ্যালেন গিন্‌সবার্গ, গ্রেগরি করসো, লরেন্স ফের্লিংগেটি এই সব নাম ভাসা ভাসাভাবে শোনা ছিল শুধু। এবং খবরে পড়েছিলাম, অ্যালেন গিন্‌সবার্গের 'হাউল' নামের একটি চটি কবিতার বই এক লক্ষ (কিংবা এক মিলিয়ান বা দশ লক্ষও হতে পারে) কপি অতি দ্রুত বিক্রি হয়ে সারা বিশ্বের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে এবং জ্যাক কেরুয়াকের 'অন দা রোড' সেই সময়কার তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর উপন্যাস। বিট কবি-লেখক-চিত্রশিল্পী-সঙ্গীতশিল্পীরা এক বিশেষ ধরনের জীবনদর্শনে বিশ্বাসী। এরা কোনও প্রকার সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করে না। জীবিকার জন্য কারও দাসত্ব করতে রাজি নয়, জীবনযাত্রার মান খুব কমিয়ে, অর্থাৎ ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে, আধ-পেটা খেয়েও কোনওক্রমে দিন কাটাতে পারে, অতীন্দ্রিয়বাদের দিকে খুব ঝোঁক। এবং গাঁজা-ভাঙ-চরস-মেস্কালিন-পিয়োটি প্রভৃতি নেশার দ্রব্য ব্যবহার করে অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধানী।

এইসব নেশার দ্রব্য নিয়ে তখন খুব আলোচনা চলছে, পক্ষে-বিপক্ষে নানারকম যুক্তি, টিমোথি লিয়ারি নামে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মান্যগণ্য অধ্যাপক ঘোষণা করেছেন যে মদ-সিগারেট ইত্যাদি অত্যন্ত খারাপ নেশা কিন্তু গাঁজা শরীর ও মনের জন্য বিশেষ উপকারী। অলডাস হাক্সলির মতন উচ্চমার্গের বুদ্ধিজীবী লেখকও 'ডোরস অফ পারসেপশান' নামে বই লিখে অবচেতনের গহনলোকের সন্ধানে নেশার প্রভাবের কথা ব্যক্ত করেছেন। আমাদের দেশের সাধু-সন্ন্যাসীরা যেমন গাঁজা-ভাঙ খেয়ে দৈব উপলব্ধির সন্ধান করেন, লেখক-শিল্পীরাও তেমনই এইসব সেবন করে পেতে পারেন নতুন সৃষ্টির প্রেরণা। (বলাই বাহুল্য, এই মতের বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যাই বেশি।) বিট সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের আউল-বাউল-সহজিয়াদের খুব একটা তফাত নেই। এ সবই সমাজের ধরা-বাঁধা গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিদ্রোহের সুর তখন চতুর্দিকে, ইংল্যান্ডেও তখন কিংসলে অ্যামিসের মতন তরুণ লেখকরা অ্যাংরি ইয়াংমেন নামে পরিচিত হচ্ছেন, এমনকী সোভিয়েত রাশিয়াতেও ইয়েফতুশেঙ্কো ও ভজনেসেন্‌স্কির মতন কবি ভাঙতে চাইছেন রাষ্ট্রীয় নির্দেশ।

আমেরিকায় বুদ্ধদের বসুর সঙ্গে যখন অ্যালেন গিন্‌সবার্গের দেখা হয়, তখন সে বলেছিল, আমি একদিন ভারতবর্ষে যাবই, এমনকী যদি পায়ে হেঁটেও যেতে হয়, তাও সই। ভারতের আধ্যাত্মিক রহস্যময়তার প্রতি তার এমন প্রবল টান। এবং সত্যিই, প্রায় পায়ে হেঁটেই এবং মধ্যপ্রাচ্যে হিচ হাইকিং করে ও কিছুটা জাহাজে চেপে সে হাজির হয়েছিল এ দেশে। কলকাতায় এসে সে বুদ্ধদেব বসু-আবু সয়ীদ আইয়ুব-নীহাররঞ্জন রায়- শিশিরকুমার ভাদুড়ী-সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাঘা বাঘা বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সেরে তারপর নিজেই তরুণ লেখকদের সন্ধানে হাজির হয় কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে।

অ্যালেনের সঙ্গে ছিল পিটার অর্লভস্কি, স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে, তারা দুই বন্ধু। অ্যালেনের মধ্যমাকৃতি, পাতলা চেহারা, মুখভর্তি দাড়ি, কোনওদিন চুলও কাটে না বোধহয়, বাবড়িতে সদ্য টাক পড়তে শুরু করেছে, আমাদের চেয়ে বছর দশেকের বড়, আর পিটার লম্বা-চওড়া বলশালী পুরুষ, দাড়ি-গোঁফ নেই, মুখখানি লাজুক ধরনের, দুজনেই ততদিনে পাজামা-পাঞ্জাবি পরতে শুরু করেছে, পায়ে রবারের চটি। অ্যালেন অন্যদের সঙ্গে পিটারের আলাপ করিয়ে দেবার সময় বলত, এ আমার স্ত্রী! এবং পিটারের মুখে সম্মতিসূচক হাসি।

পুরুষে-পুরুষে কিংবা নারীতে-নারীতে সমকাম যে ভূ-ভারতে কখনও ছিল না তা নয়, চিরকালই ছিল, কিন্তু রক্ষা করা হয়েছে কঠিন গোপনীয়তা, ওই সম্পর্ক অনুচ্চার্য। পশ্চিম

গোলার্ধেও এই সম্পর্কের দৃষ্টান্ত আছে সেই অ্যারিস্টটলের আমল থেকে, সেখানেও গোপনীয়তা রক্ষা করা হত, জানাজানি হলেই সামাজিক লাঞ্ছনা, এমনকী কারাদণ্ডও। এতগুলি শতাব্দী পেরিয়ে হঠাৎ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই গোপনীয়তা ও নিষেধাজ্ঞা ভেঙে তছনছ হয়ে গেল, লজ্জা কিংবা ভয় তুচ্ছ করে দিকে দিকে অনেক মানুষ নিজেদের সমকামী বলে ঘোষণা করতে লাগল। শুধু শিল্পে-সাহিত্যে নয়, একটানা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তখন নানাভাবেই বিদ্রোহ শুরু হচ্ছে, যেমন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেও গুঞ্জরিত হচ্ছিল বিক্ষোভ, যার প্রকাশ ঘটে হাঙ্গেরি ও চেকোস্লোভাকিয়ায়, তেমনই ধনতান্ত্রিক আমেরিকাতেও জেগে উঠেছে কৃষ্ণাঙ্গরা, মাঝে মাঝেই ফুঁসে উঠছে ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবীরা। সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকে ধিক্কার জানায় প্রকাশ্যে। মানুষের যৌনসঙ্গী নির্বাচন তার ব্যক্তিগত রুচি এবং পারস্পরিক সম্মতির ব্যাপার, সেখানে সমাজ বা রাষ্ট্রের নাক গলানো কিংবা নীতিবাগিশতা আর মানুষ মেনে নিতে রাজি নয়।

সমকামকে প্রকৃতির নীতিসম্মত বলা যায় না, কারণ প্রকৃতির অমোঘ বিধান, অনন্ত উৎপাদন। শুধু মানুষ নয়, পশুপাখি, গাছপালা, জলজ প্রাণীরাও শুধু বংশ বৃদ্ধি করে যাবে। কিন্তু মানুষ তো প্রকৃতির বিরুদ্ধেও গেছে বারবার, এবং জয়ীও হয়েছে। আগে সমকামীদের মনে করা হত বিকৃত-মানস কিংবা পঙ্গুতার মতন কোনও রোগগ্রস্ত, কিন্তু এখন প্রকাশ্য ঘোষণার পর জানা যেতে লাগল, অনেক রাষ্ট্রনেতা, মন্ত্রী, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, চিকিৎসকও সমকামী, তাঁদের মেধা ও পরিচালন-ক্ষমতা উচ্চস্তরের এবং সামাজিক জীবন সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক। নারী-মুক্তি আন্দোলনের নেত্রীরাও এই সম্পর্কের স্বীকৃতি জানালেন। এমনকী সিনেমার জনপ্রিয় রোমান্টিক নায়ক, যার প্রেমের দৃশ্যের অভিনয় দেখে লক্ষ লক্ষ যুবতীর হৃদয় আন্দোলিত হয়, হঠাৎ খবর ফাঁস হয়ে যায় যে সেই রকম কোনও কোনও নায়কও ব্যক্তিগত জীবনে নারীদের পছন্দ করে না, পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে বসবাস করে। মাত্র শ'খানেক বছর আগে দুর্ধর্ষ প্রতিভাবান লেখক অস্কার ওয়াইল্ডকে এই অপবাদে জেল খাটতে হয়েছিল এবং তাঁর পরবর্তী জীবনটাও ধ্বংস হয়ে যায়, আর এখন পুরুষে-পুরুষে কিংবা নারীতে-নারীতে বিবাহ পর্যন্ত কোনও কোনও জায়গায় আইনসিদ্ধ।

অ্যালেন গিন্সবার্গ অত্যন্ত শিক্ষিত মানুষ, কাব্য-সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে অনেক পড়াশুনো করেছে, কিন্তু সেই বয়েসে তার নানারকম চমক সৃষ্টির দিকে ঝোঁক ছিল, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে আচার-ব্যবহারে উগ্র, তার বিশ্বাস ছিল, সশস্ত্র বিপ্লবীদের মতন শিল্পী-সাহিত্যিকরাও যদি প্রথা ভাঙতে চায়, তবে তাদেরও উগ্রপন্থী হওয়া দরকার। একবার এক কবিতা-পাঠের আসরে (কলকাতা নয়, তার স্বদেশে) একজন শ্রোতা মাঝপথে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করেছিল, এসব কবিতার মানে কী? অ্যালেন কোনও উত্তর না দিয়ে, মঞ্চে দাঁড়িয়েই জামা-প্যান্ট-জাঙ্গিয়া খুলে ফেলে সহাস্যে বলেছিল, এই আমার কবিতার মানে! কলকাতায় প্রগতিশীল নামে পরিচিত কিছু ব্যক্তি অ্যালেনকে আমেরিকার চর বা সি.আই.এ.-র এজেন্ট আখ্যা দিয়েছিল, তখন তাদের চোখে সব আমেরিকানই সি.আই.এ.। অ্যালেন যে তার অনেক কবিতায় আমেরিকা নামে দেশটা ও সেখানকার শাসকদের কী প্রচণ্ড গালিগালাজ দিয়েছে, তা এরা পড়েনি। পঞ্চাশ বছর আগেও এরকম কোনও কবির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ফাঁসি হত! যে-কোনও দেশেরই সব মানুষকে এক শ্রেণীতে ফেলা এক ধরনের মূর্খতা।

অ্যালেন আর পিটার প্রথমে এসে উঠেছিল চাঁদনি বাজারের কাছে আমজাদিয়া নামে একটি অতি নিম্নমানের হোটেলে, স্যাঁতসেঁতে ঘর, দেওয়ালে ময়লা দাগ, জানলা বন্ধ হয় না, বিছানা ভর্তি ছারপোকা। শৌচাগারটি এমনই নোংরা ও কদর্য যে আমাদেরও গা ঘিনঘিন করে, হাতল ভাঙা মগটিও শ্যাওলা ধরা। শ্বেতাঙ্গ, তায় আমেরিকান, তারা যে এমন কষ্টসহিষ্ণু হতে পারে তা আমাদের ধারণায় ছিল না। ওদের দেশে অনেক গণ্ডা ফাউন্ডেশন, যারা লেখক-শিল্পীদের

নানাভাবে অর্থ সাহায্য করে, বিট জেনারেশনের কেউ তাদের দ্বারস্থ হবে না, সরকারি অনুগ্রহও নেবে না। শুধু বই বিক্রির টাকায় পিটারসহ অ্যালেনের বিশ্বপরিভ্রমণ। যতই বিক্রি হোক, চটি কবিতার বই, তার দামও সামান্য। এই আত্মনিগ্রহও যেন সাধনা। অ্যালেন প্রায়ই বলত, কবিতা রচনা চব্বিশ ঘণ্টার কাজ, সুতরাং অন্য কোনও জীবিকা নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আমার ও অ্যালেন গিন্‌সবার্গের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত। সে কবিতার জন্য আত্ম-নিবেদিত, আর আমি জীবিকার ধান্দায় অহোরাত্র নিবদ্ধ। সকালে টিউশানি, দুপুরে সরকারি অফিসে কেরানিগিরি, পিতৃবিয়োগের পর সন্ধ্যাতেও একটি সংবাদপত্র অফিসে পার্টটাইম কাজ নিয়েছি, রাত্রে আর একটি টিউশানি। তারই মধ্যে কৃত্তিবাস সম্পাদনা ও গভীর রাতে কিছু লেখালেখির চেষ্টা। তখন থাকি নাগের বাজারের কাছে ষাটগাছিতে, সেখান থেকে দক্ষিণ কলকাতা পর্যন্ত বারবার ছোটাছুটি, তারই ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা দিতে যেতাম অ্যালেনদের সঙ্গে। সুখের বিষয় সরকারি চাকরিতে ফাঁকি দেবার অনেক সুযোগ ছিল। (ফাঁকি কথাটা বোধহয় ঠিক হল না, কাজের অভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার বলাই সঙ্গত।) আমার চেয়ে বরং শক্তির সঙ্গে অ্যালেনের জীবনযাত্রা ও জীবনদর্শনের মিল অনেক বেশি। শক্তি তখন দাড়ি রাখে, কোনও কাজকর্মে মন নেই, কবিতা লেখাই তার ধ্যানজ্ঞান এবং কবিতার জন্য সে যথেচ্ছাচারও করতে পারে। অ্যালেনের সঙ্গে শক্তি একবার চলে গেল তারাপীঠ, আরও কোথাও কোথাও গিয়েছিল বোধহয়, বাড়ির বাইরে রাত কাটানো শক্তির পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। একবার অনেকে মিলে দল বেঁধে যাওয়া হয়েছিল জামসেদপুরের এক সাহিত্য-সমাবেশে, অ্যালেন গিন্‌সবার্গ তখনই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি হলেও আত্মাভিমান ছিল না বিন্দুমাত্র, অনাহূতভাবেই আমাদের সঙ্গী হয়ে সেও গিয়েছিল সেখানে। জামসেদপুর থেকে সমীর রায়চৌধুরীর কাছে চাইবাসায়, আমি তখন ফিরে এসেছি। সমীর ও তার ভাই মলয় সম্ভবত সেই সময়েই অ্যালেনের কাছে প্রেরণা পেয়ে কিছু পরবর্তীকালে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের পরিকল্পনা করে।

সে সময় আমার সঙ্গে অ্যালেনের তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি, আমি সময় পাইনি। শক্তি, সন্দীপন, শরৎকুমার, তারাপদ রায়, উৎপলকুমার বসু, জ্যোতির্ময় দত্তের সঙ্গেই অন্তরঙ্গতা হয়েছিল বেশি। আমার সঙ্গে পরিচয় দৃঢ় হয় অনেক পরে, বিশেষত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়, যখন লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এপারে চলে এসে যশোর রোডের দু'পাশে সামান্য সামান্য ছাউনির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে কোনওক্রমে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছে। তখন আমেরিকায় বব ডিলান, জন বায়েজদের মতন সঙ্গীতশিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা এইসব শরণার্থীদের সাহায্যকল্পে একটি কমিটি গড়েছিল এবং সেই কমিটির পক্ষ থেকে অ্যালেনকে পাঠানো হয়েছিল সরেজমিনে বাস্তব অবস্থা দেখে আসার জন্য। দ্বিতীয়বার কলকাতায় এসে অ্যালেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে, আমিই তাকে নিয়ে যাই যশোর সীমান্ত পর্যন্ত। সেবারেও অতি বর্ষণে যশোর রোড ডুবে গিয়েছিল কিছু জায়গায়, তার ফলে শরণার্থীদের যন্ত্রণা ও মৃত্যুহার বেড়ে গিয়েছিল অনেকখানি, গাইঘাটার কাছে গাড়ি ছেড়ে আমাদের নৌকোয় চাপতে হয়েছিল। শরণার্থী শিবিরগুলি অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে দেখার পর ফিরে গিয়ে অ্যালেন তাদের জন্য অর্থ সংগ্রহে প্রচুর উদ্যম নেয় তো বটেই এবং লেখে তার বিখ্যাত কবিতা 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'। সে কবিতায় সুর দিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে সে গানও গেয়েছে বহু সমাবেশে, সে গানটির রেকর্ডও বেরিয়েছে। সে গান যদি কেউ মন দিয়ে শোনে, তা হলে হঠাৎ এক জায়গায় আমার নামটি তার কানে ধাক্কা দেবে।

কলকাতা ও কাশী মিলিয়ে অ্যালেন ও পিটার প্রথমবারে থেকে গিয়েছিল ছ'মাস। বিশেষ কোনও প্রসঙ্গ না থাকলেও একজন কবির সঙ্গে আলাপচারিতে অনেক কিছু জানা হয়ে যায়। শুধু ইংরেজে কবিতা নয়, ফরাসি ও জার্মান কবিতা সম্পর্কেও অ্যালেনের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, তাঁর কাছে শিখেছি আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার কথা। অ্যালেনের তোলা একটি ফটোগ্রাফ

দিয়ে হয়েছিল এক সংখ্যা কৃত্তিবাসের মলাট, তাঁর সঙ্গে বসে আমি তার তিনটি কবিতার অনুবাদ করে ছাপিয়েছিলাম আমাদের পত্রিকায়। অ্যালেনও আমাদের কয়েকজনের কবিতা অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিল সিটি লাইট জার্নালে। ওদের দলেরই অন্যতম কবি লরেন্স ফের্লিংঘেটির সিটি লাইট নামে বইয়ের দোকান ও প্রকাশনা আছে সানফ্রান্সিসকো শহরে।

আমাদের দেশে সাধু-সন্ন্যাসী, সঙ্গীতশিল্পী থেকে রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালারা পর্যন্ত অনেকেই গাঁজায় দম দেয় বহু যুগ ধরে, মধ্যবিত্তদের মধ্যে তা ছিল ঘৃণার বস্তু। মধ্যবিত্ত এমনকী উচ্চবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়েরা গাঁজা টানতে শেখে সাহেবদের কাছ থেকে। প্রথমে বিট জেনারেশন, পরবর্তীকালে তাদেরই বংশধর হিপিরা গাঁজার ধোঁয়াকে জাতে তুলে দেয়। ভিয়েতনামে আমেরিকানদের অন্যায্য ও অমানবিক যুদ্ধের প্রতিবাদেই হিপি সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং তারা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। অ্যালেন গিন্‌সবার্গকে তারা গুরু বলে মেনেছিল, তার কাছ থেকে ওরা প্রধানত তিনটি জিনিস নেয়, রাস্তা-ঘাটে শুয়ে থাকার মতন কষ্টসহিষ্ণুতা, গাঁজা ও হরে কৃষ্ণ হরে রাম গান। এ ব্যাপারে আমারও সামান্য কৃতিত্ব আছে। অ্যালেন হরে কৃষ্ণ গানটি প্রথম শোনে কাশীতে, কিন্তু সুরটি ঠিক তুলতে পারছিল না। তার অনুরোধে এক রাত্রে ওই দু' লাইন গান অন্তত পঞ্চাশবার গেয়ে শোনাতে হয়। আমি বারবার তাকে শুধরে দিয়েছি, হড়ড়ড়ে কৃস্‌স্‌না নয়, হরে কৃষ্ণ, ড্যাম নয়, রাম...। অর্থাৎ হিপিদের গুরু অ্যালেন গিন্‌সবার্গ, আমি অ্যালেন গিন্‌সবার্গের ওই গানের গুরু বলা যেতে পারে। ও গান তো আর আমাদের শিখতে হয় না, বাল্যকাল থেকে শুনে শুনে কানে গেঁথে যায়।

আমাদের কয়েকজনকে গাঁজা টানার দীক্ষা দিয়েছিল অ্যালেন। শ্মশান যে একটা দ্রষ্টব্যস্থান কিংবা নিয়মিত গন্তব্য স্থান, তা আমরা আগে জানতাম না। অ্যালেন ও পিটারের সঙ্গে আমরা অনেক সন্ধে ও মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কাটিয়েছি নিমতলা শ্মশানে। সেখানে গুটিকতক ভক্ত পরিবৃত হয়ে বসে থাকে এক এক জন সাধু। কিছু গাঁজা কিনে নিয়ে গিয়ে আমরাও জুড়ে যেতাম সেই ভক্তদের সঙ্গে। সাধুবাবা তরিবত করে এক একবার গাঁজা সেজে প্রথমে নিজে প্রসাদ করে দেন, তারপর কল্কেটি গোল হয়ে হাতে হাতে ঘোরে। প্রথম প্রথম মনে হত, গাঁজা ব্যাপারটা একটা প্রচণ্ড ধাপ্পা, ওতে কোনও নেশাই হয় না। পরে আস্তে আস্তে তার মর্ম বুঝেছি, গাঁজা শুধু টানলেই হয় না, তার সঙ্গে অনেকখানি মনঃসংযোগ দরকার। কয়েকবার দম দেবার পর শুরু হয় সাধুবাবার সঙ্গে কথাবার্তা। অ্যালেন প্রত্যেক সাধুর কাছ থেকেই জানতে চায় তাঁর দৈবী অভিজ্ঞতার কথা। কোন পদ্ধতিতে জাগ্রিত হয় কুলকুণ্ডলিনী, কখন উন্মীলিত হয় তৃতীয় চক্ষু ইত্যাদি। সাধুদের লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা হচ্ছে হিন্দি, আমাদের কারও কারওকে দোভাষীর কাজ করতে হয়। একদিন এক সাধু অ্যালেনের নানা প্রশ্ন শুনে বললেন, তুমি তো আংরেজ, তুমি আমাদের শাস্ত্র সম্পর্কে কতটুকু জানো, সেটা না বুঝলে আমি উত্তর দেব কী করে? তা শুনে অ্যালেন আমাকে বলল, ওঁকে বলো, আমি একটা বাচ্চা, আমি প্রথম থেকে পাঠ নিতে চাই। আমি বলতে গেলাম, সাহেব বলছেন, হাম বাচ্চা হ্যায়...হঠাৎ আমাকে থামিয়ে দিয়ে, কালো ওড়নায় মাথা ঢাকা এক মেমসাহেব বিশুদ্ধ হিন্দিতে বলল, ম্যায় বাচ্চে হুঁ! অ্যালেনের সঙ্গে এরকম কেউ কেউ মাঝে মাঝে আসত, কেউ কেউ সহজেই শিখে নিত বাংলা বা হিন্দি, অ্যালেন অবশ্য কঠোরভাবে এক ভাষী।

আর একটি নেশার দ্রব্যের কথাও এখানে উল্লেখ করতেই হয়। তখন এল.এস.ডি. নামে একটি ড্রাগ অভূর্তপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। এল.এস.ডি-র পুরো নামটি আজ আর মনে নেই, এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল একটি চমকপ্রদ ওষুধ হিসেবে, পাগলদের চিকিৎসার জন্য। মানুষের কোনও স্মৃতিই নাকি হারায় না। মানসলোকের অনেক গহনে জমা হয়ে থাকে, উপরিতলে আর উঠে আসে না, এই ওষুধটি সেইসব অনেক স্মৃতি ফিরিয়ে দেয়। পূর্বস্মৃতি ফিরে পেলেই তো পাগলদের পাগলামি সেরে যাবে। ওষুধটি তখনও পরীক্ষামূলক, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কী কী হতে

পারে জানা যায়নি, এর মধ্যেই সেটি নেশার দ্রব্য হিসেবে দারুণ আকর্ষণীয় হয়ে গেল। লুপ্ত স্মৃতি কে না ফিরে পেতে চায়! ওষুধটি বাজারে ছাড়া হয়নি, কিন্তু আমেরিকায় বিজ্ঞানের ছাত্ররা কোনওক্রমে একটি-দুটি জোগাড় করে তার কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের পর নিজেরাই বানিয়ে ফেলতে লাগলেন ল্যাবরেটরিতে। নিষিদ্ধ ওষুধ হিসেবে সেটির দারুণ চাহিদা। অ্যালেনের কাছে এল.এস.ডি. সেবনের রোমহর্ষক বর্ণনা শুনে আমাদেরও খুব কৌতূহল হয়েছিল। খুবই কড়া ওষুধ, উল্টোপাল্টা ব্যবহারে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে। সে রকম ঘটেছেও। ছোট্ট ট্যাবলেট, প্রথমে একটি দিয়ে শুরু করতে হয়, কিছুদিন অভ্যস্ত হবার পর দুটি, তার বেশি খাওয়া সত্যিই বিপজ্জনক। যদিও জানা গেল, জ্যাক কেরুয়াক একসঙ্গে চারটি ট্যাবলেট খেয়ে তার মাতৃগর্ভে থাকার স্মৃতিও ফিরে পেয়েছিল। এই দাবির সত্যি-মিথ্যে জানি না, যদি সত্যি হয় তা হলে এই কারণেই জ্যাক কেরুয়াকের অকালমৃত্যু হয়েছিল কি না তাই-ই বা কে বলতে পারে।

এ দেশে এল.এস.ডি. পাওয়ার কথা নয়, কিছু হিপি সঙ্গে নিয়ে আসে। শক্তির অতিরিক্ত আগ্রহে অ্যালেন ওদের কাছ থেকে চারটি ট্যাবলেট জোগাড় করে দিল এবং এর ব্যবহার প্রণালী শিখিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিল বারবার। ওষুধটি খেয়েই শুয়ে পড়তে হয়, এর পর চার ঘণ্টা একটুও নড়াচড়া করা নিষেধ, এই সময়ের মধ্যে ক্ষুধাবোধ কিংবা মলমূত্র ত্যাগের ইচ্ছে কিছুই জাগবে না, তৃষ্ণা পেতে পারে, সেজন্যই পাশেই রাখা দরকার জলের পাত্র এবং অবশ্যই একজন বিনা নেশায় নজর রাখবে, হঠাৎ বুকে ব্যথা হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক ডাকতে হবে।

বন্ধুদের মধ্যে আর কেউ ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। আমার স্বভাব হচ্ছে এই, আমি নিজে থেকে হঠাৎ কোনও দুঃসাহসিক কাজ করতে পারি না, কিন্তু অন্য কেউ সেরকম কিছু শুরু করলে মনে হয়, দেখাই যাক না। সুতরাং শক্তির সঙ্গী আমি। নিজেদের বাড়িতে এইসব কাণ্ড করার সুবিধে নেই, তারাপদ রায় তখন মহিম হালদার স্ট্রিটের বাড়িতে একা থাকে। তারাপদ অসম্ভব বন্ধুবৎসল মানুষ, তাঁর ফাঁকা বাড়িতে আমরা অনেক অত্যাচার করেছি, সেখানেই শক্তি ও আমি ওষুধ মুখে দিয়ে শুয়ে পড়লাম এক খাটে পাশাপাশি। তারাপদ বসে রইল চেয়ারে।

সত্যিই আজীবন মনে রাখার মতন সেই অভিজ্ঞতা। শক্তি ও আমার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল দু' রকম। ওষুধটি খাওয়ার একটু পরেই চোখ বুজে আসে, তারপর দেখা যায় অসংখ্য রংয়ের কারুকার্য, যেন শূন্যতার মধ্যে হঠাৎ ঝাপটা মারছে রং, যেন একটা বিশাল দেওয়াল চিত্রিত হচ্ছে। তারপরই বিদ্যুৎ চমকের মতন কোনও দৃশ্য, কোনও রাস্তা, কোনও মানুষের মুখ, একটা জামা ছিঁড়ে যাওয়া, মাটিতে ঝনঝন করে পড়ল খুচরো পয়সা...। ক্রমশ দৃশ্যগুলি স্থির হতে থাকে, একবার দেখি যে একটা পুকুরের ধারে বাঁকা খেজুরগাছ বেয়ে উঠছে একটা ছ'-সাত বছরের ছেলে...কে ছেলেটি? তারপর চিনতে পারি, এ তো আমিই আমার ছ-সাত বছরের চেহারা, যেন সিনেমায় ধরে রাখা। এই রকম আরও দৃশ্য। এর মধ্যে জোর করে চোখ খুললে আবার সব কিছু সাধারণ হয়ে যায়, এই তো তারাপদর ঘর, চেয়ারে বসে চুরুট ফুঁকছে তারাপদ, দেওয়ালে জট পাকানো ইলেকট্রিকের তার...কিন্তু এই বাস্তবতাও খুব ক্ষণস্থায়ী, তারপরই মনে হয়, ঘরটা দুলছে, জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ছে মেঘ, দেওয়াল তো নেই, রামধনু।

মোট কথা সেই চার ঘণ্টা আমার কাছে সুমধুর উপভোগ্যই হয়েছিল, কিন্তু শক্তির তা হয়নি। কিছুক্ষণ পর থেকেই শক্তির মনে হয়, ওর পা দুটো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। তারাপদ ওর পায়ে হাত ছুঁইয়ে বলেছিল, সেরকম কিছু নয়, তবু শক্তি সে কথাই বলতে লাগল বারবার। তারপর শক্তির মনে হয়, মৃত্যুর সময় মানুষের পায়ের দিক থেকেই ঠাণ্ডা হতে শুরু করে। খুব সম্ভবত এই নেশার ঘোরে কোনও একটা চিন্তা একবার পেয়ে বসলে আর কিছুতেই যেতে চায় না। আমি যদিও শুনিনি, নিজেই তখন আচ্ছন্ন ছিলাম, তবে শক্তি নাকি সত্যি সত্যি মরে যাচ্ছে ভেবে এক সময় বলে উঠেছিল, তারাপদ, আমার লাস্ট ওয়ার্ড লিখে নে!

ঠিক চার ঘণ্টা পরে শক্তি আর আমি এক সঙ্গেই উঠে বসেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে খুব খিদে পেয়েছিল, কিন্তু আর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়নি। আরও দুটি ট্যাবলেট বাকি ছিল, শক্তি আবার একদিন এই নেশার পরীক্ষা করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারাপদ বন্ধুদের বাঁচাবার জন্যই সেই মূল্যবান বড়ি দুটি ফেলে দেয় নর্দমায়।

এর পরেও আমি আরও অনেক রকম নেশার দ্রব্য পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু একমাত্র সিগারেট ছাড়া আর কোনও নেশার দাসত্ব করিনি। এতগুলি বছর পরেও বুঝতে পারি, এই নিরীহ সিগারেটের মতন হারামজাদা নেশা আর হয় না। অনেক চেষ্টা করেও ছাড়তে পারছি না।

তেত্রিশ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, কিংবা তারও আগে যাঁরা কলকাতা শহর দেখেছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে, সব পাড়াতেই কিছু বাড়ির গায়ে 'টু-লেট' লেখা বোর্ড ঝোলানো থাকত। এই প্রজন্মের অনেকে হয়তো 'টু-লেট' মানেই বুঝবে না। তখন প্রচুর খালি বাড়ির মালিকরা ভাড়াটেদের ডাকাডাকি করত, ভাড়া নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা পাত্রী দেখার মতন বাড়ি ঘুরে দেখে অপছন্দের ঠোঁট উল্টে চলে যেত কিংবা দরাদরি করত, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতনই বাড়িওয়ালারা তোষামোদের হাসি হাসত। দেশ বিভাগের পর সে-অবস্থাটা একেবারেই উল্টে যায়। আগেকার সব খালি বাড়ি, ভূতের বাড়ি, বেওয়ারিশ বাড়ি ভর্তি হয়ে গেল, ভাড়া বাড়তে লাগল হু হু করে, বাড়িওয়ালা শ্রেণীরই তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ, ভাড়া ছাড়াও বে-আইনি কালো টাকার সেলামি নামে একটি প্রথা চালু হল, এমনকী যে ভাড়াপ্রার্থী চড়া ভাড়া ও সেলামি দিতেও রাজি, তার চেহারা বা আচরণ পছন্দ না হলে বাড়ির মালিক অবজ্ঞার সঙ্গে বাঁ হাত নেড়ে বলত, হবে না, হবে না! অর্থাৎ একই বস্তু বায়ার্স মার্কেট থেকে সেলার্স মার্কেটে রূপান্তরিত হয়ে গেল রাতারাতি।

আমাদের শ্যামপুকুর স্ট্রিটের আরামের বাড়িটি ছাড়তে হল এক বিচিত্র কারণে। বছরের পর বছর বাড়িওয়ালার কোনও হদিস ছিল না, আমরা রেণ্ট কন্ট্রোল অফিসে নিয়মিত ভাড়া জমা দিয়ে এসেছি। ভাড়া বাকি না পড়লে ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়, আদালতের নির্দেশ ছাড়া। সুতরাং আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। বাড়িওয়ালার পক্ষ থেকে কোনও রকম খোঁজখবর নেওয়া হয় না বলে অতি প্রয়োজনীয় কিছু কিছু মেরামতির কাজ আমাদের খরচেই করতে হত। বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পর এক সন্ধ্যায় সাদা প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরা এক সুদর্শন যুবক এসে হাজির হল, দেখলে মনে হয় সে বিমানবাহিনীর কর্মী, পরিচয় দেবার পর জানা গেল সে সত্যিই তাই এবং তার অন্য পরিচয়, এই বাড়ির মালিকদের পরিবারের সে অন্যতম জামাই। টাউন স্কুলের শিক্ষক মহাশয়টির মৃত্যুসংবাদ সে কোনও সূত্রে শুনে শোক প্রকাশ করতে এসেছে। তখন চা পানের সময়, তাকেও চা দেওয়া হলে সে সেই চায়ের প্রচুর সুখ্যাতি করে বিদায় নিল কিছু পরে। দু'-চারদিন পরেই সে ফিরে এল আবার আমাদের বাড়ির মতন চা নাকি সে আর কোথাও পান করেনি। তাই এসেছে সেই চায়ের টানে। এর পরেও সে আসতে লাগল ঘনঘন, চায়ের আকর্ষণেই, কিছুক্ষণ গল্প করে চলে যায়। তার ব্যবহার অতি ভদ্র, এবং মিষ্টভাষী, এরকম একজন এসে চা খেতে চাইছে এবং প্রত্যেকবার মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। আমি ওই সময় প্রায় দিনই বাড়িতে থাকি না। সে রান্নাঘরে আমার মায়ের কাছাকাছি বসে গাল-গল্পের ফাঁকে টুক করে বলা শুরু করল, মাসিমা, আপনার ছেলেকে বলুন, বাড়িটা ছেড়ে দিতে। এ

বাড়িটা আমার ভাগে পড়েছে, আমি এটা ভেঙে নতুন বাড়ি বানাব। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এরকম চলতে.থাকায় মা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। সে ভয় দেখায় না, মামলা-মোকদ্দমার কথা উচ্চারণও করে না, কিন্তু এমনই মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে লাগল যে মা আমাকে একদিন বললেন, নাঃ, আর এ বাড়িতে থাকা যাবে না। এ ছেলেটিকে দেখলেই এখন ভয় করে! ও চলে যাবার পরেও ওর নিশ্বাস এ-বাড়ির মধ্যে ভেসে বেড়ায়। যে-হেতু সে কখনও রুক্ষ ব্যবহার করেনি, সেইজন্য তার সঙ্গে ঝগড়ারও প্রশ্ন ওঠে না। সেই একজন চা খেতে আসা যুবকের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই আমরা সে বাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম।

পরে অবশ্য অনেক শুভার্থী আমাকে বলেছে যে, কলকাতা শহরের অমন সুবিধেজনক জায়গার বাড়িটি ছেড়ে দিয়ে আমরা অতি নির্বোধের মতন কাজ করেছি। সারা জীবনেও আমাদের তোলা যেত না নিয়মিত ভাড়া দিয়ে গেলে। বাড়িভাড়ার মামলা মিটতে লাগে কম পক্ষে দশ বছর, তাও বিচারকের রায় যায় ভাড়াটেদের পক্ষেই। ওই যুবকটির মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। স্বেচ্ছায় ছাড়তে হলেও মালিকদের কাছ থেকে-অন্তত পাঁচ-দশ হাজার টাকা আদায় করা যেত অনায়াসেই। এইসব ব্যাপারে আমি সত্যিই নির্বোধ।

এর আগে আমরা অনেকবার বাসা বদল করেছি, সে ব্যবস্থা করতেন বাবা, তাঁর ছাত্রদের অভিভাবকদের সাহায্য নিয়ে। এখন দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। কিছুদিন খোঁজাখুঁজির পর হন্যে হয়ে এই উপলব্ধি হল যে কলকাতা শহরের এলাকার মধ্যে টিকে থাকার সাধ্য আমাদের নেই। ষাটের দশক থেকেই অনেক নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত বাঙালি কলকাতা ছেড়ে মফস্বলে চলে যেতে বাধ্য হয়, আমাদেরও যোগ দিতে হল সেই এক্সোডাসে। শেষ পর্যন্ত দু'খানা ঘরের একটি ফ্ল্যাট পছন্দ হল নাগেরবাজার অঞ্চলে সাতগাছিতে, কেউ কেউ বলে ষাটগাছি, যোগীপাড়া রোডে। এত দূরের এই ফ্ল্যাটের ভাড়া শ্যামপুকুরের বাড়ির ছ'গুণ। নামে রোড হলেও রাস্তাটি বেশ সংক্ষিপ্ত, বাই লেন হওয়াই উচিত ছিল। পরে দেশ-বিদেশের অনেকে আমার ঠিকানা দেখে প্রশ্ন করেছে, ওখানে বুঝি অনেক যোগী থাকেন? তাঁরা কেমন? আমি অবশ্য কোনো যোগী দেখিনি।

বাড়িটি অবশ্য বর্ণনা দেবার মতনই মনোহর। বেশ কয়েক বিঘে জমির মাঝখানে একটি দোতলা বাড়িতে পাঁচটি ফ্ল্যাট, সামনে ও ডানদিকে বড় বড় গাছ ও বাগান, একটি পুকুর, ইনকাম ট্যাক্সের এক ধনাঢ্য উকিল এর মালিক। ফ্ল্যাটটির সামনে গোল বারান্দায় বসলে নানারকম গাছে দেখা যায় হরেক রকম পাখি। একেবারে সামনেই একটি লম্বা আতাগাছে মাঝে মাঝে এসে বসে একটি ইস্টকুটুম পাখি, পূর্ব বাংলার গ্রাম ছাড়ার পর এই পাখিটিকে দেখলাম অনেকদিন বাদে। গ্রাম ছাড়ার পর মাঝে মাঝে আমি কলকাতার গঙ্গায় সাঁতার কেটেছি, এখানে আবার সাঁতার শুরু হল। ভাড়াবাড়িতে থেকে সংলগ্ন পুকুরে সাঁতার কাটার বিলাসিতা ক'জনের হয়!

কৃত্তিবাসের ঠিকানাও বদলে গেল এই বাড়িতে। অনেক কবি ও কবিযশোপ্রার্থী অনেক দূর থেকে, এমনকী সুদূর দক্ষিণ কলকাতা থেকেও ঠিকানা খুঁজে খুঁজে আসত এখানে। এত বড় বাগানের মধ্যে উকিলবাবুর শখ করে বানানো বাড়িটি দেখে তাদের কারও কারও ধারণা হল, ওটা আমাদের নিজস্ব বাড়ি, অর্থাৎ আমি সম্পন্ন পরিবারের সন্তান। সরাসরি প্রশ্ন না করলে আমি তাদের এই ধারণাটি জিইয়ে রেখে মজা পেতাম।

বসবাসের পক্ষে বাড়িটি অতি চমৎকার ও আরামদায়ক, শুধু যাতায়াতের কষ্ট মেনে নিতেই হত। মফস্বলের বাসে হাঁড়-পাঁজরা পর্যন্ত ঝরঝরে হয়ে যায়। ঘোর দুপুরেও এইসব বাস ভিড়ে ভর্তি, প্রায়ই যেতে হত পা-দানিতে এক পা ঠেকিয়ে ঝুলতে ঝুলতে। সেই রকম ঝুলন্ত যাত্রার সময়েই এক সহযাত্রী যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়, তার নাম অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সে তখন বাগুইহাটির দিকে একটা স্কুলে ইংরেজি পড়ায়। একটা নাটকের দল গড়ে বাংলা নাটকে নতুন জোয়ার আনার স্বপ্নের কথা সে আমাকে শোনাত। আমারও তো তখন স্বপ্নই সম্বল।

এই বাড়িটির আর একটি বিশেষ সুবিধে ছিল। আমি সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত থাকি বাড়ির বাইরে, আমার তিন ভাইবোন তখনও ছাত্র-ছাত্রী, সুতরাং মাকে অনেকক্ষণ একা থাকতে হয়। কিন্তু খুব কাছেই পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগী আমার কয়েকজন মামা বাড়ি করেছেন। সুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বোন, অর্থাৎ আমার দিদিমার জন্যও একটি ছোট বাড়ি করে দিয়েছেন ওই পাড়ায়, দিদিমা সেখানেই থাকছেন তাঁর ছেলে-বউয়ের সঙ্গে। মা ইচ্ছে করলেই যে-কোনও সময় সেখানে চলে যেতে পারবেন, কিংবা তাঁরা আসবেন এ বাড়িতে। মায়ের এরকম নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়েই যেন আমি বাড়ি ফেরার সময়টা পিছিয়ে দিতে লাগলাম ক্রমশ। মধ্য রাত্তিরের আগে আড্ডাই ভাঙে না যে। মা কিন্তু আমার নিরাপত্তা সম্পর্কে কখনও নিশ্চিন্ত হননি, রাত দশটা বেজে গেলেই আমার প্রতীক্ষায় নিত্যদিন দাঁড়িয়ে থাকতেন বারান্দায়। দেরিতে ফেরার জন্য আমার অভিনব বহু যুক্তিরও অভাব ছিল না। জনসেবক নামে একটি সংবাদপত্রে বিকেলবেলা পার্টটাইম কাজ নেওয়ার ফলে আরও সুবিধে হয়ে গেল। সংবাদপত্রের কাজ সম্পর্কে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই, নাইট ডিউটি, হঠাৎ হঠাৎ বাইরে যাওয়া, এসব স্বাভাবিক বলেই মেনে নেয়। আমার দায়িত্ব ছিল রবিবাসরীয় চারটি পৃষ্ঠার সম্পাদনা, বন্ধুবান্ধবদেরই গল্প-প্রবন্ধ ছাপা হত, চেনাশুনো তরুণ শিল্পীরা করে দিত অলঙ্করণ—সেইসব লেখক ও শিল্পীরা সবাই পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়েছেন—আমার কাজ ছিল প্রতিদিন বড় জোর দু'ঘণ্টা। সংবাদ বিভাগের সঙ্গে আমার কোনও সংস্রবই ছিল না। কিন্তু কোনওদিন রাত বারোটার পরে বাড়ি ফিরে গম্ভীরভাবে জানাতাম, আজ সারা রাত থাকতে বলেছিল, আমি তাড়াতাড়ি সব কাজ সেরে চলে এলাম!

সাতগাছির রাস্তায় পরপর উদ্বাস্তু কলোনি। সবগুলিই এককালে কলকাতার ধনীবাবুদের বাগানবাড়ি ছিল, জবরদখল হয়ে গেছে। যোগীপাড়ার গলির ঠিক সামনের কলোনিটিই আমার পূর্ব-চেনা। এটার মালিক গ্রে স্ট্রিটের ঘোষ পরিবার, আমার স্কুলের বন্ধু আশুর সঙ্গে এই বাগানবাড়িতে কৈশোর বয়সে পিকনিক করতে এসেছি বেশ কয়েকবার।

সেই একটি উদ্বাস্তু কলোনির প্রথম স্থাপনা থেকে একটু একটু করে রূপান্তর আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। মানুষগুলিকেও দেখেছি বদলাতে। সেই সব দেখা থেকেই 'অর্জুন' উপন্যাসটি লেখা। আরও পরবর্তীকালে 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসেও এই অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে।

সাতগাছির বাড়িতে এসে আমার রুটিন কিছুটা বদলায়, সকালবেলার টিউশানিটা ছাড়তে বাধ্য হই। কেন না, সকালবেলা কলকাতায় গিয়ে টিউশানি করে ফিরে আসা, তারপর স্নান-খাওয়া সেরে অফিসে ছোটা খুবই ঝকমারির ব্যাপার। সে টিউশানির উপার্জন পুষিয়ে নিতে হয় টুকটাক লেখালেখি করে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আহ্বানে প্রথম আনন্দবাজার অফিসে যাই, তারপর নীরেনদা আমাকে কিছু কিছু গ্রন্থ সমালোচনা করতে দিতেন। সে সুযোগ পেয়ে আমার আহ্লাদের অবধি ছিল না। বিনা পয়সায় নতুন নতুন বই পাওয়া যাবে, আবার সেগুলি সম্পর্কে লিখলে পয়সাও পাওয়া যাবে, একেই বুঝি বলে সোনায় সোহাগা! বেশ কয়েক বছর আমি বই সমালোচনার কাজ করেছি। তা করতে গিয়ে বিপদও হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী অশোককুমার সরকারের বড় ছেলে অভীককুমার সরকার যখন সদ্য কিছু কিছু কাজ দেখাশুনো করতে শুরু করেন তখন তিনি বিদেশি সাংবাদিকতার মতন মান রক্ষার অত্যুৎসাহে একদিন আমাকে ডেকে বলেছিলেন, আপনি বই রিভিউ করেন, ঠিক যে-যে বইয়ের যেমন গুণাগুণ তা সঠিকভাবে লিখবেন, অন্য কোনও চিন্তা করবেন না, দরকার হলে কড়া সমালোচনা করবেন। তা শুনে আমি তৎকালীন এক অতি জনপ্রিয় লেখকের ভুল তথ্যপূর্ণ ও অমনোযোগে লেখা একটি উপন্যাস সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিলাম। সেই লেখক ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে অশোককুমার সরকারের কাছে নালিশ করেন এবং আনন্দবাজারে লেখা বন্ধ করে দেবার হুমকি দেন। আর একজন বিখ্যাত লেখক অভিশাপ দেন, ওই ছেলেটির আঙুলে কুষ্ঠ

হবে! (অনেক বছর পরে দেশ পত্রিকায় আমার একটি ধর্ম সম্পর্কিত লেখার জন্য ছাপার অক্ষরে আমার আঙুলে কুষ্ঠ হবার অভিশাপ দেওয়া হয়, কিন্তু আমার আঙুলগুলো এখনও পর্যন্ত বহাল তবিয়তেই আছে।)

আগে আমি নিজস্ব লেখা পড়ার সময় পেতাম বেশি রাত্রে। এখানে ফিরিই অনেক দেরিতে, তা ছাড়া দু'-এক সন্ধে এই বাড়িতে থেকে দেখেছি, দিনের আলো নিবে যাবার পর এ অঞ্চলে সুস্থিরভাবে পড়াশুনো করা অসম্ভব। এমন মশার উপদ্রব! আবাল্য কাটিয়েছি উত্তর কলকাতায়, সেখানে কখনও মশারি টাঙিয়ে শুইনি, মশার অভিজ্ঞতাই ছিল না, এখানে মশারির বাইরে বসে থাকাও কষ্টকর। দমদমের ছাত্র-ছাত্রীরা সন্ধের পর কী করে পড়াশুনো করে কে জানে? সকালের টিউশানিটা ছাড়ার পর সময় পেলাম অনেক। সেই থেকে সকালবেলাতেই লেখালেখির অভ্যেস আমার শুরু হয়ে গেল, সন্ধের পর আর কলম ছুঁই না পারতপক্ষে।

রাত্তিরের টিউশানিটাও সরিয়ে আনলাম বিকেলে, অফিস ছুটির পর টুক করে সেটা সেরে এসে আড্ডা জমত সংবাদপত্রের দফতরে। দশ টাকা-পনেরো টাকা পাওয়া যায় বলে অনেক তরুণ লেখক ও শিল্পিই সাগ্রহে লেখা ও ছবি দিতেন, এমনকী কমলকুমার মজুমদারও ধারাবাহিক রচনা লিখেছেন। পত্রিকাটি কংগ্রেস দলের। কিন্তু রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায় রাজনীতির নামগন্ধও থাকত না, কংগ্রেসের কর্তারা কেউ মাথাও ঘামাতেন না। সে পত্রিকায় আমার সহকর্মী ছিলেন প্রখ্যাত ও আমাদের প্রিয় লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। কমলকুমারের লেখা 'গোলাপ সুন্দরী' আমি পড়তে দিয়েছিলাম জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে, কমলকুমারের সঙ্গে তাঁর আলাপও করিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু দু'জনে এমনই বিপরীতধর্মী মানুষ যে ওঁদের মধ্যে ভাব জমেনি। কমলকুমার আমাদের সক্রেটিস, তার সঙ্গে অ্যালেন গিন্‌সবার্গেরও সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে দিয়েছিলাম। সে এক মজার দৃশ্য। কমলদা কথা বলতে লাগলেন পল ভেরলেন ও ত্রিস্তঁ করবিয়ের-এর কবিতা বিষয়ে, আর অ্যালেন বলতে লাগল উপনিষদ ও সাংখ্যদর্শনের কথা। এঁদেরও ভাব জমেনি।

অ্যালেন একদিন পিটারকে নিয়ে আমাদের ষাটগাছির বাড়িতেও এসেছিল বাসে চেপে। আমি বা একজন বাঙালি তরুণ কবি কেমনভাবে থাকে, সেটা দেখার আগ্রহ ছিল তার। বাড়িটা তো ভালোই, কিন্তু আমি যে মা ও ভাইবোনের সঙ্গে এক সংসারে বসবাস করি, মা আমাদের জন্য রান্না করে দেন, জামাকাপড় কেচে দেন, এসব জেনে সে কৌতুক বোধ করেছিল বেশ। ওদের দেশে কোনও সাবালক পুরুষের পক্ষে এমন জীবন অচিন্ত্যনীয়। ওরা মাতৃসঙ্গ খুব কমই পায়, মাতৃস্মৃতি নিয়ে কবিতা লেখে। অ্যালেনের দীর্ঘ কবিতা 'কাডিস', তার মা সম্পর্কে বিলাপগাথা।

অ্যালেনকে খাওয়ানোর কোনও ঝামেলাই ছিল না, ভাতের মধ্যে ডাল, তরকারি, বেগুনভাজা, মাছের ঝোল সব একসঙ্গে মেখে নিয়ে সে দিব্যি হাত দিয়ে খেতে শিখেছিল। একজন সাহেবের ওই প্রকার আহারপদ্ধতি দেখে দরজার পাশে ভিড় করে থাকা মহিলারা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসেছিলেন। পিটার কাঁটা বেছে মাছ খেতেও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। পিটার অ্যালেনের ছায়াসঙ্গী হলেও তার নিজস্ব গুণও ছিল অনেক। সেও কিছু কবিতা লিখেছে, সে যেমন বাঁশি বাজাতে পারে, তেমনই সাইকেল চালাতে চালাতে দু'হাত ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেও পারে। শেষের দিকে এক প্রখর বাকপটু বাঙালি ললনার সঙ্গে তার প্রেমও হয়ে গিয়েছিল। অ্যালেন নারীবিমুখ হলেও পিটারের আসক্তি উভয় দিকেই।

অ্যালেন পিটারের আগমনবার্তা শুনে পাশের পাড়া থেকে আমার এক পিসেমশাই এসেছিলেন দেখা করতে, জীবনে তিনি কখনও কোনও সাহেবের সঙ্গে কথা বলেননি বলে সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও নিজের ইংরেজি জ্ঞান যাচাই করতে চান। সাহেবরা এ দেশে একশো নব্বই বছর রাজত্ব করে গেলেও অনেক শিক্ষিত বাঙালি কখনও কোনও সাহেবের মুখোমুখি হয়নি।

পিসেমশাই অ্যালেনের সামনে শেকসপিয়ার থেকে কয়েক লাইন মুখস্থ বলতে শুরু করলে অ্যালেন মাঝপথে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি একটা বাংলা কবিতা মুখস্থ বলতে পারেন? পিসেমশাই পারেননি। এই আমাদের শিক্ষিত বাঙালি।

অত দূরে বাড়ি নিলেও বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই ছুটির দিনে এসে হাজির হত। পুকুরধারে বসে খাওয়া-দাওয়া করলে মনে হত বেশ একটা প্রাকৃতিক পরিবেশে পিকনিকের মতন। একবার আটচল্লিশ ঘণ্টা হরতাল ডাকা হয়েছে, বাড়ি থেকে বেরোবার উপায় নেই, হঠাৎ দেখি একটু বেলার দিকে গেট ঠেলে ঢুকছে শক্তি। কী করে এলে? কিছুটা হেঁটে, তারপর একটা দমকলের গাড়িতে চেপে। শক্তির অসাধ্য কিছুই ছিল না। একবার রাত দুটোর সময় হাওড়ায় পার্থসারথি চৌধুরীর কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে, একটা গ্যারাজগামী ফাঁকা দোতলা বাস থামিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিজের বাড়ির গলির মধ্যে পর্যন্ত সেই বাস নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের বন্ধু, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিজীবী পার্থসারথি চৌধুরী যখন হাওড়ার জেলাশাসক ছিল, তার কোয়ার্টার মানে এক বিশাল,ঐতিহ্যসম্পন্ন প্রাচীন প্রাসাদ, সেখানে আমাদের আড্ডা জমত প্রায়ই, পার্থর স্ত্রী গীতা প্রখ্যাত জাদুকর পি সি সরকারের মেয়ে, এই দম্পতির আতিথেয়তার তুলনা নেই। এসব অবশ্য অনেক পরের কথা। আমাদের পরবর্তীকালের বন্ধু ও কবি এবং পুলিশের কর্তা আয়ান রশিদ খান তখন হাওড়ার এস পি, সে পার্থর বাড়িতে নিয়ে এসেছিল ভারতবিখ্যাত গায়ক আমির খানকে। আমির খান নেশা বা আড্ডার সময় গলা খুলতে চাইতেন না, আমাদের কাকুতি-মিনতিতে সবে মাত্র একটু ছেরছার শুরু করেছিলেন, শক্তি তাঁকে ধমক দিয়ে বলেছিল, বুড়ো, তুমি রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারো না কেন? আমির খান বেশ চটেছিলেন, রবীন্দ্রসংগীত গাইতে না পারার কারণে নয়, তাঁকে বুড়ো বলার জন্য! সত্যিই অনুচিত সেই সম্বোধন, আমির খান ছিলেন সবল চেহারার সুপুরুষ। যাকে-তাকে বুড়ো বলা ছিল শক্তির স্বভাব, সেইজন্যই বোধহয় সে নিজে আর বুড়ো হল না।

অ্যালেনের কলকাতা থেকে বিদায় নেবার শেষ রাত্রিটিতে আমরা মোচ্ছব করেছিলাম উৎপলকুমার বসুর ভবানীপুরের বাড়িতে। সে বাড়িতে উৎপল তখন অভিভাবকহীন একলা সংসারী। অ্যালেনরা ভারত-প্রবাসে প্যান্ট-শার্ট পুরোপুরি ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরত সবসময়, পিটার তো দারুণ গরম, পিচ-গলা দুপুরেও হাঁটত খালি পায়ে, কিন্তু ফেরার সময় বিমানের টিকিট কাটতে গিয়ে তারা শুনল, ওই পোশাকে প্লেনে ওঠা যাবে না। তখন ইউরোপ আমেরিকার দিকে জাহাজ-যাত্রার বদলে বিমান-যাত্রা সবেমাত্র চালু হয়েছে, নিয়মকানুনের কড়াকড়ি ছিল অনেক রকম। অনেক ঝগড়াঝাঁটি করেও লাভ হয়নি, আমাদেরই কারও কারও কাছ থেকে জামাপ্যান্ট ধার করেছিল অ্যালেন, জুতো কিনতে বাধ্য হয়েছিল। সেই শেষ রাতটিতে প্রচুর পানাহার করে আমরা সবাই মিলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এক ঘরে। অ্যালেন পরে কবিতা লিখেছে 'লাস্ট নাইট ইন ক্যালকাটা', তার মধ্যে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এরকম:

> O spirit of poetry, no use calling on you
> abbling in this emptiness furnished with beds
> under the bright oval mirror—perfect
> night for sleepers to dissolve in tranquil
> blankness, and rest there eight hours
> —waking to stained fingers, bitter mouth
> and lung gripped by cigarette hunger...

সাধারণত আমাদের রাত্রির আড্ডা হত ওয়েলিংটন মোড়-ধর্মতলা অঞ্চলে, সেখান থেকে

উত্তর-দক্ষিণের যাত্রীরা ভাগ হয়ে যেত এক সময়। উত্তর কলকাতাবাসীরই তখন সংখ্যাধিক্য, আমরা সে ক'জন শ্যামবাজারের মোড়ে এসে আবার শুরু করতাম দ্বিতীয় দফা। সবাই অবিবাহিত, সেইজন্য বাড়ি ফেরার টান কিংবা ফেরার পর বকুনি খাওয়ার ভয় কম। শক্তি ও শরৎকুমার থাকে কাছাকাছি একই দিকে, সন্দীপনও ততদিনে হাওড়া ছেড়ে চলে এসেছে বরানগরে। শ্যামবাজার মোড়ের সেই গভীর রাতের আড্ডায় রোমহর্ষক ঘটনাও ঘটেছে মাঝেমাঝে। সকলেই কিছু না-কিছু লিখেছে সে বিষয়ে। শরৎকুমারের লাইন 'মধ্যরাতে কলকাতা শাসন করে চারজন যুবক'·এখনও অনেকে উদ্ধৃতি দেয়। শক্তির বিখ্যাত কবিতা, 'সে বড় সুখের সময় নয়.. , এরকম মাঝরাতে শ্যামবাজার থেকে তার বাড়ি ফেরারই বর্ণনা। ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যায়। তব যেন আড্ডা ভাঙতে ইচ্ছেই করে না। সন্দীপন ও আমাকে যেতে হয় আরও অনেক দূরে, একমাত্র বাহন শেয়ারের ট্যাক্সি। বরানগর আর নাগেরবাজারমুখী ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে দু' দিকের রাস্তায়, শেয়ারে নেয় এক টাকা, দু' টাকা। সে-যাত্রাও এক একদিন নাটকীয় হত বেশ। ষাটের দশকের শেষভাগে যখন নকশাল আন্দোলন শুরু হয়, চতুর্দিকে খুনোখুনির আতঙ্ক, তখনও আমরা নৈশ অভিযান বন্ধ করিনি। সেই বয়সে মৃত্যু নিয়ে জুয়াখেলার একটা ভাব তো থাকেই।

যশোর রোডে ষাটগাছির মোড়ে নেমে খানিকটা হেঁটে আসতে হয় আমাদের বাড়িতে। অন্ধকার গলিপথ, তারপর বাড়ির সামনের গেট ঠেলে বাগানের মধ্য দিয়ে আসা। কয়েক ধাপ সিঁড়ির পর একটা রোয়াক, তারপর ভেতরে ঢোকার দরজা। সে দরজা আমার জন্য খোলা রাখতেই হয়, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন মা। এবাড়ির জমির ডানদিকের শেষ প্রান্তের দেওয়ালের ওপাশেই একটা পরিত্যক্ত কবরখানা। মা একদিন বলেছিলেন, অনেক রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে প্রায়ই কবরখানাটার দিকে তাকিয়ে থাকি, যদি ভূত-প্রেত কিছু দেখা যায়। কোনওদিন কিছুই দেখি না তো, তা হলে বোধহয় ওসব কিছু নেই! বাবার মৃত্যুর এক বছর পরে মা বলেছিলেন, আর নিয়ম করে বার্ষিক শ্রাদ্ধ করার দরকার নেই, শুধু শুধু পিণ্ডি দিয়ে কী হবে, মরা মানুষ কিছু খেতে পারে, এ আমার বিশ্বাস হয় না। যাই হোক, একদিন সেরকম রাতে ফিরছি, সিঁড়ির ঠিক মুখটায় দেখি, একটা বেশ বড় সাপ শুয়ে আছে। এর আগে দিনেরবেলায় ঝোপে ঝাড়ে দু'-একটা সাপ দেখেছি, সাপ তো থাকবেই, ফাঁকা ফাঁকা জায়গায় দ্রুত মনুষ্য বসতি হচ্ছে বলেই তো সাপেরা সব অন্তর্ধান করে যাবে না। তা বলে আমার বাড়িতে ঢোকার মুখে, এত রাতে কোনও সাপের কি শুয়ে থাকাটা উচিত কাজ হল! আর একটু হলেই ওর গায়ে আমার পা পড়ে যেতে পারত, তা হলে আর রক্ষে ছিল না। নড়া-চড়া না করলে সাপ এমনি এমনি কামড়ায় না জানি, কিন্তু চুপ করেই বা দাঁড়িয়ে থাকব কতক্ষণ। মা আমাকে বাগান পেরিয়ে আসতে দেখেছেন, এখন যত দেরি হবে ততই তাঁর উৎকণ্ঠা বাড়বে। সাপ সাপ বলে চেঁচিয়ে ওঠাও ঠিক হবে না, তাতে বাড়ির অন্য ফ্ল্যাটের মানুষজন জেগে যাবে। পেছন ফিরে দৌড়ে পালাব? যদি সাপটা তাড়া করে? ইস্কুলের বাংলা ক্লাসে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দিয়ে বাক্য গঠন করতে বলা হত, এ যে তার সার্থক দৃষ্টান্ত! কয়েক মুহূর্ত পরেই মাথার মধ্যে একটা যুক্তি এসে গেল। সেই আঠাশ বছরের যুবকের শরীর এক লাফে সাপটিকে পার হয়ে উঠে গেল ওপরের রকে।

রাত্তিরবেলা বলেই সে পেরেছিল, দিনের আলোয় সে এতটা সাহস দেখাতে পারত না বোধহয়।

চৌত্রিশ

উনিশশো বাষট্টি সালে অক্টোবর মাসের কুড়ি তারিখটি আমাদের দেশের, আমাদের জাতীয় জীবনে, আমাদের মানসিকতায়, আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নের এক নিদারুণ সন্ধিক্ষণ। ওই দিন চিন ও ভারতের সীমান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। এ রকম অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ বোধহয় ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি, অথচ এর কুফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী।

চিন আর ভারতের যুক্ত জনসংখ্যা পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ। প্রতিবেশী এই দুটি রাষ্ট্র হাতে হাত মিলিয়ে চললে পৃথিবীর অন্য সব শক্তিশালী দেশগুলিও চিন-ভারতকে সমীহ করতে বাধ্য হত। সেই রকমই তো ছিল অনেকদিন, খুবই বন্ধুত্বের সম্পর্ক, 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই' শ্লোগান আমরা শুনেছি কতবার। এ দেশে যারা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাদের চোখেও মাও সে তুং (এখন মাও যে দং) অতি শ্রদ্ধেয় নেতা, তিনি কখনও ভারতে আসেননি, কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি হয়ে চু এন লাই একাধিকবার ভারতে এসেছেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাবলীল ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ, শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের হাতে হাত ধরে তিনি নেচেছেন পর্যন্ত। তা হলে কেন হঠাৎ এই যুদ্ধ? প্রথমটা আমরা এর কারণ ঠিক বুঝতেই পারিনি!

ভারতের সীমান্তরেখা ম্যাকমেহন লাইন। চিনের দিকে ব্রিটিশ ও মাঞ্চু সাম্রাজ্যের আমলে স্বীকৃত একটা সীমারেখা আছে, যাকে বর্তমান সমাজতন্ত্রবাদী চিনও মনে করে 'চিরাচরিত' অধিকার। আগের শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদীদের সীমানা চিহ্নকে একালের সমাজতন্ত্রবাদীরা চিরাচরিত বলে দাবি করেন কোন যুক্তিতে, তা বোঝা দুষ্কর। সে যাই হোক, বিতর্কিত মাঝখানের এলাকাটি নিছকই ঊষর প্রান্তর, জনবসতি নেই, একটা ঘাসও গজায় না, সে রকম জমি দখলের জন্য ভারতের মতন প্রাচীন বন্ধুকে শত্রু হিসেবে গণ্য করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লাগিয়ে দিতে হবে! অবশ্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও কয়েক বছর ধরে চিনের প্রতি কিছু কিছু অসমীচিন কথাবার্তা বলা হচ্ছিল, এমনও শোনা গেছে, তবু বাক্য বিনিময়ের বদলে হঠাৎ গোলাগুলি?

যুদ্ধ শুরু হবার পরেই বোঝা গেল, ভারতের সমরশক্তি চিনের তুলনায় অনেক দুর্বল। পাহাড় ডিঙিয়ে নেমে আসতে লাগলো চিনা বাহিনী, প্রতিরোধের ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে পিছিয়ে এল ভারতীয় সেনারা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্মৃতি যাদের নেই, তারা এই প্রথম স্বাধীন ভারতে দেখল যুদ্ধের আবহাওয়া, শুনল বিকট সাইরেন, দেখল নিষ্প্রদীপ। আর সেই সঙ্গে উদ্ভট সব গুজব, যেন চিনে সৈন্যরা যে-কোনওদিন এসে পড়বে কলকাতায়।

এক মাস পর, যেমন আচমকা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেই রকম ভাবেই, প্রায় তেজপুর শহরের উপান্তে এসে চিনাবাহিনী একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে আবার পিছিয়ে গেল, কয়েক হাজার বর্গমাইল দখল করে থানা গেড়ে বসে রইলো 'প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা'র ওপারে।

দু' দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে কোন দেশ প্রথম আক্রমণ করে, তা নিয়ে পরস্পরবিরোধী এমন প্রচার চলতে থাকে যে প্রকৃত সত্য নিরুপণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা। যুদ্ধের সময় সব দেশেরই অধিকাংশ মানুষ সমর্থন করে নিজের দেশকে। দেশাত্মবোধ তখন এমনিতেই উগ্র হয়ে থাকে, তা ছাড়া পরাধীনতার আশঙ্কাও কাজ করে ভেতরে ভেতরে। ভারতের দিক থেকে কিছু কিছু উস্কানিমূলক হঠকারিতা ছিল, কিন্তু এত কম শক্তি নিয়ে চিনা বাহিনীকে নিজে থেকে দুর্গম পাহাড় অঞ্চলে আক্রমণ করতে যাবে,

এতখানি মূঢ়তা কি ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে সম্ভব! আমাদের মনে হয়েছিল, চিনই আগ্রাসী ভূমিকা নিয়েছে, সে জন্য আমরা মর্মাহত বোধ করেছিলাম। কিন্তু এই প্রশ্নে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ফাটল ধরে যায়, ডাঙ্গেপন্থীরা ম্যাকমেহন লাইনকেই প্রকৃত সীমারেখা বলে মেনে নিয়ে, ভারত সরকারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে চিনকেই আক্রমণকারী বলে আখ্যা দেয়। কিন্তু পার্টির একটি বড় অংশ মনে করে যে সমাজবাদী দেশ চিন কখনও অন্যায় আক্রমণ করতে পারে না, সুতরাং এ যুদ্ধের দায় ভারতের কংগ্রেস সরকারের। এই মতভেদের ফলেই ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল দু'বছর পরে।

ভাঙনের কারণটি আরও গভীর।

ঐতিহাসিক টয়েনবির একটি উক্তি আমাকে খুবই নাড়া দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে প্রকৃত লড়াই ধনতন্ত্রের নয়, জাতীয়তাবাদের। সমাজতন্ত্রের সমর্থকরা ধনতন্ত্রকেই প্রধান শত্রু মনে করে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে, কিন্তু নিজেদের জাতীয়তাবাদ ভুলতে পারে না। যদিও সমাজতন্ত্র ও জাতীয়দাবাদের আদর্শবাদী সহাবস্থান সম্ভব নয়। সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্তই তো রাষ্ট্রগুলির সীমারেখা মুছে ফেলা, সরকারের বিলোপ, সেখানে জাতীয়তাবাদের কোনও স্থান নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের অনেকগুলি রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, বিস্তৃত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিনের মতন এত বড় একটা দেশ জড়তা, কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে সমাজতান্ত্রিক পথে দ্রুত উন্নতি করতে থাকে, তবু জাতীয়তাবাদ নিশ্চিহ্ন হবার বদলে দিন দিন যেন আরও উগ্র হয়ে উঠছে। দেশপ্রেম বা স্বজাতিপ্রেম এমনই এক তীব্র নেশা, যা কোনও উন্নত আদর্শ দিয়েও দমন করা যায় না। নইলে রাশিয়া ও চিনের মতন দুটি সমাজতন্ত্রী দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হবে কেন? সীমান্ত সংঘর্ষও হয়ে গেছে। হাঙ্গেরি ও রোমানিয়ার মতন দুটি সমাজতন্ত্রী দেশের মানুষের মধ্যে এমনই তীব্র ঘৃণার সম্পর্ক যে তৃতীয় কোনও দেশে দেখা হলে তারা পরস্পর বাক্যালাপও করে না।

ভারত-চিন সীমান্ত যুদ্ধের পশ্চাৎপটে আছে রাশিয়া-চিনের মতপার্থক্য শুধু নয়, বিদ্বেষ। জওহরলাল নেহরুর ভারত সরকার আমেরিকান ব্লকে যোগ না দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘেঁষা, পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক না হলেও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের। কমিউনিস্ট পার্টির ডাঙ্গেপন্থীরাও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থক। চিন এখন সোভিয়েত ইউনিয়নকেই মনে করে 'সংশোধনবাদী' আর নিজেরা 'প্রকৃত বিপ্লববাদী'। চিন থেকে ভারতের উদ্দেশে প্রচার চালিয়েও এই বিভাজনের কথা বলা হতে লাগল বারবার। আরও কয়েক বছর পর, দ্বিধাবিভক্ত কমিুনিস্ট পার্টির অধিকতর শক্তিশালী শাখা সি পি আই (এম) যখন পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারে যোগ দিল, তখন চিনের প্রচারে তারা হয়ে গেল 'নয়া সংশোধনবাদী', সেই প্রচারের বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করার গরম গরম শ্লোগানে আবার ভাগ হল কমিউনিস্ট পার্টি, নকশালবাড়ির পটভূমিকায় গঠিত হল তৃতীয় দল, সি পি আই (এম এল)। অর্থাৎ ভারতের বামপন্থী কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ রূপরেখায় আড়াল থেকে চিনের ভূমিকাই হয়ে গেল প্রধান।

সেই এক মাসের চিন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের আর একটি সাঙ্ঘাতিক কুফল হল সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে। এই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অস্ত্রবলহীনতা ও দক্ষতার অভাব প্রকট হয়ে পড়ায় সাঙ্ঘাতিক আলোড়ন হল দেশে। উগ্র দক্ষিণপন্থীরা গর্জন শুরু করে দিল। নেহরু বাধ্য হলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেননকে বিদায় দিতে। তিনি ভেবেছিলেন জোট নিরপেক্ষতা ও পঞ্চশীল নীতির জন্য ভারতকে কখনও যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে না, অস্ত্রসম্ভারও মজুত রাখার প্রয়োজন নেই। সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ডের মতন দেশ যেমন কোনও যুদ্ধেই যোগ না দিয়ে নিজস্ব সম্পদ বাড়ায়। কিন্তু চিনের কাছে অপমানজনক পরাজয় সহ্য করার পর দক্ষিণপন্থীদের চাপে প্রতিরক্ষা বাজেট বেড়ে গেল বহুগুণ, নানা দেশ থেকে কেনা হতে লাগল আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম। ভারতের যমজ রাষ্ট্র পাকিস্তান তার প্রাক্তন সহোদরের চিরশত্রু হবার

ভূমিকা নিয়েছে, সেই পাকিস্তান যদি দেখে যে ভারতের সেনাবাহিনী নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হচ্ছে, তখন পাকিস্তানই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? শুরু হল প্রতিযোগিতা, দু' দেশেরই প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়তে লাগল অস্বাভাবিক হারে। দু'দেশেরই কোটি কোটি মানুষ ডুবে রইল অশিক্ষার অন্ধকারে ও দারিদ্র্যে, জাতীয় সম্পদ ব্যয় হতে লাগল যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহে। অস্ত্র জমে জমে পাহাড় হলে তার ব্যবহার তো চাই। তাই পঁয়ষট্টি সালে লেগে গেল আর এক ভারত-পাকিস্তান অনাবশ্যক যুদ্ধ। এবং আশ্চর্যের কিছু নেই, ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথে গণতান্ত্রিক ভারতের বদলে স্বৈরাচারী, একনায়কপন্থী পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য হাত মেলাল ধনতান্ত্রিক আমেরিকা ও সমাজতান্ত্রিক চিন। উদ্দেশ্য একই, জাতীয় স্বার্থ। ভারতকে অস্ত্র সরবরাহ করে রাশিয়া, পাকিস্তানকে আমেরিকা ও চিন। টয়েনবির উক্তিই যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়।

ভারত-পাকিস্তান পরস্পারিক বিবাদে মত্ত হয়ে অন্য সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে পিছিয়ে থাকুক, আর সেই ফাঁকে এগিয়ে যাক চিন, চিনের এই সুপরিকল্পিত ফাঁদে আটকে রইল উপমহাদেশের দুটি দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক শিশুরা। এমনকী ভারত ও পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমা বানাবার নির্বোধ প্রতিযোগিতার মূল খুঁজতে গেলেও হয়তো সেই বাষট্টির চিন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ফিরে যেতে হবে।

সেই বাষট্টি সালে তো আমাদের এসব বোঝার কথা নয়, আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম চিনের আচরণে। চিনের ঐতিহ্য ও আধুনিক সমাজতন্ত্রী চিনকে আমরা দেখতাম শ্রদ্ধার চোখে, আমার বন্ধু দিলীপ দত্তের অনুবাদ করা চিনা কবিতার একটি সংকলন বেরিয়েছিল কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকে।

অ্যালেন গীন্সবার্গ চলে যাবার পর আরও অনেক বিদেশি কবি-লেখকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। মনে পড়ে জাপানি লেখক মিসিমার কথা। তখন কোনও লেখক সংবাদপত্র অফিসে বা বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সান্নিধ্যে এসে তরুণ কবি-লেখকদের খোঁজ করলে আমাদের ডাক পড়ত, কারণ তরুণ লেখকদের মধ্যে কৃত্তিবাস গোষ্ঠী বেশ সঙ্ঘবদ্ধ। জাপানি সাাহিত্যের দিকে তখন আমাদের মন ফিরেছে। ওসামু দাজাই নামে এক লেখকের 'আর মানুষ নই' নামে উপন্যাসটিকে মনে হয়েছিল খুবই আধুনিক গুণসম্পন্ন। ওঁর আর একটি উপন্যাসের নাম 'অস্ত সূর্য', এই নামটির তাৎপর্য এই যে জাপান 'সূর্যোদয়ের দেশ' হিসেবে পরিচিত। 'চাবি' নামে আর একটি উপন্যাস (লেখকের নাম ভুলে গেছি) জনপ্রিয় হয়েছিল খুবই। আর এশিয়ার দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার প্রাপক কাওয়াবাতার উপন্যাস বাংলায় অনূদিত হয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়। তবে মিসিমা-ই আমাদের স্বচক্ষে দেখা প্রথম জাপানি লেখক। দীর্ঘকায়, সুপুরুষ এবং প্রতিভামণ্ডিত ললাট। তিনি ইংরেজি তেমন জানতেন না, কিন্তু ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যে ভালো দখল ছিল। আমরা কয়েকজন তখন কমলকুমার মজুমদারের কাছে প্রতি রবিবার দুপুরে ফরাসি ভাষা শিখতাম, তিনি বিনা বেতনে পড়াতেন না, তাতে নাকি সঠিক শিক্ষা হয় না, তাই মাইনে নিতেন এক টাকা। অতি কঠোর ছিল তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি, প্রথমেই সংস্কৃত শব্দরূপ ও ধাতুরূপের মতন তিনি আমাদের মুখস্থ করতে দিয়েছিলেন ফরাসি ধাতুরূপ। সে যাই হোক, সেই স্বল্প বিদ্যা নিয়ে মিসিমার সঙ্গে কয়েকটি ফরাসি বাক্য বলায় তাঁর সঙ্গে আমার একটু বেশি ভাব হয়েছিল। মিসিমা'র নামও নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হচ্ছিল, কিন্তু কয়েক বছর পরেই জানা গেল, তিনি জাপানের কোনও উগ্রপন্থী দলের নেতা হিসেবে, নিজের পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে হারাকিরি করেছেন।

এক আমেরিকান প্রৌঢ়া মহিলা একদিন আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন, তার নাম রুথ স্টেফান, তিনিও কবি, যদিও আমরা তাঁর নাম শুনিনি। তিনি অন্যান্যদের বাদ দিয়ে প্রতিদিনই আমাদের সঙ্গে সন্ধে কাটাতে চান। এবং কবিতা শোনান। মহিলাটি বেশ মিষ্টিভাষী, কবিতাগুলি

অতি সাধারণ, অর্থাৎ শখের কবি। ক্রমশ জানা গেল, এই রুথ স্টেফান খুবই ধনী রমণী, আমেরিকার কয়েকটি চেইন স্টোর্সের মালিক, তাঁর দুটি স্বামী মারা গেছে, এবং প্রত্যেকবারই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন আরও প্রচুর সম্পত্তি। সারা বছরই প্রায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পর্যটন করেন। মানুষের কবিতার প্রতি কী দুর্বলতা! এ রকম একজন ধনবতী রমণী পাঁচতারা হোটেলে বিলাসব্যসনে সময় কাটাবেন, মিশবেন তাঁর সমপর্যায়ের ধনীদের সঙ্গে, তা নয়, সাধারণ চায়ের দোকানের ভাঙা চেয়ারে বসে এত দূর ও দরিদ্র দেশের কয়েকটি যুবককে তাঁর কবিতা শুনিয়ে কী এমন পরমার্থ লাভ হবে? তবু, আমরা একটু প্রশংসা করলেই তাঁর সদ্য বিগত-যৌবন মুখখানি ঝলমল করে উঠত খুশিতে।

ইংল্যান্ডের এলিয়ট-পরবর্তী অন্যতম প্রধান কবি স্টিফেন স্পেন্ডারও এসেছিলেন কলকাতায়, তাঁর সঙ্গে সেবারে আলাপ হয়েছিল সামান্যই, তিনি যামিনী রায় ও বিষ্ণু দে'র সঙ্গেই বেশি সময় কাটান।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন ছিল তখন প্রতি বছর শীতকালে একটি অতি আকর্ষণীয় উৎসব। বাংলার সব রকমের গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়া পর্যন্ত এবং নাচ এবং নাটক, কবিতা পাঠ, সাহিত্য আলোচনা নিয়ে কয়েকদিনের জমজমাট আসর, বৃহৎ মূল মণ্ডপের চারপাশে মেলার মতন রকমারি জিনিসের দোকান, খাবারের স্টল এবং এক পাশ জুড়ে অনেকগুলি বইয়ের স্টল। এখনকার কলকাতার বইমেলার পূর্বসূরী বলা যেতে পারে সেই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনকে। পরের দিকে ময়দানে এই সম্মেলন আরও বড় আকারে রূপ নিলেও প্রথম কয়েক বছর চলেছিল উত্তর কলকাতার মার্কাস স্কোয়ারে।

উৎসবের কয়েকটা দিন আমরা সদলবলে বিকেল থেকেই জড়ো হতাম মার্কাস স্কোয়ারে। সেখানেই অনেক রাত্রি পর্যন্ত আড্ডা ও পানাহার। সব অনুষ্ঠান দেখতাম বা শুনতাম না, মাঠের মধ্যে বসে থাকতাম গোল হয়ে। একবার আমরা একটা কবিতার স্টলও দিয়েছিলাম কৃত্তিবাস থেকে, তার নাম ছিল 'অতি আধুনিকতা', আমাদের বন্ধু শিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় কাঁটাতার দিয়ে সে স্টলটি এমন অপূর্ব সুন্দরভাবে সাজিয়েছিল, যা দেখলেই ভয় করে। আটজন কবির নতুন কবিতা ছাপা হয়েছিল আলাদাভাবে রঙিন কাগজে, সেগুলির সম্পাদনা ও মুদ্রণ পারিপাট্য দেখেছিল সন্দীপন। প্রত্যেকটি কবিতার দাম দু'আনা, প্রায় জোর জুলুম করেই সেগুলি বিক্রি করা হত। আমাদের স্টলের কাছাকাছি কেউ কৌতূহলী হয়ে এলে তার রক্ষে নেই, কিনতেই হবে। একসময় এক বৃদ্ধা মহিলা এসে দাঁড়ালেন স্টলের কাছে, টুকটুকে ফর্সা রং, অভিজাত চেহারা, আমরা কয়েকজন তাঁকে ঘিরে ধরে চিলুবিলু করে বলতে লাগলাম, দিদিমা, এগুলো কিনুন, আধুনিক কবিতা পড়ুন! তিনি একগাল হেসে বললেন, দাঁত নেই!

এক সন্ধেবেলা আমরা মাঠের মধ্যে গোল হয়ে বসে, কেউ কেউ ঘাস ছিঁড়ে চিবুচ্ছি, কেউ কেউ সিগারেট টানছি, গৌরকিশোর ঘোষ একজন লম্বা মতন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এ সাহেবও তরুণ কবিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান। চিড়িয়াখানার বিশেষ কোনও প্রাণীর মতন আমরাই সেই তরুণ কবি। সাহেবটির নাম পল এঙ্গেল, তিনি আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগীয় প্রধান এবং একজন কবি। এঁরও নাম আমরা আগে শুনিনি। কিন্তু কবিতার প্রতি এই সাহেবটির এমনই টান যে পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরে ঘুরে ইনি কবিদের সঙ্গে পরিচয় করে বেড়াচ্ছেন। ভারতেও ইনি দিল্লি, মুম্বই ঘুরে তারপর এসেছেন কলকাতায়। ইতিমধ্যেই তিনি কার কাছে যেন গুজব শুনেছেন যে দিল্লি ভারতের রাজনৈতিক রাজধানী, মুম্বই বাণিজ্যিক রাজধানী আর কলকাতা সাংস্কৃতিক রাজধানী। সেই জন্য কলকাতা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ বেশি।

আমরা তবু ব্রিটিশ ইংরেজিতে কিছুটা অভ্যস্ত, আমেরিকান ইংরেজিতে বেশ অসুবিধে হয়। সেইজন্যই আমেরিকান ফিল্মের, বিশেষত ওয়েস্টার্ন ছবির সংলাপ অনেকটাই বুঝতে পারি না।

অ্যালেন গীন্‌সবার্গের কথা বুঝতেও প্রথম দিকে অনেকটা অনুমান করতে হতো। পল এঙ্গেল কথা বলেন জোর দিয়ে, ধীর লয়ে, স্পষ্ট উচ্চারণে, সে জন্য তাঁর সঙ্গে ভাব জমাতে বেশ সুবিধে হয়ে গেল। ইনি পণ্ডিত লোক, রোডস স্কলার ছিলেন, ইংরেজির অধ্যাপক। কিন্তু কবিতা লেখেন ট্র্যাডিশনাল ধরনের, তাতে আধুনিকতার উপাদান বিশেষ নেই। প্রথম দিন তাঁর কবিতা শুনে শক্তর চট্টোপাধ্যায় চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল, এ যে দেখছি পাড়ার প্রাণগোপালের মতন বিয়ের পদ্য লেখে! অতটা খারাপ অবশ্য নয়, রবীন্দ্র অনুসারী কবিবৃন্দের মতন প্রথাসিদ্ধ, কিন্তু ওই ধরনের রচনা সম্পর্কে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাই ছিল তখন আমাদের স্বভাব।

মানুষটি অবশ্য বেশ সহৃদয়। জোরে জোরে হাসেন, সমালোচনা শুনেও বিরূপ না হয়ে হাসতে পারেন। তিনি কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরে দেখার জন্য গাইড না নিয়ে কবিদের সঙ্গেই ঘুরতে চান। আমাদের কেউ কেউ সময় করে পল এঙ্গেলের সঙ্গে ঘুরেছে বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, কালীঘাট। আমি বেশি সময় দিতে পারিনি, শক্তির হাতে ছিল অঢেল সময়। জ্যোতির্ময় দত্তের সঙ্গেও তাঁর খুব হৃদ্যতা হয়েছিল। আমাদের মধ্যে একমাত্র জ্যোতির্ময়ই তখন বিবাহিত, অনেক প্রণয়প্রার্থীর মধ্যে থেকে সে বুদ্ধদেব বসুর বড় মেয়ে মীনাক্ষীকে ছিনেয়ে নিয়েছে এবং আলাদা ফ্ল্যাটে থাকে। জ্যোতি পড়াশুনো করেছে ইংরেজিতে, ইংরেজি জ্ঞানের জন্যই সে অল্প বয়েসে চাকরি পেয়েছে স্টেটসম্যান পত্রিকায়, (পরে অতি যত্নে বাংলা শিখে সে ঝকঝকে বাংলা সাহিত্য-ভাষাতেও দক্ষ হয়) আর আমরা তো ভালো করে ইংরেজি বাক্য গঠন করতেই পারি না। জ্যোতির ফ্ল্যাটে প্রায়ই আমন্ত্রণ হত পল এঙ্গেলের, আমরাও কয়েকজন জুটে যেতাম সেখানে।

টিপিক্যাল আমেরিকান বলতে যা বোঝায়, পল এঙ্গেল অনেকটা সেই ধরনের। লম্বা-চওড়া চেহারা, খানিকটা দিল-দরিয়া ভাব, আবার স্বাজাত্যাভিমান খুব বেশি। যদিও শতকরা চল্লিশ জন আমেরিকান জীবনে মদ স্পর্শ করে না, কিন্তু সিনেমার আমেরিকানদের খুব মদ্যপায়ী মনে হয়, পল এঙ্গেলও সে রকমই সুরারসিক। তবে টিপিক্যাল আমেরিকানদের সঙ্গে তাঁর তফাত এই, তারা কবিতার বিশেষ ধার ধারে না, কিন্তু এই সাহেবটি কবিতা নিয়ে মশগুল, শুধু নিজের কবিতা নয়, কবিতা জিনিসটার প্রতিই তাঁর খুব প্রেম, প্রায়ই কথায় কথায় বলতেন, পৃথিবীর সব কবিরাই আমার আত্মীয়।

রুথ স্টেফান আমাদের সঙ্গে বসতেন চায়ের দোকানে বা পার্কে, কিন্তু পল এঙ্গেল প্রায় জোর করেই মাঝে মাঝে আমাদের ডেকে নিয়ে যেতেন তাঁর গ্র্যান্ড হোটেলের ঘরে। সেখানে বসত কবিতা পাঠের আসর। আমাদের বাংলা কবিতা তিনি কিছুই বোঝেন না, সুতরাং অনুরোধ করেছিলেন অন্তত দুটি করে কবিতার ইংরেজি অনুবাদ আনতে। আমাদের কারওই তখনও কোনও কবিতারই ইংরেজি অনুবাদ হয়নি, কেউ আগ্রহ দেখায়নি। অগত্যা নিজেরাই অনুবাদ করেছিলাম, অন্যদের তুলনায় আমার ইংরেজি জ্ঞান খুবই কাঁচা, সে অনুবাদ যে কী পদার্থ হয়েছিল, তা ভাবলেও এখন লজ্জা হয়। আমাদের নিত্যসঙ্গী ভাস্কর দত্ত কখনও কবিতা লেখেনি, ভবিষ্যতেও লেখার পরিকল্পনা ছিল না, সেও সরাসরি ইংরেজিতে দু' খানা লিখে কবি সেজে গেল। কারণ সে আড্ডা-সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে চায়নি।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের শেষ দিন দুপুরে রকমারি বাঙালি রান্নার একটি পঙ্‌ক্তি ভোজের আয়োজন করতেন উদ্যোক্তারা। সুক্তো, গয়না বড়ি ভাজা, মাছ-পাতুরি, ভাপা দই ইত্যাদি অনেক কিছু। সেখানে পল এঙ্গেল এবং আরও কিছু সাহেব-মেমও আমন্ত্রিত ছিলেন। আমার পাশে বসে খেতে খেতে পল এঙ্গেল একটি পটল ভাজায় কামড় দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই বস্তুটা কী? পটল জিনিসটা এখন পশ্চিম দেশগুলিতে কিছুটা সুলভ হলেও তখন খুবই দুষ্প্রাপ্য ছিল। অনেকেই পটল দেখেইনি কখনও? পটলের ইংরেজি কী? আমরা ওয়ার্ড বুকে বিভিন্ন তরিতরকারির ইংরেজি নাম মুখস্থ করেছি অল্প বয়েসে, তাও অনেক বদলে গেছে। বেগুনের

নাম আমরা জানতাম ব্রিঞ্জাল, পরে শুনলাম, সেটা হয়ে গেছে এগ প্ল্যান্ট। দইকে বলতাম কার্ড, পরে হয়ে গেল ইয়োগার্ট। ঢ্যাঁড়সের ইংরেজি লেডিজ ফিঙ্গার? শুনলে লোকে হাসে। কিন্তু পটলের সে রকম ইংরেজি মনে পড়ল না। আমি অসহায়ভাবে তাকালাম সামনের পঙক্তিতে বসা, আমাদের চেয়ে কিছুটা প্রবীণ কবি অরুণকুমার সরকারের দিকে। অরুণকুমার সরকার একটুও দ্বিধা না করে অতি সপ্রতিভভাবে বললেন, দিস ইজ কল্‌ড পট্‌ল্! ডোঞ্চ ইউ নো ইট? এই ডোঞ্চ ইয়ু নো ইট প্রশ্নেই পল এঙ্গেল কাঁচুমাচু হয়ে গেলেন। সাহেবরাও তো সব ইংরেজি শব্দ মুখস্থ রাখে না। পল এঙ্গেল ভাবলেন বুঝি এই পট্‌ল্‌ও ইংরাজি অভিধানে আছে, তাই বলতে লাগলেন, অফ কোর্স, অফ কোর্স।

বিদায় নেবার দিন পল এঙ্গেল একটি কাণ্ড করে আমাদের খুব বিপদে ফেলে দিলেন। তিনি নানারকম ডট পেন (বস্তুটি তখন নতুন) এনেছিলেন, সেগুলি বিলিয়ে দিলেন আমাদের মধ্যে এবং দু' বোতল স্কচ আমার হাতে দিয়ে বললেন, তোমরা বন্ধুরা মিলে এটা খেয়ো একদিন। এই বোতল দুটি নিয়েই মহা মুশকিল। আমাদের ঘনিষ্ঠ দলটির কারুরই বাড়িতে বসে মদ্যপানের প্রশ্নই ওঠে না, এমনকী হাতে করে বাড়িতে এই বোতল নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত পরিবারে তখনও মদ একটা নিদারুণ ঘৃণ্য বা ভয়াবহ বস্তু। বাংলা সিনেমায় শুধু চোর-ডাকাত-লম্পটরাই মদ্যপান করে, মদ্যপায়ীরা নেশার ঝোঁকে তার বউকে মারে, তার গয়না বিক্রি করে দেয়, সংসারের সর্বনাশ ডেকে আনে। সাহিত্যিকরা কক্ষনও লেখার মধ্যে নিজেদের মদ্যপানের কথা স্বীকার করেন না। তান্ত্রিকেরা কারণ বারি পান করতে পারেন, রামপ্রসাদের 'সুরা পান করি নে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে'-ও ঠিক আছে, কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালির মদ্যপান অতি গর্হিত কাজ।

স্কচ হুইস্কি তখন অতি দুর্লভ ও দামি বস্তু। বোতল দুটি ফেলেও দেওয়া যায় না প্রাণে ধরে। বেশি লোককে জানানোও চলে না। তবু একজন বয়োজ্যেষ্ঠ লেখক কী করে যেন শুনে ফেলে বললেন, তোমরা সোনাগাছির কোনও মেয়ের কাছে চলে যাও না। ওদের কারও ঘর ভাড়া নেবে। ঘণ্টায় বড় জোর পনেরো টাকা নেবে।

আমরা উত্তর কলকাতার অধিবাসীরা সবাই সোনাগাছি চিনি। সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে বাসে বা পায়ে হেঁটে যাবার সময় দেখতে পাই সেই পল্লী, দিনের বেলা শুনশান, রাত্তির বেলা জমজমাট। কিন্তু কখনও তার ভেতরে ঢুকিনি, সেটা যে নিষিদ্ধ পল্লী। তখন আমরা সব রকম নিষেধের বেড়া ভাঙছি, এ আর এমনকী! সেই বোতল দুটি নিয়ে আমরা সন্ধেবেলা সোনাগাছিতে একটি মেয়ের ঘরে গিয়ে বসলাম সদলবলে।

আমি আমার সঙ্গীদের নাম উল্লেখ করতে চাই না, কারণ এখন পরিণত বয়েসে তাঁরা কিংবা তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা এইসব প্রসঙ্গের উত্থাপন পছন্দ করবেন কি না তা ঠিক জানি না। কিন্তু আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, সেই সন্ধেতে এবং পরে আরও অনেকবার সেই পল্লীর মেয়েদের সংসর্গে আমি জীবনের বা আমাদের সমাজের যে দিকটি দেখতে পেয়েছি, তা না দেখলে আমার বোধ অনেকখানিই অসম্পূর্ণ থেকে যেত। যে-উদ্দেশ্যে পুরুষরা চুপি চুপি এদিক ওদিক তাকিয়ে সুট করে ওই সব গলিতে ঢুকে পড়ে, আমাদের সে উদ্দেশ্য ছিল না, গেলাস ও জল ছাড়া আমরা আর কিছুই চাই না শুনে মেয়েটি বেশ অবাক-খুশি হয়েছিল। সব সময় আমরা কয়েকজন পুরুষ দল বেঁধে ঘুরি, আমাদের দিনগুলি নারী-সঙ্গ বঞ্চিত, তখন সাহিত্য জগতে মেয়েদের সংখ্যা ছিল খুবই কম, যে দু'চারজন লিখতেন তাঁদের প্রকাশ্যে দেখা যেত না বিশেষ, আর পাঠিকারা কবিদের পাত্তাই দিত না। আমাদের মদ্যপানের এই আসরে একটি মেয়ে এসে বসেছে পাশে, সে গেলাসে জল ঢেলে দিচ্ছে, মাঝে মাঝে আমাদের কথা শুনে হেসে গড়াচ্ছে, এ তো অভিনব অভিজ্ঞতা! তার ভাব-ভঙ্গি-ব্যবহার কিছুই অস্বাভাবিক নয়, আমাদেরই চেনাশুনো পরিবারের মেয়েদের মতন। একটা খুব সাধারণ উপমা দেওয়া যায়। খুব ছোট বয়সে

দেখেছিলাম, পাড়ায় একটা চোর ধরা পড়েছে, সবাই মিলে তাকে মারছে, কোনওক্রমে ভিড় ঠেলে ঠুলে ঢুকে চোরটিকে দেখে অবাক হয়েছিলাম খুবই। আমার ধারণা ছিল, চোরদের বোধহয় মাথায় শিং থাকে, হাতে থাকে বাঘের মতন নখ, তা তো নয়, এ যে যে-কোনও মানুষের মতন। তেমনি বেশ্যাদের সম্পর্কেও ধারণা ছিল অস্পষ্ট, যেন তাদের পোশাক-ব্যবহার-হাসি সবই অন্যরকম।

তখন সেক্স ওয়ার্কার বা যৌন কর্মী আখ্যা চালু হয়নি, লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল বেশ্যা, খবরের কাগজে লেখা হত পতিতা বা বারাঙ্গনা। 'পতিতা'র মতন অপপ্রয়োগ বুঝি আর কোনও শব্দের হয় না। পুরুষপ্রধান সমাজ এই বৃত্তিটি চালু রেখেছে, অনেক মেয়েকেই জোর করে ধরে আনা হয়, অনেক মেয়েকে ছলে-বলে-কৌশলে ঠেলে দেওয়া হয় লোভী পুরুষদের সামনে, তবু তারা কি করে পতিতা হয়? পুরুষদের তো কেউ পতিত বলে না। যেমন অসতী কথাটার ঠিক পুংলিঙ্গ নেই। এটা একটা বহু যুগ বাহিত কুৎসিত ভণ্ডামি। এ পল্লীর একাধিক মেয়েকে দেখেছি, ভারী সরল দুঃখী ও সব সময় অসহায় ভাব। অর্থের বিনিময়ে তাদের শরীর বহু-ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সেই অর্থের সামান্যই ভাগ পায় তারা। তাদের ওপর অত্যাচার ও নিষ্পেষণ করার লোক অনেক, বিশেষত প্রত্যেক মেয়েরই ফাই-ফরমাশ খাটার জন্য একটি করে লোক থাকে, ওখানকার ভাষায় যার নাম নোকর, আসলে তার কাছেই মেয়েটি যেন ক্রীতদাসী। এ ছাড়া রয়েছে দালাল, পাড়ার গুণ্ডা, বাড়িওয়ালি মাসি। এর মধ্যে মাত্র দু'চারটি মেয়েই আত্মরক্ষার কারণে দুর্মুখ ও ঝানু হয়ে যায়, নিষ্ঠুর ভাব দেখায়, বাকিরা সবাই অসহায়ভাবে অমানবিক শোষণের শিকার।

আমরা যে মেয়েটির কাছে প্রায়ই যেতাম, তার নাম মল্লিকা। একদিন সে কথায় কথায় বলেছিল, সে দানিবাবুর নাতনি। এটা সত্যিও হতে পারে, অথবা অলীক। প্রখ্যাত অভিনেতা গিরিশ ঘোষের ছেলে, তিনিও শিশির ভাদুড়ীর পূর্ব যুগে ডাকসাইটে অভিনেতা ছিলেন, সেই দানিবাবু বিয়ে করেননি। গিরিশবাবু নাকি স্বপ্নে দেখেছিলেন কিংবা কোনও জ্যোতিষী তাঁকে বলেছিল, দানি বিয়ে করলেই মারা যাবে। দানিবাবু বিয়ে না করলেও ব্রহ্মচারী ছিলেন না। বহু ললনা ভোগ করেছেন, সুতরাং তাঁর অবৈধ পুত্র-কন্যা-নাতি-নাতনি চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা বিচিত্র কিছু নয়। এই মল্লিকা একদিন আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। যেমন মোটরগাড়ির কয়েকজন ড্রাইভার একসঙ্গে গুলতানি করলে শুধু গাড়ি নিয়েই আলোচনা করে, সে রকম তরুণ কবিরাও যখনই আড্ডায় বসে, তারা শুধু কবিতা নিয়েই কথা বলে। মল্লিকার ঘরে বসে আমরাও কবিতার পত্রপত্রিকা, কোনও কোনও সম্পাদকের মুণ্ডপাত ও কবিতা বিষয়ক বিতর্কেই মত্ত থাকতাম গেলাস হাতে নিয়ে। সেসব শুনতে শুনতে মল্লিকার চোখ ট্যারা হয়ে যেত গভীর অভিনিবেশে। একদিন সে অন্য একটি ঘর থেকে উমা নাম্নী আর একটি মেয়েকে ডেকে আনল। সে নাকি পদ্য লেখে! আমাদের অনেক পেড়াপিড়িতে, দারুণ লাজুকভাবে মাথা নাড়তে নাড়তেও শেষ পর্যন্ত সে নিয়ে এল এগারোখানা খাতা। সব কবিতায় ভর্তি। সে কবিতার মান যাই-ই হোক, তবু সে এই নির্দয়, কঠিন, অবমাননার জীবনে থেকেও সেগুলি লিখেছে কেন? জানা গেল, তেরো বছর বয়েস থেকে উমা সে পল্লীতে আছে, তখন তার বয়স প্রায় চল্লিশ, প্রতিদিনই শেষ রাতে কিংবা ভোরে সে কিছু না কিছু লেখে। সে ছাপাবার কথা ভাবেনি, খ্যাতির মোহ জানেই না, লিখে অর্থ উপার্জনের কোনও প্রশ্নই নেই, তবু সে এগারোখানা খাতা কবিতা লিখে ভরিয়ে ফেলেছে কেন?

ডাকাত ও খুনি জাঁ জেনে সম্পর্কে জাঁ পাল সার্ত্রও এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। জাঁ জেনে যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত, তবু তিনি অদ্ভুত এক নীচের তলার মানুষের ভাষায় একটি উপন্যাস লিখছিলেন আপনমনে। সে লেখা কোনওদিন জেলখানার বাইরে যাবে কি না, কেউ পড়বে কি না, সে বিষয়ে কোনও ধারণাই তাঁর ছিল না, তবু কেন লিখছিলেন, কীসের প্রেরণায়?

একেই কি বলে দৈবী প্রেরণা? জাঁ জেনের সেই উপন্যাস 'আওয়ার লেডি অফ দা ফ্লাওয়ার্স' কোনওক্রমে বাইরে যায়, মুদ্রিত হয়, শিক্ষিত সমাজে দারুণ আলোড়ন ওঠে। জাঁ পল সার্ত্র ওই উপন্যাস পাঠ করে গুণ্ডা ও ডাকাত জাঁ জেনে সম্পর্কে একটি গ্রন্থ্ রচনা করেন, যার নাম, সন্ত জেনে।

ওই উমা নাম্নী বারবনিতাটি সম্পর্কেও সেরকম একটি গ্রন্থ্ রচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু সে ক্ষমতা আমার নেই। শুধু তার একটি-দুটি কবিতা কিঞ্চিৎ ঘষামাজা করে কোনও পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছিলাম। সেই পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে নিজের নাম ও কবিতা দেখেও উমা বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস দেখায়নি, সামান্য ফ্যাকাশেভাবে হেসেছিল মাত্র। সে হাসির প্রকৃত মর্মও কি বুঝতে পেরেছি?

পঁয়ত্রিশ

কৃত্তিবাস পত্রিকা দশ বছর পূর্ণ করল তেষট্টি সালে। শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন, 'এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায়—', কৃত্তিবাসের ক্ষেত্রে সেটা খাটেনি। এই গোষ্ঠীর মধ্যে মাঝে মাঝে মতভেদ ও মনোমালিন্য ঘটেছে অবশ্যই, কিন্তু প্রকাশ্যে বিবাদ হয়নি, ভিত্তিটি টলমল করেছে দু'-একবার, কিন্তু ভেঙে পড়েনি অকস্মাৎ, এর পরেও কৃত্তিবাস বেঁচে থেকেছে বহু বছর, নানা রূপে। দু'-একজন আর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখেনি, যেমন দীপক মজুমদার ও আনন্দ বাগচী, আবার কিছু পরে এসে কেউ কেউ নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন, যেমন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শরৎকুমার তখন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও বিলিতি কোম্পানিতে উঁচু চাকরি করেন, তবু প্রেসে যাওয়া-আসা, এমনকী প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকার বান্ডিল ঘাড়ে করে পৌঁছে দিতেন দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন স্টলে। শরৎ দক্ষিণ শহর ভালো চিনতেন। মাঝখানে বিশেষ কোনও ট্রেনিং-এর জন্য শরৎ কয়েক মাসের জন্য চলে গেলেন লন্ডনে, সেই সময়টায় আমিই পত্রিকা নিয়ে গেছি দক্ষিণ কলকাতার স্টলে। একজন স্টল মালিক, আমাকে চেনেন না, জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের অন্য যে একজন আসতেন, তিনি এলেন না কেন? আমি উত্তর দিলাম, তিনি বিলেতে চলে গেছেন। স্টল মালিকটি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন আমি একটা ডাহা মিথ্যুক! ঘাড়ে করে যে পত্রিকা নিয়ে আসে, দশ-পনেরো টাকা আদায়ের জন্য চার-পাঁচবার তাগাদা দেয়, সে কখনও বিলেত যেতে পারে! বিদেশ, বিশেষত ইংল্যান্ড-আমেরিকা যাওয়া তখন ছিল খুবই দুর্লভ ব্যাপার।

শক্তি বিশেষ সাহায্য করত প্রুফ দেখায়, ও বিষয়ে তার বিশেষ দক্ষতা ছিল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, প্রুফের বান্ডিল বগলদাবা করে সে উধাও হয়ে যেত মাঝে মাঝে। তখন তাকে খোঁজাখুঁজি করতে হত সারা শহর জুড়ে।

একটা সময় আমরা প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই জড়ো হতাম উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে। সেখানে গ্যাসের আলোর নীচে বসে কবিতা ও গল্প পাঠ হত। বলাই বাহুল্য, শক্তিই কবিতা পড়ত বেশি। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার বিখ্যাত গল্প 'অশ্বমেধের ঘোড়া' ওখানেই প্রথম পড়ে শোনায়। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় একটি নতুন গল্প লিখে পাণ্ডুলিপিটি ভুল করে ফেলে এল ট্যাক্সিতে। তারপর তার কী হা-হুতাশ! সে সময় কলকাতার অধিকাংশ ট্যাক্সি চালকই পঞ্জাবি, গুরুমুখিতে পত্রিকাও বেরোয়। গল্পটির সন্ধানে সন্দীপন সেই গুরুমুখি পত্রিকাতেও বিজ্ঞাপন

দিয়েছিল, তার কোনও ফল হয়েছিল কি না মনে নেই।

ঘণ্টা দু'-এক সাহিত্যের মধ্যে ডুবে থেকে তারপর আমাদের অন্য রকম নিমজ্জনের সাধ হত। রাত্তিরের সাঁতার। পার্কের মধ্যেই একটা পুকুর আছে, সেখানে নেমে পড়তাম দল বেঁধে। সঙ্গে তোয়ালে বা অন্য পোশাক নেই, প্রথম প্রথম প্যান্ট ভিজিয়ে, সেই অবস্থাতেই ফিরতাম বাড়ি। পরের দিকে সব কিছু খুলে ফেলে সাঁতার কাটতেই সুবিধে হত, তখন লোকজন বিশেষ থাকত না, দৈবাত কেউ আমাদের দেখে ফেললে হয়তো ভূত মনে করত। পার্কগুলিতে গুণ্ডা-বদমাস-ছিনতাইবাজদের তেমন উপদ্রব ছিল না। ময়দানের অন্ধকারে প্রেমিক-প্রেমিকা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলে কিছু গুনাগার দিতে হয় অবশ্য। সেখানে আসে নকল পুলিশ কিংবা আসল পুলিশই নকল সেজে। বিনা দোষে তাদের থানায় নিয়ে যেতে চায়, সেখানে যারা প্রেম করতে এসেছে তারা জানাজানি হবার ভয়ে পাঁচ-দশ টাকা দিয়ে উদ্ধার পেতে বাধ্য হয়। প্রেমিক বেকার হলে প্রেমিকাই দিয়ে দেয় সেই পয়সা, সব মেয়েই কিছু না কিছু পয়সা জমিয়ে রাখতে পারে।

সে সময় আমাদের জামা-কাপড় খুলে ফেলার নেশা ধরে গিয়েছিল। দল বেঁধে বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলে, নারীবর্জিত অবস্থায়, রাত্তিরের দিকে আলো না জ্বেলে আমরা নগ্ন অবস্থায় আড্ডা দিতাম। জঙ্গলের মধ্যে আদিম মানবের মতন উলঙ্গ হয়ে হেঁটেছি মাইলের পর মাইল।

সমস্ত পোশাক খুলে ফেলার এই যে ইচ্ছে, তার অন্য কোনও তাৎপর্য আছে কি না জানি না। লজ্জা কিংবা অন্য কোনও চিন্তা মাথায় আসত না, যেন পেতাম অপূর্ব মুক্তির স্বাদ।

দুপুরে সরকারি চাকরি, সন্ধেবেলা সংবাদপত্র অফিসে আংশিক কাজ, মধ্যে একটা টিউশানি ও মাঝে মাঝে গ্রন্থ সমালোচনার দক্ষিণা, এইসব মিলিয়েও আমার মাসিক উপার্জন তিনশো-সাড়ে তিনশোর বেশি ছিল না। তা দিয়েই বাড়ি ভাড়া, সংসার খরচ, কৃত্তিবাস ও বেড়াতে যাবার বিলাসিতা। বাস ভাড়া বাঁচাবার জন্য কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস থেকে শ্যামবাজার যেতাম এগারো নম্বর গাড়িতে, অর্থাৎ পায়ে হেঁটে। অবশ্য এর মধ্যে আমার পরের দুই ভাইও কিছু উপার্জন শুরু করেছে। পুরনো একটা খাতায় লেখা দেখছি, তখন প্রতিদিন বাজার খরচ ছিল দু'টাকা। তখনও টাকা-আনা পয়সার হিসেব ছিল, ওজন ছিল মন-সের-ছটাক। যুদ্ধের আমলে তামা বাঁচাবার জন্য পয়সাগুলোর মাঝখানটা ফুটো হয়ে গিয়েছিল, নামই ছিল ফুটো পয়সা। এক পয়সাতেও পাওয়া যেত কলমি শাক, কিংবা কাঁচা লঙ্কা, ষোলো পয়সা বা এক সিকিতে এক সের আলু (এক কিলোর চেয়ে কিছুটা কম), এক জোড়া ডিম চব্বিশ পয়সা, সেই ডিমের জোড়া আঠাশ পয়সা হওয়ায় লোকে রাগারাগি করেছিল, দায়ী করেছিল চিন দেশকে, কারণ চিনের সঙ্গে যুদ্ধের পর জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। ইলিশ মাছের সের চার টাকায় লাফিয়ে ওঠায়, একজন চিৎকার করে বলেছিল, এর পর কি দশ টাকা দরে ইলিশ খেতে হবে! আমাদের অবশ্য একটা সুবিধে ছিল, বোয়াল, আড়, শোল, মাগুর, বাঁশ পাতা, বেলে, এই ধরনের মাছগুলি ছিল কলকাতার লোকদের কাছে অস্পৃশ্য, তাই দাম সস্তা, দেড় টাকা-দু'টাকা সের, আমাদের মতন বাঙালদের কাছে এইসব মাছই বেশি প্রিয়, আমি ওগুলিই কিনতাম। শক্তি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার খাস ঘটি, আমাদের বাড়িতে এসে প্রথম বোয়াল মাছ খেয়ে তার এতই ভালো লেগে যায়, যে আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করত, তোমাদের বাড়িতে কি আজ বোয়াল রান্না হয়েছে, তা হলে আমি খেতে যাব!

ইলিশ ছাড়া আর কোনও সামুদ্রিক মাছ বাঙালিরা একেবারেই পছন্দ করে না। এক সময় শঙ্কর মাছ, সার্ডিন ইত্যাদি চালাবার চেষ্টা হয়েছিল, সেগুলি বাজারের এক কোণে পড়ে থাকত অনাদরে, এমনকী পমফ্রেট পর্যন্ত। তেলাপিয়া আসবার আগে পমফ্রেটই ছিল সব চেয়ে সস্তা মাছ, দাম একেবারে নগণ্য। আমি সব রকম নতুন ও অচেনা মাছ চেখে দেখার পক্ষপাতী। লইট্যা

বা লটকা নামে এক প্রকার বিশ্রী হড়হড়ে চেহারার মাছ আছে, মনে হয় যেন এক দলা শিক্‌নি, সে মাছ বাজারে বিক্রি হত মুরগির খাদ্য হিসেবে। সে মাছ যে মানুষের জিভেও অতি সুস্বাদু হতে পারে তা বুঝেছিলাম কোনারকের অতি সস্তার হোটেলে একবার চেখে দেখে। কলকাতায় ফিরেই বাজার থেকে কিনে আনলাম সে মাছ, তা দেখে বাড়ির সবাই ঘেন্নায় মুখ শিঁটকালো, কেউ ছুঁতেই চায় না। অগত্যা রান্না করলাম আমিই, আলু-পেঁয়াজ কুচিয়ে সামান্য ভেজে তার মধ্যে ওই মাছে ফেলে দিলেই একটু বাদে একেবারে গলে যায়, কাঁটা ফাঁটা কিছু থাকে না। তারপর থেকে সে মাছ আমাদের বাড়িতে চালু হয়ে গেছে।

আমি কিছু কিছু পারিবারিক সংস্কারেরও উদ্যোগ নিয়েছিলাম।

তখন সব বাড়িতে ব্যবহার করা হত টিনের বালতি। সব সময় কলে জল থাকে না, তাই একাধিক বালতিতে জল ধরে রাখা হয়। জল ভর্তি বড় বড় বালতিগুলি দারুণ ভারী, তুলে নিয়ে যাবার সময় কখনও না কখনও পায়ে আঘাত লাগবেই। বাজারে তখন সদ্য পলিথিনের বালতি আসতে শুরু করেছে কিন্তু বাঙালিরা সেগুলি ব্যবহারের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ। কিন্তু আমি দক্ষিণ ভারতে সেগুলি চালু হতে দেখে এসেছি, সেখানে মাটির হাঁড়ি-কলসির বদলেও অভঙ্গুর পলিথিন-প্লাস্টিকের ব্যবহার হচ্ছে ঘরে ঘরে। একদিন আমি টিউশনির মাইনে পেয়ে দু' খানা করে রঙিন পলিথিনের বালতি ও মগ কিনে নিয়ে এলাম বাড়িতে। বালতি-মগ হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরা ঠিক কবিজনোচিত কাজ না হতে পারে, কিন্তু অন্তত নাগের বাজার অঞ্চলে টিনের বালতি বিদায় করা ও পলিথিন বালতির প্রচলনের পথিকৃতের কৃতিত্ব নিশ্চয়ই দাবি করতে পারি।

তখনও পর্যন্ত আমাদের মতন অনেক বাড়িতেই প্রথা ছিল মাটিতে বসে খাওয়া! সব বাড়িতে থাকত খান কতক পিঁড়ি (কাঁঠাল কাঠের) এবং আসন। সেইসব আসনে বাড়ির মেয়েদের নানারকম সূচিশিল্পের নিদর্শন। তবে আসনগুলি সংরক্ষিত বিশেষ অতিথিদের জন্য আর প্রাত্যহিক ব্যবহারের জন্য। বড় বড় কাঁসার থালায় ভাতের পাশে শাক-তরকারি-আলু ভাজা সাজানো। বিয়ে বাড়িতে, শ্রাদ্ধ বাড়িতে পঙ্‌ক্তিভোজ হত মাটিতে বসে।

এইসব পিঁড়ি, আসন, কাঁসার থালা, বাটি আমাদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত হলেও যুগের সঙ্গে পরিবর্তিত হতেও বাধ্য। গ্রামীণ সমাজের যৌথ পরিবারেই এসব মানায়। ছোট ছোট সংসারের পক্ষে এই ঐতিহ্য রক্ষা করা ব্যয়বহুল। অত থালা বাসন রোজ মাজামাজি করাই ঝক্কির ব্যাপার, পিঁড়ি ও আসনে এক কণা ভাত পড়লেও ধুতে হবে, এঁটো কাঁটার বিচার ছিল কুসংস্কারের মতন। বামুন বাড়িতে আবার জলের গেলাসটা বাঁ হাতে ধরা নিষিদ্ধ, ভাত খেতে খেতে জল তেষ্টা পেলে ডান হাতেই গেলাস ধরতে হবে। খাওয়ার পর থালা-বাটি সরিয়ে নেবার পর মেঝেটা ভালো করে ধুয়ে মুছে নিতে হয়, নইলে জায়গাটা শকড়ি হয়ে থাকে। বাড়ির মেয়েদেরই এ কাজ করতে হয়। যেসব পরিবারে দাস-দাসী নেই, সেসব পরিবারেও পুরুষরা বাসন মাজছে, এ দৃশ্য অকল্পনীয়।

আমি একদিন আগে থেকে কারওকে কিছু না জানিয়ে ফুটপাথের দোকান থেকে একটা সস্তার টেবিল ও চারখানা চেয়ার কিনে ঠেলা গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে এলাম বাড়িতে। বাবার অবর্তমানে পরিবারের প্রধান হিসেবে আমি নির্দেশ জারি করলাম, এখন থেকে আর মেঝেতে বসা চলবে না, খাওয়া হবে টেবিলে এবং কাঁসার থালার বদলে কাচের প্লেটে, যা ধুয়ে ফেলা খুবই সুবিধেজনক। এবং খাবার সময় জলের গেলাস ডান হাতে ধরা অস্বাস্থ্যকর।

এখন ভাবতে মজা লাগছে যে এইসব ব্যবস্থা অনেকদিনই চালু হয়ে গেছে শহরতলিতে। পিঁড়ি ও সাধের আসন অদৃশ্য, এঁটোকাঁটার বাছবিচারও কম। লোহার বালতিও দেখা যায় না। কিন্তু সেই ষাটের দশকের গোড়ায় আমাকে এইসব জোর করে প্রবর্তন করতে হয়েছিল।

আংটি-তাবিজ-মাদুলির বিরুদ্ধেও আমার কড়া অভিমত ছিল। অলঙ্কার বা শোভা বর্ধনের জন্য মেয়েরা তবু আংটি ও কানের দুল পরতে পারে, কিন্তু পুরুষদের হাতে আংটি

উপহাসযোগ্য। কোনও পরিচিত পুরুষের হাতে আংটি দেখলেই আমি সরলভাবে জিজ্ঞেস করতাম, তুমি কানে দুল পরো না কেন? কৃত্তিবাস পত্রিকায় নতুন কোনও কবি লেখা জমা দিতে এলে লক্ষ করতাম, তার বাহুতে তাবিজ কিংবা মাদুলি আছে কি না। যদি থাকত, তবে তার কবিতার বিচার করতাম প্রাথমিক অবজ্ঞার সঙ্গে।

পুরুষ মানুষের গোঁফ সম্পর্কেও আমার সংশয় ছিল। কৈশোর ছাড়াবার পর নবীন যুবা হিসেবে আমারও নাকের নীচে গোঁফের রেখা ছিল। গোঁফ ওঠাই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার লক্ষণ। তখন কেউ গোঁফ কামালে বলা হত যাত্রার দলের সখি। কিন্তু সাতাশ-আঠাশ বছর বয়েসে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পর মনে হল, গোঁফ রাখার মধ্যে একটা দেখানেপনা আছে। এক একজনের গোঁফ এক এক রকম, 'গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।' কারও মাছি গোঁফ, কারও আশু মুখুজ্যের মতন, কারও হিটলারি, কারও ডগলাসি (ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস জুনিয়ার হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা, তাঁর প্রায় ছবিতেই থাকত তলোয়ার নিয়ে মারামারি, তাঁর গোঁফও তলোয়ারের মতন), অর্থাৎ কে কী রকম গোঁফ রাখবে, সে সে-ব্যাপারে সচেতন। নিজের চেহারা সম্পর্কে এই সচেতনতাই প্রকটভাবে জাহির করা পুরুষ মানুষের যোগ্য নয়। কফি হাউসে আড্ডা দিতে দিতে একদিন আমি বন্ধুদের বললাম, চলো, সবাই মিলে একটা সেলুনে গিয়ে গোঁফ কামিয়ে ফেলি! কয়েকজন রাজি হল, কয়েকজন হেসে উড়িয়ে দিল।

শক্তি তখন দাড়ি রাখে, সুতরাং তার গোঁফ কামাবার প্রশ্ন নেই। শক্তি চিরতরে দাড়ি কামিয়ে ফেলেছিল আরও পরে, অন্য কারণে। এবং আমি প্রস্তাব করেছিলাম বলেই প্রতিবাদ স্বরূপ সে কখনও গোঁফ কামায়নি।

এগুলিকে কি ছোটখাটো সমাজ সংস্কার বলা যায়? কবিতা রচনা ছাড়াও এই সব দিকে ঝোঁক ছিল আমার। বন্ধুদের প্রায়ই বলতাম, আমি বিয়ে করব কোনও বিধবা কিংবা কোনও মুসলমান মেয়েকে। আমার দুর্ভাগ্য, কোনও বিবাহযোগ্য হিন্দু বিধবা কিংবা কোনও মুসলমান যুবতী আমার দিকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখেনি।

রাত্তিরবেলা বাড়ি ফেরার পথে মাঝে মাঝেই মনে হত, জীবনটা কি এইভাবেই কাটবে? সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সব কিছুই যেন রুটিন হয়ে গেছে, এমনকী আড্ডাও রুটিন। সরকারি অফিসে অন্য সহকর্মীরা আলোচনা করত, কী পদ্ধতিতে এবং কবে পদোন্নতি হবে। পদোন্নতি হলেও এই অফিসে আমাকে সারাজীবন কাটাতে হবে! ভাবলেই শিউরে উঠতাম। অন্য কোনও জীবিকার পথ খোঁজার যোগ্যতাও তো নেই আমার। মনের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠত প্রতিবাদ, কিন্তু তা কীসের বিরুদ্ধে তা স্পষ্ট ছিল না। নিজের জীবনটা দেখতে পেতাম না বেশি দূর পর্যন্ত। এই পরিবেশ ছাড়িয়ে ওপরে উঠতেই হবে, কিন্তু কী করে?

এর মধ্যে শক্তি একটা কাণ্ড করে ফেলল। কফি হাউস থেকে বেরিয়ে এক বন্ধুকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতে গিয়ে সেও চেপে বসল ট্রেনে। তারপর আর পাত্তাই নেই। কয়েক সপ্তাহ বাদে জানা গেল সে আছে চাইবাসায়, সমীর রায়চৌধুরীর কাছে। সমীর আমার সিটি কলজের বন্ধু, আমার সূত্রেই শক্তির সঙ্গে তার পরিচয় এবং সে তখন বিহার সরকারের অধীনে চাকরি করে, চাইবাসায় থাকে একা।

সমীর কিছুদিনের জন্য হরবোলাতেও যোগ দিয়েছিল এবং বি এ পরীক্ষার পর আমি যখন দীর্ঘদিনের বেকার, তখন একটা ব্যবসায়ের প্রস্তাব দিয়েছিল আমাকে। দু'জন অংশীদারের মধ্যে সমীর দেবে মূলধন, আমি খাটাখাটনি করব। যেহেতু ছাপাখানার কাজ শিখে গেছি, তাই পুস্তক প্রকাশনার ব্যবসা। আমাদের শ্যামপুকুর স্ট্রিটের বাড়িতে রীতিমতো অফিস খোলা হল, সহজ নাম, 'সাহিত্য প্রকাশক'। সমীরেরই আগ্রহ-আতিশয্যে প্রথম প্রকাশ আমারই কাব্যগ্রন্থ 'একা এবং কয়েকজন'। আমি মনে করতাম, কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদে ছবি থাকা উচিত নয়, তাই গেরুয়া রঙের কাপড়ে বাঁধানো মলাটের ওপর সিল্ক স্ক্রিনে ছাপা শুধু গ্রন্থের নাম ও রচয়িতার

নাম, খুবই সুদৃশ্য হয়েছিল কিন্তু ভেতরের কবিতাগুলি এতই দুর্বল যে পরে সেই বইটির দিকে তাকালেই আমার লজ্জা হত। পরবর্তীকালে সে বইটি পুনর্মুদ্রণের কথা আর মনেও স্থান দিইনি, বরং সে বালখিল্য প্রয়াসটিকে চাপা দেবার জন্য ওই নামেই একটি উপন্যাস লিখেছিলাম। সে বই ক'কপি বিক্রি হয়েছিল তা মনে নেই, কিন্তু উপহার দিয়েছিলাম অনেককে। এক দুপুরে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে উপহার দিতে গিয়েছিলাম বিষ্ণু দে-কে, তিনি তখন ক্লাসে পড়াচ্ছেন, ওই সময় যে বিরক্ত করতে নেই সে জ্ঞানও আমার ছিল না। আকাট গ্রাম্য গর্দভের মতন আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম বইটি হাতে নিয়ে। বিষ্ণু দে যদি দারোয়ান ডেকে আমাক গলা ধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দিতে বলতেন, সেটা মোটেই অন্যায্য হত না, কিন্তু সেই অগ্রজ কবি নিজেই উঠে এসে সস্নেহে এক কম্পিতবক্ষ তরুণের হাত থেকে বইটি নিয়ে তাকে ধন্য করেছিলেন।

বইটির এক কপি দিয়েছিলাম, চাকরি পাবার পর আমার সেই সরকারি অফিসের এক তরুণী সহকর্মীকে। মেয়েটি সব সময় নতমুখী, কারও সঙ্গে কথাই বলে না। সরকারি অফিসে পুরুষদের তুলনায় মেয়ে কর্মীর সংখ্যা দশ শতাংশেরও কম ছিল তখন, এবং পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে কেউই, প্রকাশ্যে অফিসের মধ্যে অন্তত, হেসে কথা বলত না। একমাত্র এক টেলিফোন-অপারেটর যুবতী ছিল প্রগলভা। আমার টেবিলের কাছাকাছি বসা সেই নতমুখী, ছিপছিপে তরুণীটি রোজ একটি করে বই নিয়ে আসত এবং টিফিনে একা একা পড়ত। একদিন একটি বইয়ের মলাট দেখতে পাই, সমর সেনের কবিতা। তাকে কবিতা-পাঠিকা জেনে, ভরসা করে একদিন গোপনে অফিসের বাইরে বাস স্টপে তাকে আমার কাব্যগ্রন্থটি উপহার দিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ শতবর্ষ পরে কোনও তরুণীর হাতে তাঁর কাব্যগ্রন্থ থাকার কথা কল্পনা করে গিয়েছিলেন, আমি জীবিত অবস্থাতেই কোনও তরুণী আমার কাব্যগ্রন্থের অন্তত পাতা উল্টো দেখবে, এটুকু তো চাইতেই পারি। মেয়েটি প্রত্যাখ্যান করেনি, হাত পেতেই নিয়েছিল এবং প্রায় অদৃশ্য একটু খুশির ছায়াও দেখা গিয়েছিল তার মুখে। সেই বইয়ের সূত্রে অবশ্য তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়নি এবং সে কোনও মতামতও জানায়নি। কয়েক বছরের মধ্যেই সে অফিসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘুচে যায়, তারও কিছুদিন পর সেখানকার এক সহকর্মী বরুণ বক্সীর কাছে জেনেছিলাম যে সেই নতমুখী তরুণীটি হঠাৎ কোনও কারণে আত্মহত্যা করেছে। শুনে কষ্ট পেয়েছিলাম খুব, সে আমার প্রেমিকা ছিল না, কিন্তু আমার কবিতার বইটি তো তার করতল স্পর্শ পেয়েছিল! এ কাহিনী উত্থাপনের কারণ, আরও কয়েবছর পর কলেজ স্ট্রিটের রেলিঙে পুরনো বইয়ের দোকানে অকস্মাৎ একদিন চোখে পড়ে সেই কাব্যগ্রন্থের এক কপি, পাতা উল্টে দেখি, তাতে সেই মেয়েটির নাম লেখা। তার মুখটা মনে পড়ে গেল। আমার সেই দুর্বল, অকিঞ্চিৎকর কাব্যগ্রন্থটি যে পুরনো বইয়ের দোকানে প্রদর্শনের মর্যাদা পেয়েছে, সেটুকুই তার সার্থকতা।

যাই হোক, সমীরেরও দুটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল, 'ঝর্ণার পাশে শুয়ে আছি' এবং 'আমার ভিয়েৎনাম', কিন্তু আমাদের সেই প্রকাশনা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অতি শৈশব অবস্থাতেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।

শক্তি চলে গেল সমীরের কাছে চাইবাসায়, আমি কিন্তু তখনও চাইবাসা কোথায় তা জানিই না। মাসের পর মাস আর শক্তির পাত্তা নেই। শক্তিও অল্প বয়সে পিতৃহীন, কিন্তু বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল খুবই আলগা, কোনও দায়িত্ব নেয়নি, তাই হঠাৎ হঠাৎ সে বাড়ি ছেড়ে, বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য যেখানে সেখানে চলে যেতে পারত, আমার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। শক্তি ফিরে আসছে না, কিন্তু অনেক রকম গুজব ভেসে আসে। একবার শোনা গেল, সমীর চাইবাসা থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেছে, শক্তি বন্দি হয়ে আছে সেখানকার জেলে। এটা সত্যি বলে মনে হল, কারণ ওরা চিঠি লেখে না কেন?

শক্তিকে উদ্ধার করার জন্য যাত্রা করলাম সন্দীপন ও আমি। জেলের খাবার খুব খারাপ, সিগারেট পাওয়া যায় না, তাই আমরা শক্তির জন্য কয়েক প্যাকেট সিগারেট, বিস্কুট ও টিনের চিজ নিলাম সঙ্গে, ট্রেন বদল করে চাইবাসায় পৌঁছে উঠলাম ডাকবাংলোয়। আঃ কী আরামের দিন ছিল তখন, রিজার্ভেশন না নিয়েও ট্রেনে বসবার জায়গা পাওয়া যেত, ডাকবাংলোয় গিয়ে চাইলেই পাওয়া যেত ঘর। চাইবাসায় সমীর কোথায় থাকে জানি না, সেখানে কাউকে চিনি না, জেলখানার উঁচু পাঁচিলটা আসবার সময়ই চোখে পড়েছে। পৌঁছোতে পৌঁছোতে বিকেল হয়ে গেছে, পরদিন সকালে সব খোঁজখবর নেওয়া যাবে ভেবে, আমরা দু'জনে বেড়াতে বেরোলাম এবং যে কোনও জায়গায় গিয়ে প্রথমেই আমার কাছাকাছি নদীটি দেখতে ইচ্ছে করে বলে, আমরা হাঁটতে লাগলাম রোরো নদীর দিকে। নির্জন রাস্তা, দু'জনেই গলা মিলিয়েছি এক গানে, হঠাৎ এক বাড়ি থেকে কেউ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, এখানে আমি ছাড়া আর কে রবীন্দ্রসংগীত গায়? এবং বেরিয়ে এল এক দাড়িওয়ালা যুবক। আর কে, শক্তি!

জেলখানার গুজব যে ছড়িয়েছিল, তার মতন সুরসিক আর হয় না। হ্যাঁ জেলখানাই বটে, তবে একেবারে স্বর্গীয় ও রমণীয়। সমীর কিছুদিনের জন্য সরকারি কাজে অন্যত্র গেছে, তাই তার এক পরিচিত বাঙালি পরিবারে রেখে গেছে শক্তিকে। সে পরিবারের সকলেরই ব্যবহার মধুর ও আন্তরিক, শক্তির খাতিরযত্নের শেষ নেই। বিশেষত কিশোরী থেকে তরুণী বয়সের ছ-সাতটি বোন শক্তির মতন একজন মানুষকে পেয়ে গানে-গল্পে মশগুল হয়ে আছে। সন্দীপন ও আমি শক্তির জন্য রেসকিউ পার্টি হয়ে এসেছি শুনে শক্তি মোটেই খুশি হল না। এ বন্দিত্ব থেকে কে উদ্ধার পেতে চায়! এমনকী বন্ধুত্বের টানও এর কাছে তুচ্ছ।

সমীরের বাড়িটা একটা ছোট টিলার ওপরে। ভারী মনোরম পশ্চাৎপট। কিন্তু সকালবেলা আমরা দু'জনে ঘুম ভেঙে উঠতে না উঠতেই দেখি যে তার আগেই সমীর ও শক্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওরা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত সেই স্বর্গধামেই কাটায় পরিদের সন্নিধানে। সে বাড়িতে আমরা পরে দু'-একবার গেছি বটে, কিন্তু আঁচ পেয়েছিলাম সেটা সমীর-শক্তির ঠিক পছন্দ নয়, ওরা আর এখানে ভিড় বাড়াতে চায় না। সন্দীপন ও আমি ওদের ওপর অভিমান করে সেই টিলার ওপরের নির্জন বাড়িতে বসে সকালবেলাতেই এক কেরোসিনের টিন ভর্তি হাঁড়িয়া পান করে টপ ভুজঙ্গ হয়ে পড়েছিলাম। মশারির ওপর জ্বলন্ত সিগারেট ছুড়ে একটা অগ্নিকাণ্ড বাধাবারও উপক্রম হয়েছিল মনে পড়ছে!

এর পর আরও কয়েকবার আমরা চাইবাসাকে কেন্দ্র করে চক্রধরপুর-রাঁচির রাস্তায় পাহাড়ি-জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন ডাকবাংলোয় মাতামাতি করতে গেছি। কিন্তু ওদিকের দীর্ঘপ্রবাস ও অভিজ্ঞতা শক্তিরই সবচেয়ে বেশি কাজে লেগেছে। ওর কবিতায় বেশ একটা পরিবর্তন আসে, অনেক বিশুদ্ধ সরল লিরিক লিখতে শুরু করে, যার অধিকাংশই অবিস্মরণীয়। প্রমথ চৌধুরী যাকে বলেছেন মন্ত্রশক্তি, সে রকম একটা কিছু যেন ভর করেছিল শক্তির ওপর। সন্দীপনেরও কিছু রচনায়, বিশেষত 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী'তে ওখানকার ছাপ পড়েছে। কিন্তু ওসব অভিজ্ঞতা আমার ওপর বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি। কিংবা আমি লেখায় কাজে লাগাতে পারিনি।

সমীর চাইবাসা থেকে বদলি হয়ে যায় ডালটনগঞ্জে, সেখানেও আমরা গেছি বারবার। ততদিনে সে চাইবাসার পূর্বোক্ত স্বর্গধামের এক বোন বেলাকে বিয়ে করেছে এবং বড় অফিসার। আমাদের মধ্যে সমীরই অনেক আগে বিবাহিত এবং বেলা তার স্বামীর দামাল বন্ধুদের আতিথ্য দিতে কখনও কার্পণ্য করেনি। তার স্বভাবের স্নিগ্ধতায় আমরাও বোধহয় ক্রমশ খানিকটা শান্ত হয়ে যাচ্ছিলাম।

একবার ডালটনগঞ্জে থাকার সময় খবর পেলাম কাছাকাছি কয়েকটা পাহাড় নিলাম হচ্ছে। ছুটে গেলাম সেই নিলাম দেখতে। তিন-চার হাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এক একটা ছোট পাহাড়।

তা লিজ না জন্মস্বত্ব তা জানি না, প্রায় ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড় লোকে কেন কিনছে তাও বুঝিনি, কিন্তু খুবই উত্তেজনা বোধ করেছিলাম। তখনকার লেখক বন্ধুদের মধ্যে আমিই একমাত্র বাস্তুহারা পরিবারের সন্তান, কোথাও আমাদের এক টুকরো জমি নেই। মনে হয়েছিল, ওরকম একটা পাহাড়ের মালিক হতে পারলে পৃথিবীতে আর কিছু চাই না। নিলামের দর চড়ছে, হঠাৎ আমার এক সময় ডাক দিতে ইচ্ছে হয়েছিল, অতি কষ্টে সামলাচ্ছি নিজেকে। পকেটে তিরিশ টাকাও নেই, তিন হাজার টাকার ডাক দিলে কী হয়? লোকে মারবে বোধহয়।

তারপর বেশ কিছুদিন আমি মনে মনে একটা নিজস্ব নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে বাস করেছি।

ছত্রিশ

স্কুল বয়েস থেকেই আমার চিঠি লেখার অভ্যেস এবং আমি চিঠি পেতে অভ্যস্ত। চিঠি লেখার জন্য হাত নিশপিশ করত, গ্রীষ্ম বা পুজোর ছুটিতে বন্ধুরা অন্য কোথাও বেড়াতে গেলেই চিঠি লিখতাম, উত্তর প্রাপ্তির আশা না করেই। জ্বরে কয়েকদিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে একটা আনন্দের ব্যাপার, চিঠি লেখার ছুতো পাওয়া গেল! এ তো শুধু ছেলে বন্ধুদের কাছে চিঠি, প্রথম প্রেমপত্র লেখার পর চিঠির স্রোতে প্রবল জোয়ার এসেছিল!

তখন পেন ফ্রেন্ডশিপ বা পত্র মিতালি খুব চালু ছিল। পত্রপত্রিকায় দেশের অন্য রাজ্যের, বাইরের নানান দেশের পত্রবন্ধুদের ঠিকানা ছাপা হত। আমি যৎপরনাস্তি ভুলভাল ইংরেজিতে এবং আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে বিদেশি ছেলেমেয়েদেরও লিখেছি। আন্তর্জাতিক চিঠির ডাক খরচ ছিল যৎসামান্য। সেইসব চিঠির উত্তর আসত সুদৃশ্য খামে আর নয়ন অভিরাম ডাকটিকিটে। এই বিদেশি পত্রমৈত্রীর আর একটা দারুণ মজা ছিল, একটা চিঠির উত্তর পাওয়া যেত সাত-আটখানা। তার রহস্যটা এই রকম: আমি চিঠি লিখলাম জাপানের একটি মেয়েকে, সে আমার নাম-ঠিকানা জানিয়ে দিল তার অন্যান্য বন্ধুদের, তারাও পাঠাতে লাগল চিঠি। সে সব চিঠির উত্তর না দিলেও ক্ষতি নেই, কারণ, তারা আবার এর মধ্যে এই ভারতীয় ছেলেটির ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছে অন্য দেশের অদেখা বন্ধুদের, সে সব জায়গা থেকেও চিঠি আসতে শুরু করেছে। অর্থাৎ একটা চিঠি লিখে আমি অনেক সময় পনেরো-কুড়িখানা খাম পেয়েছি।

চিঠির সঙ্গে আত্মপরিচয় দিতে হত কিছু কিছু, যেমন শিল্পের কোন শাখায় আমার উৎসাহ, জীবনের প্রধান শখ কী, ইত্যাদি। প্রধান শখ হিসেবে আমি সব সময়ই লিখতাম ভ্রমণ। তার ফলে অবধারিতভাবে পত্রবন্ধুরা আমন্ত্রণ জানাত তাদের দেশে, চলে এসো, আমাদের বাড়িতে থাকবে, তোমাদের নিয়ে সব দর্শনীয় স্থানে যাব, আমার মায়ের রান্না খাওয়াব! একটি জাপানি মেয়ে লিখেছিল, তুমি কি কোনও আগ্নেয়গিরি দেখেছ? তুমি এলে তোমাকে ফুজি আগ্নেয়গিরিতে নিয়ে যাব, আমার বাবা বলেছেন, সেখানে পিকনিক হবে।

এইসব চিঠি পড়ে শুরু হত কল্পনার উদ্দাম খেলা। সত্যি সত্যি যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। খুদে পত্রবন্ধুরা না হয় আতিথ্য দেবে, কিন্তু সাগর পাড়ি দেবার যানবাহনের ভাড়া দেবে কে? এ পর্যন্ত আমি ভারতের মধ্যে দিল্লি-সিমলা-হায়দরাবাদ-গোয়া ঘুরে এসেছি এক বন্ধুর রেলের পাশ নিয়ে। নিজের পয়সায় টিকিট কেটে গেছি বড়জোর শান্তিনিকেতন বা চাইবাসা, বিদেশে পাড়ি দেওয়া বামন হয়ে চাঁদ স্পর্শ করার দিবাস্বপ্নের মতন। তবু, আমি প্রায়ই তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করতাম, জাহাজে আলু কাটা কিংবা ইঞ্জিনে কয়লা দেবার চাকরিও যদি পাই, তা

হলে নিয়ে নেব তৎক্ষণাৎ! মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে জন্মেছি, এই পৃথিবীটা পুরোপুরি দেখব না?

পত্র বন্ধু-বান্ধবীরা প্রত্যেকেই নিজেদের ছবি পাঠিয়ে অনুরোধ জানাত আমার একটি ছবির জন্য। ছবিটা দেখলে তবু অন্তত বোঝা যায়, কাকে লিখছি, কে আমার কথা মনে করছে। কিন্তু তখন আমাদের এখানে ছবি তেমন সুলভ ছিল না, এখনকার মতন ঘরে ঘরে ক্যামেরা ছিল না। কুমারী মেয়েদের পাড়ার ফটোগ্রাফি স্টুডিয়োতে নিয়ে গিয়ে ছবি তোলানো হত, বিয়ের সম্বন্ধের সময় প্রয়োজন হবে বলে। ছেলেদের ছবির আবার কী দরকার? আমার বাবা, স্ত্রীর কোলে তাঁর প্রথম শিশুপুত্রের ছবি তুলিয়েছিলেন ওই রকম এক স্টুডিয়োতে নিয়ে গিয়ে। স্টুডিয়োগুলি ছিল বেশ মজার। তখনও অন্ধকার ঘরে প্লেট ক্যামেরার যুগ শেষ হয়নি, পেছনদিকে নানান রকম দৃশ্য আঁকা পরদা ঝোলানো থাকত, কলকাতায় বসেই বরফ-ঢাকা পাহাড়ের পটভূমিকায় নবদম্পতির ছবি তোলা হত বিশ্বাসযোগ্যভাবে। আমার বাবার একটা ছেলেমানুষি শখের ছবিও দেখেছি আমি, তিনি পাইলটের মতন কালো চশমা চোখে এক বন্ধুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন একটা টু সিটার প্লেনের সামনে। ওটাও স্টুডিয়োতে পর্দায় আঁকা একটা প্লেনের ছবি, সত্যিকারের কোনও প্লেনের কাছাকাছি সম্ভবত তিনি ইহজীবনে যাবার সুযোগ পাননি, আরোহণ করা দূরে থাক।

আমার বন্ধু আশুর সৌজন্যে অবশ্য আমার ফটোগ্রাফিতে হাতেখড়ি হয়েছিল অল্পবয়সেই। বনেদি বাড়ির সন্তান হিসেবে আশুর নানা রকম শখের মধ্যে অন্যতম ছিল ক্যামেরা-বিলাসিতা, ওদের পারিবারিক সংগ্রহে লাইকা, নিক্কন এইসব দুর্লভ ও বহুমূল্য কিছু ক্যামেরা ছিল। একটা সাধারণ বক্স ক্যামেরা সে আমাকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার জন্য দিত মাঝে মাঝে। সেটা নিয়ে আমি সন্ধেবেলার আলোকোজ্জ্বল চৌরঙ্গি, দুপুরের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ইত্যাদির ছবি তুলে হাত পাকিয়েছি। নিয়ম না জেনে, সূর্যের দিকে লেন্স ফিরিয়ে ছবি তুললে সেগুলি অবধারিতভাবে সিলুয়েট হবেই এবং সেই আকস্মিক-সিলুয়েট ছবিই আমার বেশি পছন্দের হত। যাই হোক, আশুর তোলা আমার একটি আবক্ষ ছবি আমি পাঠিয়েছিলাম কয়েকজন পত্রবন্ধুকে, তা পেয়ে সুইডেনের একটি মেয়ে লিখেছিল, আই লাইক্‌ড ইওর অলিভ-কালার ফেস। আমার মুখমণ্ডলটি যে জলপাই বর্ণের, তা আমার জানা ছিল না! কেউ কেউ ইংরেজির বদলে লিখত নিজেদের ভাষায়, হাঙ্গেরি থেকে একটি চিঠি পেয়ে আমি তার একটি শব্দার্থও বুঝতে পারিনি, তাকে উত্তর দিয়েছিলাম বাংলায়।

কলেজ-জীবনে এসে কৃত্তিবাসের সম্পাদক হয়ে বসবার পর প্রত্যেকদিনই আমার নামে খাম আসত নব্য কবি-যশঃপ্রার্থীদের কাছ থেকে। সঙ্গে ডাকটিকিট থাকলে উত্তর দিতাম অবশ্যই, এ শিক্ষা পেয়েছি বুদ্ধদেব বসুর কাছ থেকে। তাঁর পত্রিকায় কবিতা পাঠালে উত্তর পেতাম এত দ্রুত, যেন একই দিনের মধ্যে। চিঠি পেতাম অনেক, শুধু বহু প্রত্যাশিত চাকরির চিঠি পাবার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল বেশ কয়েক বছর।

চাইবাসা কিংবা হেসাডির ডাকবাংলোয় হুল্লোড় করে ফিরে আসার পর একদিন দেখি, চিঠির বাক্সে আমার জন্য একটি সুদৃশ্য বিদেশি খাম অপেক্ষা করছে। চিঠিটি এসেছে ফিলিপিনস থেকে, লিখেছেন পল এঙ্গেল। যাকে বলে, নিজের চোখেও বিশ্বাস করা যায় না, সেই রকমই ব্যাপার। এসব কী লেখা আছে চিঠিতে, এ কী সত্যি, না মস্করা? পল এঙ্গেল আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমেরিকার আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অন্তর্গত রাইটার্স ওয়ার্কশপে যোগ দেবার জন্য। যাওয়া-আসার বিমান ভাড়া দেওয়া হবে, এবং মাসিক স্কলারশিপ দু'শো ডলার।

বারবার পড়েও চিঠিখানার বক্তব্য যেন বিশ্বাস হতে চায় না। পল এঙ্গেল যে-ক'দিন কলকাতায় ছিলেন, তখন এ ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও কোনও ইঙ্গিত দেননি। তিনি অনেক কবি ও

লেখকদের সঙ্গে মিশেছেন, আমার সঙ্গে আলাদাভাবে কোনও কথা হয়নি, তাঁর ওপরে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করার মতন কোনও যোগ্যতাও আমার নেই। আমি ইংরেজির ছাত্র নই, ভালোভাবে ইংরেজি বলতেও পারি না, লিখতেও পারি না। আমার তুলনায় অনেক তুখোড় ইংরেজি-জানা যুবকদের তিনি দেখেছেন, তবু তিনি আমাকেই বেছে নিলেন কেন? পরবর্তীকালে অনেকেই আমাকে এই প্রশ্ন করেছেন। এর উত্তর কি আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব? বারবার এই প্রশ্ন শুনতে শুনতে শেষ পর্যন্ত আমি উত্তর দিতাম, বোধহয় আমার এই গোল মুখখানা দেখেই সাহেবের পছন্দ হয়েছে, তা ছাড়া আর তো কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না!

পরের চিঠিতে পল এঙ্গেল জানিয়েছিলেন, নিজেদের মাতৃভাষায় যারা লেখে, এরকম কিছু তরুণ কবিকে তিনি আয়ওয়া'র রাইটার্স ওয়ার্কশপে জড়ো করতে চান, যারা ইংরেজিতে লেখে তাদের নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই, তাদের অন্য অনেক রকম সুযোগ আছে। আমার কয়েকটি কবিতার অনুবাদ পড়ে এবং আমি তরুণদের জন্য পত্রিকা সম্পাদনা করি জেনে তিনি মনোনীত করেছেন আমাকে। গরিব দেশের এক কবি নিজের কষ্টার্জিত অর্থে একটি কবিতার পত্রিকার খরচ চালিয়ে যাচ্ছে, এটা পশ্চিমি দেশের মানুষের কাছে অভাবনীয়।

এমন একটা প্রস্তাব পাবার পরেও তা গ্রহণ করা যাবে কি না, তা নিয়ে আমাকে অনেক চিন্তা করতে হয়েছিল। এখানকার সংসার চালাবার দায়িত্ব আমাকে পালন করতেই হবে। এক ডলারের দাম চার টাকা আশি পয়সা, অর্থাৎ একশো ডলারে চারশো আশি টাকা। আমার এখানকার মাসিক উপার্জন এরকমই। স্কলারশিপের অর্ধেক টাকা প্রতি মাসে দেশে পাঠিয়ে দিলে আর সমস্যা থাকার কথা নয়। কিন্তু আমেরিকার জীবনযাত্রার মান আমার জানা নেই। বাকি একশো ডলারে কি ওখানকার বাড়ি ভাড়া, খাওয়া-পরা কুলোবে? অবশ্য মনে মনে আমি প্রথম থেকেই দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, যতই অসুবিধে হোক, ওদেশে গিয়ে যদি আধপেটা খেয়েও থাকতে হয়, তবু আমি যাবই! পরিচিতদের মধ্যে আমারই ভ্রমণের বাসনা সব থেকে প্রবল, এবং সেই তীব্র ইচ্ছাশক্তিতেই যেন এই সুযোগটি এসে পড়েছে আমার কাছে।

এর পরেও অনেক বাধা। সবচেয়ে দুস্তর বাধা একটি পাসপোর্ট সংগ্রহ করা। স্বাধীন দেশে প্রত্যেক নাগরিকেরই পাসপোর্ট পাওয়ার অধিকার আছে। শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশগুলিতে সেই অধিকার ছিল না, সেই দেখাদেখি জওহরলাল নেহরুর অধীনে ভারত সরকারেরও দারুণ কড়াকড়ি নীতি ছিল। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় এ দেশ থেকে প্রচুর তরুণ-তরুণী ইওরোপ আমেরিকার যেতে শুরু করে। আমার যাত্রাকাল তার কিছু আগে, তখনও বিদেশি মুদ্রার দারুণ সংকটের জন্য এ-দেশ থেকে খুব মেধাবী ছাত্রছাত্রী ছাড়া কাউকে যেতেই দেওয়া হয় না। আমার মতন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান এবং লেখাপড়াতেও মাঝারি, বাংলা কবিতা লিখি, তাও এমন কিছু খ্যাতিমান নই, আমাকে পাসপোর্ট দেবার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না রিজিওনাল পাসপোর্ট অফিসার, তিনি একজন দুঁদে আই এ এস এবং বদমেজাজি। বিদ্রূপের ছলে একদিন সরাসরি বললেন, বাংলা কবিতা লিখে আমেরিকা যাওয়া, এ কী মামার বাড়ি নাকি? তুমি যদি ও-দেশে হঠাৎ মারা যাও, তা হলে তোমার দাহকার্যের খরচ দেবে কে? তখন পাসপোর্টের ফর্মে লেখা থাকত যে বিদেশে কোনও ভারতীয়ের অকস্মাৎ মৃত্যু হলে তার মৃতদেহ সংকারের দায়িত্ব নেবেন ভারতের রাষ্ট্রপতি, অর্থাৎ ভারত সরকার খরচ করবেন বটে, কিন্তু দেশ থেকে সেই টাকা আদায় করে নেবে। কিন্তু আমার নামে কোনও বাড়ি জমি নেই, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নেই, আমার মৃত্যুর পরে সে টাকা আদায় করা হবে কীভাবে? অনেক কাকুতি-মিনতি করে একজন গ্যারান্টার জোগাড় করা হল, তাতেও পাসপোর্ট অফিসার সন্তুষ্ট নন, তিনি আমাকে পাসপোর্ট দেবেনই না, বাংলা কবিতার ব্যাপারটাই তাঁর ঘোর অপছন্দের। আমার যাওয়াটাই বানচাল হওয়ার উপক্রম।

আমার বন্ধু দিলীপ দত্ত কংগ্রেসের খুব প্রভাবশালী নেতা অতুল্য ঘোষের আত্মীয়। ওই

পরিবারের অনেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু দিলীপ কখনও রাজনীতির সঙ্গে বিন্দুমাত্র যুক্ত হয়নি, সেইজন্যই সে আমাদের বন্ধু হয়েছিল, সে ক্রিকেট খেলত আর কবিতা লিখত। বড় বড় নেতারা তাদের বাড়িতে আসে, সবাই তাকে চেনে। বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর প্রফুল্লচন্দ্র সেন তখন সবেমাত্র পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, দিলীপ একদিন আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল তাঁর কাছে, ঘরভর্তি লোকের মাঝখানে সে বলে উঠল, ও প্রফুল্লদা, সুনীলকে আমেরিকায় যেতে দিচ্ছে না কেন? আপনারা কী রাজ্য চালাচ্ছেন? প্রফুল্ল সেন কিছুই জানতেন না, সব শুনেটুনে বললেন, ওরা ভাড়া দেবে, ওখানে থাকার জন্য স্কলারশিপ দেবে? দেশে এত বেকার ছেলে, এরকম ক'জন চলে গেলে তো ভালোই, আমি হোম সেক্রেটারিকে বলে দিচ্ছি, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তখন স্বরাষ্ট্রসচিব রথীন সেনগুপ্ত, মুখ্যসচিব মৃগাঙ্কমৌলি বসু, এঁদের সঙ্গেও দেখা করলাম, এঁরা সহৃদয়ভাবে চিঠিটিঠি লিখে দিলেন। অন্য অনেক ছেলের পক্ষে এইসব হোমরা-চোমরা আমলা কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, নেহাত আমার দিলীপের মতন বন্ধু ছিল এবং নিজেই উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু এতেও কোনও কাজ হল না, সেই পাসপোর্ট অফিসার বরং আরও রেগে গিয়ে বললেন, আমাকে কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাইনে দেয়? আমি মাইনে পাই ভারত সরকারের কাছ থেকে, এঁদের কথা আমি শুনতে যাব কেন?

আমার যাত্রা যখন বাতিলই হতে চলেছে, তখন সঙ্কট মোচনের জন্য এগিয়ে এল তারাপদ রায়। তার মেসোমশাই দেবী রায় তখন লালবাজারে ডিসি ডিডি, খুব নামকরা অফিসার, তারাপদর মুখে সব জেনে তিনি আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, দেখছি কী করা যায়। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, তার পরের দিনই অর্থাৎ একেবারে শেষ দিন, যার পর হলে আর আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়া সম্ভব হত না, আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পাসপোর্ট দেওয়া হল। যে আই এ এস অফিসার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করেছিলেন, তিনি একজন পুলিশ অফিসারের কথায় কেন রাতারাতি মত বদলে ফেললেন, সে রহস্য এখনও আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি।

সাহেবদের দেশে গেলে একটা অন্তত সুট লাগে, আমার তো তা ছিলই না। আমি তখন পর্যন্ত কোটই গায় দিইনি, সোয়েটার-আলোয়ানে শীতকাল কাটিয়ে দিতাম। একটা সাধারণ সুট বানাতে অন্তত পাঁচশো টাকা লাগে। কোথায় পাব সেই টাকা। ভাস্কর ও শরৎকুমার ভাগাভাগি করে টাকা দিয়ে আমায় একটা সুট বানিয়ে দিল। কেউ একজন পরামর্শ দিয়েছিল, কালো কোট-প্যান্টের সঙ্গে মেরুন টাই পরলে সব রকম জায়গায় যাওয়া যায় এবং পায়ের মোজার রং কালো কিংবা মেরুন হতে হবে। আমি টাইয়ের গিঁট বাঁধতেও শিখিনি, শরৎকুমার একবার বেঁধে দিল, সেটাই একটু আলগা করে খুলে রাখতাম, আবার পরবার সময় আঁট করে নিতাম।

আর একটি বাধা, সরকারি অফিস থেকে অনুমতি ও ছুটি নেওয়া। পরিচিত অন্য সরকারি চাকুরেরা আগেই সাবধান করে বলেছিলেন, অনুমতি নিতে গেলেই লাল ফিতের ফাঁসে আটকে যাবে, যদি পূর্ব জন্মের সুকৃতির ফলে অনুমতি মেলেও, তাতেও সময় লাগবে অন্তত তিন থেকে ছ' মাস! সুতরাং সবচেয়ে ভালো উপায়, অনুমতি নেবার চেষ্টাই না করা। পাসপোর্ট ফর্মে আমি সরকারি চাকরির কথা উল্লেখই করিনি, এবং অফিসে কাউকে কিছু না জানিয়ে কেটে পড়েছি।

সংসারের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছি আমার দুই ভাইকে। মা আমার যাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানাননি তবে উৎকণ্ঠিত ছিলেন ঠিকই। কৃত্তিবাস পত্রিকার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তুলে নিলেন শরৎকুমার এবং প্রণব মুখোপাধ্যায়। এতসব কবি ও লেখকদের মধ্যে শুধু আমিই সুযোগ পেয়েছি বলে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া কী রকম হয়েছিল? খুশি হয়েছিল প্রায় সকলেই, অনেকে দল বেঁধে বিদায় জানাতে এসেছিল আমাদের নাগেরবাজারের বাড়িতে, এমনকী সুদূর বেহালা থেকে অরবিন্দ গুহ পর্যন্ত, যার সে রাতে আর বাড়ি ফেরার উপায়ই ছিল না। বারান্দায়

বসে সবাই খেয়েছিলাম মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত। মাগুর মাছ নাকি শুভযাত্রা! শুধু বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মনে, শক্তি ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, এঁরা কিছুদিনের জন্য কথা বন্ধ করে দিয়েছিল আমার সঙ্গে।

অন্তত দু'জন বয়োজ্যেষ্ঠ কবি আমার মনোনয়ন একেবারেই পছন্দ করেননি। তাঁরা আমার অযোগ্যতার বর্ণনা দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন পল এঙ্গেলকে, তিনি সেই চিঠি দেখিয়েছিলেন আমাকে। ওই দু'জন কবির কিন্তু নিজেদের সুযোগ পাবার কোনও প্রশ্নই ছিল না, কারণ পল এঙ্গেল জানিয়েছিলেন, তিনি শুধু তরুণ-তরুণীদেরই রাইটার্স ওয়ার্কশপে একত্র করতে চান, যাদের বয়েস তিরিশের কাছেপিঠে। আমি তখন উনত্রিশ বছর পূর্ণ করেছি। নিজেদের সুযোগ না থাকলেও ওঁরা যে আমার সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ করেছিলেন, তাতেও আশ্চর্যের কিছু নেই, নিষ্কাম বিদ্বেষ তো কিছু মানুষের থাকতেই পারে। তাতে আমার কৌতুকবোধ হয়েছিল। পরবর্তীকালে উক্ত কবিদ্বয়ের সঙ্গে যখন আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁরা যেমন পূর্ববৎ সস্নেহ ব্যবহার করেছেন, আমিও সশ্রদ্ধ ব্যবহারই করেছি, আচরণের কোনও পরিবর্তন হয়নি। সত্যিই কি তাই? আন্তরিকতাহীন, কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল নিশ্চিত।

আরও কিছু লোক, যাদের আমি চিনিই না, তারা রটিয়ে দিল যে এটা সি আই এ-র ষড়যন্ত্র, আমি সি আই-এর চর হবার জন্যই আমেরিকা যাচ্ছি। এমনই জোর দিয়ে তারা বলত, যেন এই সব তথ্যপ্রমাণ তাদের হাতে আছে। এমনও মনে হতে পারত, যেন সি আই এ নামক সাঙ্ঘাতিক সংস্থাটি গোপনে গোপনে বামপন্থীদের কাছে এইসব তথ্যপ্রমাণ তুলে দেয়। শুনতে শুনতে এমনকী আমারও খটকা লেগেছিল, সত্যিই কি আমি কিছু না জেনে সি আই এ-র ফাঁদে পা দিচ্ছি? বাংলা কবিতা লেখার জন্য আমেরিকায় স্কলারশিপ পাওয়ার ব্যাপারটা এমনই অভিনব যে এর কোনও সরল ব্যাখ্যা বিশ্বাসযোগ্য হতে চায় না। সি আই এ আমাকে কীভাবে কাজে লাগাবে, তা জানার খুবই কৌতূহল ছিল। কিন্তু আমার মতো নগণ্য চুনোপুঁটিকে শেষ পর্যন্ত বোধহয় সি আই এ পাত্তাই দেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপের বাইরে একটা পয়সাও তো কেউ দিল না। এবং আমার পরে শঙ্খ ঘোষ যখন ওই একই পরিকল্পনায়, আমেরিকায় একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্কশপে যোগ দিতে গেলেন, তখন ওই বামপন্থীরা একেবারে নিশ্চুপ, যেন সি আই এ নামে কোনও কিছুর অস্তিত্বই নেই, আমেরিকাও নির্দোষ হয়ে গেছে।

পল এঙ্গেলের সেই আমন্ত্রণপত্রটি এমনই একটা আকস্মিক ঘটনা যা আমার জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। তখন আমার জীবনযাত্রায় একটা ছক নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেইভাবেই বাকি জীবন চলার কথা ছিল, হঠাৎ সব তছনছ হয়ে গেল। এমনকী এরকমও আমার মনে হচ্ছিল বারবার যে আর হয়তো কোনওদিনই আমি কলকাতার জীবনে ফিরে আসব না।

উনত্রিশ বছরের এক যুবক, যে আগে কখনও সুট-টাই পরেনি, কখনও প্লেনে চাপেনি, সে এক সেপ্টেম্বরের মধ্যরাত্রে প্যান অ্যাম কোম্পানির বিমানে পাড়ি দিল সুদূর বিদেশে। সারাদিন তাকে খুবই দৌড়োদৌড়ি করতে হয়েছে, পাসপোর্ট পেয়েছে শেষ মুহূর্তে, পাসপোর্ট না দেখালে হাতে টিকিট পাওয়া যায় না, টিকিট না দেখালে পাওয়া যায় না ফরেন এক্সচেঞ্জ, তাও মাত্র আট ডলার। (তখন দরিদ্র ভারতমাতা তার সন্তানদের অচেনা বিদেশে পাঠিয়ে দিত মাত্র তিন পাউন্ড বা আট ডলার হাতে দিয়ে।) এতই ক্লান্ত ছিল সে, যে প্লেনে ওঠামাত্র তার ঘুম পায়, তবু সে জোর করে চোখ খুলে রেখে দেখেছিল কলকাতার আলোকোজ্জ্বল আকাশ ছেড়ে বিমানটি চলে যাচ্ছে অন্ধকারের দিকে।

আমেরিকায় এই যুবকটির কোনও আত্মীয়স্বজন নেই। মাঝপথে কোথাও থামারও উপায় নেই, কারণ আর দু' দিনের মধ্যে আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করাতে না পারলে এ বছর আর স্কলারশিপ পাওয়া যাবে না। যদি বিমানযাত্রায় মাঝপথে কোনও ছেদ পড়ে, তা হলে কী হবে? বিমান পাল্টাতে হবে তিনবার। যদি কোনও ভুল হয়? পকেটে আট ডলার সম্বল।

ভোরবেলা বিমানটি প্রথম এক জায়গায় থামার পর একটি দারুণ চমক। এখানে নেমে পায়চারি করতে দেওয়া হবে না, কিন্তু জানলা দিয়ে দেখা গেল, গোটা গোটা বাংলা অক্ষরে লেখা 'করাচি বিমানবন্দর'। দমদম বিমানবন্দরে বাংলার কোনও চিহ্ন নেই, বাংলা ভাষা দেখা গেল পাকিস্তানে? পূর্ব পাকিস্তানের তীব্র ভাষা আন্দোলনের কাছে ততদিনে নতি স্বীকার করেছে পাকিস্তানের জঙ্গি সরকার, উর্দুর পাশাপাশি বাংলাও তখন সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। করাচিতে সেই বাংলা অক্ষর দেখার রোমাঞ্চ কোনওদিন ভোলা যাবে না।

নিউ ইয়র্কের প্রধান বিমানবন্দরটি এখন সে দেশের ভূতপূর্ব ও নিহত রাষ্ট্রপতি কেনেডির নামে। সেই তেষট্টি সালে কেনেডি জীবিত এবং বিমানবন্দরটির নাম ছিল আইড্‌ল ওয়াইল্ড। সে এক বিশাল কাণ্ডকারখানা। আমাকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিকাগো যাওয়ার জন্য প্লেন বদল করতে হবে, যেতে হবে এক টার্মিনাল থেকে অন্য টার্মিনালে। কী করে সেখানে যাব? কোথায় নির্দেশ লেখা আছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। দিশাহারা হয়ে এক সহযাত্রীকে টিকিটটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী করে শিকাবো যাব? সে একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে বলল, টেক অ্যাল।

সেই প্রথম খাঁটি আমেরিকান ভাষার সঙ্গে পরিচয়। টেক অ্যাল মানে কী? আর দু'-একজনকে জিজ্ঞেস করে, ওই একই উত্তর পাই। সবারই যেন খানিকটা আনুনাসিক উচ্চারণ, আর দু'-এক মুহূর্তের বেশি সময় খরচ করে না। আমেরিকানদের সব কিছুই বড় বড়, যেমন বড় বাড়ি, তেমনই চওড়া রাস্তা, তবু মুখে বলার সময় সব কিছুই ছোট করে নেয়। যেমন বাঘকে বলে ক্যাট আর বিশ্ববিদ্যালয়কে স্কুল। শেষ পর্যন্ত ডুবন্ত ব্যক্তির খড় কুটো চেপে ধরার মতন একটি বাচ্চা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, হোয়াট ইজ অ্যাল? তখন জানা গেল, অ্যাল হচ্ছে আমেরিকান এয়ারলাইন্স-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, অর্থাৎ যেখানে যেখানে অ্যামেরিকান এয়ারলাইন্স লেখা, সেই নির্দেশ অনুসরণ করে আমায় ছুটতে হবে।

শিকাগোতে রোমাঞ্চকরভাবে রাত্রিযাপন করে পরদিন সকালে আয়ওয়া শহরে পৌঁছনো গেল। ক্রমশই বিমানগুলি ছোট হয়ে আসছিল, আয়ওয়ার যাত্রী বিমানই খুব ছোট, ডাকোটা ধরনের। এই বিমানেই আমি প্রথম বর্ণবৈষম্যের পরিচয় পাই। আমিই একমাত্র অশ্বেতাঙ্গ যাত্রী, একজন বেশ ঢ্যাঙা বিমানসেবিকা আর সবাইকে কফি দিয়ে গেল, আমাকে বাদ দিয়ে। এটা কি সত্যি সম্ভব? নিশ্চিত ভুল করেছে মেয়েটি। কিন্তু সে সামনের সারির দুই ব্যক্তির সঙ্গে গল্প করতে লাগল এবং অন্যদের কাছ থেকে খালি কাপগুলি ফেরত নিয়ে গেল, আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। আমি তবুও ধরে নিলাম, মেয়েটি অন্যমনস্কভাবে লক্ষ করেনি আমাকে। এর পরেও আমি স্পষ্ট বর্ণবৈষম্যের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেখেছি, আবার কিছু কিছু মানুষকে এতই উদার ও মুক্তমনা দেখেছি যে তার থেকেই মনে হয়েছে, কোনও দেশের মানুষকেই জাতিগতভাবে এক শ্রেণীতে ফেলা যায় না। আমেরিকানরা সবাই বর্ণবৈষম্য মানে, এটা যেমন সত্যি নয়, আবার আমেরিকানরা সবাই উদার, এটাও সত্যি নয়। একটা মিশ্র জাতির নানান লক্ষণ এখনও তাদের মধ্যে স্পষ্ট।

যদি কোনও কারণে কেউ এয়ারপোর্টে আমাকে নিতে না আসে, তা হলে আমার অবস্থা হবে অসহায়ের মতন। ততক্ষণে আট ডলারও নিঃশেষ। এয়ারপোর্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছবার মতন গাড়ি ভাড়াও আমার নেই। কিন্তু বিমানটি যখন নিচু হয়ে চক্কর দিচ্ছে, তখন আমি রানওয়ে'র ওপর এক দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। পল এঙ্গেল। আমি নামতেই তিনি তাঁর চওড়া বুকে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। সে বুকে নিশ্চিত আশ্রয় আছে।

দেড় দিন আগে আমি ছিলাম কলকাতা শহরে। সেখান থেকে সরাসরি আমেরিকার মাটিতে। সাধারণত অনেকেই দু'-একদিন ইউরোপে থেমে আসে, তাতে আবহাওয়া ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন খানিকটা সইয়ে নেওয়া যায়। আমার সে সুযোগ হল না, এমনকী এখানে পৌঁছে বিশ্রামের প্রশ্ন নেই, মালপত্র গাড়িতে চাপিয়ে পল এঙ্গেল আমাকে নিয়ে ঘুরতে লাগলেন

বিভিন্ন জায়গায়। প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ছবি তোলা ও রেজিস্ট্রেশন, তারপর ব্যাঙ্কে গিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা, তারপর টেলিফোন ও গ্যাস কানেকশনের ব্যবস্থা, তারপর ইউনিয়ন ক্যান্টিনে লাইন দিয়ে খাবার সংগ্রহ করা। এরই ফাঁকে ফাঁকে নানান ব্যবস্থাপনার কথা বুঝিয়ে দিতে দিতে তিনি বললেন, আমার জন্য একটি অ্যাপার্টমেন্টও ভাড়া করে রাখা হয়েছে, ভাড়া একটু বেশি, কিন্তু সস্তার ডর্মিটরিতে অনেকের সঙ্গে থাকলে লেখাপড়ার অসুবিধে হতে পারে, নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্টই ভালো।

সেই অ্যাপার্টমেন্ট একটি কাঠের বাড়ির দোতলায়। একটাই ঘর, সঙ্গে রান্নার জায়গা ও বাথরুম, বিশেষভাবে ছাত্রদের জন্যই তৈরি বলে বোঝা যায়। পল এঙ্গেল আমাকে সেখানকার সরঞ্জামগুলি বুঝিয়ে দিয়ে, হাতে চাবিটি দিয়ে বললেন, তুমি জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, আমি বিকেলের দিকে আবার আসব।

টেলিফোন, ফ্রিজ, গ্যাসের কুকিং রেঞ্জ, বাথরুমে শাওয়ার, এসব কোনও কিছুই আমি আগে ব্যবহার করিনি। কলকাতায় ইস্কুল মাস্টার কিংবা কেরানিদের সংসারে এইসব দ্রব্য তখনও প্রবেশের সুযোগ পায়নি। কিন্তু আমার বিশেষ করে চোখে পড়ল একটি আয়না। অত বড় আয়নাও আমাদের বাড়িতে ছিল না। দরজাটা বন্ধ করেই আমি চমকে উঠেছিলাম। দরজায় এদিকে লাগানো রয়েছে একটি প্রমাণ সাইজের আয়না, যাতে আমার আপাদমস্তক দেখা যায়। সেই অচেনা দেশে প্রথমদিনে আয়নার মানুষটিকেও আমার অচেনা মনে হল।

সাঁইত্রিশ

প্রথমেই সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে অসুবিধে হবে বুঝে পল এঙ্গেল আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তাঁর ফার্ম হাউসে, সেটি আয়ওয়া শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে।

দু'পাশে আদিগন্ত হলুদ ফসল, মাঝখান দিয়ে চকচকে মসৃণ কালো রাস্তা। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে এক একটি দুধ-সাদা ছোট গির্জা। গাড়ি যাচ্ছে অনবরত, কিন্তু কোনও শব্দ নেই। পল এঙ্গেল গাড়ি চালাতে চালাতে কথা বলতে ভালোবাসেন, প্রখ্যাত নাট্যকার টেনেসি উইলিয়ামস এক সময় আয়ওয়াতে ছিলেন, তাঁর গল্প বলছিলেন। আমি অভ্যেসবশত সিগারেট ধরাতেই তিনি ভ্রূ-কুঞ্চিত করে কয়েক নিমেষ তাকিয়ে রইলেন, তারপর হেসে বললেন, ঠিক আছে, খাও। পরে বুঝেছিলাম, সব কাচ বন্ধ, বাতানুকূল গাড়ির মধ্যে ধূমপান অনুচিত।

আয়ওয়া রাজ্যটিকে অন্য জায়গার আমেরিকানরা মনে করে চাষাভুষোদের দেশ। এ দেশে এক একটি রাজ্য এক একটি নামে চিহ্নিত, যেমন নিউ জার্সিকে বলা হয় উদ্যান রাজ্য, তেমনই আয়ওয়া ফসল রাজ্য বা কর্ন স্টেট। মাইলের পর মাইল গম কিংবা ভুট্টার খেত। তবে, যেহেতু এ দেশে ছোট চাষির অস্তিত্ব নেই, এক একজন শত শত একর জমির মালিক, তাই সেইসব চাষিরা অত্যন্ত ধনী, প্রত্যেকেরই দু'তিনটে গাড়ি, নিজস্ব ছোট প্লেন আছে, এদের বাড়িতে আসল পিকাসো বা সালভাদর দালি'র ছবি ঝোলে। এ রাজ্যে বড় কোনও শহরও নেই, ছোট ছোট শহর অনেকগুলি, বিশ্ববিদ্যালয়ও অনেক। তবু নিউ ইয়র্ক, লস এঞ্জেলিসের মতন বৃহৎ শহরের বদলে নিরুত্তাপ, শান্ত, খুদে আয়ওয়া শহরের বিশ্ববিদ্যালয়েই কেন আন্তর্জাতিক কবি-লেখকদের সমাবেশ, তা নিয়ে আমেরিকার অনেক বুদ্ধিজীবী বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র পল এঙ্গেলের অত্যুৎসাহে। তাঁর ধারণা, পৃথিবীর সব ভাষার কবিরাই পরস্পরের আত্মীয়, তাই তিনি তাদের এক জায়গায় মেলাতে চান। এই কার্যক্রমের

খরচ তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। আমেরিকানরা অনবরত এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বাসা বদল করে, তারা বাপ-পিতামহর ভিটে কিংবা ঐতিহ্যের শিকড়ে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু পল এঙ্গেল সে ব্যাপারে ব্যতিক্রম, তাঁর জন্ম-কর্ম সবই আয়ওয়াতে, তিনি এ রাজ্যের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি এখানকার ধনী চাষিদের কাছে গিয়ে সরাসরি দাবি করেন, তোমরা কবিতার জন্য কিছু টাকা খরচ করো! দাবিটি অনেকের কাছে প্রথমে অদ্ভুত শোনায়। সাধারণ অবস্থা থেকে যারা ধনী হয়, তারা সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করে, তারা গির্জা বানায়, হাসপাতাল বা স্কুল-কলেজের জন্য দান করে। প্রখ্যাত শিল্পীদের ছবি কিনে ঘর সাজানোও সামাজিক কেতার মধ্যে পড়ে, যাতে নিজেকে ছবির সমঝদার এবং সংস্কৃতিবান হিসেবেও জাহির করা যায়। তা ছাড়া মূল্যবান ছবি-কেনা এক ধরনের ব্যবসায়িক বিনিয়োগও বটে, জমিজমার মতনই, এসব ছবির দাম বাড়তেই থাকে।

কিন্তু কবিতা? তা তো সামাজিক কেতার মধ্যে পড়ে না! বেশির ভাগ নব্য ধনীর কাছে কবিতা জিনিসটাই একদল পাগলের খেয়াল। তবু পল এঙ্গেলের ঝুলোঝুলিতে এক একজন পাঁচ-দশ হাজার ডলার দিয়ে দেয়। রাই কুড়িয়ে বেল, এ রকম পাঁচ-সাতজনের কাছ থেকে আদায় করতে পারলেই হয়ে যায় যথেষ্ট। অর্থাৎ গম ও ভুট্টা চাষিদের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে রাইটার্স ওয়ার্কশপ নামে প্রকল্পটি চালু হয়েছে। টাকা আদায়ের নানান বিচিত্র কাহিনী পলই আমাকে শুনিয়েছেন, একবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে এক অতিশয় ধনাঢ্য চাষির বাড়িতেও গিয়েছিলেন।

একর প্রতি ফসল উৎপাদনে সারা বিশ্বে আয়ওয়ার স্থান প্রথম। ষাটের দশকে আমেরিকা সফরে এসে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ আয়ওয়ার এক গমের খেতে দাঁড়িয়ে স্বীকার করেছিলেন সে কথা। সেই সময়ে আমেরিকান গম সম্পর্কে অনেক বিচিত্র তথ্যও জানতে যেত। গমের উৎপাদন অনেক বেশি হয়ে গেলে বিশ্বের বাজারে দাম পড়ে যাবে। আমেরিকানদের প্রধান ধর্ম হল ব্যবসায়-চিন্তা। এক বছর গমের দাম পড়ে গেলে পরের বছর মূল্যবৃদ্ধি সহজ নয়। সুতরাং অত্যধিক উৎপাদন হলেও তার সবটা বাজারে ছাড়া হবে না, জাহাজের পর জাহাজ ভর্তি করে প্রচুর গমের বস্তা ডুবিয়ে দেওয়া হত সমুদ্রে। পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষ অনাহারে বা অর্ধভুক্ত অবস্থায় থাকে, অথচ এভাবে গম নষ্ট করা হয়? পৃথিবীর সব মানুষকে খাওয়াবার দায়িত্ব আমেরিকানরা নেবে কেন? কিছু কিছু দান-খয়রাত করা হয় অবশ্যই, দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে আমেরিকান সরকার খাদ্য পাঠায়, তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে, এবং ঢাক ঢোল পিটিয়ে তার প্রচারও হয় অনেক। বাজার চাঙ্গা রাখার জন্য মানুষের ক্ষুধাও জাগিয়ে রাখা দরকার। কয়েক বছর পর আমেরিকান সরকার একটা নতুন বুদ্ধি বার করল। জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে গম ঢালারও বেশ খরচ আছে। তা ছাড়া এর প্রচারের দিকটাও খারাপ, গরিব দেশগুলি আরও আমেরিকান-বিদ্বেষী হয়ে উঠবে। তাই আমেরিকান সরকার প্রতি বছর কিছু কিছু চাষির কাছে আবেদন জানাতে লাগল, তোমাদের এ বছর আর চাষই করতে হবে না। জমি ফেলে রাখো—গত বছর এই জমি থেকে তোমাদের যা আয় হয়েছিল, সেই টাকা সরকার থেকে দিয়ে দেওয়া হবে। চাষিরা তো তাতে রাজি হবেই, বিনাশ্রমেও সমান উপার্জন। অর্থাৎ প্রতি বছর সারা দেশে কতখানি উৎপাদন হবে, যা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সীমিত দান-খয়রাত সচল রাখা যায়, তাও পূর্ব কল্পিত ও নির্দিষ্ট।

পল এঙ্গেল আমাকে যে চাষির বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন, যাঁর বাড়িতে আমি জীবনে প্রথম পিকাসো ও দেলাক্রোয়ার পাঁচখানি আসল ছবি দেখি, তিনি সে বছর চাষ-বাস থেকে মুক্ত এবং সরকারের কাছ থেকে সমান টাকা পেয়েছেন, তাই মেজাজ বেশ প্রসন্ন, দু'দিন বাদেই সপরিবারে বিশ্ব-ভ্রমণে যাবেন, আমাদের খুব খাতির-যত্ন করলেন এবং পনেরো হাজার ডলারের চেক কেটে দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে। চাষি মহাশয়ের চারটি ছেলেমেয়ে, তাদের

মধ্যে একটি ছেলের গায়ের রং কুচকুচে কালো, জানা গেল, সেই চারজনকেই তিনি দত্তক নিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী কোনও সন্তান উপহার দিতে পারেননি।

এসব কয়েক মাস পরের কথা। প্রথম দিন পল এঙ্গেল আমাকে যেখানে নিয়ে গেলেন, সে জায়গাটার নাম স্টোন সিটি, হয়তো কয়েক দশক আগে গ্রামই ছিল। এখন ক্ষুদ্র, পকেট সংস্করণ শহরই বলা উচিত, এ দেশে প্রকৃত গ্রাম আর নেই, আধুনিকতার আর আরামের সব সরঞ্জাম এবং সবরকম খাবারদাবার সর্বত্র পাওয়া যায়। সেখানকার দোকান থেকে কিছু কেনাকাটি সেরে আবার আমরা যেতে লাগলাম ঘন বনের মধ্যে দিয়ে। এর মধ্যে রাত্রি নেমে এসেছে। কোথাও আলো নেই। কিছুক্ষণ যাবার পর একটা চমক লাগল। সেই অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ আলোয় ঝলমল করে উঠল একটি বাড়ি, একটা ছোটখাটো দুর্গের মতন, যেন একটা স্বপ্নপুরী। সে বাড়িতে পল এঙ্গেলের স্ত্রী একলা থাকেন, তাই বুঝি এত আলো জ্বেলে রাখা।

গেট দিয়ে গাড়িটা ঢোকার সময় পল খানিকটা ক্ষমাপ্রার্থী ভঙ্গিতে বললেন, প্রথম আলাপে আমার স্ত্রী হয়তো তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারেন, তুমি ঘাবড়ে যেয়ো না। যদি রাগারাগি করেন, তুমি উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকবে, দু'-একদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

এরকম কথা শুনলে ঘাবড়াবে না কে?

কিন্তু খারাপ ব্যবহার তো দূরের কথা, প্রথম আলাপের পর থেকেই পলের স্ত্রীর সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক হয়ে যায়, এবং তা আমারই চরম বোকামির কারণে। অনেক কিছু জানার বদলে খুব কম জেনেও যে মানুষ কখনও কখনও জিতে যায়, এ তারই এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত।

সে রাতে মহিলার সঙ্গে দেখা হল না, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমরা কয়েকটি স্যান্ডউইচ সহযোগে দু' পাত্র সুরা পান করে শুতে চলে গেলাম। বলাই বাহুল্য, আমার ঘুম আসার কোনও প্রশ্নই নেই। প্রথমত জেট ল্যাগ, দ্বিতীয়ত, পর পর তালা বন্ধ ঘরের পাশে একটি মাত্র ঘর খুলে আমাকে যে-খাটে শুতে দেওয়া হয়েছে, সেটা খাট তো নয়, পালঙ্ক, এত বড় পালঙ্ক, দুগ্ধ ফেননিভ নরম বিছানায়, মখমলের মতন তুলতুলে কম্বলের নীচে জীবনে প্রথমবার শুয়ে নাগেরবাজারের কোনও ভাড়া বাড়ির ছেলের কি ঘুম আসতে পারে? একটা কথাই বারবার মনে হচ্ছে, এটা আমেরিকা? আমি সত্যিই আমেরিকায় শুয়ে আছি!

ভোরের আলো ফোটার পর আমার আর একটা চিন্তা হল। ঠিক কখন তৈরি হয়ে নিতে হয়? বেশিক্ষণ শুয়ে থাকা কি ভদ্রতাসম্মত? প্লেনে ওঠার পর থেকেই একটি দুশ্চিন্তা আমাকে কুরকুর করে খাচ্ছে, এদের দেশে এসে আমার আচার-ব্যবহারে কোনও ভুল হবে না তো? কেউ আমাকে অসভ্য, বর্বর মনে করবে না তো? ভুল হলেই বা কী আসে যায়, আমার যেমন ইচ্ছে তেমন ব্যবহার করব—এই সাহসিকতা বা দম্ভ কিছুতেই জাগাতে পারিনি।

এত বড় বাড়ি, একেবারে নিস্তব্ধ, আর কারও জেগে ওঠার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তবু, দেরি করে ওঠার চেয়ে ভোরে ওঠায় দোষ নেই! তাড়াতাড়ি দাঁত-টাঁত মেজে তৈরি হয়ে, প্যান্ট-শার্ট পরে নেমে এলাম নীচে। কারওকেই দেখা যাচ্ছে না। শব্দ না করে, কাল রাতে যে-দরজা দিয়ে ঢুকেছিলাম সেটা খুলে বেরিয়ে এলাম বাইরে, রাত্তিরে কিছু বোঝা যায়নি, বাড়িটির দু'পাশে বিস্তৃত বাগান, খুব একটা যত্নের ছাপ নেই, এলোমেলো ফুলগাছ, একটু দূরেই বেশ বড় বড় গাছ। এত বড় বাড়ি, গেটে দারোয়ান দেখিনি, কাজের লোকও নেই? আমাদের দেশে যাদের এত বড় বাড়ি ও বাগান, তাদের অন্তত চার-পাঁচজন কাজের লোক তো থাকবেই। এখানে ধারেকাছেও কোনও মনুষ্যবসতি নেই।

একটুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরির পরই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটি ছোট ওকগাছের সামনে দাঁড়িয়ে ভোমরার ওড়াউড়ি দেখছেন একজন প্রৌঢ়া রমণী। ইনিই নিশ্চিত গৃহকর্ত্রী। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে তিনি মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে রইলেন নিষ্পলকভাবে। এদেশে এমন

রূপহীনা নারীর অস্তিত্ব আমি কল্পনাই করিনি। তাঁর শরীরে নারীত্বের কোনও চিহ্নই নেই বলতে গেলে। রোগা, ছোটখাটো চেহারা, প্যান্ট পরা, ওপরে ভারী সোয়েটার, নারী-সুলভ বুকের ঢেউ টের পাওয়া যায় না, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, নাকের নীচে পাতলা গোঁফের আভাস, পলের তুলনায় বেশি বয়স্কা মনে হয়, মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে খানিকটা, চোখ দুটি কুতকুতে। সত্যি কথা বলতে কী, প্রথম দর্শনে তাঁকে ঠিক একটি বানরীর মতন মনে হয়েছিল। আগের রাতে পল যেভাবে তাঁর স্ত্রীর বর্ণনা দিয়েছিলেন, তাতে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল, মহিলার মাথার গোলমাল আছে। সকালেই এক পাগলিনীর মুখোমুখি হয়ে ভয়ে আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। কেন বিছানা ছাড়তে গেলাম এত তাড়াতাড়ি! পল কাছে থাকলে এতটা বিপদ হত না।

চোখাচোখি হয়েছে, একটা কিছু তো বলতেই হবে। এ দেশে শুধু 'হাই' বললেই সব কাজ চলে যায়, সেটা তখনও জানি না। প্রভাতে প্রথম দেখার সময় গুড মর্নিং বলতে হয় তা জানি, কিন্তু সম্বোধন! এখানে সবাই সবার নাম ধরে ডাকে, ছোট-বড়র কোনও ভেদ নেই। কলকাতাতেই পল এঙ্গেল বলে দিয়েছিলেন, তাঁকে মিস্টার এঙ্গেল বলার কোনও দরকার নেই, সবাই পল বলবে। কিন্তু এই মহিলার সঙ্গে তো পরিচয়ই হয়নি, মায়ের বয়সি মহিলাকে প্রথমেই নাম ধরে ডাকব? নামটাও তো জানি না। এখানকার ইংরেজি স্কুলে পড়া স্মার্ট ছেলে হলে নিশ্চয়ই চট করে বলে দিত, হাই আন্টি! কিন্তু আমি জীবনে কখনও আঙ্কল, আন্টি বলিনি কারওকে।

ভদ্রমহিলা কী যেন বললেন বিড়বিড় করে, আমি বুঝতেই পারলাম না। তা হলেও এর পর আমার চুপ করে থাকাটা চরম অসভ্যতা। কী বলব, কী বলব ভেবে দিশাহারা হয়ে আমি বলে ফেললাম, গুড মর্নিং মাদার!

ওর চোখ দুটো আরও কুঁচকে গেল। আমার দিকে এগোতে এগোতে জিজ্ঞাসা করলেন, হোয়াট? কী বললে, কী বললে তুমি? মাদার? তুমি আমাকে মাদার বললে? আমি তোমার মাদার হলাম কবে? তুমি মাদারই বললে? আবার বলো তো।

আমি নিশ্চুপ। নিশ্চিত আমার মুখখানা আমসির্বর্ণ হয়ে গেছে।

তিনি একই কথা বলতে লাগলেন, মাদার? আমি তোমার মাদার? হাউ কাম?

পরে যতবারই এই কথাটা ভেবেছি, লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেছে। আমি ব্যবহার করেছি জংলি ভূতের মতন। এ দেশে কোনও অনাত্মীয়া মহিলাকে মাদার বলা মানে বয়সের খোঁটা দেওয়া। প্রাপ্তবয়স্কা নারী-পুরুষ যে অন্য সম্বোধনের বদলে শুধু সবাই সকলের নাম ধরে ডাকে, তার কারণ, তাতে বয়সের কোনও উল্লেখ থাকে না। বাবা-কাকার বয়সি পুরুষদেরও বলা চলে না আঙ্কেল। প্রৌঢ়ারাও সব সময় যুবতী সেজে থাকতে চায়।

বারবার মাদার, মাদার বলতে বলতে তিনি এক সময় হি হি করে হেসে উঠলেন, সে হাসি আর থামতেই চায় না, হাসতে হাসতে মাথা দোলাতে লাগলেন প্রবলভাবে। এরপর আরও মাস দু'-এক ধরে তিনি যখনই অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছে, হাসতে হাসতে বলেছেন, জানো, এই এশিয়ান ছেলেটা আমাকে প্রথম কী বলেছিল? মাদার, গুড মর্নিং মাদার! তাঁরাও তা শুনে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দিয়েছেন প্রায়। মাদার শব্দটি যে এমন হাস্য উদ্রেককারী, তা কে জানত!

পল এঙ্গেলের স্ত্রী মেরি আমার সেই মাতৃ সম্বোধন শুনে যতই বিদ্রূপ আর কৌতুক বোধ করুন, কিন্তু ওই শব্দটি তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতেও কোনওভাবে স্পর্শ করেছিল নিশ্চিত। সমসাময়িক প্রথা বিরোধী হলেও নারীদের কাছে এই ডাকের একটি চিরকালীন আবেদন আছে। সেই প্রথম দিন থেকেই তিনি আমার সঙ্গে কোনও রকম পাগলামি করেননি, বরং অতিরিক্ত খাতিরযত্ন শুরু করেছিলেন এবং তা ক্রমশ আরও বেড়েছে। তিনি কখনও এই জঙ্গলমহলে থাকেন, কখনও

শহরে। শহরে থাকার সময় প্রায়ই আমাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেন। পল এঙ্গেল কোনও কারণে কাজ উপলক্ষে বাইরে গেলেই মেরি ফোন করে আমাকে বলতেন, আমার একা একা বসে খেতে ভালো লাগে না, তুমি এসে আমার সঙ্গে খাও। আমার একা একা থাকতে ভালো লাগছে না, তুমি রাত্তিরে এ বাড়িতে এসে থাক! পল এঙ্গেল খানিকটা বিস্মিতভাবেই একদিন আমাকে বলেছিলেন, এর আগে কত বিদেশি ছেলেমেয়ে এসেছে। কিন্তু আর কারওকে মেরি এত বেশি পছন্দ করেনি। তুমি কোন ভারতীয় জাদুতে ওকে বশ করেছ?

মেরি আর পল একই বয়সি, একই সঙ্গে স্কুল-কলেজে বর্ধিত হয়েছেন, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন প্রথম যৌবনে। মেরি যথেষ্ট বিদূষী এবং বুদ্ধিমতী, হয়তো এককালে সুশ্রীও ছিলেন। পল যখন উচ্চশিক্ষার জন্য সব জীবিকা পরিত্যাগ করেন, তখন মেরি হোটেল-রেস্তোরাঁয় সামান্য কাজ করে সংসার চালিয়েছেন, স্বামীর জন্য অনেক আত্মত্যাগ করেছেন একসময়। এখন তাঁর স্বামী একজন কর্মোদ্যোগী ও ব্যস্ত পুরুষ, এর মধ্যে কোনও কারণে মেরির চেহারাটা গেছে খারাপ হয়ে। পল শক্তসমর্থ পুরুষ, আর মেরির চেহারায় অকালবার্ধক্যের ছাপ। এখন মেরির ধারণা হয়েছে, পল আর তাঁকে ভালোবাসেন না, তাঁর প্রতি মনোযোগ দেন না, অন্য মেয়েদের দিকে ঝুঁকেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দরী ছাত্রী ও অধ্যাপিকারা তাঁকে ঘিরে থাকে। এই সন্দেহবাতিক থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর এক ধরনের পাগলামি, এক এক সময় ভাঙতে শুরু করেন জিনিসপত্র, সে রকম অবস্থা আমিও দেখেছি। মেরি নিঃসন্তান নন, ওদের দুটি মেয়ে আছে, বেশ বড়, প্রথমটি থাকে অনেক দূরের কোনও শহরে, যোগাযোগ নেই-ই বলতে গেলে। ছোট মেয়েটি যেমন রূপসী; তেমনই দুরন্ত, তার সম্পর্কে লোকমুখে শুনেছি সে ঘন ঘন পোশাক পরিবর্তনের মতন বয়ফ্রেন্ড বদল করে। তার অন্য একটি শখ ঘোড়ায় চড়া, নিজস্ব তিনটি ঘোড়া আছে, বাড়িতে প্রায় থাকেই না, মাঝে মাঝে শুধু বাবার সঙ্গে দেখা করে টাকা চাইবার জন্য। বাবার কাছ থেকে সে টাকা ধার নেয়, কোনও এক সময় শোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। অর্থাৎ মা হয়েও মাতৃ সম্বোধন অনেকদিন শোনেননি মেরি।

প্রায়ই দেখতাম, মেরির মুখখানি গভীর বিষাদ মাখা। কথা বলেন টেনে টেনে, শব্দগুলি জড়ানো। বুঝতে আমার বেশ কয়েকদিন সময় লেগেছিল যে মেরির ওই ধরনের জড়ানো কণ্ঠস্বরের কারণ, তিনি প্রায়ই সকাল থেকে জিন পান শুরু করেন। পল টানা কয়েকদিন বাইরে থাকলে মেরির এই মদ্যপান বেড়ে যায়, কয়েকবার তিনি আত্মহত্যারও চেষ্টা করেছিলেন শুনেছি। আমার সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক হল, তা কিন্তু বাৎসল্যের নয়, বন্ধুর মতন, আমাকে ডেকে রান্না করে খাওয়াবার সময় তিনি শোনাতেন পলের সঙ্গে তাঁর সুখের দিনের নানান গল্প, কখনও রান্না বন্ধ করে হাপুস নয়নে কাঁদতে বসতেন, পুড়ো কালো হয়ে যেত মাংস। আবার কখনও উচ্ছল হয়ে উঠতেন হাস্যপরিহাসে। প্রতিবার বিদায় নেবার সময় তিনি আমাকে সামনা-সামনি জড়িয়ে ধরে চুম্বন দিতেন ঠোঁটে, একবারই মাত্র। কয়েক মাস পরে যখন আমার নিজস্ব বান্ধবী হয়, যার সঙ্গে সন্ধ্যাযাপনে আমার আগ্রহ অনেক বেশি, তখনও কোনও সন্ধ্যায় মেরি আমাকে টেলিফোনে ডাকাডাকি করলে আমি না গিয়ে পারতাম না। সেই ঝলমলে ফরাসি তরুণীর সাহচর্য ছেড়ে আমি কেন এক কুরূপা প্রৌঢ়ার সঙ্গে সময় কাটাতে রাজি হতাম, তার কোনও ব্যাখা দেওয়া যায় না। পলের অনুপস্থিতিতে সেটা একটা নিরানন্দ বাড়ি, মেরির সঙ্গে আমার বয়সের অনেক তফাত, আমি তেমন বাক্যবাগীশও নই, মেরি একাই কথা বলে, আমি হুঁ হুঁ করা নীরব শ্রোতা, এক এক সময় কেউ কোনও কথাই বলি না, ঘরটা আধো অন্ধকার, কোনও শব্দই নেই। এটা খুব আশ্চর্যের কথা যে, ও বাড়িতে আমি কদাচিৎ কোনও আমেরিকান ছেলেকে দেখেছি, বিদেশিদের মধ্যেও আমিই একমাত্র নিয়মিত অতিথি। পলও আমার প্রতি বেশি মনোযোগ দিতেন বলে অন্য কয়েকজনের ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছিলাম আমি।

সেই প্রথম দিনটিতে মেরির সঙ্গে আমার সহজ সম্পর্ক দেখে পল খুব স্বস্তি বোধ করেছিলেন। প্রাতরাশের পরই তিনি আমাকে নিয়ে চলে গেলেন জঙ্গলে। সেখানে কাঠ কাটতে হবে, ফায়ারপ্লেসের জন্য। এর মধ্যে ফায়ারপ্লেস অপ্রচলিতই হয়ে গেছে বলতে গেলে, সব জায়গায় সেন্ট্রাল হিটিং, অনেক বাড়িতে সাজানো ফায়ার প্লেসে নকল আগুন জ্বলে। আসল ফায়ারপ্লেসে কাঠ জোগান দেওয়া ও চিমনি পরিষ্কার করার অনেক ঝামেলা। কিন্তু পলের এই পুরনো ধরনের বাড়িটিতে এখনও ফায়ারপ্লেস বজায় রেখেছেন। আমি জীবনে কখনও নবকুমারের মতন জঙ্গলে কাষ্ঠাহরণে যাইনি, এই ইংরেজির অধ্যাপক ও কবিটির কাঠুরের ভূমিকার উদ্যম দেখে আমি হতবাক। গায়ের জামা খুলে ফেলে তিনি একটা আস্ত শুকনো গাছকে পেড়ে ফেললেন কিছুক্ষণের মধ্যে। সাধারণ করাতের বদলে ইলেকট্রিক করাত, সেটি বিষম ভারী, একটু এদিক-ওদিক হলে হাত-পা উড়ে যেতে পারে। আমার ভূমিকা টুকরো করা ডালগুলিকে গুছিয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে ট্রাকে তোলা। তাতেও পরিশ্রম কম নয়। দু'দিন আগেও যে কলকাতার কফি হাউসে হসন্তকে আধ মাত্রা না এক মাত্রা ধরা হবে সেই তর্কে টেবিল ফাটিয়েছে, সে এখন আমেরিকার জঙ্গলে এক কাঠুরের সহকারী। এই কাষ্ঠবহনের স্মৃতি আমার বিশেষভাবে মনে থাকার একটা কারণ আছে। ওই বাড়িটিতে আমি পরে আরও কয়েকবার গেছি, আমি থাকতে থাকতেই খবর জানা গেল, ফায়ারপ্লেসের আগুন থেকেই কোনওক্রমে আগুন ছড়িয়ে এমন চমৎকার প্রাসাদটি একেবারে ভস্মসাৎ হয়ে যায়। শুনে খুব কষ্ট হয়েছিল। সে সময় বাড়িতে কেউ ছিল না।

মেরি মাঝে মাঝেই ও বাড়িতে একলা থাকতেন। ওই অগ্নিকাণ্ড ছাড়াও আর একবার তাঁর খুব বিপদের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। সে সময় 'ডেসপারেট আওয়ার্স' নামে একটি আমেরিকান ফিল্ম খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। দারুণ উত্তেজনার ছবি। তিনজন কুখ্যাত খুনি আসামি জেল থেকে পালিয়ে এক গৃহস্থবাড়িতে ঢুকে বসে থাকে। সে বাড়িতে বাবা, মা, একটি তরুণী মেয়ে ও স্কুল বয়সি ছেলে থাকে। ডাকাতরা সেখানে ঢুকে বলে যে তারা খাবে, থাকবে, কোনও ক্ষতি করবে না, বাবা অফিস যেতে পারে, মেয়ে ও ছেলে যেতে পারে কলেজ-স্কুলে, কিন্তু কারওকে কিছু বলতে পারবে না, যদি পুলিশ নিয়ে আসার চেষ্টা করে তা হলে প্রথমেই মাকে খুন করা হবে। পরিস্থিতি এমনই যেন এর কোনও সমাধান নেই। সিনেমার গল্পে অবশ্য একটা শেষ সমাধান থাকেই। ঠিক সে রকমই একটা বাস্তব ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল এখানে। কাছাকাছি জেলখানা থেকে পালিয়েছে তিনটি কয়েদি, তারা লুকিয়েছে জঙ্গলে, যে-কোনও সময়ে যে-কোনও বাড়িতে জোর করে ঢুকে পড়তে পারে। পুলিশ থেকে অনবরত সাবধান করে দেওয়া হতে থাকে রেডিয়ো মারফত। পরের দিনই মেরি জানলা দিয়ে দেখতে পায় এ বাড়ির সামনের বাগানে সেই তিন খুনিকে। দরজা ভেঙে ঢোকা তাদের পক্ষে খুবই সহজ। তারা এসেছিল এ বাড়িতেই ঢোকার জন্য, একেবারে শেষ মুহূর্তে হঠাৎ পুলিশের গাড়িও পৌঁছে যায়।

এ কাহিনী শুনে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এর পরেও তুমি একা এ বাড়িতে থাকতে সাহস করো? আমার প্রশ্ন শুনে মেরি ও পল দু'জনেই উচ্চহাস্য করেছিল। আমেরিকানদের ভয় জিনিসটা খুব কম বলেই তো তারা ব্যবহারিক জীবনে এত উন্নতি করেছে। এত ডিভোর্সি মেয়ে একা থাকে, মাঝে মাঝে তাদের দু'-একজন খুন হয় বা ধর্ষিতা হয়, তবু তারা একা থাকার জেদ ছাড়ে না।

দু'দিন পরে পল আমাকে ফিরিয়ে আনলেন আয়ওয়া শহরে আমার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। এটা আমার নিজের সংসার। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে পলের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল। বিদেশি অতিথিরা অনেকেই রান্নাবান্নার ঝামেলায় যায় না, শহরে অনেক রকম রেস্তোরাঁ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে খেয়ে নিতে পারে। কিন্তু আমাকে পয়সা বাঁচিয়ে দেশে পাঠাতে হবে। নিজের রান্নার চেয়ে সস্তা আর কিছু হতে পারে না। রান্না করতে আমি ভয়ও পাই না, আমি

কবিতা রচনা করলেও কবি-কবি তো নই। কিন্তু রান্না করতে গেলে হাঁড়ি-কুড়ি, হাতা-খুন্তি লাগে। চাল-ডাল, আলু-পেঁয়াজের দোকানও চিনতে হবে। পল বললেন, ঘর-গেরস্থালির জিনিস মেয়েরাই ভালো চিনতে পারে। আমি একটি মেয়েকে পাঠাচ্ছি, সে তোমাকে সাহায্য করবে। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, বাসন মাজার সাবান কিনতেও ভুল করো না।

বিকেলের দিকে পলের নির্দেশে একটি আমেরিকান যুবতী এল আমার সঙ্গে দেখা করতে, সুশ্রী ও সমবয়সি, বেশ চটপটে, তার নাম ডোরি ক্যাটজ। সে প্রথমেই আমার অ্যাপার্টমেন্টের আনাচ-কানাচে ঘুরে দেখল, আমার কী কী দরকার। তালিকা লিখে নিল কাগজে, এমনভাবে, যেন এই কাজ সে আগেও অনেকবার করেছে। তারপর বলল, চলো।

সুপার মার্কেটে সবই পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন সুপার মার্কেটে এক একটি বিশেষ দ্রব্য সস্তা কিংবা তুলনামূলকভাবে উত্তম। ঘুরে ঘুরে কেনা গেল সব কিছু। ব্যাঙ্কে আমার নামে অগ্রিম পাঁচশো ডলার জমা পড়েছে, সুতরাং দিলদরিয়া হতে বাধা নেই। এই ভদ্রতাটুকু শেখার দরকার হয় না যে ডোরি ক্যাটজ আমার জন্য এতখানি সময় ও উদ্যম ব্যয় করার পর তাঁকে কোনও রেস্তোরাঁয় খাওয়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব আমার অবশ্যই দেওয়া উচিত। সে প্রস্তাব দিতেই সে গ্রহণ করল এবং অনেকক্ষণ ধরে আড্ডা দিতে দিতে এক নিরিবিলি রেস্তোরাঁয় পান-ভোজন করা গেল। ফেরার পথে ডোরির বাড়িই আগে পড়ে। আমি তার অঙ্গ স্পর্শ না করে বললাম, শুভরাত্রি।

ডোরি কয়েক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মুচকি হেসে বলল, ওহে মহান ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী যুবক, তুমি এদেশে কোনও যুবতীর সঙ্গে যদি বিকেল থেকে এক সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটাও, দোকানে যাও, রেস্তোরাঁয় ডিনার খাও, তারপর বাড়ি পৌঁছে দেবার সময় তাকে একটা চুমু খেতে হয়। এবং আমার কবে দেখা হবে জিজ্ঞেস না করলে সে অপমানিত বোধ করে। এসব শিখে নাও।

এবং শিক্ষার প্রথম পাঠ হিসেবে সে সিঁড়ি থেকে দু'তিন ধাপ নেমে এসে, আমার থুতনিটি এক আঙুলে ধরে ওষ্ঠ চুম্বন করল। এই প্রথম এক শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে আমার ওষ্ঠ স্পর্শ। চুম্বনের অভিজ্ঞতা আমার আগেই দেশে হয়ে গেছে কয়েকবার, ওই ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গিনী-অশ্বেতাঙ্গিনীর ওষ্ঠ-স্বাদে তো কিছু তফাত দেখা গেল না। একই রকম। তবে, এর আগে কোনও মেয়ে আমার থুতনি ধরে নিজে এগিয়ে আসেনি, দেশে উদ্যোগ নিতে হয় পুরুষদেরই। সেই অবস্থায় আমি ডোরিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোতাপাখির মতন, আবার কবে দেখা হবে? সে বলল, টেলিফোন করব।

এই ডোরি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার বান্ধবী হল না। দু'দিন পরে সে আর একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দুপুরবেলা এল আমার খোঁজখবর নিতে। দ্বিতীয় মেয়েটি ফরাসি, সে ফ্রান্স থেকে স্কলারশিপ নিয়ে এখানে এসেছে পিএইচ ডি করতে। সে আগে কোনও ভারতীয় কবি দেখেনি, তাই ডোরির সঙ্গে এসেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোনও ভারতীয় দেখেনি? ডোরি বলল, না, তা নয়, সে ভারতীয় কবি দেখেনি। তার নাম মার্গারিট ম্যাথিউ। আমি ওদের বিয়ারের ক্যান খুলে অভ্যর্থনা জানালাম, কিন্তু মার্গারিট নামে মেয়েটি প্রায় চুপ করেই রইল সর্বক্ষণ। কথাবার্তা চালাল ডোরি।

পরের দিন দুপুরে আমার দরজায় আবার ঠুক ঠুক শব্দ। খুলেই দেখি, মার্গারিট নামে মেয়েটি একা দাঁড়িয়ে। নরম উচ্চারণের ইংরেজিতে প্রচুর ক্ষমা চেয়ে সে বলল, আগের দিন সে একটা বই ফেলে গেছে ভুল করে, সে জন্যই সে আমাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছে ইত্যাদি। সে ভেতরে আসার পর রয়ে গেল চার-পাঁচ ঘণ্টা, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, তার সঙ্গে যেন আমার জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধুত্ব।

কয়েকদিন পর মার্গারিট দুষ্টুমির হাস্য দিয়ে জানিয়েছিল, সে তার বইটি আমার ঘরে ফেলে গিয়েছিল ইচ্ছে করে, যাতে আমার কাছে একা আসার একটা ছুতো পাওয়া যায়।

আটত্রিশ

ইংরেজরা বলে মার্গারেট, ফরাসিতে মার্গারিট, স্প্যানিশে মার্গারিটা। ফরাসি দেশের গ্রামের মেয়ে মার্গারিট ম্যাথিউ ফরাসি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতে আমেরিকা এসেছে কেন? যে-কারণে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতে ফরাসি দেশে গিয়েছিলেন, বাংলা নাটক নিয়ে গবেষণা করতে কেউ কেউ বিলেতে যায়, এমনকী আমিও বাংলা কবিতার সংকলনের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় এসেছি একই কারণে; স্কলারশিপ পাওয়া যায়! আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস ও অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করছেন বেশ কিছু ভারতীয় তথা বাঙালি।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে ইউরোপের বদলে আমেরিকা ও কানাডার দিকে এ দেশ থেকে দলে দলে ছাত্র, গবেষক ও চাকুরি প্রার্থীরা যেতে শুরু করে। ইউরোপ তখন রক্তাল্পতায় ভুগছে, বহিরাগতদের সম্পর্কে কড়াকড়ি শুরু করেছে, উত্তর আমেরিকায় টাকা ও সুযোগ-সুবিধে অনেক বেশি। ইউরোপের মধ্যে একমাত্র যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জার্মানিতে পুরুষের সংখ্যা এতই কমে গিয়েছিল যে সব ধরনের বহিরাগত কর্মক্ষম ব্যক্তিদের জন্য দরজা খুলে সাদর আহ্বান জানাত। এই জন্যই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানিতেই আমাদের দেশের যুবকরা গেছে বেশি। কিন্তু উত্তর আমেরিকায় উন্নতির পথ অনেক বেশি প্রশস্ত বলে জার্মানি থেকে, ইংল্যান্ড থেকেও বাঙালিদের ঢল নামে সেদিকে। আমি যখন যাই, তখনও সেই ঢল তেমনভাবে নামেনি, সবে শুরু হয়েছে মাত্র। সেই জন্যই আমেরিকায় বাঙালির সংখ্যা তখন তেমন কিছু ছিল না। এদিকে বাংলা ভাগ হবার জন্য পূর্ব বাংলা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের সংখ্যা বেশি, চরিত্রেও তারা অনেক বেশি উদ্যমী ও বেপরোয়া, ভাগ্যানুসন্ধানে তারা ঝুঁকি নিয়েও দেশত্যাগ করতে দ্বিধা করে না, তাই বিদেশে পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানিরা কয়েক গুণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। আয়ওয়া শহরেও পশ্চিম বাংলার বাঙালির সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়, পূর্ব পাকিস্তানিরা বেশ দলে ভারী, সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন, শিল্প-সাহিত্য এবং ভাব বিনিময়ের সব পথ রুদ্ধ, পঁয়ষট্টি সালে আবার ভারত-পাকিস্তানের নির্বোধ যুদ্ধ হবে, তারই যেন মানসিক মহড়া চলছে। আয়ওয়াতে পূর্ব পাকিস্তানিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গেই মেলামেশা করে, বাংলা ভাষার সূত্রে তারা আমাদের আত্মীয় মনে করে না, তাদের গান-বাজনার আসর বা উৎসবে আমাদের আমন্ত্রণ জানায় না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে (আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচালনায় ছ'পৃষ্ঠার রীতিমতো একটি দৈনিক সংবাদপত্র বেরোয় এবং সেটা আমি পাই বিনামূল্যে, তাতে নানারকম উৎসব-অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি থাকে) আমি পাকিস্তানিদের ইকবাল জয়ন্তী সভায় গেলাম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, সেখানে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করে কয়েকজন শুকনো ভদ্রতা দেখিয়েছিল ঠিকই, কেউ সাদর অভ্যর্থনা জানায়নি। লক্ষ করলাম, পূর্ব পাকিস্তানের ছেলেরা দিব্যি উর্দু বলছে, কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানিও বলতে পারে ভাঙা ভাঙা বাংলা। মনে হতেই পারে যে, দুই পাকিস্তানের মধ্যে ভাষা-সমস্যা মিটে গেছে। গান হল উর্দু ও বাংলায়। তবে সভা পরিচালনায় নেতৃত্ব দিচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি, ভারী সুদর্শন একটি যুবক, সে শুধু ইংরেজি বলে। বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমি গুনছিলাম, শ্রোতার সংখ্যা ক'জন। সঠিক বলতে গেলে, পঁয়ত্রিশ এবং এক। আমি অতিরিক্ত। জনচারেক লাল-ফর্সা ছেলেমেয়েও ছিল, আমার তুলনায়

তারাও যেন ওদের বেশি আপন। ফেরার সময় বুকটা হু-হু করছিল।

বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য ব্যাকুলতায় আমি প্রথম কিছুদিন বাংলাভাষীদের খোঁজাখুঁজি করেছি, মাসখানেক পরেই সে ঝোঁকটা চলে গেল। মনের মতন কোনও সঙ্গী না পেলে শুধু বাংলায় ভ্যাজর ভ্যাজর করেই বা কী লাভ! পরবর্তীকালের খ্যাতিমতী লেখিকা ভারতী মুখার্জি সে সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী ছিলেন, তাঁর সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু ভারতী উত্তর ভারতের কোথাও আবাল্য পরিবর্ধিত, তাই বাংলা ভালো জানতেন না, বাংলা সাহিত্য তাঁর চিন্তাজগতে স্থান পায়নি।

আমার প্রতিদিনের সঙ্গিনী হয়ে উঠল মার্গারিট নামের মেয়েটি। এমন কবিতা-পাগল নারী বা পুরুষ আমি আগে আর দেখিনি। তার জীবন-যাপনের সব কিছুই কবিতার ঝংকার ও সৌরভময়। বৃষ্টি পড়লে সে কবিতা বলে, ঝড় উঠলে কবিতা বলে, রোদ্দুর দেখলে কবিতা বলে, পয়সা ফুরিয়ে গেলে তা নিয়েও কোনও কবিতা মুখস্থ বলে সে মজা খুঁজে পায়। অথচ নিজে সে লেখে না। তার মতে, পৃথিবীর সমস্ত কবিরা যা লিখে গেছেন ও লিখছেন, সেই সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হওয়াই তার জীবনের সার্থকতা।

কয়েকদিন পরেই মার্গারিটকে কোনও বিদেশিনী বা ফরাসিভাষী বলে মনেই হয় না, সে পৃথিবীর যে-কোনও দেশেরই একটি পাগলী মেয়ে হতে পারে। মাথা ভর্তি হুড়ো-কুড়ো চুল, ভালো করে আঁচড়ায় না। পোশাকের কোনও যত্ন নেই, কবিতার আলোচনা শুরু করলে সে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। এমনও হয়েছে, আমি খিচুড়ি চাপিয়েছি, মার্গারিট পড়তে শুরু করল গিয়ম আপলেনিয়ারের বিসতেয়ার নামে পশু-পাখি বিষয়ক ছোট ছোট কবিতা। একটার পর একটা, আগেরটার চেয়ে পরেরটা বেশি ভালো, শোনো, শোনো, এইটা শোনো, এটা প্রজাপতি আর কবি বিষয়ে। এর মধ্যে আমার ডেকচি ভর্তি খিচুড়ি পুড়ে ঝিরকুট্টি কালো হয়ে গেল।

আগে কয়েক জায়গায় লিখেছি, তবু এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করি, গিয়ম আপলেনিয়ারের সূত্রেই তার সঙ্গে আমার প্রথম সখ্য হয়। ওই কবির একটি কবিতায় শকুন্তলার নামের উল্লেখ আছে, তাই সে আমার কাছে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুরো কাহিনীটি শুনতে চেয়েছিল। সংক্ষেপে নয়, সবিস্তারে। তার বিনিময়ে সে আমাকে আপলেনিয়ারের সমগ্র জীবন ও কাব্যকীর্তির কথা জানিয়ে দিল। আমি বাঙালি শুনে সে খুঁজে খুঁজে বার করল, ফরাসি কবিতায় কোথায় কোথায় বাংলা বা বাঙালির উল্লেখ আছে। (অন্তত তিনটি উল্লেখ আমার মনে আছে এখনও।)

মার্গারিট থাকে হস্টেলে, আমার নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কিছুটা দূরে। মেয়েদের হস্টেলের অভ্যন্তরে ছেলেদের যাওয়ার নিষেধ নেই, রাত দুটো পর্যন্ত সেখানে ছেলেদের থাকার অধিকার আছে। বাকি রাতটুকুর জন্যই বা বাধা থাকে কেন? তাই কিছুদিন পরেই ছেলে ও মেয়েদের হস্টেল একই হয়ে গেল। ছাত্র ও ছাত্রীরা পাশাপাশি ঘরে কিংবা একই ঘরে ভাগাভাগি করে থাকতে পারে। তারা সহ-বাস করবে কি না, সেটা তাদের ব্যক্তিগত রুচি ও নির্বাচনের ব্যাপার, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই নৈতিকতা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। পড়াশুনোয় গাফিলতি না হলেই হল। মার্গারিটের ঘরে আর একটি মেয়ে থাকে, আমি কখনও গেলে সে মেয়েটি কিছু একটা ছুতো করে চলে যায় বাইরে। তাতে আমার খুবই অস্বস্তি বোধ হয়। এর চেয়ে আমার অ্যাপার্টমেন্টে আড্ডা দেওয়াই তো ভালো। ক্রমশ শুধু আড্ডা নয়, আমরা এক সঙ্গে রান্নাবান্নাও শুরু করে দিলাম। খিচুড়ি মার্গারিটের খুব প্রিয়, ও আমাকে ফরাসি রান্না শোখায়। ডিমের কুসুম ফেটিয়ে ফোঁটা ফোঁটা তেল দিয়ে মাইওনেজ বানাতে আমি দক্ষ হয়ে গেলাম অল্প দিনে। আমি মাশরুম কখনও খাইনি আগে। এবং ব্যাঙের ঠ্যাং ভাজা। ছোটবেলা থেকে আমাদের ধারণা, চিনেরা আরশোলা ভালোবাসে, আর ফরাসিরা ব্যাঙ খেকো। পরবর্তীকালে আমি চিনদেশে গিয়ে কোথাও আরশোলার চর্চা দেখিনি, বরং সাপের মাংস সুলভ। আর মার্গারিট খাস ফরাসিদেশের মেয়ে হয়েও কখনও ব্যাঙ খায়নি। বড় বড় হোটেলে,

প্যারিসে, পরিবেশন করা হয়, সে শুনেছে মাত্র। এখানে সুপার মার্কেটে ব্যাঙের পা পাওয়া যায়, একদিন মাখন দিয়ে ভেজে খেতে দিব্যি লাগল।

মার্গারিটের মুখখানা করুণ হয়ে যেত, যে-সব সন্ধেবেলা আমি ওকে একা ফেলে রেখে মেরি কিংবা পল এঙ্গেলের আহ্বানে চলে যেতাম। আমাকে যেতেই হত।

গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে মার্গারিটকে পড়াতেও হয়। ওর ক্লাস ভোরবেলা। আমার বরাবরই বেশি রাতে ঘুমোন আর বেলা করে ওঠা অভ্যেস। একদিন খুব ভোরে টেলিফোন বেজে উঠল। মার্গারিট দারুণ উত্তেজিতভাবে বলল, এখনও ঘুমোচ্ছ? শিগগির উঠে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাও। সরিয়ে দাও সব পর্দা। আমি সাড়ে ন'টার মধ্যে চলে আসছি।

আমার ঘরটিতে তিনখানা বড় বড় জানলা। বাড়ির ঠিক উল্টোদিকেই একটা গ্যাস স্টেশান, (পেট্রোল পাম্প) সেখানে সারা রাত আলো জ্বলে এবং অনবরত গাড়ি আসে, তাই রাত্তিরে সব পর্দা টেনে রাখতে হয়। বিছানা থেকে তড়াক করে নেমে পর্দা সরিয়ে দেখলাম এক অপরূপ মায়াময় দৃশ্য। আকাশ থেকে দুলতে দুলতে নামছে অসংখ্য সাদা পালক। বছরের প্রথম তুষারপাত। জলের নিজস্ব একটা রং আছে, তার ঠিক বর্ণনা হয় না। তাকে জলরং বলাই ভালো। কিন্তু একটু দানা বাঁধতে শুরু করলেই সাদা রং হতে থাকে। বৃষ্টির রং সাদা নয়, কিন্তু তুষার অতি শুভ্র। আর তুষারপাতের সময় সব দিক যেন বড় বেশি নিস্তব্ধ হয়ে যায়, গাড়ি চলাচলের আওয়াজও শোনা যায় না।

জীবনে প্রথম তুষারপাত দর্শনে বিস্ময়কর উত্তেজনাবোধ হওয়া খুব স্বাভাবিক। আমার অবশ্য এবারেই প্রথম নয়। বয়েজ স্কাউটদের সঙ্গে কাশ্মীরে গিয়ে সোনমার্গে হঠাৎ তুষারবর্ষণ দেখেছিলাম, তা অবশ্য মিনিট দশেকের জন্য, তখন আমরা একটা উন্মুক্ত স্থানে ছিলাম। এখানে পড়ছে তো পড়ছেই, ক্রমশ রাস্তা-ঘাট সাদা হয়ে গেল, সমস্ত বাড়ির ছাদ ধবল বর্ণ, পত্রহীন গাছগুলিতে থোকা থোকা ফুলের মতন আটকে রইল বরফ। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম জানলার ধারে।

মার্গারিট তো প্রতি বছরই বরফ দেখে। তবু ঠিক সাড়ে ন'টায় এসে বই-খাতা খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে সে শরীর-ভরা চাঞ্চল্য নিয়ে বলল, বছরের প্রথম দিন স্নো পড়ছে, আর তুমি চুপচাপ ঘরে বসে থাকবে? চলো, আমরা সেলিব্রেট করি। জুতো পরে নাও, জুতো পরে নাও! তারপরই সে বলতে লাগল পল ভের্লেনের একটি কবিতা।

এরপর অনেকক্ষণ আমরা ঘুরলাম পথে পথে। ক্ষীণতনু আয়ওয়া নদীর পাশ দিয়ে, অজস্র ফুলবাগান পেরিয়ে, ছোট ছোট টিলায় উঠে। পেঁজা তুলোর মতন তুষার গায়ে মাথায় পড়লেও পোশাক ভেজে না, বৃষ্টির সঙ্গে এই একটা বড় তফাত। প্রথম তুষারপাত উদ্‌যাপন করতে আরও অনেক ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে এসেছে পথে, দুপুর হতে না-হতেই পাবগুলি ভর্তি, অন্য দিন এ সময় খালি থাকে, একসময় আমরাও বসলাম রাস্তার ধারের একটা পাবে। তুষারপাতের সময় শীত কমে যায়, সবাই বড় বড় জাগে বিয়ার পান করছে। মার্গারিট বিশুদ্ধ ফরাসি ওয়াইন ছাড়া অন্য কোনও অ্যালকোহলিক পানীয় ছোঁয় না, সে বস্তু এখানে বেশ দামি, তবু অর্ডার দেওয়া হল এক বোতল।

আমার ক্লাস করতে যাওয়ার কথা দুপুরবেলা। রাইটার্স ওয়ার্কশপ ইংরেজি এম এ বিভাগের অন্তর্গত। আমাকে এখানে ছাত্র হতে হয়েছে। পল এঙ্গেল অবশ্য প্রথম দিনই বলে দিয়েছিলেন, আমার ক্লাস করা বাধ্যতামূলক নয়, অন্য লেখকদের সঙ্গে মেলামেশা, চিন্তার আদানপ্রদান, নিজের লেখালেখিই আসল কাজ। এতদিন পর আবার ছাত্র হতে আমার অস্বস্তিবোধ ছিলই, তবু প্রথম কয়েক মাস আমি ইংরেজি বিভাগের বিভিন্ন ক্লাসে হাজিরা দিয়েছি, এখানকার পড়াশুনোর পদ্ধতিটা বোঝার জন্য। প্রথমেই ভালো লেগেছিল, এখানে সিলেবাসের কড়াকড়ি নেই দেখে। অধ্যাপক ক্লাসে এসে একটা বই দেখিয়ে বললেন, গ্রেগরি করসো'র এই কবিতার

বইটা এক মাস আগে বেরিয়েছে। তোমরা কেউ পড়েছ নাকি? আমি কয়েকটা লেখা পড়ে শোনাচ্ছি, দেখো তো এগুলো কবিতা পদবাচ্য কি না! তারপর সারাক্ষণ সেই বইটি নিয়েই আলোচনা চলল, দু'একটি ছাত্র-ছাত্রী কড়া সমালোচনা শোনাতেও ছাড়ল না। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস ফাঁকি দেওয়া বা না-দেওয়া নিয়ে মাথাব্যথা নেই, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন খুব বেশি, অধিকাংশ ছেলেমেয়েকেই নিজের পড়ার খরচ নিজেই উপার্জন করতে হয়। রেজাল্ট ভালো না হলে তারই কষ্টার্জিত অর্থ নষ্ট হবে। আর যে অল্প সংখ্যক ছেলেমেয়ে পারিবারিক টাকাপয়সায় পড়াশুনো চালায়, তারাও জানে, একবার ব্যর্থ হলে আর কিছু পাওয়া যাবে না। খুব মেধাবী না হলে ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার দিকেই যায় না। আমাদের দেশে যেমন বি এ পাস করার পর কিছুই করার নেই, চাকরিও পাওয়া যাচ্ছে না, তাই দলে দলে ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়ে যায় এম এ ক্লাসে। ওদেশে স্কুল ছাড়লেই চাকরির অনেক সুযোগ, বিশেষত সেই ষাটের দশকে আমেরিকার অবস্থা খুবই ভালো। যে হেতু একজন ট্রাক ড্রাইভারের উপার্জন একজন অধ্যাপকের চেয়ে অনেক বেশি, সেই জন্য বেশির ভাগ ছাত্রই আর কষ্ট করে এম এ-টেম এ পড়তে চায় না।

আমার মতন যে সব বিদেশিকে পল এঙ্গেল এনেছেন, তাদের সংখ্যা আট-দশ জন। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমেরিকার ঠাণ্ডা লড়াই চালু থাকলেও পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া থেকে কবিদের আসতে অসুবিধে হয়নি। খোদ রাশিয়া থেকেও ভজনেসেনস্কি নামে সেই সময়কার খ্যাতনামা তরুণ কবিরও আমাদের সঙ্গে যোগদান করার কথা ছিল, শেষ মুহূর্তে কোনও কারণে সেটা বানচাল হয়ে যায়। বিভিন্ন ভাষার কবিদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ও তাদের কাব্যপাঠ শুনে, মোটামুটি বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে খসড়া ধারণা হয়। তাতে একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম, বেশির ভাগ ভাষার কবিতায় লিরিক বর্জন করা হয়েছে, কবিতার ভাষা চলে আসছে গদ্যের কাছাকাছি। অ্যালেন গিন্সবার্গের কবিতায় সেটা আগেই দেখেছি। উপন্যাসের অভ্যুত্থান এবং সংবাদপত্রের বহুল প্রচার শুরু হতে কবিতা অনেকখানি সরে যায়, কবিতা থেকে বর্জিত হয় কাহিনীর আভাস। সরে যেতে যেতে কবিতা হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ বিমূর্ত, প্রসঙ্গহীন। আমরা সেই পর্যন্তই জেনে এসেছি, কিন্তু চিত্রশিল্প যেমন চূড়ান্ত বিমূর্ততায় পৌঁছে আবার যাত্রা শুরু করেছে উল্টোদিকে, ফিরে আসছে অবয়বে, সেইরকম কবিতাও তাল ঠুকতে আসছে গদ্যের কাছাকাছি, কবিতার মধ্যে একটা কাহিনীর আভাস কিংবা চরিত্রের উঁকিঝুঁকি দেখা যাচ্ছে সাবলীলভাবে। একটা দুটো উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। জিম সিমারমানের একটা কবিতার শুরু এই রকম :

Oops!
Well, as long as you Caught me at it,
You may as well Come in,
You are of Course in a poem
by the talented an acclaimed Poet,
Simmerman.
Now, now, No need for all that.
This way please.

ক্যাথি ক্যালাওয়ে নামে আর একজন কবির রচনার নমুনা :

Phillipe flew out of Paris, Cursing
in his black leather jacket
his one-eyed aviator glasses—
Chasing a Dutch Odalisque, his amazone

all the way to Sudan. He cried
Over the Nubian desert,
Sold her for kief and calvas
in the j' ma of Khartoum (arguing Celine
with the Blue Nile dealer).

আমাদের বাংলা কবিতায় কিন্তু জীবনানন্দ-উত্তর পর্বেও শব্দঝংকারের দিকে ঝোঁক, ছন্দ-মিলের মধ্যে একটা সুরেলা ভাব এসেই যায় এবং উপমাও বেশি বেশি। প্রত্যেক কবিতায় যেন আর মতো থাকবেই। এখানে এসে আধুনিক ইংরেজি ও অন্য ভাষার কবিতাগুলি পড়তে পড়তে হয়তো আমার নিজের লেখাতেই কিছুটা বদল এসে গিয়েছিল।

কবিতা লিখতাম মাঝরাত্রে, মার্গারিট চলে যাবার পর। একটা মস্ত বড় স্ট্যান্ড ল্যাম্প জোগাড় করেছিলাম (কিনতে হয়নি। এখানে অনেকেই পুরনো আসবাবপত্র পথের মোড়ে রেখে দিয়ে যায়, ভাঙা-চুরো নয়, হয়তো ফ্যাশান বদলে গেছে এমন সব জিনিস, সেকেন্ড হ্যান্ড হিসেবে বিক্রিও হবে না। আমাদের মতন যারা ফ্যাশান নিয়ে মাথা ঘামায় না, তারা সেই বিনা পয়সার জিনিস ঘরে নিয়ে আসে)। স্ট্যান্ড ল্যাম্পটি খুবই সুদৃশ্য, ঘরের অন্য আলো নিভিয়ে দিলে একটা আলো-ছায়ার খেয়াল হয়, পাশে আমার টেবিলে, আর এক দিকে মানুষ-সমান কাচের জানলা। এই জানলা দিয়েই দেখা যায়, একটু দূরে ছোট্ট নদীটির দু'ধারের আলো। এতটুকু নদী, তবু তার ওপরে একশো-দু'শো গজ অন্তর অন্তর সেতু, আমি দেখতে পাই পাঁচটা, প্রত্যেকটি সেতুর গড়ন আলাদা আলাদা, এই সৌন্দর্যবোধ তারিফ করার মতন।

ঝিমঝিম করে রাত, আমার বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে গাড়িও ছোটে অনবরত, আমি একটা-দুটো লাইন লিখি আর থমকে থাকি। যেন হারিয়ে ফেলেছি আত্মবিশ্বাস।

আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি, তুই এসে
দেখে যা নিখিলেশ
এই কি মানুষজন্ম? নাকি শেষ
পুরোহিত কঙ্কালের পাশাখেলা, প্রতি সন্ধেবেলা
আমার বুকের মধ্যে হাওয়া ঘুরে ওঠে...

এইটুকু লিখেই মনে হয়, এটাকে কি কবিতা বলা যায়? গদ্যেরই তো মতন, গদ্যের সীমারেখা কি অতিক্রম করতে পেরেছে? সবটা কেটে বাদ দিতে উদ্যত হয়েও থেমে যাই, বুকের মধ্যে দোলাচল চলতে থাকে।

একদিন খবর পেলাম, সপরিবারে বুদ্ধদেব বসু এসেছেন ইন্ডিয়ানার ব্লুমিংটন শহরে। অতিথি অধ্যাপক হয়ে। ওঁর ছোট মেয়ে দময়ন্তী অর্থাৎ রুমি আগে থেকেই রয়েছে এদেশে, এবারে সঙ্গে এসেছেন প্রতিভা বসু এবং ওঁদের একমাত্র ছেলে শুদ্ধশীল অর্থাৎ পাপ্পা। এ সংবাদ পেয়েই আমার বুকের মধ্যে যেন আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। এটা ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না যে কেন, এখানে সব রকম আরাম ও সম্ভোগের উপকরণ পেয়েও কেন এত তীব্র নিঃসঙ্গতাবোধ ঘোচে না! আমার তো মার্গারিটের মতন এত চমৎকার, সরল ও আন্তরিক এক বান্ধবী আছে, আরও অনেকেরই জুটে যায়, কিন্তু মার্গারিট যে সময়টা আমার কাছে থাকে না, আমি ওর কথা তখন ভাবি না, ভাবি কলকাতার কথা। ভাবনানেত্রে যেই কলকাতার দৃশ্য দেখতে পাই, অমনি বুকটা টন টন করে। কেন? কলকাতা আমাকে কী হাতিঘোড়া দিয়েছে? সেটা আমার জন্মস্থানও নয়। তবু কী যে এক অদৃশ্য বন্ধন রয়ে গেছে!

বুদ্ধদেব বসুদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ দেখা করার জন্য ব্যস্ততারই বা কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে? ব্লুমিংটন খুব বেশি দূর নয়, বাসে চেপে খুব বেশি পয়সা খরচ না করেও যাওয়া যায়, ঠিক আছে, ধীরেসুস্থে গেলেই তো চলবে। তা নয়, এই শনিবারেই যাওয়া চাই। কেন? বাংলায় কথা বলার

জন্য? বুদ্ধদেব বসুর সাহচর্য অবশ্যই কাম্য, প্রতিভা বসু সব সময়ই আমাদের মতন অর্বাচীনদের সঙ্গে সস্নেহ ব্যবহার করেছেন আর পাপ্পাও সে সময় আমার খুব ভক্ত। একটা টেলিফোন করতেই আমন্ত্রণ পেয়ে গেলাম, আমি টিকিট কেটে চড়ে বসলাম ব্লুমিংটনের বাসে।

সেবারে প্রতিভা বসুর আপ্যায়ন, আদরযত্নে সেই নিঃসঙ্গতার ভাব ঘুচে গিয়েছিল একেবারে। বেশ মজা হয়েছিল ভাইফোঁটা নিয়ে। রুমি তার ভাই পাপ্পাকে ফোঁটা দেবে, আমরা সবাই গোল হয়ে দেখছি। নানা রকম রান্না ও মিষ্টান্নও প্রস্তুত, এই উপলক্ষে হবে ভোজ। বুদ্ধদেব বসু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সুনীল বাড়ি ছেড়ে এত দূরে রয়েছে, ওর বোনও নিশ্চয়ই ওর দাদার কথা ভাবছে, রুমিই ওকে ফোঁটা দিক না! প্রতিভা বসুও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে আমাকে ডাকলেন কাছে। প্রস্তাবটি আমার মোটেই পছন্দ হল না, কিন্তু বুদ্ধদেব বসু-প্রতিভা বসু সম্পর্কে এমনই গভীর শ্রদ্ধা যে ওঁদের কথার প্রতিবাদ তো করতে পারি না! আসনে বসার পর, রুমি ফোঁটা দেওয়ার জন্য একটা আঙুলে ঘি মাখিয়ে (কিংবা মাখন) আমার কপালের সামনে এনেছে, তখন আমি কাতরভাবে বললাম, আমি ফোঁটা নিতে চাই না! প্রতিভা বসু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, ফোঁটা নিতে চাও না? কেন? আমি আরও কাতর গলায় জানালাম, আমি নিজের বোন ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও মেয়েকেই বোন বা বোনের মতনও মনে করি না! তা হলে আমি রুমির ভাই হব কী করে?

সে কথা শুনে বুদ্ধদেব বসুর সে কী প্রবল হাসি! দরজা-জানলা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

আর একবার বুদ্ধদেব বসু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভাষা-সংস্কৃতি বিভাগে বক্তৃতা দিতে আসবেন, আমারও তা শুনতে যাওয়ার আগ্রহ। আমি আগে থেকে এসে উঠেছি সস্তার ইয়ুথ হস্টেলে। টেলিফোনে কথা হয়েছিল, বুদ্ধদেব আমাকে ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন, সন্ধে সাতটায় সেখানে দেখা করতে। সেদিন বিকেল থেকেই তুষার-ঝড় বইছে। পায়ে অনেকখানি কানা উঁচু জুতো, হাতে দস্তানা ও মাথায় টুপি থাকলেও শরীরের যে-টুকু অংশ খালি, সেখানে যেন সূচ ফুটছে অনবরত। নাকের ডগাটা ঢাকবার তো কোনও উপায় নেই!

ঠিকানা খুঁজে খুঁজে পৌঁছলাম সে বাড়িতে। বেল বাজাবার পর যিনি দরজা খুললেন, তাঁকে চিনতে কোনও অসুবিধে হল না। অধ্যাপক স্টিফেন হে, কলকাতায় ছিলেন কয়েক মাস, একাধিকবার দেখা হয়েছে আমার সঙ্গে, খুব সম্ভবত ব্রাহ্ম সমাজ ও উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম সমাজ ও ধর্ম আন্দোলন বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি আমাকে দেখে হাসলেন না, কী চাই গোছের প্রশ্নের ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকে রইলেন। বুদ্ধদেব বসু আমাকে এখানে দেখা করতে বলেছেন শুনে তিনি আমাকে বাইরের বারান্দার একটা চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করে বন্ধ করে দিলেন দরজা। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিলাম, বুদ্ধদেব বসু একটু পরেই বেরিয়ে আসবেন। তাঁকে একটা খবর জানাবার জন্য ছটফট করছিলাম, সেদিনই বিকেলে শিকাগোর একটি বইয়ের দোকানের বাইরের দিকের শো-কেসে একটি নতুন বইয়ের মলাটে বাংলা অক্ষর দেখে দারুণ চমক লেগেছিল। বইটি এডোয়ার্ড ডিমকের 'দা থিফ অফ লাভ', অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অনুবাদ।

বসে আছি তো বসেই আছি, কেউ আর বাইরে এল না, কেউ আমাকে ভেতরে যেতেও বলল না। হু হু বাতাসে ওভারকোটের মধ্যেও যেন জমে যাচ্ছে শরীর। শীত কাটাতে সিগারেটের পর সিগারেট টেনে যাচ্ছি অনবরত। এক সময় ছুরি-কাঁটার টুং-টাং শুনে বোঝা গেল, ভেতরে বেশ কিছু লোক খেতে বসেছে এক সঙ্গে। ওয়াইন ঢালার আওয়াজ, হাস্যপরিহাস শুনতে পারছি স্পষ্ট, চিনতেও পারছি কয়েকটি কণ্ঠস্বর। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে আমার। ভেতরে খাওয়াদাওয়া চলছে, আর অভুক্ত অবস্থায় আমাকে ঠাণ্ডার মধ্যে বসিয়ে রাখা হয়েছে বাইরে। আমেরিকান ভদ্রতার সঙ্গে এটা একেবারেই মেলে না। আমি একেবারে অজ্ঞাত কুলশীলও নই, ভিক্ষেটিক্ষেও চাইতে আসিনি। ক্রমশ রাগ বাড়তে লাগল, তক্ষুনি আমার স্থানত্যাগ করা উচিত,

কিন্তু বুদ্ধদেব বসুকে কিছু না জানিয়ে যাই কী করে? রাগের সঙ্গে সঙ্গে আমার খিদেও বাড়ছে। কাছাকাছি কিছু লোক পানভোজন সারছেন, আর আমি পেটে কিল মেরে বসে আছি! (পরে প্রতিভা বসুর মুখে শুনেছিলাম, অনবদ্য মাছের রোস্ট ছিল!)

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে সদলবলে বেরিয়ে এলেন বুদ্ধদেব বসু। আমাকে কাঁচামাচু অবস্থায় বসে থাকতে দেখে খুব অবাক হয়ে বললেন, তুমি কখন এলে? আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম, তুমি বুঝি আর বাড়ি চিনতে পারলে না! আমি বাংলায় পুরো বৃত্তান্তটি জানাবার পর তিনি স্টিফেন হে'র সঙ্গে কথা বলতে গেলেন। আবার ফিরে এসে বললেন, সবাই গাড়িতে উঠে পড়ো।

একজন আমেরিকান অধ্যাপকের কাছ থেকে এরকম অভদ্র ব্যবহার সত্যিই আশা করা যায় না। এরকম আচরণের কারণটিও অদ্ভুত। স্টিফেন হে আমাকে চিনতে পেরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু পছন্দ করেননি, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করলেও একালের বাঙালি তরুণ কবিদের ওপর তাঁর খুব রাগ। কলকাতায় তাঁর ফ্ল্যাটে এক সন্ধ্যার পার্টিতে কয়েকজন বাঙালি তরুণ কবি মদ্যপানের বাড়াবাড়ি করেছিল, একজন তার বসবার ঘরের বড় পর্দা ধরে দোল খেতে গিয়ে সবসুদ্ধ ছিঁড়ে ভূপাতিত হয়েছিল। আমি কিন্তু ছিলাম না সেই তরুণ কবিদের দলে, তবু উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে! একদিন এয়ারপোর্টে একজন দৈত্যাকার আমেরিকান অতি ব্যস্ততায় আমার পা মাড়িয়ে দিয়ে ক্ষমা না চেয়ে চলে গিয়েছিল। তা বলে কি আমি যাবতীয় আমেরিকানকে সেই অভদ্র লোকটির সমান করে দেখব?

যাই হোক, সব কিছুরই একটা উল্টো দিক আছে। স্টিফেন হে'র এই আচরণের ফলে আবার দারুণ লাভও হয়েছিল অন্য দিক দিয়ে। সেদিন গাড়িতে উঠেই প্রতিভা বসু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিছু খেয়েছ, সুনীল? আমি লম্বা করে হ্যাঁ বললেও তিনি বিশ্বাস করলেন না। এইসব ব্যাপারে মেয়েদের বোধহয় অতিরিক্ত ইনস্‌টিংক্ট থাকে, তিনি উতলা হয়ে তাঁর স্বামীকে বললেন, আগে ওর খাওয়ার ব্যবস্থা করো, আমরা সবাই এত খেয়েছি, ও একা না খেয়ে আছে— .

এরপর আমরা গেলাম রাজেশ্বরী দত্তর অ্যাপার্টমেন্টে। বিখ্যাত গায়িকা এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্ত্রী রাজেশ্বরী আমাদের চোখে প্রায় স্বর্গের অপ্সরী। তিনি তখন শিকাগোতে কোনও চাকরি করছেন। সেখানে পৌঁছেই প্রতিভা বসু বললেন, রাজেশ্বরী, তুমি এই ছেলেটিকে কিছু খেতে দাও তো!

আমার কাছে চারমিনার সিগারেট দেখে রাজেশ্বরী স্মৃতিকাতর হয়ে কয়েকটা চেয়ে নিলেন, তারপর গল্প করতে করতে আধঘণ্টার মধ্যে রান্না করে ফেললেন, ভাত, ডাল, কিমার তরকারি আর বেগুনভাজা। একে তো গরম ডাল-ভাত, তার ওপরে রূপসী অপ্সরীর নিজের হাতের রান্না, সে স্বাদ কি জীবনে ভোলা যায়?

উনচল্লিশ

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি যেমন সুপুরুষ, তেমনই চলচ্চিত্রের নায়কোচিত তাঁর চালচলন। তাঁর স্ত্রী জাকলিনও খুব রূপসী, গণতন্ত্রে রাজা-রাজ্ঞীর কোনও স্থান নেই বটে, কিন্তু রাষ্ট্রপতির পত্নীকে ফার্স্ট লেডি আখ্যা দিয়ে প্রায় একটি রানির ভূমিকাই দেওয়া হয়। এঁদের মনে করা হত এক আদর্শ রোমান্টিক দম্পতি, যদিও কেনেডির মৃত্যুর কিছুকাল পরেই

সাংবাদিক ও জীবনীলেখকরা নানান সূত্র থেকে চমকপ্রদ সব তথ্য খুঁজে বার করেছেন, স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কেনেডি সাহেব গোপনে দারুণ লাম্পট্যলীলা চালাতেন, হলিউড তথা সারা বিশ্বের চলচ্চিত্র দর্শকদের বুক-কাঁপানো নায়িকা মেরিলিন মনরো পর্যন্ত এর মধ্যে জড়িত ছিলেন। অনেক পরে, নব্বইয়ের দশকের শেষে আমেরিকার আর এক রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন আর এক রকম যৌন ব্যভিচারের পর ধরা পড়ে গিয়ে নাকানি-চোবানি খান, কিন্তু জন কেনেডি জীবৎকালে ধরাটি পড়েননি, আদর্শ স্বামী ও সৎ নাগরিকের ভাবমূর্তিটি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন।

ষাটের দশকে আন্তর্জাতিক ঠাণ্ডা লড়াই তখন তুঙ্গে। বাড়ির পাশে কিউবাকে নিয়ে তখন আমেরিকার প্রধান শিরঃপীড়া! কমিউনিজমকে প্রায় জুজুর মতন গণ্য করা হয় আমেরিকার শিশুদের মধ্যে। অনেকেই প্রথম প্রথম ভেবেছিল ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লব বেশিদিন টিকবে না, কিউবা আবার আগের মতনই আমেরিকার প্রায় কলোনি হয়ে থাকবে। কিন্তু কাস্ত্রো দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত বিশ্বের সমস্ত বামপন্থী শক্তি কাস্ত্রোর সমর্থনে সঙ্ঘবদ্ধ। কাস্ত্রোকে হত্যা করার অনেক চোরাগোপ্তা চেষ্টাও হয়েছে! একবার কোনও একটা উপলক্ষে কিউবার সরকারকে ধ্বংস করার হুমকি দিয়ে আমেরিকা যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ক্রুশ্চেভের নির্দেশে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেও ধেয়ে আসে রণতরী। কয়েকটা দিন বিশ্ববাসী দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়েছে, দু'দেশের যুদ্ধজাহাজগুলি মুখোমুখি হয়ে গোলাগুলি ছোঁড়া শুরু করলেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। প্রায় শেষ মুহূর্তে উভয়পক্ষের শুভবুদ্ধির উদয় হয়, অস্ত্র সংবরণ করে জাহাজগুলি বিপরীত দিকে ফেরে।

আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দু'পক্ষের হাতেই তখন প্রচুর পারমাণবিক বোমা। সবগুলি বোমা একসঙ্গে ফাটলে পাঁচটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। ক্যাপিটালিস্ট কিংবা সোশালিস্ট ব্লকের যে কোনও দিক থেকে পারমাণবিক বোমার আক্রমণ শুরু হলে অন্য পক্ষও তার প্রতি-আক্রমণে বাধ্য হবে। এই বিশ্বধ্বংসী অস্ত্রগুলি চালু করার চূড়ান্ত ক্ষমতা দুই দেশের রাষ্ট্রনায়কদের হাতে। ষাটের দশকে এরকম আশঙ্কা বারবার উত্থাপিত হয়েছে। স্পেস অডিসি ২০০১ খ্যাত চলচ্চিত্রকার স্ট্যানলি কুবরিক সে সময় একটা সিনেমা তুলেছিলেন, সেটির নাম 'ডক্টর স্ট্রেঞ্জ লাভ', যাতে দেখানো হয়েছিল, আমেরিকা কিংবা রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক কোনওদিন যদি মাতাল হয়ে নেশার ঝোঁকে কিংবা ভুল করে পরমাণু অস্ত্রের বোতাম টিপে আক্রমণ চালু করে দেয়, তা হলে কী হবে? সেটা একেবারে অসম্ভব ছিল না। ডেমোক্লিসের খড়্গের মতন তখন সারা পৃথিবী ধ্বংসের মতন পারমাণবিক অস্ত্রের দণ্ডাজ্ঞা সত্যি সত্যি মাথার ওপর ঝুলে ছিল।

অর্থনৈতিকভাবে ষাটের দশকের আমেরিকা খুবই সমৃদ্ধিশালী দেশ হলেও বর্ণবিদ্বেষের নানান অমানবিক ঘটনায় কলঙ্কিত। কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি অত্যাচারের নানান বীভৎস কাহিনী প্রকাশিত হত খবরের কাগজে। একটা সংবাদ ও ছবির কথা উল্লেখ করতে পারি। একটি নিগ্রো যুবককে কয়েকদিন ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, পুলিশ শেষপর্যন্ত তার পচা-গলা লাশ উদ্ধার করে একটা জলাভূমি থেকে। সেই উদ্ধারকার্যের সময় কাছাকাছি একটা রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল চারজন শ্বেতাঙ্গ যুবক, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে তারা অম্লানবদনে, চরম নির্লজ্জতার সঙ্গে বলেছিল, এই জলাশয়ে মাছের খাদ্য হিসেবে মাঝে মাঝে আমরা এক আধটা নিগারকে মেরে তার দেহটা জলে ছুঁড়ে দিই!

এই ঘটনা ঘটেছিল অ্যালাবামা রাজ্যে। আমেরিকার দক্ষিণের চারটি রাজ্যে তখন এরকম বর্ণবিদ্বেষ ও খুনোখুনি যেন হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। অনেক হোটেল-রেস্তোরাঁয় কালো মানুষদের ঢুকতে দেওয়া হয় না, অনেক স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কালো ছাত্রদের। এসব নিবারণ করার কোনও আইনও ছিল না, সিভিল রাইটস বিল পাস হয় আরও দু'বছর পরে, তার আগেই

নিহত হয়েছিলেন কেনেডি। লড়াইটা প্রধানত আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে, (নিগ্রো শব্দটি তখন অনুচ্চার্য, কিছুদিন শুধু ব্ল্যাকস বলা হত, এখন বলা হয় ব্ল্যাক আমেরিকান) কিন্তু এশিয়ার সব লোকজন, এমনকী জাপানিরাও (তারা তখনও বাণিজ্য দক্ষতায় সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলেনি) ওদের চোখে কালো। ভারতীয় সোসালিস্ট নেতা রামমনোহর লোহিয়া সে সময় আমেরিকা শহরে এসে দক্ষিণের একটি রাজ্যে এক রেস্তোরাঁয় ঢুকতে গিয়ে অপমানিত হয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, একদল এরকম কুৎসিত ব্যবহার করলেও এর প্রতিবাদও করে অন্য দল এবং তাদেরই সংখ্যা বেশি, তবু হঠাৎ হঠাৎ কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটে যায়। রামমনোহর লোহিয়ার হেনস্থার খবর পড়ে আমি ঠিক করেছিলাম, দক্ষিণের মার্কামারা চারটি রাজ্যে কখনও বেড়াতে বা আমন্ত্রণ পেলেও যাব না।

আমাকে কখনও বর্ণবিদ্বেষ জনিত অপমান সরাসরি সহ্য করতে হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী বা অন্য দেশ থেকে আগত লেখক-লেখিকাদের মধ্যে এরকম মনোভাব আশাই করা যায় না। তবে কারও কারও ব্যবহারে বেশি বেশি বন্ধুত্বের ভাব কৃত্রিম মনে হয়েছে। ট্রেনে কিংবা দূরপাল্লার বাসে দু'-একজন লোকের দৃষ্টিতে যেমন বিরাগভাব দেখেছি, কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলেনি, তাই অভিযোগ করা যায় না। আয়ওয়া শহরে একটি বিদুষী কৃষ্ণাঙ্গিনীকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার সঙ্গে কেউ কি খারাপ ব্যবহার করে, তুমি কি বর্ণান্ধতার শিকার হয়েছ কখনও? সে বলেছিল, না, আমার সঙ্গে কেউ কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি, এখানকার হোটেল-রেস্তোরাঁয় আমাদের প্রবেশে কেউ বাধা দেয় না, দক্ষিণের রাজ্যগুলির মতন, এখানে রাস্তাঘাটে কোনও সাদা লোক আমাদের দিকে অপমানজনক মন্তব্য ছুড়ে দেয় না। কিন্তু আমি গন্ধ পাই। কোনও কোনও পার্টিতে, মিশ্র সাদা আর কালো নারী পুরুষ এক সঙ্গে পানাহার ও হই হল্লা করছে, কোনও অশান্তি নেই, তবু আমি হঠাৎ হঠাৎ একটা গন্ধ পাই, ওরই মধ্যে কেউ কেউ আমাকে অপছন্দ করছে, সেই পছন্দহীনতারও একটা গন্ধ আছে।

মেয়েটি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, তোমাদের দেশে অবস্থা কী রকম?

যদি উত্তর দিতাম, আমেরিকা তো বটেই, দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়েও অনেক খারাপ, তা হলে সত্যের অপলাপ হত কী? আমাদের দেশে বর্ণবৈষম্য তো আছেই, তার ওপরে আছে ধর্মভেদ, জাতিভেদ। অস্পৃশ্যতা, জল-অচল পর্যন্ত, যা বোধহয় পৃথিবীর আর কোনও দেশে নেই। যে দেশের কাব্য ও দর্শনে রয়েছে যাকে বলে 'মানবতার সুমহান বাণী', সেই দেশেই যখন-তখন হয় মানবতার চরমতম অপমান। এক কুয়ো থেকে পানীয় জল নেবার অপরাধে পুড়িয়ে মারা হয় হরিজনদের। পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে অগুনতি ফর্সা মেয়ের দাবি। এ সব কথা লুকোবার কোনও মানে হয় না।

মেয়েটি আবার বলল, আমি লক্ষ করেছি, ভারতীয় ছেলেরা আমাদের সঙ্গে ঠিক যেন মিশতে চায় না।

এ অভিযোগও বর্ণে বর্ণে সত্যি। অনেক ভারতীয় ছাত্র শ্বেতাঙ্গিনী বিয়ে করে, কিন্তু কেউ কোনও নিগ্রো মেয়েকে বিয়ে করেছে, এমন আমি দেখিনি। দু'-একটি ব্যতিক্রম হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু ভারতীয়রা কোথাও নিগ্রোদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে না। ভারতীয়দের গুলতানিতে কখনও নিগ্রোদের প্রসঙ্গ এলে ব্যঙ্গার্থে বলা হয় 'কালুয়া'। অনেক ভারতীয়ই কোনও না কোনও সময়ে শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে বর্ণবিদ্বেষের আঁচ পেয়েছে, তবু তারা নিজেরাও বিদ্রূপ করে কালোদের নিয়ে। আমাদের দেশে যারা ফর্সা এবং রূপবান বলে বিবেচিত, তারাও আমেরিকানদের চোখে কালো হয়ে যায়। সাহেবরা সাদা-কালোর বিভিন্ন শেড বুঝতেই পারে না। সবচেয়ে মজার কথা বলেছিল একজন গ্রিক লেখক। গ্রিকরা ইউরোপীয় এবং অবশ্যই শ্বেতাঙ্গ, এবং গ্রিক পুরুষদের একসময় মনে করা হত যেন সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা, তবু সেই গ্রিক লেখকটি একদিন আমায় কথায় কথায় বলেছিল, তুমি, আমি, আমরা যারা কালো লোক...।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, তুমিও কালো? তার মানে? সে বলেছিল, গরিব, গরিব, তুমি আর আমি দু'জনেই গরিব দেশের মানুষ, গরিব মানেই কালো, এদের চোখে! পরে আমি দেখেছি, আমেরিকায় যারা সত্যিকারের উচ্চশ্রেণীর, যাদের বলে WASP, অর্থাৎ হোয়াইট-অ্যাংলো স্যাকশান-প্রটেস্টান্ট, তারা গ্রিক ও ইতালিয়ানদেরও খানিকটা অবজ্ঞার চোখে দেখে। প্রটেস্টান্ট না হলে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হওয়াও খুব কঠিন, জন কেনেডিই ক্যাথলিক হয়েও প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়েছেন।

কেনেডি কেন খুন হলেন, তার সঠিক কারণ বোধহয় কোনওদিনই জানা যাবে না। আততায়ী হিসেবে অসওয়াল্ড নামে একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি ধরা পড়ল, কিন্তু খুনটা তার একক প্রচেষ্টার খামখেয়াল, না তার পেছনে কোনও সংগঠিত চক্র আছে তাও বোঝা যায়নি। রাশিয়ান সংযোগ বা কে জি বি-কে জড়ানোর আগে চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণ মেলেনি। সেই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর টেলিভিশনে সর্বক্ষণ শুধু সেই একই খবর ও ছবি দিনের পর দিন। আমরাও খুনের সূত্র বা খুনির মতলব জানার জন্য টেলিভিশানের সামনেই বসে থাকি, দেখতে দেখতে এমন একটা দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম, যা অতি দুর্লভ অভিজ্ঞতা। আসামি অসওয়াল্ডকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কড়া পাহারায়, লোকে ভিড় করে তাকে দেখছে, হঠাৎ সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন মোটা মতন লোক বেরিয়ে এসে রিভলভার বার করে পরপর গুলি চালিয়ে দিল অসওয়ালডের বুকে। সেই লোকটির নাম জ্যাক রুবি, সে ধরা পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই, কিন্তু জেরা বা বিচারের আগেই অসওয়ালড খতম হয়ে যাওয়ায় তার পশ্চাৎকাহিনীর সব সূত্রও লুপ্ত হয়ে গেল চিরতরে। টিভি-তে নানান সিনেমায় বা ধারাবাহিকে খুনের দৃশ্য দেখা যায়, সেগুলি বানানো, কিন্তু সত্যি সত্যি একটা খুন হচ্ছে এবং সেটা কোটি কোটি দর্শক সেই মুহূর্তেই দেখছে, এমন দৃষ্টান্ত আর নেই বোধহয়। কেনেডি হত্যার পর সে সম্পর্কে কত লোক সংবাদপত্রে বা টিভিতে কত রকম কল্পিত কাহিনী যে প্রচার করতে লাগল, তার ইয়ত্তা নেই। বাক-স্বাধীনতা বা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এমনই চরম যে কেউ ছাপার অক্ষরে প্রলাপ বকলেও তার শাস্তি হয় না। কেনেডি হত্যার পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক করতে করতেই খুন হয়ে গেল কয়েকজন, তার মধ্যে এক শ্বশুর ও জামাই উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রপতি হত্যার পরপরই প্রকাশিত হল এক প্রহসন, যার খলনায়ক উপরাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি জনসন, তিনিই নাকি ক্ষমতা দখলের উন্মত্ততায় খুন করিয়েছেন কেনেডিকে, তাঁর সঙ্গে রূপসী জ্যাকলিনের শারীরিক সম্পর্কও বাদ গেল না। লেডি ম্যাকবেথের সঙ্গে তুলনা করে তাঁকে বলা হল ম্যাকবার্ড। এ রকম বীভৎস, অলীক নাটকও কিন্তু বাজেয়াপ্ত হল না, নাট্যকারের শাস্তি হল না।

অকস্মাৎ নিয়তির প্রতিবন্ধে জনসন রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হলেও জনপ্রিয় হননি, তার অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি এই যে তাঁর চেহারাটা বড়ই সাদামাটা, কেনেডির তুলনায় একেবারে এলেবেলে। এ দেশের রাষ্ট্রপতির শারীরিক গঠনও যোগ্যতার কিছুটা অঙ্গ। পল এঙ্গেলের স্ত্রী মেরি প্রায়ই বলতেন, দুর দুর, ও লোকটাকে দেখলে মনে হয় টুপি বিক্রেতা, ওকে রাষ্ট্রপতি বলে মনেই হয় না! কিন্তু এই লিন্ডন বি জনসনের আমলেই স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক সিভিল রাইটস বিল, যার ফলে আমেরিকার সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্যজনিত যে কোনও ব্যবহার শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই দিনটিতে মার্গারিট আয়ওয়া শহরে ছিল না, সন্ধেবেলা আমি একা একা নিজের ঘরে একটা শ্যাম্পেনের বোতল খুলে নিজস্ব উৎসব করেছিলাম। এই আইন পাস হবার ফলে ও দেশে আস্তে আস্তে প্রকাশ্যে বর্ণবৈষম্যজনিত নিষ্ঠুরতা কমতে শুরু করে। অনেক জায়গায়, বিশেষত নিউ ইয়র্ক শহরে সাদা ও কালো ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে করার ধুম পড়ে যায়, তার মধ্যে খানিকটা দেখানেপনা থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন তো বটে!

আমি প্রায়ই আয়ওয়া ছেড়ে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। আমেরিকা তো দেশ নয়, মহাদেশ, বিশাল তার আয়তন, বিস্ময়কর তার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, নিবিড় অরণ্য, মরুভূমি, পাহাড়, সুদীর্ঘ বেলাভূমি ও বর্ণময় মহানগর। পূর্ব দিকে নিউ ইয়র্ক-বোস্টন, পশ্চিমে লস এঞ্জেলিস-সান ফ্রান্সিসকো। আমার স্কলারশিপের টাকার অনেকটাই পাঠিয়ে দিতাম বাড়িতে, তাই বেড়াবার জন্য আমাকে নানারকম আমন্ত্রণ জুটিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হত, যাতে ভাড়ার টাকাটা পাওয়া যায়। পূর্ব পরিচিত অ্যালেন গিন্‌সবার্গ ও রুথ স্টেফানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলাম, তাঁরা কিছু কিছু ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। রুথ স্টেফান যে কত ধনবতী মহিলা তা জেনেছিলাম এ দেশে এসে। তরুণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাকেই তাঁর নাম বলি, তারাই অবাক হয়ে বলে, তুমি ওঁকে চিনলে কী করে? এইসব ধনীরা ধরাছোঁওয়ার বাইরে থাকে। রুথ স্টেফানের দান-ধ্যান ছড়িয়ে আছে সারা দেশে। অ্যারিজোনার টুসন শহরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাইটার্স হোম পরিচালিত হয় তাঁরই অর্থানুকূল্যে। রুথ সেখানে আমায় আমন্ত্রণ পাইয়ে দিলেন, যার ফলে অ্যারিজোনার বিচিত্র মরুভূমি দেখার সুযোগও আমার ঘটে গেল। এই মরুভূমিতে প্রচুর ফণিমনসার গাছ, এক একটি দু'তলা, তিনতলা সমান উঁচু, স্প্যানিশ ভাষায় এগুলির নাম স্যায়ুয়ারো, কিছু কিছু বৈজ্ঞানিকের ধারণা, এই বিশাল ক্যাকটাস গুলির সঙ্গে বহু দূরের অন্য গ্রহের যোগাযোগ আছে। এখনও তা নিয়ে পরীক্ষা চলছে।

টুসন শহরে গিয়ে আমার টাউন স্কুলের সহপাঠী সুবোধ সেনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। সে তার বাড়িতে একদিন নিয়ে গিয়ে খুবই খাতিরযত্ন করে খাওয়াল। আমার ধারণা ছিল, আমেরিকায় আমার পরিচিত বাঙালি কেউ নেই। কিন্তু সুবোধের মতন আরও কেউ কেউ যে ছড়িয়ে আছে, তা জানা গেল আস্তে আস্তে। একজনের সূত্রে সন্ধান পাওয়া যায় অন্যদের। এই ভাবেই আমার পরিচয় হয় রমেন পাইন ও মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। রমেন পাইন ও তার স্ত্রী জুলি বহুকাল ওয়াশিংটন ডি সি প্রবাসী, ওদের সঙ্গে আমার আজীবন বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আর মদনগোপাল মুখোপাধ্যায় ডাক্তার, তার মতন সংস্কৃতিবান ও সুভদ্র মানুষ অতি দুর্লভ। তার স্ত্রী ডলি লাজুক ও স্বল্পভাষী, কিন্তু তার আতিথেয়তা এমনই আন্তরিক যে এই দম্পতির সান্নিধ্যে প্রথমবার এসেই মনে হয় যেন অনেক দিনের চেনা। পরে বেশ কয়েকবার আমি ওদের ক্যালিফোর্নিয়ার বিস্ময়কর বাসভবনে আতিথ্য নিয়েছি, প্রত্যেকবার মনে হয়েছে, এখানে আমি বিনা আমন্ত্রণেই হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসতে পারি। আমার আর এক বন্ধু, শুভেন্দু দত্ত, পরবর্তীকালে আমেরিকায় পদার্থবিদ্যায় খ্যাতনামা অধ্যাপক, তারও সন্ধান পেয়েছিলাম পূর্ব উপকূলে।

নিউ ইয়র্কে প্রথমবারে আমি যাই পল এঙ্গেলের সঙ্গে। পল এঙ্গেল কেন যেন বিদেশ থেকে আগত অন্যান্য কবিদের মধ্যে আমার প্রতিই বেশি পক্ষপাতিত্ব করতেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে সেখানে যেতেন প্রায়ই। তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন শহরে যেতেন, নিজে গাড়ি চালিয়ে, আমি তাঁর পার্শ্ববর্তী, তিনি বলতেন, সুনীল, তোমাকে যে আমি সঙ্গে নিচ্ছি, তাতে আমার একটা স্বার্থও আছে। একা গাড়ি চালালে আমি ঘুমিয়ে পড়তে পারি, তুমি আমার পাশে বসে কথা বলতে বলতে আমাকে জাগিয়ে রাখবে। শুধু কিছু কিছু বকবক করে তার বদলে নতুন নতুন শহর দর্শন, ভালো ভালো হোটেলে থাকা, অভিনব সব আহার্যের স্বাদ, (একবার মার্শাল টাউনে চিংড়িমাছ খেয়েছিলাম, এক একটি মাছ দেড় হাত-দু' হাত লম্বা, অত বড় চিংড়ি যে হয় তা আমার কল্পনাতেও ছিল না) এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কী হতে পারে! পল এঙ্গেলের বদলে আমার নিজেরই ঘুম পেয়ে যেত মাঝে মাঝে, হাইওয়ে ধরে শত শত মাইল সমান গতিতে ছোটা, একটাও ট্রাফিকের লাল বাতি নেই, লেভেল ক্রশিং নেই, দু'পাশে দৃশ্য-বৈচিত্র্যও নেই, ঘুম পাবে না? পল কনুই দিয়ে আমার পেটে খোঁচা মেরে অট্টহাস্য করে ওঠেন।

সেইভাবেই গিয়েছিলাম নিউ ইয়র্ক, উঠেছিলাম অভিজাত প্লাজা হোটেলে, একেবারে

সেন্ট্রাল পার্কের গায়ে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পলের বক্তৃতা ছিল, আমার জন্যও পোয়েট্রি সোসাইটির বার্ষিক ভোজসভার একটি আমন্ত্রণ সংগ্রহ করেছিলেন। এক বিধবা মহিলা তাঁর ইচ্ছাপত্রে এই কবিতা পরিষদকে এক মিলিয়ান ডলার দান করেছিলেন বলে (হায়, আমাদের দেশের কবিদের কেউ এরকম দান করেন না) সেবারের ভোজসভায় দারুণ জাঁকজমক। অন্য একটি বড় হোটেল সেই পার্টিতে যোগদান করার জন্য জীবনে প্রথম ও শেষবার আমাকে সুটের সঙ্গে বো পরতে হয়েছিল, তাতে আমাকে কী রকম ক্যাবলাকার্তিকের মতন দেখাচ্ছিল কে জানে!

আমাদের হোটেলের সামনে সর্বক্ষণ উৎসুক জনতার ভিড়, কারণ প্রচুর সেলিব্রিটি ওঠেন সেখানে। শুনলাম বিখ্যাত গণগায়ক প্যাট বুন রয়েছেন কোনও ঘরে, আমার সঙ্গে লিফটে একবার দেখা হয়ে গেল অ্যালেক গিনেসের, 'ব্রিজ অন দা রিভার কোয়াই' ফিল্মের বিখ্যাত নায়ক, তাঁকে দেখামাত্র চিনেছিলাম, কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, এলিজাবেথ টেলারকে খুব কাছ থেকে দেখেও আমি চিনতে পারিনি। মুখখানা এমনই রং করা যে মনে হয়েছিল একটা জ্যান্ত পুতুল। আটবার কিংবা ন'বার বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের বিশ্ব রেকর্ড করেছেন যে মহিলা, তাঁর সঙ্গে তখন তাঁর তৎকালীন স্বামী রিচার্ড বার্টনের খুব ভাব। রিচার্ড বার্টন সে সময় ব্রডওয়ের একটি নাটকে অভিনয় করছেন, এলিজাবেথ টেলারের তাতে কোনও ভূমিকা নেই, তবু অতিশয় পতিব্রতা পত্নীর মতন তিনি প্রত্যেকদিন স্বামীকে থিয়েটার হলে পৌঁছে দিয়ে আসেন। তবে সবচেয়ে হই চই ও হাঙ্গামা হল এক সকালে, পুলিশ এসে সামলাল ভিড়, ঘরের জানলা দিয়ে দেখলাম, সেই ভিড়ের মধ্যে ছোটাছুটি করছে চারটি অল্প বয়েসি ছেলে, জনতা উন্মত্তের মতন তাদের একবার ছুঁতে চাইছে। এরা বিটল্‌স নামের এক গানের সম্প্রদায়, আমি এদের নাম আগে শুনিনি। ওই সময়েই বিটল্‌সরা খ্যাতিতে আর সব গানের দলকে ছাড়িয়ে যায়।

এইসব দেখতে দেখতে এক একসময় মনে হত, এরকম একটা দামি হোটেলে আমার মতন ফরিদপুরের অজ পাড়াগাঁর একটা ছেলে এল কী করে? এ কি সত্যি, না প্রহেলিকা? নিজের গালে চিমটি কেটে দেখতাম, ঘোর ভাঙে কি না!

অ্যালেন গিন্‌সবার্গের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করতেই সে বলল, আমি তোমাদের ওই হোটেলে যেতে পারব না, তুমি আমার কাছে চলে এসো। সে তখন অস্থায়ীভাবে রয়েছে এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে। নিউ ইয়র্ক শহরটি প্রকাণ্ড হলেও রাস্তাগুলি এমন পরিকল্পিতভাবে সাজানো যে ঠিকানা পেলেও ভূগর্ভ ট্রেনে বা বাসে চেপে সেখানে পৌঁছে যাওয়া শক্ত কিছু নয়। গ্রিনিচ ভিলেজে আট নম্বর রাস্তায় একটি বইয়ের দোকানের নাম এইট্‌থ স্ট্রিট বুক শপ, সে দোকানের কাউন্টারে গিয়ে অ্যালেনের কথা জিজ্ঞেস করতেই কর্মচারীটি পাশের একটা সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়ে বলল, তিন তলায় উঠে যাও। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ বুকে একটা চমক লাগল। একটা বাংলা গান শোনা যাচ্ছে, তাও লোকগীতি, 'ফান্দেতে পড়িয়া বগা কান্দে রে'! ওপরে এসে দেখি, একটা অ্যাটিকের ছোট ঘরে, খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে কিছু লেখালেখি করছে অ্যালেন, একটা রেকর্ড প্লেয়ারে বাজছে এই গান, পাশের একটা স্টোভের ওপর সসপ্যানে টগবগ করে ফুটছে ভাত। আমাকে দেখে তড়াক করে উঠে এসে সে জড়িয়ে ধরল, সে যেন এক অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের স্পর্শ। মাত্র এক বছর আগে কলকাতায় অ্যালেনের সঙ্গে অনেক সন্ধ্যা যাপন করেছি, তখন আমার আমেরিকায় আসার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, তখন এদেশ ছিল ভূপৃষ্ঠের অন্য দিকে অতি সুদূর। অ্যালেন বারবার বলতে লাগল, প্লেজান্ট সারপ্রাইজ, প্লেজান্ট সারপ্রাইজ!

অ্যালেনের গায়ে মিলিটারি ধরনের পোশাক দেখে প্রথমে খটকা লেগেছিল। হাসতে হাসতে সে জানাল, বাধ্য হয়ে সে এই পোশাক পরিধান করেছে, কারণ, এখন ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকে

রাস্তায় বেরোলে ভবঘুরে মনে করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। ভবঘুরেদের জন্য সরকার তৈরি করেছে অনেক আস্তানা। নতুন জামা-কাপড় কেনার পয়সা নেই, এক বন্ধু সেনাবাহিনীতে ছিল, সদ্য নিহত হয়েছে, তার স্ত্রীর কাছ থেকে এই পোশাকগুলি চেয়ে নিয়েছে অ্যালেন। পিটার পা-জামা পাঞ্জাবি পরে রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে সত্যিই ধরা পড়েছিল, কোনওক্রমে দৌড়ে পালিয়ে বেঁচেছে। তখনও হিপিদের যুগ আসেনি। এরপর হিপিরা পোশাকের সব রীতিনীতি তছনছ করে দেয়। আগে অনেক রেস্তোরাঁতেই সুটের সঙ্গে টাই না থাকলে ঢুকতে দিত না। হিপিদের উত্থানের পর অনেক রেস্তোরাঁ নোটিশ দিয়েছে, খালি গায়ে এবং খালি পায়ে প্রবেশ নিষেধ!

অ্যালেনের রান্না করা ভাত, মুসুরির ডাল সেদ্ধ আর ফুলকপি ভাজা খেয়ে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। প্লাজা হোটেলের অত্যন্ত দামি দামি খাবারের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। সেদ্ধ মুসুরির ডাল কতদিন পর খেলাম, ঠিক যেন অমৃত। আমি আয়ওয়াতে মুসুরির ডাল জোগাড় করতেই পারিনি। এর ইংরেজি যে লেনটিল, তা সেদিনই জানলাম অ্যালেনের কাছ থেকে। অ্যালেন খেতে খেতে বলল, তুমি প্লাজা হোটেল থেকে নিউ ইয়র্ক কিছুই দেখতে, বুঝতে, চিনতে পারবে না, তুমি আমাদের সঙ্গে এসে থাকো। আমিও সেটাই চাই, এত বড় হোটেলে থেকেই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

সসঙ্কোচে পল এঙ্গেলের কাছে এই অনুমতিটি চাইতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। এবং তিনিও খানিকটা সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, তুমি কি অ্যালেন গিন্‌সবার্গ সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে পারো? ওর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের।

দু'জনেই আমেরিকান, দু'জনেই কবি, তবু তাদের চেনাশুনো নেই, এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দেবে একজন বাঙালি কবি? আসলে এই দু'জন দু'দিকের প্রতিনিধি, পল এঙ্গেল অধ্যাপক, অর্থাৎ এস্টাব্লিসমেন্টের অন্তর্গত, আর অ্যালেন গিন্‌সবার্গ বিদ্রোহীদের নেতা। পল এঙ্গেলের কথা শুনে মনে হল, অ্যালেন বুঝি তাঁকে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে দেবে, তাই আমার মতন একজন ঢালের আড়াল দরকার। অ্যালেনকে জানিয়ে পরের সন্ধেতেই পল এঙ্গেলকে নিয়ে গেলাম সেই অষ্টম রাস্তার বইয়ের দোকানের ওপরের তলার ছোট্ট ঘরটিতে। কোনও রকম আক্রমণ বা কটুবাক্য বিনিময় হল না, দু'জনে সহাস্যে হাত মেলালেন। অ্যালেনকে খুশি করার জন্য তার কয়েকটি কবিতার বইয়ের নাম বলে গেলেন পল, সেগুলি তিনি পড়েছেন, এবং কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্ অ্যালেনও পলের লেখাটেখা সম্পর্কে খবর রাখে দেখা গেল। পল যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পৃথিবীর নানান দেশ থেকে তরুণ লেখক-লেখিকাদের এনে সম্মিলিত করছেন আয়ওয়া শহরে, তার প্রশংসা করলো অ্যালেন। পল তখন অ্যালেনকে বললেন, আপনিও সেখানে একবার আসুন না। আপনাকে নিজেদের মধ্যে পেলে বিদেশি লেখক-লেখিকারা উৎসাহিত হবে। অ্যালেন বলল, হ্যাঁ যেতে পারি, অবশ্যই যেতে পারি, একদিন কবিতা পাঠের ব্যবস্থা করুন ওখানে, তার আগে সুনীলকে কিছুদিন ছেড়ে দিন আমাদের কাছে।

পল এঙ্গেল ফিরে গেলেন, আমি কয়েকটা দিনের জন্য রয়ে গেলাম অ্যালেনদের লোয়ার ইস্ট সাইডের এক নতুন আখড়ায়।

চল্লিশ

দেশ ছেড়ে আসবার আগে 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক আমাকে একটি আদেশ দিয়েছিলেন, প্রতি মাসে আমাকে একটি লেখা পাঠাতে হবে। সেই প্রথম কোনও পত্রিকার পক্ষ থেকে লেখার জন্য আমন্ত্রণ পাওয়া, তাও 'দেশ'-এর মতন পত্রিকা, প্রতি সপ্তাহে যে পত্রিকার সূচিপত্র সংবাদপত্রে দেখার সময় বক্ষে দুরু দুরু শুরু হত এবং কোনও সপ্তাহে নিজের নামটি দেখতে পেলে লাফিয়ে ওঠার ইচ্ছে হত। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় মনে হত, শহরের সব লোক জেনে গেছে যে আগামী সপ্তাহে 'দেশ' পত্রিকায় আমার কবিতা ছাপা হচ্ছে এবং সবাই আমাকে দেখছে! এ হেন পত্রিকার স্বয়ং সম্পাদকের আদেশ ও আমন্ত্রণপত্র পাওয়ার সৌভাগ্য সত্ত্বেও আমি লেখা পাঠাইনি। ঠিক কী যে লিখতে হবে তা বুঝতে পারিনি, খবরের কাগজে 'আমেরিকার চিঠি', 'জার্মানির চিঠি' কিংবা 'লন্ডন নোট বুক' জাতীয় লেখা পড়েছি, যাতে সমসাময়িক নানা ঘটনার উল্লেখ থাকে, সে রকম কিছু লিখতে ইচ্ছে করেনি। আমার সাংবাদিকতার কোনও শিক্ষাই ছিল না, আগ্রহও ছিল না। গদ্য লেখা সম্পর্কেই ছিল আলস্যবোধ, এর আগে কয়েকখানা শখের ছোট গল্প ছাড়া লিখেছি শুধু রাশি রাশি ব্যক্তিগত চিঠি। ও না, বরণীয় মানুষ : স্মরণীয় বিচার নামে প্রচুর পড়াশুনো করেও খেটেখুটে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিদের বিচার কাহিনী লিখেছিলাম বটে আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায়, সেই নামে এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েও গেছে আমার প্রথম গদ্যগ্রন্থ। সেসব রচনা অর্থ উপার্জনের জন্য, এখানে সে প্রয়োজন নেই, তা হলে সাময়িক উপকরণ নিয়ে গদ্য লিখে সময় নষ্ট করার কী দরকার, তার বদলে কবিতা লিখলেই হয়!

আমার অনুপস্থিতিতে 'কৃত্তিবাস'-এর ভার নিয়েছিলেন শরৎকুমার ও প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, পত্রিকা আগের চেয়েও আকারে বর্ধিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল নিয়মিত, তার জন্য কবিতা পাঠাতাম। এবং অন্যান্য লিট্‌ল ম্যাগাজিনে। ভয়ে ভয়ে 'দেশ' পত্রিকায় একটি কবিতা পাঠাতেই সাগরদা মৃদু ভর্ৎসনা করে চিঠি দিলেন, তোমার কবিতাটা ছাপছি, কিন্তু গদ্য কোথায়? শেষ পর্যন্ত সাগরদার বকুনির ভয়েই আমি এক বৎসরে কোনওক্রমে দুটি লেখা পাঠিয়েছিলাম, কোনওটাই সংবাদ ঘেঁষা নয়, বরং ভ্রমণমূলক। প্রথমটি, অ্যারিজোনার টুস্‌ন শহরের পাশে দৈত্যাকার ক্যাকটাসবহুল মরুভূমিতে ঘুরতে ঘুরতে আমার ঘুমিয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা, আর দ্বিতীয়টি 'দু' রকম নিউইয়র্ক'। এক দিকে বনেদি পাড়ায় প্লাজা হোটেলের মতন বিলাসবহুল হোটেলে চিত্রতারকা ও ধনকুবেরদের সঙ্গে কয়েকটি দিন যাপন, অন্য দিকে লোয়ার ইস্ট সাইডের মতন গরিব পাড়ায় প্রায় বস্তিবাড়ির মতন অ্যালেন গিনসবার্গের আখড়ায় বেকার, ভবঘুরে ও নেশাখোরদের সঙ্গে সারা দিন-রাত হই-হল্লা ও আড্ডা। 'দেশ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় সেই আমার খানিকটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে গদ্য রচনার শুরু, ভবিষ্যতে এই পত্রিকায় যে আমাকে হাজার হাজার গদ্য-পৃষ্ঠা ভরাতে হবে, তা তখন আমার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না, সে রকম কোনও বাসনাই ছিল না। এতদিন পর হিসেব করে দেখছি, 'দেশ' পত্রিকার ইতিহাসে আমার চেয়ে বেশি গদ্য পৃষ্ঠা আর কোনও লেখক লেখেননি। নিয়তি আর কাকে বলে!

কিছুদিনের জন্য এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে আবার ফিরে আসতাম আয়ওয়া শহরে আমার এক কক্ষের অ্যাপার্টমেন্টে। এর মধ্যে আমার ক্লাসে হাজিরা দেবার দায় ঘুচে গেছে, ইচ্ছে হলে যাই, সে রকম ইচ্ছে প্রায় দিনই হয় না। কিছু বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করে

একটি সংকলন প্রস্তুত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, সেটিও অল্পদিন পরেই পরিত্যক্ত হয়, কারণ আমার সহযোগী হিসেবে যাকে দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে আমার কথায় কথায় মতান্তর হত, সেই যুবকটি ইংরেজির অধ্যাপক এবং হবু কবি, ভারত নামে দেশটি সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না, জানার আগ্রহও ছিল না, আচরণে খানিকটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেত। আমি তাকে গ্রাহ্য করতে যাব কী দুঃখে? অসমাপ্ত হয়ে রইল অনুবাদের কাজ। তাতেও অস্বস্তির কোনও কারণ ঘটেনি, কারণ পল এঙ্গেল বিদেশ থেকে আমন্ত্রিত লেখকদের ওপর কোনও রকম শর্ত চাপানোতে বিশ্বাস করতেন না, তাদের পুরোপুরি স্বাধীনতা দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, কেউ যদি নিয়মিত ক্লাস করে ডিগ্রি নিতে না চায়, অন্য কোনও দায়িত্ব না নিয়ে নিজের ভাষায়, নিজের লেখা নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকতে চায়, তাতেও তিনি খুশি। মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে সন্ধেবেলায় সাহিত্য সভার আয়োজন হত, তাতে তিনি কয়েকজন আমন্ত্রিত লেখকদের নতুন রচনা পাঠ করে শোনাবার অনুরোধ জানাতেন। যার যার নিজস্ব ভাষার রচনা, সম্ভব হলে তার ভাবানুবাদ। এক সন্ধ্যায় একজন স্প্যানিশ কবির কবিতা বিনা অনুবাদে শুনেছিলাম এক ঘণ্টা, প্রায় কিছুই বুঝতে পারিনি অর্থ। তবু অনুভব করেছিলাম, অর্থ না বুঝলেও শব্দের নির্বাচন, শব্দের চাপা ঝংকার শুনতে শুনতেও খানিকটা উদ্দীপ্ত হওয়া যায়।

এইসব দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে আমার হাতে অঢেল সময় এসে গেল, এমনও হয়েছে, আমি দিনের পর দিন ঘর থেকে এক পাও বেরোইনি, বাইরে যেতে গেলেই শার্ট-প্যান্ট, মোজা-জুতো পরতে হয়, বিশেষত মোজা পরার ব্যাপারে আমার খুব আলস্য ছিল, আজও আছে, ঘরের মধ্যে দিব্যি পাজামা-গেঞ্জি পরে, শুয়ে-বসে ইচ্ছেমতন বই পড়া কিংবা লেখালেখি করা যায়। বরাবরই আমার বাড়ির মধ্যে পাজামা পরে থাকা অভ্যেস, আমার বাবা লুঙ্গি পরতেন, আমি কখনও লুঙ্গি ধারণ করিনি। এ দেশে হাফ-প্যান্ট পরেও বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করা যায়, কিন্তু পাজামা পরে নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়ানোও তখন অভব্যতা বলে গণ্য হত। কেউ আমার ঘরের দরজায় টোকা দিলে আমি সন্ত্রস্তভাবে হুড়োহুড়ি করে পাজামা খুলে প্যান্ট-শার্ট পরে নিতাম, শার্টটা আবার প্যান্টের মধ্যে গুঁজে নিতে হয়। যখন তখন দরজায় করাঘাত করে নানারকমের ফেরিওয়ালা, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মেয়ে, একতলা থেকে কোনও প্রয়োজনে আসে আমার পোলিশ বন্ধু ক্রিস্তফ, আর মার্গারিট। একদিন মার্গারিট জিজ্ঞেস করল, তোমার দরজা খুলতে এত দেরি হয় কেন? আমার পাজামা সমস্যার কথা অকপটে তাকে জানালে সে খুব হাসল, পরদিন সে আমার জন্য কিনে আনল একটা তোয়ালের লম্বা ড্রেসিং গাউন। এ দেশে ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়ানো থাকলেই সাত খুন মাপ, তলায় কিছু থাক বা না থাক, সকলের সামনে বেরোনো যায়। আমাদের তৎকালীন বাংলা সিনেমায় সব নায়িকার বাবা ড্রেসিং গাউন পরত, প্রথম দিন সেই ড্রেসিং গাউনটা জড়িয়ে আমার নিজেকেও মনে হচ্ছিল ছবি বিশ্বাসের মতন, হাতে শুধু একটা পাইপ নেই! ড্রেসিং গাউনটা পাবার পর এই সুবিধে হল, সকালে স্নান করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে কিছুই পরি না, দিগম্বর হয়ে ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করলেও তো দেখার কেউ নেই। ড্রেসিং গাউনটা রাখা থাকে চেয়ারের মাথায়। শীতকালেও এখানে এক একদিন ঘর এমন গরম হয়ে যায় যে শরীরে পোশাক রাখতে ইচ্ছে করে না। সেন্ট্রাল হিটিং কমাবার ব্যবস্থা নেই। জানলার বাইরে তুষারপাত হচ্ছে, ভেতরে গরমে ঘামছি।

পোশাক প্রসঙ্গে একদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে। পল এঙ্গেল কিংবা মেরি প্রায়ই আমাকে ওদের বাড়িতে নৈশভোজের জন্য আমন্ত্রণ জানান, তা ছাড়াও পল মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যান কোনও রেস্তোরাঁয়। আমেরিকায় পৃথিবীর সব দেশেরই রেস্তোরাঁ আছে, ইচ্ছে মতন যে কোনও দেশের খাবার খাওয়া যায়। সেইরকমই এক সন্ধ্যায় পল টেলিফোনে জানালেন, তিনি আমাকে একটি নতুন ধরনের রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে চান। আমাকে আধঘণ্টার

মধ্যে তৈরি থাকতে হবে। জুন মাস, সেদিন দারুণ গরম পড়েছে। যে অঞ্চলে শীতকালে রাস্তার পাশে চার ফুট বরফ জমে থাকে, বিশ্বাসই করা যায় না যে সেখানেও গ্রীষ্মকালে অন্তত কয়েকটি দিন গরম অসহ্য হয়। এইসব দিনে আমেরিকান ছেলেরা খালি গায়েও রাস্তায় বেরোয়। কিংবা হাওয়াইয়ান শার্ট। পাতলা কাপড়ের এই ঢলঢলে জামাটি আমেরিকানদেরই অবদান, ইংরেজরা তখনও দু'চক্ষে দেখতে পারত না, কারণ, এই শার্ট গুঁজে পরতে হয় না, সঙ্গে টাই পরারও সুযোগ নেই। আমার পক্ষে এই শার্ট খুব সুবিধেজনক, বেশ রংচঙে দু'তিনখানা কিনেও ফেলেছি। যথারীতি সেই সন্ধেতেও মার্গারিটের সঙ্গে বসে কবিতা পড়ছিলাম, পল এঙ্গেলের ডাক শুনে তাকে ফেলে চলে যেতেই হল। পল আমাদের বাড়ির দরজায় এসে হর্ন দিলেন, আমি নেমে গিয়ে তাঁর গাড়িতে ওঠার পর তিনি বললেন যে পথে তাঁর এক বন্ধুকে তুলে নিয়ে যাবেন।

শহর ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে নিরিবিলি এলাকায় সেই বন্ধুর বাড়ি। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল, তিনি ভেতরে ডেকে নিয়ে বসালেন। তারপর দেখি যে দুই বন্ধুতে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কী যেন আলোচনা করছেন, আর মাঝে মাঝে চোরা চাহনি দিচ্ছেন আমার দিকে। এই রে, আমাকে নিয়ে কোনও সমস্যা হয়েছে নাকি! যে-রেস্তোরাঁয় যেতে চান, সেখানে কালো লোকদের ঢুকতে দেয় না? তা হলে আমি যেতেও চাই না। একটু পরে পল আমার কাছে এসে কাঁচুমাচুভাবে বললেন, সুনীল, আমরা যে রেস্তোরাঁয় যাব বলে ঠিক করেছি, সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং, একটা নদীর প্রায় ওপরেই একটা পরিত্যক্ত পাওয়ার হাউসকে একটুও না বদল করে রেস্তোরাঁ বানানো হয়েছে, সেটা দেখতে যেমন অপূর্ব, তেমনই খাবারের খুব সুনাম। কিন্তু একটা মুশকিল এই, তুমি হাওয়াই শার্ট পরে আছ, সেখানে জ্যাকেট পরে যাওয়া বাধ্যতামূলক। তুমি শার্টের ওপর আমার বন্ধুর একটা জ্যাকেট চাপিয়ে নেবে?

বন্ধুটিও বললেন, তাঁর অনেকগুলি জ্যাকেট আছে, তার কোনও একটা আমার গায়ে ফিট করে যাবে। আমার আপত্তির সুযোগ এল না, দু'জনে মিলে একটার পর একটা জ্যাকেট আমাকে পরিয়ে দেখতে লাগলেন, একটি বেশ মানানসই হয়েও গেল। জ্যাকেট পড়লে শার্টটা ভেতরে গুঁজতেই হয়। আমি বেল্ট পরে আসিনি। শার্ট ভেতরে থাকলে বেল্ট ছাড়া কোমর ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে, সেটা রীতিবহির্ভূতও বটে। আমি সে সমস্যার কথা উত্থাপন করতেই বন্ধুটি দু'তিনটি বেল্টও এনে দিলেন, একটি আমার কোমরে লেগে গেল। সেই অবস্থায় আমাকে দেখে দু'জনে দারুণ হাসতে লাগলেন।

পল এঙ্গেলের এই বন্ধুটির নাম ভ্যান অ্যালেন, তিনি বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী, নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। মহাকাশে তাঁর আবিষ্কৃত একটি বলয়ের নাম ভ্যান অ্যালেন'স বেল্ট। সেই ভ্যান অ্যালেনের বেল্ট আমার কোমরে।

আমার সকাল শুরু হয় চিঠির বাক্স দেখে। ঘুম ভাঙতেই গায়ে ড্রেসিং গাউনটা জড়িয়ে ছুটে যাই নীচে। চিঠির বাক্স প্রতিদিনই ভর্তি থাকে, অথচ চিঠি থাকে না, অর্থাৎ থাকে অনেকগুলি বিজ্ঞাপনের চিঠি, এ দেশে যাকে বলে জাঙ্ক মেইল। কত রকম যে বিজ্ঞাপন। তার ইয়ত্তা নেই, নতুন নতুন সাবান, টুথপেস্ট, ক্রিম, রান্নার তেল ইত্যাদি। বিভিন্ন কোম্পানির ভোগ্যপণ্যের প্রতিযোগিতা। চিঠির সঙ্গে ছোট ছোট নমুনাও থাকে, পেস্ট, সাবান তো বটেই, এমনকী তেলের শিশি পর্যন্ত। আসল চিঠি, অর্থাৎ বন্ধুবান্ধব বা বাড়ির চিঠি যেদিন পাই, সেদিন একখানা চিঠি বারবার পড়েও যেন আশা মেটে না। বাংলা অক্ষরে চিঠির জন্য এত ব্যাকুলতা জীবনে কখনও বোধ করিনি। চিঠি পাবার জন্য আমি প্রথমে এসেই দেশের প্রায় সমস্ত চেনাশুনো মানুষকে আগেই নিজের ঠিকানা জানিয়ে একটা করে চিঠি লিখে পাঠিয়েছি, তারপর মনে মনে এক এক জনের কাছ থেকে উত্তর পাবার দিন হিসেব করি। হিসেব মেলে না, দিনের পর দিন পেরিয়ে যায়, তারপর এক একজন সম্পর্কে আশা ছেড়ে দিলে অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন উত্তর আসে।

শক্তি ও সন্দীপনের সঙ্গে আমার সাময়িক মনোমালিন্য কেটে গেছে, ওরাও নিয়মিত লেখে। এরোগ্রামের চিঠিই সবচেয়ে শস্তা, আর সবচেয়ে বেশি সদ্ব্যবহার করতে জানে সন্দীপন। সে প্রথমে কালি দিয়ে লিখে পুরো জায়গাটা ভরিয়ে ফেলে, তারপর তারই ওপর দিয়ে আবার লেখে পেন্সিলে। অর্থাৎ একই কাগজে দু'খানা চিঠি। কালিতে লেখা ও পেন্সিলের লেখার জন্য সন্দীপনের ভাষাও আলাদা হয়ে যায়। শক্তির চিঠিতে লেগে থাকে বিষাদের সুর, যা শক্তির ব্যবহারের সঙ্গে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মুখের কথার মানুষ আর চিঠির মানুষ প্রায়ই আলাদা হয়। সবচেয়ে মজার কথা লিখেছিল দিলীপ দত্ত, বন্ধুদের মধ্যে তার বিয়ে হয়েছিল একেবারে প্রথম, তার স্ত্রী প্রভাতী ছিল আমাদের সকলেরই বান্ধবীর মতন, আমরা বেকার থাকার সময় ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে গিয়েছিল দিলীপ, তার বাড়িতে প্রায়ই আড্ডা হত, অন্দরমহল থেকে আসত গরম গরম কচুরি ও মোহনভোগ। সেই দিলীপ লিখল, তুমি চলে যাবার পর অন্য বন্ধুরাও আর আসে না, আড্ডা জমে না, প্রায়ই সন্ধেবেলা মনে হয় কী করি, কী করি, তাই ভাবছি কিছুদিনের জন্য পাগল হয়ে যাব! পাগল হলে আর আড্ডার কথা ভাবতে হবে না।

চিঠিতেই জানলাম, সন্দীপন বিয়ে করতে চলেছে। বিদেশে আসার আগের কয়েকটা বছর শক্তি, সন্দীপন, শরৎকুমার, ভাস্কর ও আমি এই পাঁচজন ছিলাম প্রায় প্রতিদিনের নিত্যসঙ্গী, রাজদ্বারে কিংবা শ্মশানে পাশাপাশি। এই ইনার সার্কেলের মধ্যে সন্দীপন প্রথম বিয়ে করে। প্রথম খবরটা পড়ে মনে হয়েছিল, ও যেন আমাদের এই ঘনিষ্ঠ দল থেকে বেরিয়ে গেল! বিয়ের পর কি আর বন্ধুদের জন্য আগের মতন সময় দেওয়া যায়! তারপরই এল ভাস্করের বিয়ের চিঠি। তিরিশ বছরে পা দিয়ে একে একে প্রবেশ করছে সংসারে। তারাপদ রায়ের বিয়ে ও সেই সংক্রান্ত অনেক মজার গল্পও অন্যরা জানাল চিঠিতে।

আমি তখনও বিয়ের ব্যাপারটা চিন্তাই করতে পারিনি। একটি মেয়ের সঙ্গে জীবনটা জড়িয়ে ফেলা যেন এক অন্য জগতে প্রবেশ করার মতন, সেই জগতের সামনে দুলছে একটা রহস্যময় পর্দা, সেই পর্দাটা সরিয়ে সবটা দেখে নিতে কেমন যেন গা ছমছম করে। যেমন আছি, বেশ তো আছি, এরকমই মনে হয়।

মার্গারিটের সঙ্গে ভাব গাঢ় হবার পরেই ও নিজেই একদিন কাচুমাচু মুখে বলেছিল যে, প্রেম হলেও ও কিছুতেই আমাকে বিয়ে করতে পারবে না। ওর বাবা-মা বেঁচে আছেন, ওদের পরিবার গোঁড়া ক্যাথলিক, ওর এক বোন সন্ন্যাসিনী হয়ে কনভেন্টে থাকে, মার্গারিটের নিজের ধর্মীয় গোঁড়ামি নেই, কিন্তু সে একজন হিন্দুকে বিয়ে করলে ওঁর পরিবার কিছুতেই তা মেনে নিতে পারবে না, বিশেষত ওর মা হয়তো মনের আঘাতে প্রায়োপবেশনে বসবেন! বিয়ে না করেও আমি কি মার্গারিটের বন্ধু থাকতে রাজি আছি?

সে কথা শুনে বিন্দুমাত্র আঘাত পাবার বদলে আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছিল। বিয়ের জন্য আমি তখন একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না, বিয়ের প্রশ্ন উঠলে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বজায় রাখা সম্ভব হত না। মার্গারিট সরল মেয়ে বলেই ওকে আমার অবস্থাটাও জানিয়ে দিলাম অকপটে। আমি গরিব পরিবারের ছেলে, চিরদিন আমেরিকায় থাকব বলে আসিনি, মা-ভাই-বোনদের সংসারেই ফিরে যেতে হবে, দু'খানা ঘরের সেই নাগেরবাজারের ফ্ল্যাটে হঠাৎ মেম-বউ নিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। দু'জনের দিক থেকেই এই খোলাখুলি আলোচনার পর আমাদের সম্পর্কটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

মার্গারিটের কাছ থেকে আমি যে ফরাসি সাহিত্যের অনেক কিছু জেনেছি তাই-ই নয়, পাশ্চাত্য সঙ্গীতেরও দীক্ষা নিয়েছি। দেশে থাকতে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্পর্কে আমার আগ্রহ জন্মেছিল, রাত জেগে জেগে গান-বাজনা শুনে খানিকটা কান তৈরি হয়েছিল, কিন্তু ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল মিউজিক সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। বিথোভেন, মোৎসার্ট, বাখ প্রমুখদের শুধু নামই শুনেছি। মার্গারিটের একটা সেকেন্ড হ্যান্ড রেকর্ড প্লেয়ার ছিল, সেটা নিয়ে

এল আমার ঘরে, পুরনো রেকর্ড কিনে এনে সে আমাকে শোনাত কোনটা নাইন্থ সিম্ফনি, কোনটা ব্লু ড্যানিউব। কনসার্ট আর চেম্বার মিউজিকের তফাত। সব আমি বুঝিনি, কিন্তু সত্যিকারের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটা মর্মস্পর্শী আবেদন থাকেই। রেকর্ডে নাইন্থ সিম্ফনি বাজছে, আমরা হয়তো তা মন দিয়ে শুনছি না, অন্য কথা বলছি কিংবা কবিতা পড়ছি, কিন্তু ওই সঙ্গীতের আবহে মন অনেক বেশি সংবেদনশীল হয়ে যায়।

মুখ বদলাবার জন্য মাঝে মাঝে আমরা শুনতাম আমেরিকান লোকসঙ্গীত কিংবা নিগ্রো ব্লুজ। কিছু কিছু ফরাসি লোকসঙ্গীতও মার্গারিট শোনাত, সবটা মানে না বুঝলেও তার দু'-একটি আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কালো লোকদের একটা গান ছিল, 'গুডনাইট আইরিন'। সে গানটা নিয়ে মাঝে মাঝে মজা হত বেশ।

পরপর কয়েকদিন ঘরের মধ্যে বসে কবিতা পাঠ, মদ্যপান, রান্নাবান্না, হাসি-গল্পের পর একদিন হঠাৎ মনে হত, বাইরে টাটকা বাতাসে নিশ্বাস নেওয়া দরকার। আবহাওয়া ভালো থাকলে ইচ্ছে হত কিছু পয়সা খরচ করতে। সে রাতে আর রান্নাবান্নার ঝামেলা নয়, পানাহার হবে কোনও পাবে। এরকম বিশ্ববিদ্যালয়ের শহরের পাবে কত জাতের ছেলেমেয়ে, কত বিচিত্র পোশাক, কত রকম রঙ্গ। সকলের ভাষা প্রধানত ইংরেজি হলেও কেউ কেউ মাঝে মাঝে গান গেয়ে ওঠে নিজের ভাষায়। পাশের ছেলেমেয়েরাই অনুরোধ করে, তোমার ভাষায় একটা গান শোনাও! আমাকেও বাজখাঁই হেঁড়ে গলায় দু'-একবার বাংলা গান গাইতে হয়েছে।

সেই পাবে বিয়ার সার্ভ করে একটি ফুট ফুটে ফর্সা তরুণী, কুড়ির বেশি বয়েস নয়, সে সকলের সঙ্গে হাসি-মস্করায় যোগ দেয় বটে, আবার পয়সার হিসেবেও বেশ টনটনে। রাত এগারোটা বেজে গেলেই সে সকলকে ওঠার জন্য তাড়া দেয়, কারও কারও হাত থেকে বিয়ার মাগ কেড়ে নেয়, তার ডিউটি শেষ, তাকেও তো বাড়ি যেতে হবে! মেয়েটির নাম আইরিন, সবাই শেষবেলায় তাকে অনুরোধ করে আর একটু থাকতে দাও আইরিন, আর এক পাত্তর চুমুক দিতে দাও! একদিন সে আমার কাছে এসে তাড়া দিতেই আমি পূর্ব পরিচিত গানটি গেয়ে উঠলাম :

> গুডনাইট আইরিন
> গুডনাইট আইরিন, গুডনাইট আইরিন
> আই উইল সি ইু ইন মাই ড্রিম...

এই গানটা আরও অনেকে জানে, সবাই গেয়ে উঠল সমস্বরে। সকলের বিয়ারের পাত্র আইরিনের দিকে তোলা।

একটি পানশালার পরিচারিকা, সারাদিন খেটেখুটে ক্লান্ত, এখন অনেকগুলি যুবক তাকে বন্দনা করছে, গানের মধ্য দিয়ে বলছে, তোমাকে আজ স্বপ্নের মধ্যে দেখব। লজ্জায় যেন কুঁকড়ে গেল তার শরীর, মুখখানা হয়ে গেল অরুণবর্ণ, দেখতে দেখতে যেন সে হয়ে উঠল এক রাজকন্যা। তারপর দু' হাত তুলে, আর সব কিছু ভুলে, বিভোর হয়ে শুরু করল নাচ।

একচল্লিশ

আমেরিকা প্রবাসে বৎসর ঘুরতে না-ঘুরতে আমার জীবনে একটি নতুন সঙ্কট দেখা দেয়। খুবই কঠিন সঙ্কট।

আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রাইটার্স ওয়ার্কশপের মেয়াদ ছিল ন' মাস। আমার সতীর্থ অন্যান্য দেশের বেশ কয়েকজন লেখক-লেখিকা তারপরেও এ দেশে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত ও বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। বেশি আগ্রহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির লেখক-লেখিকাদের। নিজেদের দেশের পরিবেশ তাদের একেবারেই পছন্দ নয়। পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়ার কয়েকজন লেখকের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল, ওই সব দেশের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পরিবেশ সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই বন্ধুদের কথা শুনে বুঝেছিলাম, সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত হিসেবে এসব দেশে সমান অধিকার স্বীকৃত হলেও মূল রাশিয়ানরা এ দেশগুলিকে কলোনির মতন মনে করে, রুশ ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বাধ্যতামূলকভাবে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছোট ছোট দেশগুলির নিজস্ব ভাষা। পোল্যান্ডের লেখক ক্রিস্তফ আমার সবচেয়ে কাছাকাছি প্রতিবেশী, তার সমস্ত তির্যক রসিকতাই রুশ বিরোধী। সে অবশ্য জানিয়েছিল, নিজের দেশে এসব রসিকতা প্রকাশ্যে বলাবলি করার উপায় নেই, সব সময় গুপ্তচরদের খপ্পরে পড়ার ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। ক্রিস্তফের বয়স আমার চেয়ে অনেকটাই বেশি, বিবাহিত, তার স্ত্রীর ছবি দেখিয়েছে কয়েকবার, কিছু একটা কৌশলে সে তার স্ত্রীকেও আনিয়ে নিল আমেরিকায় এবং তারপরই দু'জনে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইল।

রোমানিয়ার এক তরুণী লেখিকা এর মধ্যে বিয়ে করে ফেলল একজন আমেরিকান ফুটবল খেলোয়াড়কে। আরও দু'জন লেখকের বিয়ে হয়ে গেল এই ন' মাসের মধ্যে, আমেরিকান নাগরিককে বিয়ে করে ফেলাই এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায়। কিছুদিন পর সে বিয়ে ভেঙে গেলেও অধিকারটা চলে যায় না। এই জন্য অনেক নকল বিয়েও হয়, পরে জেনেছি।

অবশ্য বিয়ে না করেও থেকে যাবার অনেক উপায় আছে। সেই ষাটের দশকের গোড়ায় এ দেশে ইমিগ্রেশানের তেমন কড়াকড়ি ছিল না, অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সুদৃঢ়, চাকরি-বাকরির সম্ভাবনা অঢেল। ভিসা পাওয়া যেত পাঁচ বছরের, অনেকেই পাঁচ বছর পর্যন্ত থেকে জীবিকা অর্জন করে, কিছু টাকাপয়সা জমিয়ে চলে যেত কানাডায়। তখন কানাডায় ভারতীয়দের ভিসাই লাগত না (তখন পর্যন্ত ভারতীয় পাসপোর্টের যথেষ্ট সম্মান ছিল, এখনকার মতন এমন হেনস্থা সহ্য করতে হত না, সুইডেন, উভয় জার্মানি, এমনকী ইংল্যান্ডেও ভিসার প্রয়োজন হত না। মাস ছয়েক কানাডায় কাটিয়ে আবার আমেরিকায় প্রবেশ করলে পাওয়া যেত আরও পাঁচ বছরের ভিসা। তারই মধ্যে গ্রিন কার্ড কিংবা নাগরিকত্বেরও ব্যবস্থা হয়ে যেত।

অনেকেই থেকে যাবার ব্যবস্থা করছে, আমি কী করব?

ততদিনে কিছু কিছু আসবাব, বইপত্র, থালা-বাসন, কম্বল-বালিশের মতন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে রীতিমতো সংসার পেতে বসেছি। মার্গারিট ও আমার যৌথ সংসার বলা যেতে পারে, একবেলা আমি রান্না করি, অন্য বেলা সে, চাটু-সসপ্যান মাজা, ঘর ঝাঁড় দেওয়ার কাজও ভাগাভাগি। দু'জনেরই টাকাপয়সা থাকে এক ড্রয়ারে, ইচ্ছে মতন খরচ হয়, মাসের শেষে ফুরিয়ে গেলে ধার করি ক্রিস্তফের কাছ থেকে। এর মধ্যে এরিক নামে একটি ছেলে আমাকে

জোর করে গাড়ি চালানো শেখানোর জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল। ও দেশে গাড়ি চালাতে না জানা মানে প্রায় পঙ্গুর মতন অবস্থা, সব কিছুরই দূরত্ব এত বেশি, পাবলিক ট্রান্সপোর্টও ব্যয়বহুল, পোস্টম্যানরাও নিজস্ব গাড়ি চালিয়ে চিঠি বিলি করে। এরিক আমার শুভার্থী সেজে আমাকে তার গাড়িতে তুলে স্টিয়ারিঙে বসাত। এতে তার একটা স্বার্থপর মতলবও ছিল। সে তার পুরনো ঝরঝরে ফোর্ড গাড়িটা (এ দেশে এই ধরনের গাড়িকে বলে জ্যালোপি) আমাকে বিক্রি করতে চায়। যে গাড়ি চালাতেই জানে না, সে গাড়ি কিনবে কেন? পুরনো গাড়ি এক দারুণ সমস্যার ব্যাপার। এ দেশের মানুষের ঝোঁক নতুন নতুন মডেলের গাড়ি ব্যবহার করা, চাঙ্গা অর্থনীতিতে তার সুযোগও প্রচুর, গাড়ি কেনার পুরো টাকা ঋণ দেবার জন্য ব্যাঙ্কগুলি মুখিয়ে আছে, কিন্তু পুরনো গাড়িটি বর্জন করাই প্রধান বাধা। সেই সময় বেশি পুরনো গাড়ি, সেকেন্ড হ্যান্ড বা থার্ড হ্যান্ড, বিক্রি করা একরকম অসম্ভবই ছিল (এখন সে অবস্থা বদলে গেছে)। পুরনো গাড়ি কোনও জায়গায় ফেলে রাখারও নিয়ম নেই। কেউ কেউ চুপি চুপি গাড়িটা চালিয়ে কোনও পাহাড়ের ওপর নিয়ে গিয়ে রাত্রিরবেলা ফেলে দিত খাদে। সেটাও বে-আইনি। পুলিশ ঠিক গাড়ির মালিককে খুঁজে বার করে শাস্তি দেয়। আইনসম্মতভাবে পুরনো গাড়ি বাতিল করার একমাত্র উপায় অটোমোবিল গ্রেভইয়ার্ড অর্থাৎ গাড়ির কবরখানায় সেটি পাঠিয়ে দেওয়া। কবরখানার জমি যেমন কিনতে হয়, তেমনি বাতিল, অব্যবহৃত গাড়ি রাখার জন্যও দিতে হয় কিছু টাকা। সেই গাড়ির কবরখানার দৃশ্যও মনে রাখবার মতন, শত শত বিখ্যাত কোম্পানির গাড়ি নীরব, নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে এক জায়গায়, তাদের চেহারা কিন্তু মোটেই মলিন, রংচটা নয়, মৃত বা মুমূর্ষু বলে মনেও হয় না, ইচ্ছে করলে যে-কোনও মুহূর্তেই আবার গড়গড়িয়ে চালানো যেতে পারে। আমাদের কলকাতায় ওদের চেয়ে অনেক পুরনো, রুগ্ণ, লঝ্ঝরে গাড়ি চলে স্বচ্ছন্দে, অবশ্য কলকাতায় মোটর গ্যারেজের মিস্তিরিরা, এমন কি ছেঁড়া গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট-পরা বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা যে-রকম কৃতিত্বের সঙ্গে মেরামত করে এক একটা মুমূর্ষু গাড়িকেও সজীব করে দেয়, সে জ্ঞান তো আমেরিকান মিস্তিরিদের নেই। ওখানকার মিস্তিরিরা সুট-টাই পরে, তাদেরও নিজস্ব গাড়ি আছে, তাই যে-কোনও গাড়ি মেরামতের জন্য হাত ছোঁয়ালেই অনেক টাকা হাঁকে।

এরিক আমাকে ওর ফোর্ড গাড়িটা বিক্রি করতে চেয়েছিল তিরিশ ডলারে। তখনকার টাকার হিসেবেও দেড়শো টাকা। মাত্র দেড়শো টাকায় একটা চালু গাড়ি?

অর্থাৎ আমার নিজস্ব সুসজ্জিত ফ্ল্যাট, ফর্সা বান্ধবী এবং গাড়ির মালিক, আমার আর আমেরিকান হয়ে যেতে বাকি রইল কী? এসব ছেড়ে ধুলো-ধোঁওয়া-আবর্জনায় ভরা, ভেজাল খাদ্য ও রোগভোগ, বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের মধ্যে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কোনও যুক্তি আছে কি?

অনেকেই ধরে নিয়েছিল, আমি থেকে যাচ্ছি। আমি পল এঙ্গেলের বিশেষ স্নেহধন্য, সেজন্য সতীর্থদের মধ্যে কারও কারও কিছুটা ঈর্ষা ছিল, তারা বলতে লাগল, তোমার আর চিন্তা কী, পল তোমার জন্য সব ব্যবস্থা করে দেবেন। সত্যিই তাই, পল এঙ্গেল একদিন বললেন, তোমার বাড়িওয়ালাকে বলেছি, তোমার ফ্ল্যাটের লিজ আরও এক বছর বাড়িয়ে দিতে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে তোমার একটা চাকরিরও ব্যবস্থা হয়েছে, এখনকার স্কলারশিপের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি পাবে। কাজটা মোটেই শক্ত নয়, সময় পাবে অনেক, ইচ্ছেমতন পড়াশুনো করতে পারবে, লিখতেও পারবে!

তখনই কোনও উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে এক কোণে দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ। একেবারে স্থির, নিষ্কম্প, কাষ্ঠপুত্তলিবৎ। পলক পর্যন্ত পড়ছিল না চোখের, অথচ ঝড় বইছিল মনের মধ্যে। আমি আমেরিকায় থেকে যাব, সে জন্য কি এসেছিলাম? ভ্রমণে আমার প্রাণের টান, গিয়েছি কত পাহাড়চূড়ায়, সমুদ্রতীরে, গহন অরণ্যে, কত অপরূপ সুন্দর

স্থানে, কোথাও তো আমার বেশিদিন থেকে যাবার বাসনা হয়নি। কলকাতার চেনা পরিবেশ, রাত্তিরে নিজের বিছানার পুরনো বালিশ আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। এখানে যতই সুখ থাক, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা থাক, প্রমোদ থাক, তবু সে সবের মোহে আমি বাঁধা পড়ে যাব?

যুক্তি দিয়ে বিচার করলে অবশ্য ফিরে যাওয়াটা মূর্খের গোঁয়ার্তুমির মতনই মনে হবে। লাইব্রেরিতে চাকরি নিলে প্রতি মাসে অনেক বেশি টাকা পাঠাতে পারব মা, ভাই-বোনদের জন্য। জীবিকা অর্জনের জন্য অনেক ছেলেই তো প্রবাসে কিংবা বিদেশে থাকে। এখানে আমার পড়াশুনোর সুযোগ অনেক বেশি, বিশাল গ্রন্থাগারটি আমার খুব প্রিয় স্থান, একবার ঢুকলে আর বেরোতেই ইচ্ছে করে না। কলকাতায় ফিরে গেলে আমি কী পাব? পড়ব এক ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তার মধ্যে। সরকারি চাকরি থেকে বিনা অনুমতিতে পালিয়ে এসেছি, সে চাকরি তো নেই-ই, বরং উল্টে হয়তো শাস্তি পেতে হতে পারে। অন্য কোনও চাকরির জন্য আবার দাঁড়াতে হবে কত শত ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে? সংসার খরচ জুটবে কোথা থেকে? বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আমার শূন্যস্থানটাও কি ফিরে পাওয়া সম্ভব? খাঁচার বাঘ কোনও ক্রমে জঙ্গলে ফিরে গেলে অন্য বাঘেরা আর তার গায়ের গন্ধ পছন্দ করে না। আমার গায়ে আমেরিকান গন্ধ পেয়ে যদি বন্ধুরা নাক সিঁটকোয়?

এরই মধ্যে আর একবার গিয়েছিলাম ইন্ডিয়ানায় ব্লুমিংটন শহরে প্রতিভা বসু-বুদ্ধদেব বসুর কাছে। ওঁদের ছেলে শুদ্ধশীল অর্থাৎ পাপ্পা কয়েকবার এসে থেকে গেছে আমার কাছে। পাপ্পা আমায় খুব ভালোবাসত, কলকাতাতেও আমার সাহচর্য তার খুব পছন্দ ছিল, তার বুদ্ধিদীপ্ত, সরস কথাবার্তায় আমিও মুগ্ধ ছিলাম। আয়ওয়ায় এসে মার্গারিটের সঙ্গেও বেশ ভাব হয়েছিল পাপ্পার। এমনও হয়েছে, পাপ্পারই অনুরোধে একই বিছানায় তিনজন পাশাপাশি শুয়ে গল্প করেছি সারা রাত।

পাপ্পা ঘন ঘন টেলিফোন করত। তার ডাকেই আবার গিয়েছিলাম ব্লুমিংটন। দময়ন্তী অর্থাৎ রুমি সম্ভবত ততদিনে চলে গিয়েছিল অন্য বাড়িতে। প্রতিভা বসুর কাছাকাছি এলেই অনুভব করতাম একটা স্নেহের তরঙ্গ। আমার মা প্রতিভা বসুর রচনার ভক্ত ছিলেন, দু'জনে প্রায় একই বয়সি। আমি যে লাইব্রেরি থেকে মায়ের জন্য এনে দেওয়া প্রতিভা বসুর সবগুলি বইই পড়েছি, তা জেনে তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন। আর বুদ্ধদেব বসুর কাছে বসে তাঁর প্রতিটি কথা শোনার সময়ই আমি হয়ে উঠতাম শ্রুতিধর। যেন একটি শব্দও হারিয়ে না যায়, সব লিপিবদ্ধ হয়ে যেত মনে মনে।

বুদ্ধদেব বসুর কাছে পরামর্শ চেয়েছিলাম, পল এঙ্গেল আমাকে থেকে যেতে বলছেন, আমার কি থেকে যাওয়াই উচিত? একটুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বলেছিলেন, যখন সুযোগ আছে, পাকাপাকি না হোক, তুমি আরও কয়েকটা বছর অন্তত থেকে যেতে পারো। কলকাতায় ফিরে আবার কেরানির চাকরি করবে? এ দেশে চার-পাঁচ বছর কাটিয়ে ফিরলে দেখবে দেশে তোমার কদর বেড়ে যাবে। এখানে নানারকম কোর্স আছে, পড়াশুনো করে তোমার যোগ্যতা বাড়িয়ে নিতে পারো। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব কিংবা সাহিত্য যদি পড়ে নাও, তা হলে দেশের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ পেতে অসুবিধে হবে না। এ দেশে থেকেও লেখালেখি করতে পারো, অমিয়বাবু (চক্রবর্তী) যেমন করছেন।

বুদ্ধিভ্রংশ হলে গুরুবাক্যও মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। আমারও বোধহয় সে রকমই অবস্থা হয়েছিল, আমি ওঁর পরামর্শ শুনেও নিঃসংশয় হতে পারিনি। পাকাপাকি থাকা আর কয়েক বছর বসবাসে ডিগ্রি ও অর্থ উপার্জন করে নেওয়ার তফাত আছে বটে, কিন্তু কয়েক বছরের চিন্তাটাই একটা দারুণ ফাঁদ। সুজিত নামে একটি ছেলে আমাকে বলেছিল, প্রথম এক বছরে অনেকেরই ফিরে যাবার একটা তীব্র ইচ্ছে কিংবা আদর্শবোধ থাকে, তারপর দু'-তিন বছর কেটে গেলে সেই তীব্রতা মিলিয়ে যায়, তখন অনেক রকম উল্টো যুক্তি মাথায় আসে।

অনেককেই তো এ রকম দেখছি! আপনি মশাই কয়েকটা বছর থাকুন, ফ্ল্যাটের বদলে আপনার নিজস্ব বাড়ি হবে। মেম বউ হবে, দু'-তিনটে ফরসা ফর্সা ছেলেমেয়ের বাবা হবেন, রবিবার আপনি শর্টস পরে নিজের বাগানের ঘাস ছাঁটবেন, দু'-একটা ফুটফুটে বাচ্চা ড্যাডি ড্যাডি বলে দৌড়োবে আপনার চার পাশে, এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আমার যেমন হয়েছে!

সে দৃশ্য কল্পনা করেই আমি শিউরে উঠেছিলাম। আমার ড্রয়ারে একটি গোলাকার পৃথিবীব্যাপী বিমানের টিকিট ছিল। অর্থাৎ আমাকে যে টিকিটটি দেওয়া হয়েছিল, তা দিয়ে আমি পৃথিবীর যে-কোনও দেশে যেতে পারি। কিন্তু টিকিটটির মেয়াদ এক বছর। সে সময়সীমা উত্তীর্ণ হলেই টিকিট বাতিল হয়ে যাবে, তখন আমায় নিজের পয়সায় কাটতে হবে নতুন টিকিট। সে পয়সা উপার্জন করতে হলে আমাকে বাধ্য হয়ে নিতেই হবে চাকরি। তারপর যদি আবার মত বদলায়। চাকরি নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তো টিকিট কেটে পালানো যায় না।

কিছুতেই মনস্থির করতে পারি না। সেই অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা যেন ভেতরে ভেতরে রক্তক্ষরণের মতন। এই সিদ্ধান্তের ওপর আমার জীবনের গতি নির্ভর করছে। ঝোঁকের মাথায় যদি ফিরে যাই, ফিরে গিয়ে যদি বিপদের মধ্যে পড়ি, অর্থ উপার্জনের কোনও পথ না পেলে যদি আমাদের পুরো পরিবারটিই অনাহারের সম্মুখীন হয়, তখন তো আর এখানে ফিরেও আসা যাবে না। অর্থচিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া খুব বড় ব্যাপার, এখানে থাকলে সে দুশ্চিন্তা আর থাকবে না, বরং আমাদের কলকাতার সংসারেও সচ্ছলতা আসবে। কিন্তু তার বিনিময়ে আমাকে কী মূল্য দিতে হবে? কলকাতা আর আয়ওয়া শহর পৃথিবীর ঠিক বিপরীত দুই গোলার্ধে, দু'দিকের জীবনও দু'রকম, আমি কোনটা বেছে নেব? এ সিদ্ধান্ত নেওয়া কি সহজ!

অনেকেই হয়তো ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক কিছু পরিকল্পনা করে রাখে, কিছু ছক কষা থাকে, থাকে কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আমার সেরকম কিছুই ছিল না। শুধু বর্তমান নিয়ে বাঁচা। আমেরিকায় আসার সুযোগ পেয়ে উৎফুল্ল হয়েছিলাম খুবই, কিন্তু তারপর বাকি জীবনটা কীভাবে কাটাব ভাবিনি। অনেকে মিলে যখন বোঝাতে লাগল, আমার পক্ষে এ দেশে থেকে উপার্জনের পথ নিশ্চিন্ত করাই সবদিক থেকে যুক্তিসঙ্গত, তখন সেই যুক্তির বাঁধুনিতেও আমার যেন হাঁপ ধরে যেতে লাগল। একদিন দুপুরে স্নান করে বেরিয়ে এসে নিরাবরণ অবস্থায় প্রমাণ সাইজের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমার ঠিক কী করা উচিত বলো তো? আয়নার প্রতিবিম্ব সবসময় উল্টো হয়, ডানদিক চলে যায় বাঁদিকে, তার ব্যবহারও কি অন্যরকম হতে পারে না?

মনে হল যেন আয়নায় প্রতিবিম্ব মুচকি মুচকি হাসছে, যেন আমার দ্বিধা, সংশয় ও অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা দেখে সে বেশ মজা পেয়েছে। এক ধমক লাগিয়ে বললাম, হাসির কী আছে? উত্তর দাও! তখন সেই প্রতিবিম্ব বলল, আগে ঠিক করো, তুমি কীসে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাও? মানুষ তো শুধু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধানেই বাঁচে না, বাঁচে ব্যক্তিগত সিদ্ধির আনন্দের জন্য!

কীসে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাওয়া যায়, এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও তো সহজ নয়। ব্যক্তিভেদে আলাদা আলাদা। যোদ্ধার চরম আনন্দ যুদ্ধজয়ে, সন্ন্যাসীর আনন্দ ত্যাগে। আমি তার কোনওটাই নই। আমার আনন্দের তীব্রতা এক এক সময় এক এক রকম! একবার ভুটান সীমান্তে একটা পাহাড়ি নদীতে স্নান করে এমন আনন্দ হয়েছিল, যেন তা কোনও রমণী সম্ভোগের চেয়েও বেশি। আমাকে চিন্তাকুল দেখে আয়নার মূর্তিটিই বলল, আমি তো দেখি, যখন ঘরে আর কেউ থাকে না, তোমার বান্ধবীও না, মধ্যরাতে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে তুমি বাংলায় কিছু কিছু লেখালেখি করো, তখন তোমার মুখে চোখে যে তীব্রতা ফুটে ওঠে, উচ্চাঙ্গের মদ্যপানের সময়, সুস্বাদুতম খাদ্য আস্বাদনে কিংবা বান্ধবী সংসর্গেও সেরকমটি হয় না। ওই সব লেখালেখি করে কী লাভ, তা জানি না, তবে সবচেয়ে বেশি আনন্দ যে পাও, তাতে কোনও

সন্দেহ নেই। ওইটুকু আনন্দ নিয়েই জীবন কাটানো উচিত। কী, কী বলতে চাইছ, এখানে থেকেও লেখালেখি করা যায়? মূর্খ, যদি বাংলাতেই লিখতে চাও, তা হলে ফিরে যেতে হবে তোমার নিজের মাটিতে, যেখানে তোমার শিকড়, যেখানকার মানুষ তোমার ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার অবিরাম বদল চলে সূক্ষ্মভাবে।

সেই দুপুরবেলাই আমার চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল। একথা তো ঠিকই, একটা কবিতা লিখে ফেলতে পারলে যে-রকম রোমাঞ্চ হয়, কোনও কিছুর সঙ্গেই তার তুলনা চলে না। বাংলা ভাষায় লিখতে হলে যেতেই হবে বাংলার পরিমণ্ডলে। অমিয় চক্রবর্তীর মতন প্রখ্যাত কবি বহুদিন আমেরিকাবাসী, তাঁর বিদেশিনী স্ত্রী, এখনও কবিতা লিখছেন, কিন্তু ইদানীংকার কবিতাগুলি নিরামিষ মনে হয় না? ভাব চমৎকার, কিন্তু ভাষায় যেন দাঁত নেই। কিংবা গুরু আছে, চণ্ডাল নেই। সাহিত্যের ভাষায় ওদুটিকে মেলাতেই হয়।

আমার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সাহিত্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই। নিজের সম্পর্কে আমি কোনও ভুল ধারণা পোষণ করি না। আমি খুব ভালোভাবেই জানি, আমি লেখা বন্ধ করে দিলে বাংলা সাহিত্যের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না, কিছু বন্ধুবান্ধব ছাড়া কেউ লক্ষই করবে না। আমার মতন শত শত তরুণ কবিতা লেখার চেষ্টা করছে, তাদের মধ্যে অনেকেই হারিয়ে যায়, আমারই চেনা কয়েকজন ঝকঝকে ভাষা নিয়ে লিখতে এসেছিল, তারপর চলে গেছে ব্যস্ত জীবিকায়; সম্পর্ক ত্যাগ করেছে সাহিত্যের সঙ্গে। ক্রিকেট খেলায় বলে, দে অলসো র‍্যান, শারদীয় সংখ্যার সূচিপত্রে কয়েকজন কবির নামের পরে থাকে ইত্যাদি (এখন লেখা হয় প্রমুখ)। আমি কিছুদিন হয়তো ওই ইত্যাদির দলে থেকে তারপর হারিয়ে যাব দেশে ফিরে, তাতেও কিছু যায় আসে না, আপাতত আমার লেখালেখির বাসনা প্রবল, সে লেখা সার্থক হোক বা না হোক, রোমাঞ্চটাই সবচেয়ে উপভোগ্য। তা ছাড়া দেশে ফিরে গেলে যে অনিশ্চয়তার ঝুঁকি আছে, সেটাও যেন চ্যালেঞ্জের মতন, এর আগেও তো অনেক ঝুঁকি নিয়েছি, আমার মধ্যে খানিকটা জুয়াড়ি প্রবৃত্তি তো রয়েছেই, মৃত্যুর সঙ্গেও জুয়া খেলিনি কি?

ফ্রিজ খুলে দেখলাম, নানাবিধ মাংস ও অন্যান্য সুখাদ্য রয়েছে। কাবার্ডে অনেক রকম সুরার বোতল সাজানো, ঘরে ছড়িয়ে আছে মার্গারিটের ব্যবহার্য নানারকম জিনিসপত্র, সে সবের দিকে তাকিয়েও আমার মন দুর্বল হল না, বরং সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার জন্য শরীরটা বেশ হালকা বোধ হল।

যুক্তির চেয়েও আবেগ অনেক সময়ই প্রবল হয়। আমার এই মন ঠিক করাও আবেগের ব্যাপার। আবেগও নানারকম হয়, অন্য এক ধরনের আবেগের কেন্দ্রে রয়েছে মার্গারিট নামের তরুণীটি। সে তখন ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়েছিল একটা সেমিনারে যোগ দিতে। দু'দিন বাদেই ফিরে এল আমার জন্য রোজে ওয়াইনের বোতল নিয়ে। যাবার আগে সে জেনে গিয়েছিল, আমি লাইব্রেরির চাকরি নিচ্ছি, এবং তাতে আমাদের দু'জনেরই কত সুবিধে হবে, তা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিল। সন্ধেবেলা দু'জনে মুখোমুখি বসে রেকর্ড প্লেয়ারে গান শুনতে শুনতে কয়েক পাত্র সেই নরম সুরা পান করার পর আমি তাকে চরম সংবাদটি জানালাম। ফরাসি মেয়েদের হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময়, অভিমান ইত্যাদির অভিব্যক্তি খুব স্পষ্টভাবে মুখমণ্ডলে বা কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে। প্রথমে বিস্ময়ে তার ভুরু উঠে গেল কপালে, অবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে লাগল যে এটা আমার ঠাট্টা। তারপর চেঁচামেচি, না, না, এ হতেই পারে না, কিছুতেই যাবে না ইত্যাদি। হঠাৎ চুপ করে গেল একসময়। আর কোনও কারণে নয়, আমি যে শুধু কবিতা লেখার জন্যই ফিরে যাচ্ছি, এটা কয়েকবার শোনার পর সে শান্তভাবে বলল, তা হলে তো তোমায় যেতেই হবে। এখানে থাকার জন্য যদি তোমার লেখা বন্ধ হয়ে যায়, তাতে আমারই পাপ হবে, আমি তো তুচ্ছ একটা মেয়ে, কিন্তু কবিতা বিশ্বজনীন।

আমার পক্ষে আর কোনওদিনই হয়তো আমেরিকায় যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু মার্গারিট

কলকাতায় আসতে পারে অনায়াসে। সে ফরাসি কনসুলেটে চাকরি নেবে, কিংবা আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে পড়াবে। তা তো হতেই পারে, আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে অল্প কিছুদিন পড়ার সময় আমি ফ্রান্স থেকে সদ্য-আসা তরুণী শিক্ষিকা দেখেছি। মার্গারিটকে অবশ্য দু'-আড়াই বছর অপেক্ষা করতে হবে, তার পি এইচ ডি থিসিস শেষ করার জন্য।

সিদ্ধান্তটা পল এঙ্গেলকে জানানো আরও কঠিন হয়েছিল। তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বারবার অবুঝের মতন বলতে লাগলেন, বাট হোয়াই? বাট হোয়াই? তিনি জানতেন, আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি, দেখেছেন আমাদের পারিবারিক অবস্থা। এখানকার নিশ্চিত চাকরির নিরাপত্তা ছেড়ে কেন আমি অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, তা তাঁকে বোঝানো যায় না। এখানে বসেও তো লেখা যায়, এমনকী ইংরেজিতেও লেখার চেষ্টা করতে পারো। কিন্তু আমার মত বদলের আর কোনও প্রশ্নই নেই।

শুরু হয়ে গেল বাক্স-প্যাঁটরা গোছাবার পালা। জিনিসপত্র জমে গিয়েছিল অনেক, একটা খুব সুদৃশ্য ইলেকট্রিক ইস্ত্রি কিনেছিলাম, তার অনেক রকম কায়দা, ভারতে সে রকম জিনিস তখনও আসেনি, মার্গারিট বলেছিল, এটা সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি রাজি হইনি। অনেক রান্নার সরঞ্জাম, কম্বল, টেবল ল্যাম্প, মার্গারিট হস্টেলের ঘরে থাকে, তার এসব জিনিস রাখার জায়গা নেই, আমি সব বিলিয়ে দিলাম নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। কারণ আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আমার পক্ষে আর কোনওদিন বিদেশে আসার সুযোগ ঘটবে না, সুতরাং ফেরার পথে যে কটা দেশ সম্ভব দেখে যেতে হবে, বেশি মোটঘাট সঙ্গে রাখা চলবে না। একটা হালকা স্যুটকেসই ভ্রমণের পক্ষে প্রশস্ত। তা ছাড়া আমার মনে হয়েছিল, বন্যেরা যেমন বনে সুন্দর, সেই রকম এইসব বিদেশি জিনিসপত্র বিদেশেই মানায়। কলকাতায় আমাদের বাড়িতে ফ্রিজ নেই, টেলিফোন নেই, ওয়াশিং মেশিন তখন পর্যন্ত কেউ চোখেই দেখেনি। হঠাৎ একখানা ঝাঁচকচকে ইলেকট্রিক ইস্ত্রি রাখার কি মানে হয়? কিংবা কফি-মেকার? বরং ভারতীয় হয়ে কোনও আমেরিকানকে কিছু দান করলে তৃপ্তি হয়।

ফেরার দিন এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে এসে শেষ মুহূর্তেও পল এঙ্গেল আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, সুনীল, এখনও ভেবে দেখো, এখনও অন্য ব্যবস্থা করা যায়। যদি আর একটা বছরও থেকে ধীরে সুস্থে কলকাতায় চিঠি লিখে কোনও চাকরির জোগাড় করতে পারো, আমিও কিছু সাহায্য করতে পারি...

আমার জন্য একজন মানুষ এমন আন্তরিকভাবে ব্যাকুলতা প্রকাশ করছেন দেখলে চোখে জল আসবে না?

আয়ওয়া থেকে নিউ ইয়র্কে এসে অ্যালেন গিন্সবার্গের সঙ্গে কাটালাম কয়েকটি দিন। সেই দিনগুলির বিবরণ 'ছবির দেশে কবিতার দেশে' গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লেখা হয়েছে। অ্যালেন অবশ্য আমার দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত সমর্থনই করেছিল।

তারপর আকাশে উড়ে আটলান্টিক পেরিয়ে ইউরোপে। প্রথমে লন্ডন। কলকাতার ব্রিটিশ কাউনসিল থেকে আগেই আমাকে সংস্কৃতি বিনিময় ব্যবস্থায় ইংল্যান্ডে আতিথ্য দেবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আমার হোটেল থেকে কয়েক পা গেলেই হাইড পার্ক। সেখানে দাঁড়িয়ে প্রথমেই মনে হয়েছিল এই তা হলে সেই হাইড পার্ক, যার কথা কতবার কত বইতে পড়েছি। লন্ডনের বহু রাস্তা দ্রষ্টব্য স্থানের কথা আমাদের ছোটবেলা থেকেই মুখস্থ। পরাধীন আমলে বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হত ব্রিটিশ ইতিহাস, কোনও কোনও জায়গা স্বচক্ষে দেখে বেশ হতাশই হয়েছি। লন্ডনে আমার বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত কেউই ছিল না, সেজন্য দিনগুলি কাটাতে হয়েছে ইংরেজদের সাহচর্যে।

নিউ ইয়র্কে থাকার সময় একদিন দেখা হয়েছিল বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী সালভাদর দালি'র সঙ্গে, অ্যালেনের সঙ্গে আমাকেও বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে কফি খাইয়েছিলেন নিজের হাতে

বানিয়ে। সালভাদর দালি নিজের নামে কয়েকটা বারো-চোদ্দো মিনিটের ছোট ফিল্মও বানিয়েছিলেন, সেগুলির কিছু অংশ অ্যানিমেটেড। তার একটি দেখালেন আমাদের। ওরকম শিল্পসম্মত, কৌতুকময় চূড়ান্ত পর্নোগ্রাফি আমি আর কখনও দেখিনি। লন্ডনে এসে দেখা হল টি এস এলিয়ট এবং স্টিফেন স্পেন্ডারের সঙ্গে। এলিয়ট সাক্ষাৎকারের স্থান দিয়েছিলেন ফেবার অ্যান্ড ফেবার নামে প্রকাশনা সংস্থায় তাঁর নিজের ছোট্ট ঘরে। স্পেন্ডার নিজে এসেছিলেন আমার হোটেলে, অনেক রাতে, পরদিন দুপুরে তিনি আমার লাঞ্চ খাওয়াবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারবেন না। বিশেষ কাজ পড়ে গেছে, সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে। টেলিফোনে সে কথা জানালেই যথেষ্ট ছিল, তবু যে নিজে এলেন, সেটাই ব্রিটিশ ভদ্রতা।

লন্ডন থেকে প্যারিসে, সেখানে আমার জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল মার্গারিট। সেসব দিনের কথাও লেখা হয়ে গেছে পূর্বোক্ত গ্রন্থে।

জুরিখে ছিল আমার বাল্যবন্ধু বিমান মল্লিক। তার সঙ্গে যোগাযোগ করে সুইজারল্যান্ড দেখা হয়ে গেল কিছুটা। কিছু টাকা আমি জমিয়ে এনেছি, কিন্তু হোটেলে থাকার সামর্থ্য নেই, সেইজন্যই বিমান ভাড়া না লাগলেও জার্মানি কিংবা স্পেনে যাওয়া হল না, পরিচিত কেউ নেই বলে। তবে ঠিক করে রেখেছিলাম, জন্মের মধ্যে একবার যখন সুযোগ পেয়েছি, রোম আর ইজিপ্ট দেখে যেতেই হবে যে-কোনও উপায়ে। প্রাচীন ইতিহাস আমাকে দারুণভাবে টানে। রোম এবং কায়রো, এই দু' শহরেই আমাকে সস্তার হোটেল খুঁজে উঠতে হয়েছিল। সেসব ভ্রমণ বিবরণী এখানে অবান্তর হয়ে যাবে, তবে দুটি প্রশ্নের কথা আমার আজও মনে আছে।

কায়রোর হোটেলের ডাইনিংরুমে আমার পাশের এক ব্যক্তি আমাকে ভারতীয় বলে চিনতে পেরে ভাব জমিয়েছিলেন। ইজিপ্টের অনেক জায়গায়, পিরামিড দেখতে গিয়েও ভারতীয় পরিচয়ের জন্য বিশেষ খাতির পেয়েছি। তখন এই রকম অবস্থা ছিল। হোটেলের সেই ব্যক্তিটি বেশ পণ্ডিত, তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম শুনেছেন, তিনি কথায় কথায় বললেন, সুনীতিবাবুকে একটা প্রশ্ন করে উত্তরটা যদি জানাও, তা হলে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমরা মুসলমানরা আল্লাহকে মানি, আল্লার একটিই নাম, কিন্তু তোমাদের ভারতে 'খোদা' শব্দটিও চলে। এই শব্দটি কোথা থেকে এল? আমরা খোদা ব্যবহার করি না, ভারতীয় মুসলমানেরা (এবং পাকিস্তানিরা) ব্যবহার করে কেন? সুনীতিকুমার জীবিত ছিলেন আমি ফিরে আসার পরেও আরও কিছুদিন, কিন্তু তাঁকে এ-প্রশ্ন করার সুযোগ আমি পাইনি। আর লন্ডনে কথায় কথায় টি এস এলিয়ট জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের যে ট্রিনিটি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, এঁদের মধ্যে বিষ্ণু ও মহেশ্বর অর্থাৎ শিবের প্রচুর ভক্ত। সারা ভারতে বিষ্ণু ও শিব মন্দির অসংখ্য কিন্তু সমান শক্তিসম্পন্ন হয়েও ব্রহ্মার মন্দির মাত্র এক-আধটি, তার ভক্ত সম্প্রদায়ই বা হয়নি কেন? কেন ব্রহ্মা সম্পর্কে এরকম হেলাফেলা?

এ প্রশ্নেরও সঠিক উত্তর আমাকে কেউ দিতে পারেনি। পরে অবশ্য কিছু কিছু কাহিনী শুনেছি। মহাদেবের জ্যোতির্লিঙ্গের আদি-অন্ত নিরূপন করতে হয়েছিল ব্রহ্মাকে। তিনি শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারেননি সেই বিশালত্বের কাছে, তাই মিথ্যা মিথ্যাভাষ করেছিলেন। সেই জন্য মহাদেবের অভিশাপে তাঁর পূজা পাবার অধিকার বন্ধ হয়ে যায়। এ কাহিনীটি বড়ই স্থূল, কারণ সমপর্যায়ের দেবতা হয়েও ব্রহ্মাকে কেন শিবলিঙ্গ পরিমাপ করতে বলা হবে, এবং এ ক্ষেত্রে অভিশাপও অধিকার বহির্ভূত। অন্য দুটি কাহিনীতে আবার অভিশাপ দিয়েছেন দুই নারী, মোহিনী নাম্নী এক স্বর্গবেশ্যা ব্রহ্মাকে কামনা করে প্রত্যাখ্যাত হন এবং তাঁর পূজা লোপের অভিশাপ দিয়ে প্রতিশোধ নেন। অন্যটিতে ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্প্রদানে বসে সাবিত্রীকে আহ্বান করেন, কিন্তু ট্র্যাফিক জ্যাম বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক সাবিত্রী ঠিক এসে পৌঁছোতে পারেননি। বিরক্ত হয়ে ব্রহ্মা গায়ত্রী নামে গোপকন্যাকে সহধর্মিণী হিসেবে বরণ করে নিয়ে যজ্ঞ সমাপন করেন। দেরি করে পৌঁছে ক্ষমা চাওয়ার বদলে ক্রুদ্ধ সাবিত্রী ব্রহ্মাকেই শাপ দেন, সেই পূজা

লোপ। অভিশাপ এত শস্তা?

এসব কাহিনীগুলীর গভীরতা বড়ই কম। মনে হয় ব্রহ্মার কোনও রোমান্টিক ইমেজ গড়ে ওঠেনি, তাঁর কল্পিত চেহারাটাও প্রেমিক হবার যোগ্য নয়, বরং ভয়াবহ। শিব ও বিষ্ণুর নায়কোচিত রূপ এবং তাঁরা আকর্ষণীয় কাহিনীর মধ্যমণি বলেই তাঁদের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ে, ব্রহ্মা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েন।

যাই হোক, এসব অকিঞ্চিৎকর কারণগুলি টি এস এলিয়টকে লিখে জানাবার উপযুক্ত নয়। আর টি এস এলিয়টও এর পরে বেঁচে ছিলেন মাত্র পাঁচ মাস।

কায়রো থেকে আমার ইস্তানবুল ও বাগদাদ যাবার বাসনা ছিল, হোটেলের ঘরে একদিন হিসেব করে দেখি, আমার পকেট শুধু খুচরো পয়সায় ভর্তি, এ হোটেলের বিলও মেটানো যাবে কি না কে জানে! সুতরাং আর কোথাও বেড়ানো যাবে না, এবার বাড়ি ফেরার পালা। কোনওক্রমে কায়রোর হোটেলের বিল মিটিয়ে হাতে রইল দু' ডলার, অর্থাৎ দশ টাকা। এবারে চেপে বসলাম দমদমের প্লেনে।

আমার ফেরার দিনটি কারওকে জানানো হয়ে ওঠেনি, তাই বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয়স্বজন কেউ যায়নি এয়ারপোর্টে। ইচ্ছে করে, খুবই ইচ্ছে করে সে সময় একটা চেনা মুখ দেখতে। কত লোক অন্যদের উদ্দেশে হাতছানি দিচ্ছে, হাসছে, নাম ধরে ডাকছে, আমি যেন এসেছি এক অচেনা দেশে, আমাকে কেউ চেনে না। সুটকেস হাতে এসে দাঁড়ালাম বাইরে, নিশ্বাস নিলাম বুক ভরে, এ বাতাস অন্তত চেনা।

পকেটে দশ টাকা থাকতে কে আর ট্যাক্সি নেয়! বাড়ি বেশি দূরেও নয়। চেপে বসলাম একটা সাইকেল রিকশায়। নাগেরবাজারের মোড় পেরিয়ে মনে হল, এ পর্যন্ত কোনও কিছুরই তো বদল দেখলাম না। আমিও কি কিছু বদলেছি?

বিয়াল্লিশ

কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের সিঁড়ির মুখে প্রতিদিন সিগারেট বিক্রি করে ইসমাইল, সে আমাকে দেখে একটা ছোট্ট স্মাইল দিয়ে জিজ্ঞেস করল, অনেকদিন আসোনি, কোথায় ছিলে? আমি তার একজন বিশিষ্ট ক্রেতা, কারণ ধারে কিনতে পারি, সুতরাং সে তো আমাকে মনে রাখবেই। মার্কিন দেশে আমার ব্র্যান্ড ছিল লাকি স্ট্রাইক, ফরাসি দেশে গোলোয়াজ, কলকাতায় আবার ফিরে এলাম চারমিনারে। একটা সিগারেট ধরিয়ে; যেন গতকালই আমি এখানে আড্ডা দিয়ে গেছি, সেই ভঙ্গিতে ঢুকলাম দোতলার হলে। আমার ফেরার খবর প্রায় কারওরই জানা ছিল না। দু' তিনটি টেবিল থেকে সহর্ষ বিস্ময়ে স্বাগতম জানাল বন্ধুরা। শংকর চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে জোরালো। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোর গালের রং দেখছি কমলালেবুর মতন হয়ে গেছে (সত্যি নয়, বড় জোর বেগুনি হতে পারে), চুলের ছাঁট ক্রু-কাট করেছিস কেন, এই লাল জামাটা আমাকে একদিন দিস, পরে দেখব। তখন শ্যামল আর আমার শরীরের গড়ন প্রায় এক রকম, যদিও শ্যামল অনেক বেশি সুপুরুষ। দু'জনের পদবি এক হওয়ায় শ্যামল অনেক জায়গায় বলত, আমরা দুই ভাই, আমাদের ঠাকুরদার নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ('স্বর্ণলতা'র লেখক), আমাদের বাবা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (শরৎচন্দ্রের মামা ও 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদক), আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের কাকা! জমজমাট কফি হাউসে চেয়ারের খুব অভাব, অনেক দূরের টেবিল থেকে

একটা চেয়ার টেনে এনে বসলাম এবং বলা যেতে পারে, ঝাঁকে মিশে গেলাম।

খানিক বাদেই প্রস্তাব উঠল, খালাসিটোলায় যাওয়া হোক, সেখানে পাওয়া যাবে   লকুমার মজুমদারকে।

বন্ধুদের দলে সাবলীলভাবে মিশে থাকা সম্পূর্ণ অচেনা একজনকে দেখলাম, তার নাম বেলাল চৌধুরী। সম্পূর্ণ মেদহীন সুগঠিত শরীর, ফর্সা রং, নিষ্পাপ, সুকুমার মুখখানিতে ঈষৎ মঙ্গোলীয় ছাপ। এই নিরীহ যুবকটি সম্পর্কে অনেক রোমহর্ষক কাহিনী (হয়তো পুরোটা সত্যি নয়, সব রোমহর্ষক কাহিনীই তো সত্যি-মিথ্যে-গুজব মিশ্রিত হয়ে থাকে) শোনা গেল। তার বাড়ি পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানে, পেশা কুমির ধরা। একটা কুমির-শিকারি জাহাজে অনেক সাগর-উপসাগর পাড়ি দিতে দিতে সে হঠাৎ খিদিরপুরে এসে জাহাজ থেকে নেমে পড়েছে এবং পাসপোর্টটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে মিশে গেছে কলকাতার জনারণ্যে। এবং সে একজন কবি, তাই জল যেমন জলকে টানে, সেইভাবে সে যুক্ত হয়ে গেছে কফি হাউসের কবির দঙ্গলে। পাকিস্তানের সঙ্গে তখন ভারতের সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে দিনকে দিন, কয়েক মাস পরেই শুরু হবে একটি বালখিল্যসুলভ যুদ্ধ, সেরকম আবহাওয়ায় পাকিস্তানের নাগরিক হয়েও সহায়সম্বলহীন অবস্থায় কলকাতায় বিচরণ করার জন্য প্রচণ্ড মনের জোর ও সাহসের দরকার। অবশ্য বেলালের একটা দারুণ সম্পদ ছিল, সেটা তার মুখের হাসি এবং সহজ আন্তরিকতায় মানুষকে আপন করে নেবার ক্ষমতা। পরে অনেকবার দেখেছি, যে-কোনও বাড়িতে গেলে সে পরিবারের বাচ্চা ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে বুড়ো-বুড়িরা পর্যন্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই বেলালকে ভালোবেসে ফেলে। এর মধ্যে সে কমলদারও খুব চেলা হয়ে গেছে, দুজন অসমবয়সি মানুষের এমন গাঢ় বন্ধুত্বও দুর্লভ।

বেলালের মতন মানুষদের কোনও একটা বিশেষ দেশের সীমানায় গণ্ডিবদ্ধ করা যায় না, এরা সারা পৃথিবীর নাগরিক। ভ্যাগাবণ্ডপনায় বেলাল শক্তিকেও অনেকখানি হার মানিয়ে দিয়েছিল।

বেলালের সঙ্গে পরে অনেকবার অনেক রকম রোমহর্ষক অভিযান করা গেছে, কিন্তু আলাপের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাটি চিরস্মরণীয়। হল কী, খালাসিটোলায় অত্যুৎসাহে বন্ধুদের সঙ্গে মেতে থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। বছর খানেক ধরে উত্তম স্কচ, বার্বন ও ফরাসি ওয়াইন পান করে আমার অভ্যেস খারাপ হয়ে গিয়েছিল, বাংলা মদের মতন অতি উপাদেয় পানীয় আমার সহ্য হল না, কোন মুহূর্তে যে চেতনা সম্পূর্ণ লোপ পেল, তা টেরও পাইনি। তখন আমার সেই জড় দেহ নিয়ে বন্ধুরা খুবই মুশকিলে পড়েছিল, তাদের তখনও ভালো করে নেশাই জমেনি, বেশি রাতও হয়নি।

আমার জ্ঞান ফিরে এল ভোরবেলা। চোখ মেলে প্রথমে বুঝতেই পারলাম না, কোথায় শুয়ে আছি। রাস্তাঘাটে নয়, শ্মশানে-মশানে, হরিমন্দিরে নয়, একটা ঘরেই, সেরকম ঘরও কখনও দেখিনি। চ্যাঁচার বেড়া, ওপরে টিনের চাল, ঘরখানা এমনই ছোট যে মাঝখানে একটা তক্তপোশ ছাড়া আর নড়াচড়ার জায়গাই নেই বলতে গেলে। আমার পরনে সোয়েটার-প্যান্ট-শার্ট-জুতো সবই আছে, এখানে এলাম কী করে বা কার সঙ্গে, তা কিছুই মনে নেই। চিৎ হয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম একটুক্ষণ, পিঠে কীসের জন্য খোঁচা লাগছে, চাদরের তলায় হাত ঢুকিয়ে দেখি, একটা মোটা বই। সে বইটা টেনে সরাতেই সেদিকটা নিচু হয়ে গেল, তারপর ধরমড় করে উঠে দেখি; তোশক বলতে কিছুই নেই, একটা কাঠের চৌকির ওপর নানান আকারের সাজানো বইয়ের ওপর চাদর পাতা। আমি এতগুলি বইয়ের ওপর রাত কাটিয়েছি? এটা কার ঘর, জায়গাটাই বা কোথায়? বাইরে যেন কাদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, সবই নারীকণ্ঠ, কান পেতে শুনলাম, কী নিয়ে যেন ঝগড়া চলছে, তার মধ্যে অনেক অশ্লীল গালিগালাজ, আর অধিকাংশই পুরুষদের পক্ষে প্রযোজ্য, অর্থাৎ পুরুষরা প্রতিপক্ষের মা-বোন সম্পর্কে যে-সব

কুপ্রস্তাব করে, মেয়েরাই বলছে সেইসব। দরজাটাও চাটাই ও কঞ্চির, টেনে খুলতে গেলে একটুখানি ফাঁক হল মাত্র, বাইরে থেকে তালাবন্ধ। ফাঁক দিয়ে দেখে মনে হল, বাইরেটা একটা কবরখানা, মাঝে মাঝে বাটনাবাটা শিলের মতন পাথর বসানো।

মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে ভাববার চেষ্টা করলাম, সবটাই কি দুঃস্বপ্ন? এটা বাস্তব হতেই পারে না। মাত্র ক'দিন আগেই আমি ছিলাম আমেরিকায়, সে ঘরের তিনদিকেই জানলা। আমার বিছানার গদিটি ছিল পালক ভরা, আর কাল রাতে আমি শুয়েছি তোশকহীন তক্তপোশে, উঁচু-নিচু বইয়ের ওপর, চ্যাঁচার বেড়ায় জানলাহীন ঘর, পরিবেশ কবরখানা, স্ত্রীলোকেরা গালাগালি বিনিময় করছে পুরুষদের ভাষায়, দরজায় তালা বন্ধ, এটা একটা সুররিয়াল দৃশ্য, এটা কারও অবচেতনের সৃষ্টি, আমি সেখানে একটা চরিত্র হয়ে গেছি। পাখি নয়, শুনছি শুধু চিলের ডাক, এরকম দৃশ্যে এমন আবহসঙ্গীতই মানায়। এখন আমার বসে বসে বইগুলি পড়া উচিত? আস্তে আস্তে মাথা পরিষ্কার হতেই পেটে খিদের কামড় টের পাই। নিশ্চিত কাল বিকেলের পর কিছু খাওয়া হয়নি, খালাসিটোলায় আদা আর ছোলা, কমলদার পরিহাসময় মুখ, এ ছাড়া আর কিছু মনে পড়ে না। এরকম চেতনা হারানো, এরকম অ্যামনেশিয়া আমার প্রথম হল। যে-ই আমাকে এখানে আনুক, দরজায় তালা লাগিয়ে রেখেছে কেন। দরজাটা ধরে ঝাঁকালাম কয়েকবার। কার নাম ধরে ডাকব জানি না। এখানে কে আছে, দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও! আমার চিৎকারে স্ত্রীলোকদের ঝগড়া স্তব্ধ হয়ে গেল, কয়েকজন উঁকিঝুঁকি মারল দরজার কাছে এসে। এই দৃশ্যটাও অলীক মনে হয়, একটা অচেনা স্থানে, অচেনা কারওর ঘরে আমি বন্দি, বাইরে কয়েকজন রমণী কৌতূহলী চোখে দেখছে। তারা কেউ 'এই বন্দিই আমার প্রাণেশ্বর' বলল না, দৃশ্যটির মধ্যে রোমান্টিকতার ছিটেফোঁটাও নেই, রমণীরা কেউ সুন্দরী তো নয়ই, যুবতীও নয়, মধ্যবয়েসি দজ্জাল ধরনের, রমণী শব্দটাই এখানে প্রযোজ্য নয়, একজনের মুখ বন-বিড়ালের মতন, একজনের স্পষ্ট গোঁফ, একজনের হাতে একতাল গোবর। তাদের চোখে বিস্ময় নেই, কোনও মন্তব্যও করল না, একটু পরেই আবার সরে গেল দূরে।

অর্থাৎ আমাকে বন্দিই থাকতে হবে? কতক্ষণ? কী কী অপরাধ করেছি কাল রাতে? কিছু মনে করতে পারছি না বলে অপরাধবোধ আরও তীব্র হয়। অজ্ঞাত অন্যায়ের জন্য অনুশোচনায় সিরসির করে সর্বাঙ্গ। কাল রাতে বাড়ি ফিরিনি, বাড়িতে খবর দেবারও উপায় নেই, তখন টেলিফোনের এত চল ছিল না, মা দারুণ দুশ্চিন্তা করছেন, এটা ভেবেও লজ্জা-পরিতাপে অবশ লাগে। ঘরটায় ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখলাম, বই ছাড়া আর প্রায় কিছুই নেই, এখন এরকম অবস্থায় কি বই পড়ে সময় কাটানো যায়? একটা বাঁশি থাকলেও না হয় সান্ত্বনা পাওয়া যেত, একজন বন্দি-মানুষ বাঁশির সুরে মগ্ন হয়ে আছে, এ দৃশ্যটাও এখানে মানিয়ে যায়।

ইচ্ছে করলে লাথি মেরে মেরে ভেঙে ফেলা যায় চ্যাঁচার বেড়ার দেওয়াল। কিন্তু কার ঘর আমি ভাঙব? দরজাটাও তেমন মজবুত নয়, টানাটানি করে সেটা ওপরের দিকে খানিকটা তোলা যায়, তলায় খানিকটা ফাঁক হয়। আমি মাটিতে শুয়ে পড়ে, গড়িয়ে গড়িয়ে দরজার তলা দিয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করলাম বেশ কিছুক্ষণ ধরে, পিঠ ও হাত-পা ছড়ে গেল, দরজাটা পটপট শব্দে হেলে পড়ল এক দিকে, তারই মধ্যে কোনওক্রমে নিষ্ক্রান্ত হওয়া গেল। মুক্তি, মুক্তি! একজন বেশ ভালো, বিলিতি জামা-কাপড় পরা মানুষ যাকে এখানকার কেউ আগে দেখেনি, সে কেন সারা রাত এই একটা ঘরে তালাবন্ধ ছিল, কেনই বা সে দরজা প্রায় ভেঙে বেরিয়ে এল, তা নিয়ে পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকেরা কোনও প্রশ্ন করল না, ভ্রূক্ষেপও করল না। জায়গাটা একটা কবরখানাই বটে, এক দিকে বাঁশ ও দর্মার বেড়া দেওয়া এরকম আরও কয়েকখানা ঘর রয়েছে, মনে হয় জবরদখল। আরও খানিকটা জমি দখল করার বিবাদে সেই স্ত্রীলোকেরা প্রমত্ত বলেই মনে হল।

এ কবরখানা আগে দেখিনি, জায়গাটা কোথায়, তাও বুঝতে পারছি না। কলকাতা শহরটা

আমি তন্ন তন্ন করে চিনি, আগে আমার এ-রকম শ্লাঘা ছিল, মাত্র এক বছরের প্রবাসে এমন বিভ্রম হয়ে গেল? সে কবরখানার বাইরে এসেও অচেনা মনে হচ্ছে অঞ্চলটি, পথ-ঘাটে মানুষজন প্রায় নেই-ই বলতে গেলে, গাড়ি-ঘোড়াও কচিৎ। একটুক্ষণ উদভ্রান্তের মতন আধা দৌড়োবার পর হঠাৎ দেখতে পেলাম, একটা বাড়ির গায়ে লেখা রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল হস্টেল। আমার চমক লাগল, এ বাড়িটি তো আমার চেনা। আগে কয়েকবার এসেছি। শুধু তাই নয়, এ হস্টেলের সুপার আমাদের অতি প্রিয় ছোটকুদা। কবি ও সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন সত্যপ্রসন্ন দত্ত, সবাই বলত, ওঁরা দু'জন হরিহর আত্মা। ইনি সেই সত্যপ্রসন্ন দত্তের ছোট ভাই, আমরা ছোটকুদা বলেই ডাকতাম, অতিশয় নরম মনের মানুষ, কলেজ স্ট্রিটে দৈবাৎ তাঁর দেখা পেলে আমাদের মধ্যে উল্লাসের স্রোত বয়ে যেত, শক্তি ওঁকে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলত, ছোটকুদা, পনেরোটা টাকা দাও না, খুব খিদে পেয়েছে। ছোটকুদা কৃত্রিম ধমক দিয়ে বলতেন, না মোটেই খিদে পায়নি, টাকা নিয়ে তোমরা আজেবাজে জিনিস খাবে! শেষ পর্যন্ত দিয়েও দিতেন।

সেই প্রাতঃকালে ইন্টারন্যাশনাল হস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল, এখন ছোটকুদা হতে পারেন আমার ত্রাণকর্তা। কারণ, তখন আমি অন্য একটা সমস্যা নিয়ে দারুণ চিন্তিত। কবরখানা থেকে বেরিয়েই নজর করেছি যে; আমার প্যান্টের একটা পায়ের পেছন দিকে অনেকখানি ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলছে, বেশ খারাপ জায়গায় ছেঁড়া, দেখা যাবেই। সেটা আগের রাত্রেই কখনও হয়েছে, কিংবা দরজার তলা দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময়, তা কে জানে। আমার বিদেশি দামি প্যান্ট ছেঁড়ার আফসোসের চেয়েও বড় কথা, এই অবস্থায় আমি বাড়ি ফিরব কী করে? আগের রাত্রে না ফেরার জন্য কোনও মুমূর্ষু বন্ধু সম্পর্কে করুণ কাহিনী না হয় বানানো যায়, কিন্তু এতখানি ছেঁড়া প্যান্টের কী ব্যাখ্যা হতে পারে?

দারোয়ানকে প্রায় ঠেলেই আমি উঠে গেলাম সুপারইনটেনডেন্টের কোয়ার্টারের দোতলায়। ঘড়ি পরার অভ্যেস আমি আগেই ছেড়ে দিয়েছি, ঘুম ভাঙার পর এত কাণ্ড করার পর আমার খেয়ালই হয়নি যে এখন মাত্র পৌনে ছটা বাজে, ছাত্ররাই কেউ জাগেনি, সুপারের এত তাড়াতাড়ি জেগে ওঠার কী দায় পড়েছে। আমার ডাকাডাকিতে ছোটকুদা চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন। এরপর আমি যে কাণ্ডটা করলাম, সেটাও প্রায় সুররিয়ালিস্টিকই বলা যেতে পারে। তখন আমার চিন্তা সম্পূর্ণ একমুখী, ছেঁড়া প্যান্ট! ছোটকুদা জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার হে, এত সকালে? এদিকে কোথায় এসেছিলে? এর উত্তরে ভদ্রতাসূচক যে সব ভণিতা করা উচিত ছিল তা ভুলে গিয়ে আমি ব্যগ্রভাবে বললাম, ছোটকুদা, একটু সূচ-সুতো দিতে পারেন?

ছোটকুদা প্রথমে বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, কী কইলা? কী চাইলা? আমি একইভাবে বললাম সূচ-সুতো। এই দেখুন প্যান্টটা ছিঁড়ে গেছে, সেলাই করতে হবে।

ছোটকুদা হতভম্বের মতন তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তাঁরও তো ঘুমের ঘোর কাটতে কিছুটা সময় লাগবে! কিন্তু তিনি জানতেও চাইলেন না, প্যান্টটা অমনভাবে কী করে ছিঁড়ল বা কোথা থেকে এসেছি আমি। হেসে বললেন, ঠিক আছে। বসো, আগে চা খাও। গরম গরম ফিস ফ্রাই খাবে। আমাদের কুক খুব ভালো ফিস ফ্রাই বানায়। আর প্যান্টটা ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে একটা তোয়ালে জড়িয়ে এস। সেলাইয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এবারে আমার হতভম্ব হবার পালা। এত সকালে ফিস ফ্রাই? কী হচ্ছে আজ ভোর থেকে? সবই অলীক, সবই অবাস্তব। জিজ্ঞেস করলাম, ছোটকুদা, আপনি চায়ের সঙ্গে ফিস ফ্রাই খান? তিনি বললেন হ্যাঁ, বললাম না, আমাদের কুক খুব ভালো বানায়, আগের রাত থেকে ম্যারিওনেট করে রাখে।

সকালে প্রথম কাপ চায়ের সঙ্গে ফিস ফ্রাই খায়, এমন মানুষ কি ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয়টি আছে? ছোটকুদা কি এই পৃথিবীর, না অন্য গ্রহের? কিংবা, এরকম কিছু কিছু মানুষ আছে বলেই

পৃথিবীটা এত বর্ণময়।

পরে জেনেছিলাম, আগের রাতে আমি অকস্মাৎ অচেতন এবং অসাড়-শরীর হয়ে যাবার ফলে বন্ধুরা খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণের জন্য তারা যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমার নায়েরবাজারের বাড়ি অনেকেই চেনে না, তা ছাড়া ওই অবস্থায় ট্যাক্সিতে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, তাতে অনেক ভাড়া। এরকম পরিস্থিতিতে কেউ কেউ দায়িত্ব এড়িয়ে সরে পড়ে, কেউ কেউ বুক দিয়ে আগলে রাখে। সেই প্রথম পরিচয়ের দিনেই বেলাল আমার দায়িত্ব নিয়েছিল। তখন বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র উৎপলকুমার বসুই নিজের বাড়ি বিক্রি করে সাহেবি কায়দায় আধা সাহেব পাড়া রয়েড স্ট্রিটে একলা ফ্ল্যাটে থাকে, সেখানে অনেকেই হুল্লোড় শেষে রাত্রিযাপন করে। আমাকে সেখানেই শুইয়ে রাখা যেত; কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় তোলার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বেলাল আমাকে নিজের ঘরে রেখে আসে। বাইরে থেকে তালা দেবার কারণ, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করবার জ্ঞানও আমার ছিল না, দরজা খোলা রাখলে পাশের বস্তির ছেলেরা ভেতরে ঢুকে অনেক কিছু চুরি করে নিতে পারত। চুরি করবার মতন সম্পদ বেলালের ঘরে প্রায় ছিলই না, বই ছাড়া তা কে আর নেবে! কিন্তু এ দেশের চোর-ডাকাতরা এমনই ছ্যাঁচড়া যে বেলালের চৌকির নীচে রাখা দু'-একখানা জামা-কাপড় বা থালা-গেলাসও নিতে পারে, তা ছাড়া আমার গায়ের সোয়েটারটা বেশ দামি। নেবার মতন কিছু না পেলে রাগের চোটে চোর-ডাকাতরা খুনও করে যায়!

জীবনে ওরকমভাবে অচৈতন্য আমি একবারই হয়েছি। পরের বহু বছর ধরে দেখেছি, ওরকম তুরীয় অবস্থায় পৌঁছবার অধিকার আসলে বেলালেরই একচেটিয়া। স্থান-কাল-পাত্র কিছুই সে গ্রাহ্য করে না। এমন অনেকবার দেখেছি, কোনও বাড়িতে সান্ধ্য আড্ডায় আমরা বেলালকে নিয়ে গেছি, হয়তো কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবার, বেলালকে তারা আগে দেখেইনি। কিছুক্ষণ পানাহারের পর কথা বলতে বলতে বেলাল হঠাৎ অজ্ঞান এবং পাথর। তাকে বাধ্য হয়েই সেখানে শুইয়ে রেখে আমরা চলে গেছি, কিন্তু কোনও বাড়িতেই বেলাল সম্পর্কে সামান্যতম অভিযোগও শোনা যায়নি, বরং সেসব পরিবারের সঙ্গে বেলালের দীর্ঘস্থায়ী সুসম্পর্ক হয়ে গেছে। এবং তরুণীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা আমাদের কাছেও ঈর্ষণীয় ছিল।

অন্য দেশের নাগরিক হয়েও কলকাতার এক অজ্ঞাত কবরখানায়, জবরদখল জমির বাড়িতে, তাও কুড়ি-পঁচিশ টাকার ভাড়ায় বেলাল যে-ভাবে দিনযাপন করেছে তাতে মনে হয়েছে, এ ছেলে নিশ্চিত কোনও ছদ্মবেশী রাজকুমার। আমি সে রকমভাবেই বেলালকে গ্রহণ করেছি প্রথম দিন থেকে। এরকম বেপরোয়া সাহস আমার কোনওদিনই ছিল না। আমি নিজে যা পারি না, তা অন্য কারও সহজসাধ্য দেখলে আমার শ্রদ্ধা হয়।

কিছুদিন পর বেলাল ক্যামাক স্ট্রিটের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পাড়ায় একটা ঘুপচি ঘর নিয়েছিল, সেখানেও চলত আমাদের তুমুল আড্ডা ও নানা রকম গোপন পরীক্ষা। সেসব কথা লেখার ভার রইল বেলালের ওপর।

দেশে ফেরার পর বেশ কিছু বন্ধুর উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেও বন্ধুত্বের ব্যাপারেই জীবনের প্রথম চরম আঘাতটাও পাই এই সময়। এর দু'-একদিনের মধ্যেই হাংরি জেনারেশানের সমীর রায়চৌধুরী ও মলয় রায়চৌধুরীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। সমীর কলেজ জীবন থেকেই আমার বন্ধু, চাইবাসা-ডাল্টনগঞ্জে তার বাড়িতে কত দিন ও রাত কাটিয়েছি, বন্ধুকৃত্যে সে অতি উদার, আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকও সমীর। মলয়কেও চিনি তার ছোট বয়স থেকে। দু'জনেরই রচনা প্রকাশিত হয়েছে কৃত্তিবাস পত্রিকায়। হাংরি জেনারেশান আন্দোলন শুরু হয় আমার অনুপস্থিতিতে এবং অজ্ঞাতসারে। সেই সময়কার ইংল্যান্ডের অ্যাংরি ইয়ংমেন আর আমেরিকার বিট জেনারেশান, এই দুই আন্দোলনের ধারা মিলিয়ে সম্ভবত হাংরি আন্দোলনের চিন্তা দানা বেঁধেছিল, হয়তো অ্যালেন গিন্সবার্গের প্রেরণাও ছিল কিছুটা এবং মুখ্য ভূমিকা ছিল মলয়ের।

এই নতুন আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে তৈরি হয়েছিল ইস্তাহার ইংরিজি-বাংলা মিলিয়ে, আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যও ছিল এবং সে উদ্দেশ্য সফলও হয়েছিল কিছুটা, সাপ্তাহিক 'টাইম' ম্যাগাজিন ও আরও কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল কলকাতার এই অভিনব আন্দোলন সম্পর্কে।

শক্তি, সন্দীপন, উৎপলকুমার বসু প্রমুখ যারা কৃত্তিবাসের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত, তারাও প্রথম থেকে যোগ দিয়েছিল হাংরি আন্দোলনে। অর্থাৎ কৃত্তিবাসেরই একটা প্রধান অংশ নিয়ে এই আন্দোলন, কিন্তু আমাকে এ সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গও জানানো হয়নি। আমার সমর্থন কিংবা বিমুখতার কোনও প্রশ্নই নেই, কেউ কিছু জিজ্ঞেসই করেনি আমাকে, প্রস্তুতিপর্ব চলছিল আমাকে গোপন করে। অকস্মাৎ একদিন ইস্তাহারটি হাতে পেয়ে আমি অনেকক্ষণ বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারিনি। যেসব বন্ধুদের সঙ্গে আমার প্রতিদিন ওঠা-বসা, তারা একটা নতুন কিছু করতে যাচ্ছে সম্পূর্ণ আমাকে বাদ দিয়ে? এর কী কারণ থাকতে পারে, তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনি। বন্ধুদের কাছে আমি অসহ্য হয়ে উঠেছি, কিংবা আমার হাতে নেতৃত্ব চলে যাওয়ার আশঙ্কা? একটা গভীর বেদনাবোধ আমি লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম।

একটা নতুন সাহিত্য আন্দোলন শুধু ইস্তাহার ও স্লোগান দিয়ে সার্থক করা যায় না। নতুন ধরনের লিখতে হয়। হাংরি-দলীয় কবি ও গদ্যকারগণ কিছু কিছু পরীক্ষা করছিলেন, আমি লক্ষ করছিলাম দূর থেকে, সেইসব নতুন ধরনের লেখার মধ্যে খুঁজেছি সাহিত্যমূল্য। হাংরি জেনারেশন এই ইংরিজি নামটি অবশ্য আমার কাছে অরুচিকর মনে হয়েছিল। অ্যালেন গিনসবার্গকে আমি সমশ্রেণীর বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করেছিলাম, তার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা কিংবা তাকে অনুসরণ করার কথা কখনও আমার মনে আসেনি। সব ভাষারই আলাদা পরিমণ্ডল থাকে, সামাজিক অবস্থারও প্রতিফলন হয়। তার অনেক লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি, সেও কিছু কিছু ব্যাপার শিখেছে আমাদের কাছ থেকে। আমেরিকায় সব ব্যাপার নিয়েই হুজুগ তৈরির চেষ্টা হয়। আমাদের দেশে সাহিত্যক্ষেত্রে তা দেখা হয় নিচু চোখে। লেখালেখি ছাড়াও হাংরি জেনারেশনের নামে কিছু কাণ্ড হতে লাগল। যেমন, কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির কাছে একটা করে মুখোশ পাঠিয়ে জানানো হল, এখন থেকে এই মুখোশ পরে থাকুন। একদিন একজন প্রখ্যাত লেখকের অফিসে ফোনে জানানো হল, আপনার ছেলে খুব অসুস্থ, শিগগির বাড়ি চলে যান! এগুলিকে কৌতুক বলা চলে না। সমর্থনও করা যায় না। যেহেতু হাংরি জেনারেশান নামের সঙ্গে কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর অনেকেই জড়িত, তাই পত্রিকার এক সংখ্যায় আমাকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাতে হল যে হাংরি জেনারেশানের ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে কৃত্তিবাসের কোনও সম্পর্ক নেই।

বেশ কয়েক মাস প্রবলবেগেই চলেছিল হাংরি আন্দোলন, বেরিয়েছিল কয়েকটি পত্রিকা, তার পর তাদের ওপর পুলিশের হামলা হয়। আমার ফেরার কয়েকদিনের মধ্যেই কাকতালীয়ের মতন পুলিশ গ্রেফতার করে সমীর ও মলয়কে। তাতে কয়েকজন মনে করল, আমিই ওদের ধরিয়ে দিয়েছি। যেন, দমদমে পদার্পণ করেই আমি পুলিশ কমিশনারকে টেলিফোনে আদেশ করেছি ওই কটাকে ধরে গারদে পুরুন তো! একজন আমাকে একটি কাতর চিঠি লিখে অনুরোধ জানাল, পুরনো বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে আমি যেন ওদের ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করি।

এরকম অভিযোগে আমি নিদারুণ মর্মাহত হয়েছিলাম। মানুষ সবচেয়ে বেশি আঘাত পায়, যখন যে দোষ সে করেনি, সে বিষয়ে বিন্দু-বিসর্গও জানে না, সেই দোষে অভিযুক্ত হয়। বিশেষত কোনও ঘনিষ্ঠজনের কাছ থেকে। আমেরিকা যাওয়ার জন্য আমার মান-মর্যাদা কি এতই বেড়ে গেছে যে পুলিশ কমিশনার আমার হুকুম মানবে? কে পুলিশ কমিশনার তাঁর নামও জানি না। এমনকী আমি পুলিশের কোনও দারোগাকেও চিনি না। আমি নিজের বন্ধু বা সমসাময়িক লেখকদের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দিতে পারি, আমার সম্পর্কে কেউ এরকম

খারাপ ধারণা পোষণ করে, এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি আঘাত দিয়েছিল। বন্ধুত্ব ব্যাপারটা সম্পর্কেই প্রশ্ন জেগেছিল। স্কুলের শেষ দিন থেকেই বন্ধুদের প্রতি প্রায় সমকামীদের মতনই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম, নিজের বাড়ির লোকজন, আত্মীয়স্বজনের চেয়ে বন্ধুরাই ছিল বেশি আপন। কিন্তু এখন মনে হল, প্রকৃত বন্ধুত্ব কি সম্ভব? কিংবা কত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে বন্ধুত্ব? পরবর্তী দীর্ঘ সময়ে আমি বুঝেছি, আমার সত্যিকারের বন্ধু যে কয়েকজন আছে, তারা কেউই লেখক নয়। তারা ঘুণাক্ষরেও আমাকে ভুল বুঝবে না। বন্ধুত্ব আজীবনও থাকতে পারে, কিন্তু তারা এক পালকের পাখি নয়, যেমন ভাস্কর, সে আমার জন্য প্রাণও দিতে পারত।

পুলিশী তৎপরতার সূত্রপাতেই হাংরি জেনারেশানের প্রথম সারির নেতারা সবাই পুলিশের কাছে মুচলেকা দিয়ে জানিয়ে আসে, ভবিষ্যতে তারা ওই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। সমীরও ছাড়া পেয়ে যায়, মামলা হয় শুধু মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে, অশ্লীলতার অভিযোগ। সেই সময় কিছুদিনের জন্য মলয় খানিকটা একা হয়ে পড়ে। মামলা ওঠার আগে মলয় আমার বাড়িতে এসে অনুরোধ জানায় আমাকে তার পক্ষ নিয়ে সাক্ষ্য দিতে। আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে তাকে জানিয়েছিলাম, পৃথিবীর যে কোনও দেশেই সাহিত্যের ব্যাপারে পুলিশের হস্তক্ষেপের আমি বিরোধিতা করব। সাহিত্যের বিচার করতে পারে একমাত্র পাঠকেরা, সরকারের সে বিচার করার অধিকার নেই। মলয়ের পক্ষ নিয়ে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জানাতে রাজি আছি। কিন্তু যে-কবিতাটি নিয়ে অভিযোগ, সেটাকে আমার সার্থক কবিতা মনে হয়নি মোটেই। শ্লীল-অশ্লীলের পার্থক্য নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, তবে কবিতাটিকে রসোত্তীর্ণ বলা চলে না। মলয় জানাল যে, আমার এরকম সাক্ষ্যে পুরোপুরি কাজ হবে না, এটা আধা-সমর্থন, কবিতাটিকে বাদ দিয়ে শুধু কবিকে সমর্থন করলে বিচারক মানবেন না।

সেই প্রথম আমি দাঁড়ালাম আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায়। সরকার পক্ষের উকিল অভিযুক্ত কবিতার কিছু আদিরসাত্মক শব্দসমন্বিত অংশ নির্দেশ করে বললেন, আপনি এই লাইনগুলি জোরে জোরে পড়ুন।

পড়লাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মতে কি এই ধরনের লেখা খুবই অশ্লীল নয়? এরকম লেখায় সমাজের ক্ষতি হয় না?

না। শুধুমাত্র কয়েকটি শব্দ দিয়ে অশ্লীলতার বিচার হয় না। এবং আমার মতে, এই রচনা কোনও ক্রমেই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

আপনার মতে, এটা কি একটা সার্থক কবিতা?

সামান্য দ্বিধা করে আমি বেশ জোর গলাতেই বলেছিলাম, হ্যাঁ—এটা একটা সার্থক কবিতা।

বন্ধুর ভাইয়ের জন্য এই সামান্য মিথ্যেটুকু বলতে আমার বিবেকে আঁচড় লাগেনি।

তেতাল্লিশ

বাঙালি লেখকদের মধ্যে ব্যস্ততম মানুষ ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ, এবং গদ্য লেখক হয়েও তাঁর মতন কবিতাপ্রেমী আমি আর কারওকে দেখিনি। ছোটখাটো চেহারার মানুষটি সদা চঞ্চল, মাথার মধ্যে সবসময় যেন পাঁচরকম চিন্তা সমান্তরালভাবে ছোটে। 'কিনু গোয়ালার গলি', 'শেষ নমস্কার', 'শ্রীচরণেষু মাকে'র মতন উপন্যাস এবং দুর্দান্ত কিছু ছোট গল্পের জন্য এক সময় প্রবল খ্যাতি পেয়েছিলেন, শেষের দিকে তাঁর সাংবাদিক সত্তা তাঁর লেখক সত্তাকে অনেকখানি আড়াল করে দেয়। এক সময় ইংরেজি কাগজের সাংবাদিক হিসেবে থাকতেন দিল্লিতে,

কলকাতায় এসে আনন্দবাজার পত্রিকার ভার অনেকখানি নিজের কাঁধে তুলে নেন। সে সময় আনন্দবাজার ও যুগান্তর-ই প্রধান বাংলা সংবাদপত্র, এক কালের বসুমতীর তখন পড়ন্ত দশা, সত্যযুগ, পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ, লোকসেবক, স্বাধীনতা, জনসেবক এইসব পত্রিকা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। কিছুদিনের জন্য যুগান্তরের জনপ্রিয়তা আনন্দবাজারকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সন্তোষকুমার ভার নেবার পর আনন্দবাজার আবার প্রথম স্থান অধিকার করে নেয়। বাংলা সাংবাদিকতায় তিনি এনেছেন নতুন আঙ্গিক, নতুন ভাষা। যত দূর জানি, সাধু ভাষা ছেড়ে চলিত ভাষার প্রচলনও হয় তাঁর নির্দেশে। আনন্দবাজারের সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারী অশোককুমার সরকারকে অনেকে বলত রক্তকরবীর রাজার মতন, তিনি থাকেন উপরিতলে, তাঁকে প্রায় দেখাই যায় না, সন্তোষকুমারই তাঁর বকলমে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তিনি সর্বত্র পরিদৃশ্যমান।

সাংবাদিকতার পেশা তাঁর কাছে এমনই তীব্র নেশার মতন হয়ে গিয়েছিল যে তিনি দিনের মধ্যে পনেরো-ষোলো ঘণ্টাই কাটাতেন অফিসে, কোনও কোনও সময় রাত্রেও বাড়ি ফিরতে পারতেন না। কিছুকালের জন্য আনন্দবাজার এবং এই সংস্থার ইংরেজি কাগজ হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডেরও বার্তা সম্পাদক ছিলেন একই সঙ্গে। এ হেন ব্যস্ত মানুষটি ছিলেন বিস্ময়কর রকমের পড়ুয়া, ছোটখাটো লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সব লেখাও পড়তেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, নতুন কারও কবিতা ভালো লাগলে মুখস্থ বলে দিতেন দু'লাইন, স্মৃতিশক্তিও ছিল অসাধারণ। তিনি অসম্ভব রবীন্দ্রভক্ত, নিজে গাইতে না পারলেও প্রায় সমস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণী তাঁর কণ্ঠস্থ, কোনও গায়ক-গায়িকা সামান্য হসন্ত ভুল করলেও তাঁর কান এড়াত না, এ সত্ত্বেও তিনি সাম্প্রতিকতম কবিতা পড়তেন সমান মনোযোগে।

আমি বিদেশ থেকে ফিরে বেকার অবস্থায় ঘুরছি বলে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এক সকালে আমাকে নিয়ে গেলেন সন্তোষকুমার ঘোষের বাড়িতে। অগ্রজ কবিদের মধ্যে নীরেনদার সঙ্গেই আমার যোগাযোগ ছিল বেশি। সরকারি চাকরি থেকে বিনা অনুমতিতে, ছুটি না নিয়ে প্রস্থান করেছিলাম বলে ভয়ে আর ও পাড়া মাড়াইনি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি যা-কিছু জমেছিল তাও কখনও দাবি করিনি, নিজস্ব ড্রয়ারের কাগজপত্রও আনা হয়নি। মজার ব্যাপার এই, আমার এরকম অনুপস্থিতির জন্য কোনও রকম কৈফিয়ত চাওয়া হয়নি সরকার পক্ষ থেকে, আমাকে বরখাস্ত করারও চিঠি পাঠানো হয়নি। অনেক বছর ধরে বন্ধু-বান্ধবরা বলত, তুমি যখন বরখাস্ত হওনি, তার মানে চাকরি এখনও টিকে আছে, যে-কোনওদিন ওই অফিসে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়তে পারো। হয়তো গিয়ে দেখবে, এর মধ্যে তোমার প্রমোশানও হয়ে গেছে!

সন্তোষকুমার আমাকে চিনতেন, কিন্তু তখনও তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি। দু'চারটে কথা বলার পরই তিনি প্রস্তাব দিলেন, তুমি দুর্গাপুরে যাও! সেখানে আনন্দবাজারের নতুন অফিস খোলা হবে, তুমি হবে ইনচার্জ, কোয়ার্টার পাবে, জিপ গাড়ি পাবে, তোমার আন্ডারে কয়েকজন স্টাফ থাকবে।

আমি ভেবেছিলাম, দৈনিক পত্রিকায় আমার কিছু লেখাটেখার সুবিধে করে দেবার কথা বলবেন নীরেনদা, হঠাৎ চাকরির প্রস্তাব পেয়ে হকচকিয়ে গেলাম। সেই ষাটের দশকে দুর্গাপুর সম্পর্কে অনেক জল্পনাকল্পনা ছিল, অনেকে মনে করত, শিল্পনগরী হিসেবে এর গুরুত্ব কলকাতাকে ছাড়িয়ে যাবে, প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য হবে, আর সেই টানে বহু মানুষ বসতি স্থাপন করবে সেখানে। কিন্তু আমি চাকরি নেবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, তা ছাড়া ফিরে এসেছি কলকাতার টানে, দুর্গাপুরে গিয়ে থাকতে যাবই বা কেন? আমি রাজি নই শুনে সন্তোষদা বেশ ধমকধামক দিলেন, তিনি ক্ষমতার আঁচে সব সময় ঝলমল করছেন, তাঁর যে কোনও প্রস্তাব মানেই আদেশ এবং সকলে তা মেনে চলছে, এটা দেখতেই তিনি অভ্যস্ত। লেখালেখির সঙ্গে জড়িত কোনও বেকার যুবকের পক্ষে আনন্দবাজারের লোভনীয় চাকরি প্রত্যাখ্যান করাও স্বাভাবিক নয়, কিন্তু আমি তখন ঠিক করেই ফেলেছি যে চাকরি না করেও জীবন চালানো যায়

কি না, তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে, অ্যালেন গিন্‌সবার্গও আমার কানে ফুসমন্তর দিয়েছিল, সাহিত্য রচনা শুধু লিখতে বসার সময়টুকু নয়, চব্বিশ ঘণ্টার কাজ, ধরাবাঁধা কোনও জীবিকা নিলে তার বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়। জীবনযাপনের পদ্ধতিটাও রচনার একটা আঙ্গিক।

বন্ধু শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ও তখন একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির উঁচু অফিসার, তিনি তাঁর দফতরে আমার জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছিলেন, শুধু নাম-কা-ওয়াস্তে একদিন ইন্টারভিউ দিতে হবে। শরতের সঙ্গে এক অফিসে প্রতিদিন দেখা হবে, এই প্রলোভনে প্রায় রাজিও হয়ে গিয়েছিলাম। নির্দিষ্ট দিনে বাড়ি থেকে সেজেগুজে বেরিয়েও মধ্যপথে ভাবান্তর হল। ইন্টারভিউতে মনোনীত হলে প্রতিদিন সুট-টাই পরে সাহেবি-অফিসে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায় হাজিরা দিতে হবে? জুতোর পালিশ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত রাখতে হবে নিখুঁত! তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, জীবনে আর কখনও কোনও ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে দাঁড়াব না। গলায় আর কোনওদিন টাই বাঁধব না তো বটেই, প্যান্টের সঙ্গে চটি পরার এবং যে দিন খুশি দাড়ি না কামাবার স্বাধীনতা আমায় রক্ষা করতে হবে।

নীরেনদা আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক, তিনি আমাকে প্রতি সপ্তাহে কিছু লেখার বরাত দিলেন। আমি তখন নব নব বিচিত্র বিষয় খুঁজে বার করতাম সারা সপ্তাহ ধরে। সিনেট হলের ঠিক সম্মুখভাগে উপবিষ্ট মূর্তিটি কার, তরু দত্ত, অরু দত্ত'র সমাধি কোথায়, কলকাতার কোন অঞ্চলে ওয়ারেন হেস্টিংস ও ফিলিপ ফ্রান্সিস ডুয়েল লড়েছিলেন, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে কয়েক মাইল অন্তর লম্বা লম্বা গম্বুজগুলো তৈরি হয়েছিল কেন ইত্যাদি। গত দু'তিন শতকের কলকাতা তথা বাংলার ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনোর শুরু তখন থেকে।

সাগরদাও একদিন ডেকে বললেন, তুমি আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বিদেশি কবিদের সঙ্গে মিশেছ, অন্যান্য ভাষায় টাটকা কীসব লেখা হচ্ছে তা অনুবাদ হতে অনেক সময় লাগে, আমরা ঠিক মতন জানতে পারি না, তুমি দেশ পত্রিকায় প্রতি সংখ্যায় এইসব নিয়ে কিছু লেখো। শুরু হল, 'অন্য দেশের কবিতা'। বিংশ শতাব্দীতে, ইংরেজি বাদ দিয়ে, প্রধান পাঁচটি ইউরোপীয় ভাষায় কবিতা নিয়ে কী কী আন্দোলন হয়েছে তার পরিচয়, প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও দুটি-একটি কবিতার ভাবানুবাদ। অনুবাদের মাধ্যমে কবিতার রস ও শব্দমাধুর্য অনেকটাই হারিয়ে যায় তা ঠিক, তবু তো অনুবাদের দরজা দিয়েই আমরা বিশ্ব সাহিত্যে কিছুটা প্রবেশের অধিকার পাই। দান্তের ডিভাইন কমেডির স্বর্গীয় পবিত্রতা হয়তো পুরোটা পাইনি, গ্যয়টের ফাউস্টের শয়তান ও শুভবুদ্ধি দ্বন্দ্ব হয়তো সবটা অনুধাবন করা যায়নি, তবু তো অনুবাদ হয়েছে বলেই কিছু জেনেছি!

আয়ওয়াতে আমি প্রচুর বইপত্র সংগ্রহ করেছিলাম, সেগুলি বিমানযাত্রায় সঙ্গে আনা সম্ভব ছিল না, অনেকগুলি প্যাকেটে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম জাহাজ ডাকে, সেগুলি এসে পৌঁছেছিল। অন্য ভাষার লেখক বন্ধুদের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল চিঠিপত্রে, তাদের কাছ থেকেও সাহায্য চেয়েছি, তারা ডাকে বই-পত্র পত্রিকা পাঠিয়ে দিয়েছে। যেমন, আনতোনিও নামে একজন স্প্যানিশ বন্ধুর মুখে নিকোলাস গিলেন নামে একজন কবির কথা শুনেছি অনেকবার। বিংশ শতাব্দীতে স্প্যানিশ ভাষার বিখ্যাত কবি উনামুনো, হিমেনেথ, লোরকা, আলবের্তি, নেরুদা প্রমুখ কবিদের পরিচিতি সারা বিশ্বে, কিন্তু নিকোলাস গিলেনের কথা আমার জানা ছিল না। এর জন্ম কিউবায়, রচনার ভাষা স্প্যানিশ, কবিতা লিখেছেন আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের কালো মানুষদের ওপর অত্যাচার-অবিচার নিয়ে। 'নিগ্রো' নামে একটি কবিতা বড়ই মর্মন্তুদ, যখন সেটি লেখা হয়েছিল, তখনও কিউবায় ফিডেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে বিপ্লব হয়নি, সেখানকার ও আমেরিকার নিগ্রোদের অবস্থা একই রকম ছিল। আমার বন্ধুটিকে চিঠি লিখে নিকোলাস গিলেনের কবিতা ও তাঁর সম্পর্কে তথ্য আনিয়ে নিয়েছিলাম। আর ফরাসি কবিতা সম্পর্কে তো মার্গারিটের সাহায্য পাওয়া যায় সব সময়, সে-সপ্তাহে দুটি করে চিঠি লেখে। ফরাসিতেও আমি

ককতো, এলুয়ার, আরাগঁ, আঁরি মিশো, রনে শার প্রমুখের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলাম লেওপোল্দ সেঙ্ঘর-কে। ইনিও মূল ফরাসি দেশের নন, উপনিবেশের কালো রঙের কবি।

'অন্য দেশের কবিতা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। তখন মধ্যরাত পেরিয়েও আরও অনেকক্ষণ আমরা আড্ডা দিতাম শ্যামবাজার মোড়ে, প্রায়ই সেখানে নানা রকম হুটোপাটি ও উৎপাত হত; একদিন সেরকমই একটা কিছুর মধ্যে পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে গেল শ্যামপুকুর থানায়। এই সব সময়ে পকেটে এতই কম পয়সা থাকে যে ঘুষ দিয়ে ছাড়া পাওয়ারও উপায় নেই, সারারাত আমাকে বসিয়ে রাখা হল একটা কাঠের বেঞ্চে। থানার বড়বাবু ওপরেই থাকেন, সকালে তিনি নেমে এসে কড়া গলায় আমাকে ধমক দিতে লাগলেন, আমার নামে গুণ্ডামি ও আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ, যদিও আসল কারণটি ছিল এক ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে বিবাদ। পুলিশ আসার পর অন্য বন্ধুরা সরে পড়েছিল, আমি পারিনি। আমার পরিচয় দেবার মতন কিছু নেই, পুলিশের কোনও কর্তাকেও চিনি না, এইসব ক্ষেত্রে অপরাধ অস্বীকার কিংবা তর্কাতর্কি করে কোনও লাভ হয় না জানি! কয়েক বছর আগে প্রায় এই রকমই একটি কারণে শক্তি ও আমি গভীর রাতে বটতলা থানায় নীত হয়েছিলাম। তখন আমি জনসেবক পত্রিকায় পার্ট টাইম কাজ করি, সে পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নাম থাকে অতুল্য ঘোষের, এবং তিনি তখন মুখ্যমন্ত্রীর চেয়েও ক্ষমতাবান। যদিও ওই পত্রিকার কর্মী হিসেবে তাঁর সঙ্গে আমার কখনও একটিও বাক্য বিনিময় হয়নি, তবু সেই সূত্র ধরে শক্তি হুঙ্কার দিয়ে দারোগার দিকে আঙুল তুলে বলেছিল, সুনীল, এক্ষুনি অতুল্য ঘোষকে টেলিফোন করে এই লোকটাকে নর্থ বেঙ্গলে বদলি করে দাও তো। শক্তির এ কথার প্রতিক্রিয়া হল অপ্রত্যাশিত, দারোগাবাবুটি আমাদের ঠাস ঠাস করে থাপ্পড় মারতে মারতে বলেছিলেন, আমাকে অতুল্য ঘোষ দেখাচ্ছ? অতুল্য ঘোষের বাবাও আমাকে নর্থ বেঙ্গলে বদলি করতে পারবে না! (পরবর্তীকালে শক্তি একজন পুলিশ-বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিল, ডি আই জি, আই জি র‍্যাঙ্কের অনেক অফিসার ছিল তার ভক্ত, কিন্তু সেই সময়ে শক্তিও জানত না যে কলকাতা পুলিশ আর বাংলা পুলিশের প্রশাসন আলাদা, কলকাতা পুলিশের কোনও কর্মীকে সত্যিই জেলায় বদলি করা যায় না।) সেদিন শাস্তি হিসেবে দারোগাটি আমাদের পেট পাম্প করার জন্য পাঠিয়েছিলেন হাসপাতালে, সে অতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার, শেষ পর্যন্ত অব্যাহতি পাওয়া গিয়েছিল এই জন্য যে আর জি কর হাসপাতালের তরুণ হাউস সার্জেনদের মধ্যে একজন কবিতাপ্রেমী ছিল এবং সে কৃত্তিবাসের কবিদ্বয়কে চিনতে পেরেছিল।

এখানেও অনেকটা সেই ব্যাপারই হল আকস্মিকভাবে। থানার বড়বাবু আমাকে শাসাচ্ছেন আদালতে পাঠিয়ে জেল খাটাবেন বলে, হঠাৎ চোখে পড়ল তাঁর টেবিলের ওপর একটি নতুন সংখ্যা দেশ পত্রিকা। আমি বিনীতভাবে বললাম, আপনি দেশ পড়েন? ওই পত্রিকায় আমার ধারাবাহিক অন্য দেশের কবিতা বেরোচ্ছে, আমি লেখালিখি করি, গুণ্ডামি করা আমার কাজ নয়। ভদ্রলোক হঠাৎ থেমে গিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তাঁর মুখের রেখাগুলিই বদলে গেল, তিনি সবিস্ময়ে বললেন, সে কী! ওগুলো তো আমি নিয়মিত পড়ি। আপনি তো লার্নেড লোক মশায়, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, জার্মান কত ভাষা জানেন, আপনাকে ধরে এনেছে? ছি ছি ছি, আসলে কী হয়েছিল বলুন তো?

সত্যি কথা বলতে কী, আমি ফরাসি ভাষা খুব সামান্যই জানি বটে, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, জার্মান ভাষা সম্পর্কে আমার কোনও জ্ঞানই নেই, ওইসব কবিতা অনুবাদ করছিলাম ইংরেজি থেকে। কিন্তু এ রকম পরিস্থিতিতে আগ বাড়িয়ে সে কথা জানিয়ে দেওয়া কি উচিত ছিল? আত্মরক্ষার জন্য, মুখে কিছু না বলে লাজুক হাস্যময় ওষ্ঠে 'লার্নেড লোক' সেজে থাকাই যুক্তিযুক্ত নয় কি? এর পরে ভদ্রলোক আমাকে চা-টোস্ট খাওয়ালেন ও বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন। তবে, 'অন্য দেশের কবিতা' যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন ভূমিকায়

স্পষ্টভাবে সত্য কথা জানিয়েছিলাম যে আমি মোটেই বহু ভাষাবিদ নই। এই মোল্লাটির দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।

বছরখানেক বাদে এই সিরিজটি শেষ হবার পরেও সাগরদা বললেন, তুমি আর একটি কিছু ধারাবাহিক শুরু করো, কী লিখবে তা তুমিই ঠিক করবে। আনন্দবাজারে তখন নানারকম ফিচার লিখছি, তাই দেশ পত্রিকার জন্য ঠিক করলাম একটা ছদ্মনাম। জন্ম হল নীললোহিতের। নামটি প্রমথ চৌধুরীর একটি চরিত্র থেকে নেওয়া, বেকার, বাউণ্ডুলে, ভ্রমণপ্রিয়, তখন আমার বয়স একত্রিশ, নীললোহিতের বয়স একটু কমিয়ে দিলাম, তার বয়স সাতাশের বেশি কখনও বাড়বে না। এই নীললোহিত নামের প্রথম সিরিজটির নাম বিশেষ দ্রষ্টব্য। এটাও শেষ করার পর সাগরদা থামতে দিলেন না, তিনি আমাকে ভার দিলেন প্রতি সপ্তাহে 'সাহিত্য সংবাদ' লেখার। এর জন্যও আমি গ্রহণ করলাম আর একটি নতুন নাম, সনাতন পাঠক। আমার দিদিমা আমাকে সনাতন নামে ডাকতেন, আর সনাতন পাঠক বলতে আল্টিমেট রিডারও বোঝানো যায়। আমার উপার্জনে সহায়তা করার জন্যই সাগরদা এরকম পর পর লেখার জন্য আদেশ দিতেন। অবশ্য এরকম এক একটি লেখার জন্য দক্ষিণা পনেরো-কুড়ি টাকার বেশি ছিল না।

সন্তোষকুমার ঘোষ মাঝে মাঝে আমাকে কিছু কিছু লেখার বরাত দিতেন, তিনি নজর রাখছিলেন আমার ওপর, হঠাৎ একদিন আমাকে আর একটি প্রস্তাব দিলেন। তখন সংবাদপত্রের অর্থনীতি অন্যরকম ছিল, এখনকার মতন এত বিজ্ঞাপনের প্রাবল্য ছিল না, লেখা থাকত প্রচুর, শুধু সংবাদ দিয়ে কুলোনো যেত না, দিতে হত নানারকম ফিচার। আনন্দবাজারের প্রতিদিন শেষ পৃষ্ঠা জুড়ে থাকত এক এক রকমের বিষয়, যেমন সোমবারের 'আনন্দমেলা' ছিল পাতা জোড়া, সেই রকম প্রতি শনিবার 'দেশে দেশে', তাতে থাকত শুধু আন্তর্জাতিক সংবাদ ও আকর্ষণীয় ফিচার। সন্তোষদা বললেন, তুমি কলকাতার বাইরে যেতে চাও না, এই সাপ্তাহিক পৃষ্ঠাটার ভার নাও। শুনে প্রথমে আমার খটকা লেগেছিল, এতদিন সেই পৃষ্ঠাটি দেখাশুনো করতেন আমার সমসাময়িক লেখক ও বন্ধু মতি নন্দী। কোনও কারণে কি সন্তোষদা মতিকে সরিয়ে দিয়ে আমাকে সেই জায়গায় বসাতে চান? যদি তাই-ই হয়, তা হলে এ কাজ গ্রহণ করা আমার পক্ষে মোটেই নীতিসম্মত নয়। প্রকৃত অবস্থাটা জানার জন্য আমি খুঁজে খুঁজে মতির বাড়িতে উপস্থিত হলাম এক দুপুরে। মতি খানিকটা অবাকই হয়েছিল। সে অবশ্য জানাল যে সে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার কিছু লেখার কাজ নিয়েছে, তা ছাড়া খেলার লেখা বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে চায়, তাই 'দেশে দেশে' পৃষ্ঠাটি ছেড়ে দেবার প্রস্তাব সে নিজেই দিয়েছে। অর্থাৎ ওই দায়িত্ব গ্রহণে আমার কোনও বাধা নেই। কাজটা অবশ্য তেমন সহজ নয়। পুরো এক পৃষ্ঠার অন্তত ছ'কলম লেখা আমাকে জোগাড় করতে হবে অর্থাৎ বিদেশি পত্র-পত্রিকা থেকে অংশবিশেষ অনুবাদ এবং আমার নিজের দেশবিদেশ ঘোরার অভিজ্ঞতাভিত্তিক ফিচার। নানারকম ছবি সংগ্রহের দায়িত্বও আমার। এবং প্রতি শুক্রবার রাত্তিরে প্রেসে গিয়ে আমাকেই করতে হবে পেজ মেকআপ। লেখা মাপে বেশি হলে কেটে বাদ দিতে হয়, কম পড়লে লাইন গুনে লিখে দিতে হয় প্রেসে বসে। তখনও হ্যান্ড সেট টাইপের যুগ, কিছুদিন পরে আসে লাইনো। প্রেসের কর্মীরা যাতে মেকআপ করতে অযথা দেরি না করেন, সেজন্য তাঁদের দাদা-কাকা বলে অনুনয় করতে হত।

এই কাজের জন্য আমাকে আনন্দবাজার অফিসে এই প্রথম দেওয়া হল একটি টেবিল-চেয়ার। গৌরকিশোর ঘোষ, নিখিল সরকার, কিছুদিনের জন্য বরুণ সেনগুপ্ত যে-ঘরে বসতেন, আমার স্থান হল সেই ঘরে। বাইরের লোক এসে মনে করত, আমি বুঝি আনন্দবাজারে চাকরি নিয়েছি বা পেয়েছি, তা কিন্তু নয়, হাজিরা খাতায় আমার নাম ছিল না, মাস মাইনেও ছিল না। প্রতি শনিবার ওই এক পৃষ্ঠার রচনা ও মেকআপের জন্য আমার পারিশ্রমিক ছিল পঞ্চাশ টাকা। এ নিয়ে নির্মম কৌতুকও হত মাঝে মাঝে। শুক্রবার রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত প্রেসে

থেকে খেটেখুটে পেজ মেকআপ করে চলে গেলাম হৃষ্টচিত্তে, পরদিন সকালে চক্ষু চড়কগাছ! অনিবার্য কারণবশত এ সপ্তাহে 'দেশে দেশে' প্রকাশিত হল না, তার বদলে বাটা কোম্পানির নানারকম জুতোর ছবি। শেষ মুহূর্তে বড় বিজ্ঞাপন এসে গেলে প্রথম কোপ পড়ত ফিচার পৃষ্ঠার ওপরে। বিজ্ঞাপনই সংবাদপত্রের লক্ষ্মী। ওই বিজ্ঞাপনের জন্য কোম্পানির অতিরিক্ত লাভ হল, কাটা গেল আমার পঞ্চাশ টাকা, লেখা ছাপা না হলে টাকা দেওয়ার নিয়ম নেই, আমার পরিশ্রম বৃথা। পুরনো হয়ে যাবে বলে অধিকাংশ লেখাই ব্যবহার করা যাবে না পরের সপ্তাহে। তবে আমার সান্ত্বনা ছিল এই, কোনও কোনও মাসে তো পাঁচটা শনিবারও হয়!

'দেশে দেশে' পৃষ্ঠায় অনুবাদগুলিতে নাম ব্যবহার করতাম না, মৌলিক রচনার জন্য গ্রহণ করলাম আর একটি নাম, নীল উপাধ্যায়। অর্থাৎ নিজের নাম ছাড়াও নীললোহিত, নীল উপাধ্যায় ও সনাতন পাঠক এই চারটি নামে আমার গদ্য-র দাপাদাপি চলতে লাগল অনবরত। অনেকেই জানত না, এই চারটি নামের আড়ালে আছে একই ব্যক্তি। কলেজ জীবনে যে গদ্যের খুঁতখুঁতুনির জন্য বাংলা পরীক্ষার সব কটি প্রশ্নের উত্তর লিখে শেষ করতে পারত না, সে-ই এখন জলবত বাংলা গদ্য লেখে বন্যার বেগে। পরবর্তীকালে আমার মনে হয়েছে, বাংলা সংবাদপত্রের যাবতীয় লেখকদের মধ্যে একমাত্র অমিতাভ চৌধুরী (প্রথম) ছাড়া আমার চেয়ে দ্রুত গদ্য বোধহয় আর কেউ লিখতে পারেন না। চাকরি করব না, শুধু লিখে জীবিকা অর্জন করতে হবে, এই জেদ আমি চালিয়ে গেছি ছ' বছর, তার জন্য আমাকে আয়ুক্ষয়ও করতে হয়েছে অনেক।

মাথার মধ্যে কবিতা ও গদ্যের জন্য যেন দুটি আলাদা প্রকোষ্ঠ ভাগ করা ছিল। এই সময়ে কবিতাও লিখেছি তুলনামূলকভাবে বেশি। দেশে ফেরার এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয় আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি'। এরকম নামকরণে বন্ধুবান্ধবদের কয়েকজন বেশ আপত্তি জানিয়েছিলেন, তখন একজন কারওর বই বার করার উদ্যোগ নিলে অনেকে মিলে তার নাম, মলাট, হেডিং, বডি টাইপ ইত্যাদির আলোচনা ও প্রুফ দেখার কাজ হত। উদাস সিংহ কিংবা উড়ন্ত সিংহাসন এই দুটি নামও আমার মনে এসেছিল, কিন্তু 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি' এরকম চাঁছাছোলা গদ্য নামই আমার বেশি পছন্দ হল। কবিতার শব্দবন্ধে মুখের ভাষার সিনট্যাক্স প্রয়োগের যত দূর সম্ভব চেষ্টা চালাচ্ছি, গীতি কবিতা থেকে সরে যাচ্ছি অনেক দূরে, সুতরাং লালিত্যময় নাম দেবার প্রশ্নই ওঠে না। 'উড়ন্ত সিংহাসন' নামটি শক্তির খুব মনে ধরেছিল, পরে সে নিজের একটি কাব্যগ্রন্থে ওই নামটি ব্যবহার করে। 'কৃত্তিবাস'ও তখন বেরোচ্ছে নিয়মিত, এরই মধ্যে কৃত্তিবাসের খরচও জোগাড় করতে হত, আমি চাঁদা তুলে পত্রিকা চালানোয় বিশ্বাসী ছিলাম না।

ধরাবাঁধা চাকরি না করলে উপার্জন অনিশ্চিত ও অনিয়মিত থাকে বটে, কিন্তু একটা সুবিধেও পাওয়া যায়, একটা স্বাধীন সত্তার অনুভূতি, সারা সপ্তাহে নটা-দশটার সময় নাকে-মুখে ভাত গুঁজে অফিসে ছুটতে হয় না। চাকুরিজীবীরা সমাজের সুবিধেভোগী শ্রেণী হলেও তারা সকালগুলো উপভোগ করতে পারে না। অস্থিরতায় ভুগতে হয়। আমার সকালগুলি খুব লম্বা, দুপুরও ঢিলেঢালা, খাওয়ার সময়ে ডাঁটা চিবোনো কিংবা কাঁকড়া খাওয়ার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। সকালের দিকে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা কম, সকলেই কোনও না কোনও জীবিকায় যুক্ত হয়েছে, শক্তি শিয়ালদার কাছে একটা টিউটোরিয়াল হোম খুলে ফেলেছে, চোখমুখে বেশ একটা উদ্দীপনার চিহ্ন নিয়ে শক্তিকে বিভিন্ন মাস্টারদের পরিচালনা করতে দেখা যায়। কয়েকবার দেখতে গেছি বিকেলের দিকে, শক্তি আমাকেও পড়াবার জন্য অনুরোধ করেছিল, আমি উৎসাহ বোধ করিনি।

সকালগুলোতে অনেক সময় পাওয়া যায় বলে আমি সংবাদপত্রের চটজলদি লেখা ছাড়া অন্য কিছু রচনার চেষ্টায় অতৃপ্তি ও রোমাঞ্চে মেতে থাকতাম। বিদেশে শুরু করেছিলাম দুটি

গদ্য রচনা, 'যুবক যুবতীরা' নামে একটি উপন্যাস কিংবা উপন্যাসের মতন কিছু, যাতে টানা কোনও কাহিনী থাকবে না, নায়ক-নায়িকা থাকবে না, ন্যারেটিভ স্টাইল বর্জিত হবে এবং বাস্তবতা ও পরাবাস্তবতা মিশ্রণের কিছুটা পরীক্ষা। প্রবাসে একটু একটু করে লিখেছি, এখানে বছর খানেকের মধ্যে সেটা শেষ হয়ে গেল। একটি ছোট পত্রিকার সম্পাদক কারও মুখে সে লেখাটির কথা শুনে চেয়ে পাঠালেন। পাণ্ডুলিপিটি জমা দিতেই মনোনীত হল ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য, কিন্তু প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পরই আমার হাড়-পিত্তি জ্বলে ওঠার উপক্রম। সম্পাদকমশাই যেখান থেকে সেখান থেকে প্রচুর লাইন বাদ দিয়েছেন। এই সম্পাদকমশাই একটি টিউটোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ, তার ছাত্র-ছাত্রীদের পত্রিকাটি কেনা বাধ্যতামূলক, আমার লেখাটিতে নাকি প্রচুর শব্দ অশ্লীল, ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠের অনুপযুক্ত, তাই তিনি ইচ্ছেমতন কাটছেন। আমি দেখা করে বললাম, আমি একটি শব্দও বাদ দিতে বা বদল করতে রাজি নই, আপনাকে ছাপতে হবে না। পাণ্ডুলিপি ফেরত দিন। আশ্চর্য, তিনি পাণ্ডুলিপি ফেরত দিতে রাজি নন, বরং চোখ রাঙিয়ে বললেন, তাঁর সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমার নেই। দ্বিতীয় কিস্তিও ছাপা হল ছিন্নভিন্ন অবস্থায়। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাকে খানিকটা হুমকি দিতে হল, তাঁকে বললাম, একদল বন্ধুবান্ধব এনে তাঁর টিউটোরিয়ালটিই বন্ধ করে দেব! এতে কাজ হল। পাণ্ডুলিপিটা ফেরত পাবার পর আমার চক্ষু লাল হওয়া স্বাভাবিক, কারণ পাণ্ডুলিপিটির অনেক লাইন লাল কালি দিয়ে কাটা, অতি কষ্টে সংযত করেছি নিজেকে। কফি হাউসে এই প্রসঙ্গ নিয়ে তপ্ত আলোচনা চলেছিল, তা শুনে উত্তরতরঙ্গ নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক আগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে একটি সংখ্যাতেই ছেপে দিলেন পুরো উপন্যাসটি, একটি শব্দও বাদ না দিয়ে। কফি হাউসের বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা শুধু গদ্য লেখেন, তাঁরা 'যুবক-যুবতীরা' পড়ে মুখ বিকৃত করেছিলেন, গল্প-উপন্যাসের এলাকায় আমার অনধিকারীর মতন উঁকিঝুঁকি মারা অনেকের পছন্দ হয়নি, একজন প্রবীণ লেখকও মনে করতেন, কবিদের গল্প-উপন্যাস লেখার চেষ্টা করাই উচিত নয়। তবে কবিরা কেউ কেউ পছন্দ করেছিলেন, আমার ওই রচনাটি।

পত্রিকায় ছাপা তো হল, এরপর সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশের কী পদ্ধতি, তা আমার জানা ছিল না। অনেক লেখকের জীবনীতে পড়েছি অবশ্য যে, প্রথম জীবনে অনেক সংগ্রাম করে যেতে হয়, উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি বগলে নিয়ে ঘুরতে হয় প্রকাশকদের দরজায় দরজায়, একটু-আধটু অপমান গায়ে মাখলে চলে না, অনেক বিখ্যাত উপন্যাসও প্রথমে অনেক প্রকাশক ফেরত দিয়েছেন। কিন্তু এই পদ্ধতি অনুসরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব, আমি যে প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে পারি না, জীবনের প্রথম কবিতা ডাকে পাঠিয়েছি, ছাপা হয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত সব লেখাই ডাকে পাঠিয়েছি কিংবা কেউ চেয়েছে, উপযাচক হয়ে কোথাও লেখা দিতে যাইনি, সংগ্রাম-টংগ্রামও করতে হয়নি। প্রত্যাখ্যান সহ্য করার চেয়ে প্রত্যাশা না থাকাও ভালো, আমাকে যে লেখক হতেই হবে, তেমন মাথার দিব্যি তো কেউ দেয়নি। যুবক-যুবতীরা পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই রয়ে গেল।

আর একটি লেখাও আমি শেষ করেছিলাম, 'সোনালি দুঃখ'। এটা ঠিক উপন্যাসও নয়, পুরোপুরি মৌলিক রচনাও নয়। মার্গারিটের সঙ্গে প্রায়ই আমার সাহিত্য নিয়ে বিনিময় প্রতিযোগিতা চলত, অর্থাৎ আমি কোনও বাংলা কবিতা বা গল্পের ভাবানুবাদ ওকে শোনালে ও সঙ্গে সঙ্গে তার সমতুল্য ফরাসি কোনও কবিতা বা গল্প খুঁজে বার করত। সেইরকমভাবেই আমি রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী সবিস্তারে জানাবার পর মার্গারিট বর্ণনা করল ত্রিস্তান ও ইসল্টের গভীর প্রণয় ও বিষাদময় এক মর্মান্তিক উপাখ্যান। এ উপাখ্যান শুধু ফরাসি সাহিত্যের নয়, মধ্য যুগে প্রচলিত ছিল ইউরোপের অনেক দেশে। এই অভিশপ্ত প্রণয়ী যুগলকে নিয়ে গান বেঁধেছে ত্রুবাদুররা, নাটক হয়েছে, এমনকী আধুনিককালে ভাগ্নারের মতন সঙ্গীতস্রষ্টা অপেরাও রচনা করেছেন। এ কাহিনী আমাদের এখানে তেমন পরিচিত নয়, অন্তত আমি আগে শুনিনি বা

পড়িনি, সেটি এমনই মর্মস্পর্শী যে বাংলায় লিখে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছিল। এ কাহিনীর নানারকম ভাষ্য আছে, সবগুলিই সংগ্রহ করেছিলাম, মার্গারিট সাহায্য করেছিল, সেগুলির নির্যাস নিয়ে এবং নিজস্ব কল্পনা মিশিয়ে, বিশেষত শেষ দৃশ্যে, আমি রচনা করি একটি নতুন ভাষ্য। নায়ক ত্রিস্তানের নামের অর্থ দুঃখ, আর ইসল্টের মাথার চুলের রং সম্পূর্ণ সোনালি, তার একটি মাত্র চুল নিয়েই কাহিনীর শুরু, তাই নামকরণ 'সোনালি দুঃখ'। পরে বই হিসেবে প্রকাশের সময় আমি এটি উৎসর্গ করি মার্গারিটকে, উৎসর্গ পত্রে ইংরেজিতে লিখেছিলাম, টু মার্গারিট, ফর দা হেল্প অফ হার গুড হ্যান্ডস। ডাকে বইটি পাবার পর মার্গারিট চিঠিতে জানিয়েছিল, তুমি তো আমায় বাংলা পড়তে শেখাওনি, আমি বইটার মলাটে কতবার যে হাত বুলিয়েছি, আর কেন জানি না, আমার কান্না পাচ্ছিল! ততদিনে মার্গারিটের সঙ্গে শঙ্খ ঘোষ ও জ্যোতির্ময় দত্তের পরিচয় হয়ে গেছে ও দেশে এবং তার কলকাতায় আসা সুদূর পরাহত হয়ে যাচ্ছে।

এই বইখানির জন্য আমার পরম লাভ, বহু ভাষাবিদ এবং আমার প্রিয় লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে পরিচয় ও সান্নিধ্য। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ অবশ্য মোটেই মধুর নয়। তিনি আমাকে চিনতেন না, তিনি রবীন্দ্রনাথে এমনই আপ্লুত যে রবীন্দ্র-পরবর্তী কোনও কবিতাই পড়বেন না ঠিক করেছিলেন, সুতরাং আমার মতন একজন অকিঞ্চিৎকর আধুনিক কবির অস্তিত্ব সম্পর্কেই তাঁর অবহিত থাকার কথা নয়, কিন্তু অন্য দেশের কবিতা সিরিজ লেখার সময় আমার একটা কৌতুকের চেষ্টা কেউ তাঁর নজরে এনেছিল এবং তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পত্রিকায় মন্তব্যও করেছিলেন। ফরাসি শব্দের উচ্চারণ নিয়ে আমাদের এখানে নানারকম বিভ্রান্তি আছে, সঠিক উচ্চারণ বাংলা অক্ষরে প্রকাশ করাও বোধহয় সম্ভব নয়। ছেলেবেলা থেকে আমরা দেখে আসছি ভিক্তর হুগো, অথচ ফরাসি ভাষায় শব্দের প্রথমে এইচ অক্ষরটি থাকলে তার উচ্চারণ নিষিদ্ধ। ফরাসি শব্দগুলি ইংরেজি উচ্চারণে লিখলে ঝামেলা ঢুকে যায়। যেমন নেপোলিয়নকে নাপোলিয়ঁ দেখতে আমাদের চোখে লাগে। কেউ কেউ প্যারিসকে লেখেন পারি, অথচ ফ্রাঁস না, লিখি ফ্রান্স। তা হলে Arthur Rimbaud এই কবির নামের উচ্চারণ কী হবে? আর্থার রিমবড? কেউ কেউ লেখেন আর্তুর র‍্যাঁবো। কিন্তু মার্গারিট ও অন্য ফরাসিদের মুখে আমি শুনেছি, 'র‍্যাঁবো' উচ্চারণটিও সঠিক নয়, ওদের আর-এর উচ্চারণ ইংরেজি আর-এর মতন একেবারেই নয়, র-এর বদলে খ আর হ-এর মাঝামাঝি; যেমন রেডিয়ো শোনায় হ্রাদিও'র মতন। এবং এন-এর মতন এম-কে সব সময় চন্দ্রবিন্দু করা চলে না। সেই জন্যই উচ্চারণের জটিলতার ইঙ্গিত করে আমি লিখেছিলাম, র‍্যাঁবো'র বদলে হ্যাম্বো লিখলে কেমন হয়? সৈয়দ মুজতবা আলী তাতেই দারুণ চটে গিয়ে লিখলেন, আজকালকার ডেপো ছোঁড়ারা দু'পাতা ফরাসি শিখেই মনে করে দিগ্‌গজ হয়ে গেছে। হ্যাম্বো? কবি না পাঁঠার ডাক বোঝার উপায় নেই ইত্যাদি।

আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে চিঠি লিখে সবিস্তারে ও সবিনয়ে জানালাম যে, আমি মোটেই ফরাসি জানি না, উচ্চারণ নিয়ে বিদ্যে ফলাবার স্পর্ধা দেখাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমি নেহাতই কৌতুক করেছি। আলী সাহেব আমার এই কৈফিয়ত গ্রাহ্য করলেন না, উত্তরও দিলেন না। তিনি পাকিস্তানি শাসন মেনে নিতে পারেননি বলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে এসেছিলেন, এক সময় ছিলেন কলকাতার বেতার কেন্দ্রের অধিকর্তা। কিছুদিন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় স্থান শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করেছেন, সেখানে তাঁর অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি, বিশ্বভারতী থেকে পদত্যাগ করলেও জেদের বশে বোলপুরে থাকতেন ঘরভাড়া নিয়ে; পঁয়ষট্টি সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তাঁকে কিছু কিছু লাঞ্ছনাও সহ্য করতে হয়, তবু তাঁর রচনায় কখনও মালিন্যের ছাপ পড়েনি। ডালহাউসি স্কোয়ারে স্পেন্সেস হোটেলে (যেখানে মাইকেল মধুসূদন থেকেছেন কিছুদিন, এখন হোটেলটির অস্তিত্ব নেই) প্রায় প্রতি সন্ধেবেলা সাগরময় ঘোষকে কেন্দ্র করে একটি পানাহারের আড্ডা বসত, মুজতবা আলী সেখানে যোগ দিতেন মাঝে মাঝে, সাগরদার প্রশ্রয়ে আমিও কয়েকবার গেছি। একদিন মুজতবা আলী আমাকে দেখেই যেন

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, আকারে ইঙ্গিতে বোঝালেন যে আমার উপস্থিতি তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। আমি মনে আঘাত পেয়েছিলাম এই জন্য যে আমি যে তাঁর লেখার, বিশেষত ভাষা ব্যবহারের কতখানি ভক্ত তা তাঁকে বোঝাতেও পারছি না। একটা এলেবেলে কৌতুক করার জন্য এই শাস্তি! তারপর বোধহয় সাগরদাই আমার 'সোনালি দুঃখ' তাঁকে পড়তে দিয়েছিলেন, হঠাৎ আমি সবুজ কালিতে লেখা রাবীন্দ্রিক অক্ষরে একটি চিঠি পেলাম আমার এই প্রিয় লেখকের কাছ থেকে। দীর্ঘ চিঠিটিতে তিনি লিখেছেন যে, ফরাসি ভাষা থেকে এই সুবিখ্যাত কাহিনীটি তিনি নিজেই কেন আগে লেখেননি, সে জন্য তাঁর আফসোস হচ্ছে, এবং এ বইখানি তিনি তাঁর শিয়রের কাছে রেখে দিয়েছেন।

শুধু চিঠি লিখেই ক্ষান্ত না হয়ে তিনি সাগরদাকে বলেছিলেন, ওই ছোঁড়াটাকে তুমি এক সন্ধেবেলা ডেকে পাঠাও। স্পেন্সেস হোটেলের সেই টেবিলে বসার অধিকার পাবার পর সৈয়দ মুজতবা আলী সুরার পাত্র তুলে বললেন, আজ থেকে তুমি আমাদের ইয়ার হলে। আর যাই করো, কখনও ফরাসি উচ্চারণ ফলিও না। আমি কান মুলে বলেছিলাম, নাক খত দেব কী? তারপর অনেকদিন আমি তাঁর সান্নিধ্যে বসে অনেক রসিকতা ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ইয়ার্কি শোনার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি। দেখা না হলে, চিঠি লিখতেন মাঝে মাঝে, সেসব চিঠি বারবার পড়বার মতন। এখনকার সাহিত্যিকদের এরকম চিঠি লেখার অভ্যেস চলে গেছে।

চুয়াল্লিশ

উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ কেন এবং কী কারণে হয়েছিল, তা ক'জন মনে রেখেছে? একাত্তর সালের যুদ্ধ ইতিহাসের মর্মে চিরকাল গাঁথা থাকবে, কিন্তু তার ছ' বছর আগেকার যুদ্ধটাকে একেবারে বাচ্চা ছেলেদের ঝগড়া বলে মনে হয়, অথচ তারই জন্য কত রক্তপাত এবং দু'দেশের সম্পদ ক্ষয়। এক একটা যুদ্ধ মানেই দেশের অগ্রগতি থেমে যাওয়া কিংবা পিছিয়ে যাওয়া।

প্রথমে শুরু হয়েছিল কচ্ছের রান অঞ্চল, যেখানে শুধু বুনো গাধারা চরে বেড়ায়, সেই গুজরাত-সিন্ধু প্রদেশের সংলগ্ন প্রায় শুকনো লবণ হ্রদের অনেকটা অংশ পাকিস্তান দাবি করায়। দাবি মানে আলাপ-আলোচনা নয়, গোলাগুলি চালনা। পশুচারণার জন্য প্রয়োজনীয় জমির জন্য মরতে লাগল মানুষ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য একটা আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে সেই কচ্ছের রানের নব্বই ভাগ অংশ থেকে গেল ভারতের অধিকারে। যুদ্ধ কিন্তু থামল না, কারণটা আসল নয়, যুদ্ধ করতেই হবে, এটাই আসল কথা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, ঘৃণা গোলাবারুদের ধোঁয়ার চেয়েও বেশি। কয়েক মাস পরেই আবার বোমাবর্ষণ শুরু হয়ে গেল কাশ্মীরে। মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হল দু'দেশের স্থলবাহিনী।

কাশ্মীর অনেক দূরে, সেখানকার যুদ্ধের আঁচ পশ্চিমবাংলা কিংবা পূর্ব পাকিস্তানে লাগবার কথা নয়। শুধু সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে নানারকম উত্তেজক খবর আসে। পাকিস্তানের রেডিয়ো ও সংবাদপত্রে প্রচারিত হয় যে পাকিস্তানি বীর সৈনিকদের হাতে ভারতীয় সেনারা পোকা-মাকড়ের মতন মরছে। এক একজন পাকিস্তানি যোদ্ধা দশজন ভারতীয় সৈন্যের সমান, মরলে শহিদ আর মারলে গাজি হবার উদগ্র বাসনা নিয়ে তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আর ভারতে প্রচারিত হচ্ছে যে, ভারতীয়দের আক্রমণের মুখে পাকিস্তানিরা দাঁড়াতেই পারছে না, ক্রমাগত পিছু হটছে, ছাম্ব সেক্টার থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছে, হাজি পীর গিরিবর্ত্ম অনায়াসে

ভারত দখল করে নিয়েছে ইত্যাদি। অঘোষিত যুদ্ধ, দূর থেকে ধনী ও শক্তিশালী দেশগুলি মুচকি মুচকি হাসছে, সেইসব দেশ থেকেই তো দামি দামি অস্ত্র কিনে এনে পরস্পরের দিকে ছোঁড়াছুঁড়ি করছে এই দুটি রাষ্ট্র, চলুক না এরকম আর কিছুদিন। হঠাৎ অবস্থাটা বদলে গেল, ভারতের সেনাপতি জয়ন্তনাথ চৌধুরী অতর্কিতে লাহোর সেক্টারে আক্রমণ করে বসলেন। পাকিস্তান যাবতীয় শক্তি সঞ্চয় করেছিল কাশ্মীর সীমান্তে, অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা পড়ে গেল লাহোরে।

তা হলে কি এবার দু' দেশে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হবে, যে-কোনও সময়ে পূর্ব পাকিস্তানও আক্রান্ত হতে পারে? সেখানকার বাঙালিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এই আশঙ্কা। পশ্চিম বাংলার বাঙালিদেরও মনে হল, ওদিকে যেমন আচমকা লাহোর আক্রান্ত হয়েছে, তার প্রতিশোধ হিসেবে পাকিস্তানিরাও বোমা বর্ষণ করতে পারে কলকাতায়। দ্বিখণ্ডিত বাংলার বাঙালি জাতিসত্তা এই সময় পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, এতদিন তবু যেটুকু যাতায়াত ছিল দু'দিকের মানুষের তা বন্ধ হয়ে গেল সম্পূর্ণভাবে, বই পত্র-পত্রিকার আদানপ্রদানও নিষিদ্ধ হল তো বটেই, এমনকী রবীন্দ্রসঙ্গীতও নিষিদ্ধ হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তানে। সেখানকার হিন্দুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঘোষিত হল শত্রু সম্পত্তি হিসেবে, কারাগারে আটক করা হল বহু হিন্দুকে। পাকিস্তানে জারি আছে সামরিক শাসন, সেখানে আইন-কানুনের তোয়াক্কা করে না সরকার। ভারতীয় গণতন্ত্রে এতখানি সম্ভব নয়, তবুও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল সাম্প্রদায়িকতা, হুমায়ুন কবীর ও শানওয়াজ খানের মতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সম্পর্কেও ছড়াল সন্দেহ, গ্রেফতার হলেন অনেক মুসলমান নেতা। কিছু কিছু লোক আড়ালে সংস্কৃতিজগতের অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সম্পর্কেও ফিসফিস করতে লাগল অকথা-কুকথা।

বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় কলকাতায় সন্ধে থেকে ব্ল্যাক আউট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কুড়ি বছর পর আবার। দোকানপাট সব বন্ধ, রাস্তাঘাট নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তা হলে আমরা যাই কোথায়, আমাদের তো সন্ধের সময় বাড়ি ফেরার অভ্যেস নেই। এই বোকা বোকা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার একমাত্র উপায় সমস্ত বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করা। আমরা আড্ডা বন্ধ করিনি, গুলতানি করেছি কলেজ স্কোয়ারে, হোঁচট খেতে খেতে ঘুরেছি অন্ধকার রাস্তায়, যানবাহনের অভাবে বাড়ি ফিরেছি মধ্য রাত্রি পার করে পায়ে হেঁটে। আমাদের আড্ডায় প্রায় সময়ই অন্তত দু'জন মুসলমান উপস্থিত থাকত, বেলাল চৌধুরী ও শামসের আনোয়ার, কিন্তু তারা মুসলমান কি না কিংবা আমরা হিন্দু কি না, তা মনেই থাকে না। এরই মধ্যে আমরা কয়েকজন বেড়াতে চলে গেলাম ঝাড়গ্রামের কাছে বেলপাহাড়ি অঞ্চলে, ওদিকে কলাইকুণ্ডায় আছে সামরিক বিমানবাহিনীর ঘাঁটি, সেটি ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানি ছত্রীবাহিনীব অবতরণের গুজব ম ম করছে, আমরা সরল ও অবোধের মতন উন্মুক্ত স্থানে রাত্রিযাপন করতে গিয়ে ছত্রীবাহিনী সন্দেহে ধরা পড়ে গেলাম জনসাধারণের হাতে। এই জনসাধারণ সাধারণত যুক্তিটুক্তির ধার ধারে না, অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই রক্তলোলুপতা থাকে, সঙ্ঘবদ্ধ হলেই তা প্রকট হয়, তখন একক অপরাধবোধ কাজ করে না, তা ছাড়া উগ্র দেশপ্রেম কৃত্রিম পেশীবল এনে দেয়। ওদের হাতে আমাদের শরীরগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না, শেষ পর্যন্ত বেঁচে গিয়েছিলাম অনেকটাই বেলাল চৌধুরীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বলা যেতে পারে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপে ভারত-পাকিস্তানের লড়ালড়ি শেষ পর্যন্ত থামল। পাকিস্তানের জঙ্গি শাসক আইয়ুব খান এর মধ্যে একটা হাস্যকর নির্বাচনের মারফত রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, ভারতে জওহরলাল নেহরুর পর প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। কাশীর পণ্ডিত বংশের ছেলে, ছোট্টখাট্টো চেহারার নিরীহ লালবাহাদুর শাস্ত্রী এত বড় একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন, এ তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবেননি, বরং আইয়ুব খানের মুখে যুদ্ধ-হুংকার মানিয়ে যায়। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন এই দু'জনকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাসখন্দে,

সেখানে কাশ্মীর নিয়ে দরাদরি চলল। যুদ্ধ বিরতির যে-কোনও শর্ত মেনে নিলে সেটা আইয়ুবের কাছে পরাজয়ের সমান, আর লালবাহাদুরও ভাবতে লাগলেন, ভারতে যে-রকম পাকিস্তান বিরোধী উন্মাদনা রয়েছে, তাতে আইয়ুবের কাছে কোনও রকম নতি স্বীকার করলে দিল্লিতে ফিরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারটিতে কি আর বসতে পারবেন? তাসকেন্টে আলোচনার কোনও অগ্রগতি নেই। বারবার ভেস্তে যাবার উপক্রম, শেষ পর্যন্ত কোসিগিনের পীড়াপীড়িতে একটা জোড়াতালি দেওয়া যুক্ত বিবৃতি তৈরি হল, ফটোগ্রাফারদের সামনে কাষ্ঠহাসি দিয়ে আইয়ুব ও লালবাহাদুর হাত মেলালেন, তারপর ভোজসভায় কোনওক্রমে একটুখানি নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করে লালবাহাদুর শুতে চলে গেলেন তাড়াতাড়ি। এই যুক্ত বিবৃতির কী প্রতিক্রিয়া হবে দেশে, এই দুশ্চিন্তায় ঘুমের নামগন্ধ নেই, এতটা মানসিক চাপ তাঁর সহ্য হল না, রাত একটা-পঁচিশে শুরু হল প্রবল বুক ব্যথা, সাত মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে গেল শেষনিশ্বাস।

পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধে ভারত-পাকিস্তানের বিন্দুমাত্র লাভ হয়নি। কারও অহংবোধও তৃপ্ত হয়নি, বরং ক্ষতির পরিমাণ বিপুল। ভারতে অর্থনৈতিক অবনতিতে সব দিকে অভাব; তার মধ্যে খাদ্যাভাব সবচেয়ে তীব্র। আমেরিকা বরাবরই পাকিস্তানের পক্ষপাতী, ভারতের জোট নিরপেক্ষতা নীতি আমেরিকার মতে আসলে ভণ্ডামি, তাই পাকিস্তানকে তারা সবরকম সাহায্য করে। চিনের সঙ্গেও সীমান্ত যুদ্ধের পর ভারতের সঙ্গে আর মুখ দেখাদেখিও নেই, চিনও ঝুঁকে আছে পাকিস্তানের দিকে, একমাত্র রাশিয়াই ভারতের ঘোষিত বন্ধু। কিন্তু বিপদের সময় রাশিয়া ভারতকে অস্ত্র ও বিমান পাঠিয়ে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু ভারতকে খাদ্য সরবরাহ করার সামর্থ্য রাশিয়ার নেই। রাশিয়াকেই আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, কৃষিজমির ব্যক্তি মালিকানার বিলোপ করে যৌথ খামার ব্যবস্থার সুফল বিশেষ পাওয়া যায়নি।

যুদ্ধের পর পশ্চিম বাংলায় চাল-গমের দারুণ অনটন, র‍্যাশনিং ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ার উপক্রম। শহরে তবু অনেকগুণ বেশি দাম দিয়ে কালোবাজার থেকে কিছু চাল কিনতে পারা যায়, গ্রামে গ্রামে একেবারে হাহাকার পড়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন সপ্তাহে প্রতি সোমবার বাঙালিদের না খেয়ে থাকার উপদেশ দিয়ে উপহাসের পাত্র হলেন। হোটেলগুলিতে দু'বেলা ভাত পরিবেশন নিষিদ্ধ হয়ে গেল, অর্থাৎ বেশি দাম দিয়ে গোপনে ভাত পাওয়া যাবে এবং চার-পাঁচ তারার বড় হোটেলগুলিতে পোলাও-বিরিয়ানি ঠিকই পাওয়া যাবে। এক জেলা থেকে অন্য জেলায় কিংবা মফস্বল থেকে কলকাতায় চাল আনা-নেওয়া বন্ধ করার জন্য চেক পোস্ট বসিয়ে চালু হল করডনিং, অর্থাৎ আরও এক রকম ঘুষের ব্যবস্থা এবং গ্রামের সাধারণ মানুষ, বয়স্কদের সঙ্গে বাচ্চা ছেলেরাও, এমনকী ঘরের বউরাও নিযুক্ত হয়ে গেল চোরাচালানিতে, রেলের কামরায় সিটের তলায় চালের বস্তা নিয়ে লুকিয়ে শুয়ে থাকে বালক ও নারীরা। রেশনের চাল যে-টুকুও বা পাওয়া যেত, তাতে খুব কাঁকড় মেশানো। ভাত খেতে বসে যখন-তখন দাঁত ভেঙে যাবার উপক্রম হত। চিনিও বাজার থেকে আত্মগোপন করল, গুড় দিয়ে চা খেতে গিয়ে নষ্ট হল চায়ের স্বাদ। সর্ষের তেলে শিয়ালকাঁটার ভেজাল। ভেজাল প্রায় সব কিছুতেই। এমনকী বেবি ফুডে পর্যন্ত। কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা কমে যেতে লাগল হু হু করে, দারুণ এক খাদ্য আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখা গেল দিগন্তে।

লালবাহাদুরের আকস্মিক মৃত্যুর পর ভাগ্য খুলে গেল ইন্দিরা গাঁধীর। প্রবীণ কংগ্রেসী নেতারা মনে করলেন, এই অনভিজ্ঞা তরুণীটিকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে তাঁরাই আড়াল থেকে সুতো টানাটানি করবেন, কিন্তু অচিরেই স্বমূর্তি ধরলেন জওহরলালের কন্যা এবং পিতৃস্থানীয় নেতাদের পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে দিল্লির মসনদে নেহরু বংশের ধারাবাহিক অধিকারের পথ প্রশস্ত করলেন, জাতীয় কংগ্রেসে শুরু হল ভাঙনের পর ভাঙন।

ওদিকে পাকিস্তানেও আইয়ুব খানের দম্ভ ও ক্ষমতা অনেকখানি চূর্ণ হয়ে টলমল করছে গদি, আর একটি সামরিক অভ্যুত্থান আসন্ন। উইংসের আড়ালে অপেক্ষমাণ জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

পূর্ব পাকিস্তানে সব রকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অধিকাংশ নেতা, এমনকী অনেক সংবাদপত্রের সম্পাদকও কারারুদ্ধ, তবু যুদ্ধ চলার সময় অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ মনে করত, ভারতই আক্রমণকারী এবং পাকিস্তানকে ভাঙতে চায়, তাই সরকারকে সমর্থন করা উচিত। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পর অন্য রকম উপলব্ধি হল, পূর্ব পাকিস্তান তো ছিল অরক্ষিত, সৈন্যবল ও অস্ত্রবল প্রায় সবই তো পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সময় ভারতীয় বাহিনী যদি সত্যিই ঢাকা আক্রমণ করত, তা হলে তার প্রতিরোধ করার তো কোনও উপায়ই ছিল না। পাকিস্তানি শাসকদের কাছে পূর্ব বাংলা যেন অতি অবহেলিতা দুয়োরানি। আয়তনে ও জনসংখ্যার হিসেবে জাতীয় সম্পদের কিছুটা বেশি-ভাগ প্রাপ্য বাঙালিদের, কিন্তু তা পাওয়া তো দূরের কথা, সেনাবাহিনীতে, কেন্দ্রীয় সরকারের সিভিল সার্ভিসে বাঙালিদের সংখ্যা নগণ্য। গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত হলে ন্যায্য অধিকার আদায় করে নেওয়া যেত, কিন্তু এই পাকিস্তানে গণতন্ত্র সুদূর পরাহত। ধর্মের মিল থাকলেও সাম্য আসে না, ইসলামি রাষ্ট্র হয়েও পশ্চিমের ভূমিকা প্রভু ও শোষকের, আর পূর্বের মানুষ নির্যাতিত ও শোষিত। তা হলে আর এই রাষ্ট্রের বন্ধন টিকিয়ে রাখার কী অর্থ হয়? স্বশাসন কিংবা স্বাধীনতার দাবি গুঞ্জরিত হতে থাকল পূর্ব পাকিস্তানে।

এই যুদ্ধ এবং পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় আমাদের মন খারাপ লাগত। ওদিক থেকে আবার হাজার হাজার পরিবার ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসতে শুরু করেছে এদিকে। ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে আমি পুরনো ও দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ অভিযানে প্রায়ই যেতাম বিভিন্ন জায়গায়, এর মধ্যে একবার গিয়েছিলাম লালগোলায়। সেখান থেকে অদূরে একটি স্থানের নাম ভগবানগোলা। এই নামটি শুনলেই রোমাঞ্চ জাগে, এখানেই নদীর বুকে নৌকোয় ছদ্মবেশী, পলাতক নবাব সিরাজউদ্দৌলা ধরা পড়ে যান, এবং মুহম্মদী বেগের ছুরিতে প্রাণ হারান। অবশ্য একটা অতি জনপ্রিয় নাটকেই এরকম ঘটনা আছে, আসলে সিরাজ ধরা পড়েছিলেন মালদার মানিকচক ও রতুয়া থানার মাঝখানে, কালিন্দী নদীর ধারে, দানসা ফকিরের দরগায়। সে যাই হোক, সেই ভগবানগোলায় গিয়ে নদীর ধারে একটা নির্জন জায়গায় ইন্দ্রনাথ ও আমি বসে রইলাম কিছুক্ষণ। নদীর মাঝখানে চরা পড়ে গেছে, সেখানে টোকা মাথায়, লুঙ্গি পরা কিছু লোক চাষের কাজে ব্যস্ত। ওখান থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা। ইচ্ছে করলেই এক দৌড়ে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু আসলে যায় না, কোথাও হয়তো ঘাপটি মেরে আছে পাকিস্তানি সীমান্ত রক্ষীরা। ওই যে ওইদিকে নদীর ধারে গাছপালায় ঢাকা, এখানকারই মতন একটা শান্ত গ্রাম, ওটা আসলে বিদেশ, খুবই দূরের দেশ, ওখানে আর কোনওদিনই যাওয়া হবে না। ইন্দ্রনাথের কাঁধের ঝোলায় কিছু না-কিছু থাকেই, একটা রামের বোতল বার করে চুমুক দিতে লাগলাম একটু একটু। ইন্দ্রনাথেরও জন্ম ওপার বাংলায়, এক সময় দু'জনেই ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিলাম কিছু একটা হাসির কথার মাঝখানে।

চাকরি-বাকরির ভরসা না করে, শুধু লেখালেখির জোরেই জীবন চালাবার যে ঝুঁকি নিয়ে আমি বিদেশ থেকে চলে এসেছিলাম, তা ব্যর্থ হয়নি। প্রচুর পরিশ্রম ও নানা ধরনের গদ্য লিখতে হত বটে, কিন্তু আমার উপার্জন মন্দ ছিল না। প্রথম দিকে অনেকেই বলেছিল আমায় ইংরেজি লেখার চেষ্টা করতে, ইংরেজির দক্ষিণা বেশি, শুধু বাংলা লিখে জীবিকানির্বাহ সম্ভব নয়, কিন্তু আমি এক ভাষার মানুষ, দুটি ভাষায় দু'নৌকোয় পা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার ইংরেজিজ্ঞানও তেমন ছিল না। এর মধ্যে আমার বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, আমার ভাই দুটিও পড়াশুনো শেষ করে চাকরি পেয়েছে, সুতরাং আমার সাংসারিক দায় অনেক কম। কিন্তু তখনও আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। অর্থ উপার্জনের জন্য পত্র-পত্রিকায় লিখে যাচ্ছি গদ্য, সেগুলোর অন্য কোনও মূল্যই নেই আমার কাছে, নিজের শখে

লিখে যাচ্ছি কবিতা, প্রকাশ করে যাচ্ছি কৃত্তিবাস পত্রিকা, যেন এমনভাবেই জীবন কেটে যাবে। তবে, এই সময় কয়েকটি বছর জীবনযাত্রা ছিল বড়ই উদ্দাম, অনেক সময় মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি, আচম্বিতে এই পৃথিবী থেকে সরে পড়া খুবই সম্ভব ছিল। কেন এই উদ্দামতা, কেন এত অস্থির ও অসহিষ্ণুভাবে নিজেকেই ভাঙার চেষ্টা, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। দেশ বা স্বাধীনতা সম্পর্কে নৈরাশ্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থাই কী এর জন্য দায়ী, তাও জানি না। সুস্থিরভাবে যে এ বিষয়ে চিন্তা করব, তারও যেন সময় ছিল না। কাব্যসাহিত্যে যৌবনেরই জয়গান হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে চিন্তা করে দেখেছি, আমার প্রথম যৌবন কেটেছে প্রায় একটা বোধহীন অবস্থায়। যা হচ্ছে হোক, এ রকম একটা বেপরোয়া মনোভাব ছিল, এবং বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র শক্তিই ঠিক এইভাবে তাল দিয়েছিল। সন্দীপনেরও ঝোঁক ছিল সম্পূর্ণ নৈরাজ্যের দিকে। বোধের গভীরতা, যদি কিছু এসে থাকে, তা আমাদের এসেছিল মধ্য যৌবনে।

পরপর দুটি প্রায় নাটকীয় ঘটনায় আমার জীবন আবার একটি অন্য দিকে বাঁক নেয়।

'বিশ্বভারতী' পত্রিকার এককালের সম্পাদক সুশীল রায় ছিলেন সাগরময় ঘোষের বিশেষ বন্ধু। তিনি কবিতাও লিখতেন এবং কবিতার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল। 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা ছিল তাঁর জীবিকার অঙ্গ, কিন্তু নিজের শখে তিনি 'ধ্রুপদী' নামে একটি ক্ষীণকায় কবিতা পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশ করেছেন দীর্ঘদিন। এই সুশীল রায়ের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর সময়। সে সময় নানা রকম পাগলামি হয়েছিল, কবিতা-ব্যাধিও বলা যেতে পারে। কবিতা পত্রিকা প্রকাশের প্রতিযোগিতার একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল, ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা চালানোই ছিল বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, আমরা 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা বছরে তিনটের বেশি বার করতে পারিনি, বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'ও তখন অনিয়মিত, 'ময়ূখ' সগৌরবে কিছুদিন চলার পর বন্ধ হয়ে গেছে, 'উত্তরসূরি', 'শতভিষা', 'কবিপত্র'ও অনেক সময় চতুর্মাসিক, কিন্তু রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর বছরে মাসিক কবিতার কাগজ, পাক্ষিকও বেরোতে লাগল, পঁচিশে বৈশাখের কবিপক্ষে আমাদের কবিতা সিংহ ও বিমল রায়চৌধুরী শুরু করলেন 'দৈনিক কবিতা', অর্থাৎ খবরের কাগজের মতন প্রতিদিন কবিতা পত্রিকা, সেটাকেও টেক্কা দেবার জন্য সুশীল রায় ঠিক করলেন, অন্তত পঁচিশে বৈশাখের দিনটিতে বেরুবে 'কবিতা ঘণ্টিকী'। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় কবিতার বুলেটিন। বিমল রায়চৌধুরী আমাদের বন্ধু, সুশীল রায়ের অনুরোধে আমরা 'কবিতা ঘণ্টিকী'র মজাতেও যোগ দিলাম, অর্থাৎ শক্তির 'ধর্মে আছো, জিরাফেও আছো'র মতন আমরা দৈনিক কবিতাতেও আছি, কবিতা ঘণ্টিকীতেও আছি। উভয় জায়গাতেই খাদ্য, পানীয় ও সিগারেট পাওয়া যাবে বিনা খরচে।

সুশীল রায় অত্যন্ত অতিথিবৎসল মানুষ, তাঁর স্ত্রী রন্ধনপটীয়সী ও অতি উদার-হৃদয় মহিলা, ওঁদের পাঁচটি কন্যাও ভারী মধুর স্বভাবের, শতবার্ষিকীয় হাঙ্গামা চুকে যাবার পরও ওঁদের কাঁকুলিয়ার বাড়িতে প্রায়ই আড্ডা ও খাদ্য-পানীয়ের আসর বসত। সাগরময় ঘোষই সেখানে মধ্যমণি, আমাদের মতন অর্বাচীনরা আমন্ত্রণ পেত মাঝে মাঝে। সাগরদা'র একটা বিশেষ গুণ ছিল, তিনি তাঁর বয়স, অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার বিকীরণ বুঝতে দিতেন না, সব বয়েসিদের সঙ্গে মিশতেন সমানভাবে। আমরা তাঁর হাঁটুর বয়েসি হলেও তিনি তাঁর সামনে আমাদের গেলাস ধরার এবং সিগারেট টানার অবাধ প্রশ্রয় দিতেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তও তাঁর সাহেবি পাড়ার আবাসে মাঝে মাঝে পানাহার ও সাহিত্য আলোচনার আসরে আমন্ত্রণ জানাতেন তাঁর ছাত্র, বন্ধু ও অন্যান্য কবিদের। সেখানে উপস্থিত থাকতেন বুদ্ধদেব বসু। আমার বন্ধুস্থানীয় কবিরা সুধীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসুর ছাত্র। তারা ওঁদের সামনে সুরার পাত্র গ্রহণ করার অনুমতি পেলেও সিগারেট টানত বারান্দায় গিয়ে গোপনে। এটা আমার কাছে মজার মনে হত, এবং যেহেতু আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনও ওই দুই মহারথীর ছাত্র হইনি, তাই এই অন্তত

বিভাজন জানতাম না, ফস করে সিগারেট ধরিয়ে সুধীন্দ্রনাথের অননুমোদনের ভঙ্গিটি উপভোগ করতাম।

একদিন সুশীল রায়ের বাড়ির সান্ধ্য আসরের মাঝামাঝি অবস্থায় সাগরদা আমাকে চোখের ইঙ্গিতে বাইরে যেতে বললেন, এবং বারান্দায় নির্জনে হাত রাখলেন আমার কাঁধে। আমি হয়তো ঠিক সময়ে কোনও সাময়িক লেখা জমা দিইনি, এই কথা ভেবে বকুনি খাওয়ার জন্য সঙ্কুচিত, সাগরদা বকুনি দেবার চেয়েও বেশি গুরুতর মুখে বললেন, সুনীল, এবার শারদীয় সংখ্যায় দেশে তোমাকে উপন্যাস লিখতে হবে!

এটা ঠিক বিনা মেঘে বজ্রপাত বলা যায় না। ভূমিকম্পও ঠিক নয়। তবু আকস্মিকতার উপমায় সেই রকমই মনে হয়েছিল। এরকম অভিঘাতের কারণটি হয়তো এখনকার পাঠকবৃন্দ ঠিক বুঝতে পারবেন না, এখন প্রতি বছর শারদীয় সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় সাত-আটটি উপন্যাস ছাপা হয়, নানা বয়েসি লেখকের। সেই সময় শারদীয় দেশে উপন্যাস প্রকাশিত হত একটি মাত্র, সেটি লিখতেন কোনও সর্বজনমান্য প্রবীণ লেখত, অন্য বিশিষ্ট লেখকরা লিখতেন ছোট গল্প, তখন ছোট গল্পের বিশেষ গৌরব ছিল। প্রথম সারির লেখকরা তাঁদের সারা বছরের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পটি জমিয়ে রাখতেন শারদীয় সংখ্যার জন্য। ছোট গল্পের এই গৌরবে আঘাত হানে সিনেমা পত্রিকাগুলি, তারাই প্রথম শারদীয় সংখ্যায় হঠাৎ পাঁচটি-ছ'টি নাম-করা লেখকের উপন্যাস ছাপতে শুরু করে এবং সেই দিকে আকৃষ্ট করে পাঠকদের। সে বছরই সাগরময় ঘোষ পূর্বতন প্রথা ভেঙে সিদ্ধান্ত নেন, প্রবীণ, মধ্যবয়স্ক ও নবীন, এই তিন বয়সের তিনজনের উপন্যাস প্রকাশ করবেন। কিন্তু নবীনদের প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে নির্বাচন করার তো কোনও যুক্তিই নেই! সাধারণ নিয়মটি ছিল এই, প্রথমে বেশ কয়েক বছর 'দেশ' পত্রিকার সাধারণ সংখ্যায় গল্প লিখতে হবে, সেখানে যোগ্যতা প্রমাণিত হলে গল্প লেখার জন্য ডাক পাওয়া যাবে শারদীয় সংখ্যায়, সেখানেও বছরের পর বছর গল্প লিখে লিখে উপন্যাস লেখার সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে চুলদাড়িতে রীতিমতো পাক ধরা পর্যন্ত। কিন্তু আমি তখনও 'দেশ' পত্রিকার সাধারণ সংখ্যাতেও একটাও ছোট গল্প লিখিনি! অন্য অনেক ছোট গল্প লেখক রয়েছেন, ছোট গল্পের নতুন রীতি নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাতেও আমি যোগদান করিনি, গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমি প্রকৃতই অনধিকারী, বহিরাগত আগন্তুক। 'দেশ' পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাস লেখার সম্মান সেই জন্যই আমার পক্ষে শুধু অভাবিত নয়, অবিশ্বাস্যও বটে।

আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল প্রত্যাখ্যানের। 'দেশ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত, সেখানে দুর্বল কিছু লিখে পৃষ্ঠা নষ্ট করা আমার উচিত নয়। উপন্যাসের আঙ্গিক সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই, এক একটা পরিচ্ছেদ শেষ করতে হয় কোথায় এবং কেন? সাগরদাকে মৃদু স্বরে আপত্তির কথা জানাতেই ধমক দিয়ে বললেন, কোনও কথা শুনতে চাই না। তুমি কাল থেকেই লিখতে বসে যাও! সাগরদা দারুণ পড়ুয়া ছিলেন, সমস্ত পত্র-পত্রিকা (লিট্‌ল ম্যাগাজিনও বাদ দিতেন না) পড়ে নবীন লেখক-লেখিকাদের খুঁজতেন, একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত আমার 'যুবক যুবতীরা'ও তিনি পড়েছিলেন, সেই সূত্র টেনে তিনি বললেন, তোমাকে ফর্মটর্ম নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, যা মনে আসবে লিখে যাবে।

সেটা সম্ভবত মে মাস, অর্থাৎ সাগরদা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বেশ দেরিতে, তখন হাতে টাইপ সাজানোর যুগ, কম্পোজ করতে অনেক সময় লাগে। শারদীয় সংখ্যার সব লেখা জুন মাসের মধ্যে জমা দিতেই হয়। উপন্যাস লেখার জন্য সময় দেওয়া হয় এক বছর, আমার মতন একজন অনভিজ্ঞ লেখকে জীবনের প্রথম অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে মাত্র এক দেড় মাসের মধ্যে? এ কখনও সম্ভব? পুরো উপন্যাসটি এক টানা লেখা, বারবার পড়ে কাটাকুটি-সংশোধনের সময়ও আমি পাইনি, প্রত্যেকদিন সকালে আমাদের নাগেরবাজারের বাড়িতে আদালতের পেয়াদার মতন হাজির হত দেশ পত্রিকার পিওন, আগের দিন দু'-চার পাতা যা লেখা হয়েছে

তাই-ই দিয়ে দিতে হত তার হাতে। তখনও জেরক্স চালু হয়নি, নিজের কাছে কপি রাখারও উপায় নেই। প্রেসের ভাষায় পৃষ্ঠাকে বলে স্লিপ, পিওনটি বলত, আজ ক'ছিলিপি? মোটে তিন? ক'দিনে শেষ করবেন?

উপন্যাসে নাকি একটা প্লট থাকতে হয়, প্রথম কয়েকটি দিন প্লট খোঁজার চিন্তায় বৃথা সময় নষ্ট করে তারপর মনে মনে বললাম, দুর ছাই, চুলোয় যাক প্লট! মনে পড়ে গিয়েছিল জ্যাক কেরুয়াকের একটা কথা। বিট জেনারেশানের লেখকদের মধ্যে জ্যাক কেরুয়াকই গদ্য লেখক হিসেবে খুব খ্যাতি পেয়েছিলেন, (অকস্মাৎ অকালমৃত্যুতে এই প্রতিভাবান লেখকটির রচনায় ছেদ পড়ে) সেই জ্যাক একদিন কথায় কথায় আমায় বলেছিলেন, আমায় প্লট খুঁজতে হয় না, নতুন উপন্যাস শুরু করার আগে আমি আমার জীবনের কোনও একটা ঘটনা মনে করার চেষ্টা করি, অমুক বছর অমুক মাসে আমি কী করছিলাম? মনে পড়লে, সেখান থেকে শুরু করি, তারপর লেখাটা নিজের মনে যেদিকে খুশি যায়। কেরুয়াকের একটাই উপন্যাস তখন পড়েছিলাম, 'অন দ্য রোড', সেটি এই রীতিরই রচনা। সমসাময়িক আরও কিছু বিদেশি উপন্যাসেও লক্ষ করেছি, কাহিনী যেন শুরু হয় চলমান জীবনের মাঝখান থেকে, পরিবেশ বা প্রকৃতি বর্ণনার ধানাইপানাই বাদ, চরিত্রগুলির চেহারা বা পোশাকটোশাকের বিবরণও অবান্তর, সে সব পরে দু'-একটা আঁচড়ের অপেক্ষায় থাকে।

কয়েকদিন আগে, আমার এক বন্ধুর ভাই সকালে এসে আমার ঘুম ভাঙিয়েছিল, তার দাদা আগের রাত্রে বাড়ি ফেরেনি, আমার কাছে খোঁজ নিতে এসে সে কথা বলছিল চাপা ভর্ৎসনার ভাষায়, 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসটিও শুরু হল সেইভাবে, তার প্রথম বাক্যটিই এরকম 'সকালবেলা পরিতোষ এসে বলল, এ সব কী শুরু করেছেন আপনারা?' এ উপন্যাসের নায়ক বা প্রধান চরিত্রের নামও সুনীল, উত্তমপুরুষে অর্থাৎ আমি আমি করে লেখা অভিনব কিছু নয়, কিন্তু এর আগে উত্তমপুরুষে লেখা যতগুলি উপন্যাস পড়েছি, সব কটিই লেখকের নাম আর নায়কের নাম এক নয়, অর্থাৎ লেখক বুঝিয়ে দেন, এটা তাঁর নিজের জীবনের কাহিনী নয়, এটা একটা আঙ্গিক মাত্র। কিন্তু সুনীল নাম দিয়ে আমি বোঝাতেই চেয়েছি যে এটা আমার নিজের জীবনের ঘটনা। কিন্তু আত্মজীবনী নয়। প্রকৃত ঘটনা দিয়ে শুরু করলেও লেখার নিজস্ব একটা যুক্তিতে নতুন নতুন প্রসঙ্গের নির্মাণ হয়। বাস্তবজীবনী ছাড়াও মানুষের একটা আলাদা ভাবজীবনী থাকে, তা আলাদা হতে বাধ্য, আবার কখনও কখনও বাস্তবজীবন ও ভাবজীবনী মিলেমিশেও যায়, যেমন সমান্তরাল দুটি রাস্তা কখনও এক জায়গায় মিশে গিয়ে, কিছুক্ষণ চলার পর আবার পৃথক হয়ে যায়। আত্মপ্রকাশের সুনীলও কখনও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পরিবারের এক উদ্ভ্রান্ত যুবা, কখনও সে ক্রুদ্ধ, অস্থির যুবসমাজের প্রতিনিধি। লিখতে লিখতে একটা মজা পেয়ে গিয়েছিলাম, তখন গল্পউপন্যাস লিখে প্রতিষ্ঠা পাবার কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার মনে দানা বাঁধেনি, সাগরদার তাড়নায় এই একটিই লিখছি, ভবিষ্যতে আর লিখব না হয়তো, সুতরাং এই লেখায় কিছু মূল্যবোধ নিয়ে খেলা করলে মন্দ কী, পাঠকদের আঘাত লাগে তো লাগুক। ভাষাটাকেও ইয়ার্কি-ঠাট্টা মিশিয়ে যত দূর সম্ভব মুখের ভাষা করা যায়। এরকম সাবলীল ও যথেচ্ছভাবে অনেকখানি লেখার হঠাৎ আমার মনে হল, এ যা লিখে যাচ্ছি, গল্পের মাথামুণ্ডু নেই, এ কী সত্যি পাঠযোগ্য? নাকি নিতান্তই ভাবালুতা? অথবা সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষায় গর্বস্রাব? পাঠকরা যদি বলেন, (অর্থাৎ আমার কিছু পরিচিত ব্যক্তি যাঁদের মতামতের আমি মূল্য দিই, সেই কয়েকজন পাঠক) এ সব এলোমেলো গদ্যপ্রবাহের কী মানে হয়? এই দ্বিধা ও সন্দেহ যেই মনে এল, অমনি ভয় ধরে গেল, দারুণ শীতের কাঁপুনির মতন অবস্থা। তবে কী পুরোটাই ছিঁড়ে ফেলে আবার লেখা উচিত? তারও তো সময় নেই। দু'-একদিন হতাশা-ব্যর্থতাবোধে ডুবে থাকার পর দেশ পত্রিকার পিওনের তাড়নায় আবার শুরু করতে হল লেখা, জোর করে ঢুকিয়ে দিলাম একটি উপকাহিনী। পূর্ববঙ্গের এক অভিনেত্রীর ঘটনাটি অন্যের মুখে শোনা, আমার

নিজের অভিজ্ঞতার নির্যাস নয় বলেই বেশ কৃত্রিম, এবং আত্মপ্রকাশ উপন্যাসে সেই অংশটিই সবচেয়ে দুর্বল।

'দেশ' শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের সময় আমি লজ্জায় ও আতঙ্কে কিছুদিন লুকিয়েছিলাম কলকাতার বাইরে। উপন্যাসটির জন্য নিন্দা ও প্রশংসা দুই জুটেছিল, তবে, নিন্দা, বিদ্রূপ সমালোচনা এবং কটূক্তিই বেশি। আমার প্রধান সান্ত্বনা, সাগরদা বলেছিলেন, তুমি আমার মুখ রক্ষা করেছ। এবং দু'-একজন, তাঁদের মধ্যে খুবই আশ্চর্যজনকভাবে আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতন রবীন্দ্রবিমুগ্ধ এবং সত্য-শিব-সুন্দরের বন্দনাকারীও জানিয়েছিলেন, এই উপন্যাসে তিনি আন্তর্জাতিক আধুনিকতার স্বাদ পেয়েছেন। সেইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

হয়তো জীবনে আর কোনও উপন্যাসই লিখতে প্রবৃত্ত হতাম না, কিন্তু পরের বছরই আর একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটল। 'জলসা' নামের একটি সিনেমা পত্রিকা তখন খুব জনপ্রিয় ছিল। সে পত্রিকার সঙ্গে আমার কোনও সংস্রব ছিল না, কিন্তু সেই প্রেস থেকে ছাপা হত কৃত্তিবাস। পরপুর দু' সংখ্যায় ধার জমে গিয়েছিল, এর মধ্যে আমার খানিকটা পরিচিত হয়েছে বলে টাকা মেরে দিয়ে পালানো সম্ভব নয়, আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে গিয়েও আমাকে ধরে ফেলা যায়। টাকার জন্য তাড়া দিতে দিতে সেই পত্রিকার মালিক একদিন একটি চমকপ্রদ প্রস্তাব দিলেন। আমি যদি 'জলসা'র শারদীয় সংখ্যার জন্য একটি উপন্যাস লিখে দিই, তা হলে আমাকে আর প্রেসের ধার মেটাতে হবে না, তাঁরাও লেখাটার জন্য কোনও দক্ষিণা দেবেন না। কাটাকুটি! এ প্রস্তাব আমার কাছে আকাশের চাঁদ হাতে পাবার মতন। আমাকে আর টাকাটা শোধ দিতে হবে না। এর চেয়ে আর আনন্দের কী হতে পারে। কারও কাছে ধার থাকলে সর্বক্ষণ গায়ের জামাটা ঘামে ভেজা মনে হয়। ঋণমুক্ত হওয়া মানে সাঁতার কেটে স্নানের মতন অনুভব।

প্লট নিয়ে কোনও চিন্তাই করতে হল না। কিছুদিন আগেই আমরা চার বন্ধু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর দত্ত ও আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম এক অনির্দিষ্ট অভিযানে, টিকিট না কেটে উঠেছিলাম ট্রেনে, এক সহযাত্রীর পরামর্শে নেমে পড়লাম ধলভূমগড়ে। সেই সময় ধলভূমগড় ছিল খুবই নিরিবিলি জায়গা, কাছেই জঙ্গল, তার মধ্যে মধ্যে আদিবাসীদের গ্রাম, এবং একটি আইনসঙ্গত পানশালা, যেখানে শুধু মহুয়ার মদ পাওয়া যায়। টিকিট না কাটলেও আমরা বিনা টিকিটের যাত্রী নই, চেকারকে পয়সা দিয়ে রশিদ নিয়েছিলাম, স্টেশনের ওভারব্রিজ পার হতে হতেই ঠিক করেছিলাম, আর খবরের কাগজের সঙ্গে অর্থাৎ বাকি পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না, ছদ্ম পরিচয়ে দখল করেছিলাম বনবাংলো এবং সন্ধেবেলার মিশমিশে অন্ধকারে মনে হয়েছিল, মিছিমিছি জামাকাপড় পরে থাকার দরকারই বা কী! 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাস শুরু হল ঠিক এইভাবে। তারপর কাহিনী একটা অবয়ব পায়। এর মধ্যে অনেক ঘটনা বাস্তবে সত্যি সত্যি সংঘটিত হয়নি, কিন্তু শিল্পেরও একটা অলীক বাস্তবতা থাকে। অনেকটা গুরুত্বহীনভাবে লেখাচ্ছলে লেখা। এই উপন্যাস কারও চোখে পড়বার কথা নয়, কিন্তু চোখে পড়ল সত্যজিত রায়ের। তিনি 'অরণ্যের দিনরাত্রি' নিয়ে ফিল্ম করতে চাইলেন। সত্যজিৎ রায় তখন তাঁর খ্যাতির মধ্যগগনে, বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক রচনা-নির্ভর তাঁর চলচ্চিত্রগুলি, আধুনিকদের মধ্যে তিনি শুধু নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন, সেই তুলনায় আমি তো প্রায় অজ্ঞাতকুলশীল। সমস্ত পত্রিকায় এই প্রশ্নই ধ্বনিত হয়েছিল, সত্যজিৎ রায় এরকম একজন নবীন লেখকের কাহিনী নির্বাচন করলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানার কথা নয়। (পরে জেনেছিলাম, 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসটি পড়েও সত্যজিৎ রায় সেটি নিয়ে ফিল্ম করার কথা চিন্তা করেছিলেন, কিছু বাস্তব অসুবিধের জন্য সে প্রকল্পটি মুলতুবি হয়ে যায়।)

'অরণ্যের দিনরাত্রি' অবলম্বনে ফিল্ম করার প্রস্তাব জানিয়ে সত্যজিৎ রায় যেদিন সন্ধেবেলা আমাকে ফোন করেন, সে রাতে কেন জানি না সারা রাত আমি একলহমার জন্যও ঘুমোতে পারিনি। এরকম একেবারে নিদ্রাহীন রাত কাটাবার অভিজ্ঞতা আর আমার মনে পড়ে না। এটা

যে ঠিক আনন্দের অস্থিরতা, তাও নয়, খ্যাতি কিংবা অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনার উত্তেজনাও নয়, বারবার শুধু মনে হচ্ছিল, আমার জীবনে নতুন কিছু ঘটতে যাচ্ছে, আমি যেন একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে, কিন্তু অন্য দিকটা দেখতে পাচ্ছি না।

এর পরের উপন্যাসটিও আমি লিখি একটি অতি স্বল্পস্থায়ী সিনেমার পত্রিকায়। এটাও আমার নিজেরই বেকার জীবন এবং বহু চাকরির ব্যর্থ ইন্টারভিউ দেবার অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। এবং কিমাশ্চর্যম অতঃপরম, এই 'প্রতিদ্বন্দ্বী'ও সত্যজিৎ রায়ের মনে ধরে গেল, এই উপন্যাস অবলম্বনেই তিনি সৃষ্টি করলেন তাঁর পরবর্তী চলচ্চিত্র। দুটি ছবিই আন্তর্জাতিক সুনাম পেয়েছে এবং প্রদর্শিত হয়েছে নানা দেশে, যে সব বিদেশি লেখক লেখিকার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, তাদের কয়েকজন চিঠি লিখে জানাল রে'র ফিল্মে কাহিনীকার হিসেবে তোমার নাম দেখলাম, তুমি কবে থেকে ঔপন্যাসিক হয়ে উঠলে? এর উত্তর তো আমি নিজেই জানি না। দেশের সবকটি বড় বড় পত্র-পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় ততদিনে কবিতার জন্য আমি আমন্ত্রণ পাই, এখন থেকে সম্পাদকরা বলতে লাগলেন, কবিতা দাও বা না দাও, তোমাকে উপন্যাস লিখতেই হবে, অন্ততপক্ষে বড় গল্প। স্বনামে তো বটেই, এমনকী নীললোহিতও হয়ে উঠল উপন্যাসকার। যেন ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রশ্ন নেই, একটা ঘূর্ণি পাকে পড়ে আমি ভাসতে ভাসতে চলে এলাম গদ্যের জগতে। পাকাপাকিভাবে, সেখান থেকে আর বেরুবার রাস্তা রইল না।

পঁয়তাল্লিশ

একদা উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে, সন্ধের পর জনবিরল হয়ে গেলে, একটা আলোর স্তম্ভের নীচে দশ-বারোজন বন্ধু গোল হয়ে বসে নিজেদের সদ্য রচিত গল্প-কবিতা পাঠ করে শোনাতাম। কিছুদিন পর সে আসর বন্ধ হয়ে গেলেও বেশ কয়েক বছর পর আবার চালু হয় দক্ষিণ কলকাতায় শংকর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। আমাদের মধ্যে একমাত্র শংকরেরই ছিল নিজস্ব একটা বৈঠকখানা, সেখানে নিরবচ্ছিন্ন আড্ডায় ব্যাঘাত ঘটাত না কেউ, পাশের একটা দোকান থেকে অনবরত আসত ভাঁড়ের চা, এক একদিন ওপর থেকে মাসিমার তৈরি নানারকম সুখাদ্য। শংকরের মা ছিলেন সম্ভবত আমাদের সকলের জননীর তুলনায় বেশি বিদূষী, তিনি ইংরিজি উপন্যাস পড়ে সময় কাটাতেন। শুধু আড্ডা নয়, প্রতি রবিবার সন্ধেবেলা সেখানে অন্তত তিন-চারজনকে নতুন রচনা পড়তে হবে, আগে থেকে নির্দিষ্ট করা হত নামগুলি। আমি ছিলাম শ্রোতা, কারণ নিজের লেখা পকেটে নিয়ে ঘোরার অভ্যেস আমার ছিল না, বরং সঙ্কোচ ছিল। কিন্তু বেশিদিন পাশ কাটানো গেল না। এক রবিবার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এবং কয়েকজন চেপে ধরল, পরের রবিবার আমাকে একটি গল্প শোনাতেই হবে, নইলে আমার আর প্রবেশ-অধিকার থাকবে না। কবিতা শোনালেও চলবে না, শ্যামল এবং কয়েকজন গল্পকারের মতে, এক-আধ পাতার কবিতা নাকি নিতান্তই ফাঁকিবাজি।

সেই রবিবারটিতে আমি সকাল থেকে চেষ্টা করেও একটা গল্প লিখে উঠতে পারিনি। অথচ আড্ডার টানে মনটা খুবই অস্থির, গল্প নিয়ে যেতেই হবে, সন্ধে হয়ে গেছে, তবু আমি কোনওক্রমে হুড়হুড়িয়ে গল্পটা লিখে শেষ করার চেষ্টা করছি, এই সময় আমার ছোট ভাই এসে খবর দিল, কয়েকটি মেয়ে ও এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, তাঁরা অচেনা এবং গাড়ি করে এসেছেন। শুনে খুবই অবাক হতে হয়। কারণ অতদূর নাগেরবাজারের বাড়িতে বন্ধু-

বান্ধব আর কৃত্তিবাসে রচনা প্রকাশেচ্ছু অত্যুৎসাহী তরুণ কবি ছাড়া আর কেউ আসে না, তাও দিনের বেলা, বিকেলের পর আমি কোনওদিনই বাড়ি থাকি না, সেদিনও আর দশ-পনেরো মিনিট পরে আমাকে পাওয়া যেত না। এবং গাড়ি-চড়া লোকেরা আমার খোঁজ করার কোনও কারণ নেই।

আমাদের মোটে দু'ঘরের ফ্ল্যাট। দু'দিকে দুটি প্রশস্ত বারান্দা আছে বটে, কিন্তু বৃষ্টির সময় ব্যবহার করা যায় না। সেটা বর্ষাকাল। আমার ঘরটিতে একটি খাট পাতা, তাতেই অনেকখানি ভরে গেছে, সে খাটে আমি ও আমার মেজ ভাই শুই, কোনওক্রমে এক কোণে একটি লেখাপড়ার টেবিল এবং দুটি মাত্র চেয়ার। সেখানেই আসতে বলা হল আগন্তুকদের। ভদ্রলোকটির বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, তরুণী দুটি তিরিশের থেকে দূরে, অন্যজন বাচ্চা মেয়ে। তিনজনেরই চেহারার উজ্জ্বলতা ও সাজ পোশাকের রুচি দেখলেই বোঝা যায়, দক্ষিণ কলকাতার। পুরুষটিও সেই কথাই জানালেন, তাঁরা আসছেন দক্ষিণ কলকাতা থেকে, এই ঠিকানায় পৌঁছতে অনেক খোঁজাখুঁজি ও ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। তা তো হবেই, দক্ষিণ কলকাতার লোক উত্তর কলকাতা প্রায় চেনেই না, নাগেরবাজার তখন নিতান্তই মফঃস্বল, ভি আই পি রোড পুরোপুরি তৈরি হয়নি, সল্টলেক নামের উপনগরীটির অস্তিত্ব নিছক কাগজে কলমে, এদিককার রাস্তাগুলি অন্ধকার-অন্ধকার, আমাদের বাড়ির সামনের খোলা জায়গাটিতে আলো জ্বালাবার কোনও ব্যবস্থাই নেই। অতদূর থেকে কষ্ট করে ওঁরা এসেছেন কেন? কারণটি অবিশ্বাস্য রকমের চমকপ্রদ। ওঁরা এক কপি কৃত্তিবাস পত্রিকা কিনতে চান।

আমার এই আস্তানার ঠিকানাই কৃত্তিবাসের কার্যালয় বটে, পত্রিকা আমরা বিভিন্ন স্টলে পৌঁছে দিই, দক্ষিণ কলকাতাতেও। কোনও স্টল থেকে না কিনে এতদূর চলে আসার কোনও মানে হয় না। আর যত ছোট পত্রিকাই হোক, আমি তাঁর সম্পাদক তো বটে, সম্পাদকের একটা মান-সম্মান আছে, সম্পাদক কখনও নিজে পত্রিকা বিক্রি করে না। তবে, সম্পাদক কারুকে কারুকে ইচ্ছে করলে কমপ্লিমেন্টারি কপি দিতে পারে। এ রকম উৎসাহী পাঠকদের সম্পাদক এক কপি পত্রিকা উপহার দিতে চাইলেও এই সান্ধ্য-আগন্তুকরা তা নিতে রাজি নয়। পত্রিকার দাম মাত্র এক টাকা, ভদ্রলোকটি একটি এক টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন, সম্পাদক তা কিছুতেই নেবে না, এই নিয়ে চলল ঝুলোঝুলি। ভদ্রলোকের কথা শুনলেই বোঝা যায়, কবিতা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই, পত্রিকার নাম কৃত্তিবাস না কাশীরাম তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। তিনি খুব সম্ভবত এসেছেন ওই তরুণীদের কোনও একজনের অনুরোধে। অচেনা লোকদের বাড়িতে গিয়ে মেয়েরা কখনও বিছানায় বসে না, চেয়ারের অভাবে মেয়েরা দাঁড়িয়েই আছে, কেউ কোনও কথা বলছে না। নামও বলা হয়নি। পুরুষ মানুষ হিসেবে আমি ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে আড়চোখে একাধিকবার দেখে নিয়েছি দুই তরুণীকে, তাদের মধ্যে বিশেষ একজনের চোখেই যেন রয়েছে বেশি কৌতূহল ও কবিতা-প্রবণতা। এটা কী করে বোঝা যায়। তা ব্যাখ্যা করা যায় না, তবু একটা কিছু তরঙ্গ টের পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত এক টাকার প্রশ্নটিতে আমার জেদ বজায় রইল, এবং ভদ্রতাবশত ওদের পৌঁছে দিতে গেলাম নীচের দরজা পর্যন্ত। বিদায় সম্ভাষণের পর সেই বিশেষ তরুণীটি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখ খুলল, জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, একটা কথা বলব? আমি উত্তর দেবার আগেই সে আমায় বলল, আচ্ছা থাক। সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরল এবং চারজনেই মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

আমি খানিকক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সব কিছুই যেন প্রহেলিকাবত! অতদূর থেকে গাড়ির পেট্রোল পুড়িয়ে সামান্য এক টাকার পত্রিকা কিনতে আসা, দু'জন নীরব তরুণীর একজন শেষ মুহূর্তে কিছু বলতে চেয়েও না বলে চলে যাওয়া... কী বলতে চেয়েছিল সে? মেয়েরাই পারে এ রকম রহস্যসৃষ্টি করতে। না-বলা বাণীর ঘনযামিনীতে আমি বিমূঢ়!

সে মেয়েটির মুখচ্ছবি আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে রইল। তার নাম জানি না, ঠিকানা জানি

না, আর কোনওদিন তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভবনাও নেই, জানা হবে না সে কি বলতে চেয়েছিল? একদিন যেন কলেজ স্ট্রিটে দেখলাম তাকে হেঁটে যেতে, সত্যিই সে কী না তা বুঝে নেবার আগেই সে মিলিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। ম্যাক্সমুলার ভবনে একদিন কাব্যপাঠের আসরে শ্রোতাদের মধ্যে পেছনের দিকে কি সে-ই বসেছিল, না কি তার মতন চেহারার কাছাকাছি অন্য কেউ? এ রকম মাঝেমাঝেই আমার দৃষ্টিভ্রম হতে লাগল। যেন চলতে লাগল লুকোচুরি খেলা। পথের বাঁকে মিলিয়ে যাওয়া কিংবা দোতলা বাসের জানলার ফ্রেমে বাঁধানো একটি মুখ এক ঝলক দেখা, যেন ঠিক সেই মেয়েটি। অথচ মুখোমুখি দেখা হয় না কেন? কবিতা পড়তে ভালোবাসে, যদি মাঝে মাঝে কলেজ স্ট্রিটে আসে, তা হলে আমার সঙ্গে দেখা হওয়া খুবই স্বাভাবিক, সেখানে আমার নিত্য হাজিরা।

কী বলতে চেয়েছিল সে? সেটা জানতে হবে, এবং ভেতরে ভেতরে তৈরি হতে লাগল প্রবল এক ইচ্ছাশক্তি, যার টানে ওই মেয়েটির সঙ্গে আর একবার দেখা হবেই হবে। একদিন আনন্দবাজার অফিসে বসে 'দেশে দেশে' বিভাগের জন্য ছবির ক্যাপশন লিখছি, সন্তোষকুমার ঘোষ আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর ঘরে তিনটি তরুণী বসে আছে, সমবয়সিনী হলেও ত্রিধারার মতন, তাদের মধ্যে একজন সেই না-বলা-কথার রহস্যময়ী। সন্তোষদা বললেন, এরা আনন্দবাজার অফিস দেখতে এসেছে, মেশিন ঘরটর দেখা হয়ে গেছে, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। অন্য দু'জনের নাম লক্ষ্মী চৌধুরী ও এষা মুখোপাধ্যায়, তাদের আগে দেখিনি, তৃতীয় জনের নাম শুনেই চমক লাগল। মাঝে মাঝে পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে চিঠিপত্র পাই, স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক পত্রলেখিকাকে দু' তিনবার উত্তরও দিয়েছি, এই কী সে? তা হলে সেই সন্ধ্যায় কৃত্তিবাস সংগ্রহ করার উপলক্ষে সে আমাকে স্বচক্ষে দেখতে গিয়েছিল? আমিও তাকে আবার দেখতে চেয়েছি বলেই তো ইচ্ছাশক্তি দিয়ে টেনে এনেছি এখানে।

কথায় কথায় সেই যুবতীত্রয় জানাল যে দক্ষিণ কলকাতায় তাদের একটি ক্লাব আছে, সেখানে একদিন আমাকে কবিতা পাঠ করতে হবে। আমি তো যাকে বলে, এক পায়ে খাড়া, কেন না আবার দেখা হবে। সেই অনুষ্ঠানে গিয়ে বোঝা গেল, বান্ধবীদের মধ্যে স্বাতীই সবচেয়ে লাজুক, খুব কম কথা বলে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ও আমার দৃষ্টির মধ্যে একটা সেতুবন্ধন হয়ে গেল, সেখানে কথার কোনও প্রয়োজন নেই। চোখের আড়াল হলে চিঠিতে বলা যায় অনেক কিছু, এরপর কয়েক সপ্তাহ ঘন ঘন পত্র বিনিময় হতে লাগল, চিঠি পড়লেই বোঝা যায়, মেয়েটির বাংলা ভাষায় জ্ঞান যথেষ্ট। প্রথম প্রথম নৈর্বক্তিক ভাব বিনিময়, তারপর ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি আসার পর, বান্ধবীদের বাদ দিয়ে একদিন একা একা দেখা করার অনুরোধ জানালাম আমি। গঙ্গার ধার। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ন্যাশনাল লাইব্রেরির সামনের মাঠ (ওই লাইব্রেরিতে আমি বিনা পয়সায় পাখার হাওয়া খাওয়ার জন্য কয়েক ঘণ্টা কাটাতাম প্রায়ই), ময়দানের মধ্য দিয়ে হাঁটা, কিংবা ঘোর দুপুরে চিড়িয়াখানা। ভিক্টোরিয়া স্মৃতি উদ্যানের মধ্যে একটি ছোট রেস্তোরাঁ ছিল, ভোর থেকেই খুলত, নাগেরবাজার থেকে খুব ভোরে উঠে সেখানে চায়ের কাপ নিয়ে দু'জনে বসে থাকতাম অনেকক্ষণ। স্বাতীর চোখে মুখে এমন একটা সারল্য, যেন সে জানেই না পৃথিবীতে খারাপ কিছু আছে, লোভ, হিংসা, ঈর্ষা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে যে কত মানুষ অযথা সময় নষ্ট করে এ সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই নেই, সে সর্বাঙ্গীণ রোমান্টিক, সাহিত্য ও গান বাজনার জগৎ ছাড়া তার অন্য বাস্তবতা বোধ নেই। তার এই সারল্যের কাছে মাঝে মাঝেই আমার মাথা হেঁট হয়ে যেত, মনে হত আমি অযোগ্য।

স্বাতী তখন বি এসসি পাশ করে একটি বাচ্চাদের স্কুলে শখ করে পড়ায় সকালবেলা, বিকেলে আলিয়ঁাস ফ্রাঁসেজে ও ম্যাক্সমুলার ভবনে ফরাসি ও জার্মান ভাষার পাঠ নেয় আর গান শেখে দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে। আমার পাল্লায় পড়ে ওর এই সবকটিতেই বিঘ্ন ঘটেছে। আমার যে তখন রোজই দেখা করা চাই। এক একদিন আমি দারুণ ভাবে অপ্রস্তুত অবস্থাতেও পড়েছি।

আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজের সামনের ফুটপাথে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকতাম, ক্লাস শেষ হবার পর স্বাতী বেরিয়ে এলে তাকে নিয়ে কোথাও একটুক্ষণ বসব, তারপর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দেব। একদিন স্বাতী বেরিয়ে এল পাঁচ ছ'জন যুবক-যুবতী সমভিব্যহারে, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর বলল, কোথাও বসে একটু চা-টা খেলে হয় না? কাছাকাছি পার্ক স্ট্রিটের দামি রেস্তোরাঁয় চা পানের পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার নেই, ঢোকা হল একটিতে, অন্যরা শুরু করল নানারকম গল্প, আমি একেবারে আড়ষ্ট, সমস্ত রোমকূপে কাঁটা, শুধু পয়সার চিন্তা করছি। আমার কাছে আছে মাত্র ন'টাকা, তাতে সেই ছেষট্টি সালে দু'জনের চা-জলখাবার বেশ ভালোই হয়ে যায় বড় দোকানে, কিন্তু পাঁচ-ছ'জনের হবে কি? যদিও নেওয়া হয়েছে শুধু স্যান্ডুইচ ও সকলের জন্য চা, তাতে কত বিল হবে? ফরাসি ক্লাসের এই ছাত্র-ছাত্রীদের গড় বয়েস আমার চেয়ে মাত্র সাত-আট বছর কম, তবু যেন মনে হচ্ছে অন্য প্রজন্ম, আমি যেন অনেক দূরের মানুষ এবং আমি সিনিয়র বলেই আমার বিল মেটানো উচিত। আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে আমি কিছুদিনের জন্য পড়েছিলাম বলেই জানি, অধিকাংশ সচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েরাই এখানে আসে, চায়ের দোকানে কে বিল মেটাবে না মেটাবে তা নিয়ে এরা চিন্তাও করে না, কারণ যে-কেউ পারে। যদি টাকা কম পড়ে তা হলে আমি কী করব? অন্যদের কাছে চাইতে হবে? তার চেয়ে বোধহয় এই মুহূর্তে আমার মরে যাওয়াই ভালো। বিল এল চোদ্দো টাকার, আমি সঙ্গে সঙ্গে স্বাতীর হ্যান্ডব্যাগটি তুলে নিয়ে বললাম, দেখি, এর মধ্যে কী আছে? একটা খোপে কিছু টাকা পয়সা রয়েছে, তার থেকে ছ'সাতটা টাকা তুলে নিলাম অবলীলাক্রমে। অন্য কেউ লক্ষই করল না। হঠাৎ আমার মাথায় এ রকম বুদ্ধি এল কী করে? আমি মোটেই চালাক-চতুর, সপ্রতিভ ধরনের ছোকরা ছিলাম না, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আমার একেবারেই নেই, কখনও ধাঁধার উত্তর দিতে পারি না। এবং আমি এটাও জানতাম, বিনা অনুমতিতে মেয়েদের হাত ব্যাগ খুলে দেখা অতি গর্হিত কাজ, ফরাসিতে নাকি বলে mes affaire, তবু মরিয়া হয়েই ইন্‌সটিংকট্ বশে ও রকম করে ফেলেছি এবং মান বেঁচেছে।

এ রকম একটি সামান্য ব্যাপারও মনে থাকার কারণ, সেদিন স্বাতীকে তার বন্ধুদের সঙ্গে ট্যাক্সিতে তুলে দেবার পর আমার খেয়াল হয়েছিল আমি তো নিজের পকেট উজাড় করে দিয়েছি, এখন আমার বাড়ি ফেরার বাস ভাড়াও নেই। পার্ক স্ট্রিট থেকে নাগেরবাজার পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে? ক'দিন লাগবে? প্রেমে পড়লে মানুষ এমনই বোকা হয়ে যায়! একা একা খানিকক্ষণ হেসেছিলাম নিজেকে নিয়ে। পুরোটা হাঁটতে হয়নি অবশ্য, কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে এসে বন্ধুবান্ধবদের পাওয়া গিয়েছিল।

প্রেমের পরবর্তী পর্যায় বি পূর্বক বহ্ ধাতু ঘঞ্! এই বিষয়ে আমি যেন খানিকটা বোধহীন ছিলাম। একটি মেয়ের জীবন পুরোপুরি আমার জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে, এ যেন আমার সমস্ত প্রত্যাশার অতীত। নারীর কাছে লাবণ্য ও মাধুর্যের আমি প্রার্থী, ছিটে ফোঁটা পাওয়াই তো যথেষ্ট। তা ছাড়া বিয়ে মানেই নিজস্ব সংসার, সে দায়িত্ব নেবার কি আমি যোগ্য? বিয়ের কোনও কল্পনাই আমার মনে সেই তেত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত দানা বাঁধেনি। আমার মেজো ভাই অনিল আগেই বিয়ে করেছে, অঞ্জলির সঙ্গে তার পরিচয় হবার পর মধ্যবিত্ত পরিবারের রীতি অনুযায়ী দাদার বিয়ে হয়নি বলে সঙ্কোচে কিছু বলতে পারছিল না, কোনওক্রমে জানতে পেরে আমি নিজেই উদ্যোগ নিয়ে ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম। ছোট ভাই অশোকের সঙ্গে শীলারও বোধহয় ততদিনে আলাপ হয়েছে এবং দাদা বিয়েই করবে না এ রকম ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্বাতীর সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা ও মাঝে মাঝে নিরালায় দেখা করা তো মাসের পর মাস চালিয়ে যাওয়া যায় না। এর বাড়িতেও বিয়ের চাপ আছে। ওরা পাঁচ বোন, স্বাতী দ্বিতীয়া, শুধু দিদির বিয়ে হয়েছে, আমার বাড়িতে যে ভদ্রলোক গাড়িতে ওদের নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সন্তোষ মুখোপাধ্যায় ওর জামাইবাবু, ওর পরের তিন বোনও প্রেম ও পাত্র নির্বাচন করে

মেজদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় আছে। সব বোনই সুশ্রী, স্বাতীর জন্যও উপযুক্ত পাত্র কম ছিল না। ওর বাবা-মা কোনও সুযোগ্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে একেবারে ঠিকঠাক করার পরেও স্বাতী গোপনে সেই পাত্রকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিত, সে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু এ কৌশল বারবার খাটে না, বাবা-মায়ের অবাধ্য হবার মতন স্বভাবই নয় এ মেয়েটির। এ সব শুনে আমার মনে হত, এ মেয়েটি অন্য কোনও পুরুষের ঘরণী হয়ে চলে যাবে, এ একেবারে অসম্ভব, পৃথিবী উল্টে গেলেও তা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাকে গ্রহণ করতে যদি সে রাজি না হয়? সাংসারিক বিচারে আমার কোনও যোগ্যতাই নেই, আমি সুদর্শন যুবা নই, (স্বাতীর পরবর্তী তিন বোনের নির্বাচিত স্বামী দীপক সরস্বতী, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থ মুখোপাধ্যায় তিনজনই খুব সুপুরুষ) ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার সম্বন্ধ করা পাত্রদের তুলনায় আমি নগণ্য এক কবি এবং সাধারণ পরিবারের সন্তান। তবু কিছুদিন পরে আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, আমি তার পানিপ্রার্থী হলে প্রত্যাখ্যাত হতে হবে না। তার কারণ তার মনে বাস্তব অবস্থা বিচারের কোনও প্রশ্নই উঁকি মারে না, কবি-লেখকরা এমন এক কল্পলোকের মানুষ, যেখানে সে তার মনের মিল খুঁজে পায়। ততদিনে আমার কিছু বন্ধুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে এবং তাদেরও সে পছন্দ করে ফেলেছে। শংকর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির আড্ডাতেও নিয়ে গেছি তাকে।

কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবের আগে কতকগুলি ব্যাপার স্পষ্ট করা দরকার। যেমন, মার্গারিট নাম্নি এক ফরাসি তরুণীর সঙ্গে যে আমার বিশেষ সম্পর্ক ছিল সেটা স্বাতী একদিন না একদিন জানবেই, বিয়ের পরে জানার চেয়ে আগেই জানা উচিত। মার্গারিট আমাকে নিয়মিত চিঠি লেখে, আমার পরে যারা আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছে, যেমন শঙ্খ ঘোষ ও জ্যোতির্ময় দত্তের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে, কিন্তু তার কলকাতায় আসার সম্ভাবনা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে নানাকারণে, তাকে তার বাবা-মায়ের ভার নিতে হয়েছে। স্বাতীকে মার্গারিটের কথা খোলাখুলি জানাবার পর মার্গারিটকেও চিঠিতে জানালাম স্বাতীর কথা। মার্গারিট সঙ্গে সঙ্গে স্বাতীকে সরাসরি এক চিঠি লিখে তার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করল। এরপর মার্গারিট ও স্বাতীর চিঠি বিনিময় হয়েছিল বেশ কিছুদিন।

দ্বিতীয়ত, আমার যে কোনও চাকরি নেই এবং জীবিকার স্থিরতা নেই, সেটা গোপন করাও চলে না। আনন্দবাজার অফিসে আমি আলাদা চেয়ার-টেবিলে বসি, তা দেখে অনেকের ভুল ধারণা হতে পারে। কিন্তু সেখানে আমার দিন মজুরির মতন ফুরনের কাজ, যে-কোনও দিন বন্ধ হয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এ সব জেনেও স্বাতী বলেছিল, আমি গাছতলায় গিয়ে থাকতেও রাজি আছি। রোমান্টিক আর কাকে বলে!

তৃতীয়ত, মদ্যপান ও বেপরোয়া জীবনযাপন। একদিন ভিক্টোরিয়া স্মরণ উদ্যানে লর্ড বেন্টিঙ্কের মূর্তির সামনে বিকেল ছ'টায় দেখা করার কথা, দুপুর থেকে বন্ধু সংসর্গে কোথাও বসে ছ'সাত পেগ হুইস্কি টানার পর ঠিক ছটায় এসে অপেক্ষামানা তরুণীটিকে বললাম, দেখো, বন্ধুদের সঙ্গে আমি মাঝে মাঝে এতটা পান করি, বেশ উপভোগ করি, তবে পা-টা বিশেষ টলে না, কথাও জড়ায় না। তা দেখে বা শুনেও মেয়েটি ভয় পায়নি। তখনও পর্যন্ত উত্তর কলকাতার অধিকাংশ পরিবারে মদ্যপান সাঙ্ঘাতিক ট্যাবু, বাংলা সিনেমায় মদ্যপায়ী মানেই অতিশয় দুর্বৃত্ত ও দুশ্চরিত্র। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতায় খানিকটা ইংরিজি-ঘেঁষা কালচারে মদ্যপান সম্পর্কে ও রকম ভীতি নেই, স্বাতী তার বাবাকে মাঝে মাঝে বিয়ার ও ব্র্যান্ডি পান করতে দেখেছে। দাদা ও তার বন্ধুদের সঙ্গে পার্টিতে নিজেও চুমুক দিয়েছে জিন-লাইমের গেলাশে। একদিন না জেনে, শুধু জল ভেবে স্টি জিন খেয়ে ফেলেছিল অনেকটা। এরিক মারিয়া রেমার্ক-এর 'থ্রি কমরেডস' উপন্যাসটি তার খুব প্রিয়, সে বইতে ভর্তি নানারকম মদ্যপানের অতি আকর্ষণীয় বর্ণনা। সুতরাং এতেও আমি পাশ।

কিন্তু জানাজানি হবার পর ওদের পরিবারে প্রবল আপত্তি উঠেছিল। সে আপত্তির ভিত্তি অতি বাস্তব। ওদের পরিবার বেশ সচ্ছল, সে পরিবারের সবচেয়ে সরল, নিষ্পাপ, কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত মেয়েটিকে যেন হরণ করে নিতে চাইছে এক দমদমের গুণ্ডা। কিছুদিন আগে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দমদমের পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা দল বেঁধে কিছু দোকানদারকে মারধর করে, ভয় দেখিয়ে চাল-ডাল থেকে মাছ-মাংস পর্যন্ত নির্দিষ্ট বাঁধা দরে বিক্রি করতে বাধ্য করেছিল। তার নাম হয়েছিল, দমদম দাওয়াই। সুতরাং দক্ষিণ কলকাতার লোকদের চোখে দমদমের সব ছেলেই গুণ্ডা, আর আমার চেহারাটাও তো গুণ্ডারই মতন বটে। তখনও মোটাসোটা ঠিক নয়, লোকে দূর থেকে বলত, ওই গুণ্ডা মতন চেহারার ছেলেটা, মাথার চুলও ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া। আমি কবিতা-টবিতা লিখি বটে, কিন্তু কোনও চালচুলো তো নেই। এবং বাঙাল হওয়াটাও একটা বড় অযোগ্যতা, খাঁটি পশ্চিমবঙ্গীয় পরিবারে বাঙালদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন তখনও খুবই দুর্লভ ঘটনা। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমার উপার্জনের স্থিরতা নেই। আমি যদি আনন্দবাজারে পাকা চাকরি করতাম, তা হলেও সেটা স্বাতীদের পরিবারের চোখে তেমন সম্মানজনক হত না। তখনও পর্যন্ত শিক্ষক-অধ্যাপক এবং সংবাদপত্রের চাকুরিজীবীদের মনে করা হত, গরিব-আদর্শবাদী, বেতন ছিল খুব কম, একজন অধ্যাপক বা সাংবাদিকের মাইনে যে-কোনও ব্যাঙ্কের সাধারণ কর্মচারীর তুলনায় অর্ধেকও নয়। অর্থাৎ সাংবাদিকের চাকরিটা এসব কিছু নয়। আমার আবার সে চাকরিও নেই।

সেই বছরেই শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে 'আত্মপ্রকাশ'। যে-হেতু নায়কের নাম সুনীল, তাই সমস্ত ঘটনাগুলিই অনেকে হুবহু সত্যি বলে ধরে নিয়েছে। স্বাতীদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা কখনও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তেমন কিছু পড়ে না, তারাও 'দেশ' শারদীয় সংখ্যায় আমার লেখাটি পড়ে নিয়ে বুঝে গেল, আমি কি সাঙ্ঘাতিক চরিত্রের ছেলে, জুয়া খেলা, মারামারি, বেশ্যালয়ে গমন, কিছুই বাদ নেই! মাঝে মাঝেই আমি আনন্দবাজার অফিসে টেলিফোন পাই, কোনও নারী বা পুরুষ নাম না জানিয়ে ব্যাকুলভাবে অনুরোধ করছে, আপনি আমাদের মেয়েটিকে ছেড়ে দিন! প্লিজ! এ বিয়ে হতেই পারে না। ওর বাবা এমন দুঃখ পাবেন যে হয়তো মরেই যাবেন। আমি হাসতে হাসতে বলতাম, ছেড়ে দেব কী, আমি ধরে তো রাখিনি! আপনাদের মেয়েটিকে বোঝান, তাকে বারবার জিজ্ঞেস করুন, তার যদি আপত্তি থাকে, আমাকে আর কোনওদিনই দেখতে পাবেন না। তার সঙ্গে কোনও যোগাযোগও রাখব না। আর তার যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আপনারা জোর করবেন না প্লিজ, এ বিয়ে হবেই!

তখন গোপনীয়তা অনেকটা ঘুচে গেছে, স্বাতীকে নিয়ে চেনাশুনো কোনও কোনও বাড়িতে যেতাম, এক বিকেলে গিয়েছিলাম নাকতলায় বুদ্ধদেব বসু-প্রতিভা বসুর নতুন বাড়িতে। প্রতিভা বসু সব সময়ই খুব আপন করে কাছে টেনে নেন। পাপ্পার সঙ্গে স্বাতীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল প্রথম দিন থেকেই। বুদ্ধদেব বসু স্বাতীর নাম শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, ওঁর উপন্যাস 'তিথিডোর' খুবই জনপ্রিয়, তার নায়িকার নাম স্বাতী, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার উপন্যাস থেকেই তোমার নাম রাখা হয়েছে নিশ্চয়ই? স্বাতী লাজুক ভাবে জানাল যে তা নয়, ওর জন্ম হয়েছে উপন্যাসটি প্রকাশের কিছু আগে। ওদের পাঁচ বোনের নামেই অন্ত্যমিল আছে, তপতী-স্বাতী-জয়তী-গীতি-ব্রততী, একমাত্র দাদার নাম দেবব্রত। বুদ্ধদেব বসু আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নামের মানে জানো আশা করি? আমাদের সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে স্বাতী বলল, হ্যাঁ, খড়্গ! আমি আঁতকে উঠে ভাবলাম, এটা ও কী বলল? আমরা সবাই জানি, স্বাতী একটি লোহিতবর্ণ নক্ষত্র, প্রবাদ আছে, এই নক্ষত্রের অশ্রু বিন্দু সমুদ্রে পড়ে ঝিনুকের পেটে গেলে তাই মুক্তো হয়। লাজুক হলেও এ মেয়েটির পেটে পেটে দুষ্টুবুদ্ধি কম নয়, সবার জানা অর্থটি সে বলবে না। অভিধান এনে দেখা গেল, স্বাতী খড়্গেরও নামান্তর।

শুভার্থীরা প্রায়ই বলে, তা হলে আর তোমরা দেরি করছ কেন? স্বাতীদের বাড়ির সবার

অজান্তে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে ফেললেই হয়, কিন্তু স্বাতী কোনওভাবেই তার বাবা-মায়ের মনে আঘাত দিতে চায় না, ওঁদের রাজি করাতে হবেই। এক সকালে ওঁরা দু'জন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। স্বাতীর মায়ের নাম কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইবাহুল্য, সেই বিখ্যাত গায়িকা নন। অবশ্য, ইনিও ভালো গান করেন, নামের মিলের জন্যই প্রকাশ্যে গান করেননি বোধহয়, লাজুক ও মৃদুভাষী, দেখলেই বোঝা যায় বনেদি বাড়ির মেয়ে। বাবা অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি অনেক দিক থেকেই একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি শখ করে বিমান চালানো শিখেছিলেন, যৌবনে নানারকম অ্যাডভেঞ্চার করেছেন, তিনি নিজস্ব ট্র্যান্সমিটারে বিশেষ তরঙ্গে মধ্যরাত্রে দেশ-বিদেশের নানান ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, এঁদের ইংরেজিতে বলে 'হ্যাম', নেপালের মহারাজা কিংবা অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যানের মতন ব্যক্তিরা এই হ্যামের সদস্য। এ ছাড়াও তাঁর গান-বাজনা রেকর্ডিং-এর বিশেষ দক্ষতা ছিল, রবীন্দ্রনাথের নিজের কণ্ঠে গানের রেকর্ডিং-এ তিনি সহায়তা করেছিলেন, 'দেশ' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে সে কথা পড়েছি। তিনি নিজে নানান ছোটখাটো যন্ত্র উদ্ভাবন করতেন, তা নিয়ে একটি কারখানা খুলেছিলেন। মারফি রেডিয়োখ্যাত ডেবসন্স কম্পানির মালিক দেবু চৌধুরী একদিন কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন, তুমি গণেশদার (অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক নাম) মেয়েকে বিয়ে করছ? উনি তো ইলেকট্রনিক্সের জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া, আমাদের কখনও কোনও সমস্যা হলেই ওঁকে ফোন করি।

যাই হোক, ওঁর মেজ মেয়ে যে নিজেই নিজের স্বামী নির্বাচন করেছে সে কথা অনেক দিন ওঁকে জানানো হয়নি, শোনার পর নাকি বলেছিলেন, ছেলেটির কী বংশ, গরিব না বড়লোক, এখন কত উপার্জন করে না করে তাতে কিছু আসে যায় না। যে লাইনে কাজ করছে তাতে যদি খাঁটি উদ্যগী হয়, সেটাই যথেষ্ট, তারপর আমার মেয়ের ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে। আমাদের বাড়িতে এসে সামান্য কিছু কথাবার্তা বলে তিনি কী বুঝলেন কে জানে, দিন ঠিক হয়ে গেল। পরে শুনেছি, আমার মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওঁদের দু'জনেরই খুব ভালো লেগেছিল।

এর মধ্যে দু'পক্ষেই নানারকম গুজব ছড়িয়েছিল। স্বাতীকে কেউ বলেছিল, আমি নাকি চেক লুঙ্গি পরে বাজারে যাই (আমি জীবনে কখনও লুঙ্গি পরিনি, আমার বাবা অবশ্য পরতেন), মদ খেয়ে আমি নাকি ল্যাম্পপোস্টের ওপরে চড়ে বসে থাকি, (আমি এক সময় পেয়ারা গাছে ও খেজুর গাছে অনেকবার উঠেছি, ল্যাম্প পোস্টে তো কোনও ফল ফলে না, তার ওপর চড়তে যাব কেন?) আমার আসল মতলব নাকি শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি গ্রাস করা ইত্যাদি। আমার বন্ধু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় চোখ বড় বড় করে একদিন বলেছিল, তুই কাকে বিয়ে করছিস রে? আমার ভাইয়ের স্ত্রী ও পাড়ায় থাকে, সে বলেছে ব্যানার্জি বাড়ির মেয়েরা সবাই এক একটি পরী, ওরা হাতে গ্লাভ্স পরে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় কাচে, ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল ছাড়া অন্য জল খায় না, ও মেয়ে তোদের নাগেরবাজারের বাড়িতে একদিনও থাকতে পারবে? অন্য একজন বন্ধ বক্রভাবে বলেছিল, সুনীল মুখে জাত মানি না, ধর্ম মানি না এসব বড় বড় কথা বলে, কিন্তু বিয়ে করার সময় ঠিক বেছে নিয়েছে পাল্টি ঘরের বামুনের মেয়েকে! আম অনেক সময় বলতাম বটে, যে যদি কখনও বিয়ে করি, তা হলে চাইব কোনও বিধবা কিংবা মুসলমানের মেয়ে, যেহেতু আমাদের পরিবারে সে রকম বিয়ে কখনও হয়নি। কিন্তু যদি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের একটি মেয়ের সঙ্গে মনের মিল হয়, তবে শুধু ব্রাহ্মণ বলেই তাকে প্রত্যাখ্যান করার কোনও যুক্তি আছে কি?

বিয়ে তো ঠিক হল, কিন্তু তার তো একটা খরচ আছে। আমার তো দিন আনি দিন খাই অবস্থা। 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসের জন্য আমাকে কোনও প্রকাশক খুঁজতে হয়নি, দেশে প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে বই হয়ে বেরিয়ে যায়। আনন্দ

পাবলিশার্স তখন প্রায় একটি নতুন সংস্থা, তাঁরা একটা চমৎকার নিয়ম করেছেন, নতুন বা প্রবীন লেখকদের একই রকম সমান রয়ালটি, এবং তাও যথেষ্ট বেশি, শতকরা কুড়ি ভাগ। কিন্তু আমার বই সদ্য বেরিয়েছে, বিক্রি হলে তবে তো রয়ালটি পাব। এখনকার বাদল বসু তখন প্রায় নবীন শিক্ষানবীশ, আনন্দ পাবলিশার্স পরিচালনা করতেন ফণিভূষণ দেব, খুব অমায়িক মানুষ এবং কাঠ বাঙাল, তাঁর কাছে একদিন কাচুমাচু ভাবে জানতে চাইলাম, কিছু অগ্রিম পেতে পারি কি না। এ রকম অসঙ্গত অনুরোধের কারণটি জেনে তিনি সহাস্যে বললেন, তবে তো চাইতেই পারো। হিসেব কষতে লাগলেন, বইয়ের দাম ছ'টাকা, এক সংস্করণের রয়ালটি হয় বারোশো টাকা, নতুন লেখকের বই, বিক্রি হবে কি না ঠিক নেই, যাই হোক, এক হাজার টাকা দেওয়া যেতে পারে। সেই এক হাজার আর ধারধোর করে আরও কিছু, তাতেই সম্পন্ন হল উৎসব। আমাদের বিয়ের তারিখটির একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যও আছে। এর মধ্যে পশ্চিমবাংলায় একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেছে। নিদারুণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অনটন, অরাজকতা, যখন তখন পুলিশের গুলি চালনা এই সবের পর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সব বড় বড় নেতা ধরাশায়ী। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন এবং কিং-মেকার হিসেবে পরিচিত অতুল্য ঘোষও শোচনীয় ভাবে হেরেছেন, স্বাধীনতার সাড়ে উনিশ বছর পর কংগ্রেস দল ক্ষমতাচ্যুত হল পশ্চিমবঙ্গে। গড়া হল একটি যুক্তফ্রন্ট, এককালের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শ্রদ্ধেয় নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় কংগ্রেস দল থেকে চরম অপমানিত ভাবে বিতাড়িত হয়েছিলেন, এবার তিনিই হলেন যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী, আর অর্থমন্ত্রী হলেন দ্বিখণ্ডিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান শাখা সি পি আই (এম)-এর নেতা জ্যোতি বসু। আমার বিয়ের দিনেই এই মন্ত্রিসভা শপথ নেয়।

এই জোড়াতালি দেওয়া যুক্তফ্রন্ট বেশি দিন টিকতে পারেনি, মাত্র ন'মাস পরেই তার পতন হয়। ঠিক সেই দিনটিতেই আবার জন্ম হয় স্বাতী ও আমার প্রথম ও একমাত্র পুত্র সন্তান। নার্সিংহোমে ভোরবেলা আমি অপেক্ষা করছি, তখনও কিছু খবর পাওয়া যায়নি, আমার মনে পড়ছিল জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' উপন্যাসটির কথা। ভাবী পিতা হিসেবে আমার কী করা উচিত, উৎকণ্ঠিত ভাবে পায়চারি এবং ঘন ঘন সিগারেট টানা? আমিও বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান, আমার জন্মের সময় বাবা কী করেছিলেন? অবশ্য আমার জন্ম গ্রামের বাড়ির উঠোনের আঁতুর ঘরে, আর আমার সন্তান জন্ম নিচ্ছে শহরের নার্সিংহোমে। নভেম্বর মাসের কুয়াশা মাখা ভোর, গাড়ি শূন্য, জনশূন্য রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছেন ডাক্তার শোভা ঘোষ তাঁর চেহারায় এমনই একটা মধুর ব্যক্তিত্ব আছে যে দেখলেই ভরসা পাওয়া যায়। কিছু কথা না বলে, শুধু একটু হেসে তিনি উঠে গেলেন ওপরে। সিজারিয়ান হতে কতক্ষণ লাগে কে জানে! আমি বাবা হতে যাচ্ছি, পৃথিবীতে আর একটি নতুন শিশু আসছে...আমার হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ছিল বাবার কথা, তিনি এসব কিছুই জেনে গেলেন না, স্বাতীকেও দেখলেন না। সেদিনই বিকেলবেলা সন্তোষদার সঙ্গে দেখা, সুখবরটি শুনে তিনি ড্রয়ার থেকে একটি রামের বোতল বার করে বললেন, যাও, এক্ষুণি তোমার ছেলের ঠোঁটে একটু রাম ছুঁইয়ে এসো, আর তার নাম রাখবে রামানুজ।

নার্সিংহোমে গিয়ে রামের বোতল খোলার মতন নাটকীয় কাজ করার মতন সাহস আমার হয়নি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়-ইন্দ্রনাথ মজুমদারের মতন রামপ্রিয় বন্ধুরাই সে বোতলটির সদ্ব্যবহার করেছে এবং রামানুজ নামও পছন্দ হয়নি স্বাতীর। রামায়ণ-মহাভারত থেকে সে শ'খানেক নাম টুকে রেখেছিল, তার থেকেও কোনও নামে মনস্থির করা যাচ্ছিল না। ছেলেকে পুপ্লু কিংবা টুটুল নামে ডাকা হত। তার দেড়-দু'বছর বয়েস হবার পর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রায়ই এসে এক একটা নাম প্রস্তাব করতেন, স্বাতী তাঁর সামনাসামনি না হলেও পরে নাকচ করে দিত। একবার অলোকরঞ্জন এসে বললেন, শৌভিক নামটি

কেমন? আমি বা স্বাতী কিছু অভিমত দেবার আগেই সেই বাচ্চা ছেলেটি আমার নাম শৌভিক, আমার নাম শৌভিক, এই বলতে বলতে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। এই শৌভিক নামটিই টিঁকে গেল শেষ পর্যন্ত।

প্রথম দিন, কৃত্তিবাস কেনার ছুতোয় আমাদের নাগেরবাজারের বাড়িতে জামাইবাবুর সঙ্গে এসে অসমাপ্ত বাক্যে স্বাতী কী বলতে চেয়েছিল, তা আর কখনও জানায়নি।

ছেচল্লিশ

আমরা ছেলেবেলায় শুনতাম, দমদম বিমানবন্দরটি নাকি এশিয়ার মধ্যে সর্ব বৃহৎ। এই দাবি পুরোপুরি সত্য হোক বা না হোক, কলকাতার এই বিমানবন্দরটির গুরুত্ব নিশ্চিত যথেষ্ট ছিল, আমরা চোখের সামনে দেখলাম, সেই গুরুত্ব কী ভাবে হ্রাস পাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই বিমানবন্দর আধুনিকভাবে সম্প্রসারিত হয়নি, সত্তরের দশকের শুরু থেকেই দিল্লি-মুম্বইয়ের তুলনায় কলকাতার বিমানবন্দরের মলিন অবস্থার শুরু। জলের জাহাজের বন্দরটির ক্রমাবনতির শুরু আরও আগে থেকে। গঙ্গা নদীর নাব্যতা একদিনে কমে যায়নি, আমরা উদাসীন থেকে এই নদীটিকে সূতিকা রোগিণীর মতন অবস্থা হতে দেখেছি। কলকাতা শহরের খ্যাতি ছিল প্রাসাদনগরী হিসেবে, শিল্প-বাণিজ্যেরও কেন্দ্র ছিল, সংস্কৃতি চর্চা নিয়ে ছিল কত গর্ব, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতি, সবই ম্লান হয়ে যেতে লাগল। ষাটের দশকেও কলকাতা-যাদবপুরে কত বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের দেখেছি, এখন আর ক'জন আসে? কলকাতা শহর যেমন গুরুত্ব হারিয়েছে, পশ্চিমবাংলাও ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় পিছিয়ে পড়তে থাকে অনেকদিক থেকে। শিল্পে বাণিজ্যে তো বটেই, এমনকী শিক্ষা বিস্তারে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবায়।

এ রাজ্যের এমন অধঃপতনের অবধারিত ফল শাসক দল কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের বিমুখতা। প্রায় দু'দশক ধরে কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেস দল ক্ষমতায় থাকলেও এই দলের সমর্থক সংবাদপত্রগুলিতে পর্যন্ত প্রায়ই লেখা হত 'পশ্চিমবাংলার প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ' আচরণের কথা। দেশভাগের ক্ষত পঞ্জাব বেশ দ্রুত প্রায় পুরোপুরি সামলে নিয়ে শস্যশালিনী এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, কিন্তু বাংলায় সেই ক্ষত আরও দগদগে হয়েছে, বস্তুত পরবর্তী পঞ্চাশ বছরেও অধিকাংশ সমস্যার মূলে সেই র‍্যাডক্লিফের ছুরি।

একই ভাষা, সংস্কৃতি, আবহাওয়া, খাদ্যরুচির মানবগোষ্ঠীর শুধু ধর্মীয় বিভেদের জন্য মনের গতি দু'রকম হতে পারে না। প্রায় একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবাংলায় যুবসমাজের মধ্যে বিপ্লবের চিন্তা দানা বাঁধতে শুরু করে। সে বিপ্লবের লক্ষ্য একই। রূপরেখা কিছুটা আলাদা। বাঙালি মুসলমানরাই পাকিস্তানের দাবিতে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়েছিল, সেই বাঙালি মুসলমানরাই ষাটের দশকের শেষ দিকে উপলব্ধি করে যে পাকিস্তান সৃষ্ট হলেও তাদের প্রতি শোষণ ও বঞ্চনার অবসান তো হয়ইনি, বরং বেড়ে চলেছে ক্রমশ। পাকিস্তানে পর পর সামরিক শাসনে সমস্ত ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত, সেই সব অর্ধশিক্ষিত (কেউ কেউ দুশ্চরিত্র) সামরিক শাসনকর্তারা বাঙালি মুসলমানদের খাঁটি মুসলমান বলেও মনে করে না, যখন তখন চোখ রাঙায়। সুতরাং পাকিস্তানের অখণ্ডতা টিঁকিয়ে রাখা অর্থহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বিচ্ছিন্নতা ছাড়া অন্য পথ নেই, এরই পরিণামে একাত্তর সালের সাতই মার্চ শেখ মুজিবর রহমানের ঘোষণা, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।

পশ্চিমবাংলার বামপন্থী যুবসমাজ চাইল শ্রেণী সংগ্রাম ও সশস্ত্র বিপ্লব। তবে তা শুধু পশ্চিমবাংলাকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য নয়, তা হবে সর্বভারতীয়, যদিও তার কোনওই প্রস্তুতি ছিল না, তবু কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন জ্বলতে লাগল পশ্চিমবাংলায়।

আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে যখন কলকাতার নাম প্রায় মুছে যাচ্ছে, তখন পশ্চিমবাংলায় অখ্যাত একটি থানা নকশালবাড়ির নাম সকলকে চমকে দিল। প্রথম সূত্রপাত একটি সামান্য ঘটনায়। নকশালবাড়ির একটি গ্রামে একদিন একদল আদিবাসী কৃষক তীর-ধনুক-বর্শা-লাঠি-সোঁটা নিয়ে দৌড়ে এসে বসে পড়ল একখণ্ড জমির ওপর, সেই জমির চার পাশে লাল পতাকা পুঁতে দিয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। এটা এমন কিছু অভিনব ব্যাপার নয়, জমি দখলের চেষ্টা ও জোর করে ফসল কেটে নেওয়া প্রতিবছরই ঘটে, আবার পরে পুলিশের সাহায্য নিয়ে জোতদাররা জমি থেকে জবর দখলকারীদের উচ্ছেদও করে দেয়। উত্তরবঙ্গের কিষাণ সভা সাতষট্টি সালে এরকম জমি দখল অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে যে একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে যাবে, কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শাসনভার নেবে যুক্ত ফ্রন্ট এবং কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু হবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সে সম্ভাবনার কথা কল্পনাতেও ছিল না। জ্যোতি বসুর হাতেই পুলিশ বাহিনী, সেই পুলিশবাহিনী কি সংগ্রামী কৃষকদের বিরুদ্ধে যেতে পারে? প্রথমবারের সাফল্যে উদ্দীপিত হয়ে কিষাণ সভার নেতৃত্বে পরবর্তী দশ সপ্তাহের মধ্যে আরও ষাটটি জমি দখলের ঘটনা ঘটে গেল, বাধা এল সামান্য। কিষাণ সভার কিছু কিছু নেতার ধারনা হল, চাষি ও মজুরদের নিত্য ব্যবহার্য অস্ত্র দিয়েই শুরু হবে বিপ্লব।

কয়েক মাস পরে নকশালবাড়ির আর একটি গ্রামে জয়ের স্বাদ পাওয়া উগ্র কৃষিকর্মীদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হল কয়েকজন পুলিশ, তাদের মধ্যে একজন ইন্সপেক্টর ওয়াংদির মৃত্যু হল হাসপাতালে দু'দিন পরে। সেইদিনই আর একদল পুলিশ ঘেরাও হল, সহকর্মীর হত্যায় পুলিশদের চোখে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন, সামান্য প্ররোচনাতেই তারা নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে সাতজন নারী ও দুটি শিশু সমেত হত্যা করে দশজনকে। এ যেন জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতারই ক্ষুদ্র সংস্করণ। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সব সময়ই কৃষক ও মজুরদের ওপর গুলি চালনার বিরোধী, এখন সেই দলেরই নেতা পুলিশমন্ত্রী, সুতরাং এই ঘটনায় সারা দেশ স্তম্ভিত! অবশ্য এরকম গুলি চালনার নির্দেশ নিশ্চিত রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে আসেনি, জ্যোতি বসু সুদীর্ঘকাল বিরোধী দলের নেতা হিসেবে আন্দোলন পরিচালনা করেছেন, শাসন কার্যভার পেয়ে এই অল্প কয়েক মাসে হয়তো সব দিক গুছিয়ে নিতে পারেনি। এরপর পুলিশকে সংযত হবার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হল বটে, কিন্তু জ্যোতি বসু সংবিধানের শপথ নিয়ে মন্ত্রী হয়েছেন, তিনি সশস্ত্র কৃষকদের জমি দখলও সমর্থন করতে পারেন না। উত্তরবঙ্গে তাঁর দলের যে-সব নেতারা বিপ্লবের নামে এরকম সংঘর্ষের উস্কানি দিচ্ছিলেন, তাদের নিরস্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে বিতাড়িত করা হল দল থেকে, গ্রেফতার হলেন অনেকেই, কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্রোহ স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু একটি স্ফুলিঙ্গ নিভলেও ইতস্তত আরও স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠতে দেরি হয়নি। শুরু হল নকশালপন্থী বিপ্লব-প্রচেষ্টা। যাতে চুম্বক আকৃষ্টের মতন দলে দলে যোগ দিয়েছে হাজার হাজার মেধাবী, আদর্শবাদী তরুণ-তরুণী।

একটা ট্যাজেডি এই যে বিপ্লবের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই যুবসম্প্রদায়কে নেতৃত্বের জন্য একমুখী হয়ে চেয়ে থাকতে হয়েছিল চিনদেশের দিকে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়ানের নেতাদের কাছ থেকে আর দেশে দেশে বিপ্লবের আহ্বান শোনা যায়নি, ভিয়েতনাম যুদ্ধে তাঁরা গা বাঁচিয়ে থেকেছেন। চিনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ানের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, রাশিয়াকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে শোধনবাদী এবং মূলত সেই প্রশ্নেই ভাগ হয়ে গেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। গরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যের দলটির নতুন নাম হল সি পি (এম), তারা চিনপন্থী হিসেবেই পরিচিত, কিন্তু সেই দলও যখন সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে পশ্চিমবাংলায়

জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠন করল, তখন বহু তরুণ সদস্যদের মধ্যে দেখা দিল প্রবল বিক্ষোভ। তারা তো বিপ্লবের জন্য ফুঁসছে, তাদের মনে জ্বলজ্বল করছে লেনিনের উক্তি, পার্লামেন্ট আসলে শুয়োরের খোঁয়াড়। বিপ্লব একটা রোমাঞ্চকর স্বপ্ন, তার আহ্বানে প্রাণ দেওয়াও অতি তুচ্ছ, সব বিপ্লবে যুবশক্তিই প্রাণ দিতে ছুটে যায়। একশো কিংবা এক হাজার বছর আগেকার কোনও ধর্মগুরুর বাণী কিংবা উপদেশ যেমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তাঁর অনুগামীরা, সেরকমই অন্য দেশের, অন্য কালের কোনও রাজনৈতিক তাত্ত্বিকের আক্ষরিক অনুসরণ কি সঙ্গত? ইতিহাসে এ রকম ভুল দেখা গেছে বারবার। দেশ এবং কাল ভেদে বিপ্লবের আঙ্গিকও পৃথক হতে বাধ্য।

কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে প্রথম যখন দেখি অগ্নি অক্ষরে বিপ্লবের নানারকম আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা, 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' তখনই আমাদের অনেকের খটকা লেগেছিল। নকশালবাড়ির বিপ্লব প্রচেষ্টার সঙ্গে চিনের সম্পর্কের তাৎপর্য আমি তখনও ঠিক বুঝতে পারিনি। কিংবা সেই সম্পর্কের প্রকৃত ইতিহাস এখনও উদ্‌ঘাটিত হয়নি। লেনিন-স্ট্যালিনের পর মার্কসবাদী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জীবিত তাত্ত্বিক মাও সে তুঙ (এখন পরিবর্তিত উচ্চারণ মাও জে দঙ) কি সত্যিই এমন অপরিকল্পিত, এমন প্রস্তুতিহীন ভাবে তাড়াহুড়ো করে ভারতের মতন একটি বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্মের দেশে বিপ্লব শুরু করার প্ররোচনা দিয়েছিলেন? অথবা তাঁর অজ্ঞাতসারে চিন সরকারের এ ব্যাপারে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল? পিকিং বেতার থেকে একটি মেয়ে অতীব ধারালো কণ্ঠস্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরিজিতে যে-সব খবর প্রচার করত, তা আমরাও দু'-একবার শুনেছি। সব ডাহা মিথ্যে কথা। মাও সে তুং-এর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় জনগণ সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করে দিয়েছে! নকশাল বাড়ি অঞ্চলের তিনটি গ্রামের তিনটি থানা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, একজন অফিসারসহ দশজন পুলিশ খুন ইত্যাদি। বাংলার তরুণরা চিনের যে নেতাকে বিপ্লব তরণীর কর্ণধার বলে গণ্য করতে শুরু করেছিল, তাঁর নাম লিন পি আও। পরবর্তীকালে সেই লিন পি আও ক্ষমতালোভী এবং বিশ্বাসঘাতক হিসেবে প্রমাণিত হন, একটা বিমান নিয়ে চিন থেকে পালাতে গিয়ে নিহত হন রহস্যজনকভাবে।

শুধু তরুণরাই নয়, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের কিছু কিছু প্রবীণ নেতাও আশু বিপ্লবের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। সৌরেন বোস, সরোজ দত্ত, এমনকী পার্টির মুখপত্র 'দেশহিতৈষী'র সম্পাদক সুশীতল রায়চৌধুরী পর্যন্ত। অচিরকালের মধ্যে যখন বিপ্লবী দল গঠিত হয়, তাঁর প্রধান নেতা হন চারু মজুমদার, তাঁর নাম আমরা আগে শুনিনি। তাঁর রাজনৈতিক ক্ষেত্র উত্তরবঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল, পার্টির কর্মীরা নিশ্চিত তাঁকে চিনতেন কিন্তু বাইরে তেমন পরিচিতি ছিল না। ক্রমশ জানা গেল, তিনি শিলিগুড়ির কংগ্রেসী নেতা বীরেশ্বর মজুমদারের ছেলে, ছাত্র বয়েস থেকেই রাজনীতিতে জড়িত, প্রথমে ছিলেন কংগ্রেসের সোসালিস্ট পার্টিতে, তারপর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে কাজ শুরু করেন কৃষক ফ্রন্টে, তেভাগা আন্দোলনে ছিলেন সক্রিয় কর্মী, জেল খেটেছেন কয়েকবার। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক মাত্র পথ সশস্ত্র বিপ্লব এবং তার জন্য গড়িমসি করার প্রশ্নই ওঠে না। এই নিয়ে দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ লেগেই ছিল। অবশ্য এরই মধ্যে একবার সম্ভবত স্থানীয় সহকর্মীদের উপরোধে তিনি জলপাইগুড়ির উপনির্বাচনে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর জামানত জব্দ হয়। অল্প বয়েস থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভালো নয়, তবু দুর্বল শরীর নিয়েই তিনি সংগঠনের কাজ করেছেন গ্রামে গ্রামে, চা-বাগানে। চৌষট্টি সালে তাঁর একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়। শরীরে কঠিন রোগ ছিল বলেই কি তিনি বিপ্লব শুরু করার এমন তাড়াহুড়োর পক্ষপাতী ছিলেন?

যে-দেশে একটি সুসংগঠিত সেনাবাহিনী আছে, সে দেশে বিপ্লব শুরু করতে গেলে

জনসাধারণের হাতে অস্ত্র দিতে হবে না? এই বিপ্লবীদের মতে, অস্ত্রের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকাও আসলে শোধনবাদ। দা, কুড়ুল, কাস্তে, লাঠি এগুলোও অস্ত্র, গ্রামের মানুষ এই সব অস্ত্রই ব্যবহার করতে জানে, এ দিয়েই লড়াই শুরু করে গড়ে তুলতে হবে ছোট ছোট এলাকা ভিত্তিক মুক্তিসংগ্রাম। সুযোগ পেলেই কেড়ে নিতে হবে অত্যাচারীদের অস্ত্র। মাও সে তুং বলেননি যে, 'শত্রুর অস্ত্রাগারই আমাদের অস্ত্রাগার?' আবার সেই অন্য দেশের, অন্য পরিপ্রেক্ষিতের অন্ধ অনুসরণ! এর চেয়ে নিজের দেশে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ব্যর্থতার কারণগুলি অনুধাবন করা বেশি প্রয়োজনীয় ছিল বোধহয়।

নকশাল আন্দোলনের সময় আমি যদি উনিশ-কুড়ি বছরের কলেজের ছাত্র হতাম, তবে খুব সম্ভবত আমিও সে আন্দোলনে চোখ বুজে যোগ দিতাম। নিজের ছাত্র বয়েসে আমি বামপন্থীদের মিছিলে যোগ দিতে দিতে একসময় বাইরে বেরিয়ে এসেছি, রাজনীতির সঙ্গে আর সংস্পর্শ ছিল না, কিন্তু বিপ্লব শব্দটি আকৃষ্ট করত সব সময়। দেশের অবনতি দেখে আমিও মনে মনে ভাবতাম, একটা সর্বাত্মক বিপ্লব ছাড়া এ দেশের পচা-গলা শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। তবে, আমার সে বিপ্লব-ধারণা ঠিক বাস্তব-ভিত্তিক নয়, তার রূপ রেখা সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও ধারণা ছিল না, অনেকটাই কল্পনারঞ্জিত। আমি তখন জীবিকা অর্জনের জন্য প্রায় সর্বক্ষণ ব্যাপৃত, সদ্য বিবাহিত এবং এক সন্তানের পিতা, তবু মনে হত, এক সময় বিপ্লব শুরু হবেই হবে, তখন আমার কাছেও ডাক আসবে, আমাকে যেতে হবে। এটাকে স্বপ্নের বিপ্লব-বিলাসও বলা যেতে পারে, পৃথিবীর অনেক মানুষের মধ্যেই বোধহয় এরকম মনোবাসনা থাকে। এই বাসনা থেকেই কবিতা লিখেছিলাম, 'চে গুয়েভারার প্রতি'। 'আমার স্বপ্ন' নামে আর একটি কবিতায় দীনেশ গুপ্ত, প্রদ্যোত ভট্টাচার্য, ভবানী ভট্টাচার্য, সূর্য সেনের মতন স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কথা লিখতে লিখতে শেষে যুক্ত করেছিলাম, 'কানু-সন্তোষ-অসীমরা জেলখানার নির্মম অন্ধকারে বসে এখনও সে রকম স্বপ্ন দেখছে।' সে আমলে সম্ভবত আর কোনও অ-রাজনৈতিক লেখকের রচনায় এই সব নকশাল বিপ্লবীদের নাম উল্লেখিত হয়নি।

নকশালরা অবশ্য আমাকে পছন্দ করত না মোটেই। তার কারণ, যে-পত্রিকাকে তারা মনে করে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রধান দুর্গ, আমি তার সঙ্গে যুক্ত। আমেরিকা নামটিই তাদের কাছে ঘৃণ্য, আমার সে দেশ থেকে ঘুরে আসাও দোষের। আমার সে দেশে যাওয়াটাই তারা বড় করে দেখেছে, ফিরে আসার কারণটা জানতে চায়নি। (স্বয়ং কার্ল মার্কস একটি আমেরিকান বাণিজ্যিক পত্রিকায় লিখে জীবিকা অর্জন করতেন, এক সময় তিনি ইংল্যান্ড ছেড়ে আমেরিকায় গিয়ে বসবাসের কথাও চিন্তা করেছিলেন।) তা ছাড়া আমি কয়েক বছর আগে কংগ্রেস দলের মুখপত্র জনসেবকেও রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদকগিরি করেছি, সুতরাং আমাকে শ্রেণীশত্রু হিসেবে গণ্য করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। খতমের তালিকায় আমার নাম ছিল কি না তা-ও জানি না। একজন লেখককে যে প্রধানত তার রচনা থেকেই বিচার করা উচিত, তা অনেকেই মানে না, আমার লেখার মধ্যে কোথাও বিপ্লববিরোধী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে কি না বিবেচ্য হয়নি। অনেক পরে এক প্রাক্তন নকশাল, অধুনা ঔপন্যাসিকের মুখে শুনেছি, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, আমার বা আমার মতো কয়েকজন কবির লেখা এক লাইনও পড়া চলবে না। আমি কিন্তু নকশালপন্থীদের পত্র-পত্রিকা, ইস্তাহার এবং কারওর কারওর গল্প-কবিতা পাঠ করতাম খুবই আগ্রহের সঙ্গে। ওদের প্রতি আমার প্রত্যাশা ছিল বিপুল, কিছু কিছু কাজের সমালোচনাও করতাম মনে মনে। গ্রামকে দিয়ে শহর ঘেরার প্রস্তাব খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল, কিন্তু 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', এই ঘোষণা কিছুতেই পছন্দ করতে পারিনি। আগে ভালোভাবে অস্ত্রচালনা শিক্ষা না করে এলোমেলো ভাবে কনস্টেবল খুন করে বন্দুক-পিস্তল কেড়ে নেওয়াও সঠিক পথ বলে মনে হয়নি।

খতমের প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে। তখন চতুর্দিকে খুন-জখম তো চলছেই, কে যে কেন

খুন হচ্ছে, তাও বোঝার উপায় নেই। সেই সুযোগে যার অন্য কারওকে ব্যক্তিগত ভাবে অপছন্দ, তাকে ভয় দেখানোর হুমকিও চলছে যত্রতত্র। নকশাল আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সেইসময় একদিন পশ্চিম জার্মানির কনসুলেটের একটি পার্টিতে সমর সেনের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি তার অনেকদিন আগেই কবিতা লেখা একেবারে ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি সাংবাদিক হয়েছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় ছিলেন কয়েক বছর, তারপর সে পরিচয় মুছে ফেলে 'নাউ' নামে একটি ইংরিজি পত্রিকার সম্পাদক হন, তারও পরে প্রকাশ করেন তাঁর নিজস্ব পত্রিকা 'ফ্রন্টিয়ার', সে পত্রিকা পুরোপুরি নকশাল বিপ্লবের সমর্থক, আগুন ঝরানো লেখায় তিনি তাত্ত্বিক গুরু হিসেবে মান্য হন। সমর সেনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, তবে কৃত্তিবাসে তাঁকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলাম। তাঁর কবিতার আমি খুবই অনুরাগী, তিনি কেন একেবারে কবিতা থেকে দূরে সরে গেলেন, এই অভিমান ও অভিযোগ নিয়েই সেই লেখা। শুনেছি, কেউ তাঁকে কৃত্তিবাস পত্রিকার সেই সংখ্যাটি দিলে তিনি কবিতাটি পাঠ করে পত্রিকাটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। যাই হোক, সমর সেন সদলবলে খানিক দেরিতে সেই পার্টিতে প্রবেশ করার পর আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম অন্য এক কোণে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের সামনে যেতে আমি সব সময়ই আড়ষ্ট বোধ করি, তবু অত্যুৎসাহী কেউ একজন আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। সমর সেন রামের গেলাশ হাতে নিয়ে প্রথম বাক্যটিই বললেন, এই সেই সত্যজিৎ রায়ের দালালটা না? এ যেন বিনা দোষে আচমকা এক থাপ্পড় খাওয়ার মতন। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিটি সদ্য মুক্তি পেয়েছে, আমি তার কাহিনীকার মাত্র, আমার কাহিনীও চলচ্চিত্রটিতে অনেক বদলে গেছে, কিন্তু আমাকে দালাল আখ্যা দেওয়া হবে কেন? আমি যতদূর সম্ভব বিনীত ভাবে বললাম, দেখুন, আমি তো উপযাচক হয়ে সত্যজিৎ রায়ের কাছে যাইনি, তিনি আমার উপন্যাসটি পছন্দ করেছেন। সে জন্য আমাকে দালাল বলছেন কেন? সরাসরি কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বোধহয় সমর সেনের স্বভাবে ছিল না। এর পরেই তিনি আমার 'অর্জুন' উপন্যাসটির প্রসঙ্গ টেনে আনলেন, সেটি সে বছরেরই শারদীয় সংখ্যা 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বললেন, রিফিউজিদের নিয়ে বেশ লেখাটা চলছিল, হঠাৎ তার মধ্যে একটি বড়লোকের মেয়ে নিয়ে এলে কেন? বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে এনে জাপটাজাপটি না করালে বুঝি বই বাজারে বিক্রি হয় না? আমার 'অর্জুন' উপন্যাসটিতে অনেক ত্রুটি থাকতে পারে, আছেও, আমি জানি, কিন্তু এই কি তার সমালোচনার ভাষা? এর পরেও কি আমি উত্তপ্ত হয়ে উঠব না? বিনয় আর হীনম্মন্যতা তো এক নয়। আমি খানিকটা তীক্ষ্ণভাবে বললাম, আপনি ক্যাপিটালিস্ট পশ্চিম জার্মানির এই বড়লোকদের পার্টিতে মদ খেতে এসেছেন কেন? আমার মতন হ্যাংলা, গরিব, তরুণ কবিরা তবু আসতে পারে, কিন্তু আপনি গরিবও নন, তরুণও নন। তা ছাড়া এরা আপনাদের ঘোষিত শত্রু! এ কথারও উত্তর না দিয়ে সমর সেন তাঁর এক সঙ্গীর দিকে ফিরে বললেন, এ ছেলেটার নাম খতমের তালিকায় আছে না? কত নম্বরে?

তখন, জেল থেকে বউদিকে লেখা দীনেশ গুপ্তর চিঠির একটি লাইন আমার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, 'আমি অমর, আমাকে মারিবার সাধ্য কাহারো নাই'।

'হয়তো সমর সেন আমার মতন এক অর্বাচীনের সঙ্গে কৌতুক করতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই ইংরেজ-সুলভ শুষ্ক হিউমার আমি ঠিক অনুধাবন করতে পারিনি।

খতমের তালিকায় নাম থাক বা না থাক, সে সময় আলটপকা হঠাৎ খুন হয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু ছিল না। সাতষট্টি থেকে একাত্তর সাল পর্যন্ত এরকমই অনিশ্চিত ছিল অনেকের জীবন। এক মে-দিবসে কলকাতার ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন জ্যোতি বসু, সেই ময়দানেরই অন্যপ্রান্তে আর এক সভায় কানু সান্যাল ঘোষণা করলেন এক নতুন দলের জন্মের কথা। সি পি আই (এম এল), দ্বিধা বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি এবার ত্রিধা হল। কিন্তু এই নতুন দলটি কেন্দ্রীয় ভাবে তেমন সুসংগঠিত হবার সময় পায়নি মনে হয়, বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সব

অ্যাকশান নেওয়া হচ্ছিল, তা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে কি না বোঝা যায়নি। যেখানে সেখানে বাংলা মাধ্যমের ইস্কুল বাড়িতে আগুন ধরানো, বিদ্যাসাগরের মূর্তির মুণ্ডু ভাঙা, বাসে আগুন লাগানো, শিক্ষক থেকে শুরু করে অনেক নিরীহ মানুষের গলা কেটে দেওয়া, চলন্ত বাসে বোমা ছোঁড়া, এ সবের মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কিংবা বিপ্লবের কর্মসূচির পরিচয় পাওয়া যায়নি। বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বেশ কিছু সমাজ-বিরোধীও এর মধ্যে ঢুকে পড়ে হত্যা ও লুঠতরাজ চালাচ্ছিল রাজনীতির নামে। ময়দানের মুক্তমেলায় নকশাল ছেলেরাই বোমা মেরেছিল, এ কথা আমার আজও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। পুলিশ থেকে সেরকমই বলা হয়েছিল, যদিও অনেক জায়গায় পুলিশই নানারকম কুকীর্তি করে নকশালদের নামে দোষ চাপাত, এ দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

লন্ডনের হাইড পার্কের এক কোণে স্বাধীন ভাবে সব রকম মতামত প্রকাশ এবং গান-বাজনা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। সেখানে ব্রিটিশ সরকারকে কোনও বক্তা চরম গালাগালি দিলেও পুলিশ বাধা দেয় না, কিংবা মুখোমুখি দুই পক্ষ সাংঘাতিক বাকযুদ্ধ শুরু করলেও যতক্ষণ না হাতাহাতি শুরু হয়, ততক্ষণ হস্তক্ষেপ করে না পুলিশ, পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রায় সেই রকমই মুক্তমেলা শুরু হয় কলকাতার ময়দানে, টাটা বিল্ডিং-এর উল্টোদিকে গাছতলায়। প্রতি শনিবার দুপুরে সেখানে জমায়েত হত, প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন জ্যোতির্ময় দত্ত, আমরাও কয়েকজন ছিলাম সঙ্গে, পরে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সেটা জমজমাট হয়ে ওঠে, কোনও সংগঠনের প্রয়োজন হয়নি। সেখানে কেউ এসে গান ধরে, একটু দূরে কেউ শুরু করে কবিতা পাঠ কিংবা দু'তিনজনের নাটিকা, কিংবা বক্তৃতা, কেউ ছবি আঁকে, যার যা খুশি, শ্রোতারা পছন্দমতন এক একজনকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ায়, পছন্দ না হলে আর একজনের কাছে চলে যায় কিংবা কারওর অনুষ্ঠান রুচিসম্মত না হলে ওরে পাগলা বসে পড় বলে থামিয়ে দেওয়া হয়। যারা কখনও রেডিয়োতে (তখনও টি ভি অশ্রুতপূর্ব) গান গাইবার কিংবা কোনও মঞ্চে ওঠার সুযোগ পায় না, সেরকম অনেক অচেনা গায়ক-গায়িকা, শিল্পী এবং বক্তা এই মুক্তমেলায় এসে জমিয়ে দিত। তাদের মধ্যে পরে কয়েকজন বেশ বিখ্যাতও হয়েছেন। শিল্পী প্রকাশ কর্মকার একদিন এসেছিলেন দামামা বাজাতে বাজাতে, অকালপ্রয়াত কবি তুষার রায় হয়েছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয়। ছোট্টখাট্টো চেহারা, ছেঁড়া খাঁকি প্যান্ট ও পেঁজা পেঁজা বোতামবিহীন জামা পরা, মাথাটা একদিকে বেঁকিয়ে, বিচিত্র উচ্চারণে তুষার যখন অনর্গল কবিতা বলে যেত, তাকেই ঘিরে থাকত বহুসংখ্যক তরুণ-তরুণী। তুষার এক এক সময় সামনে কারওকে দেখে তাৎক্ষণিক কবিতাও বানিয়ে ফেলত, যেমন একদিন এক পুলিশের দিকে তর্জনী দেখিয়ে সে বজ্রনাদে বলে উঠেছিল, পুলিশ! কবিকে দেখে টুপিটা তুই খুলিস! কয়েকমাসের মধ্যেই ময়দানের এই মুক্তমেলা শনিবার দুপুরের একটা দারুণ আকর্ষণীয় উৎসব হয়ে দাঁড়াল, পয়সা খরচের কোনও ব্যাপার নেই, শিল্পী ও শ্রোতাদের মধ্যে আনন্দ বিনিময়ই একমাত্র উদ্দেশ্য। তবু কাদের যেন মনে হল, এটা অপসংস্কৃতির চর্চা। হঠাৎ একদিন একদল যুবক হৈ হৈ করে এসে বলল, ময়দানে এসব চলবে না, বন্ধ করে দিতে হবে। তাদের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদে না গিয়ে অনুনয় করে বলা হল, তোমরা নিজেরা খানিকক্ষণ দেখো, শোনো, কোনটা খারাপ তা জানাও। দেখা ও শোনার ধৈর্য তাদের নেই, চলে গেল খানিকটা শাসানি দিয়ে। এক শনিবার আমি যাইনি, সন্ধেবেলা শুনতে পেলাম, সেদিন দুপুরে মুক্তমেলায় কারা যেন কয়েকটা বোমা ছুঁড়ে পালিয়ে গেছে, আহতদের মধ্যে রয়েছে দু'তিনটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে। শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কোনটা সংস্কৃতি আর কোনটা অপসংস্কৃতি তা আমরা বুঝি না, ওরা বেশি বোঝে? বোমা মেরে সংস্কৃতির শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে? এ তো ফ্যাসিজিমেরই নামান্তর। কেউ কেউ জোর করে তবু মুক্তমেলা চালিয়ে যাবার কথা বলেছিলেন, কিন্তু অনেকে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আনে, তাদের জীবনের দায়িত্ব কে নেবে। আমরা আর যাইনি, বন্ধ হয়ে যায় মুক্তমেলা।

সেই ভয়াবহ দিনগুলিতেও আমাদের বেপরোয়া জীবনযাত্রার কোনও বদল হয়নি। আমার বিয়ের কয়েকমাসের মধ্যেই অন্য বন্ধুরা, শক্তি, শরৎকুমার, সমরেন্দ্র, শ্যামল ও আরও অনেকে টপাটপ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু বাড়ি-টাড়ির দিকে মন দিতে আমাদের আরও কয়েকবছর সময় লেগেছে। সন্দীপনের বিয়ে হয়েছিল অনেক আগে, তবু নিজেকে সে বলত ম্যারেড ব্যাচেলার। এক বন্ধুর বিয়ের কয়েকমাস পরে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ খেয়াল হল, তার নবোঢ়া পত্নীর নামটা মনে নেই! বাড়ি গিয়ে স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে হবে তো, তাই সে অন্য এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করেছিল, আমার সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছে বলো তো? নামটা পেটে আসছে, মুখে আসছে না!

তখন সিনেমাহলগুলিতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নাইট শো, বেশিরভাগ মানুষই সন্ধে হতে না হতে ঢুকে পড়ত বাড়ির মধ্যে। প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার অক্ষতভাবে ফিরে আসাটাই যেন একটা বিরাট ঘটনা। কিন্তু আমরা যে স্বভাবে নিশাচর, রাতপাখি, সন্ধের মধ্যে কুলায় প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না। আড্ডায় আড্ডায় রাত অনেক বেড়ে যায়, তবু বন্ধুদের ছেড়ে যেতে মন চায় না। এখন বুঝতে পারি, অল্প বয়েসের সেই আড্ডাই ছিল কবিতা লেখারও প্রেরণা, হিংসা-বিদ্বেষ-পরশ্রীকাতরতার অনুপ্রবেশ ঘটেনি তখনও। কিন্তু প্রতিদিনই গভীর রাতে বাড়ি ফেরা ছিল দুঃসাহসিক অভিযানের মতন, অনেকবার আমরা বিপদে পড়েছি। আমাকে যেতে হত শেয়ারের ট্যাক্সিতে, বড় রাস্তার মুখ থেকে গলির মধ্যে খানিকটা অন্ধকার হাঁটাপথ। দমদমের দিকে প্রায়ই সকালে দু'একটা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যেত রাস্তায়। সেই গলি দিয়ে যাওয়ার সময় আমি কোমর থেকে বেল্টটা খুলে হাতে নিতাম, সেটা যেন তলোয়ার, কেউ আক্রমণ করতে এলে লড়ে যেতে হবে! একদিন বেশ একটা ভয়াবহ হাস্যকর ঘটনা ঘটেছিল। যথারীতি শ্যামবাজার থেকে মধ্যরাতে শেয়ারের ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরছি, সাতগাছির মোড়ে আমার নেমে যাবার কথা, হঠাৎ আমার পাশের লোকটি ধমকের সুরে বলল, না, তোমার এখানে নামা চলবে না। আমি বিস্ময় প্রকাশ করতেই সে ফস করে একটা লম্বা ছুরি বার করে আমার পেটে চেপে ধরে বিশ্রী গালাগালি দিয়ে বলল, চল আমার সঙ্গে। ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার সমর্থনে কিছু বলতে গিয়ে ঘাড়ে একটা রদ্দা খেল। ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই, ধড়াস ধড়াস করছিল বুক। এই লোকটি কোনও একটা নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমার পেটে ছুরিটা ঢুকিয়ে দেবে? যদিও কী দোষ করেছি জানি না, তবু এরকম কিছু হঠাৎ একদিন ঘটে যেতে পারে, অবচেতনে এরকম ধারণাও ছিল। নাগেরবাজার, ক্লাইভ কলোনি, এয়ারপোর্টও ছাড়িয়ে একজায়গায় ট্যাক্সিটি থামানো হল। চতুর্দিক অন্ধকার, শুনশান। লোকটির ছুরির আস্ফালনে ট্যাক্সি ড্রাইভার ও আমাকে নেমে দাঁড়াতে হল। এইবারই কি সেই মুহূর্ত? ছুরিটা এতই বড় যে বাধা দেবার চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই লোকটি খুব জোরে দৌড়ে মিলিয়ে গেল একপাশের মিশমিশে অন্ধকারে। আমরা দু'জন হতভম্বের মতন একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর ট্যাক্সিতে উঠে চম্পট দিলাম। যেতে যেতে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ব্যাপারটা কী হল বলুন তো? শুধু শুধু কেন আমাকে এতটা দূরে নিয়ে এল? ড্রাইভারটি বললেন, বুঝলেন না, ও নিজেই ভয় পেয়েছে। ওকেও বোধহয় কেউ খুন করতে চায়, তাই একা আসতে সাহস করছিল না।

তখন নানান রকম সন্দেহে নিজেদের মধ্যেও খুনোখুনি শুরু হয়ে গেছে। বাঙালিরা সংঘবদ্ধ ভাবে কোথাও লড়াই করেছে, অনতিঅতীত ইতিহাসে এরকম নজির নেই, কিন্তু গুপ্তহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, কিন্তু তিনচারজন মিলে কাপুরুষের মতন কোনও নিরস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যা করার ব্যাপারে তারা বেশ পারঙ্গম। বিপ্লবের আহ্বানে কিছু কিছু মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছিল, এবার সামরিকবাহিনী এসে সেসব গুঁড়িয়ে দিতে লাগল। পুলিশও সাঙ্ঘাতিক প্রতিশোধপরায়ণ, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও মেতে উঠল হত্যালীলায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাতি

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কেন্দ্র থেকে প্রেরিত হয়ে পশ্চিমবাংলার ভারপ্রাপ্ত, বরানগরের মতন কয়েকটি জায়গায় বীভৎস গণহত্যাকাণ্ডের জন্য তাঁকে অপ্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা হয়েছে।

আমরা বিপ্লবপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিইনি, তাদের বিরুদ্ধতাও করিনি। তাদের নামে সংঘটিত কোনও কাজ, যেমন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত কোনও উপাচার্যকে হত্যা কিংবা বিদ্যাসাগরের মূর্তির মুণ্ডু ভাঙা সমর্থন করতে পারিনি, আবার এক একটি হিরের টুকরোর মতন সৎ, আদর্শবাদী যুবক কিংবা সরোজ দত্ত'র মতন মানুষ যখন মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছেন তখন দারুণ কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু এ রক্তপাত থামাবার কোনও উপায় তো আমাদের জানা নেই। তবু অন্তত নৈতিক প্রতিবাদ জানাবার জন্য আমরা কৃত্তিবাসের এক সংখ্যায় ঘোষণা করেছিলাম, 'রক্তের বদলে রক্ত চাই'। অর্থাৎ দিকে দিকে বইছে অকারণের রক্তস্রোত, আমরা নিজে থেকে রক্ত দেব, আহত মানুষদের সেবার জন্য। একটা নির্দিষ্ট তারিখ জানিয়ে যোগাযোগ করা হল মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড ব্যাঙ্কের সঙ্গে। হা হতোস্মি! আশা করেছিলাম, কলকাতায় কবির সংখ্যা গণনাতীত, কৃত্তিবাসের পাঠক-অনুরাগীও কম নয়, দলে দলে সবাই রক্ত দিতে ছুটে আসবে। মেডিক্যাল কলেজের গেটের সামনে একঘণ্টা অপেক্ষা করেও রক্তদাতার সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র চারজন। তাও আমার ছোট শ্যালিকার প্রেমিক পার্থ, যার সঙ্গে কবিতার কোনও সম্পর্ক নেই, সে বেচারি এমনিই সকালবেলা দেখা করতে এসেছিল আমার সঙ্গে, তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম সংখ্যা বাড়াবার জন্য। দেখা গেল, কবিরা রক্ত দিয়ে কবিতা লেখার কথা বলে বটে, কিন্তু অন্যের জন্য রক্ত দিতে রাজি নয়। মধ্যবিত্ত বাঙালির রক্তদান সম্পর্কে অনর্থক ভীতি আছে, অথচ মাঝে মাঝে রক্ত দিলে শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না, তেমন ব্যথাও লাগে না, এটা জানা কথা!

যে-কোনও কারণেই হোক, নকশালপন্থী নেতাদের চোখে আমার মতন কবি-লেখকরা অবজ্ঞার পাত্র হলেও কয়েকজন তরুণ বিপ্লববাদী আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে আসত। তর্ক-বিতর্ক হত। আবার দুপুরে আমাদের সঙ্গে দুটি ডাল-ভাত খেয়ে যেতে বললে আপত্তি জানাত না। তারা এনে দিত পত্র-পত্রিকা, রেড বুক, কয়েকটি চিনে উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। তারা কেউ দল বেঁধে আসত না, হয়তো একজনের কথা বলত না অন্যকে।

ততদিনে আমরা নাগেরবাজার ছেড়ে ফ্ল্যাটভাড়া নিয়েছি দক্ষিণ কলকাতায়। আমাদের এতদিনের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে দেবার জন্য আমিই দায়ী। বাড়িতে তখন তিন পুত্রবধূ নিয়ে আমার মায়ের শান্তি ও সুখের সংসার, কোনওরকম মনোমালিন্য নেই, আমার মনে হয়েছিল সেটাই প্রকৃষ্ট সময়, কেন না রুচি-পার্থক্যের জন্য ভবিষ্যতে তিন বধূর মধ্যে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা তো আছেই। তা ছাড়া আমার মায়ের একটা দোষ ছিল, তিনি তাঁর বড়ছেলের বউকে বেশি বেশি আদর করতেন, সেটা স্বাতীর পক্ষেও অস্বস্তির কারণ হত। আমার এই সিদ্ধান্তের আরও কয়েকটি কারণ ছিল, আমার দুই ভাইয়ের সঙ্গে আমার জীবনযাত্রা পদ্ধতির অনেক তফাত। আমার দু'একটি বন্ধু এসে মাঝে মাঝে উৎপাত ও শান্তিভঙ্গ করে। গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরার অভ্যেসটি কিছুতেই শোধরাতে পারছি না। শ্যামবাজার থেকে শেয়ারের ট্যাক্সিতে ফেরা ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, মা ও স্বাতী আমার ফেরার অপেক্ষায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন বারান্দায়, প্রতি রাতে এজন্য আমার লজ্জাবোধ হয়, পরদিন সকালে আবার ভুলে যাই। তা ছাড়া, আমি অনুভব করছিলাম স্বাতীর প্রতি বেশ অবিচার করা হচ্ছে, দক্ষিণ কলকাতায় তার জন্ম, সেখানেই লালিত ও বর্ধিত হয়েছে, সেখান থেকে তাকে শেকড়শুদ্ধু দমদমের মফঃস্বলে উপড়ে আনা হলেও সে মানিয়ে নিয়েছিল বেশ তাড়াতাড়ি, বাড়ির সকলের এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গেও ভাব হয়ে গেছে, কিন্তু বিয়ের আগে সে ফরাসি-জার্মান শিক্ষার ক্লাসে, গানের ক্লাসে যেত, বান্ধবীদের সঙ্গে বেড়াতে যেত এখানে সেখানে, বিয়ের পর সে নিতান্তই গৃহবধূ হয়ে গৃহে আবদ্ধ থাকবে, এটা মোটেই ঠিক নয়। এখন মেনে নিলেও কিছুদিন

পরে নিশ্চয়ই তার মন বিদ্রোহ করবে। এদিককার অচেনা রাস্তাঘাটে সে একা একা বেরুতে পারে না। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতায় সে জলের মাছের মতন সাবলীল। মাঝেমাঝে বাপের বাড়ি যেতে চাইলে তাকে বাস বদল করে যেতে হয়, ভিড়ের বাসে শিশুপুত্রকে কোলে আঁকড়ে রেখে সেই সুদীর্ঘ যাত্রা মোটেই সুখকর নয়। তবে, বিয়ের সময় থেকেই আমি দমদমের বাড়ির আর একটি ফ্ল্যাট নিয়েছিলাম, বারান্দাবহুল খুব খোলামেলা, তিনদিকই উন্মুক্ত, সে ফ্ল্যাটটি স্বাতীর খুব পছন্দ ছিল।

দক্ষিণ কলকাতায় চলে আসার ইচ্ছে থাকলেও সেখানে ফ্ল্যাটভাড়া অনেক বেশি, সে সামর্থ আমার ছিল না, তাই অনবরত দেরি হয়ে যাচ্ছিল, অকস্মাৎ 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র জন্য পেয়ে গেলাম চার হাজার টাকা। তার অর্ধেক টাকা একে ওকে কিছু কিছু উপহার দেবার জন্য খরচ করে ফেলল স্বাতী, বাকি দু' হাজার টাকা সম্বল করেই আমি নিয়ে ফেললাম এক ঝুঁকি, তখনও কোনও চাকরি নেই, লেখায় উপার্জন প্রতিমাসে বাড়ে কমে, হঠাৎ একমাস অসুস্থ হয়ে পড়লেই লেখা বন্ধ, অর্থাগমও বন্ধ, তবু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে দুশো পঁচাত্তর টাকায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে চলে এলাম ঢাকুরিয়া ব্রিজের কাছে। সঙ্গে নিয়ে এলাম মাকে, আমাদের শিশুপুত্রটি একা ঠাকুমার স্নেহ উপভোগ করার অতিরিক্ত সুযোগ পেয়ে গেল, আবার এদিকে দাদু-দিদার সাহচর্যও পেতে লাগল ঘন ঘন, এবং মাসি-মেসোদের আদর।

এখানে স্বাতী নতুন করে সংসার গুছিয়ে বসার কিছুদিন পর সেই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছিল। একটি নকশালপন্থী তরুণ, তার বয়েস কুড়ি-একুশের বেশি নয়, কখনও সখনও আমাদের বাড়ি আসত। একদিন সে রাত দশটার পরে হঠাৎ এসে উপস্থিত। সাধারণত সে সকালে বা দুপুরে আসে। তার মুখখানি খুবই সুশ্রী ও কোমল, কিন্তু সেদিন তার চোখ দুটি যেন অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল, হাসি নেই, ওষ্ঠে কঠিন রেখা, হঠাৎ স্বাতীকে ও আমাকে প্রণাম করে ফেলে সে বলল যে, সে একটি খাতা আমাদের কাছে রেখে যেতে চায়, সে যদি আর কখনও ফিরে না আসে তা হলে আমি যেন খাতার লেখাগুলি কোথাও ছাপিয়ে দেবার চেষ্টা করি। স্বাতী বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, ফিরে আসবে না মানে? কেন? সে জানাল যে আজ রাতেই তাকে একটা অ্যাকশানে যেতে হবে, ফিরে না আসার সম্ভাবনাই বেশি। অ্যাকশান-এর বিশেষ অর্থও স্বাতীর বোধগম্য নয়, সে কোথাও কাউকে খুন করতে যাচ্ছে আর কয়েকজনের সঙ্গে। কোথায় এবং কাকে, তাও বলা নিষেধ। স্বাতী বিহ্বলভাবে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ, এরকম একটি সুকুমার প্রকৃতির ছেলে খুনি হতে যাচ্ছে, এটা সে বিশ্বাসই করতে চাইছিল না। কেন যাচ্ছে, না যেতে হবে না, এসব বলেও কোনও লাভ নেই, তার আর ফেরার পথ নেই, এখন যদি সে না যায়, সেটা হবে তার সহযাত্রীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, তা হলে তারাই এই ছেলেটিকে চরম শাস্তি দেবে। স্বাতী প্রায় তার প্রেমিকার মতন কিংবা তার মায়ের মতন, কিংবা এই দুটি মিলিয়ে যে সত্তা হয়, সেই রূপ নিয়ে ছেলেটিকে নিবৃত্ত করতে চাইল হাত চেপে ধরে, কোনও লাভ হল না, সে জোর করে হাত ছাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল দপদপিয়ে।

তারপর স্বাতী এমন কান্না শুরু করল যে কিছুতেই তাকে থামানো যায়নি। তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই। আমি খাতাটার প্রতিটি পৃষ্ঠা উল্টে পাল্টে দেখলাম। নানারকম ভাবে কাটাকুটি করা অধিকাংশই কবিতা, কিছু গদ্য, দিনলিপির মতন। উচ্চকণ্ঠে রাজনৈতিক বক্তব্য আছে, লেনিন ও মাও-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি আছে। তা ছাড়া অনেক কবিতাতেই ঝিলিক দিচ্ছে ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা, এক অপাপনীয়া তরুণীর মুখ। কোনও রচনাই মুদ্রিত হবার মতন ঠিক মানে পৌঁছয়নি, কিন্তু তার বিশুদ্ধ আবেগ আমাকে খুবই আলোড়িত করেছিল। অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবছিলাম, কবিতা জিনিসটার কী সাংঘাতিক মায়া, যে আর একদিনও বাঁচবে কি না ঠিক নেই। মৃত্যুর পর কী হয় জানে না। সেও এই কবিতাগুলি ছাপিয়ে তার মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়।

স্বাতীর ব্যাকুল কান্নার মধ্যে প্রার্থনাও ছিল। প্রার্থনা যদি ইচ্ছাশক্তি হয়, তবে তার অবশ্যই জোর আছে। স্বাতীর সেই কান্নাই খুব সম্ভবত ছেলেটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তার সেদিনের অ্যাকশানের ফলাফল আমরা কখনও জানতে পারিনি। সংবাদপত্রেও কিছু প্রকাশিত হয়নি, তবে বছর কয়েক বাদে জেল থেকে বেরিয়ে এসে সে খাতাটি ফেরত নিয়ে যায়।

সাতচল্লিশ

সন্তোষকুমার ঘোষ সম্পর্কে আমরা অবাক হয়ে ভাবতাম, উনি ঘুমোন কখন। সারা দিন-রাতই তো তিনি ব্যস্ত। অফিসে তাঁর ঘরে একটা আরাম কেদারা ছিল, কখনও সেটাতে বসে কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে নিতেন, তাও বড় জোর আধঘণ্টা। সংবাদপত্রে শেষ পাতা ছাড়া হয় রাত্রি দেড়টা-দুটোয়, প্রায় রাতেই তিনি সেটা নিজে দেখে দিয়ে যেতেন, তার আগে বা পরে গাড়িতে চক্কর দিয়ে বেড়াতেন সারা শহর। চেনাশুনো কারও বাড়িতে তিনি হানা দিতেন যখন-তখন, রাত-বিরেত মানতেন না, আমাদের দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটে তিনি কয়েকজন সঙ্গীসহ রাত দুটোর সময়েও হাজির হয়েছেন কয়েকবার। স্বাতীকে জাগিয়ে তুলে বলতেন, খুব খিদে পেয়েছে, খিচুড়ি রান্না করো। স্বাতী সাদা মাটা, এক রঙা মানুষদের চেয়ে এরকম ব্যতিক্রমী চরিত্রই বেশি পছন্দ করে, সন্তোষদার সঙ্গে তার প্রথম আলাপের পরই ভাব জমে গিয়েছিল এবং খিচুড়ি রান্নাতেও বেশ হাত পাকিয়ে ফেলেছিল।

লেখককুলের মধ্যে একমাত্র সন্তোষকুমারকেই তখন গাড়ি চড়তে দেখেছি, তাও তাঁর পদাধিকার বলে। ড্রাইভার ছিল, তবু এক এক মাঝ রাত্তিরে তাঁর নিজে গাড়ি চালাবার শখ চাপত। সে সময় তাঁর সঙ্গী হবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাদের হয়েছে, তারা কখনও সে অভিজ্ঞতা ভুলবে না। ওঃ, কী খারাপ গাড়ি চালাতেন তিনি! একদিন বুদ্ধদেব-প্রতিভা বসুর নাকতলার বাড়ি থেকে ওঁর সঙ্গে ফিরছি, কী কারণে যেন ড্রাইভারের ওপর রাগ করে তাকে মাঝপথে নামিয়ে দিয়ে নিজে স্টিয়ারিং ধরলেন। গাড়ি একবার রাস্তার এপাশে আর একবার ওপাশে, কান ঘেঁষে বিকট শব্দে ব্রেক কষছে অন্য গাড়িগুলি, আমার প্রাণটা ওষ্ঠের কাছে এসে বেরিয়ে যাবার জন্য ধুকপুক করছিল। তবু যে তিনি কখনও দুর্ঘটনার শিকার হননি, তার কারণ, অনেকে বলত, সন্তোষকুমারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন আলাদা দেবতা চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দেয়।

সংবাদপত্রের জন্য সমস্ত মন ও সময় নিবেদিত, নিজস্ব সাহিত্যরচনার ধারাটি প্রায় শুষ্ক, তবু প্রতিদিনের কিছুটা সময় সংবাদ-জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সাহিত্যিকদের সঙ্গে কাটাতেন। কখনও ডেকে আনতেন সমরেশ বসুকে, কিংবা শক্তি, মতি নন্দী, সমরেশ মজুমদার কিংবা আমাকে, আলোচনা হত সাহিত্যের আঙ্গিকের খুঁটিনাটি নিয়ে। পেশার সাফল্যে ও নেশায় যে তাঁর সৃজনমূলক কাজ চাপা পড়ে যাচ্ছে, তা তিনি অনুভব করতেন ঠিকই, বেদনাবোধও ছিল, কিন্তু বেরুবার পথও বোধহয় আর ছিল না। সমরেশ বসুকে তখন বলা হত সাহিত্যের উত্তমকুমার, উচ্চতায় কিছুটা হ্রস্ব হলেও খুবই সুপুরুষ, নানারকম পোশাকে তাঁকে খুবই মানাত। তিনি নিয়ম করে প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বসতেন লেখার টেবিলে, তিনি কোথাও চাকরি করতেন না, লেখার ধরাবাঁধা সময়টাই ছিল চাকরির মতন, সন্ধের পর থেকে মুক্ত পুরুষ, সেজেগুজে বেরুতেন আড্ডা দিতে। সন্তোষকুমার ছাড়া আমার মতন কম বয়েসিরাই ছিল তাঁর বন্ধু। সন্তোষকুমার প্রায়ই সমরেশ বসুকে বলতেন, আমি তোকে ঈর্ষা করি। কিন্তু যখন 'বিবর'

উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়, সন্তোষকুমারই তখন প্রথম সে উপন্যাসকে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে লিখিত অভিনন্দন জানান। বুকের দরজা খুলে দিয়ে তিনি অন্যের লেখার শর্তহীন প্রশংসা করতে পারতেন, এমন উদারতা খুবই দুর্লভ।

সন্তোষদা কিছুদিন ধরে স্বাতীকে বলতে শুরু করলেন, তোমার এই মূর্খ স্বামীটি যে ফ্রি লানসিং করে জীবন কাটবে ঠিক করেছে, সে রকমভাবে কতদিন চলবে? খবরের কাগজের নীতি যখন-তখন পাল্টে যেতে পারে। নীল উপাধ্যায় নামে ও যে 'দেশে দেশে' পৃষ্ঠাটি চালায়, সেটা তুলে দেওয়া হবে, তাতে ওর উপার্জন অনেক কমে যাবে, তখন তোমরা খাবে কী? ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে না? এখন ওকে চাকরি নিতে বলো। স্বাতী আমার চাকরি করা কিংবা না-করা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি, টাকা পয়সার ব্যাপারেও খুবই অন্যমনস্ক, তাই আমাকে জোর করেনি। সন্তোষদা কয়েকবার পেড়াপিড়ি করার পর রাজি হয়ে গেলাম আমি নিজেই। রম্যরচনার বিষয়বস্তু খুঁজতে খুঁজতে তখন আমার হন্যে হবার মতন অবস্থা। তা ছাড়া, আলাদা সংসার পাতার যা কিছু ঝক্কি-ঝামেলা, হঠাৎ হঠাৎ খালি হাত ও বাজার বন্ধ, বিয়ের নেমন্তন্নর উপহার কিনতে গিয়ে কিংবা ছেলের অসুখ হলে ডাক্তার দেখাবার জন্য কারও কাছ থেকে ধার করার গ্লানি, এসবই শুরু হয়ে গেছে। 'দেশে দেশে' পৃষ্ঠাটি বন্ধ হয়ে যাওয়াও বেশ দুঃসংবাদ। নিজের জীবন নিয়ে ঝুঁকি নেওয়া যায়, কিন্তু এখন যে অন্য জীবনও জড়িয়ে গেছে! প্রায় ছ'বছর শুধু কলম সম্বল করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে গিয়ে আমাকে শেষ পর্যন্ত চাকরি নিতে হল সত্তর সালে। সেই সময় সন্তোষদা শক্তিকেও ডেকে নিলেন। শক্তি আর আমার একসঙ্গে একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল 'যুগলবন্দী' নামে। তখন থেকে শক্তি-সুনীল কিংবা সুনীল-শক্তি নামদুটি একসঙ্গে উচ্চারিত হত, দু'জনেই একসঙ্গে যুক্ত হলাম আনন্দবাজার পত্রিকার কাজে।

সন্তোষদাকে আমি জানিয়েছিলাম, কোনওরকম রাজনৈতিক লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, রিপোর্টারদের মতন ঘুরে ঘুরে খবর সংগ্রহ কিংবা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেবার ব্যাপারেও আমি অযোগ্য, কারণ নতুন মানুষের সঙ্গে সহজে আলাপ জমিয়ে নিতে পারি না। আর সংবাদপত্রে ডে-ডিউটি, ইভনিং ডিউটি, নাইট ডিউটি— এরকম বিভিন্ন পর্যায় থাকে, তার থেকেও আমাকে অব্যাহতি দিলে ভালো হয়, কারণ সকাল ও সন্ধেগুলিতে নিজস্ব সময় না পেলে অন্য লেখা, কৃত্তিবাস চালানো সম্ভব হবে না। সন্তোষদা বললেন, রাজনৈতিক লেখার জন্য তোমার কলমের দরকার নেই, তার জন্য অনেকে তৈরি হয়ে আছে, তোমার বাকি দাবিগুলি পরে বিবেচনা করা যাবে, তার আগে তোমাকে সবরকম ডিউটি নিয়ে সব বিভাগের কাজ শিখতে হবে। সুতরাং পরবর্তী কয়েক মাস প্রুফ দেখা, পৃষ্ঠা সজ্জা, নিজস্ব প্রতিবেদন কিংবা অপর প্রতিবেদকদের রচনা সংশোধন, টেলিপ্রিন্টারে আগত ইংরিজি খবরের অনুবাদ, শিরোনাম দেওয়া ইত্যাদি শিক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হল সকালে, দুপুরে ও রাত্রে। কম্পিউটার যুগের বহু আগের কথা, তখন পুরো সংবাদ বিভাগটি ছিল বিশাল এক হল ঘরে, অনেকগুলি টেবিল, কাজের ফাঁকে ফাঁকে এ টেবিল থেকে ও টেবিলে মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া, হাসি ঠাট্টা, আড্ডায় জমজমাট ছিল পরিবেশ, সিগারেট সম্পর্কে কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। নাইট ডিউটি সম্পর্কে আমার অনীহা ছিল, পরে দেখা গেল সেটাই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। রাত্তিরের দিকেই গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি আসে, এক একদিন হইচই, দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়ে যায়। মাঝ রাত্তিরে বিরাট কোনও দুঃসংবাদ এলে বদলে ফেলতে হয় প্রথম পৃষ্ঠা। রাত্তিরের কাজ শেষ হলে বাড়ি ফেরার প্রশ্ন ছিল না, বড় বড় টেবিলগুলো থেকে কাগজপত্র সরিয়ে বিছানা পেতে দেওয়া হত, কোম্পানিরই দেওয়া বিছানা, মাত্র দু'তিন ঘণ্টার জন্য ঘুমোবার চেষ্টা, ভোর হতে না হতেই বাইরে বেরিয়ে সামনের দোকানে চা-জিলিপি খাওয়া। কয়েক মাস পরে সন্তোষদা আমাকে বার্তাকক্ষ থেকে সরিয়ে নিয়ে বসিয়ে দিলেন সহকারী সম্পাদকদের ছোট ঘরে, শিফ্‌ট ডিউটির

বদলে নির্দিষ্টভাবে বারোটা থেকে ছ'টা, কাজ ছিল চিঠিপত্র বিভাগ ও গ্রন্থ সমালোচনা বিভাগ দেখা, 'কলকাতার কড়চা' বিভাগটির দায়িত্বে ছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ, কিছুদিন সে বিভাগটিও আমাকে দেখতে হয়েছিল। এসব কাজই আমার বেশ পছন্দের ছিল। সে ঘরের অন্যান্যদের তুলনায় আমার পদমর্যাদা ছিল নীচে, হংসদের মধ্যে বক হয়ে আমি বসে থাকলেও বাইরের লোকরা বুঝত না, আমিই বা জনে জনে ডেকে ডেকে ভুল ভাঙাই কী করে?

বিশেষ প্রতিবেদক হিসেবে আমাকে কখনও কখনও পাঠানো হয়েছে বাইরে, যেমন বিহারের চাসনালায় ভয়াবহ খনি দুর্ঘটনার সময়, যখন প্রায় চারশো কয়লা-শ্রমিক চাপা পড়ে গিয়েছিল খনি গর্ভে, কয়েকদিন ধরে জানাই যায়নি, তারা মৃত না তখনও জীবিত ; আটাত্তর সালের বন্যার সময় হেলিকপ্টারে বা নৌকোয় বিভিন্ন জেলা ঘুরে দেখা ; ইন্দিরা গাঁধীর হত্যার পর দিল্লির দাঙ্গা, কিংবা বার্লিন দেওয়ালের পতন। সংবাদপত্রের প্রতিবেদকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় মানুষ, আক্রান্ত বা তাদের আত্মীয়-পরিজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনীর পুনর্নির্মাণ করেন। আমি তেমনটি পারি না, শুধু একা ঘুরে দেখি, কোথাও চুপ করে বসে থাকি, অন্যদের কথাবার্তা যা কানে আসে তাই শুনি, নিজে থেকে কারওকে কিছু জিজ্ঞেস করি না, সেভাবেই যতটা যা পেরেছি, লিখেছি। আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ কোনওদিনই আমাকে লেখার ব্যাপারে কোনও নির্দেশ দেননি, কোনও নীতি অনুসরণ করার জন্য চাপ দেননি, সুযোগ-সুবিধে ও স্বাধীনতা দিয়েছেন অবাধ, এমনকী এই পত্রিকার কোনও কোনও নীতির বিরুদ্ধ মত প্রকাশের সুযোগ দেবার মতন উদারতা দেখিয়েছেন।

নাইট ডিউটির সময় এক একদিন বাকি রাতটুকু বিনিদ্র থেকে বেরিয়ে পড়তাম ব্রাহ্মমুহূর্তে। যে কোনও শহরেরই মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত অন্যরকম চেহারা। মধ্যরাত্রির রূপ অনেকবারই দেখেছি, কিন্তু ভোরে সচরাচর রাস্তায় নামা হয় না। ঊষালগ্নের বাতাস গায়ে লাগলে অবধারিত ভাবে মনে হবেই, বেঁচে থাকা কী সুন্দর! ট্রাম-বাসও চালু হয়নি, হাঁটতে শুরু করি মন্থর পায়ে, বাড়ি ফেরার তাড়া নেই, কেন না এখনই পৌঁছোলে মা ও স্বাতীর ঘুম ভাঙাতে হবে। পার্ক স্ট্রিটে এসেই সবচেয়ে বিস্ময় বোধ হয়েছিল। এটাই শহরের সবচেয়ে সুসজ্জিত রাস্তা, এক কালে বলা হত সাহেবপাড়া, তখনও বেশ কিছু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেব-মেম দেখা যেত, আলো ঝলমল করত রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত, ভোরবেলা তার একেবারে অন্যরূপ। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ, একটু একটু কুয়াশা মাখা নির্জন নিস্তব্ধ পথ, বড় বড় বাড়িগুলি ঘুমিয়ে আছে চোখ বুজে। সব সময় যে রাস্তাটিকে যানবাহন ও জনবহুল দেখতেই অভ্যস্ত, সেখানে আর কেউ নেই, আমি একা, যেন প্রলয়ের পর এক নিঃসঙ্গ পথিক। আমার কোনওরকম অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস নেই, কিন্তু পরাবাস্তবতার দিকে একটা টান আছে। যেন এই দৃশ্যমান জগতের আড়ালে রয়েছে একটা অন্য জগৎ, হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায় তার এক ঝলক, যার ঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। একটা চিনে রেস্তোরাঁর সামনে কয়েকটি বেলুন উড়ছে, আরও কাছে গিয়ে দেখি, একটি চিনে কিশোর, ধপধপে সাদা পোশাক পরা, লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে সেই রঙিন বেলুনগুলি নিয়ে, বেলুনগুলিতে ঘুঁষি মেরে মেরে তুলছে ওপরে। আমি যে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, সে ভ্রূক্ষেপও করল না, খেলতেই লাগল, একসময় দারুণ শিহরিত হল আমার সর্বাঙ্গের রোমকূপ। ছেলেটি লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠছে, তারপর যেন ওপরেই থেমে থাকছে বেশ কয়েক মুহূর্ত। যাকে বলে লেভিটেশান। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ তুচ্ছ করে শূন্যে থেমে থাকা তো কিছুতেই সম্ভব নয়, এটা অবিশ্বাস্য। তবে কি চিনেদের মতন চেহারা হলেও এ ছেলেটি পৃথিবীর মানুষ নয়, এসেছে ভিন্ন গ্রহ থেকে, তার শরীরের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি অন্য রকম? হঠাৎই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। বেলুনগুলো দুলছে, ছেলেটি নেই। মানুষের মতনই চেহারা, তবু অদৃশ্য হয়ে যায় কী করে? ছেলেটি কয়েকবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেছে কিন্তু আমাকে দেখেনি, যেন আমার অস্তিত্বই নেই, তার চোখেও কি আমি অদৃশ্য ছিলাম? আরও

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, ছেলেটিকে আর দেখা গেল না, সামনের চিনে দোকানটির দরজা জানলা সব আঁটা।

বিস্ময়ের সেখানেই শেষ নয়। খানিকটা এগিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়ে, পার্কের সামনের ফুটপাথে উবু হয়ে বসে আছে দশ-বারোজন মানুষ, তাদের সকলেরই পরনে একই রকম লুঙ্গি, সাদা ফতুয়া, মাথায় পাগড়ির মতন গামছা বাঁধা। প্রত্যেকের সামনে একটা করে বেতের চুবড়ি, ওরা বাঁশি বাজাচ্ছে, সাপুড়েদের বাঁশি। এতগুলি সাপুড়ে এ রকম ভোরে পার্ক স্ট্রিটে এসে জড়ো হল কী করে? আমি কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণে বহু অলিতে গলিতে ঘুরেছি, কোথাও সাপুড়েদের আস্তানা দেখিনি। যারা রাস্তায় সাপ খেলা দেখায় তারা নিশ্চিত আসে মফঃস্বল থেকে, কিন্তু তারা এত জায়গা থাকতে পার্ক স্ট্রিটে বাঁশি বাজানো প্র্যাক্টিস করতে আসবে, এর কি কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়! আধ খোলা চুপড়ি থেকে ফনাও তুলছে কয়েকটি সাপ। আমি ছাড়া আর কোনও দর্শক নেই, সাপুড়েরাও আমাকে দর্শক হিসেবে গণ্য করছে না। চিনে ছেলেটির শূন্যে অবস্থান আমার দৃষ্টিবিভ্রম হলেও হতে পারে, কিংবা সে জাদুকর, কিন্তু এখানে একসঙ্গে এতগুলি সাপুড়ের সমাবেশ সম্পর্কে কোনও ভুল নেই, তাদের বাঁশির সুরে বাতাস দুলছে, ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলে রাখা যেত। কয়েক মিনিট পরেই তারা একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে চুবড়ি মাথায় নিয়ে চলে গেল একই দিকে। এদের চোখেও যেন আমি অদৃশ্য।

তীব্র কৌতূহলে আমি পরের দিন ঠিক একই রকম ভোরে আবার এসেছিলাম পার্ক স্ট্রিটে, কিন্তু বেলুন নিয়ে লীলায় মেতে থাকা কোনও চিনে কিশোরের চিহ্ন সেখানে ছিল না, ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়ে ছিল না সাপুড়েদের দল। সেদিনই বিকেলে চিনে রেস্তোঁরায় ঢুকেও দেখতে পাইনি সেই ছেলেটিকে, অবশ্য চিনেদের চেহারা একবার মাত্র দেখে আলাদাভাবে চেনা সহজ নয়, সেই বয়েসিও কেউ ছিল না। কয়েকদিন পর ভবানীপুরে গাঁজা পার্কের পাশে একজন সাপুড়েকে বেশ জমিয়ে খেলা দেখাতে দেখেছিলাম বটে, তার মুখ ভর্তি দাড়ি, আমার পার্ক স্ট্রিটের সাপুড়েদের সবারই মুখ ছিল মসৃণ। এ সব কিছু না, হয়তো কোনও তাৎপর্য নেই, তবু এই সব অতি নিভৃত ও নিজস্ব অবলোকন নিয়ে অনেকক্ষণ বেশ মেতে থাকা যায়।

অল্প বয়েস থেকেই কিছু কিছু অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মনে একটা প্রশ্ন থাকে, অন্যদেরও কি এরকম হয়? যৌনতা সম্পর্কে এ সংশয় তো থাকে বহুদিন। আরও কিছু কিছু, যেমন হঠাৎ একটা গানের লাইন মনে পড়ল হাঁটতে হাঁটতে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল পাশের দোকানের রেডিয়োতে ঠিক সেই গানটাই বাজছে। তার মানে কি গানটা ক্ষীণভাবে আগেই শুনেছিলাম? তা হলে এর ব্যাখ্যা কী, সুচিত্রা মিত্র একটা গান থামিয়ে পরবর্তী গানটা ধরবেন, আমি মনে মনে বললাম, 'আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে।' সেটাই তিনি গেয়ে উঠলেন। প্রত্যেকবার এ রকম হয় না, এরকম মনেও পড়ে না, সমস্ত মনস্কতা একটা সূচের ডগার মতন তীক্ষ্ণও হয় না, হঠাৎ হঠাৎ হয়। কোনও একটা অচেনা জায়গায় জীবনে এলাম প্রথমবার, স্টেশান থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়েই মনে হল, এ জায়গা আমি আগে দেখেছি, খেলার মাঠের পেছনে ওই যে গির্জা, পুকুরের কাছে একটা ঝুপসি অশ্বত্থ গাছ...অথচ ছবিও দেখিনি, কোনও বর্ণনাতেও পড়িনি। কেউ কেউ বলেন, খুব ক্লান্ত অবস্থায় কোথাও পৌঁছোলে এমন হতে পারে, প্রথম দৃষ্টিপাতের পরই চোখ বুজে যায়, পরের পলক পড়ার মধ্যেই ঘটে যায় স্মৃতিবিভ্রম, আগের মুহূর্তটা মনে থাকে না, তবু মনে হয় চেনা লাগছে কেন? জানি না এ ব্যাখ্যা সত্যি কি না, এ রকম আমার প্রায়ই হয়। প্রথমবার বিদেশ থেকে ফিরে আমি মাঝে মাঝেই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতাম, এমন কোনও বিদেশি শহরের রাস্তা দিয়ে আমি হাঁটছি, যে শহরে আমি যাইনি। বাড়িগুলি অন্যরকম, গোল গোল স্থাপত্য, মানুষজনের পোশাকও আলাদা ধরনের, সবাই নিঃশব্দ। যেসব শহর ঘুরে এসেছি, সেগুলো একবারও দেখি না। এমনকী কোনও বন্ধুকে দেখতে পাই কোনও বাড়ির মধ্যে, দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। সেটা তার বাড়ি নয়, সে রকম বাড়ি

বা বারান্দা আমিও দেখিনি কখনও বাস্তবে, হতে পারে তা স্বপ্নের নির্মাণ। কিন্তু স্বপ্নের স্থায়িত্ব তো মাত্র কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তার মধ্যে সেই বাড়ির সিঁড়ি, জানলা, বারান্দার রেলিঙের গড়ন, এ সব ঠিক করল কে? আবছা তো নয়, একেবারে স্পষ্ট, খুঁটিনাটি পর্যন্ত দেখা যায়, আমিই কি সেই অলীক গৃহের স্থপতি? তা হলে আমি স্বপ্নের মধ্যে এত রকম রাস্তা বানিয়েছি, কোনও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও তত রাস্তা হয় না।

লিখতে বসেও এক একদিন বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। দমদমে মশার উপদ্রবে সন্ধে বা রাত্তিরে লেখার অভ্যেস আমার চলে গিয়েছিল, তা ছাড়া আড্ডার নেশা, সেইজন্যই আমার যাবতীয় লেখালেখি সকাল ও দুপুরে। মাঝে মাঝে অবশ্য ঘোরগ্রস্তের মতন মধ্যরাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে কবিতার খাতা খুলেও বসি। সকালে বা দুপুরে নির্জনতা বা নিস্তব্ধতা পাওয়া সম্ভব নয়। আমার কোনও লেখার আলাদা ঘর নেই, বাড়ির মধ্যে ঘোরাঘুরি করে নিজস্ব মানুষ। বাইরে থেকেও যখন তখন কেউ না কেউ দেখা করতে আসে, কাণ্ডজ্ঞানহীন তরুণ কবিযশোপ্রার্থীরা মেদিনীপুর বা মুর্শিদাবাদ থেকে এসে মনে করে, তারা যে অতদূর থেকে এসেছে সেটাই বড় কথা। আগে থেকে কিছু না জানিয়ে এসে পড়ে তারা একজনের সময় নষ্ট করছে কি না কিংবা তার লেখায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে কি না, সে প্রশ্নও মনে আসে না। যাই হোক, এরই মধ্যে কখনও টানা দু'তিন ঘণ্টা লেখার সুযোগ পেলে শরীরটা যেন গলে গলে যেতে শুরু করে, তারপর কিছু কিছু রহস্যময় ঘটনাও এসে পড়ে, কখনও শুনতে পাই কোনও রমণী কণ্ঠে কান্নার শব্দ, চেনা কণ্ঠ নয়, সেই মুহূর্তে আমি কোনও কান্নার দৃশ্যও লিখছি না। অলৌকিক বা অতিবাস্তব কিছু নয়, রাস্তায় গাড়ির শব্দ যেমন শোনা যাচ্ছে, পাশের বাড়ির চেঁচামেচি, সেই রকমই খুব কাছেই কারও কান্না। দু'তিনবার শোনার পর কলম রেখে আমি উঠে সমস্ত ফ্ল্যাট ঘুরে দেখি, মা, স্বাতী, আর পুপ্‌লে ছাড়া আর কেউ নেই, তারা কাঁদতেই পারে। কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনজনকেই অন্যভাবে ব্যস্ত দেখা যায়, বারান্দায় এসে রাস্তায় কিংবা পাশের দু'বাড়িতেও সে রকম কোনও উপলক্ষ চোখে পড়ে না। তবু ফিরে এসে কলম হাতে নিলে আর একবার শুনতে পাই সেই কান্না। আমি নিজেও কাঁদি, অন্যের লেখা প্রিয় গল্প-উপন্যাস পড়তে গেলে তো হয়ই, রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' ও সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' পড়তে পড়তে যে কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করেছি, তা তো মনে আছেই। এমনকী নিজের লেখার সময়েও, 'একা এবং কয়েকজন' উপন্যাসের শেষে সূর্যকে হত্যা করে আমি ফুঁপিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। আর একটা কথাও সত্যের খাতিতে সসঙ্কোচে লেখা দরকার, লিখতে লিখতে, দিন-দুপুরে অতি একাগ্রতার মধ্যে আচম্বিতে সমস্ত রোমকূপ খাড়া, ঘন ঘন নিঃশ্বাস, যৌন উত্তেজনা। অন্য লেখকদেরও এ রকম হয় কি না, তা কারওকে জিজ্ঞেস করতে পারিনি।

চেনা কারও মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা কিংবা একদিন আগে তার কথা বেশি বেশি মনে পড়া অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পর্যায়ে পড়ে কি না জানি না, আমার এরকম হয়, যখন মিলে যায়, তখন আমার এই অনুভূতিটা পছন্দ হয় না। অনেকদিন যে একটিও চিঠি লেখেনি, তার কথা হঠাৎ মনে পড়লেই চিঠি আসে। সাধারণত এগুলি কাকতালীয় হয়, কিন্তু পর পর চার-পাঁচবার এ রকম মিল হলেই মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করে। সেই জন্যই মনে হয়, আমরা সব সময় যুক্তিবাদী স্বাভাবিক মানুষ সেজে থাকলেও মাঝে মাঝে চলে যাই মনোজগতের এক গোলকধাঁধায়। দিনের বেলায় জাগ্রত অবস্থাতেও আমরা খানিকটা দিবাস্বপ্নের মধ্যে থাকি। ঘড়ির কাঁটা একদিকে চলে, জীবন মাঝে মাঝে তা উল্টে দেয়। অবশ্য আমি এ সবের মধ্যে কখনও ধর্মীয় অলৌকিকতার ছিটেফোঁটাও কল্পনা করিনি।

আমার যখন-তখন আকাশ দেখার বাতিক আছে। মানুষ এবং তার আত্মীয় বাঁদর-শিম্পাঞ্জিকুল ছাড়া পৃথিবীর আর সব প্রাণীই মাটির দিকে মুখ রেখে চলে। তবু সব মানুষ

কি সারাদিনে একবারও ইচ্ছে করে আকাশের দিকে তাকায়? যখন-তখন আকাশ দেখা আমার মুদ্রাদোষের মতন। কোনও অচেনা জায়গায় গেলেই প্রথমে একবার আকাশ দেখে নিই, সব দেশের আকাশ কিন্তু একই রকম নয়, মেঘের গড়ন নিত্যনতুন বলেই আকাশের রূপও নানারকম, অরোরা বোরিয়ালিস দেখার রোমাঞ্চের তুলনা হয় না, কেনিয়ায় একবার হাই ওয়েতে দাঁড়িয়ে দূরের কিলিমাঞ্জারো পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে যেমন মেঘমণ্ডিত আকাশ দেখেছিলাম, তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ছেলেবেলা উত্তর কলকাতায় থাকার সময় গ্রীষ্মকালে ছাদে শুতাম মাদুর পেতে। জ্যোৎস্না রাতে সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলী উদ্ভাসিত হয়ে উঠত চোখের সামনে। দূরত্ব শব্দটি যে কত সুদূর হতে পারে তা একমাত্র নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকিয়েই সঠিক উপলব্ধি করা যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহজে ঘুম আসত না। এখন তো কতকাল আর ছাদে শুই না, তবু প্রায়ই রাত্তিরে আকাশ দেখার অভ্যেসটি রয়ে গেছে। এক একদিন মাঝ রাতে বা শেষ রাতে ঘুম ভেঙে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি, স্বাতী হঠাৎ জেগে উঠে অবাক হয়।

আকাশের দিকে বেশ কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে কখনও-সখনও নতুন কোনও লেখার বিষয় কিংবা কবিতার প্রথম লাইন মাথায় এসে যায়। বলাই বাহুল্য, এটা দৈবপ্রেরণার মতন কিছু নয়। প্রেরণা ঠিক কাকে বলে, তাই-ই এখনও বুঝলাম না। আকাশের কোথাও অপরূপ স্বর্গরাজ্য আছে, সেখানে চিরতরুণ দেব-দেবীরা বিচরণ করেন, এমন একটা মোহময় রূপকথা আরও অনেকের মতন আমাকেও কৈশোরের অর্ধেক বয়েস পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তারপর তো সব রকম রূপকথার জগৎ থেকেই সরে এসেছি; কবেই তো জেনে গেছি যে দূরবীন আবিষ্কারের পর ষোলোশো দশ সালের দশই জানুয়ারি গ্যালিলিও গ্যালিলি স্বর্গকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন ('জানুয়ারি টেন, সিক্সটিন টেন, গ্যালিলিও গ্যালিলি অ্যাবলিশেস হেভেন'— ব্রেখ্‌টের কবিতা)। কবিতার লাইন আসে বিদ্যুৎ চমকের মতন। অথবা ঝলসে ওঠে কোনও দৃশ্য, যাতে রয়েছে কাহিনীর আভাস। এগুলি যেন মহাকাশের উপহার, নিশ্চয়ই অনেক লেখকই পান। মহাকাশ শুধু উল্কাই পাঠায় না।

ছেলেবেলায় গুরুজনেরা বলতেন, সকালবেলা উঠে সবুজ গাছপালার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে চোখ ভালো থাকে। এখন আমার ধারণা, মাঝে মাঝে রাত্রির আকাশের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকলেই চোখের প্রকৃত শুশ্রূষা হয়।

সন্তোষদা আমাকে একটি আলাদা ঘরে স্থাপিত করে নির্দিষ্ট সময়ের মনোমতন দায়িত্ব দিলেও কয়েকমাস পরে আমি স্বেচ্ছায় সারা রাত সংবাদপত্রের কাজের জন্য মেতে উঠেছিলাম। তখন ভারতীয় উপ-মহাদেশে শুরু হয়ে গেছে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম ও দুঃসহ বিভীষিকা।

ভারতে নানান বাধাবিপত্তি ও কিছু কিছু বিষফোঁড়া থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্র মাথা উঁচু করে টিঁকে থাকতে পেরেছে। কিন্তু পাকিস্তান গণতন্ত্রের ধারণাটাই কিছুতেই হজম করতে পারেনি। একাত্তর সালে একটা সাধারণ নির্বাচন হল, নিয়মসঙ্গত ভাবে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ জয়ী হল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে, কিন্তু সামরিক শাসকরা তা মানতে চাইলেন না, এমনকী জুলফিকার আলি ভুট্টোর মতন রাজনৈতিক নেতাও এই নির্বাচনের ফলাফলকে স্বীকৃতি দিলেন না। শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ দিলে পাকিস্তান ভাঙার প্রশ্ন উঠত না, কিন্তু ভাঙনের বীজ এর মধ্যেই উপ্ত হয়ে গেছে। শেখ মুজিবের সঙ্গে ভুট্টো সাহেব ও ইয়াহিয়া খানের আলাপ-আলোচনার বৈঠক ঢাকা শহরে কয়েকদিন চলল বটে, হঠাৎ কিছু ঘোষণা না করেই ভুট্টো এবং ইয়াহিয়া খান চুপি চুপি সরে পড়লেন ইসলামাবাদে, শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হল কোনও অজ্ঞাত স্থানে। পঁচিশে মার্চ সামরিক বাহিনী ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে মেতে উঠল গণহত্যায়। পরে জানা গিয়েছিল, ওই ত্রিপাক্ষিক আলোচনার দিনগুলি

নিতান্তই ছিল সময় হরণের ছলছুতো। সেই ফাঁকে রাশি রাশি সেনাবাহিনী নিয়ে আসা হচ্ছিল পশ্চিম থেকে পূর্ব পাকিস্তানে। পশ্চিমের শাসকবর্গ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদের উস্কানি দেয় হিন্দুরা, তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আওয়ামি লিগ, সুতরাং হিন্দুদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে, আওয়ামি লিগের প্রত্যক্ষ সমর্থক সবাইকে হত্যা করলেই এদিককার সব আন্দোলন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। লক্ষ লক্ষও নয়, কয়েক কোটি মানুষকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ঠাণ্ডা মাথায়। পঁয়তাল্লিশ সালে হিটলারের মৃত্যু হলেও তার নতুন নতুন সংস্করণ এখনও বিভিন্ন জায়গায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

মাঝখানের পাঁচ বছর ঢাকা বা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের কোনওরূপ যোগাযোগই ছিল না। এদিককার সংবাদপত্রেও ওদিককার খবর থাকত না প্রায় কিছুই। সেই সময়েই বাঙালিজাতি সত্যিকারের দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, সীমান্তে নিশ্ছিদ্র প্রাচীর। ঢাকা থেকে কেউ কলকাতায় ফোন করতে চাইলে প্রথমে ফোন করতে হত লন্ডনে, সেখান থেকে সংযোগ হত কলকাতার সঙ্গে। কী হাস্যকর ও করুণ অবস্থা! পঁচিশে মার্চের পর হঠাৎ পূর্ব পাকিস্তানই হয়ে উঠল এখানকার প্রধান সংবাদ। প্রথম প্রথম এত সব বীভৎস কাণ্ডের বিবরণ অবিশ্বাস্য মনে হত। নৃশংসতারও তো একটা মাত্রা থাকে। তা ছাড়িয়ে গেলে সবই যেন অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমও একই রকম বিবরণ দিতে লাগল এবং হত্যা ও ধ্বংসলীলার ছবি, ছবি তো মিথ্যে হতে পারে না। কিছুদিন পরেই যেমন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা চলে আসতে শুরু করলেন কলকাতায়, তেমনই লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ প্রাণের দায়ে আশ্রয় নিতে এল সীমান্তের এপারে। আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ কবিদের সেই প্রথম দেখলাম, আলাপ হল ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান এবং প্রাবন্ধিক-সাংবাদিক হাসান মুরশেদ, এম আর আখতার মুকুল, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীই 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির রচয়িতা এবং পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে এম আর আখতার মুকুল নিয়মিত গ্রামীণ ভাষায় ভাষ্যপাঠে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন।

প্রথম দিকের আকস্মিক আঘাতে বেশ কিছু মানুষ প্রাণ হারালেও পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়ে প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। কিন্তু একটি সুসংবদ্ধ সেনাবাহিনী, যাদের হাতে আধুনিকতম মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র, তাদের সঙ্গে শুধু আবেগ ও দেশাত্মবোধ দিয়ে লড়াই করা যায় না। একমাত্র চালিয়ে যাওয়া যায় গেরিলা যুদ্ধ, তারও সুফল পেতে লেগে যায় বছরের পর বছর। সেই প্রলম্বিত যুদ্ধের জন্য মনোবল, অস্ত্রবলও লাগে প্রচুর। গেরিলা যুদ্ধের জন্যও প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কিছু বাঙালি অফিসার, আধা সামরিক ও পুলিশের কিছু অংশ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যোগ দিয়েছিল, তাদেরও অস্ত্র ও রশদ জোগাড় হবে কোথা থেকে? প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারে একমাত্র প্রতিবেশী ভারতীয় সেনাবাহিনী, কিন্তু ভারত সরকার এ রকম প্রকাশ্য সমর্থন দিতে পারে না, কেন না, পাকিস্তান রাষ্ট্রে গৃহবিপ্লব হোক বা যাই হোক, তাতে অন্য দেশের হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইনবিরুদ্ধ। পৃথিবীর সব দেশ এই নারকীয় হত্যালীলাকেও পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে নিশ্চুপ হয়ে আছে। আমেরিকা ও চিনের আগে থেকেই সমর্থন আছে পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের প্রতি। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আমেরিকা পাকিস্তানে গণতন্ত্রের ওপর এই ব্যাভিচার দেখেও উচ্চবাচ্য করেনি।

আমাদের কোনও প্রতিবেশী যদি পেশীবলে উন্মত্ত হয়ে নারী ও শিশুদের গলা টিপে মারতে থাকে, তা হলে সেটাও ওদের সাংসারিক ব্যাপার ভেবে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি? এই মানবিক সমস্যা ছাড়াও ভারতের আর একটি বাস্তব সমস্যা বিরাট আকার নিয়ে ফেলল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে পৌঁছল প্রায় এক কোটিতে। অকস্মাৎ এই

জন-বিস্ফোরণে পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা ও আসামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গঠন পর্যুদস্ত হবার উপক্রম। এত মানুষের বাসস্থান, খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা করতেই হিমসিম খেতে হয়। তার ওপর অন্য ভয়, যে-কোনও সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধার আশঙ্কা। পাকিস্তানি চরেরা সে চেষ্টাও কম করেনি, কিন্তু সে সময় পূর্ব ভারতের মানুষ আশ্চর্য সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঁধী ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও অন্যান্য প্রধান পশ্চিমি দেশগুলিতে বিনা আমন্ত্রণে ঘুরে বেরিয়েছেন এই সমস্যা সমাধানের আবেদন নিয়ে, কেউ সাড়া দেয়নি। এরপর একমাত্র উপায় পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ, আবার একটি যুদ্ধ, এবং যদি সর্বাত্মক যুদ্ধ হয় তা'হলে, চিন ও আমেরিকা পাকিস্তানের সাহায্যে সসৈন্যে এগিয়ে এলে ভারতের পরাজয় অনিবার্য। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ানের সঙ্গে কুড়ি বছরের বন্ধুত্ব চুক্তি, অর্থাৎ ভারত আক্রান্ত হলে রাশিয়া তার পাশে এসে দাঁড়াবে, এ রকম শর্ত হবার পরই ইন্দিরা গাঁধী মুক্তিবাহিনীকে সরাসরি সাহায্য এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন।

সে সময় আমি আনন্দবাজার অফিসে প্রায়ই রাত জেগে বসে থাকতাম। নতুন নতুন খবর এলে তৎক্ষণাৎ তা লিখে ফেলা হত, পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ঢুকে-পড়া আমাদের সাংবাদিকরা দ্রুত খসড়া প্রতিবেদন পাঠালে আমি তার সম্পূর্ণ রূপ দিতাম। সব মিলিয়ে এমনই উত্তেজনা ছিল যে, একটুও ক্লান্তিবোধ হত না। অফিসের কাছেই মিশন রো'র ওপরে একটি হোটেলে ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, সন্তোষদা মাঝে মাঝে সেখানে কয়েক ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম নিতে যেতেন। কয়েকদিন আমাকে তাঁর মৌখিক রচনার শ্রুতিলিখন করতে হয়েছে, তিনি আর নিজের হাতে লিখতেন না। কয়েকদিন পরেই অবশ্য আমি বেঁকে বসে বলেছিলাম, ওঁর ভাষার শ্রুতিলিখন করতে গেলে আমার ভাষায় তার প্রভাব পড়ে যেতে পারে। আমি আর রাজি নই। তখন শ্রুতিলিখনের জন্য অন্য একজন নিযুক্ত হল, আমার নিজস্ব লেখাও চলতে লাগল পাশাপাশি।

লেখা ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও ওষুধ সংগ্রহ করার কাজে মেতে উঠেছিলাম, মাঝে মাঝে সেই সব নিয়ে যেতাম সীমান্তের মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে। স্বাতীর বাবাও ছোট ছোট বেতার যন্ত্র তৈরি করে দিতেন। সেই সব শিবিরে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে শুনতে পেতাম কত রোমহর্ষক কাহিনী। পাকিস্তানি সৈনিকদের নিদারুণ নিষ্ঠুরতার (বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বেয়নেট দিয়ে খোঁচানো) কাহিনী শুনে মনে হত, তারাও তো মানুষ তাদেরও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে, তবু তারা এমনভাবে মানুষকে মারছে, মুসলমান হয়েও মুসলমানকে মারছে, কী কুমন্ত্রণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের মগজে? আবার কিছুদিন আগেও যারা ছিল ছাত্র, অনেকে সচ্ছল পরিবারের সন্তান, কখনও বন্দুক-পিস্তল ধরেনি, এই কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁদের কি অস্বাভাবিক পরিবর্তন, সব সময় মৃত্যুকে পকেটে পুরে রেখেছে, এক একজনের অসম সাহসিক বীরত্বের কথা শুনে অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। বসিরহাটের কাছে একটা গোপন শিবিরে সন্ধের পর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গোল হয়ে বসে মুড়ি আর কাঁচা লঙ্কা খেতে খেতে নানান অভিজ্ঞতার কথা শুনছি, পাশেই এক জায়গায় জড়ো করে রাখা এক গাদা লাইট মেশিন গান আর হ্যান্ড গ্রেনেড। কেউ অবহেলার সঙ্গে সামনে ফেলে রাখছে রিভলভার, গলায় বুলেটের মালা, হ্যাজাক বাতি জ্বলছে, দূরে হঠাৎ হঠাৎ শোনা যাচ্ছে কামানের গর্জন। আমার মনে হত, দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিতে এরকম যুদ্ধের কত বিবরণ পড়েছি, ফিল্মে দেখেছি, এদেশে কখনও যুদ্ধ দেখিনি। সত্যি সত্যি বাঙালির ছেলেরা যুদ্ধ করছে, পাশেই একটা সত্যিকারের যুদ্ধ এই মুহূর্তেও চলছে, ভাবতেও কেমন যেন লাগে। আমার তখন সাঁইতিরিশ বছর বয়েস, এই বয়েসটা কোনও গির্জার পক্ষে খুবই কম, কোনও ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পক্ষে খুবই বেশি, এই বয়েসে নতুন করে সৈন্যবাহিনীতেও যোগ দেওয়া যায় না বোধ হয়। তবু এক একসময় মনে

হত, কলম রেখে রাইফেল হাতে নিয়ে কি এই যুদ্ধে সহযোগী হওয়া যায় না? যায় না, তার আরও কারণ, এটা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করার যুদ্ধ, আমি তো ভারত তথা পশ্চিমবাংলার মানুষ। ফরিদপুরের গ্রামের পর গ্রাম আক্রান্ত হলে সেখানকার মানুষ যে-যেমনভাবে পারে প্রতিশোধ সংগ্রামে অংশ নেবে, কিন্তু আমার ফরিদপুরে জন্ম হলেও আমি তো আর সেখানকার কেউ না! আমি শুধু সেই সব বিবরণ পড়ব কিংবা শুনব।

শরণার্থীদের তাঁবু বনগাঁ থেকে শুরু করে যশোর রোডের দু'পাশ ধরে সল্টলেক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, কলকাতা গ্রাস করার উপক্রম। সেই সব শরণার্থীদেরও দেখতে যেতাম। একদিন কবি অ্যালেন গিন্‌সবার্গ আগে থেকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ আনন্দবাজার অফিসে সাধারণ দর্শনার্থীদের মতন শ্লিপ লিখে উপস্থিত। অ্যালেন আমাকে জানাল, আমেরিকান সরকারের নীতি যাই-ই হোক, সে দেশের বহু বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও জনসাধারণ পাকিস্তানি অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছে। বব ডিলানের মতন তখনকার জনপ্রিয়তম গায়ক ভারতে শরণার্থীদের জন্য যত বেশি সম্ভব সাহায্য পাঠাতে চায়, সেই উদ্দেশ্যেই তারা প্রকৃত অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য অ্যালেনকে পাঠিয়েছে। একটা গাড়ি ভাড়া করে অ্যালেন ও একজন ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে একদিন রওনা হলাম যশোর রোড ধরে। মাঝে মাঝেই থেমে অ্যালেন দেখছিল কোনওরকমে হোগলার ছাউনি দেওয়া ঘরে মানুষের জীর্ণ, শীর্ণ চেহারা। নিপীড়িত মানবতা। অঝোরেই বৃষ্টি পড়ছে, শুরু হয়ে গেছে বন্যা, গাড়িতে বেশি দূর যাওয়া গেল না, তবু অ্যালেনের অদম্য জীবনী শক্তি, গাড়ি ছেড়ে নেওয়া হল নৌকো। হ্যাঁ, যশোর রোড দিয়ে নৌকো চলেছিল, একেবারে সীমান্তে পৌঁছে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি, হঠাৎ উল্টোদিক থেকে শুরু হল গুলিবর্ষণ, একটা গুলি এসে লাগল আমার শরীর থেকে দু'তিন ইঞ্চি দূরে গাছের গুঁড়িতে।

একাত্তর সালের ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল যুদ্ধ, ভারত সরকারের স্ট্র্যাটেজি ছিল, যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধের হেস্তনেস্ত করে ফেলা, যাতে আমেরিকার সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে এসে পৌঁছতে না পারে। সে যুদ্ধের প্রতিদিনের ঘটনা আজও আমার মনে আছে, কিন্তু এখানে তার বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব পাকিস্তানের বিমানবাহিনী প্রথমেই ধ্বংস করে এবং ঢাকার বিমান বন্দর বোমার আঘাতে অকেজো করে দিয়ে ভারতীয় স্থলবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় এগোতে থাকে, ওদিককার এক একটি দুর্গ বা ঘাঁটির পতন হয়। খুলনার সাতক্ষিরার পতন হয় এগারো-বারো তারিখের মধ্যে, পাকিস্তানী বাহিনী পশ্চাৎ অপসরণ শুরু করে। কলকাতার ভূতপূর্ব পাকিস্তানি কনসুলেট অনেক আগেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যোগ দিয়ে বাংলাদেশ মিশন নাম নিয়েছে, সেখানকার প্রতিনিধিরা সাতক্ষিরায় গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলতে চান, আমরাও কয়েকজন সেই দলে জুটে গেলাম। বসিরহাটের পাশে ইছামতী নদী পেরিয়ে কয়েক মাইল পরে সীমান্ত, আমাদের ট্রাক এমনই ভর্তি যে দাঁড়িয়ে থেকেও পাশের মানুষের কাঁধ খিমচে ধরে আছি, যে-কোনও মুহূর্তের ঝাঁকুনিতে ছিটকে বাইরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। তখনও অনেক জায়গায় মাইন পোঁতা রয়েছে, রাস্তার ধারে ধারে ফক্সহোল ও বাঙ্কার, কোথাও কোথাও পড়ে আছে মৃতদেহ, গোলাগুলিতে বিধ্বস্ত সব ফাঁকা বাড়ি, ঠিক যেন বিদেশি চলচ্চিত্রের মতন যুদ্ধক্ষেত্র, এবং বহু জায়গায় ছিন্ন শাড়ি, ব্রা, মেয়েলি জুতো। হিংস্র জন্তুর মতন পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী মরিয়া হয়ে বাঙালি মেয়েদের কামড়ে, ছিঁড়ে খেয়েছে। সে যাত্রায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের সঙ্গী, লিখেছিলেন তাঁর স্মরণীয় রচনা, 'ক্ষমা নেই'!

ষোলোই ডিসেম্বর ঢাকায় ভারতীয় উপ সেনাপতি অরোরার কাছে পূর্ব পাকিস্তানের সেনাপতি নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেন। নিয়তির এমনই পরিহাস, এরা দু'জনে নাকি ছিলেন একই সময়ে, একই জায়গায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বন্ধু। সেই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম না, তবু মনশ্চক্ষে যেন সবই দেখেছি। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ঢাকায় মুক্তির উল্লাস আমার মর্মস্পর্শ করেছিল। সেদিন কলকাতাতেও আমরা নিজস্ব উৎসব করেছিলাম এবং নিকটতম সুযোগে

যেতে চেয়েছিলাম সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে। শুধুই ভাষার প্রশ্নে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি, পাকিস্তানে বাংলাভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আন্দোলনের মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছিল অনেক আগেই। মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক বৈষম্য, এবং পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা রটিয়ে দিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানি মুসলমানরা প্রকৃত মুসলমান নয়, সেইজন্যই বাঙালি মুসলমানদের হত্যা করতে সৈন্যরা বিবেকযন্ত্রণা অনুভব করেনি। যদিও ইয়াহিয়া খান কিংবা জুলফিকার আলি ভুট্টোর মতন নেতারাও কেউই সঠিক অর্থে মুসলমান নন, তাঁরা পশ্চিমি রীতিনীতিতে অভ্যস্ত, ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামি বিধি কিছুই মান্য করতেন না। তবুও সাধারণ মানুষদের তাঁরা ধর্মের নামে ধোঁকা দিতে ইতস্তত করেননি।

বাংলাদেশে যাওয়ার সুযোগ আমার ঘটে গেল পরের মাসেই। তখনও যাতায়াতের পথ সুগম হয়নি, নদীবহুল বাংলাদেশের অনেক সেতুই বিধ্বস্ত, স্টিমার ফেরি চালু হয়েছে বটে কিন্তু খাদ্য সরবরাহের জন্য অগণিত ট্রাক যাচ্ছে ভারত থেকে, তারই মধ্যে মনোজ বসু নিজের জন্মস্থান দেখার জন্য ব্যাকুল হলেন। তাঁর দুই ছেলে মনীষী ও ময়ূখের সৌজন্যে সে গাড়িতে আমারও একটা জায়গা হয়ে গেল। আটচল্লিশ সালের পর তেইশ বছর বাদে এই আবার ফেরা, কিন্তু আগেকার যাত্রাপথের কথা আমার তেমন কিছুই মনে নেই। শ্যামবাজার থেকে যে-যশোর রোডের শুরু, বনগাঁ সীমান্ত পার হবার পর সেই একই রাস্তা, দু'পাশের গ্রাম্য বাড়ি-ঘর ও প্রকৃতি একই রকম, মানুষ একই আকার-প্রকারের, তবু কেন রোমাঞ্চ হয়?

ফিরে যাচ্ছি জন্মভূমিতে। রিটার্ন অফ দা প্রডিগাল সান? সে রকম তো অনুভূতি হচ্ছে না। আমার মা-মাসিরা যে গ্রাম্য ছবির কথা ভেবে ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তা তো এতদিন জলছবি হয়ে গেছে। বাবা তাঁর অন্তিম দিনগুলিতে একবার বাড়ি যাবার জন্য অস্থির হয়েছিলে বহু বছর কলকাতা শহরে কাটালেও গ্রামের বংশানুক্রমিক বাড়িটাকেই তিনি নিজের বাড়ি ভাবতেন, কিন্তু সেখানে ফেরার কোনও উপায় ছিল না। যেন আমার গায়ে লাগছে বাবার সেই মানসিক যাতনার দীর্ঘশ্বাস, এটা খুবই লঘু সেন্টিমেন্ট হতে পারে, কিন্তু সে রকম অনুভূতি হচ্ছিল ঠিকই। পূর্ব বাংলার গ্রাম থেকে উৎপাটিত কিংবা বিতাড়িত হয়ে কলকাতায় আশ্রয় নেওয়া কত মানুষের মহিমাহীন, মলিন, অসহায় মুখ আমি দেখেছি। আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সকলেই আহার-বাসস্থানের সমস্যা ঘুচিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের গলার আওয়াজ চুপসে গিয়েছিল। এতবড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেল, দুই বাংলার মানুষের মধ্যে কত আবেগের আলিঙ্গন হল, তবু হিন্দু বা মুসলমান, এপার কিংবা ওপার থেকে কেউই আর ফিরতে পারবে না জন্মভিটেতে। আমি একা ফিরব কোথায়?

আবার ভাষার টানে, বাংলা ভাষার মানুষদের এই যুদ্ধ জয়ে এমনই রোমাঞ্চ হয় যে হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, এখানকার গাছগুলিও বাংলায় কথা বলে, বাতাসের শব্দও বাংলা। এটা নতুন বাংলাদেশ, বাংলা ভাষার দেশ, পশ্চিমবাংলায় বাংলার সেই মর্যাদা নেই! আমার একবার এমনও মনে হয়েছিল, কলকাতা ছেড়ে এসে বাংলা ভাষার লেখক হিসেবে ঢাকায় বসবাস করব, কিন্তু বাংলাদেশের লেখক-বন্ধুরা কেউ কেউ পরে সহাস্যে বলেছিল, ইউফোরিয়া কাকে বলে জানো তো! সেটা এক সময় কেটে যাবেই, তখন বোঝা যাবে কত ধানে কত চাল, তখন আমরাই অনেকে তোমাকে তাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠব! এটা পরিহাস হতে পারে, কিন্তু সত্যিই আর ফেরা যায় না।

মনোজ বসুর পৈতৃক বাড়ি অনেকখানি জমি ও বাগান সমেত, আধা ধ্বংস স্তূপের মতন পড়েছিল, তিনি সেটিকে একটি হাসপাতাল হিসেবে দান করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি তোমার গ্রামের বাড়ি দেখে যেতে চাও? আমরা তো ওই দিক দিয়েই ঢাকায় যাব। আমি সবেগে দু'দিকে মাথা নেড়েছি। আমাদের পাকা বাড়ি ছিল না, এতদিন অব্যবহারে, এবং প্রকৃতির নিয়মে এমনিতেই ধ্বংস হবার কথা, বাগান-পুকুর

জবর দখল হয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়। সে পরিবর্তন আমি দেখতে চাই না। আমার মনের মধ্যে বৃষ্টি ভেজা টিনের চালের বাড়ি, ফলন্ত বাতাবি লেবুর গাছ, পুকুরের ধারে বাঁকা খেজুর বৃক্ষ সমন্বিত যে-চিত্রটি, সেটাই অক্ষয় হয়ে থাক।

অরিচা ঘাট পেরিয়ে ঢাকায় পৌঁছবার পর আমার আশ্রয় জুটেছিল কাজী সাহেব নামে একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, উদার মানুষের কাছে, পরে অনেকবার তাঁর খোঁজ করেও সন্ধান পাইনি, তবে বেশির ভাগ সময় কাটাতাম কবি জসিমুদ্দিনের বাড়িতে। তাঁর বাড়ির সংলগ্ন নিজস্ব ধান খেত পর্যন্ত ছিল, শহরের মধ্যে এরকম ধান খেত রক্ষা করার জন্য তিনি গর্ব প্রকাশ করতেন। কবি সহৃদয় ব্যবহারে এবং নানারকম আহার্য পরিবেশনে আমাদের আপ্লুত করে রেখেছিলেন, কিন্তু একটা লজ্জার কথা বিশেষ করে আমার মনে আছে। তিনি জমিয়ে গল্প বলেছিলেন, হঠাৎ আমি বাধা দিয়ে কাঁচুমাচুভাবে আবেদন জানিয়েছিলাম, আমায় কিছু কাগজ দিতে পারেন? আমি একটু লিখব কোনও ফাঁকা ঘরে বসে। তিনি সবিস্ময়ে এমনভাবে তাকিয়ে ছিলেন, যেন আমার মাথার দোষ আছে! আসলে, সে সময়ে 'দেশ' পত্রিকায় আমার একটি ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছিল, বাংলাদেশ দেখার অত্যুৎসাহে আমি পরবর্তী সংখ্যার জন্য ইনস্টলমেন্ট না দিয়েই চলে এসেছি, এমনিতে কখনও আমার লেখা কোনও সপ্তাহে বাদ পড়ে না, সাগরময় ঘোষের রক্তচক্ষু মনে পড়ছিল বারবার। জসিমুদ্দিনের এক ছেলে আমাকে এক তাড়া কাগজ ও পাঁচখানা কলম দিলেন, ওপরতলার একটি ঘরে বসে আমি দু'তিন ঘণ্টায় লিখে ফেললাম উপন্যাসের এক কিস্তি, তারপর ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের এক পাইলটের হাত দিয়ে সেই লেখা ঢাকা থেকে কলকাতায় দেশ পত্রিকার অফিসে যথা সময়ে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ঢাকায় সেই সময় মিছিল ও সভা-সমিতি চলছে অনবরত। রমনার মাঠে এক সভায় ঠেলেঠুলে ঢুকতে দেখেছিলাম জিয়াযুর রহমানকে, যিনি তখন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান নায়ক, পরে যদিও তাঁর পরিচয় বদলে যায়। দেখেছিলাম খালেদ মুশারফ ও রফিকুল ইসলামকে, এঁরা সবাই বাঙালি বীর সেনানী। এক সভায় ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ভারতীয় সৈন্যরা কি কখনও এ দেশ ছেড়ে যাবে, না এখানেই গেড়ে বসে থাকবে? এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানার কথা নয়। তখন নব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ভারতীয়দের হাতে বন্দি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য প্রচুর ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের অনেকের আশঙ্কা, এত অর্থ ও গোলাবারুদ খরচ করে ভারতীয় সৈন্যরা জিতেছে, তারা সহজে ছাড়বে কেন, বাংলাদেশটাকে তারা ভারতের মধ্যে গিলে নেবে কিংবা কয়েক বছর ধরে শোষণ করে ছিবড়ে অবস্থায় ছেড়ে যাবে। আর ভারতের অধিকাংশ জনমত—এখানেই সমস্যার অন্ত নেই, এর ওপর বাংলাদেশের মতন একটা প্রায় নিঃস্ব দেশের দায়িত্ব নেবার কোনওই মানে হয় না, আমাদের সৈন্যরা যত তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, ততই মঙ্গল! যাই হোক, আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই বাংলাদেশেরই আর একজন ব্যক্তি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, সব ভারতীয় সৈন্য যে ফিরবে না, তা তো জানা কথা! যে বারো-চোদ্দো হাজার ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদের মুক্তি যুদ্ধে সাহায্য করতে গিয়ে এখানে প্রাণ দিয়েছে, বাংলাদেশের মাটিতে যাদের গোর হয়েছে, তারা আর ফিরবে কী করে বলুন!

ঢাকার পূর্বাণী হোটেলে তখন খোলা হয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকার স্থানীয় দফতর। ভবিষ্যতের কত রকম পরিকল্পনা। অনেক রাত পর্যন্ত সেই হোটেলের একটি কক্ষে পানাহার, আড্ডা চলছে, দু'দিন আগে আলাপ হয়েছে কবি শামসুর রহমানের সঙ্গে, সন্তোষদাও তাঁর বিশেষ অনুরাগী। কলকাতা প্রত্যাগত অনেকেই এসেছেন, এ যেন বসেছে এক টানা বিজয়-উৎসব। রঙ্গ-রসিকতা, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক রুচিতে কোনও প্রভেদ নেই, তবু মাঝখানের এতগুলি বছরের কেন এই কৃত্রিম ব্যবধান? ধর্মের চেয়েও সংস্কৃতির জোর যে

কিছুমাত্র কম নয়, তা ধর্মান্ধরা কেন কিছুতেই বুঝতে পারে না? ভাষার ব্যবধানে মানুষের ব্যবহার সহজ-সাবলীল হতে পারে না, এক ভাষার মানুষ দ্বিভাষীদের বদলে সমভাষার মানুষের মানুষদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হবেই। সামরিক শাসকরা মনে করে, কামান-বন্দুক চালিয়ে, কয়েক লক্ষ মানুষকে খুন করে একটা জাতিকে বরাবরের মতন পদানত রাখা যায়। তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না, বারবার ভুল করে। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষদের জন্যও আমাদের সমবেদনা হচ্ছিল, তারা কবে স্বাধীন চিন্তার অধিকার, মুখ খোলার অধিকার পাবে?

এক সময় টাটকা বাতাসে নিশ্বাস নেবার জন্য আমি এসে দাঁড়ালাম বারান্দায়। শীতকালের মেঘহীন নক্ষত্র খচিত আকাশ। ছায়াপথের অণু-পরমাণুর মতন আকৃতির সব তারা, যেমন ছোটবেলায় ছাদে শুয়ে দেখেছি। তখন মনে হত, এই বিশাল মহাকাশে আমাদের এই পৃথিবী নামের গ্রহটি একটা বালুকনার মতনও নয়, তার চেয়েও অতি ক্ষুদ্র। তারই মধ্যে মানুষের সভ্যতা, সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষেরও কল্পনার জগৎ কত সীমাহীন, কালহীন, দিগন্তহীন? এই পৃথিবীরও অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে কত মানুষ দেশ থেকে দেশান্তরে গেছে, খাদ্য, পানীয় ও নিরাপত্তার সন্ধানে মানুষ জন্মস্থান ছেড়ে অজানার সন্ধানে যেতে দ্বিধা করেনি, পাড়ি দিয়েছে আপাতদৃষ্টিতে অকূল সমুদ্র। তা হলে আমার বাবা-কাকারা যে-কোনও কারণেই হোক ফরিদপুর ছেড়ে চলে গেছেন কলকাতায়, তা নিয়ে এত আদিখ্যেতা করারই বা কী আছে? মানুষ তো বাসস্থান বদলাতেই পারে। মাদারিপুরের সেই গ্রামের বাড়ির তুলনায় কলকাতায় আমরা তো তেমন খারাপ অবস্থায় নেই। প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হলেও যে নাগরিক উপভোগ পেয়েছি, তা কি কম আকর্ষণীয়? দেশ কি একটা ধোঁয়াটে আবেগময় ধারণা মাত্র নয়!

এইসব যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তার পরেও বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দুটো একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এটা আমার দেশ নয়! এটা আমার দেশ নয়। তারপর আপনমনেই একটু হেসে আবার ঢুকে পড়ি আড্ডাখানার মধ্যে।

সমাপ্ত